প্রবন্ধসংগ্রহ

প্রমথ চৌধুরীর অন্যান্য বই

বীরবলের হালখাতা
রায়তের কথা
হিন্দু সংগীত
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান
চার-ইয়ারি কথা
গল্পসংগ্রহ
সনেট-পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা

৭ অগস্ট ১৮৬৮ - ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

পরিমল গোস্বামী -গৃহীত চিত্র

প্রবন্ধসংগ্রহ

প্রমথ চৌধুরী

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কলকাতা

প্রথম খণ্ড
প্রকাশ ৭ অগস্ট ১৯৫২
পুনর্মুদ্রণ ৭ অগস্ট ১৯৫৭, মার্চ ১৯৫৯, মে ১৯৬১
দ্বিতীয় খণ্ড
মার্চ ১৯৫৪
প্রমথ চৌধুরীর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে দুই খণ্ডের একত্র মুদ্রণ
৭ অগস্ট ১৯৬৮
সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল ১৯৭৪
পুনর্মুদ্রণ নভেম্বর ১৯৮৬, অগস্ট ১৯৯০, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
মে ১৯৯৮

প্রকাশক শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলকাতা ১৭

মুদ্রক স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি। কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

বিভিন্ন প্রবন্ধপুস্তকে ও সাময়িক পত্রে মুদ্রিত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধাবলী থেকে নির্বাচিত পঞ্চাশটি রচনার সমষ্টি প্রবন্ধসংগ্রহ দুই খণ্ডে বিভক্ত। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক প্রবন্ধগুলির বিষয়বিভাগ ও নির্বাচন করে দিয়েছেন, এবং গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন, এজন্য বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

প্রথম খণ্ডে 'সাহিত্য' ও 'ভাষার কথা'-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত; দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়সূচী—'ভারতবর্ষ' 'সমাজ' ও 'বিচিত্র'। এই খণ্ডের শেষে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রবন্ধসূচী মুদ্রিত আছে।

[১৯৫২]

বর্তমান মুদ্রণে প্রবন্ধসংগ্রহের দুটি খণ্ড একত্র প্রকাশিত হল।

সূচীপত্র

সাহিত্য

ভাষার কথা

ভারতবর্ষ

সমাজ

বিচিত্র

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ সাহিত্য হয়ে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। রচনার অনতি-পরিসর বন্ধনের মধ্যে কোনো বিষয়ে লেখকের বক্তব্যের আলোচনা ও মীমাংসার প্রকাশ প্রবন্ধের মূল অর্থ ও আদি রূপ। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে ও তাঁর সমকালে বাংলায় প্রবন্ধের রূপ ছিল মোটের উপর এই অনলংকৃত আদি রূপ—রামমোহন রায়ের ধর্মালোচনায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজসংস্কারের তর্কবিতর্কে, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক ও সামাজিক প্রবন্ধগুলিতে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন নানা রচনার মধ্যে প্রবন্ধরচনায় হাত দিলেন তখন তাঁর সাহিত্যের সোনার কলমে প্রবন্ধের মধ্যে এল বক্তব্যের অতিরিক্ত উপরিপাওনা, যাতে রচনা হয় সাহিত্য। প্রবন্ধ সাহিত্য হয়ে উঠল। সেই অবধি বাংলায় সাহিত্যধর্মী প্রবন্ধের চলন হয়েছে। বিষয়ের নানাত্বে এবং প্রবন্ধলেখকদের রুচির ও শক্তির তারতম্যে বাংলার প্রবন্ধসাহিত্যে বৈচিত্র্য এসেছে, যেমন এসেছে অন্য-সব ভাষায়।

সাহিত্যধর্মী প্রবন্ধ ভাষা থেকে আটপৌরে নিরাভরণ প্রবন্ধকে বাতিল করে না। ভাষার যা প্রথম কাজ, বক্তব্যকে ব্যক্ত করা, তা চিরকালই থাকবে তার প্রধান কাজ। অনেক বিষয় আছে যাদের সম্বন্ধে প্রবন্ধের চরম সাফল্য বক্তব্যকে সুব্যক্ত করা। রাঙিয়ে বলা কি সাজিয়ে বলা যেখানে হাস্যকর। অস্থানে কবিত্ব, অর্থাৎ ঔচিত্যজ্ঞানের অভাব। বিজ্ঞান কি ইতিহাসের কোনো তথ্যের সুপরিচয় দিতে যা প্রয়োজন সে হচ্ছে বিষয়ের পূর্ণ পরিচ্ছন্ন জ্ঞান, যে বিচার ও যুক্তিতে তথ্যের প্রতিষ্ঠা তার পারম্পর্যের নীরন্ধ্র ধারণা, এবং সে জ্ঞান ও ধারণাকে পাঠকের মনে স্বচ্ছন্দে অবিকৃত পৌঁছে দেবার বাক্যরচনার কুশলতা। অলংকরণ এখানে বোঝা চাপানো। পাঠকের মনের পথে ঝটিতি গতির বাধা। এখানে রচনার যে গুণের প্রয়োজন সে হচ্ছে শুধু প্রসাদগুণ। অবশ্য এ প্রসাদগুণ আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয়, সর্বজনসাধ্যও নয়। আমাদের দেশের প্রাচীন ভাষ্যকার-টীকাকারদের মধ্যে যাঁরা প্রথম শ্রেণীর, তাঁদের রচনা এরকম রচনার উৎকৃষ্ট নমুনা। যেমন এ যুগের কোনো কোনো বিজ্ঞানীর শিক্ষিতসাধারণের জন্য রচিত প্রবন্ধ। কখনো হঠাৎ হাতের গুণে এ রচনাও সাহিত্য হয়ে ওঠে। সাহিত্যের সুপরিচিত রঙ ও ভূষণে নয়। রচনা থাকে তেমনি নিরাভরণ। বিষয়ের জ্ঞান ও তার প্রতিষ্ঠার প্রণালীর বিশদ বিবরণ দেওয়া ছাড়া রচনার আর-কোনো অবান্তর উদ্দেশ্যও থাকে না। তবুও সে রচনা কেবল বুদ্ধিকে উদ্রিক্ত ও তৃপ্ত করে না, মনকেও মুগ্ধ করে। আটপৌরের যা অতিরিক্ত তা বুদ্ধিকে বিষয় ও যুক্তির অনুধাবন থেকে অন্যমনা করে না, জ্ঞান ও বিচারকেই মনে কেটে বসিয়ে দেয়। নিরাবরণ কেজো শরীর অবয়ব-সংস্থানের সুঠামে কেজো থেকেও হয় মনোহারী। ছবিতে রঙ নেই, কিন্তু রেখাঙ্কনের কৌশল কেবল বস্তুকে আঁকে না, তার অন্তরকেও প্রকাশ করে। শংকরের বেদান্তসূত্রভাষ্যের প্রস্তাবনা এর উদাহরণ। গত শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ সেদিনের নবলব্ধ জ্ঞান সাধারণ্যে প্রচারের জন্য প্রবন্ধ লিখেছেন। তার মধ্যে আচার্য হাক্সলির প্রবন্ধগুলি এরকম রচনার ভালো উদাহরণ। বিষয় ও উদ্দেশ্যে আট-পৌরে হয়েও অসাধারণ। অন্য বিজ্ঞানীদের অনুরূপ প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনা করলেই প্রভেদ বোঝা যায়। আইন ও তার ইতিহাস বিষয়বস্তুতে নীরস। অধ্যাপক

মেইটল্যান্ড ইংলণ্ডের আইনের এক ইতিহাস লিখেছেন, এবং সে ইতিহাস নিয়ে ছোটো-বড়ো অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানে ও আবিষ্কারে তা পরিপূর্ণ, ঐতিহাসিকের একনিষ্ঠ সত্যভাষণ তার প্রতি পাতায়। কিন্তু এই নীরস উপকরণ মেইটল্যান্ডের হাতে পেয়েছে আশ্চর্য গড়ন। কোনো বাহ্যিক উপচারে নয়। নীরসকে সরস ক'রে প্রকাশের অসাধারণ লিপিকৌশলে। মেইটল্যান্ডের পূর্বে ইংলণ্ডের আইনের সম্পূর্ণতর ইতিহাস রচনা হয়েছে, যেমন অধ্যাপক হোল্ডস্‌ওয়ার্থের ইতিহাস। তথ্য পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শনের আধার। চোখ বুজে নির্ভর করা যায়। কিন্তু মেইটল্যান্ডের সঙ্গে তফাত আইনসর্বস্ব পাঠকের কাছেও অজ্ঞাত থাকে না। যে শক্তি সম্পূর্ণ কর্মক্ষম, আর যে শক্তি কর্মকে আয়ত্ত ক'রেও দশ আঙুল উর্ধ্বে থাকে তাদের যে তফাত। বাংলা প্রবন্ধে এরকম রচনার বড়ো দৃষ্টান্ত প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা'। বিগত যুগের ইংরেজ সিবিলিয়ান অ্যাস্‌কলি সাহেব বাংলাদেশের চাষের জমির স্বত্ব-স্বামিত্বের এক ঐতিহাসিক বিবরণ লিখেছিলেন। পরিষ্কার ঝরঝরে সুপাঠ্য লেখা। বাংলাদেশের রায়তের অবস্থা ও সে-অবস্থার ইতিহাসের বিশদ বর্ণনা। প্রমথ চৌধুরীর রচনার বিষয়ও ঐ এক কথা। কিন্তু সে কথা তাঁর হাতে হয়েছে 'রায়তের কথা'।

২

বাংলা ১৩২১ সালের বৈশাখ থেকে সবুজ পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হয়। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় নানা বিষয়ে যে-সব প্রবন্ধ লিখেছেন তাদের রচনাকাল তখন থেকে মোটামুটি কুড়ি-পঁচিশ বছর। এ সময়ের পূর্বে তাঁর লেখা প্রবন্ধের সংখ্যা অতি অল্প। যদিও বাংলা গদ্যরচনায় সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষার যে যুদ্ধে চলিত ভাষার পক্ষের নেতা হিসাবে প্রমথ চৌধুরীর বাংলাদেশে সব চেয়ে বেশি পরিচয়, তার কয়েকটি প্রবন্ধ এ সময়ের পূর্বে লেখা। 'কথার কথা' এ সময়ের অনেক পূর্বে ১৩০৯ সালের ভারতীতে প্রকাশ হয়; 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধু-ভাষা' ও 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' এর অনতিকাল পূর্বে ১৩১৯ সালের শেষের দিকে ভারতীতে প্রকাশ হয়।

এর সমকালে ও অনতিপূর্বকালে দুইজনের লেখা প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধগুলির মূল্য ও বিশেষত্ব হৃদয়ংগম হয়। সে দুইজন হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ। সাহিত্যের সমালোচনায়, কি রাষ্ট্র ও সামাজিক সমস্যার আলোচনায়, বাংলা কবিতার ছন্দ-বিচারে, কি বাংলা ব্যাকরণের রীতি ও বাংলা শব্দতত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে—সর্বত্র পড়েছে মহাকবির মনের ছাপ, সর্বত্র মহাকবির বাগ্‌বৈভব। বিচারে যুক্তির মধ্যে হঠাৎ এল উপমা। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ান্তরের স্পর্শে অদ্ভুত ঐক্যের আলোর চমক পথ আলো ক'রে দিল। প্রতিপক্ষের মনে হল এ অন্যায়। লড়াই চলছিল লাঠিতে লাঠিতে, তার মধ্যে তলোয়ারের ধার ও দীপ্তি আনা। ভাষা ও প্রকাশকে অনুদ্‌বেজিত রেখে শ্রোতার মনে আবেগ-সঞ্চারের যে কৌশল মহাকবির আয়ত্ত তার দোলা এ-সব প্রবন্ধে

লেগেছে। বিষয়ভেদে সে দোল মন প্রকাশ্যে উপভোগ করছে, বিষয়ভেদে সে দোল মৃদুর চেয়েও মৃদু। বুদ্ধি ভাবে যা-কিছু আয়োজন তাকে চলার পথে দ্রুত এগিয়ে নেবার জন্য। কিন্তু অজ্ঞাতে পায়ে লেগেছে ছন্দের দোল। মহাকবির গদ্য, সুতরাং ভুলেও কোথাও পদ্যগন্ধী নয়। ভাষাপ্রয়োগের কলাকৌশল রয়েছে প্রচ্ছন্ন। কিন্তু ব্যক্ত হয়েছে এমন গদ্যে যা গদ্যলেখকের অসাধ্য। এরকম প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর সাহিত্যে দুর্লভ; যেমন দুর্লভ মহাকবির আবির্ভাব। আর তার চেয়েও দুর্লভ মহাকবির প্রবন্ধরচনায় প্রেরণা। এ রচনা নানা শ্রেণীর প্রবন্ধের এক শ্রেণী নয়। এ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। পাগল ছাড়া এর অনুকরণের কথা কোনো লেখক কল্পনা করে না।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন সেকালের বেসরকারি কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক। ছাত্রদের পদার্থবিজ্ঞানের ক খ পড়াতেন। সেই প্রাথমিক বিজ্ঞান পড়াতে পরীক্ষা দেখাবার জন্য যে সামান্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তারও বালাই ছিল না। সে-সবের জায়গায় ছিল কালো বোর্ড আর সাদা চক। বিজ্ঞানে এই প্রাইমারি বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয় রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন সর্ববিজ্ঞানবিদ্যার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। কিন্তু মহাপণ্ডিত বললে তাঁর পরিচয় হয় না। বহু বিজ্ঞানের শিকড় থেকে ফুলফল পর্যন্ত সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানমাত্র নয়, সে-সব বিজ্ঞানের গতি ও প্রকৃতিতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল অসাধারণ। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানের পরিণতি, এবং সে শতাব্দীর শেষ দিকে তার নবপর্যায়ের সূচনার তথ্য ও তত্ত্বে তাঁর মন ভরে ছিল। সে জ্ঞান ও চিন্তার অল্প কিছু পরিচয় তিনি দিয়েছেন তাঁর প্রথম দিকের নানা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে। আজ যে-সব বাঙালি বিজ্ঞানী বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও নববিজ্ঞানের চমৎকার পরিচয় দিচ্ছেন রামেন্দ্রসুন্দর তাঁদের গুরু। তাঁর সর্বজ্ঞানরসিক অনুসন্ধিৎসু মন বিজ্ঞানেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারে নি। বেদবিদ্যা ও বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন থেকে আরম্ভ ক'রে মহাভারত ও মহাজন-চরিত-কথার মধ্য দিয়ে বাংলার মেয়েলি ছড়া পর্যন্ত সে মনের স্বচ্ছন্দ গতি। ইংরেজ সমালোচক যে মনকে বলেছেন 'বাদশাহী হীরা'। জ্ঞানের আলো পড়লে শতমুখ থেকে কিরণ ঠিকরে আসে। রামেন্দ্রসুন্দরের শেষের দিকের প্রবন্ধগুলি তাঁর এই বহুমুখী জ্ঞান ও চিন্তার পরিচয়। তাঁর বিশাল জ্ঞান ছিল তাঁর মনের লীলাক্ষেত্র, তাকে বহন করতে হত না। তাঁর লেখা প্রবন্ধ তাঁর মনের প্রতিচ্ছবি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা তিনি বলেছেন অতি সহজে; তার পরিধির কথা ভাবলে তবে মনে বিস্ময় আসে। তাঁর গভীর চিন্তা পাঠকের মনে চিন্তা আনে কিন্তু তার প্রকাশ গম্ভীর নয়। ভাষা অবলীলায় ভাবকে প্রকাশ করছে, কিন্তু তার গতি লঘু নয়। পদক্ষেপে মহার্ঘ শালীনতা। গভীর জ্ঞান ও চিন্তা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা। কিন্তু তার মধ্যে দেখা দিয়েছে অনাবিল হাসি। জ্ঞানীর বিমুক্ত মনের পরিচয়।

৩

গৌতম বুদ্ধ আর্য ছিলেন, না, প্রত্যন্তবাসী আর্যেতর জাতির বংশধর, এ তর্ক প্রাচীন। এথ্‌নলজির প্রমাণে এর মীমাংসার কথায় প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন—

"একদল আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, শাক্যসাত্বতাদি কুল আর্যবংশীয় নয়। কিন্তু এ মত যে সত্য তার কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই। এ স্থলে এথ্‌নলজি নামক উপবিজ্ঞানের আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে। তবে এইটুকু বলে রাখা দরকার যে, এথ্‌নলজিস্টদের হাত এখন আমাদের মাথা থেকে নেমে নাকের উপর এসে পড়েছে, সম্ভবত পরে দাঁতে গিয়ে ঠেকবে। যাঁরা মস্তকের পরিমাণ থেকে মানবের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব এবং হীনত্ব নির্ণয় করতেন তাঁদের মস্তিষ্কের পরিমাণ যে স্বল্প ছিল এ সত্য এথ্‌নলজিস্টরাই প্রমাণ করেছেন। এখন এঁদের বিজ্ঞানের প্রাণ নাসিকাগত হয়েছে। কিন্তু সে প্রাণ যতদিন না ওষ্ঠাগত হয় ততদিন এঁরা শাক্যসিংহের জাতি নির্ণয় করতে পারবেন না। কেননা বুদ্ধদেবের দন্ত রক্ষিত হয়েছে, নাসিকা হয় নি।" [১]

অনুমান করা কঠিন নয় রবীন্দ্রনাথ যদি এ আলোচনা করতেন কৌতুকের শুভ্রহাস্যে ও দুটি-একটি উপমার বিস্ময়ের চমকে একটি রসবস্তু গড়ে উঠত। রামেন্দ্রসুন্দরের হাতের বিজ্ঞানবুদ্ধির তীক্ষ্ণ আলোতে এ অপবিজ্ঞানের সমস্ত ফাঁক প্রকট হত। প্রমথ চৌধুরী বিজ্ঞানের চর্মে ঢাকা অজ্ঞানের বুকে সোজাসুজি ছুরি বসিয়েছেন। সে ছুরির ধার ও ঔজ্জ্বল্য চোখে ধাঁধা লাগায়। কিন্তু সে ছুরি যে খুন করার ছুরি তাতে সন্দেহ থাকে না। এই অল্প কয়েক লাইন লেখার মধ্যে নানা জ্ঞানের ইঙ্গিত ছড়ানো রয়েছে। কিন্তু তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। যে মারাত্মক ব্যঙ্গ এর লক্ষ্য তাতে ভার ও ধার জোগানোই এদের কাজ।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধের অনেকগুলি এইরকম বিতর্কমূলক। কোনো প্রাচীন কি নবীন প্রচলিত ও প্রচারিত মতকে পরীক্ষা ক'রে প্রায়ই তার উচ্ছেদ করা এদের লক্ষ্য। এ পরীক্ষায় যুক্তি ও তর্কের অনেক বিচার, দেশী ও বিদেশী তথ্য ও তত্ত্বের বহু আলোচনা। সে বিচার ও আলোচনার সামর্থ্য অল্প লেখকেরই থাকে। তার মূলে আছে অসামান্য ধীশক্তির বহু বছরের নানা জ্ঞান ও চিন্তার অনন্যমনা চর্চা। কিন্তু পাঠকের মনে এ-সব প্রবন্ধের প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ এ বিচার ও আলোচনার বিষয়বস্তুর নয়। বিচার ও আলোচনায় প্রবন্ধ কোথায় পৌঁছল সে মীমাংসারও নয়। যা প্রথম থেকে পাঠকের মনকে সজাগ ও মুগ্ধ রাখে সে হচ্ছে বিচার ও আলোচনার প্রকাশের ভঙ্গি।

এই-সকল প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী যে রচনারীতি এনেছেন বাংলা সাহিত্যে তা নূতন। যে-সব প্রবন্ধ বিতর্কমূলক নয় তারও রচনারীতি নূতন। বিষয়বৈচিত্র্যের অবধি নেই। ভাষা সাহিত্য, শিক্ষা সভ্যতা, প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাস, সমাজ পলিটিক্স, চিরন্তন ও সাময়িক সকলের সেখানে স্থান। নানা জ্ঞান ও বিদ্যার অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ করেছেন যেন সহজ ঘরোয়া কথায়। যা প্রাচীন, সুতরাং নমস্য ও তর্কাতীত, বর্তমানের আলো ফেলে তার স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। যা আধুনিক ও সাময়িক, অতিপ্রাচীনের মধ্যে তার ছবি আবিষ্কার ক'রে মানুষের মন ও চরিত্রের মূল ঐক্য দেখিয়েছেন। আর, সকল আলোচনাকে অনুস্যূত করে আছে এক

---

[১] 'আর্যধর্মের সহিত বাহ্যধর্মের যোগাযোগ'। সবুজ পত্র, মাঘ ১৩২২

দীপ্তিমান রসিকতার সুতীক্ষ্ণ সরসতা। পদবিন্যাসমাত্র যা মনকে অপহরণ করে। লেখকের মনের গড়ন-ভঙ্গি ছাড়াও যে এ রসিকতার মূলে আছে জ্ঞানের বৈচিত্র্য ও বহুজ্ঞানচর্চায় শাণিত বুদ্ধি, পাঠকের সে কথা প্রথমে মনে হয় না।

প্রবন্ধগুলি যখন সবুজ পত্রে প্রকাশ হচ্ছিল, তাদের শব্দচয়ন ও শব্দগ্রন্থনের কৌশল, সংহত প্রকাশের পারিপাট্য পাঠকের মনকে যে সবচেয়ে দখল করেছিল। তাতে আশ্চর্য কিছু নেই। বলার ভঙ্গি বলার বিষয়কে মনে ছাপিয়ে উঠেছিল। কিন্তু যে অংশটা প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভার একান্ত নিজস্ব তা ছাড়া তাঁর রচনারীতি বাংলা গদ্যরচনা, প্রবন্ধ ও সমধর্মী রচনাকে বহুল প্রভাবিত করেছে, লেখকদের জ্ঞানে ও অজ্ঞাতে। সাধু বনাম চলিত ভাষার তর্কে প্রমথ চৌধুরীর জয়ের চিহ্ন যেমন আজ বাংলা গদ্যরচনার সারা শরীরে, তেমনি তাঁর রচনারীতির প্রভাব বাংলা গদ্যে আজ ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাক্-প্রমথ যুগের তুলনায় আজকের বাংলা গদ্য অনেক সংহত, তার গতি অনাড়ষ্ট, জটিলকে স্বচ্ছন্দ প্রকাশের প্রসাদগুণ তার অনেক বেশি। এর মূলে প্রমথ চৌধুরীর আদর্শের প্রভাব অনেকখানি। বাংলা গদ্যের ভাষা ও রচনারীতিতে তিনি যে পরিবর্তন এনেছেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর বড়ো দান বলে তা স্বীকৃত হবে। কিন্তু তাঁর বলার ভঙ্গিতে তাঁর বলার বিষয় যদি চাপা পড়ে তা হবে দেশের দুর্ভাগ্য। এই ঋজু কঠিন তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে তিনি যা বলেছেন তার প্রধান কথা হচ্ছে মন ও সাহিত্যের মুক্তির কথা। সে কথা বলার প্রয়োজন চিরকাল থাকবে। এবং আজকের দিনে তার প্রয়োজন বোধ হয় সবচেয়ে বেশি।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। আজ আমরা যাকে বলছি 'প্রগতিসাহিত্য' বা 'সমাজচেতন সাহিত্য' তার তর্ক খুব প্রখর হয়ে উঠেছে, ঐতিহাসিক কারণে। কিন্তু সবুজ পত্র যখন প্রথম প্রকাশ হচ্ছে সে তর্কের তখন অপ্রতুল ছিল না। মানুষের সমাজের আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন; তার শ্রেণীভেদের, তার ধনোৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার, তার রাষ্ট্রশক্তির মূল উৎসের। এ আলোচনা তখন বেশ চলেছে; কারণ সময়টা প্রথম মহাযুদ্ধের উদ্যোগ ও ভীষ্ম-পর্ব। এ আলোচনায় প্রমথ চৌধুরীর মন ছিল মোটের উপর এই পরিবর্তনের পক্ষে। কিন্তু যখন দাবি উঠল যে, সাহিত্যের কাজ এই পরিবর্তনের পথকে সুগম করা, সাহিত্যিককে হতে হবে এই পথ তৈরির ইন্‌জিনিয়ার, তখন তিনি সাহিত্যের মূল প্রকৃতির কথাটি বললেন পরিষ্কার করে 'সবুজ পত্রের মুখপত্রে'—ওঁ প্রাণায় স্বাহা ব'লে যার আরম্ভ। একটা অংশ তুলে দিচ্ছি—

"...এ কথা সত্য যে মানবজীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা সাহিত্য নয়, তা শুধু বাক্‌ছল। জীবন অবলম্বন করেই সাহিত্য জন্ম ও পুষ্টি লাভ করে, কিন্তু সে জীবন মানুষের দৈনিক জীবন নয়। সাহিত্য হাতে-হাতে মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দিতে পারে না। কোনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কিন্তু কোনো-কোনো কথায় মন ভেজে; এবং সেই জাতির কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য। শব্দের শক্তি অপরিসীম। ...তাই আমরা কথায় মরি কথায় বাঁচি। মন্ত্র সাপকে মুগ্ধ করতে পারে কি না জানি নে, কিন্তু মানুষকে যে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গোটা ভারতবর্ষ। সংস্কৃত শব্দ যে সংস্কারকে বাধা দিতে পারে তার

প্রমাণ বাংলা সাহিত্য। মানুষমাত্রেরই মন কতক সুপ্ত আর কতক জাগ্রত। আমাদের মনের যে অংশটুকু জেগে আছে সেই অংশটুকুকেই আমরা সমগ্র মন বলে ভুল করি—নিদ্রিত অংশটুকুর অস্তিত্ব আমরা মানি নে কেননা জানি নে। সাহিত্য মানবজীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা।"

আজকের দিনে এর টীকায় বলা প্রয়োজন যে, ঘুমপাড়ানি গান শুধু মা-ঠাকুরমার মুখের প্রাচীন ছড়া নয়, যা শুনে শিশুরা ঘুমিয়ে পড়ে। অতিনবীন সব ছড়া আছে যার সুরে অনেক বয়স্ক শিশুর মনের এক দিক ছাড়া আর সব দিক ঘুমে অচেতন হয়। সাহিত্যের এক ফল সমস্ত মনকে জাগরূক করা। বিশেষ কাজের জন্য যাকে postulate স্বীকার করতে হয়, তা যে জ্ঞানের axiom নয় সে সম্বন্ধে মনকে সজাগ রাখা।

'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' প্রবন্ধটিতে প্রমথ চৌধুরী আবার লিখেছেন—

"সাহিত্যকে কোনো-একটি বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনের উপায়স্বরূপ করে তুললে তাকে সংকীর্ণ করে ফেলা অনিবার্য। আমরা সামাজিক জীব, অতএব নূতন-পুরাতনের যুদ্ধেতে একপক্ষে-না-একপক্ষে আমাদের যোগ দিতেই হবে, কিন্তু আমাদের সমগ্র মনটিকে যদি আমরা এই যুদ্ধে নিয়োজিত করি তা হলে আমরা সনাতনের জ্ঞান হারাই। যা কোনো-একটি বিশেষ যুগের নয়, কিন্তু সকল যুগেরই হয় সত্য নয় সমস্যা, তাই হচ্ছে মানবমনের পক্ষে চিরপুরাতন ও চির-নূতন, এক কথায় সনাতন। এই সনাতনকে যদি রাধাকুমুদবাবু নিত্যবস্তু বলেন, তা হলে সাহিত্যের যে নিত্যবস্তু আছে এ কথা আমি অস্বীকার করব না; কিন্তু ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিকেরা তা অগ্রাহ্য করবেন। একান্ত বিষয়গত সাহিত্যের হাত থেকে মুক্তি লাভ করবার ইচ্ছা থেকেই 'art for art' মতের উৎপত্তি হয়েছে। কাব্য বল, ধর্ম বল, দর্শন বল, এ-সকল হচ্ছে বিষয়ে নির্লিপ্ত মনের ধর্ম। এই সত্য উপেক্ষা করার দরুন ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য শ্রীভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে।"

কিছু বিচিত্র নয় যে, যেখানে 'সমাজসচেতন' 'প্রগতি'-সাহিত্যের আজ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি সেখানেই তার উপদ্রবের পাল্টা দেখা দেবে 'art for art' সাহিত্য ও সাহিত্য-বিচার, রাষ্ট্রের চাপ যখন একটু আলগা হবে।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধগুলি বহু জায়গায় ছড়ানো রয়েছে; অনেক পাঠকেরই দুষ্প্রাপ্য। তার পঞ্চাশটি প্রবন্ধ একত্র প্রকাশ হচ্ছে এই 'প্রবন্ধসংগ্রহে'। এই পুনঃপ্রকাশে পাঠকের সঙ্গে প্রবন্ধগুলির নূতন পরিচয় হবে। নানা কষ্টি-পাথরের বিচারে প্রবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যের বড়ো সম্পদ। প্রবন্ধগুলিতে মনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আহ্বান, উপদেশে ও আচরণে। প্রাচীন ও নবীন সংস্কারের অন্ধতা থেকে মুক্তি, অর্থহীন বন্ধন থেকে মুক্তি। বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালির মনের এই মুক্তির বাণীর প্রতিষ্ঠা হোক।

শ্রাবণ ১৩৫৯ — অতুলচন্দ্র গুপ্ত

সা হি ত্য

জয়দেব

একখানি সাহিত্যগ্রন্থকে দুইরকম ভাবে আলোচনা করা যায়: প্রথমত, কাব্য স্বরূপে ; দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কারের উপায় স্বরূপে।

প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিলে আমরা কেবলমাত্র তাহার দেশকাল-নিরপেক্ষ কাব্য হিসাবে দোষগুণবিচারে সমর্থ হই।

দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিলে আমরা তাহা যে নির্দিষ্ট সময়ে যে দেশে রচিত হইয়াছিল সেই দেশের তৎসাময়িক অবস্থাসকলের আলোচনাদ্বারা তাহার তদ্দেশীয় অন্যান্য কাব্যসকলের সহিত কি সম্বন্ধ এবং তাহার দোষ ও গুণ কোন্ কোন্ বিশেষ কারণপ্রসূত, এই-সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারি।

কাব্যের দোষগুণবিচার করাই সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক প্রথায় আলোচনা উক্ত বিচারের সহায়তাসাধন করে মাত্র। কিন্তু এই উভয় পদ্ধতির মিলিত সাহায্যেই যথার্থ সমালোচনা করা যায়।

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, সংস্কৃত সাহিত্যে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি না থাকায় শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি গ্রন্থের সহিত জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দের কি সম্বন্ধ তাহা আমার নিকট অবিদিত : এবং ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধেও আমার পরিমিত জ্ঞান, জয়দেবের সময়ে, অর্থাৎ বঙ্গীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের সময়ে, বঙ্গদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাদির সম্যক্ নির্ধারণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সুতরাং উপস্থিত প্রবন্ধে আমাকে জয়দেবের গ্রন্থ কেবলমাত্র কাব্য হিসাবে বিচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইবে। আর-একটি কথা, শুনিতে পাই গীত-গোবিন্দের নাকি একটি আধ্যাত্মিক অর্থ আছে ; জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার নিগূঢ় মিলনের বিষয়ই নাকি রাধাকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনাচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে এ কাব্যে আধ্যাত্মিকতার কোনো পরিচয় নাই। জয়দেব তাঁহার কাব্যে যে-সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার সহজ ও প্রচলিত অর্থ অনুসারে যতটা বুঝা যায় তাহাই বুঝিয়াছি, কোনো নিগূঢ় অর্থ উদ্‌ভাবনও করিতে পারি নাই। আমার কাছে কৃষ্ণ ও রাধাকে আমাদেরই মতো রক্তমাংসে-গঠিত মানুষ বলিয়া বোধ হইয়াছে এবং তাঁহাদের প্রেমকেও স্ত্রীপুরুষঘটিত সাধারণ মানবপ্রেম বলিয়াই বুঝিয়াছি। যদি যথার্থই একটি সুগভীর আধ্যাত্মিক ভাব

কাব্যখানির প্রাণস্বরূপ হয় তাহা হইলে আমি উপস্থিত প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা একান্ত অর্থশূন্য। সূচনাস্বরূপ এই অসম্পূর্ণতার কথা উল্লেখমাত্র করিয়া আমি আসল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

২

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়মূলক দুই-চারিটি ঘটনা লইয়া জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছেন।

একদিন কৃষ্ণ গোপিনীগণ সমভিব্যাহারে যমুনাতীরে বসন্তবিহার করিতেছিলেন, এমন সময় রাধা বেশভূষা করিয়া কৃষ্ণের উদ্দেশে তথায় আসিয়া উক্ত ব্যাপার দেখিয়া ক্রোধভরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণও একান্ত অপ্রতিভ হইয়া মৌনভাব ধারণ করিয়া রহিলেন এবং রাধাকে গমন হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টামাত্র করিতেও সাহসী হইলেন না। কিন্তু, রাধা চলিয়া গেলেন দেখিয়া তিনি গোপবধূদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোনো-এক নিভৃত কুঞ্জবনে আশ্রয় লইয়া মনো-দুঃখে রাধার কথা ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে রাধা স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণ-কৃত পূর্ববিহারস্মরণে অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে আনয়নার্থ তাঁহার নিকট সখী প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণ সখীকে বলিলেন, 'আমি যাইতে পারিব না, তাহাকে আসিতে বলো।' তার পর সখীর রাধার নিকট প্রত্যাগমন এবং কৃষ্ণের প্রার্থনানুযায়ী রাধাকে কৃষ্ণের নিকট পাঠাইবার চেষ্টা। কিন্তু রাধা ইচ্ছা থাকিলেও বিরহজনিত শারীরিক ক্লান্তি হেতু স্থান পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। সখী অগত্যা আবার কৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। কৃষ্ণ এবার রাধার সকাশে স্বয়ং যাইতে রাজি। সখী ছুটিয়া আসিয়া রাধাকে সুসংবাদ জানাইলে রাধা বাসকসজ্জা হইয়া কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ কথা রাখিতে পারিলেন না। কাজেই রাধা ঠাহরাইলেন যে, কৃষ্ণ অন্য-কোনো রমণীর সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার সহিত জমিয়া গিয়াছেন। উক্ত রমণীর সহিত কৃষ্ণ কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন, সেই-সকল কথা রাধা কল্পনায় অনুভব করিয়া সেই ভাগ্যবতীর তুলনায় নিজেকে অত্যন্ত হতভাগিনী মনে করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাত্রি এইরূপেই কাটিয়া গেল। প্রত্যুষে কৃষ্ণ অন্য রমণীর ভোগচিহ্নসকল শরীরে ধারণ করিয়া রাধার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাধা কৃষ্ণকে কিরূপ ভাষায় সম্ভাষণ করিলেন তাহা বোধ হয় আর বলিবার আবশ্যক নাই। কৃষ্ণ নিজের দোষক্ষালনের কোনোরূপ চেষ্টা করিলেন না, কারণ সে চেষ্টা নিষ্ফল। অধরের কজ্জল, কপোলের সিন্দুর, বক্ষঃস্থ যাবক-রঞ্জিত পদচিহ্ন— এ-সকল কোথা হইতে আসিল। তাহার নাহয় একটি বাজে কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু পরিধানের নীল শাটী সম্বন্ধে তো আর কোনোরূপে মিথ্যা কৈফিয়ত খাটে না। রাধা কথা শেষ করিয়া দুর্জয় মান করিয়া বসিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের কাছে কি মান টিকে? তিনি মনোমত কথায় রাধার প্রীতিসাধন করিলেন, রাধা কৃষ্ণের উপরে যে আড়ি করিয়াছিলেন তাহা ভাবে পরিণত হইল। এই তো গেল প্রভাতসময়ের ঘটনা। যোগেযাগে দিনটিও কাটিয়া গেল। দিনান্তে

অভিসারিকা রাধা কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন, উভয়ের মিলন হইল। মিলনান্তর সম্ভোগ, সম্ভোগান্তর কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার বেশবিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থের সমাপ্তি।

দেখা যাইতেছে, এ কাব্যের মুখ্য বর্ণিত বিষয় রাধাকৃষ্ণের রূপ ; তাঁহাদের পরস্পরের বিরহে পরস্পরের দুঃখপ্রকাশ ; মিলিত হইলে পরস্পরে কথোপকথন অর্থাৎ কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণের দেহের বর্ণনা ও তাঁহাদের মনোগত প্রেমভাবের বর্ণনা। এ ছাড়া আনুষঙ্গিকরূপে যমুনাতীর কুঞ্জবন বসন্তকাল রাধার সখী ও অন্যান্য গোপিনীগণের কথাও বলা হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকারের আত্মপরিচয় ও ঈশ্বরের বন্দনা বাদ দিলে দেখা যায়, রাধা ও কৃষ্ণের কেলি ব্যতীত স্বর্গমর্ত-পাতালের অন্য কোনো বিষয়, কোনোরূপ ধর্মনৈতিক কিংবা নৈতিক মতামত ইত্যাদি কিছুই গীতগোবিন্দে স্থান লাভ করে নাই। জয়দেবের মস্তিষ্কপ্রসূত কোনো চিন্তা ইহাতে সন্নিবেশিত হয় নাই। ইহা আমার নিকট অত্যন্ত সুখের বিষয় বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ কবির ক্ষমতার পরিসর যত সংক্ষিপ্ত হয় ও তাঁহার কল্পনা যত সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে বদ্ধ থাকে, ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন সমালোচকের পক্ষে সমালোচনা করাটা ততই সহজসাধ্য হইয়া উঠে। আমি এখন জয়দেবে যাহা নাই তাহার কথা ছাড়িয়া দিয়া তাহাতে যাহা আছে তাহার বিষয়ই আলোচনা করিব। জয়দেবের কবিত্বশক্তির পরিমাণ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্বে আমি তাঁহার বর্ণিত প্রেম কিরূপ ও তাঁহার বর্ণিত স্ত্রীপুরুষের রূপই বা কিরূপ, তাহাই যথার্থরূপে নিরূপণ করিতে চেষ্টা পাইতেছি।

মনের ভাবের প্রকাশ কথায় ও কার্যে। সাধারণ গোপিনীগণ, রাধা ও কৃষ্ণ, ইঁহারা প্রেম শব্দের অর্থে কি বুঝেন তাহা তাঁহাদের কথায় ও কার্যে বিশেষরূপে বুঝা যায়। গোপিনীগণ কৃষ্ণের কামোদ্দীপ্ত মুখের উপরে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া কানে-কানে কথা কহিবার ছলে তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া, পীনপয়োধরভারভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, 'কেলিকলাকুতুকেন' কুঞ্জবনে প্রবেশের নিমিত্ত তাঁহাব পরিহিত দুকুল ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি স্বীয় প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন।

রাধা কৃষ্ণের বিরহে কাতর হইয়া সখীকে বলিলেন—

> সখি হে কেশিমথনমুদারম্
>
> রময় ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়া সবিকারম্।

তাহার পর কৃষ্ণের সহিত মিলন হইলে কৃষ্ণ কি করিবেন এবং তাঁহার অবস্থা কিরূপ হইবে, রাধা সে বিষয়ে সখীকে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সে বক্তৃতাটি ইচ্ছা সত্ত্বেও এ সভায় আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতে পারিলাম না। নিজেরা পড়িয়া দেখিলেই তাহাতে রাধা বিরহ ও মিলন কিভাবে দেখেন তাহা অতি স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন।

সখী কৃষ্ণের নিকট রাধার বিরহ-অবস্থা জানাইয়া বলিতেছেন, রাধা

> ব্রতমিব তব পরিরম্ভসুখায় করোতি কুসুমশয়নীয়ম্।

আরো নানা কথা বলিলেন, ফলে দাঁড়াইল রাধার অবস্থা অতি শোচনীয় ; তিনি

অতিশয় উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত, রক্ষা পাওয়া ভার; রোগের কারণ কৃষ্ণের বিরহ। রোগ অতি কঠিন হইলেও কৃষ্ণের দ্বারা অতি সহজেই তাহার প্রশমন হইতে পারে। সখী কৃষ্ণকে বলিলেন, এ রোগ

ত্বদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্রসাধ্যাম্।

আর কৃষ্ণ?—তিনিও কথা এবং ব্যবহারে তাঁহার মনোভাব নিঃসন্দেহরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র চুম্বন আলিঙ্গন রমণ ইত্যাদির দ্বারা গোপিনীগণের প্রতি তাঁহার অন্তরের ভালোবাসা প্রকাশ করেন। সখীদ্বারা রাধাকে বলিয়া পাঠান যে, যাও শ্রীমতীকে গিয়া বলো—

ভূয়স্ত্বৎকুচকুম্ভনির্ভরপরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি।

কৃষ্ণ রাধার দুর্জয় মান ভঞ্জনার্থ যে-সকল চাটুবচন প্রয়োগ করেন তাহাতেও ঐ একটি ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি সকলেই যে-ভাবে মত্ত সে-ভাবের নাম সংস্কৃতে ঠিক প্রেম নহে। জয়দেব-বর্ণিত প্রেমের উৎপত্তি দেহজ আকাঙ্ক্ষা হইতে, তাহার পরিণতি দেহের মিলনে, তাহার উদ্দেশ্য দেহের ভোগজনিত সুখলাভ; তাঁহার নিকট বিরহের অর্থ প্রণয়ী-প্রণয়িনীর দেহের বিচ্ছেদজনিত শারীরিক কষ্ট।

গীতগোবিন্দে আসল ধরিতে গেলে প্রেমের কথা নাই, কেবলমাত্র কামের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। হৃদয়ের সহিত জয়দেবের সম্পর্ক নাই, শরীর লইয়াই তাঁহার কারবার। যে রমণীর মনে প্রেম নাই, যাহার হৃদয় নাই, কেবলমাত্র দেহ আছে—তাহার স্ত্রীসুলভ লজ্জা নম্রতা ইত্যাদি মানসিক সৌন্দর্যের বিশেষ অভাব থাকিবার কথা; রাধিকাপ্রমুখ গোপযুবতীদিগের এই নির্লজ্জতার পরিচয় তাঁহাদের ব্যবহারে ও কথোপকথনে যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করা যায়। রাধা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলে 'স্মরশরপরবশাকুত' প্রিয়মুখ দেখিয়া নির্লজ্জভাবে উচ্চহাস্য করিয়া উঠেন।

এই তো গেল প্রেমের কথা, এখন শারীরিক সৌন্দর্যের কথা পাড়া যাউক। শারীরিক সৌন্দর্য তিনটি বিভিন্ন উপকরণে গঠিত—

১ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গঠন বা আকৃতি

২ বর্ণ

৩ ভাব, অর্থাৎ আন্তরিক সৌন্দর্যের বাহ্যবিকাশ।

জয়দেবের নায়ক-নায়িকা যখন সর্বাংশে আন্তরিক সৌন্দর্যবঞ্চিত তখন অবশ্য তাহাদের শরীরে ভাবের সৌন্দর্যের দেখা পাওয়া অসম্ভব।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গঠন এবং পরস্পরের সহিত পরস্পরের পরিমাণসামঞ্জস্য ও বর্ণ এ-সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া ইহাতে কোনোরূপ ভোগের ভাব সংলিপ্ত নহে। যে সৌন্দর্য চোখে দেখা যায়, তাহার কেবল মানসিক উপভোগই সম্ভব; তাহা হইতে যে সুখ লাভ করা যায় তাহা কেবলমাত্র মানসিক আনন্দ; তাহাতে দেহের কোনোরূপ লাভলোকসান নাই। কিন্তু স্পর্শ করিয়া যে সুখ তাহা চৌদ্দ-আনা দৈহিক, সুতরাং জয়দেবের নিকট আমরা আকৃতি ও বর্ণের সৌন্দর্য অপেক্ষা শারীরিক কোমলতা ও স্পর্শযোগ্যতা ইত্যাদির অধিক বর্ণনা প্রত্যাশা করিতে পারি এবং জয়দেব এ বিষয়ে আমাদিগকে নিরাশ করেন না। মুখশ্রীর প্রধান উপকরণ ভাব, গঠন ও বর্ণের সৌন্দর্য। তাই জয়দেব মুখশ্রীবর্ণনা দুই

কথায় করিয়াছেন, যে দুইটি কথা বলেন তাহাও খানিকটা যেন না বলিলে নয় বলিয়া।

গীতগোবিন্দের মুখ্য বিষয়টি কি, তাহা আমি যেরূপ বুঝিয়াছি তাহা আপনাদিগকে এতক্ষণ ধরিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, এখন আমি তাহার কাব্যাংশের দোষগুণের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

৩

কোনো-একটি বিশেষ রচনা কাব্য কি না, ও যদি কাব্য হয় তাহা হইলে কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ কিংবা নিকৃষ্ট এ-সকল বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলে আগে কাব্য কাহাকে বলে সে বিষয়ে কতকটা পরিমাণে পরিষ্কাররূপ ধারণা থাকা আবশ্যক। আমরা প্রায় সকলেই সচরাচর কবিতা-বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি এবং আমাদের সকলেরই মনে কাব্য যে কি পদার্থ সে বিষয়ে একটা ধারণাও আছে, সেটি যে কি তাহা ঠিক প্রকাশ করিয়া বলা অত্যন্ত কঠিন। কোনো-একটি ক্ষুদ্র সংজ্ঞার ভিতর পৃথিবীর যাবতীয় কবিতাপুস্তক প্রবেশ করানো যায় না। দুই-চারি কথায় কোনো কাব্যের সমস্ত গুণের বর্ণনা করা অসম্ভব। কিন্তু সকল কাব্যের ভিতর যেটি সাধারণ অংশ তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে তাহা যে কি, সে বিষয়ে একটি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। আমার বিবেচনায় আমাদের দেশে প্রচলিত 'কাব্য রসাত্মক বাক্য'[১] কাব্যের এই সংজ্ঞায়, সকল কাব্যের ভিতর যেটি সাধারণ অংশ অর্থাৎ যাহার অভাবে কোনো রচনা কাব্য হইতে পারে না, সেইটি অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই অল্পসংখ্যক কথা-কয়েকটির মধ্যে কি ভাব নিহিত আছে তাহা খুলিয়া বুঝাইয়া দিলে বোধ হয় আপনারাও আমার কথা কতক পরিমাণে গ্রাহ্য করিবেন।

'রসাত্মক বাক্য'—এই কথা কয়েকটির যথার্থ অর্থ বুঝিতে হইলে রস আত্মা ও বাক্য এই শব্দগুলির অর্থ জানা আবশ্যক। প্রথমত, 'বাক্য' এই শব্দ লইয়াই আরম্ভ করা যাউক ; আমরা দেখিতে পাই বাক্যের দুইটি অংশ আছে। প্রথম, অর্থ ; দ্বিতীয়, শব্দ। প্রথমাংশ মানসেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ; দ্বিতীয়াংশ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যে শব্দ কানে শুনিয়া অন্তরে তাহার অর্থ গ্রহণ করি তাহাই বাক্য।

বাক্যের বিষয় মানুষের মনোভাব।

বাক্যের উদ্দেশ্য তাহা প্রকাশ করা এবং উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের উপায় শব্দ। সুতরাং বাক্য রসাত্মক হইতে হইলে, প্রথমত, ভাব রসাত্মক হওয়া আবশ্যক ; দ্বিতীয়ত, শব্দ রসাত্মক হওয়া আবশ্যক ; তৃতীয়ত, এরূপভাবে প্রকাশ করা কর্তব্য যাহাতে রসাত্মক ভাব রসাত্মক শব্দের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইতে পারে।

শব্দের রস কি? অবশ্য শ্রুতিমধুরতা; যেমন সংগীতে একটি সুর আর-একটি

[১] যেকালে এ প্রবন্ধ লেখা হয়, সেকালে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের কোনো গ্রন্থ আমি চোখে দেখি নি, এমন-কি, তাদের নাম পর্যন্ত শুনি নি, সেই কারণে উক্ত শাস্ত্রীয় বাক্যটি আমি আমাদের দেশে প্রচলিত বাক্য বলে উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছিলুম।—লেখক। ১৩২৭

সুরের সহিত মিশ্রিত হইয়া অধিকতর শ্রুতিমধুর হয়, সেইরূপ একটি শব্দ আর-একটি শব্দের সংস্পর্শে অধিকতর শ্রুতিমধুর হয়। কানে শুনিতে ভালো লাগিবার জন্য শব্দবিন্যাসের পারিপাট্য হইতে ছন্দের উৎপত্তি। ভাষা ছন্দোবন্ধ হইলে যত শুনিতে ভালো লাগে, ছন্দব্যতিরেকে ততদূর মিষ্ট লাগে না। সুতরাং কবির ভাষা ছন্দোযুক্ত। পদ্যে দুইটি উপকরণ বিদ্যমান—প্রথম rhyme, দ্বিতীয় rhythm। এই দুইটির মধ্যে দ্বিতীয়টিই ছন্দের প্রাণস্বরূপ ; rhyme না থাকিলেও ছন্দ হয় কিন্তু rhythm না থাকিলে চলে না ; rhyme ও rhythm উভয়েই সমভাবে বর্তমান থাকিলেই ছন্দ যথেষ্ট পরিমাণে পূর্ণাবয়ব হয়। সুতরাং যে কবির রচনায় rhyme এবং rhythm যত বহুল-পরিমাণে থাকিবে ততই তাঁহার শব্দের রস বেশি হইবে।

যে ভাব মনে সুন্দর ভাবের উদ্রেক করে, আমাদের হৃদয় বিশুদ্ধ আনন্দে পরিপ্লুত করে তাহাই রসাত্মক ভাব। যেমন ফুল, সুগঠিত প্রস্তরমূর্তি, পূর্ণিমা-রজনী ইত্যাদি আমাদের দেখিতে ভালো লাগে, কিন্তু কেন লাগে তাহার কোনো কারণ নির্দেশ করা যায় না, সেইরূপ মানবমনের প্রেম ভক্তি স্নেহ, সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষাজনিত বিষাদ, জগতের আদি অন্ত উদ্দেশ্য ইত্যাদি রহস্যপূর্ণ বিষয়ের চিন্তাজনিত মনের আবেগ, বিস্ময়াদি ভাবসকল সহজেই আমাদের ভালো লাগে ; কিন্তু কেন যে ভালো লাগে তাহার কোনো কারণ নির্দেশ করা যায় না। উক্তপ্রকার রসাত্মক ভাবসকলই কাব্যের মুখ্য বিষয়। এই-সকল ভাবের ভিতর যে মাধুর্য আছে তাহাই প্রকাশ করা এবং আমাদের মনে এই-সকল ভাব উদ্রেক করিয়া আনন্দ প্রদান করাই কবিতার উদ্দেশ্য এবং যে কবি সেই উদ্দেশ্যসাধনে কৃতকার্য হয়েন তিনিই যথার্থ শ্রেষ্ঠ কবি। যদিও সুন্দর ভাব লইয়াই কবির কারবার, তথাপি পৃথিবীর কোনো সুন্দর জিনিস একেবারে তাঁহার আয়ত্তের বহির্ভূত নয়। কি বাহ্যিক, কি মানসিক যতপ্রকার সৌন্দর্য আছে সকলেরই ভিতর একটা বিশেষ মিল আছে। চিত্রকরের মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি দ্বারা লোকের মানসিক তৃপ্তি সাধন, কিন্তু তিনি তাঁহার চিত্রে বাহ্যিক সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া ভাবের সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিতে পারেন ; কবির পক্ষেও ঠিক সেইরূপ। ভাবের সৌন্দর্য প্রকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইলেও তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যের বর্ণনাতেও ক্ষান্ত নহেন, বরং যে কবি নিজের রচনায় রূপজ ভাবজ নৈতিক ইত্যাদি নানাবিধ সৌন্দর্যের একত্র মিলন করিতে পারেন তিনিই তত উচ্চদরের কবি বলিয়া গণ্য হয়েন। কিন্তু যেমন একটি চিত্রকরের পক্ষে চিত্রে ভাবের সৌন্দর্য প্রকটিত করিতে হইলে প্রথমত, চিত্রটিকে সুন্দর করিয়া আঁকিতে হইবে, দ্বিতীয়ত, যাহাতে তাহার ভাব পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয় সেইরূপ করিয়া আঁকিতে হইবে ; কবির পক্ষেও ঠিক সেইরূপ কোনো-একটি বিষয় কাব্যভুক্ত করিতে হইলে প্রথমে তাহাকে ভাবের সৌন্দর্যের সহিত লিপ্ত করিতে হইবে, দ্বিতীয়ত, তাহাকে সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইবে।

আমি ভাষা ও ভাব পৃথক করিয়া আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু বাস্তবিক কবির নিকট ভাষা ও ভাবের ভিতর কোনো প্রভেদ নাই। কবিতার ভাষা ও ভাব পরস্পরের

উপর পরস্পর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ভাব মন্দ হইলে কবিতার ভাষা কখনোই সুন্দর হইতে পারে না, এবং ভাষা কদর্য হইলে ভাবও সম্পূর্ণরূপে কবিত্বপূর্ণ হইতে পারে না। কবিতার ভাষা ভাবের দেহস্বরূপ, কিছুতেই তাহা ভাব হইতে পৃথক করিতে পারা যায় না। একটি ভাব দুইপ্রকার ভাষায় ব্যক্ত হইলে অর্থ সম্বন্ধে অনেকটা বিভিন্ন হইয়া যায়। নিবিড় অন্ধকারকে কালিদাস বলিতেছেন 'সূচিভেদ্যস্তমস্', জয়দেব বলিতেছেন 'অনল্পতিমির'। এ দুয়ের মধ্যে কতটা প্রভেদ আপনারাই বুঝিতে পারিতেছেন।

যে অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারা কবিতায় ভাব ও ভাষার সম্পূর্ণ একীকরণ সম্পন্ন হয় তাহাই কবিতার আত্মা। এই আত্মা আমাদের আত্মার ন্যায় রহস্যাজড়িত। যেমন বৈজ্ঞানিকগণ মানবদেহ খণ্ডখণ্ড করিয়াও তাহার ভিতরকার আত্মাকে খুঁজিয়া পান না, সেইরূপ সমালোচকেরাও একখানি কাব্যের বিভিন্ন উপাদানসকল পরস্পর হইতে বিশ্লিষ্ট করিলেও তাহাদের অন্তরস্থ আত্মাকে ধরিতে পারেন না। যাঁহারা ভাবের সহিত ভাষা যুক্ত করিয়া কবিতাকে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন তাঁহাদেরই কবিতার আত্মা আছে। কিন্তু যথার্থ কবিত্বশক্তিবিবর্জিত কোনো ব্যক্তি যদি বহুল পরিশ্রম দ্বারা বিশেষরূপে পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ভাব -সকলকে পরিপাটি ছন্দ ও ভাষা -যুক্ত করেন তাহা হইলেও তাঁহার রচনা কাব্যশ্রেণীভুক্ত নয়। সৃষ্টি ও নির্মাণে যে প্রভেদ, কবিতা ও তাহার অনুকরণে রচিত প্রাণশূন্য ছন্দোবন্ধের সমষ্টিতে সেই প্রভেদ।

পূর্বে যাহা বলিলাম তাহা সংক্ষেপে বলিতে গেলে দাঁড়ায় এই যে, যে রচনায় রসাত্মক ভাব সম্পূর্ণরূপ অনুরূপ ভাষায় প্রকাশিত তাহাকেই আমি কাব্য বলিয়া মানি। এখন দেখা যাউক কাব্য-বিষয়ে আমার মত অনুসারে বিচার করিলে জয়দেবের কাব্যজগতে স্থান কোথায়।

৪

জয়দেব অধিকাংশ কবিদিগের অপেক্ষা কাব্যের বিষয়নির্বাচনে নিজের নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় দিয়াছেন; প্রেমের পরিবর্তে শৃঙ্গাররসকে কবিতার বর্ণিত বিষয়স্বরূপ স্থির করিয়াছেন, সেজন্য আমরা কখনো তাঁহাকে কালিদাসাদি কবিগণের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করিতে পারি না। আমি আপাতত জয়দেব বিষয়টি কাব্যাকারে গঠিত করিয়া কিরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহাই বলিতেছি।

জয়দেবের কবিতাসকল প্রকৃতির শোভা, রাধাকৃষ্ণের রূপ এবং তাঁহাদের বিরহ-মিলন ইত্যাদি অবস্থার বর্ণনায় পূর্ণ; সুতরাং তাঁহার বর্ণনাবিষয়ে কৃতকার্যতা অনুসারে তাঁহার কবিত্বশক্তির স্বরূপ নির্ধারিত হইবে। কবিরা দুইরূপ প্রণালীতে বর্ণনা করিয়া থাকেন— প্রথম, স্পষ্ট এবং সহজ ভাবে, দ্বিতীয়, বর্ণিত বিষয় ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দেন। উভয় উপায়ই প্রকৃষ্ট, এবং শ্রেষ্ঠ কবিরা উভয় প্রণালী অনুসারেই বর্ণনা করিয়া থাকেন। জয়দেব কেবলমাত্র প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন।

বর্ণনার পারিপাট্য ও সৌন্দর্য উপমাদি অলংকারসকলের প্রয়োগ দ্বারা বিশেষরূপে সাধিত হয়। এ জগতের সকল পদার্থের মধ্যেই একটা মিল আছে। আমাদের সময়ে সময়ে কোনো-একটি পদার্থ কিংবা ঘটনা দেখিয়া মনে হয় যেন আর অন্য-একটি কি জিনিসে এইরূপ ভাব দেখিয়াছিলাম। পৃথক পৃথক পদার্থের ভিতরকার এই সাদৃশ্যের তুলনা হইতে উপমাদির উৎপত্তি।

উপমাদির দ্বারা দুইটি কার্য সিদ্ধ হয়: ১. ইহার দ্বারা একটি অস্পষ্ট ভাবকে স্পষ্ট করা যায়, ২. ইহার দ্বারা ভাবের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়। ইহা ব্যতীত কোনো দুইটি ভাব বা পদার্থের ভিতর আমার অলক্ষিত কোনোরূপ মিল কেহ দেখাইয়া দিলে মনে বিশেষ আনন্দ লাভ করা যায়। কবিতায় যে-সকল উপমা ব্যবহৃত হয় তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য কোনো-একটি ভাবের উপমার সাহায্যে সৌন্দর্যবৃদ্ধি, এবং কেবলমাত্র উপমার যাথার্থ্য দ্বারা মনের তুষ্টিসাধন, সুতরাং জয়দেবের বর্ণনাব যাথার্থ্য এবং সৌন্দর্য অনেকটা তাঁহার উপমাদি অলংকার প্রয়োগের শক্তিসাপেক্ষ।

জয়দেবের বিরহাদি বর্ণনা নেহাত একঘেয়ে। তাঁহার বিরহীবিরহিণীদিগের নিকট যে বস্তু মনের সহজ অবস্থায় ভালো লাগিবার কথা তাহাই শুধু খারাপ লাগে। জয়দেব বিরহের ভাবের অন্য-কোনো অংশ ধরিতে পারেন নাই। কালিদাসের মেঘদূত-কাব্যে যক্ষস্ত্রীর যে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে জয়দেবের বর্ণনায় বৈচিত্র্যের অভাব এবং বিরহাবস্থার মধ্যে যে মধুর সৌন্দর্য আছে তাহার সম্পূর্ণ উল্লেখের অভাব— এই দুইটি ত্রুটি আমাদের নিকট স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

জয়দেবের অভিসারবর্ণনায় কেবলমাত্র বেশভূষার বর্ণনাই দেখিতে পাই। তাহাতে অভিসারিকার মনের আবেগ, প্রেমের নিমিত্ত অবলা রমণীগণ কিরূপে নানারূপ বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, এ-সকল বিষয়ে তিনি একটি কথাও বলেন নাই। এ বর্ণনাও নেহাত একঘেয়ে। তাঁহার বসন্তবর্ণনার প্রধান দোষ তাহাতে একটিও সম্পূর্ণ নূতন কথা দেখিতে পাই না। পূর্ববর্তী কবিরা যে-সকল বসন্তবর্ণনা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই তাঁহার বসন্তবর্ণনার উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। নূতনত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহাতে আরো অনেক দোষ বাহির হইয়া পড়ে। তাঁহার সমস্ত বর্ণনাটিতে সমগ্র বসন্তের ভাব ফুটিয়া উঠে না। তিনি এ কথা ও কথা বলেন, কিন্তু তাহার ভিতর হইতে একটা কোনো বিশেষ ভাব খুব স্পষ্টরূপে দেখা যায় না। কালিদাস অনেক স্থলে বসন্তবর্ণনা করিয়াছেন, তাহার অনেক স্থলেই তিনি একটিমাত্র শ্লোকে হয় বসন্তের সমগ্রভাব প্রকাশ করিয়াছেন, নয় একটিমাত্র চিত্রে সমস্ত বসন্ত আবদ্ধ করিয়াছেন—

> দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং
> স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ॥
> সুখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ
> সর্বং প্রিয়ে চারুতরং বসন্তে॥

জয়দেব বসন্তবর্ণনায় অনেকগুলি বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বর্ণিত বিষয়-গুলির মধ্যে খুব-একটা ভাবের মিল নাই। তিনি একটি শ্লোকের প্রথম চরণে

বলিতেছেন যে 'বসন্তে বিরহীগণ বিলাপ করিতেছেন'; সেই শ্লোকের আর-একটি চরণে 'অলিকুল কর্তৃক বকুলকলাপ অধিকারে'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এ দুয়ের ভিতর যে কি স্বাভাবিক মিল তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তাঁহার উদ্দেশ্য, বসন্তে যে মদন-রাজার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে তাহাই বর্ণনা করা। কিন্তু কেবলমাত্র কোনো ফুলকে মদন-রাজার নখ এবং অন্য অপর আর-একটিকে বিরহী-দিগের হৃদয়বিদারণের অস্ত্রস্বরূপ বলিলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যথার্থ মদনবিকারের ভাব কিসে ফুটিয়া উঠে তাহা আমি কালিদাসের একটিমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥

উক্ত শ্লোকে কালিদাস মদনের নখ দূরে যাউক তাঁহার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, তথাপি প্রেমরসমত্ততার কি চমৎকার চিত্র আঁকিয়াছেন। সমগ্র ভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও জয়দেব এমন একটিমাত্রও শ্লোক রচনা করিতে পারেন নাই যাহাতে কোনো-একটি পদার্থের সজীব চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতিবর্ণনাতেও যেরূপ স্ত্রীপুরুষের রূপবর্ণনাতেও তিনি ঠিক সেইরূপ অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। কালিদাস

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥

এই একটিমাত্র শ্লোকে সমগ্র উমাকে কত সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। জয়দেব এইরূপ দুই-চার কথায় একটি স্ত্রী কিংবা পুরুষের সমগ্র চিত্র বর্ণনা করিতে একান্ত অপারগ। তাঁহার বিশ্বাস পদ্মের ন্যায় মুখ, তিলফুলের ন্যায় নাসিকা, ইন্দীবরের ন্যায় নয়ন এবং বান্ধুলির ন্যায় অধর—এই-সকলের একটি সমষ্টি করিলেই সুন্দরীর মুখ নির্মাণ করা যায়। উক্ত বিশ্বাসে ভর করিয়া সুন্দর-কবি বিদ্যাকে একটি পদ্মের সহিত তিলফুল নীলোৎপল বান্ধুলিপুষ্প এবং কুন্দকলিকা ইত্যাদি অতি কৌশলসহকারে সংযোজনা করিয়া যে অপূর্ব মূর্তি নির্মাণ করিয়া উপহারস্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন তাহা অবশ্য জয়দেবের নিকট তিলোত্তমার মুখ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। উক্তপ্রকার বিশ্বাসের উপর আমার কোনোই আক্রোশ নাই, যিনি ইচ্ছা করেন অনায়াসে তিনি ঐ-সকল ফুল জোড়াতাড়া দিয়া যখন-তখন মনের সুখে সুন্দরীর রূপবর্ণনা করিয়া কবিতা লিখিতে পারেন। কেবল এইটিমাত্র মনে রাখিলেই আমি সন্তুষ্ট থাকিব যে, পদ্ধতি অনুসারে চলিলে মাথামুণ্ড কিছুই বর্ণনা করা যায় না।

তার পর জয়দেবের উপমার বিষয় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। প্রথমত আমরা দেখিতে পাই যে জয়দেবের উপমাসকল প্রায়ই নেহাত পড়ে-পাওয়া-গোছের।

জয়দেবের পূর্বে সেই-সকল উপমা শতসহস্রবার সংস্কৃতকবিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। জয়দেব কাব্যজগতের বিস্তৃত ক্ষেত্র হইতে তাহা কুড়াইয়া লইয়াছেন মাত্র। কাব্যজগতে না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করার প্রথাটা বিশেষরূপ প্রচলিত আছে এবং কোনো কবি যদ্যপি উক্ত উপায়ে উপার্জিত দ্রব্যের সমুচিত সদ্ব্যবহার করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে লোকে কিছু-একটা বিশেষ দোষও দেয় না। নেহাত পরের দ্রব্য বলিয়া চেনা গেলেই আমরা রাগ করি এবং কবির উদ্দেশে কটুকাটব্যও ব্যবহার করি; কিন্তু যদি তাহার একটুমাত্রও রূপের পরিবর্তন দেখিতে পাই তাহা হইলেই ঠাণ্ডা থাকি। জয়দেব অনেক স্থলেই পরের উপমাদি লইয়া তাহার একটু-আধটু বদলাইয়া নিজের বলিয়া চালাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহার এ বিষয়ে হাত বড়ো মন্দ সাফাই নহে; আবার অনেক স্থলে যেমনটি পাইয়াছেন অবিকল তেমনটি রাখিয়াছেন। এইরূপ উপমাদি পড়িয়া রাগ করি আর না করি, খুব যে খুশি হই তাহা নহে। যে কথা হাজারবার শুনিয়াছি তাহা আর কার শুনিতে ভালো লাগে। আমার তো পদ্মের মতো মুখ ইত্যাদি কথা শুনিলেই মনটা একটু অন্যমনস্ক হয় এবং ঐরূপ উপমা বেশিক্ষণ পড়িতে হইলেই হাই উঠিতে আরম্ভ হয়, কারণ ও-সব পুরানো কথায় মনে কোনো নির্দিষ্ট ভাব বা চিত্র আসে না। শুনিবামাত্রই মনে হয় ও-সব তো অনেকদিনই শুনিয়াছি, আবার অনর্থক ও কথা কেন? ভরসা করি, আপনারা সকলেই আমার সহিত এ বিষয়ে একমত।

কিন্তু জয়দেব যে কেবলমাত্র প্রচলিত উপমাদি ব্যবহার করিয়াছেন এমন নহে তাঁহার পরিকল্পিত দু-চারিটি নূতন উপমাও গীতগোবিন্দে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে যেগুলি আমার নিকট বিশেষরূপে জয়দেবীয় বলিয়া বোধ হইয়াছে, আপনাদের জ্ঞাতার্থে তাহারই দুই-একটি এখানে উদ্‌ধৃত করিতেছি। জয়দেব ঈশ্বরের নরহরিরূপ সম্বন্ধে বর্ণনায় বলিতেছেন—

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গম্
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।

ইহার দোষ— প্রথমত, কমলের নখাঘাত ও তৎকর্তৃক ভ্রমরের বিনাশ নেহাত অস্বাভাবিক; দ্বিতীয়ত, নরসিংহের করযুগলকে কমলের সহিত তুলনা করায় এবং হিরণ্যকশিপুকে ভৃঙ্গের সহিত তুলনা করায় উভয়ের ভিতর বৈরিতার বিরোধী-ভাবের পরিচয় দেওয়া হয় নাই; তৃতীয়ত, দুর্দান্ত দৈত্যের সহিত কৃষ্ণ নরহরিরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বধার্থ স্বীয় বীরত্বের পরিচায়ক যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাকে কমল ও ভ্রমরের যুদ্ধস্বরূপ বলায় ভাবের যাথার্থ্য এবং সৌন্দর্য কতটা পরিমাণে বজায় থাকিল আপনারাই বিবেচনা করিবেন।

বলরামকে উল্লেখ করিয়া জয়দেব বলিতেছেন—

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্।

হলতাড়নার ভয়ে যমুনা ডাঙায় উঠিয়া বলরামের দেহে বসনরূপে সংলগ্ন হইয়াছেন, এরূপ অযথা কথা বলায় যদি কিছু সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইত তাহা হইলেও নাহয়

উপমাটি সহ্য করা যাইত; আমার বিবেচনায় জয়দেব বলরামকে জলে নামাইলে যমুনাকে আর জলছাড়া করিবার আবশ্যক হইত না। কৃষ্ণের মুখ কিরূপ, না—

তরলদৃগঞ্চলবলনমনোহরবদনজনিতরতিরাগম্‌

স্ফুটকমলোদরখেলিতখঞ্জনযুগমিব শরদি তড়াগম্‌।

কৃষ্ণের নয়নশোভিত বদন দেখিয়া মনে হইল যেন পদ্মের ভিতর খঞ্জনযুগল খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কমলের ভিতর খঞ্জনযুগলের বিহার আমিও দেখি নাই, জয়দেবও দেখেন নাই এবং আমার বিশ্বাস ওরূপ কার্য খঞ্জনেরা কখনো করে না। এ উপমাটি আমার নিকট যেমন অপ্রাকৃত তেমনি অর্থশূন্য বলিয়া মনে হইতেছে।

এই আমার উপমা তিনটি উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য কেবল জয়দেবকে নিন্দা করা নহে; আমি এই-সকল উদাহরণ হইতে জয়দেব কি জন্য এবং কি উপায়ে উপমা প্রয়োগ করিতেন তাহাই দেখাইব। এরূপ উপমা পড়িয়া আপনাদের কি মনে হয় না যে, জয়দেব কেবল উপমাপ্রয়োগ করাটা কবিতায় আবশ্যক বিবেচনায় উক্ত কার্য করিতেছেন, বাস্তবিক উপমায় কবিতার সৌন্দর্য বাড়িল কি না এবং কোনো বিশেষ ভাব পরিষ্কাররূপে তাহার সাহায্যে ব্যক্ত করা গেল কি না এ-সব কথা জয়দেবের মনেও আসে নাই। উপমা আপনা হইতেই তাঁহার কাছে আসে না, তিনি জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া আনেন অর্থাৎ তাঁহার উপমায় স্বাভাবিকতা কিছুমাত্র নাই। তাহা কেবলমাত্র কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ। প্রমাণ, কবিরা প্রায়ই সুন্দর করযুগলকে কমলের সহিত তুলনা করেন, তাই জয়দেব নরসিংহের করযুগলকে কমলস্বরূপ বলিয়া বসিলেন্‌ এবং তাহাকে কমল বলায় হিরণ্যকশিপুকে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ভৃঙ্গ বলিতে হইল। ভাবের সৌন্দর্য বজায় থাকিল কি না সে কথা ভাবিয়া আর কি করিবেন? একটি ভুলের জন্য বাধ্য হইয়া আর-একটি অন্যায় কাজ করিতে হইল। আবার দেখুন, কবিরা মুখকে পদ্মের সহিত এবং নয়নযুগলকে খঞ্জনের সহিত তুলনা করেন, ইহা জয়দেবের নিকট অবিদিত ছিল না, কিন্তু নয়নশোভিত বদনকে কবিরা কি বলেন তাহা তাঁহার জানা ছিল না। কাজেই কি করেন, তিনি উপমা-স্বরূপ পদ্মের সহিত মনে মনে খঞ্জনের যোগ করিয়া ফেলিলেন, অগত্যা খঞ্জনকেই কমলোদরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইল। ল্যাঠা চুকিয়া গেল, জয়দেব হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কবিতা হইল কি না সে কথা আপনারা ভাবুন।

আমি ক্রমে ক্রমে প্রমাণ করিয়াছি যে, জয়দেব যখন কোনো বিষয়ের সাধারণ ভাব অথবা তাহার সর্বাবয়বের প্রত্যক্ষরূপ সহজভাবে কিংবা অলংকারাদির সাহায্যে উত্তমরূপ বর্ণনা করিতে অসমর্থ তখন তাঁহাকে এ বিষয়েও বড়ো কবি বলিয়া গণ্য করা যায় না।

৫

এখন আমি জয়দেবের ভাষা সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা বলিয়াই আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। জয়দেবের ভাষা যে অতি সুললিত এবং শ্রুতিমধুর ইহা তো সর্ববাদিসম্মত। এমন-কি, যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ তাঁহারাও এ কথা

স্বীকার করিয়া থাকেন। বরং শেষোক্ত ব্যক্তিদিগকেই উক্ত বিষয়ে জয়দেবের প্রচুর পরিমাণে প্রশংসা করিতে দেখা যায়। আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, কবিতার ভাষার সৌন্দর্য হইতে ভাবের সৌন্দর্য পৃথক করা যায় না। ভাবের অনুরূপ ভাষা প্রয়োগেই যথার্থ কবিত্বশক্তির পরিচয়। যাহাদের মস্তিষ্কে ভাব ও ভাষা একত্রে গঠিত হয় না তাহারা লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য হয় ভাব-বিষয়ে পাণ্ডিত্য নয় ভাষা-বিষয়ে ছন্দনির্মাণের কৌশল, এই দুইয়ের একটির সাহায্য লইতে বাধ্য হয়। জয়দেব আমার বিবেচনায় যথার্থ উচ্চ-অঙ্গের কবিতা রচনার অক্ষমতাবশত লোকসাধারণের চটক লাগাইবার অভিপ্রায়ে শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় কথার কারিগরি দেখা যায়। মনে কোনো-একটি বিশেষ ভাবের উদয় হইলে যে-কথাটি স্বভাবতই মুখাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, জয়দেব সেটিকে চাপিয়া রাখেন। তাহার পরিবর্তে শব্দ-শাস্ত্র খুঁজিয়া ভাবপ্রকাশবিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনেকাংশে অনুপযোগী আর-একটি কথা আনিয়া হাজির করেন। কালিদাসাদি যথার্থ শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনাপ্রণালী স্বতন্ত্র। তাঁহারা স্বভাবতই যে কথাটি মুখে আসে সেইটি ব্যবহার করেন; তবে তাঁহাদের ভাবের সহিত আমাদের ভাবের অনেক পার্থক্য, সুতরাং যেরূপ শব্দ প্রয়োগ করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা একান্তই দুঃসাধ্য। আপনার আমার ও জয়দেবের সহিত তাঁহাদের এইটুকুমাত্র তফাত। জয়দেবের ভাষার প্রধান দোষ— সুস্পষ্ট rhythmএর অভাব। তাঁহার ব্যবহৃত শব্দসকল একটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে অন্য আর-একটির ন্যায়। অতিরিক্ত মাত্রায় অকারান্ত শব্দের ব্যবহারে শব্দসকলের হ্রস্বদীর্ঘাদি প্রভেদ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায়, সুতরাং তাহাদের উচ্চারণের বৈচিত্র্য-অভাবে, জয়দেবের ভাষায় গাম্ভীর্যের একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু বাক্যের যে অংশ কেবলমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাও গাম্ভীর্যব্যতিরেকে সম্পূর্ণরূপে মধুর হইতে পারে না। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ভাষা-সম্বন্ধেও গাম্ভীর্যযুক্ত মাধুর্য গাম্ভীর্যবিরহিত মাধুর্য অপেক্ষা বহুল পরিমাণে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীসম্পন্ন। গীতগোবিন্দের সহিত মেঘদূতের তুলনা করিলেই দেখা যায় গাম্ভীর্য-গুণবিশিষ্ট হইয়াও শেষোক্ত কাব্যের ভাষা পূর্বোক্ত কাব্যের ভাষা হইতে কত উৎকৃষ্ট।

সমভাবে উচ্চারিত অকারান্ত শব্দের একত্রে বহুল বিন্যাসের আর-একটি দোষ আছে, তাহাতে পাঠকমাত্রেরই পক্ষে রচনার অর্থ গ্রহণ করা কিঞ্চিৎ কঠিন হইয়া উঠে। বিভিন্ন বিভিন্ন শব্দসকল পরস্পর হইতে বিশেষরূপে স্বতন্ত্র না হইলে পাঠকালীন তাহাদের প্রত্যেকের উপর নজর পড়ে না। একটি শ্লোকের অন্তর্ভূত শব্দসকলের আকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য যত সুস্পষ্ট তাহার অর্থও সেই পরিমাণে চট্ করিয়া বুঝা যায়। শব্দসকলের বৈচিত্র্য বজায় রাখিয়া তাহাদের ভিতর সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া যিনি রচনাকে শ্রুতিমধুর করিতে পারেন তিনিই যথার্থ ভাষার রাজা। জয়দেব তাঁহার রচনায় শব্দসকলের হ্রস্বদীর্ঘাদি প্রভেদজনিত বন্ধুরতা ভাঙিয়া মাজিয়া-ঘষিয়া এমন মসৃণ করিয়াছেন যে তাহা পড়িতে গেলে তাহার উপর দিয়া রসনা ও মন দুইই পিছলাইয়া যায়। প্রত্যেক শব্দটির উপর মন বসাইতে না

পারিলে সমস্ত রচনার অর্থের উপরেও অমনোযোগ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে।

গীতগোবিন্দে কথার বড়ো-একটা কিছু অর্থ নাই বলিয়া জয়দেব যে চাতুরী করিয়া যাহাতে পাঠকের মন ভাবের দিকে আকৃষ্ট না হইতে পারে, সেই অভিপ্রায়ে উক্তপ্রকার শ্লোক রচনা করিয়াছেন এমন বোধ হয় না। কিন্তু ফলে তাহাই দাঁড়াইয়াছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমি শুধু জয়দেবের কবিতার দোষ দেখাইয়া আসিয়াছি। তিনি যে উৎকৃষ্ট কবিদিগের সহিত সমশ্রেণীতে আসন গ্রহণ করিতে পারেন না তাহাই দেখানো আমার উদ্দেশ্য। যাঁহার কাব্যের বিষয় প্রেমের তামসিক ভাব, মানবদেহের সৌন্দর্য যাঁহার দৃষ্টিতে ততটা পড়ে না, যিনি মানবদেহকে কেবল ভোগের বিষয় বলিয়াই মনে করেন, প্রকৃতির সৌন্দর্যের সহিত যাঁহার সাক্ষাৎপরিচয় নাই, যিনি বর্ণনা করিতে হইলেই শোনা কথা আওড়ান, যাঁহার ভাষায় কবিত্ব অপেক্ষা চাতুরী অধিক— এক কথায়, যাঁহার কাব্যে স্বাভাবিকতা অপেক্ষা কৃত্রিমতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাঁহাকে আমি উৎকৃষ্ট কবি বলিতে প্রস্তুত নহি। ভরসা করি এ বিষয়ে আপনারাও আমার সহিত একমত। কিন্তু এ-সকল কথা সত্য হইলেও জয়দেবকে যে অনেকে বড়ো কবি বলিয়া মনে করেন সে কথাও তো অস্বীকার করিবার জো নাই। জয়দেব সম্বন্ধে এই সাধারণ মত কি কি কারণ -প্রসূত তাহা আমি কতকটা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছি। নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করিতেছি।

৬

প্রথমত, শৃঙ্গাররসের বর্ণনায় জয়দেব যখন তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা প্রস্ফুটিত করিয়া তুলেন তখন তাঁহার কবিতা বিশেষরূপে স্বাভাবিক হইয়া উঠে— তখন তিনি কোনোরূপ অপ্রাকৃত কিংবা অযথার্থ কথা বলেন না। যে বিষয়ে যাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে তাহার বর্ণনায় সে অবশ্য বিলক্ষণ নিপুণ। সুরতসুখালসজনিত দেহের অবস্থা তিনি কত জাজ্বল্যমান করিয়া আঁকিতে পারেন। মনের ভাবের কথা নাই বলিলেন, রোমাঞ্চ শীৎকার ইত্যাদি একান্ত শারীরিক ভাবসকলের বর্ণনায় তো তিনি কাহারো অপেক্ষা কম নন। আর তাঁহার ভাষায় গাম্ভীর্য ইত্যাদি গুণ নাই বটে কিন্তু তাহা শৃঙ্গাররসের বর্ণনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যুবতীদিগের দেহের ন্যায় তাঁহার শব্দগুলিও কুসুমসুকুমার। যখন রূপসীদিগের কবরী শিথিল হইয়া যাইতেছে, নীবিবন্ধন খসিয়া পড়িতেছে, যখন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বন্ধন শ্লথ হইয়া আসিতেছে তখন আর ভাষার বাঁধুনি কি করিয়া প্রত্যাশা করা যায়? রাধার দেহের ন্যায় গীতগোবিন্দের ভাষা 'নিঃসহনিপতিতা লতা'স্বরূপ। তাই শৃঙ্গাররসবর্ণনকালে তাহার ভাষা ভাবের অনুরূপ। তিনি শৃঙ্গাররসের কবি। কিন্তু যে রসেরই হউন না, কবি তো বটে। এবং কবির যথার্থ রচনা যে জাতিরই হউক, লোকের ভালো লাগিবেই লাগিবে, সুতরাং জয়দেবের কাব্য সাধারণের একেবারেই অনাদরের সামগ্রী নহে।

দ্বিতীয়ত, সাধারণের সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞতা আর-একটি কারণ। সংস্কৃত না জানার দরুন ভাষার লালিত্য হইতে লোকে ধরিয়া নেয় ভাবেরও অবশ্য সৌন্দর্য আছেই আছে।

তৃতীয়ত, রাধাকৃষ্ণের প্রেম জয়দেবের কাব্যের বিষয় বলিয়া সাধারণের নিকট জয়দেবের কাব্য এত উপাদেয়। এ সংসারে ফুল জ্যোৎস্না মলয়পবন কোকিলের কুহুস্বর আমাদের সকলেরই ভালো লাগে, চিরদিন লোকের ভালো লাগিয়াছে এবং চিরদিন ভালো লাগিবে। কিন্তু কতকগুলি জিনিস আছে যাহার যথার্থ একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য না থাকিলেও অভ্যাস ও সংস্কার-বশত আমাদের ভালো লাগে। যমুনার জল, তমালের বন, বৃন্দাবন, মথুরা, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি— এ-সকলের মধুরতা পূর্ণিমারজনী দক্ষিণপবনের ন্যায় আমাদের নিকট পুরাতন হয় না। যিনিই এ-সকলের কথা বলেন, তাঁহার কথাই আমাদের শুনিতে ইচ্ছা যায়। আমরা অনেকেই বৃন্দাবন, যমুনার জল এ-সকল কিছুই দেখি নাই, বাঁশির স্বরও কখনো শুনি নাই— তবে তাহাদের কথা এত প্রাণ স্পর্শ করে কেন? কারণ ঐ এক-একটি কথা হৃদয়ে কত সুন্দর কত মধুর স্মৃতি জাগাইয়া তুলে। আমরা যমুনার জল দেখি নাই বটে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে এত সুন্দর কবিতা পড়িয়াছি যে, যমুনার সমস্ত সৌন্দর্য আমাদের হৃদয়ে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে; তাই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়সম্পর্কীয় সকল বস্তুকেই প্রকৃতির চিরস্থায়ী সুন্দর অংশসকলের মধ্যে ভুক্ত করিয়া ফেলি। সুতরাং জয়দেব যখন সেই যমুনা, সেই বাঁশি, সেই রাধা, সেই কৃষ্ণ ও সেই বৃন্দাবনের কথা বলেন তখন তাহার পরিবর্তে তাঁহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকবিরা আমাদের মনে ঐ-সকলের যে সুন্দর মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহারই দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। আমরা আসল কারণ না বিচার করিয়া মনে করি, জয়দেবের কবিতা পড়িয়াই আমরা মোহিত হইতেছি। তাঁহার পরবর্তী কবিসকলের গুণ আমরা ভুলক্রমে জয়দেবে আরোপ করি। চণ্ডীদাসাদি বৈষ্ণবকবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাব্যের বিষয় না করিলে জয়দেব আমাদের যতটা ভালো লাগে তাহা অপেক্ষা অনেক কম ভালো লাগিত, অন্তত আমার কাছে।

জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭

সনেট কেন চতুর্দশপদী

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন গত মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'সনেট-পঞ্চাশৎ' নামক পুস্তিকার সমালোচনা সূত্রে সনেটের আকৃতি এবং প্রকৃতির বিশেষ পরিচয় দিয়ে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, 'খুব সম্ভব, কলাপ্রবীণ ইতালীয় ও অপরদেশীয় কবিরা পরীক্ষাদ্বারা দেখিয়াছেন যে, পূর্ণরসাভিব্যক্তির পক্ষে চতুর্দশপদই সমীচীন, এবং তাহাই সাহিত্য-সংসারে চলিয়া আসিয়াছে।'

নানা যুগে নানা দেশে নানা কবির হাতে ফিরেও সনেট যে নিজের আকৃতি ও রূপ বজায় রাখতে পেরেছে, তার থেকে এই মাত্র প্রমাণ হয় যে, সনেটের ছাঁচে নানারূপ ভাবের মূর্তি ঢালাই করা চলে এবং সে ছাঁচ এতই টেঁকসই যে বড়ো বড়ো কবিদেরও ভাবের জোরে সেটি ভেঙেচুরে যায় নি। কিন্তু সনেট যে কেন চতুর্দশ পদ গ্রহণ করে জন্মলাভ করলে, সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। অথচ অস্বীকার করা যায় না যে, বারো কিংবা ষোলো না হয়ে সনেটের পদসংখ্যা যে কেন চৌদ্দ হল তা জানবার ইচ্ছে মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

কি কারণে সনেট চতুর্দশপদী হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমার একটি মত আছে এবং সে মত কেবলমাত্র অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত: তার সপক্ষে কোনোরূপ অকাট্য প্রমাণ দিতে আমি অপারগ। স্বদেশী কিংবা বিদেশী কোনোরূপ ছন্দশাস্ত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, পিঙ্গল কিংবা গোর কোনো আচার্যের পদসেবা আমি কখনো করি নি। সুতরাং আমার আবিষ্কৃত সনেটের 'চতুর্দশীতত্ত্ব' শাস্ত্রীয় কিংবা অশাস্ত্রীয়, তা শুধু বিশেষজ্ঞেরাই বলতে পারবেন।

চৌদ্দ কেন ?— এ প্রশ্ন সনেটের মতো বাংলা পয়ার সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। এর একটির সমস্যার মীমাংসা করতে পারলে অপরটির মীমাংসার পথে আমরা অনেকটা অগ্রসর হতে পারব।

আমার বিশ্বাস, বাংলা পয়ারের প্রতি চরণে অক্ষরের সংখ্যা চতুর্দশ হবার একমাত্র কারণ এই যে, বাংলা ভাষায় প্রচলিত অধিকাংশ শব্দ হয় তিন অক্ষরের নয় চার অক্ষরের। পাঁচ-ছয় অক্ষরের শব্দ প্রায়ই হয় সংস্কৃত নয় বিদেশী। সুতরাং সাত অক্ষরের কমে সকল সময়ে দুটি শব্দের একত্র সমাবেশের সুবিধে হয় না। সেই সাতকে দ্বিগুণ করে নিলেই শ্লোকের প্রতি চরণ যথেষ্ট প্রশস্ত হয়, এবং অধিকাংশ প্রচলিত শব্দই ঐ চৌদ্দ অক্ষরের মধ্যেই খাপ খেয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আমাদের ভাষায় দু অক্ষরের শব্দের সংখ্যাও কিছু কম নয়। কিন্তু সে-সকল শব্দকে চার অক্ষরের শব্দের শামিল ধরে নেওয়া যেতে পারে, যেহেতু দুই স্বভাবতই চারের অন্তর্ভূত।

এই চৌদ্দ অক্ষর থাকবার দরুনই বাংলা ভাষায় কবিতা লেখবার পক্ষে পয়ারই

সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। একটানা লম্বা কিছু লিখতে হলে, অর্থাৎ যাতে অনেক কথা বলতে হবে এমন কোনো রচনা করতে গেলে, বাঙালি কবিদের পয়ারের আশ্রয় অবলম্বন ছাড়া উপায়ান্তর নেই। কৃত্তিবাস থেকে আরম্ভ করে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত বাংলার কাব্যনাটকরচয়িতামাত্রই পূর্বোক্ত কারণে অসংখ্য পয়ার লিখতে বাধ্য হয়েছেন, এবং চিরদিনের জন্য বাঙালির প্রতিভা ঐ পয়ারের চরণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে।

পয়ারে চতুর্দশ অক্ষরের মতো সনেটে চতুর্দশ পদের একত্র সংঘটন, আমার বিশ্বাস, অনেকটা একই কারণে একই রকমের যোগাযোগে সিদ্ধ হয়েছে।

বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, জীবজগৎ এবং কাব্যজগতের ক্রমোন্নতির নিয়ম পরস্পরবিরুদ্ধ। জীব উন্নতির সোপানে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই তার ক্রমিক পদলোপ হয়, কিন্তু কবিতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পদবৃদ্ধি হয়। পদ্য দুটি চরণ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে; দ্বিপদীই হচ্ছে সকল দেশে সকল ভাষার আদি ছন্দ। কলিযুগের ধর্মের মতো, অর্থাৎ বকের মতো, কবিতা একপায়ে দাঁড়াতে পারে না।

এই দ্বিপদী হতেই কাব্যজগতের উন্নতির দ্বিতীয় স্তরে ত্রিপদীর আবির্ভাব হয়, এবং ত্রিপদী কালক্রমে চতুষ্পদীতে পরিণত হয়। কবিতার পদবৃদ্ধির এই শেষ সীমা। কেন?— সে কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা আবশ্যক। আমরা যখন মিল-প্রধান সনেটের গঠনরহস্য উদ্‌ঘাটন করতে বসেছি, তখন মিত্রাক্ষরযুক্ত দ্বিপদী ত্রিপদী ও চতুষ্পদীর আকৃতির আলোচনা করাটাই আমাদের পক্ষে সংগত হবে। অমিত্রাক্ষর কবিতা কামচারী, চরণের সংখ্যাবিশেষের উপর তার কোনো নির্ভর নেই, তাই কোনোরূপ অঙ্কের ভিতর তাকে আবদ্ধ রাখবার জো নেই।

দ্বিপদীর চরণ দুটি পাশাপাশি মিলে যায়। ত্রিপদীর প্রথম দুটি চরণ দ্বিপদীর মতো পাশাপাশি মেলে, তৃতীয় চরণটি অপর-একটি চরণের অভাবে আলগা ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, এবং অপর-একটি ত্রিপদীর সান্নিধ্যলাভ করলে তার তৃতীয় চরণের সঙ্গে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হয়। বাংলা সংস্কৃত ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষার ত্রিপদীর আকৃতি ও প্রকৃতি এইরূপ, কিন্তু ইতালীয় ত্রিপদীর (terza rima) গঠন স্বতন্ত্র।

ইতালীয় ত্রিপদীর প্রথম চরণের সহিত তৃতীয় চরণের মিল হয়, এবং দ্বিতীয় চরণ মিলের জন্য পরবর্তী ত্রিপদীর প্রথম চরণের অপেক্ষা রাখে। ইতালীয় ত্রিপদী তিন চরণেই সম্পূর্ণ। ভাব এবং অর্থ বিষয়ে একটির সহিত অপরটি পৃথক এবং বিচ্ছিন্ন। পূর্বাপরযোগ কেবলমাত্র মিলসূত্রে রক্ষিত হয়। একটি কবিতার ভিতর, তা যতই বড়ো হোক-না কেন, সে যোগের কোথাও বিচ্ছেদ নেই। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত একটি কবিতার অন্তর্ভূত ত্রিপদীগুলি এই মিলনসূত্রে গ্রথিত, এবং ইস্ক্রুর পাকের ন্যায় পরস্পরযুক্ত। নিম্নে রবার্ট ব্রাউনিং রচিত THE STATUE AND THE BUST নামক কবিতা হতে ইতালীয় ত্রিপদীর নমুনাস্বরূপ ছয়টি চরণ উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি। পাঠক দেখতে পাবেন যে, প্রথম ত্রিপদীর মধ্যম চরণটি মিলের জন্য দ্বিতীয় ত্রিপদীর প্রথম চরণের অপেক্ষা রাখে।—

There's a palace in Florence, the world knows well,
And a statue watches it from the square,
And this story of both do our townsmen tell,
Ages ago, a lady there,
At the farthest window facing the East
Asked, 'Who rides by with the royal air?'

অর্থাৎ ত্রিপদীর বিশেষত্ব হচ্ছে, দুটি চরণ পাশাপাশি না মিলে মধ্যস্থ একটি কিংবা দুটি চরণ ডিঙিয়ে মেলে। ত্রিপদীর এই মিলের ক্ষণিক বিচ্ছেদ রক্ষা করে চারটি চরণের মধ্যে দু-জোড়া মিলকে স্থান দেবার ইচ্ছে থেকেই চতুষ্পদীর জন্ম। দুটি দ্বিপদী পাশাপাশি বসিয়ে দিলে চতুষ্পদী হয় না। চতুষ্পদীতে প্রথম চরণ হয় তৃতীয় চরণের সঙ্গে নয় চতুর্থ চরণের সঙ্গে মেলে, আর দ্বিতীয় চরণ হয় তৃতীয় নয় চতুর্থের সঙ্গে মেলে। এক কথায় চতুষ্পদীর আকৃতি দ্বিপদীর এবং প্রকৃতি ত্রিপদীর।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, দ্বিপদী ত্রিপদী ও চতুষ্পদীই পদ্যের মূল উপাদান। বাদবাকি যতপ্রকার পদ্যের আকার দেখতে পাওয়া যায়, সে-সবই দ্বিপদী ত্রিপদী এবং চতুষ্পদীকে হয় ভাঙচুর করে, নয় জোড়াতাড়া দিয়ে গড়া। এ সত্য প্রমাণ করবার জন্য বোধ হয় উদাহরণ দেবার আবশ্যক নেই।

কবিতার পূর্ববর্ণিত ত্রিমূর্তির সমন্বয়ে একমূর্তি গড়বার ইচ্ছে থেকেই সনেটের সৃষ্টি। সেই কারণেই সনেট আকৃতিতে সমগ্রতা একাগ্রতা এবং সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। ত্রিপদীর সঙ্গে চতুষ্পদীর যোগ করলে সপ্ত পদ পাওয়া যায়, এবং সেই সপ্ত পদকে দ্বিগুণিত করে নেওয়াতেই সনেট চতুর্দশ পদ লাভ করেছে। এই চতুর্দশ পদের ভিতর দ্বিপদী ত্রিপদী এবং চতুষ্পদী তিনটিরই স্থান আছে, এবং তিনটিই সমান খাপ খেয়ে যায়।

পেত্রার্কার সনেটের অষ্টক পরস্পর মিলিত এবং একাঙ্গীভূত দুটি যমজ চতুষ্পদীর সমষ্টি; এবং প্রতি চতুষ্পদীর অভ্যন্তরে একটি করে আস্ত দ্বিপদী বিদ্যমান। ষষ্ঠকও ঐরূপ দুটি ত্রিপদীর সমষ্টি। ফরাসি সনেটও ঐ একই নিয়মে গঠিত, উভয়ের ভিতর পার্থক্য শুধু ষষ্ঠকের মিলের বিশিষ্টতায়। ফরাসি ভাষায় ইতালীয় ভাষার ন্যায় পদে পদে ছত্রব্যবধান দিয়ে চরণে চরণে মিলনসাধন করা স্বাভাবিক নয়; সেইজন্য ফরাসি সনেটে ষষ্ঠকের প্রথম দুই চরণ দ্বিপদীর আকার ধারণ করে।

সনেট ত্রিপদী ও চতুষ্পদীর যোগে ও গুণে নিষ্পন্ন হয়েছে বলে চতুর্দশপদী হতে বাধ্য।

ভাদ্র ১৩২০

বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ

নানারূপ গদ্যপদ্য লেখবার এবং ছাপবার যতটা প্রবল ঝোঁক যত বেশি লোকের মধ্যে আজকাল এ দেশে দেখা যায়, তা পূর্বে কখনো দেখা যায় নি। এমন মাস যায় না, যাতে অন্তত একখানি মাসিক পত্রের না আবির্ভাব হয়। এবং সে-সকল মাসিক পত্রে সাহিত্যের সকলরকম মালমসলার কিছু-না-কিছু নমুনা থাকেই থাকে। সুতরাং এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, বঙ্গ সাহিত্যের একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে। এই নবযুগের শিশুসাহিত্য আঁতুড়েই মরবে কিংবা তার একশো বৎসর পরমায়ু হবে, সে কথা বলতে আমি অপারগ। আমার এমন কোনো বিদ্যে নেই, যার জোরে আমি পরের কুষ্ঠি কাটতে পারি। আমরা সমুদ্রপার হতে যে-সকল বিদ্যার আমদানি করেছি, সামুদ্রিক বিদ্যা তার ভিতর পড়ে না। কিন্তু এই নবসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণগুলির বিষয় যদি আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মায়, তা হলে যুগধর্মানুযায়ী সাহিত্যরচনা আমাদের পক্ষে অনেকটা সহজ হয়ে আসবে। পূর্বোক্ত কারণে, নব্য লেখকরা তাঁদের লেখায় যে হাত দেখাচ্ছেন, সেই হাত দেখবার চেষ্টা করাটা একেবারে নিষ্ফল নাও হতে পারে।

প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এই নবসাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করছে। অতীতে অন্য দেশের ন্যায় এ দেশের সাহিত্যজগৎ যখন দু-চারজন লোকের দখলে ছিল, যখন লেখা দূরে থাক্‌ পড়বার অধিকারও সকলের ছিল না, তখন সাহিত্যরাজ্যে রাজা সামন্ত প্রভৃতি বিরাজ করতেন। এবং তাঁরা কাব্য দর্শন ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে, মন্দির অট্টালিকা স্তূপ স্তম্ভ গুহা প্রভৃতি আকারে বহু চিরস্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে আমাদের দ্বারা কোনোরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড করে তোলা অসম্ভব এই জ্ঞানটুকু জন্মালে আমাদের কারো আর সাহিত্যে রাজা হবার লোভ থাকবে না। এবং শব্দের কীর্তিস্তম্ভ গড়বার বৃথা চেষ্টায় আমরা দিন ও শরীর পাত করব না। এর জন্য আমাদের কোনোরূপ দুঃখ করবার আবশ্যক নেই। বস্তুজগতের ন্যায় সাহিত্যজগতেরও প্রাচীন কীর্তিগুলি দূর থেকে দেখতে ভালো, কিন্তু নিত্যব্যবহার্য নয়।

দর্শনের কুতবমিনারে চড়লে আমাদের মাথা ঘোরে, কাব্যের তাজমহলে রাত্রিবাস করা চলে না, কেননা অত সৌন্দর্যের বুকে ঘুমিয়ে পড়া কঠিন। ধর্মের পর্বতগুহার অভ্যন্তরে খাড়া হয়ে দাঁড়ানো যায় না, আর হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ালেই যে কোনো অমূল্য চিন্তামণি আমাদের হাতে ঠেকতে বাধ্য এ বিশ্বাসও আমাদের চলে গেছে। পুরাকালে মানুষে যা-কিছু গড়ে গেছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সমাজ হতে আলগা করা, দু-চারজনকে বহু লোক হতে বিচ্ছিন্ন করা। অপরপক্ষে নবযুগের ধর্ম হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করা, সমগ্র

সমাজকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা; কাউকেও ছাড়া নয়, কাউকেও ছাড়তে দেওয়া নয়। এ পৃথিবীতে বৃহৎ না হলে যে কোনো জিনিস মহৎ হয় না, এরূপ ধারণা আমাদের নেই; সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের কীর্তির তুলনায় নবীন সাহিত্যের কীর্তিগুলি আকারে ছোটো হয়ে আসবে কিন্তু প্রকারে বেড়ে যাবে, আকাশ আক্রমণ না করে মাটির উপর অধিকার বিস্তার করবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কাব্যদর্শনাদি আর গাছের মতো উঁচুর দিকে ঠেলে উঠবে না, ঘাসের মতো চারি দিকে চারিয়ে যাবে। এক কথায়, বহুশক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে স্বল্পশক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকের দিন আসছে। আমাদের মনোজগতে যে নবসূর্য উদয়োন্মুখ, তার সহস্র রশ্মি অবলম্বন করে অন্তত ষষ্টিসহস্র বালখিল্য লেখক এই ভূভারতে অবতীর্ণ হবেন। এরূপ হবার কারণও সুস্পষ্ট। আজকাল আমাদের ভাববার সময় নেই, ভাববার অবসর থাকলেও লেখবার যথেষ্ট সময় নেই, লেখবার অবসর থাকলেও লিখতে শেখবার অবসর নেই; অথচ আমাদের লিখতেই হবে, নচেৎ মাসিক পত্র চলে না। এ যুগের লেখকেরা যেহেতু গ্রন্থকার নন শুধু মাসিক পত্রের পৃষ্ঠপোষক, তখন তাঁদের ঘোড়ায় চড়ে লিখতে না হলেও ঘড়ির উপর লিখতে হয়; কেননা মাসিক পত্রের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, পয়লা বেরনো। কি যে বেরল তাতে বেশি কিছু আসে-যায় না। তা ছাড়া, আমাদের সকলকেই সকল বিষয়ে লিখতে হয়। নীতির জুতোসেলাই থেকে ধর্মের চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সকল ব্যাপারই আমাদের সমান অধিকারভুক্ত। আমাদের নবসাহিত্যে কোনোরূপ 'শ্রমবিভাগ' নেই—তার কারণ, যে ক্ষেত্রে 'শ্রম' নামক মূল পদার্থেরই অভাব, সে স্থলে তার বিভাগ আর কি করে হতে পারে?

তাই আমাদের হাতে জন্মলাভ করে শুধু ছোটোগল্প, খণ্ডকাব্য, সরল বিজ্ঞান ও তরল দর্শন।

দেশকালপাত্রের সমবায়ে সাহিত্য যে ক্ষুদ্রধর্মাবলম্বী হয়ে উঠেছে, তার জন্য আমার কোনো খেদ নেই। একালের রচনা ক্ষুদ্র বলে আমি দুঃখ করি নে, আমার দুঃখ যে তা যথেষ্ট ক্ষুদ্র নয়। একে স্বল্পায়তন, তার উপর লেখাটি যদি ফাঁপা হয় তা হলে সে জিনিসের আদর করা শক্ত। বালা গালাভরা হলেও চলে, কিন্তু আংটি নিরেট হওয়া চাই। লেখকরা এই সত্যটি মনে রাখলে গল্প স্বল্প হয়ে আসবে, শোক শ্লোকরূপ ধারণ করবে, বিজ্ঞান বামনরূপ ধারণ করেও ত্রিলোক অধিকার করে থাকবে, এবং দর্শন নখদর্পণে পরিণত হবে। যাঁরা মানসিক আরামের চর্চা না করে ব্যায়ামের চর্চা করেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, যে সাহিত্যে দম নেই তাতে অন্তত কস (grip) থাকা আবশ্যক।

২

বর্তমান ইউরোপের সম্যক্ পরিচয়ে এই জ্ঞান লাভ করা যায় যে, গণধর্মের প্রধান ঝোঁক হচ্ছে বৈশ্যধর্মের দিকে; এবং সেই ঝোঁকটি না সামলাতে পারলে সাহিত্যের পরিণাম অতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আমাদের এই আত্মাসর্বস্ব দেশে লেখকেরা যে

বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করবেন না, এ কথাও জোর করে বলা চলে না। লক্ষ্মীলাভের আশায় সরস্বতীর কপট সেবা করতে যে অনেকে প্রস্তুত, তার প্রমাণ 'ভ্যালু পেয়েব্‌ল্‌ পোস্ট' নিত্য ঘরে ঘরে দিচ্ছে! আমাদের নবসাহিত্যের যেন-তেন-প্রকারেণ বিকিয়ে যাবার প্রবৃত্তিটি যদি দমন করতে না পারা যায়, তা হলে বঙ্গসরস্বতীকে যে পথে দাঁড়াতে হবে সে বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নেই। কোনো শাস্ত্রই এ কথা বলে না যে, 'বাণিজ্যে বসতে সরস্বতী'। সাহিত্যসমাজে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবার ইচ্ছে থাকলে দারিদ্র্যকে ভয় পেলে সে আশা সফল হবে না। সাহিত্যের বাজার-দর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত বাড়বে সেইসঙ্গে তার মূল্য সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের লোপ পেয়ে আসবে। সুতরাং আমাদের নবসাহিত্যে লোভ নামক রিপুর অস্তিত্বের লক্ষণ আছে কি না সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক, কেননা শাস্ত্রে বলে লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।

৩

এ যুগের মাসিক পত্র -সকল যে সচিত্র হয়ে উঠেছে, সেটি যেমন আনন্দের কথা তেমনি আশঙ্কারও কথা। ছবির প্রতি গণসমাজের যে একটি নাড়ির টান আছে, তার প্রচলিত প্রমাণ হচ্ছে মার্কিন সিগারেট। ঐ চিত্রের সাহচর্যেই যত অচল সিগারেট বাজারে চলে যাচ্ছে। এবং আমরা চিত্রমুগ্ধ হয়ে মহানন্দে তাম্রকূটজ্ঞানে খড়ের ধূম পান করছি। ছবি ফাউ দিয়ে মেকি মাল বাজারে কাটিয়ে দেওয়াটা আধুনিক ব্যাবসার একটা প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দেশে শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলীতেই চিত্রের প্রথম আবির্ভাব। পুস্তিকায় এবং পত্রিকায় ছেলেভুলোনো ছবির বহুল প্রচারে চিত্রকলার যে কোনো উন্নতি হবে, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে— কেননা সমাজে গোলাম-পাশ করে দেওয়াতেই বণিক্-বুদ্ধির সার্থকতা; কিন্তু সাহিত্যের যে অবনতি হবে, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। নর্তকীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সারঙ্গীর মতো, চিত্রকলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কাব্যকলার অনুধাবন করাতে তার পদমর্যাদা বাড়ে না। একজন যা করে অপরে তার দোষগুণ বিচার করে, এই হচ্ছে সংসারের নিয়ম। সুতরাং ছবির পাশাপাশি তার সমালোচনাও সাহিত্যে দেখা দিতে বাধ্য। এই কারণেই, যেদিন থেকে বাংলাদেশে চিত্রকলা আবার নবকলেবর ধারণ করেছে তার পরদিন থেকেই তার অনুকূল এবং প্রতিকূল সমালোচনা শুরু হয়েছে। এবং এই মতদ্বৈধ থেকে সাহিত্যসমাজে একটি দলাদলির সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়েছে। এই তর্কযুদ্ধে আমার কোনো পক্ষ অবলম্বন করবার সাহস নেই। আমার বিশ্বাস, এ দেশে এ কালের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে চিত্রবিদ্যায় বৈদগ্ধ্য এবং আলেখ্যব্যাখ্যানে নিপুণতা অতিশয় বিরল। কারণ এ যুগের বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের প্রবেশ নিষেধ। তবে বঙ্গদেশের নব্যচিত্র সম্বন্ধে সচরাচর যে-সকল আপত্তি উত্থাপন করা হয়ে থাকে, সেগুলি সংগত কি অসংগত তা বিচার করবার অধিকার সকলেরই আছে, কেননা সে-সকল আপত্তি কলাজ্ঞান নয়, সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদূর আমি জানি, নব্য চিত্রকরদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ

এই যে, তাঁদের রচনায় বর্ণে বর্ণে বানান-ভুল এবং রেখায় রেখায় ব্যাকরণ-ভুল দৃষ্ট হয়। এ কথা সত্য কি মিথ্যা শুধু তাঁরাই বলতে পারেন, যাঁদের চিত্রকর্মের ভাষার উপর সম্পূর্ণ অধিকার জন্মেছে ; কিন্তু সে ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে দেখতে পাওয়া যায় না, যদিচ ও-সকল স্থানে সমালোচকের দর্শন পাওয়া দুর্লভ নয়। আসল কথা হচ্ছে, ঐ শ্রেণীর চিত্রসমালোচকেরা অনুকরণ অর্থে ব্যাকরণ শব্দ ব্যবহার করেন। এ'দের মতে ইউরোপীয চিত্রকরেরা প্রকৃতির অনুকরণ করেন, সুতরাং সেই অনুকরণেব অনুকরণ করাটাই এ দেশের চিত্রশিল্পীদের কর্তব্য। প্রকৃতি নামক বিরাট পদার্থ এবং তার অংশভূত ইউরোপ নামক ভূভাগ, এ উভয়ের প্রতি আমার যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা আছে, কিন্তু তাই বলে তার অনুকরণ করাটাই যে পরমপুরুষার্থ, এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারি নে। প্রকৃতির বিকৃতি ঘটানো কিংবা তার প্রতিকৃতি গড়া কলাবিদ্যাব কার্য নয়— কিন্তু তাকে আকৃতি দেওযাটাই হচ্ছে আর্টের ধর্ম। পুরুষের মন প্রকৃতি-নর্তকীর মুখ দেখবার আয়না নয়! আর্টের ক্রিয়া অনুকরণ নয়, সৃষ্টি। সুতরাং বাহ্যবস্তুর মাপজোখের সঙ্গে আমাদের মানস-জাত বস্তুব মাপজোখ যে হুবাহুব মিলে যেতেই হবে, এমন কোনো নিয়মে আর্টকে আবদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে প্রতিভার চরণে শিকলি পরানো। আর্টে অবশ্য যথেচ্ছাচারিতার কোনো অবসর নেই। শিল্পীরা কলাবিদ্যার অনন্যসামান্য কঠিন বিধিনিষেধ মানতে বাধ্য, কিন্তু জ্যামিতি কিংবা গণিতশাস্ত্রের শাসন নয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে আমার পূর্বোক্ত মতের যাথার্থ্যের প্রমাণ অতি সহজেই দেওয়া যেতে পারে। একে একে যে দুই হয় এবং একের পিঠে এক দিলে যে এগারো হয, বৈজ্ঞানিক হিসেবে এর চাইতে খাঁটি সত্য পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। অথচ একে একে দুই না হয়েও এবং একের পিঠে একে এগাবো না হয়েও ঐরূপ যোগাযোগে যে বিচিত্র নকশা হতে পাবে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নীচে দেওযা যাচ্ছে—
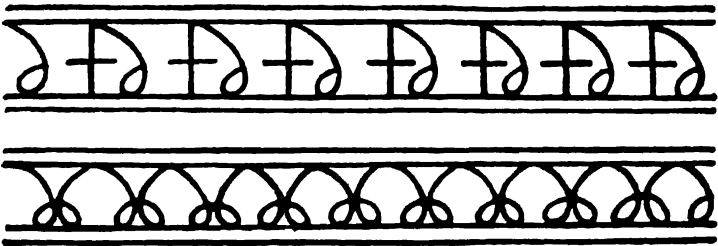
সম্ভবত আমার প্রদর্শিত যুক্তির বিরুদ্ধে কেউ এ কথা বলতে পারেন যে, 'চিত্রে আমরা গণিতশাস্ত্রের সত্য চাই নে, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সত্য দেখতে চাই।' প্রত্যক্ষ সত্য নিয়ে মানুষে মানুষে মতভেদ এবং কলহ যে আবহমান কাল চলে আসছে তার কারণ অন্ধের হস্তীদর্শন ন্যায়ে নির্ণীত হয়েছে। প্রকৃতির যে অংশ এবং যে ভাবটির সঙ্গে যার চোখের এবং মনের যতটুকু সম্পর্ক আছে, তিনি সেই-

টুকুকেই সমগ্র সত্য বলে ভুল করেন। সত্যভ্রষ্ট হলে বিজ্ঞানও হয় না আর্টও হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানের সত্য এক, আর্টের সত্য অপর। কোনো সুন্দরীর দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং ওজনও যেমন এক হিসাবে সত্য, তার সৌন্দর্যও তেমনি আর-এক হিসাবে সত্য। কিন্তু সৌন্দর্য নামক সত্যটি তেমন ধরাছোঁয়ার মতো পদার্থ নয় বলে সে সম্বন্ধে কোনোরূপ অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া যায় না। এই সত্যটি আমরা মনে রাখলে নব্য শিল্পীর কৃশাঙ্গী মানসীকন্যাদের ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেবার জন্য অত ব্যগ্র হতুম না এবং চিত্রের ঘোড়া ঠিক ঘোড়ার মতো নয়, এ আপত্তিও উত্থাপন করতুম না। এ কথা বলার অর্থ—তার অস্থিসংস্থান, পেশীর বন্ধন প্রভৃতি প্রকৃত ঘোড়ার অনুরূপ নয়। অ্যানাটমি অর্থাৎ অস্থিবিদ্যার সাহায্যে দেখানো যেতে পারে যে, চিত্রের ঘোটক গঠনে ঠিক আমাদের শকটবাহী ঘোটকের সহোদর নয় এবং উভয়কে একত্রে জুড়তে জোতা যায় না। এ সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, অস্থিবিদ্যা কঙ্কালের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপব নয়। কঙ্কালের সঙ্গে সাধারণ লোকের চাক্ষুষ পরিচয় নেই ; কারণ দেহতাত্ত্বিকের জ্ঞান-নেত্রে যাই হোক, আমাদের চোখে প্রাণীজগৎ কঙ্কালসার নয়। সুতরাং দৃষ্টজগৎকে অদৃষ্টের কষ্টিপাথরে কষে নেওয়াতে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু রূপজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না। দ্বিতীয় কথা এই যে, কি মানুষ কি পশু, জীবমাত্রেরই দেহযন্ত্রগঠনের একমাত্র কারণ হচ্ছে উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে কতকগুলি ক্রিয়া সম্পাদন করা। গঠন যে ক্রিয়াসাপেক্ষ, এই হচ্ছে দেহবিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব। ঘোড়ার দেহের বিশেষ গঠনের কারণ হচ্ছে, ঘোড়া তুরঙ্গম। যে ঘোড়া দৌড়বে না তার অ্যানাটমি ঠিক জীবন্ত ঘোড়ার মতো হবার কোনো বৈধ কারণ নেই। পটস্থ ঘোড়া যে তটস্থ, এ বিষয়ে বোধ হয় কোনো মতভেদ নেই। চিত্রার্পিত অশ্বের অ্যানাটমি ঠিক চড়বার কিংবা হাঁকাবার ঘোড়ার অনুরূপ করাতেই বস্তুজ্ঞানের অভাবের পরিচয় দেওয়া হয়। চলৎশক্তিরহিত অশ্ব, অর্থাৎ যাকে চাবুক মারলে ছিঁড়বে কিন্তু নড়বে না এহেন ঘোটক, অর্থহীন অনুকরণের প্রসাদেই জীবন্ত ঘোটকের অবিকল আকার ধারণ করে চিত্রকর্মে জন্মলাভ করে। এই পঞ্চভূতাত্মক পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরে একটি মানসপ্রসূত দৃশ্যজগৎ সৃষ্টি করাই চিত্রকলার উদ্দেশ্য, সুতরাং এ উভয়ের রচনার নিয়মের বৈচিত্র্য থাকা অবশ্যম্ভাবী। তথাকথিত নব্যচিত্র যে নির্দোষ কিংবা নির্ভুল, এমন কথা আমি বলি না। যে বিদ্যা কাল জন্মগ্রহণ করেছে, আজ যে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল সম্পূর্ণ আত্মবশে আসবে, এরূপ আশা করাও বৃথা। শিল্প হিসাবে তার নানা ত্রুটি থাকা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কোথায় কলার নিয়মের ব্যভিচার ঘটছে, সমালোচকদের তাই দেখিয়ে দেওয়া কর্তব্য। অস্থি নয় বর্ণের সংস্থানে, পেশী নয় রেখার বন্ধনে, যেখানে অসংগতি এবং শিথিলতা দেখা যায়, সেই স্থলেই সমালোচনার সার্থকতা আছে। অব্যবসায়ীর অযথা নিন্দায় চিত্রশিল্পীদের মনে শুধু বিদ্রোহীভাবের উদ্রেক করে, এবং ফলে তাঁরা নিজেদের দোষগুলিকেই গুণভ্রমে বুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চান।

আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সাহিত্য, চিত্র নয়। যেহেতু এ যুগের সাহিত্য চিত্রসনাথ হয়ে উঠেছে, সেই কারণেই চিত্রকলার বিষয় উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছি।

আমার ও প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার অপর একটি কারণ হচ্ছে এইটি দেখিয়ে দেওয়া যে, যা চিত্রকলায় দোষ বলে গণ্য তাই আবার আজকাল এ দেশে কাব্যকলায় গুণ বলে মান্য।

প্রকৃতির সহিত লেখকদের যদি কোনোরূপ পরিচয় থাকত তা হলে শুধু বর্ণের সঙ্গে বর্ণের যোজনা করলেই যে বর্ণনা হয়, এ বিশ্বাস তাঁদের মনে জন্মাত না। এবং যে বস্তু, কখনো তাঁদের চর্মচক্ষুর পথে উদয় হয় নি, তা অপরের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে খাড়া করে দেবার চেষ্টারূপ পণ্ডশ্রম তাঁরা করতেন না। সম্ভবত এ যুগের লেখকদের বিশ্বাস যে, ছবির বিষয় হচ্ছে দৃশ্যবস্তু আর লেখার বিষয় হচ্ছে অদৃশ্যমন। সুতরাং বাস্তবিকতা চিত্রকলায় অর্জনীয় এবং কাব্যকলায় বর্জনীয়। সাহিত্যে সেহাইকলমের কাজ করতে গিয়ে যাঁরা শুধু কলমের কালি ঝাড়েন, তাঁরাই কেবল নিজের মনকে প্রবোধ দেবার জন্য পূর্বোক্ত মিথ্যাটিকে সত্য বলে গ্রাহ্য করেন। ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হচ্ছে সকল জ্ঞানের মূল।. বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক নয়। দূরদৃষ্টি লাভ করার অর্থ চোখে চালশে-ধরা নয়। দেহের নবদ্বার বন্ধ করে দিলে মনের ঘর অলৌকিক আলোকে কিংবা পারলৌকিক অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে উঠবে, বলা কঠিন। কিন্তু সর্বলোকবিদিত সহজ সত্য এই যে, যাঁর ইন্দ্রিয় সচেতন এবং সজাগ নয় কাব্যে কৃতিত্ব লাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। জ্ঞানাঞ্জনশলাকার অপপ্রয়োগে যাঁদের চক্ষু উন্মীলিত না হয়ে কানা হয়েছে, তাঁরাই কেবল এ সত্য মানতে নারাজ হবেন। প্রকৃতিদত্ত উপাদান নিয়েই মন বাক্যচিত্র রচনা করে। সেই উপাদান সংগ্রহ করবার, বাছাই করবার এবং ভাষায় সাকার করে তোলবার ক্ষমতার নামই কবিত্বশক্তি। বস্তুজ্ঞানের অটল ভিত্তির উপরেই কবি-কল্পনা প্রতিষ্ঠিত। মহাকবি ভাস বলেছেন যে, 'সুনিবিষ্ট লোকের রূপ বিপর্যয়' করা অন্ধকারের ধর্ম। সাহিত্যে ওরূপ করাতে প্রতিভার পরিচয় দেওয়া হয় না, কারণ প্রতিভার ধর্ম হচ্ছে প্রকাশ করা, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করা— প্রত্যক্ষকে অপ্রত্যক্ষ করা নয়। অলংকারশাস্ত্রে বলে অপ্রকৃত অতিপ্রকৃত এবং লৌকিক জ্ঞানবিরুদ্ধ বর্ণনা কাব্যে দোষ হিসেবে গণ্য। অবশ্য পৃথিবীতে যা সত্যই ঘটে থাকে তার যথাযথ বর্ণনাও সব সময়ে কাব্য নয়। আলংকারিকেরা উদাহরণস্বরূপ দেখান যে, 'গৌঃ তৃণম্ অত্তি' কথাটা সত্য হলেও ও কথা বলায় কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় না। তাই বলে 'গোরুরা ফুলে ফুলে মধুপান করছে' এরূপ কথা বলাতে কি বস্তুজ্ঞান কি রসজ্ঞান কোনোরূপ জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না। এ স্থলে বলে রাখা আবশ্যক যে, নিজেদের সকলপ্রকার ত্রুটির জন্য আমাদের পূর্বপুরুষদের দায়ী করা বর্তমান ভারতবাসীদের একটা রোগের মধ্যে হয়ে পড়েছে। আমাদের বিশ্বাস, এ বিশ্ব নশ্বর এবং মায়াময় বলে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা বাহ্যজগতের কোনোরূপ খোঁজখবর রাখতেন না। কিন্তু এ কথা জোর করে বলা যেতে পারে যে, তাঁরা কস্মিন্‌কালেও অবিদ্যাকে পরাবিদ্যা বলে ভুল করেন নি, কিংবা একলম্ফে যে মনের পূর্বোক্ত প্রথম অবস্থা হতে দ্বিতীয় অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এরূপ মতও প্রকাশ করেন নি। বরং শাস্ত্র এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, অপরাবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হলে কারো পক্ষে পরাবিদ্যা লাভের অধিকার

জন্মায় না, কেননা বিরাটের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই স্বরাটের জ্ঞান অঙ্কুরিত হয়। আসল কথা হচ্ছে, মানসিক আলস্যবশতই আমরা সাহিত্যে সত্যের ছাপ দিতে অসমর্থ। আমরা যে কথায় ছবি আঁকতে পারি নে, তার একমাত্র কারণ, আমাদের চোখ ফোটবার আগে মুখ ফোটে।

এক দিকে আমরা বাহ্যবস্তুর প্রতি যেমন বিরক্ত, অপর দিকে অহং-এর প্রতি ঠিক তেমনি অনুরক্ত। আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের মনে যে-সকল চিন্তা ও ভাবের উদয় হয় তা এতই অপূর্ব এবং মহার্ঘ যে, স্বজাতিকে তার ভাগ না দিলে ভারতবর্ষের আর দৈন্য ঘুচবে না। তাই আমরা অহর্নিশি কাব্যে ভাবপ্রকাশ করতে প্রস্তুত। ঐ ভাবপ্রকাশের অদম্য প্রবৃত্তিটিই আমাদের সাহিত্যে সকল অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনোভাবের মূল্য আমার কাছে যতই বেশি হোক-না, অপরের কাছে তার যা-কিছু মূল্য, সে তার প্রকাশের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি ভাষায় পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না। এই ধারণাটি যদি আমাদের মনে স্থান পেত তা হলে আমরা সিকি পয়সার ভাবে আত্মহারা হয়ে কলার অমূল্য আত্ম-সংযম হতে ভ্রষ্ট হতুম না। মানুষমাত্রেরই মনে দিবারাত্র নানারূপ ভাবের উদয় এবং বিলয় হয়। এই অস্থির ভাবকে ভাষায় স্থির করবার নামই হচ্ছে রচনাশক্তি। কাব্যের উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা নয়, ভাব উদ্রেক করা। কবি যদি নিজেকে বীণা হিসেবে না দেখে বাদক হিসেবে দেখেন, তা হলে পরের মনের উপর আধিপত্য লাভ করবার সম্ভাবনা তাঁর অনেক বেড়ে যায়। এবং যে মুহূর্ত থেকে কবিরা নিজেদের পরের মনোবীণার বাদক হিসেবে দেখতে শিখবেন, সেই মুহূর্ত থেকে তাঁরা বস্তুজ্ঞানের এবং কলার নিয়মের একান্ত শাসনাধীন হবার সার্থকতা বুঝতে পারবেন। তখন আর নিজের ভাববস্তুকে এমন দিব্যরত্ন মনে করবেন না যে, সেটিকে আকার দেবার পরিশ্রম থেকে বিমুখ হবেন। অবলীলাক্রমে রচনা করা আর অবহেলাক্রমে রচনা করা যে এক জিনিস নয়, এ কথা গণধর্মাবলম্বীরা সহজে মানতে চান না— এই কারণেই এত কথা বলা। আমার শেষ বক্তব্য এই যে, ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেও যে মহত্ত্ব আছে, আমাদের নিত্যপরিচিত লৌকিক পদার্থের ভিতরেও যে অলৌকিকতা প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তার উদ্ধারসাধন করতে হলে, অব্যক্তকে ব্যক্ত করতে হলে, সাধনার আবশ্যক; এবং সে সাধনার প্রক্রিয়া হচ্ছে দেহমনকে বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্জগতের নিয়মাধীন করা। যাঁর চোখ নেই, তিনিই কেবল সৌন্দর্যের দর্শন-লাভের জন্য শিবনেত্র হন; এবং যাঁর মন নেই, তিনিই মনস্বিতালাভের জন্য অন্যমনস্কতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। নব্য লেখকদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন দেশী বিলাতি কোনোরূপ বুলির বশবর্তী না হয়ে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় লাভ করবার জন্য ব্রতী হন। তাতে পরের না হোক, অন্তত নিজের উপকার করা হবে।

আশ্বিন ১৩২০

সবুজ পত্রের মুখপত্র

ওঁ প্রাণায় স্বাহা

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাঙালি জাতিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'একটা নতুন কিছু করো।' সেই পরামর্শ অনুসারেই যে আমরা একখানি নতুন মাসিক পত্র প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছি, এ কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হবে না। এ পৃথিবীটি যথেষ্ট পুরোনো, সুতরাং তাকে নিয়ে নতুন কিছু করা বড়োই কঠিন, বিশেষত এ দেশে। যদি বহু চেষ্টায় নতুন কিছু করে তোলা যায়, তা হয় জলবায়ুর গুণে দুদিনেই পুরোনো হয়ে যায়, নয় তো পুরাতন এসে তাকে গ্রাস করে ফেলে। এই-সব দেখেশুনে এ দেশে কথায় কিংবা কাজে নতুন কিছু করবার জন্য যে পরিমাণ ভরসা ও সাহস চাই তা যে আমাদের আছে তা বলতে পারি নে।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, তবে কি উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য, কি অভাব পূরণ করবার জন্য, এত কাগজ থাকতে আবার একটি নতুন কাগজ বার করছি— তা হলেও আমাদের নিরুত্তর থাকতে হবে ; কেননা কথা দিয়ে কথা না রাখতে পারাটা সাহিত্যসমাজেও ভদ্রতার পরিচায়ক নয়। নিজেকে প্রকাশ করবার পূর্বে নিজের পরিচয় দেওয়াটা— শুধু পরিচয় দেওয়া নয়, নিজের গুণগ্রাম বর্ণনা করাটা— যদিও মাসিক পত্রের পক্ষে একটা সর্বলোকমান্য 'সাহিত্যিক' নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবুও সে নিয়ম ভঙ্গ করতে আমরা বাধ্য। যে কথা বারো মাসে বারো কিস্তিতে রাখতে হবে, তার যে মাঝে মাঝে খেলাপ হবার সম্ভাবনা নেই— এ জাঁক করবার মতো দুঃসাহস আমাদের নেই। তা ছাড়া স্বদেশের কিংবা স্বজাতির কোনো-একটি অভাব পূরণ করা, কোনো-একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করা সাহিত্যের কাজও নয়, ধর্মও নয় ; সে হচ্ছে কার্যক্ষেত্রের কথা। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করাতে মনের ভিতর যে সংকীর্ণতা এসে পড়ে, সাহিত্যের স্ফূর্তির পক্ষে তা অনুকূল নয়। কাজ হচ্ছে দশে মিলে করবার জিনিস। দলবদ্ধ হয়ে আমরা সাহিত্য গড়তে পারি নে, গড়তে পারি শুধু সাহিত্যসম্মিলন। কারণ দশের সাহায্যে ও সাহচর্যে কোনো কাজ উদ্ধার করতে হলে নিজের স্বাতন্ত্র্যটি অনেকটা চেপে দিতে হয়। যদি আমাদের দশজনের মধ্যে মনের চৌদ্দ-আনা মিল থাকে, তা হলে প্রতিজনে বাকি দু-আনা বাদ দিয়ে, একত্র হয়ে সকলের পক্ষে সমান বাঞ্ছিত কোনো ফললাভের জন্য চেষ্টা করতে পারি। এক দেশের এক যুগের এক সমাজের বহু লোকের ভিতর মনের এই চৌদ্দ-আনা মিল থাকলেই সামাজিক কার্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়, নচেৎ নয়। কিন্তু সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ। সুতরাং সাহিত্যের পক্ষে মনের ঐ পড়ে-পাওয়া-চৌদ্দ-আনার চাইতে ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব দু-আনার মূল্য

ঢের বেশি। কেননা ঐ দু-আনা হতেই তার সৃষ্টি এবং স্থিতি, বাকি চৌদ্দ-আনায় তার লয়। যার সমাজের সঙ্গে ষোলো-আনা মনের মিল আছে, তার কিছু বক্তব্য নেই। মন পদার্থটি মিলনের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, আর বিরোধের স্পর্শে জেগে ওঠে। এবং মনের এই জাগ্রত ভাব থেকেই সকল কাব্য সকল দর্শন সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি।

এ কথা শুনে অনেকে হয়তো বলবেন যে, যে দেশে এত দিকে এত অভাব সে দেশে যে লেখা তার একটি অভাবও পূরণ না করতে পারে, সে লেখা সাহিত্য নয়— শখ ; ও তো কল্পনার আকাশে রঙিন কাগজের ঘুড়ি ওড়ানো, এবং সে ঘুড়ি যত শীঘ্র কাটা পড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ততই ভালো। অবশ্য ঘুড়ি ওড়াবারও একটা সার্থকতা আছে। ঘুড়ি মানুষকে অন্তত উপরের দিকে চেয়ে দেখতে শেখায়। তবুও এ কথা সত্য যে, মানবজীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা সাহিত্য নয়, তা শুধু বাক্-ছল। জীবন অবলম্বন করেই সাহিত্য জন্ম ও পুষ্টি লাভ করে, কিন্তু সে জীবন মানুষের দৈনিক জীবন নয়। সাহিত্য হাতে-হাতে মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দিতে পারে না। কোনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কিন্তু কোনো-কোনো কথায় মন ভেজে ; এবং সেই জাতির কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য। শব্দের শক্তি অপরিসীম। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে মশার গুন্‌গুনানি মানুষকে ঘুম পাড়ায়— অবশ্য যদি মশারির ভিতর শোওয়া যায় ; আর দিনের আলোর সঙ্গে কাক-কোকিলের ডাক মানুষকে জাগিয়ে তোলে। প্রাণ পদার্থটির গূঢ় তত্ত্ব আমরা না জানলেও তার প্রধান লক্ষণটি এতই ব্যক্ত এবং এতই স্পষ্ট যে তা সকলেই জানেন। সে হচ্ছে তার জাগ্রত ভাব। অপর দিকে নিদ্রা হচ্ছে মৃত্যুর সহোদরা। কথায় হয় আমাদের জাগিয়ে তোলে, নয় ঘুম পাড়িয়ে দেয়— তাই আমরা কথায় মরি কথায় বাঁচি। মন্ত্র সাপকে মুগ্ধ করতে পারে কি না জানি নে, কিন্তু মানুষকে যে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গোটা ভারতবর্ষ। সংস্কৃত শব্দ যে সংস্কারকে বাধা দিতে পারে তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্য। মানুষমাত্রেরই মন কতক সুপ্ত আর কতক জাগ্রত। আমাদের মনের যে অংশটুকু জেগে আছে সেই অংশটুকুকেই আমরা সমগ্র মন বলে ভুল করি— নিদ্রিত অংশটুকুর অস্তিত্ব আমরা মানি নে, কেননা জানি নে। সাহিত্য মানবজীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয় নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখিরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজ পত্র-মণ্ডিত সাহিত্যের নবশাখার উপর এসে অবতীর্ণ হন তা হলে আমরা বাঙালি জাতির সবচেয়ে যে বড়ো অভাব, তা কতকটা দূর করতে পারব। সে অভাব হচ্ছে আমাদের মনের ও চরিত্রের অভাব যে কতটা, তারই জ্ঞান। আমরা যে আমাদের সে অভাব সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারি নি তার প্রমাণ এই যে, আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য বলে, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা বলে, আলস্যকে ঔদাস্য বলে, শ্মশানবৈরাগ্যকে ভূমানন্দ বলে, উপবাসকে উৎসব বলে, নিষ্কর্মাকে নিষ্ক্রিয় বলে প্রমাণ করতে চাই। এর কারণও স্পষ্ট। ছল দুর্বলের বল। যে দুর্বল সে অপরকে প্রতারিত করে আত্মরক্ষার জন্য, আর নিজেকে প্রতারিত করে আত্মপ্রসাদের

জন্য। আত্মপ্রবঞ্চনার মতো আত্মঘাতী জিনিস আর নেই। সাহিত্য জাতির খোরপোশের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না, কিন্তু তাকে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে।

আমরা যে দেশের মনকে ঈষৎ জাগিয়ে তুলতে পারব, এত বড়ো স্পর্ধার কথা আমি বলতে পারি নে, কেননা যে সাহিত্যের দ্বারা তা সিদ্ধ হয়, সে সাহিত্য গড়বার জন্য নিজের সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয়— তার মূলে ভগবানের ইচ্ছা থাকা চাই অর্থাৎ নৈসর্গিকী প্রতিভা থাকা চাই। অথচ ও-ঐশ্বর্য ভিক্ষা করে পাবার জিনিস নয়। তবে বাংলার মন যাতে আর বেশি ঘুমিয়ে না পড়ে, তার চেষ্টা আমাদের আয়ত্তাধীন। মানুষকে ঝাঁকিয়ে দেবার ক্ষমতা অল্পবিস্তর সকলের হাতেই আছে, সে ক্ষমতার প্রয়োগটি কেবল আমাদের প্রবৃত্তিসাপেক্ষ। এবং আমাদের প্রবৃত্তির সহজ গতিটি যে ঐ নিজেকে এবং অপরকে সজাগ করে তোলবার দিকে, তাও অস্বীকার করবার জো নেই ; কারণ ইউরোপ আমাদের মনকে নিত্য যে ঝাঁকুনি দিচ্ছে, তাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। ইউরোপের সাহিত্য ইউরোপের দর্শন মনের গায়ে হাত বুলোয় না, কিন্তু ধাক্কা মারে। ইউরোপের সভ্যতা অমৃতই হোক মদিরাই হোক আর হলাহলই হোক, তার ধর্মই হচ্ছে মনকে উত্তেজিত করা, স্থির থাকতে দেওয়া নয়। এই ইংরেজি শিক্ষার প্রসাদে, এই ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে, আমরা দেশসুদ্ধ লোক যে দিকে হোক কোনো-একটা দিকে চলবার জন্য এবং অন্যকে চালাবার জন্য আঁকুবাঁকু করছি। কেউ পশ্চিমের দিকে এগোতে চান কেউ পূর্বের দিকে পিছু হটতে চান, কেউ আকাশের উপরে দেবতার আত্মার অনুসন্ধান করছেন কেউ মাটির নীচে দেবতার মূর্তির অনুসন্ধান করছেন। এক কথায়, আমরা উন্নতিশীলই হই আর অবনতিশীলই হই— আমরা সকলেই গতিশীল, কেউ স্থিতিশীল নই। ইউরোপের স্পর্শে আমরা, আর-কিছু না হোক, গতি লাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যাবহারিক সকলপ্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করেছি। এই মুক্তির ভিতর যে আনন্দ আছে সেই আনন্দ হতেই আমাদের নবসাহিত্যের সৃষ্টি। সুন্দরের আগমনে হীরা মালিনীর ভাঙা মালঞ্চে যেমন ফুল ফুটে উঠেছিল, ইউরোপের আগমনে আমাদের দেশে তেমনি সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠেছে। তার ফল কি হবে সে কথা না বলতে পারলেও এই ফুলফোটা যে বন্ধ করা উচিত নয়, এই হচ্ছে আমাদের দৃঢ় ধারণা। সুতরাং যিনি পারেন তাঁকেই আমরা ফুলের চাষ করবার জন্য উৎসাহ দেব।

ইউরোপের কাছে আমরা একটি অপূর্ব জ্ঞান লাভ করেছি। সে হচ্ছে এই যে, ভাবের বীজ যে দেশ থেকেই আনো-না কেন, দেশের মাটিতে তার চাষ করতে হবে। চীনের টবে তোলামাটিতে সে বীজ বপন করা পণ্ডশ্রম মাত্র। আমাদের এই নবশিক্ষাই ভারতবর্ষের অতিবিস্তৃত অতীতের মধ্যে আমাদের এই নবভাবের চর্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র চিনে নিতে শিখিয়েছে। ইংরেজি শিক্ষার গুণেই আমরা দেশের লুপ্ত অতীতের পুনরুদ্ধারকল্পে ব্রতী হয়েছি। তাই আমাদের মন একলম্ফে শুধু বঙ্গ-বিহার নয়, সেইসঙ্গে হাজার দেড়েক বৎসর ডিঙিয়ে একেবারে আর্যাবর্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এখন আমাদের পূর্ব কবি হচ্ছে কালিদাস,

কাশীদাস নয় ; দার্শনিক শংকর, গদাধর নয় ; শাস্ত্রকার মনু, রঘুনন্দন নয় ; আলংকারিক দণ্ডী, বিশ্বনাথ নয়। নব্যন্যায় নব্যদর্শন নব্যস্মৃতি আমাদের কাছে এখন অতিপুরাতন। আর যা কালের হিসাবে অতিপুরাতন, তাই আবার বর্তমানে নতুন রূপ ধারণ করে এসেছে। এর কারণ হচ্ছে ইউরোপের নবীন সাহিত্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের আকারগত সাদৃশ্য না থাকলেও অন্তরের মিল আছে। সে হচ্ছে প্রাণের মিল— উভয়ই প্রাণবন্ত। গাছের গোলাপের সঙ্গে কাগজের গোলাপের সাদৃশ্য থাকলেও জীবিত ও মৃতের ভিতর যে পার্থক্য, উভয়ের মধ্যে সেই পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু স্থলের গোলাপ ও জলের পদ্ম উভয়ে একজাতীয়, কেননা উভয়েই জীবন্ত। সুতরাং আমাদের নবজীবনের নবশিক্ষা, দেশের দিক ও বিদেশের দিক দুই দিক থেকেই—আমাদের সহায়। এই নবজীবন যে লেখায় প্রতিফলিত হয় সেই লেখাই কেবল সাহিত্য— বাদবাকি লেখা কাজের নয়, বাজে।

এই সাহিত্যের বহির্ভূত লেখা আমাদের কাগজ থেকে বহির্ভূত করবার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করেছি বলে আমরা এই নতুন পত্র প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছি। একটা নতুন কিছু করবার জন্য নয়, বাঙালির জীবনে যে নূতনত্ব এসে পড়েছে তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ করবার জন্য।

এই নূতন জীবনে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা সাহিত্য যে কেন পুষ্পিত না হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠছে, তার কারণ নির্ণয় করাও কঠিন নয়। কিঞ্চিৎ বাহ্যদৃষ্টি এবং কিঞ্চিৎ অন্তর্দৃষ্টি থাকলেই সে কারণের দুই পিঠই সহজে মানুষের চোখে পড়ে।

সাহিত্য এ দেশে অদ্যাবধি ব্যাবসা-বাণিজ্যের অঙ্গ হয়ে ওঠে নি। তার জন্য দোষী লেখক কি পাঠক, বলা কঠিন। ফলে আমরা হচ্ছি সব সাহিত্যসমাজের শখের কবির দল। অব্যবসায়ীর হাতে পৃথিবীর কোনো কাজই যে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে না, এ কথা সর্বলোকস্বীকৃত। লেখা আমাদের অধিকাংশ লেখকের পক্ষে কাজও নয় খেলাও নয়, শুধু অকাজ; কারণ খেলার ভিতর যে স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা আছে, লেখায় তা নেই; অপর দিকে কাজের ভিতর যে যত্ন ও মন আছে, তাও তাতে নেই। আমাদের রচনার মধ্যে অন্যমনস্কতার পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়; কেননা যে অবসর আমাদের নেই সেই অবসরে আমরা সাহিত্যরচনা করি। আমরা অবলীলাক্রমে সাহিত্য গড়তে চাই বলে আমাদের নৈসর্গিকী প্রতিভার উপর নির্ভর করা ব্যতীত উপায়ান্তর নেই। অথচ এ কথা লেখকমাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, যিনি সরস্বতীর প্রতি অনুগ্রহ করে লেখেন, সরস্বতী চাই-কি তাঁর প্রতি অনুগ্রহ নাও করতে পারেন। এই একটি কারণ যার জন্যে বঙ্গ সাহিত্য পুষ্পিত না হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠছে। ফুলের চাষ করতে হয়, জঙ্গল আপনি হয়। অতিকায় মাসিক পত্রগুলি সংখ্যাপূরণের জন্য এই আগাছার অঙ্গীকার করতে বাধ্য, এবং সেই কারণে আগাছার বৃদ্ধির প্রশ্রয় দিতেও বাধ্য। এই-সব দেখেশুনে ভয়ে সংকুচিত হয়ে আমাদের কাগজ ক্ষুদ্র আকার ধারণ করেছে। এই আকারের তারতম্যে প্রকারেরও কিঞ্চিৎ তারতম্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমাদের স্বল্পায়তন পত্রে অনেক লেখা আমরা অগ্রাহ্য করতে বাধ্য হব। স্ত্রীপাঠ্য শিশুপাঠ্য স্কুলপাঠ্য এবং অপাঠ্য

প্রবন্ধসকল অনাহূত কিংবা রবাহূত হয়ে আমাদের শ্বারস্থ হলেও আমরা তাদের স্বস্থানে প্রস্থান করতে বলতে পারব। কারণ আমাদের ঘরে স্থানাভাব। এক কথায়, শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ আমাদের প্রকাশ করতে হবে না। এর লাভ যে কি, তিনিই বুঝতে পারবেন যিনি জানেন যে, যে কথা একশো বার বলা হয়েছে তারই পুনরাবৃত্তি করাই শিক্ষকের ধর্ম ও কর্ম। যে লেখায় লেখকের মনের ছাপ নেই, তা ছাপালে সাহিত্য হয় না।

তার পর, যে জীবনীশক্তির আবির্ভাবের কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, সে শক্তি আমাদের নিজের ভিতর থেকে উদ্‌বুদ্ধ হয় নি; তা হয় দূর দেশ হতে নয় দূর কাল হতে, অর্থাৎ বাইরে থেকে, এসেছে। সে শক্তি এখনো আমাদের সমাজে ও মনে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। সে শক্তিকে নিজের আয়ত্তাধীন করতে না পারলে তার সাহায্যে আমরা সাহিত্যে ফুল কিংবা জীবনে ফল পাব না। এই নূতন প্রাণকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হলে প্রথমে তা মনে প্রতিবিম্বিত করা দরকার। অথচ ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ করতে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাবসকলকে যদি প্রথমে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করে নিতে পারি, তবেই তা পরে সাহিত্যদর্পণে প্রতিফলিত হবে। আমরা আশা করি আমাদের এই স্বল্পপরিসর পত্রিকা মনোভাব সংক্ষিপ্ত ও সংহত করবার পক্ষে লেখকদের সাহায্য করবে। সাহিত্য গড়তে কোনো বাইরের নিয়ম চাই নে, চাই শুধু আত্মসংযম। লেখায় সংযত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সীমার ভিতর আবদ্ধ হওয়া। আমাদের কাগজে আমরা তাই সেই সীমা নির্দিষ্ট করে দেবার চেষ্টা করব।

আমার শেষ কথা এই যে, যে শিক্ষার গুণে দেশে নূতন প্রাণ এসেছে, মনে সাহিত্য গড়বার প্রবৃত্তি জন্মিয়ে দিয়েছে, সেই শিক্ষাব দোষেই সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করবার অনুরূপ ক্ষমতা আমরা পাই নি। আমরা বর্তমান ইউরোপ ও অতীত ভারতবর্ষ, এ উভয়ের দোটানায় পড়ে বাংলা প্রায় ভুলে গেছি। আমরা শিখি ইংরেজি, লিখি বাংলা, মধ্যে থাকে সংস্কৃতের ব্যবধান। ইংরেজি শিক্ষার বীজ অতীত ভারতের ক্ষেত্রে প্রথমে বপন করলেও তার চারা তুলে বাংলার মাটিতে বসাতে হবে, নইলে স্বদেশী সাহিত্যের ফুল ফুটবে না। পশ্চিমের প্রাণবায়ু যে ভাবের বীজ বহন করে আনছে, তা দেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারছে না বলে হয় শুকিয়ে যাচ্ছে, নয় পরগাছা হচ্ছে। এই কারণেই মেঘনাদবধকাব্য পরগাছার ফুল। 'অর্কিড'-এর মতো তার আকারের অপূর্বতা এবং বর্ণের গৌরব থাকলেও তার সৌরভ নেই। খাঁটি স্বদেশী বলে অন্নদামঙ্গল স্বল্পপ্রাণ হলেও কাব্য; এবং কোনো দেশেরই নয় বলে বৃত্রসংহার মহাপ্রাণ হলেও মহাকাব্য নয়। ভারতচন্দ্র ভাষার ও ভাবের একতার গুণে সংযমের গুণে তাঁর মনের কথা ফুলের মতো সাকার করে তুলেছেন, এবং সে ফুলে, যতই ক্ষীণ হোক-না কেন, প্রাণও আছে গন্ধও আছে। দেশের অতীত ও বিদেশের বর্তমান, এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধ নয়, মিলনের উপর আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আশা করি বাংলার

পতিত জমি সেই মিলনক্ষেত্র হবে। সেই পতিত জমি আবাদ করলেই তাতে যে সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠবে, তাই ক্রমে জীবনের ফলে পরিণত হবে। তার জন্য আবশ্যক আর্ট, কারণ প্রাণশক্তি একমাত্র আর্টেরই বাধ্য। আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকা, আশা করি, এ বিষয়ে লেখকদের সহায়তা করবে। বড়োকে ছোটোর ভিতর ধরে রাখাই হচ্ছে আর্টের উদ্দেশ্য। ওস্তাদরা বলে থাকেন যে গৌড়সারঙ্গ রাগিণী ছোটো, কিন্তু গাওয়া মুশকিল; 'ছোটিসে দরওয়াজাকে অন্দর হাতি নিকাল্‌না যৈসা মুশকিল ঐসা মুশকিল, দরিয়াকো পাকড়কে কুঁজামে ডাল্‌না যৈসা মুশকিল ঐসা মুশকিল।' অবস্থা গুণে যতই মুশকিল হোক-না কেন, বাঙালি জাতিকে এই গৌড়সারঙ্গই গাইতে চেষ্টা করতে হবে। আমাদের বাংলাঘরের খিড়কিদরজার ভিতর প্রাচীন ভারতবর্ষের হাতি গলাবার চেষ্টা করতে হবে, আমাদের গৌড়ভাষার মৃৎকুম্ভের মধ্যে সাত সমুদ্রকে পাত্রস্থ করতে চেষ্টা করতে হবে। এ সাধনা অবশ্য কঠিন, কিন্তু স্বজাতির মুক্তির জন্য অপর কোনো সহজ সাধনপদ্ধতি আমাদের জানা নেই।

বৈশাখ ১৩২১

সবুজ পত্র

বাংলাদেশ যে সবুজ, এ কথা বোধ হয় বাহ্যজ্ঞানশূন্য লোকেও অস্বীকার করবেন না। যার শস্যশ্যামল রূপ বাংলার এত গদ্যেপদ্যে এতটা পল্লবিত হয়ে উঠেছে যে, সে বর্ণনার যাথার্থ্য বিশ্বাস করবার জন্য চোখে দেখবারও আবশ্যক নেই। পুনরুক্তির গুণে এটি সেই শ্রেণীর সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার সম্বন্ধে চক্ষুকর্ণের যে বিবাদ হতে পাবে, এরূপ সন্দেহ আমাদের মনে মুহূর্তের জন্যও স্থান পায় না। এ ক্ষেত্রে সৌভাগ্যবশত নাম ও রূপের বাস্তবিকই কোনো বিরোধ নেই। একবার চোখ তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, তরাই হতে সুন্দরবন পর্যন্ত এক ঢালা সবুজ বর্ণ দেশটিকে আদ্যোপান্ত ছেয়ে রেখেছে! কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, কোথাও তার বিরাম নেই। শুধু তাই নয়, সেই রঙ বাংলার সীমানা অতিক্রম করে উত্তরে হিমালয়ের উপরে ছাপিয়ে উঠেছে ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের ভিতর চারিয়ে গেছে।

সবুজ, বাংলার শুধু দেশজোড়া রঙ নয়, বারোমেসে রঙ। আমাদের দেশে প্রকৃতি বহুরূপী নয়, এবং ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে বেশপরিবর্তন করে না। বসন্তে বিয়ের কনের মতো ফুলের জহরতে আপাদমস্তক সালংকারা হয়ে দেখা দেয় না, বর্ষার জলে শুচিস্নাতা হয়ে শরতে পুজার তসর ধারণ করে আসে না, শীতে বিধবার মতো সাদা শাড়িও পরে না। মাধব হতে মধু পর্যন্ত ঐ সবুজের টানা সুর চলে; ঋতুর প্রভাবে সে সুরের যে রূপান্তর হয়, সে শুধু কড়িকোমলে। আমাদের দেশে অবশ্য বর্ণের বৈচিত্র্যের অভাব নেই। আকাশে ও জলে, ফুলে ও ফলে, আমরা বর্ণগ্রামের সকল সুরেরই খেলা দেখতে পাই। কিন্তু মেঘের রঙ ও ফুলের রঙ ক্ষণস্থায়ী; প্রকৃতির ও-সকল রাগরঙ্গ তার বিভাব ও অনুভাব মাত্র। তার স্থায়ী ভাবের, তার মূল রসের, পরিচয় শুধু সবুজে। পাঁচরঙা ব্যভিচারী ভাব-সকলের সার্থকতা হচ্ছে বঙ্গদেশের এই অখণ্ড-হরিৎ স্থায়ী ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলা।

এরূপ হবার অবশ্য একটা অর্থ আছে। বর্ণমাত্রেই ব্যঞ্জন বর্ণ, অর্থাৎ বর্ণের উদ্দেশ্য শুধু বাহ্যবস্তুকে লক্ষণান্বিত করা নয়, কিন্তু সেই সুযোগে নিজেকেও ব্যক্ত করা। যা স্বপ্রকাশ নয়, তা অপর কিছুই প্রকাশ করতে পারে না। তাই রঙ রূপও বটে রূপকও বটে। যতক্ষণ আমাদের বিভিন্ন বর্ণের বিশেষ ব্যক্তিত্বের জ্ঞান না জন্মায় ততক্ষণ আমাদের প্রকৃতির বর্ণপরিচয় হয় না, এবং আমরা তার বক্তব্য কথা বুঝতে পারি নে। বাংলার সবুজ পত্রে যে সুসমাচার লেখা আছে তা পড়বার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক হবার আবশ্যক নেই; কারণ সে লেখার ভাষা বাংলার প্রাকৃত। তবে আমরা সকলে যে তার অর্থ বুঝতে পারি নে তার কারণ হচ্ছে যিনি গুপ্ত জিনিস আবিষ্কার করতে ব্যস্ত, ব্যক্ত জিনিস তাঁর চোখে পড়ে না।

যাঁর ইন্দ্রধনুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে আর তার জন্মকথা জানা আছে, তিনিই জানেন যে সূর্যকিরণ নানা বর্ণের একটি সমষ্টিমাত্র, এবং শুধু সিধে পথেই সে সাদা ভাবে চলতে পারে। কিন্তু তার সরল গতিতে বাধা পড়লেই সে সমষ্টিব্যস্ত হয়ে পড়ে বক্র হয়ে বিচিত্র ভঙ্গি ধারণ করে, এবং তার বর্ণসকল পাঁচ বর্গে বিভক্ত হয়ে যায়। সবুজ হচ্ছে এই বর্ণমালার মধ্যমণি। এবং নিজগুণেই সে বর্ণরাজ্যের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে থাকে। বেগুনি কিশলয়ের রঙ, জীবনের পূর্বরাগের রঙ; লাল রক্তের রঙ, জীবনের পূর্ণরাগের রঙ; নীল আকাশের রঙ, অনন্তের রঙ; পীত শুষ্ক পত্রের রঙ, মৃত্যুর রঙ। কিন্তু সবুজ হচ্ছে নবীন পত্রের রঙ, রসের ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও ব্যক্তি। তার দক্ষিণে নীল আর বামে পীত, তার পূর্বসীমায় বেগুনি আর পশ্চিমসীমায় লাল। অন্ত ও অনন্তের মধ্যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে, স্মৃতি ও আশার মধ্যে মধ্যস্থতা করাই হচ্ছে সবুজের অর্থাৎ সরস প্রাণের স্বধর্ম।

যে বর্ণ বাংলার ওষধিতে ও বনস্পতিতে নিত্য বিকশিত হয়ে উঠছে, নিশ্চয় সেই একই বর্ণ আমাদের হৃদয়-মনকেও রাঙিয়ে রেখেছে। আমাদের বাহিরের প্রকৃতির যে রঙ, আমাদের অন্তরে পুরুষেরও সেই রঙ। এ কথা যদি সত্য হয় তা হলে সজীবতা ও সরসতাই হচ্ছে বাঙালির মনের নৈসর্গিক ধর্ম। প্রমাণস্বরূপে দেখানো যেতে পারে যে, আমাদের দেবতা হয় শ্যাম নয় শ্যামা। আমাদের হৃদয়-মন্দিরে রজতগিরিসন্নিভ কিংবা জবাকুসুমসংকাশ দেবতার স্থান নেই। আমরা শৈবও নই সৌরও নই; আমরা হয় বৈষ্ণব নয় শাক্ত। এ উভয়ের মধ্যে বাঁশি ও অসির যা প্রভেদ, সেই পার্থক্য বিদ্যমান। তবুও বর্ণসামান্যতার গুণে শ্যাম ও শ্যামা আমাদের মনের ঘরে নির্বিবাদে পাশাপাশি অবস্থিতি করে। তবে বঙ্গ-সরস্বতীর দূর্বাদলশ্যামরূপ আমাদের চোখে যে পড়ে না তার জন্য দোষী আমরা নই, দোষী আমাদের শিক্ষা। এ কালের বাণীর মন্দির হচ্ছে বিদ্যালয়। সেখানে আমাদের গুরুরা এবং গুরুজনেরা যে জড় ও কঠিন শ্বেতাঙ্গী ও শ্বেতবসনা পাষাণমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন আমাদের মন তার কায়িক এবং বাচিক সেবায় দিন দিন নীরস ও নির্জীব হয়ে পড়ছে। আমরা যে নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করি নে, তার কারণ আমাদের নিজের সঙ্গে আমাদের কেউ পরিচয় করিয়ে দেয় না। আমাদের সমাজ ও শিক্ষা দুইই আমাদের ব্যক্তিত্বের বিরোধী। সমাজ শুধু এক-জনকে আর-পাঁচজনের মতো হতে বলে, ভুলেও কখনো আর-পাঁচজনকে একজনের মতো হতে বলে না। সমাজের ধর্ম হচ্ছে প্রত্যেকের স্বধর্ম নষ্ট করা। সমাজের যা মন্ত্র, তারই সাধনপদ্ধতির নাম শিক্ষা। তাই শিক্ষার বিধি হচ্ছে 'অপরের মতো হও', আর তার নিষেধ হচ্ছে 'নিজের মতো হোয়ো না'। এই শিক্ষার কৃপায় আমাদের মনে এই অদ্ভুত সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, আমাদের স্বধর্ম এতই ভয়াবহ যে তার চাইতে পরধর্মে নিধনও শ্রেয়। সুতরাং কাজে ও কথায়, লেখায় ও পড়ায়, আমরা আমাদের মনের সরস সতেজ ভাবটি নষ্ট করতে সদাই উৎসুক। এর কারণও স্পষ্ট, সবুজ রঙ ভালো মন্দ দুই অর্থেই কাঁচা। তাই আমাদের কর্ম-যোগীরা আর জ্ঞানযোগীরা, অর্থাৎ শাস্ত্রীর দল, আমাদের মনটিকে রাতারাতি

পাকা করে তুলতে চান। তাঁদের বিশ্বাস যে কোনোরূপ কর্ম কিংবা জ্ঞানের চাপে আমাদের হৃদয়ের রসটুকু নিংড়ে ফেলতে পারলেই আমাদের মনের রঙ পেকে উঠবে। তাঁদের রাগ এই যে, সবুজ বর্ণমালার অন্তঃস্থ বর্ণ নয় এবং ও রঙ কিছুরই অঙ্গে আসে না—জীবনেরও নয়, বেদেরও নয়, কর্মেরও নয়, জ্ঞানেরও নয়। এ'দের চোখে সবুজ-মনের প্রধান দোষ যে, সে মন পূর্বমীমাংসার অধিকার ছাড়িয়ে এসেছে এবং উত্তরমীমাংসার দেশে গিয়ে পেঁছয় নি। এ'রা ভুলে যান যে, জোর করে পাকাতে গিয়ে আমরা শুধু হরিৎকে পীতের ঘরে টেনে আনি, প্রাণকে মৃত্যুর দ্বারস্থ করি। অপর দিকে এ দেশের ভক্তিযোগীরা, অর্থাৎ কবির দল, কাঁচাকে কচি করতে চান। এ'রা চান যে আমরা শুধু গদ্‌গদভাবে আধো-আধো কথা কই। এ'দের রাগ সবুজের সজীবতার উপর। এ'দের ইচ্ছা সবুজের তেজটুকু বহিষ্কৃত করে দিয়ে ছাঁকা রসটুকু রাখেন। এ'রা ভুলে যান যে, পাতা কখনো আর কিশলয়ে ফিরে যেতে পারে না; প্রাণ পশ্চাৎপদ হতে জানে না। তার ধর্ম হচ্ছে এগনো, তার লক্ষ্য হচ্ছে হয় অমৃতত্ব নয় মৃত্যু। যে মন একবার কর্মের তেজ ও জ্ঞানের ব্যোমের পরিচয় লাভ করেছে, সে এ উভয়কে অন্তরঙ্গ করবেই। কেবলমাত্র ভক্তির শান্তিজলে সে তার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করে রাখতে পারে না। আসল কথা হচ্ছে, তারিখ এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে দিয়ে যৌবনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। এ উভয়ের সমবেত চেষ্টার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, বাঙালির মন এখন অর্ধেক অকালপক্ক এবং অর্ধেক অযথা-কচি। আমাদের আশা আছে যে, সবুজ ক্রমে পেকে লাল হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের অন্তরের আজকের সবুজ রস কালকের লাল রক্তে তবেই পরিণত হবে, যদি আমরা স্বধর্মের পরিচয় পাই এবং প্রাণপণে তার চর্চা করি। আমরা তাই দেশী কি বিলাতি পাথরে-গড়া সরস্বতীর মূর্তির পরিবর্তে বাংলার কাব্যমন্দিরে দেশের মাটির ঘটস্থাপনা করে তার মধ্যে সবুজ পত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু এ মন্দিরের কোনো গর্ভমন্দির থাকবে না, কারণ সবুজের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য আলো চাই আর বাতাস চাই। অন্ধকারে সবুজ ভয়ে নীল হয়ে যায়। বন্ধ ঘরে সবুজ দুঃখে পাণ্ডু হয়ে যায়। আমাদের নবমন্দিরের চার দিকের অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে। শুধু তাই নয়, এ মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার থাকবে। ঊষার গোলাপি, আকাশের নীল, সন্ধ্যার লাল, মেঘের নীল-লোহিত, বিরোধালংকারস্বরূপে সবুজ পত্রের গাত্রে সংলগ্ন হয়ে তার মরকতদ্যুতি কখনো উজ্জ্বল কখনো কোমল করে তুলবে। সে মন্দিরে স্থান হবে না কেবল শুষ্ক পত্রের।

বৈশাখ ১৩২১

সাহিত্যসম্মিলন

গত সাহিত্যসম্মিলনে একটি নূতন সুরের পরিচয় পাওয়া গেছে—সে হচ্ছে সত্যের সুর। এ সুর যে বঙ্গ সাহিত্যে পূর্বে কখনো শোনা যায় নি, তা নয়। তবে নূতনত্বের মধ্যে এইটুকু যে, আর-পাঁচটি বিবাদী সংবাদী ও অনুবাদী সুরের মধ্যে এবারকার পালায় এইটিই ছিল স্থায়ী সুর। এবং সে সুর যে অতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তার কারণ তা কোমল নয়, তীব্র।

এবারকার ব্যাপারের কর্মকর্তারা নিমন্ত্রিত অভ্যাগত সাহিত্যিকদের প্রচলিত প্রথামত 'আসুন বসুন' বলে সম্ভাষণ করেন নি, 'উঠুন চলুন' বলে অভিভাষণ করেছেন। এ'রা সকলেই গলার আওয়াজ আধসুর চড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে একবাক্যে বলেছেন যে, 'এ দেশের সেকাল সত্যযুগ হতে পারে, কিন্তু একাল হচ্ছে মিথ্যার যুগ।' এই দেশব্যাপী মিথ্যার হাত হতে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায়, তারই সন্ধান বলে দেওয়াটাই ছিল সাহিত্যাচার্যদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মিথ্যার চর্চা লোকে দুভাবে করে—এক জেনে, আর-এক না জেনে। সত্য যে কি, তা জেনেও কেউ কেউ কথায় ও কাজে তা নিত্য উপেক্ষা করেন। এ রোগের ঔষধ কি, বলা কঠিন; অন্তত ওর কোনো টোটকা আমার জানা নেই। অপর পক্ষে, অনেকে কেবলমাত্র মানসিক জড়তাবশত ও-বস্তু যে কি তার সন্ধান জানেনও না, নেনও না। তাই সম্মিলনের মুখপাত্রেরা, যাদের মনের সর্বাঙ্গে আলস্য ধরেছে সেই শ্রেণীর লোকদের, উপদেশ দিয়েছেন— 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'।

এ'রা আমাদের জাগিয়ে তুলতে চান সত্যের জ্ঞানে, আমাদের উঠে চলতে বলেন সত্যের অনুসন্ধানে। কারণ, যে সত্য চোখের সুমুখে রয়েছে সেটিকে দেখাও আমাদের পক্ষে যেমন কর্তব্য, যে সত্য লুকিয়ে আছে তাকে খুঁজে বার করাও আমাদের পক্ষে তেমনি কর্তব্য। কোনো জিনিস দেখতে হলে জাগা অর্থাৎ চোখ খোলা দরকার, আর কোনো জিনিস খুঁজতে হলে ওঠা এবং চলা দরকার। তাই এ'রা আমাদের 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' এই মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চান। তবে আমরা এ মন্ত্রে দীক্ষিত হতে রাজি হব কি না জানি নে; কেননা এ মন্ত্রের সাধনায় আমরা অভ্যস্ত নই।

লোকপ্রবাদ যে, পুরুতে যখন মন্তর পড়ে পাঁঠা তাতে কর্ণপাত করে না। পাঁঠা যে ও-সব কথা কানে তোলে না তার কারণ, উৎসর্গের মন্ত্র পড়া হয় ছাগকে বলি দেবার জন্য। কিন্তু এই সাহিত্যযজ্ঞের পুরোহিতেরা যে মন্ত্র পড়েছেন তা বলির মন্ত্র নয়, বোধনের মন্ত্র। সুতরাং তাতে কর্ণপাত করায় আমাদের বিশেষ আপত্তি হওয়া উচিত নয়। আমরা মানি আর না মানি, এ'রা যে-কথা বলেছেন তা যে মন দিয়ে শোনবার মতো কথা, এই বিশ্বাসে আমি সাহিত্যসম্মিলনের অভিভাষণচতুষ্টয়ের আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি।

২

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁর অভিভাষণের উপসংহারে বলেছেন যে,

বিজ্ঞান যদি বৃদ্ধ ভারতমন্ত্রীর কথা শোনেন, তবে ভারতে ফিরিয়া আসুন।

এ কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর মতে ভারতবর্ষই হচ্ছে বিজ্ঞানের জন্মভূমি। কিন্তু পুরাকালে বালক-অবস্থাতেই বিজ্ঞান সমাজের প্রতি অভিমান করে দেশত্যাগী হয়ে ইউরোপে চলে যান। এবং সেখানে তদ্দেশবাসীর যত্নে লালিতপালিত হয়ে এখন যথেষ্টর চাইতেও বেশি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছেন। এমন-কি, ইউরোপবাসীরা এখন আর তাঁকে সামলে উঠতে পারছে না। এই কারণেই যিনি স্থলপথে বিলেত চলে গেছ্লেন তাঁকে আবার জলপথে দেশে ফিরে আসতে অনুরোধ করা হয়েছে। ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে এলে দেশের যে কোনো অকল্যাণ হবে, এ আশঙ্কা ঠাকুরমহাশয় করেন না। বরং তিনি এতে মঙ্গলেরই আশা করেন। কেন? তা তিনি স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেন নি। তবে তিনি বিজ্ঞানের রূপগুণের যে শাস্ত্র-সংগত বর্ণনা করেছেন, তার থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি যে কি কারণে বিজ্ঞানের আবার দেশে ফেরাটা দরকার।

ঠাকুরমহাশয় বলেছেন যে,

বৈদান্তিক আচার্যেরা বলেন সত্য তিনপ্রকার: ১ পারমার্থিক সত্য=তত্ত্বজ্ঞান=পরাবিদ্যা, ২ ব্যবহারিক সত্য=বিজ্ঞান=অপরাবিদ্যা, ৩ প্রাতিভাসিক সত্য=ভ্রমজ্ঞান=অবিদ্যা।

বিজ্ঞান বলতে একালে আমরা যা বুঝি সে বিষয়ে বেদান্তের পরিভাষায় সম্যক্ আলোচনা করা কঠিন। কারণ জ্ঞানের এই ত্রিবিধ জাতিভেদ আধুনিক দার্শনিকেরা স্বীকার করেন না। নব্যমতে জ্ঞান এক, শুধু ভ্রমই বহুবিধ। তবুও আমার বিশ্বাস যে, বেদান্তের পরিভাষা অবলম্বন করেও জ্ঞানের রাজ্যে বিজ্ঞানের স্থান কোথায় এবং কতখানি তা দেখানো যেতে পারে। সুতরাং আমি এ প্রবন্ধে উক্ত পরিভাষাই ব্যবহার করব।

ঠাকুরমহাশয় পূর্বোক্ত তিন সত্যের নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করেছেন—

বিজ্ঞান ব্যষ্টিজ্ঞান বা শাখাজ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান সমষ্টিজ্ঞান বা মোট জ্ঞান। পারমার্থিক সত্য মোট জ্ঞানের মোট সত্য; ব্যাবহারিক সত্য বিভিন্ন জ্ঞানের বিভিন্ন সত্য।

অর্থাৎ যে জ্ঞানের দ্বারা এক অখণ্ডসত্য লাভ করা যায়, সেই হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞান; আর যার দ্বারা বহু খণ্ডসত্যের জ্ঞান লাভ করা যায়, সেই হচ্ছে বিজ্ঞান। এক কথায়, তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষকে জানা; বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতিকে চেনা। বিজ্ঞানের নামে অনেকে ভয় পান এই মনে করে যে তা তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী; এবং তত্ত্বজ্ঞান যেহেতু ভারতবর্ষের প্রাণ, অতএব সেটিকে নিরাপদে রাখবার জন্য এঁদের মতে বিজ্ঞানকে পরিহার করা কর্তব্য। এরূপ কথা অবশ্য বেদ-বেদান্তে নেই; বরং উপনিষদ্‌কারেরা বলেছেন যে, অপরাবিদ্যা আয়ত্ত করতে

না পারলে পরাবিদ্যায় কারো অধিকার জন্মায় না। উপরোক্ত মতটি যে সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, বিজ্ঞানের চর্চা ত্যাগ করলে বহু সম্বন্ধে আমাদের ভ্রমজ্ঞান হওয়া অবশ্যম্ভাবী, কারণ বিজ্ঞান হচ্ছে পরীক্ষিত জ্ঞান ; বৈজ্ঞানিকেরা সত্যের টাকা না বাজিয়ে নেন না। বহু খণ্ডসত্যের উপর যদি এক মোটসত্যের প্রতিষ্ঠা না করা যায়, তা হলে বহু খণ্ডমিথ্যার উপর সে সত্যের যে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, এরূপ মিছা আশা শুধু পাগলে করতে পারে।

আসল কথা এই যে, দর্শনে আমরা ব্যষ্টি ও সমষ্টি এই দুইটি ভাবকে পৃথক্ করে নিলেও এ বিশ্ব ব্যস্তসমস্ত। তাই সমষ্টির জ্ঞানের ভিতর ব্যষ্টির জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে, এবং ব্যষ্টির জ্ঞান সমষ্টির জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। কেননা বস্তুত ও-দুই একসঙ্গে জড়ানো। তত্ত্বজ্ঞানে ও বিজ্ঞানে প্রভেদ এই যে, সমষ্টিজ্ঞান পরাবিদ্যায় এক ভাবে পাওয়া যায়, আর অপরাবিদ্যায় আর-এক ভাবে পাওয়া যায়। পরাবিদ্যার সমষ্টিজ্ঞান হচ্ছে মূলত একত্বের জ্ঞান। অপর পক্ষে বহুকে যোগ দিয়ে যে সমষ্টি পাওয়া যায়, তারই জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানানুমোদিত সমষ্টিজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানী এক জেনে সব জানতে চান, আর বৈজ্ঞানিক সবকে একত্র করে জানতে চান। এ দুয়ের ভিতর পার্থক্য আছে কিন্তু বিরোধ নেই। সুতরাং বিজ্ঞানের চর্চায় পারমার্থিক সত্যের নাশের ভয় নেই, ভয় আছে শুধু মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদের। যাঁরা মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চান তাঁরাই শুধু বিজ্ঞানকে ডরান।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, প্রাতিভাসিক সত্য হচ্ছে ভ্রমজ্ঞান। এ কথা শুনে লোকের এই ধোঁকা লাগতে পারে যে, কি করে একই জ্ঞান যুগপৎ সত্য ও ভ্রম হতে পারে। প্রাতিভাসিক সত্য যে এক হিসাবে সত্য আর-এক হিসাবে মিথ্যা, এর স্পষ্ট প্রমাণ আছে। সম্মিলনের সভাপতিমহাশয় যে-দুটি উদাহরণ দিয়েছেন, তারই সাহায্যে প্রাতিভাসিক সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করতে চেষ্টা করব।

সূর্য পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে, এটি হচ্ছে প্রাতিভাসিক সত্য ; আর পৃথিবী যে সূর্যের চার দিকে ঘুরছে, এটি হচ্ছে, বৈজ্ঞানিক সত্য। পৃথিবী চ্যাপটা, এটি হচ্ছে প্রাতিভাসিক সত্য ; আর পৃথিবী গোলাকার, এটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য। পৃথিবী চ্যাপটা ও সূর্যের যে উদয়াস্ত হয়, এ দুটিই হচ্ছে প্রত্যক্ষ সত্য, অর্থাৎ আমাদের চোখের পক্ষে ও আমাদের চলাফেরার পক্ষে সম্পূর্ণ সত্য। যতখানি জমি বাংলাদেশে চোখে দেখা যায় তা যে সমতল, এর চাইতে খাঁটি সত্য আব নেই। সুতরাং পৃথিবীর যে খণ্ডদেশ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ, তা চ্যাপটা, গোলাকার নয়। সমগ্র পৃথিবীটি গোলাকার, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীটি প্রত্যক্ষ নয়। আমরা যখন প্রত্যক্ষের সীমা লঙ্ঘন করে অপ্রত্যক্ষের বিষয় প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহায্যে জানতে চাই, তখনই আমরা ভ্রমে পড়ি। কারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হচ্ছে সমষ্টির জ্ঞান, অসংখ্য খণ্ড খণ্ড প্রত্যক্ষজ্ঞানের যোগাযোগ করে সে জ্ঞান পাওয়া যায়। অসংখ্য চ্যাপটা খণ্ডকে ঠিক দিলে তা গোল হয়ে ওঠে। এক মুহূর্তে একদেশদর্শিতাই হচ্ছে প্রত্যক্ষজ্ঞানের ধর্ম, সুতরাং কোনো একটি বিশেষ প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর নির্ভয়ে বৈজ্ঞানিক সত্যকে দাঁড় করানো যায় না।

ইন্দ্রিয় বাহ্যবস্তুর যে পরিচয় দেয়, সাধারণত মানুষে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে,

কারণ তাতেই তার কাজ চলে যায় ; কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মাণ্ডকে একটি প্রকাণ্ড সমষ্টি হিসেবে দেখতে চায় ; বিশ্বে একটা নিয়ম আছে এই বিশ্বাসে, সে সেই নিয়মের সন্ধানে ফেরে। বস্তুসকলকে পৃথক্‌ভাবে না দেখে যুক্তভাবে দেখতে গিয়ে বিজ্ঞান দেখতে পায় যে, প্রাতিভাসিক সত্য সমগ্র সত্য নয়। পৃথিবী যে চ্যাপটা ও সূর্য যে পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের হিসেবে এ দুটি হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং সম্পর্করহিত সত্য। কিন্তু বিজ্ঞানের্ কাছে এ দুটি হচ্ছে এক সত্যের দুইটি বিভিন্ন রূপ। পৃথিবী নামক মৃৎপিণ্ডটি যে কারণে সূর্যের চার পাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেই কারণেই সেটি তাল পাকিয়ে গেছে। ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ কিংবা চ্যাপটা হলে ওভাবে ঘোরা তার পক্ষে অসাধ্য হত। সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো বিরোধ নেই, কারণ এ উভয়ের অধিকার স্বতন্ত্র। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানতে চাই বস্তুজগতের সামান্য গুণ, আর প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহায্যে আমরা দেখতে চাই বস্তুর বিশেষ রূপ। অতএব বিজ্ঞানেব চর্চা করলে আমাদের তত্ত্বজ্ঞান মারা যাবে না অর্থাৎ আমাদের ধর্ম নষ্ট হবে না ; এবং আমাদের বাহ্যজ্ঞানও নষ্ট হবে না অর্থাৎ কাব্য-শিল্পও মারা যাবে না। যা তত্ত্বজ্ঞানও নয়, বিজ্ঞানও নয়, প্রত্যক্ষজ্ঞানও নয়, তাই হচ্ছে যথার্থ মিথ্যা ; এবং তারই চর্চা করে আমরা ধর্ম সমাজ কাব্য শিল্প, এক কথায় সমগ্র মানবজীবন, সমূলে ধ্বংস করতে বসেছি।

৩

বিজ্ঞান শুধু একপ্রকার বিশেষজ্ঞানের নাম নয় ; একটি বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, আসলে তারই নাম হচ্ছে বিজ্ঞান। আমরা বিজ্ঞানকে যতই কেন সাধাসাধি করি-নে, সে কখনোই এ দেশে ফিরে আসবে না, যদি-না আমরা তার সাধনা করি। সুতরাং সেই সাধনপদ্ধতিটি আমাদের জানা দরকার। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি যে কি, সে সম্বন্ধে আমি দুই-একটি কথা বলতে চাই। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য থেকেই তার উপায়েরও পরিচয় পাওয়া যাবে। তত্ত্বজ্ঞানের জিজ্ঞাস্য বিষয় হচ্ছে 'এক সত্য', অথচ প্রত্যক্ষজ্ঞানের বহুর অস্তিত্ব তত্ত্বজ্ঞানীরাও অস্বীকার করতে পারেন না। তাই বৈদান্তিকেরা বলেন, যা পূর্বে এক ছিল তাই এখন বহুতে পরিণত হয়েছে। সাংখ্যের মতে সৃষ্টি একটি বিকার মাত্র, কেননা ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতির সুস্থ অবস্থা। সৃষ্টিকে বিকার হিসেবে দেখা আশ্চর্য নয়, কেননা আপাতসুলভ জ্ঞানে এ বিশ্ব একটি ভাঙাচোরা, ছাড়ানো ও ছড়ানো ব্যাপার। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই অসংখ্য পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করা, জড়জগতের ভগ্নাংশগুলিকে যোগ দিয়ে একটি মন দিয়ে ধরবার-ছোঁবার মতো সমষ্টি গড়ে তোলা। এই ভগ্নাংশগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যোগ করতে হলে আঁকজোখ চাই। সুতরাং দুইয়ে দুইয়ে চার করার নামই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ আব-বে-দেশেই হোক, বিজ্ঞানের রাজ্যে হয় না। বিজ্ঞানের কারবার শুধু বস্তুর সংখ্যা নিয়ে নয়, পরিমাণ নিয়েও। সুতরাং বিজ্ঞানে মাপজোখও করা চাই। বিনা মাপে বিনা আঁকে যে সত্য পাওয়া

যায় তা বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। বিজ্ঞানের যা-কিছু মর্যাদা গৌরব ও মূল্য, তা সবই এই পদ্ধতির দরুন। আমাদের কাছে কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যের বিশেষ কিছু মূল্য নেই, যদি আমরা কি উপায়ে সেটি পাওয়া গেছে তা না জানি। পৃথিবী কমলালেবুর মতো, এটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু কি মাপজোখের কি যুক্তির সাহায্যে এই সত্য নির্ণীত হয়েছে, সেটি না জানলে ও-সত্য আমাদের মনের হাতে কমলালেবু নয়, ছেলের হাতে মোয়া ; অর্থাৎ তা আমাদের এতই কম করায়ত্ত যে. যে-খুশি-সেই কেড়ে নিতে পারে। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসকলের ক্রমান্বয় ভুল বেরচ্ছে, আবার তা সংশোধন করা হচ্ছে। কিন্তু সে ভুলের আবিষ্কার ও সংশোধন ঐ একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে সাধিত হচ্ছে।

ঐতিহাসিক শাখার নেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয় করবার পদ্ধতিটি যে কি, তারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন; কারণ ইতিহাস ঠিক বিজ্ঞান না হলেও একটি উপবিজ্ঞানের মধ্যে গণ্য। এ ক্ষেত্রে মৈত্রেয়মহাশয়ের মতে ঐতিহাসিকদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে অনুসন্ধান করে অতীতের দলিল সংগ্রহ করা। সে দলিল নানা দেশে নানা স্থানে ছড়ানো আছে। সুতরাং সেই-সব হারামণির অন্বেষণের জন্য ঐতিহাসিকদের দেশদেশান্তরে ঘুরতে হবে। শুধু তাই নয়। ঐতিহাসিক তত্ত্ব সকল সময়ে মাটির উপর পড়ে-পাওয়া যায় না। ও হচ্ছে বেশির ভাগ কষ্ট করে উদ্ধার করবার জিনিস। কারণ অতীত প্রত্যক্ষ নয়, বর্তমানে তা ঢাকা পড়ে থাকে। ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করবার অর্থ হচ্ছে অ-দৃষ্টকে দৃষ্ট করা, তার জন্য চাই পুরুষকার। তাই মৈত্রেয়মহাশয় কেবল-মাত্র ভক্তিভরে অতীতের নাম কীর্তন না করে তার সাক্ষাৎকার লাভ কববার পরামর্শ আমাদের দিয়েছেন। তাঁর পরামর্শমত কাজ করতে হলে আমাদের করতাল ভেঙে কোদাল গড়াতে হবে। ভূগর্ভে ও কালগর্ভে যে-সকল ঐতিহাসিক রত্ন নিহিত আছে আগে তা খুঁড়ে বার করতে হবে, পরে তার কাটাই-ছাঁটাই করে সাহিত্যসমাজে প্রচলন করতে হবে। এ কথা অবশ্যস্বীকার্য যে, আগে আসে খনিকার, তার পরে মণিকার। মৈত্রেয়মহাশয় তাই ঐতিহাসিকদের কলম ছাড়িয়ে খন্তা ধরাতে চান। তাঁর বিশ্বাস যে, ঐতিহাসিকদের হাতের খন্তা নিয়ত ব্যবহারে ক্ষয়ে গিয়ে ক্রমশ কলমের আকার ধারণ করবে, এবং সেই কলমে ইতিহাস লিখতে হবে। ইতিহাসের আবিষ্কর্তা ও রচয়িতার মধ্যে যে অধিকারভেদ আছে, মৈত্রেয়মহাশয় বোধ হয় সেটি মানেন না। অথচ এ কথা সত্য যে একজনের পক্ষে কলম ছেড়ে খন্তা ধরা যত কঠিন, আর-একজনের পক্ষে খন্তা ছেড়ে কলম ধরা তার চাইতে কিছু কম কঠিন নয়।

সে যাই হোক, মৈত্রেয়মহাশয় আমাদের আর-একটি বিশেষ আবশ্যকীয় কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সে হচ্ছে এই যে, ত্যাগ স্বীকার না করতে পারলে কোনোরূপ সাধনা করা যায় না। কেননা, ত্যাগের অভ্যাস থেকেই সংযমের শিক্ষা লাভ করা যায়। ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক সাধনা করতে হলে আমাদের অসংখ্য মানসিক-আলস্যপ্রসূত বিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। আমাদের পুরাণের মায়া, কিংবদন্তীর মোহ কাটাতে হবে।

শুধু রূপকথা নয়, সেইসঙ্গে কথার মোহও আমাদের ত্যাগ করতে হবে; অর্থাৎ যথার্থ ইতিহাস রচনা করতে হলে সে রচনায় 'শব্দের লালিত্য, বর্ণনার মাধুর্য, ভাষার চাতুর্য' পরিহার করতে হবে। এক কথায় শ্রীহর্ষচরিত আর কাদম্বরীর ভাষায় লেখা চলবে না। এ কথা অবশ্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু কি কারণে অক্ষয়বাবু অপরকে যে-উপদেশ দিয়েছেন নিজে সে-উপদেশ অনুসরণ করেন নি তা ঠিক বুঝতে পারলুম না। কারণ তাঁর অভিভাষণের ভাষা যে 'অক্ষর-ডম্বর', এ কথা টাউন হলে সশরীরে উপস্থিত থাকলে স্বয়ং বাণভট্টও স্বীকার করতেন। সম্ভবত অক্ষয়বাবুর মতে ইতিহাসের আখ্যান হচ্ছে বিজ্ঞান, আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যাখ্যান হচ্ছে কাব্য।

৪

যে লোভ অক্ষয়বাবু সংবরণ করতে পারেন নি, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। শাস্ত্রীমহাশয় আগাগোড়া অশাস্ত্রীয় ভাষা ব্যবহার করায় তাঁর অভিভাষণ এতই জলের মতো সহজ হয়েছে যে, তা এক নিশ্বাসে নিঃশেষ করা যায়। এ শ্রেণীর লেখা যে বহতা নদীর জলের মতোই স্বচ্ছ ও ঠাণ্ডা হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। জলের মতো ভাষার বিশেষ গুণ এই যে, তা জ্ঞানপিপাসুদের তৃষ্ণা সহজেই নিবারণ করে। বর্ণ-গন্ধ চাই শুধু কাব্যের ভাষায়, কেননা তা হয় অমৃত নয় সুরা।

আমি বহুকাল হতে এই কথা বলে আসছি যে, বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষাতেই রচিত হওয়া উচিত। কিন্তু এই সহজ কথাটি অনেকের কাছে এতই দুর্বোধ ঠেকে যে, তাঁরা এরূপ আজগুবি কথা শুনে বিরক্ত হন। এঁদের মতে বাংলা হচ্ছে আমাদের আটপৌরে ভাষা, তাতে সাহিত্যের ভদ্রতা রক্ষা হয় না। সুতরাং সাহিত্যের জন্য সাধুভাষা নামক একটি পোশাকি ভাষা তৈরি করা চাই। পোশাক যখন চাইই, তখন তা যত ভারী আর যত জমকালো হয় ততই ভালো। তাই সাহিত্যিকরা সংস্কৃত ভাষার চোরা-জরিতে কিংখাব বুনতে এতই ব্যগ্র ও এতই ব্যস্ত যে, সে জরি সাচ্চা কি ঝুটো, তা দিয়ে তাঁরা কিংখাব দূরে থাক্ দোসুতিও বুনতে পারেন কি না, পারলেও সে বুনানিতে ঐ জরি খাপ খায় কি না, এ-সব বিচার করবার তাঁদের সময় নেই। সুতরাং বাংলা লিখতে বললে তাঁরা মনে করেন যে, আমরা তাঁদের কাব্যের বস্ত্রহরণ করতে উদ্যত হয়েছি। কিন্তু আমরা যে ওরূপ কোনো গর্হিত আচরণ করতে চাই নে, তার প্রমাণ, ভাষা ভাবের লজ্জা নিবারণ করবার জিনিস নয়। ভাষা বস্ত্র নয়, ভাবের দেহ; আলংকারিকদের ভাষায় যাকে বলে 'কাব্যশরীর'। বাঙালির ভাষা বাঙালি চৈতন্যের অধিষ্ঠান। বাঙালির আত্মাকে সংস্কৃত ভাষার দেহে কেউ প্রবেশ করিয়ে দিলে ব্যাড়ীর আত্মা নন্দ-ভূপতির দেহে প্রবেশ করে যেরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল সেইরূপ হবারই সম্ভাবনা। দরিদ্র ব্রাহ্মণের আত্মা রাজার দেহে প্রবেশ করার তার যে কি পর্যন্ত দুর্গতি হয়েছিল তার বিস্তৃত ইতিহাস কথাসরিৎসাগরে দেখতে পাবেন। বাঙালির স্কুলে-পড়ানো আত্মা

কেন যে নিজের দেহপিঞ্জর হতে নিষ্ক্রমণ করে পরের পঞ্জরে প্রবেশলাভ করবার জন্য ছটফট করছে, তার কারণ শাস্ত্রীমহাশয়ই নির্দেশ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

আমার বিশ্বাস, বাঙালি একটি আত্মবিস্মৃত জাতি। বিষ্ণু যখন রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন কোনো ঋষির শাপে তিনি আত্মবিস্মৃত ছিলেন।

আমরাও তেমনি বাঙালি জাতির অজ্ঞান অবতার, সম্ভবত গুরু-পুরোহিতের শাপে। মুক্তির জন্য আমাদের এই শাপমুক্ত হতে হবে, অর্থাৎ জাতিস্মর হতে হবে। কেননা, সত্যলাভের জন্য যেমন বাহ্যজ্ঞান চাই, তেমনি আত্মজ্ঞানও চাই। এই জাতিস্মরতা লাভ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইতিহাস। একমাত্র ইতিহাসই জাতির পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই জাতীয় পূর্বজন্মের জ্ঞান হারিয়েই আমরা নিজের ভাষার মনের ও চরিত্রের জ্ঞান হারিয়েছি।

শাস্ত্রীমহাশয়ের মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, এক 'আর্য' শব্দের উপর জীবন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বাঙালির ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট হবে, কেননা আমরা মোক্ষমুলারের আবিষ্কৃত খাঁটি আর্য নই। আমরা একটি মিশ্রজাতি। প্রথমত দ্রবিড় ও মোঙ্গলের মিশ্রণে বাঙালি জাতি গঠিত হয়। তার পর সেই জাতির দেহে মনে ও সমাজে কতক পরিমাণ আর্যত্ব আরোপিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে আমরা একেবারে আর্যমিশ্র হয়ে উঠি নি। শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে আর্যসভ্যতা আবর্তে আবর্তে বাংলায় এসে পৌঁচেছে। তিনি বলেন—

এই-সকল আবর্ত ঘুরিতে ঘুরিতে যখন বাংলায় আসিয়া উপনীত হয়, তখন দেখা যায় আর্যের মাত্রা বড়ই কম, দেশীর মাত্রা অনেক বেশি।

এ সত্য আমি নিরাপত্তিতে স্বীকার করি, যদিচ সম্ভবত আমি এই ক্রমাগত আর্য-আবর্তের একটি ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্, কেননা আমি ব্রাহ্মণ।

বাংলা ভাষা আর্য ভাষা নয়, উক্ত ভাষার একটি স্বতন্ত্র শাখা—এক কথায় একটি নবশাখ ভাষা। বাঙালি জাতিও আর্য জাতি নয়, একটি নবশাখ জাতি। আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রধান চেষ্টা হয়েছে আমাদের মন ও ভাষার মধ্যে থেকে তার দেশী খাদটুকু বাদ দিয়ে তার আর্য সোনাটুকু বার করে নেওয়া। প্রথমত ওরূপ খাদ বাদ দেওয়া সম্ভব নয়, দ্বিতীয়ত সম্ভব হলেও বড়ো বেশি যে সোনা মিলবে তাও নয়। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে, দেশী অংশটুকু বাদ দেবার এত প্রাণপণ চেষ্টা কেন। ও তো খাদ নয়, ঐ তো হচ্ছে বাঙালি জাতির মূলধাতু। এবং সে ধাতু যে অবজ্ঞা কিংবা উপেক্ষা করবার জিনিস নয়, তা যিনিই বাঙালির প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধান রাখেন তিনিই মানেন। কাঁঠাল আম নয় বলে দুঃখ করবারও কারণ নেই, এবং কাঁঠালের ডালে আমের কলম বসাবার চেষ্টা করবারও দরকার নেই। আমরা এই বাংলার গায়ে হয় ইংরেজি নয় সংস্কৃতের কলম বসিয়ে সাহিত্যে ও জীবনে শুধু কাঁঠালের আমসত্ত্ব তৈরি করবার বৃথা চেষ্টা করছি।

শাস্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে, বাঙালি জাতির প্রাচীন সিদ্ধাচার্যেরা সব সহজিয়া মতের প্রবর্তক ও প্রচারক ছিলেন। আমরা আত্মজ্ঞানশূন্য বলে যা আমাদের কাছে সহজ তাই বর্জন করি; আমরা সাধুভাষায় সাহিত্য লিখি, আর জীবনে হয়

সাহেবিয়ানা নয় আর্যামি করি। জাতীয় আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারলে আমরা আবার সহজ, অর্থাৎ natural, হতে পারব। মনের এই সহজসাধন অতি কঠিন ব্যাপার, কেননা আমাদের সকল শিক্ষাদীক্ষা হচ্ছে কৃত্রিমতার সহায় ও সম্পদ।

৫

সাহিত্যশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ও আমাদের বলেছেন যে—

আলস্যের প্রশ্রয় দিলে হইবে না। নিদ্রিত সমাজকে জাগাইতে হইবে। শয্যাশয়ান সমাজের সুখসুপ্তি ভাঙাইতে হইবে।

এ যে শুধু কথার কথা নয়, তার প্রমাণ, কি করে সাহিত্যের সাহায্যে সমাজকে জাগিয়ে তুলতে পারা যায় তার পন্থা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মোট কথা এই যে, দর্শনবিজ্ঞানের চর্চা না করলে সাহিত্য শক্তিহীন ও শ্রীহীন হয়ে পড়ে। তর্করত্নমহাশয়ের মতে 'সাহিত্য' শব্দের অর্থ সাহচর্য। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, কিসের সাহচর্য? তার উত্তর, সকলপ্রকার জ্ঞানের সাহচর্য। কারণ অতিপ্রবুদ্ধ অজ্ঞতার গর্ভে যে সাহিত্য জন্মগ্রহণ করে তা সুকুমার-সাহিত্য নয়, তা শুধু কুমার-সাহিত্য অর্থাৎ ছেলেমানষি লেখা। তিনি দেখিয়েছেন যে, কালিদাস প্রভৃতি বড়ো বড়ো সংস্কৃত কবিরা সে যুগের সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রমাণ শকুন্তলা অভিজ্ঞান, অবিজ্ঞান নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের নানা যুক্ত শাস্ত্রের জ্ঞানের অভাব-বশত আমরা সংস্কৃত কাব্য আধো বুঝি, সংস্কৃত দর্শন ভুল বুঝি, পুরাণকে ইতিহাস বলে গণ্য করি, আর ধর্মশাস্ত্রকে বেদবাক্য বলে মান্য করি।

সে যাই হোক, পাণ্ডিত্য কস্মিন্‌কালেও সাহিত্যের বিরোধী নয়। তার প্রমাণ, কালিদাস দান্তে মিল্টন গ্যেটে প্রভৃতি। তবে, পণ্ডিত অর্থে যদি বিদ্যার চিনির বলদ বোঝায় তা হলে সে স্বতন্ত্র কথা। জ্ঞানই হচ্ছে কাব্যের ভিত্তি, কারণ সত্যের উপরেই সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত। তর্করত্নমহাশয়ের বক্তব্য এই যে, ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে 'সিন্‌থেটিক কালচার' তাই হচ্ছে সাহিত্যের পরম সহায়। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। ইউরোপের দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস অর্থনীতি সমাজতত্ত্ব রাজনীতির সঙ্গে কতকটা পরিচয় না থাকলে কোনো বড়ো ইংরেজ কবি কিংবা নভেলিস্টের লেখা সম্পূর্ণ বোঝাও যায় না, তার রসও আস্বাদন করা যায় না। সাহিত্য হচ্ছে প্রবুদ্ধ চৈতন্যের বিকাশ; এবং চৈতন্যকে জাগিয়ে তুলতে হলে তার উপর আর-পাঁচজনের মনের আর-পাঁচরকমের জ্ঞানের ধাক্কা চাই। যাঁর মন সত্যের স্পর্শে সাড়া দেয় না, সে সত্য আধ্যাত্মিকই হোক আর আধিভৌতিকই হোক, তিনি কবি নন। সুতরাং দর্শন-বিজ্ঞানকে অস্পৃশ্য করে তোলায় কাব্যের পবিত্রতা রক্ষা হয় না। এই কারণেই তর্করত্নমহাশয় আমাদের দেশী-বিলাতি সকলপ্রকার দর্শন-বিজ্ঞান অনুবাদ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে আলস্যপ্রিয় বাঙালি-মনের পক্ষে বিজ্ঞানচর্চারূপ মানসিক ব্যায়াম হচ্ছে অত্যাবশ্যক। আমাদের অলস মনের আরামজনক বিশ্বাস-সকল বিজ্ঞানের অগ্নিপরীক্ষায় পরিশুদ্ধ না হলে সত্যের খাঁটি সোনাতে তা পরিণত

হবে না; আর যা খাঁটি সোনা নয়, তার অলংকার ধারণ করলে কাব্যের দেহও কলঙ্কিত হয়।

৬

এবারকার সাহিত্যসম্মিলনের ফলে যদি বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের মিলন হয়, তা হলে বঙ্গ সাহিত্যের দেহ ও কান্তি দুইই পুষ্ট হবে। সে মিলন যে কবে হবে তা জানি নে। কিন্তু সত্যের সঙ্গে আমাদের ভাবের ও ভাষার বিচ্ছেদটি যে বহু লোকের নিকট অসহ্য হয়ে উঠেছে এইটি হচ্ছে মহা আশার কথা। মিথ্যার প্রতি আগে বিরাগ না জন্মালে কেউ সত্যের উদ্দেশে তীর্থযাত্রা করেন না; কারণ সে পথে কষ্ট আছে। বিজ্ঞানের মন্দিরে, অর্থাৎ সত্যের মানমন্দিরে পৌঁছতে হলে আগাগোড়া সিঁড়ি ভাঙা চাই।

আমি বৈজ্ঞানিক নই, কাজেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানই আমার মনের প্রধান সম্বল। সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সম্বন্ধে সাহিত্যাচার্যেরা কেউ দুটি ভালো কথা বলেন নি। তাই আমি তার সপক্ষে কিছু বলতে বাধ্য হচ্ছি।

বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতিরিক্ত হলেও ঐ মূলজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বাহ্যবস্তুকে ইন্দ্রিয়গোচর করতে হলে ইন্দ্রিয়েরও একটা শিক্ষা চাই। অনেকে চোখ থাকতেও কানা, কান থাকতেও কালা, অথচ মুখ না থাকলেও মূক নন। এই শ্রেণীর লোকের বাচালতার গুণেই আজ বাংলা সাহিত্যের কোনো মর্যাদা নেই। কাব্যকে আবার সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করতে হলে ইন্দ্রিয়কে আবার সজাগ করে তোলা চাই। চোখও বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে আমাদের ঠকাতে পারে, যদি সে চোখ ঘুমে ঢোলে। অপর পক্ষে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকলেও যা স্পষ্ট তাও আমাদের কাছে ঝাপসা হয়ে যায়। চোখে আর মনে এক না করতে পারলে কোনো পদার্থ লক্ষ্য করা যায় না। ইন্দ্রিয় ও মনের এই একীকরণ সাধনা বিনা সিদ্ধ হয় না। যাঁরা কাব্য রচনা করবেন, তাঁদের পক্ষে বাহিরের ভিতরের সকল সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। কারণ কাব্যে প্রত্যক্ষ ব্যতীত অপর কোনো সত্যের স্থান নেই। সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর অবিশ্বাস এবং তার প্রতি অমনোযোগ হচ্ছে কাব্যে সকল সর্বনাশের মূল। প্রত্যক্ষ জ্ঞান অবশ্য নিজের সীমা লঙ্ঘন করলে মিথ্যা বিজ্ঞানে পরিণত হয়। বিজ্ঞানও তেমনি নিজের সীমা লঙ্ঘন করলে মিথ্যা তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হয়। তার কারণ, বিজ্ঞান কোনো পদার্থকে এক হিসেবে দেখতে পারে না। বিজ্ঞান যে সমষ্টি খোঁজে সে হচ্ছে সংখ্যার সমষ্টি। বিজ্ঞান চারকে এক করতে পারে না। বিজ্ঞান চারকে পাওয়ামাত্র হয় তাকে দুই দিয়ে ভাগ করে, নয় তার থেকে দুই বিয়োগ করে; পরে আবার হয় দুই দ্বিগুণে, নয় দুয়ে-দুয়ে চার করে। অর্থাৎ বিজ্ঞান যার উপর হস্তক্ষেপ করে তাকে আগে ভাঙে, পরে আবার জোড়াতাড়া দিয়ে গড়ে। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে যে, বিজ্ঞানের হাতে জল হয় বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, নয় বরফ হয়ে জমে থাকে; আর নাহয় তো এক ভাগ অক্সিজেন আর দু ভাগ হাইড্রোজেনে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তার

পর বিজ্ঞান আবার সেই বাষ্পকে ঠাণ্ডা করে সেই বরফকে তাতিয়ে জল করে দেয়, এবং অক্সিজেনে-হাইড্রোজেনে পুনর্মিলন করে দেয়।

কিন্তু আমরা এক নজরে যা দেখতে পাই, তাই হচ্ছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এ জ্ঞানও একের জ্ঞান, অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞান হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞানের সবর্ণ।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ

এ কথা তাঁরই কাছে সত্য, যাঁর কাছে এটি প্রত্যক্ষ সত্য। কেননা, কোনোরূপ আঁকের সাহায্যে কিংবা মাপের সাহায্যে ও-সত্য পাওয়া যায় না। একত্বের জ্ঞান কেবলমাত্র অনুভূতিসাপেক্ষ।

আমি পূর্বে বলেছি, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রামে মনঃসংযোগ করা চাই; সেই মনঃসংযোগের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা চাই, এবং সেই ইচ্ছার মূলে আন্তরিক অনুরাগ চাই; এবং এ অনুরাগ অহৈতুকী প্রীতি হওয়া চাই। কোনোরূপ স্বার্থ-সাধনের জন্য যে সত্য আমরা খুঁজি, তা কখনো সুন্দর হয়ে দেখা দেয় না। যে প্রীতির মূলে আমার সহজ প্রবৃত্তি নেই, তা কখনো অহৈতুকী হতে পারে না। সুতরাং সত্য যে সুন্দর, এই জ্ঞানলাভের উপায় হচ্ছে সহজসাধন, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা কঠিন সাধন। কারণ আত্মার উপর বিশ্বাস আমরা হারিয়েছি।

সে যাই হোক, বিজ্ঞানের অবিরোধে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের চর্চা করা যায়, এ বিশ্বাস হারালে আমরা কাব্য-শিল্প সৃষ্টি করতে পারি নে। বিজ্ঞান হচ্ছে পূর্বসৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান। নূতন সৃষ্টির হিসাব বিজ্ঞানের পাকা খাতায় পাওয়া যায় না। সৃষ্টির মূলে যে চিররহস্য আছে, তা কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে ধরা পড়ে না। এই কারণে দেশের লোককে বিজ্ঞানের চর্চা করবার পরামর্শ দেওয়াটা সৎপরামর্শ, কেননা যা স্পষ্ট তাতে সর্বসাধারণের সমান অধিকার আছে। অপর পক্ষে কাব্যে শিল্পে অধিকারীভেদ আছে। সত্যের মূর্তিদর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি

শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রবাবুর 'বাস্তব' নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তর্কই হচ্ছে আলোচনার প্রাণ। পৃথিবীর অপর সকল বিষয়ের ন্যায় সাহিত্য সম্বন্ধেও কোনো মীমাংসায় উপস্থিত হতে হলে বাদী-প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই উক্তি শোনাটা দরকার।

এই উপলক্ষে রবীন্দ্রবাবুর কাব্যের দোষগুণ বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তার কারণ, রবীন্দ্রবাবুর কাব্যে বস্তুতন্ত্রতা নেই বললে, আমার বিশ্বাস, কিছুই বলা হয় না। কোন্ কাব্যে কি আছে তাই আবিষ্কার করা এবং প্রকাশ করাই হচ্ছে সমালোচনার, শুধু মুখ্য নয়, একমাত্র উদ্দেশ্য। অবিমারকে যা আছে শকুন্তলায় তা নেই, শকুন্তলায় যা আছে মৃচ্ছকটিকে তা নেই, এবং মৃচ্ছকটিকে যা আছে উত্তররামচরিতে তা নেই— এ কথা সম্পূর্ণ সত্য হলেও এ সত্যের দৌলতে আমাদের কোনোরূপ জ্ঞানবৃদ্ধি হয় না। কোনো-এক ব্যক্তি আইস্‌ল্যাণ্ড সম্বন্ধে একখানি একছত্র-বই লেখেন। তাঁর কথা এই যে, আইস্‌ল্যাণ্ডে সাপ নেই। এই বইখানি সম্বন্ধে ইউরোপের সকল সমালোচক একমত এবং সে মত এই যে, উক্ত পুস্তকের সাহায্যে আইস্‌ল্যাণ্ড সম্বন্ধে কোনোরূপ জ্ঞান লাভ করা যায় না। কোনো বিশেষ পদার্থের অভাব নয়, সদ্‌ভাবের উপরেই মানুষের মনে তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রবাবুর কাব্য সম্বন্ধে রাধাকমলবাবুর মতের প্রতিবাদ করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। কোনো-একটি মতের খণ্ডন করতে হলে সে মতটি যে কি, তা জানা আবশ্যক। আইস্‌ল্যাণ্ডে সাপ নেই— এ কথা অপ্রমাণ করবার জন্য লোককে দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে, সে দেশে সাপ আছে, এবং তার জন্য সাপ যে কি বস্তু সে বিষয়েও স্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। রবীন্দ্রবাবুর কাব্যে বস্তুতন্ত্রতা আছে কি নেই সে বিচার করতে আমি অপারগ, কেননা রাধাকমলবাবুর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ থেকে বস্তুতন্ত্রতা যে কি বস্তু তার পরিচয় আমি লাভ করতে পারি নি। তিনি সাহিত্যে বাস্তবতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিত্যবস্তুর উল্লেখ করেছেন। বস্তুতন্ত্রতার অর্থগ্রহণ করা যদি কঠিন হয় তা হলে নিত্যবস্তুতন্ত্রতার অর্থগ্রহণ করা যে অসম্ভব, সে কথা বলা বাহুল্য। সেই বস্তুই নিত্য, যা কালের অধীন নয়। এরূপ পদার্থ যে পৃথিবীতে আছে এ কথা এ দেশের প্রাচীন আচার্যেরা স্বীকার করেন নি। বিষ্ণুপুরাণের মতে—

> যাহা কালান্তরেও অর্থাৎ কোনো কালেও পরিণামাদিজনিত সংজ্ঞান্তর প্রাপ্ত হয় না, তাহাই প্রকৃত সত্য বস্তু। জগতে সেরূপ কোনো বস্তু আছে কি?—কিছুই নাই।[১]

[১] রামানুজধৃত বচন, শ্রীভাষ্য

যে বস্তু জগতে নেই, সে বস্তু যদি কোনো কাব্যে না থাকে তা হলে সে কাব্যের বিশেষ কোনো দোষ দেওয়া যায় না, কেননা এই জগৎই হচ্ছে সাহিত্যের অবলম্বন।

২

বস্তুতন্ত্রতা আত্মপরিচয় না দিলেও তার পরিচয় নেওয়াটা আবশ্যক; কেননা এ বাক্যটির দাবি মস্ত। বস্তুতন্ত্রতা একাধারে সকল সাহিত্যের মাপকাঠি ও শাসনদণ্ড, সুতরাং সাহিত্যসমাজে এর প্রচলন বিনা বিচারে গ্রাহ্য করা যায় না।

এ বাক্যটি বাংলা সাহিত্যে পূর্বে ছিল না। সুতরাং এই অপরিচিত আগন্তুক শব্দটির কুলশীলের সন্ধান নেওয়া আবশ্যক।

এ বাক্যটি সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে নেই, দর্শনশাস্ত্রে আছে।

কাব্যে ও দর্শনে যোগাযোগ থাকলেও এ দুটি যে পৃথক্ জাতীয় সাহিত্য, এ সত্য তো সর্বলোকবিদিত। দার্শনিকমাত্রেই নাম-রূপের বহির্ভূত দুটি-একটি ধ্রুব সত্যের সন্ধানে ফেরেন; অপর পক্ষে নাম-রূপ নিয়েই কবিদের কারবার। সুতরাং দার্শনিক পরিভাষার সাহায্যে কাব্যের রূপগুণের পরিচয় দেবার চেষ্টা সকল সময়ে নিরাপদ নয়। তবে শংকরের বস্তুতন্ত্রতা কাব্যক্ষেত্রে ব্যবহার করতে আমার বিশেষ কোনো আপত্তি নেই। শংকরের মতে—

জ্ঞান কেবল বস্তুতন্ত্র, অর্থাৎ জ্ঞান প্রমাণ-জন্য; প্রমাণ আবার বস্তুর স্বরূপ অবলম্বন করিয়াই জন্মে, অতএব জ্ঞান ইচ্ছানুসারে করা না-করা এবং অন্যথা করা যায় না।

শংকর একটি উদাহরণ দিয়ে তাঁর মত স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেটি এই—

হে গোতম! পুরুষও অগ্নি, স্ত্রীও অগ্নি ইত্যাদি শ্রুতিতে যে স্ত্রী-পুরুষে বহ্নি-বুদ্ধি উৎপাদন করিবার বিধান আছে, তাহা মনঃসাধ্য অর্থাৎ তাহা মনের অধীন, পুরুষের অধীন এবং শাস্ত্রীয় আজ্ঞাবাক্যেরও অধীন। কিন্তু প্রসিদ্ধ অগ্নিতে যে অগ্নিবুদ্ধি, তাহা না পুরুষের অধীন, না শাস্ত্রীয় আজ্ঞাবাক্যের অধীন। অতএব জ্ঞান প্রত্যক্ষ-বিষয়-বস্তুতন্ত্র।

সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতার অর্থ যদি প্রত্যক্ষ বস্তুর স্বরূপজ্ঞান হয়, তা হলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বস্তুতন্ত্রতার অভাবে দর্শন হতে পারে কিন্তু কাব্য হয় না। যদি বর্ণনার গুণে কোনো কবির হাতে বেল কুল হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে যে তাঁর বেলকুল ভুল হয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রাধাকমলবাবু অবশ্য যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং অর্থে ও-বাক্য ব্যবহার করেন না; কেননা যে কবির হাতে বাংলার মাটি এবং বাংলার জল পরিচ্ছিন্ন মূর্তি লাভ করেছে তাঁর কাব্যে যে পূর্বোক্ত হিসেবে বস্তুতন্ত্রতা নেই, এ কথা কোনো সমালোচক সজ্ঞানে বলতে পারবেন না। দেশের রূপের সম্বন্ধে যিনি দেশসুদ্ধ লোকের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন তাঁর যে প্রত্যক্ষ বস্তুর স্বরূপজ্ঞান নেই, এ কথা চোখের মাথা না খেয়ে বলা চলে না। শংকরের বস্তুতন্ত্রতাকে যদি কোনো বিশেষণে বিশিষ্ট করতে হয়, তা হলে সেটির অনিত্যবস্তুতন্ত্রতা সংজ্ঞা দিতে হয়। কেননা 'প্রসিদ্ধ অগ্নি' ইত্যাদি যে অনিত্য

বস্তু সে তো সর্বদর্শনসম্মত। সুতরাং রাধাকমলবাবুর মত এবং শংকরের মত এক নয়, কেননা নিত্যবস্তুতন্ত্রতার সঙ্গে অনিত্যবস্তুতন্ত্রতার আকাশপাতাল প্রভেদ। সত্য কথা এই যে, বস্তুতন্ত্রতা নামে সংস্কৃত হলেও পদার্থটি আসলে বিলেতি। সেইজন্য রাধাকমলবাবু তাঁর প্রবন্ধে তাঁর মতের সপক্ষে কেবলমাত্র ইউরোপীয় লেখকদের মত উদ্ধৃত করতে বাধ্য হয়েছেন, যদিচ সে-সকল লেখকদের পরস্পরের মতের কোনো মিল নেই। জর্মান দার্শনিক অয়কেন এবং ইংরেজ নাটককার বার্নার্ড শ যে সাহিত্যজগতে একপন্থী নন, এ কথা তাঁদের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন।

ইউরোপীয় সাহিত্যের রিয়ালিজম্‌ই নাম ভাঁড়িয়ে বাংলা সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা নামে দেখা দিয়েছে। সুতরাং বস্তুতন্ত্রতার বিচার করতে হলে অন্তত দু কথায় এই রিয়ালিজমের পরিচয় দেওয়াটা আবশ্যক।

ইউরোপের দার্শনিক-জগতেই এ শব্দটি আদিতে জন্মলাভ করে। আইডিয়ালিজমের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েই রিয়ালিজম্‌ দর্শনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, এবং সেই অবধি আজ পর্যন্ত এ উভয়ের যুদ্ধ সমানে চলে আসছে। আইডিয়ালিজমের মূল কথা হচ্ছে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা; এবং রিয়ালিজমের মূল কথা, জগৎ সত্য ব্রহ্ম মিথ্যা। এ অবশ্য অতি স্থূল প্রভেদ। কেননা এ উভয় মতই নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। এবং এই-সকল শাখায়-প্রশাখায় কোনো কোনো স্থলে প্রভেদ এত সূক্ষ্ম যে তাদের ইতরবিশেষ করা কঠিন। দর্শনের ক্ষেত্রে যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয় ক্রমে তা সাহিত্যক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত গত শতাব্দীতে বিজ্ঞানের সহায়তা লাভ করে রিয়ালিজম্‌ ইউরোপীয় সাহিত্যে একাধিপত্য লাভ করবার উদ্দেশ্যে সকলপ্রকার আইডিয়ালিজমের উপরে প্রবল পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করে।

রাধাকমলবাবু বস্তুতন্ত্রতার সপক্ষে বার্নার্ড শ -র দোহাই দিয়েছেন। বার্নার্ড শ প্রমুখ লেখকদের মতে রিয়ালিজমের অর্থ যে আইডিয়ালিজমের উপর আক্রমণ, তার স্পষ্ট প্রমাণ তাঁর নিজের কথাতেই পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, ইবসেনের নাটকের সারমর্ম হচ্ছে: His attacks on ideals and idealisms। এবং এই দুই মনোভাবের প্রতি বার্নার্ড শ -র যে কতদূর ভক্তি আছে তার পরিচয়ও তিনি নিজমুখেই দিয়েছেন। তিনি বলেন—

I have sometimes thought of...substituting in this book the words idol and idolatry for ideal and idealism ; but it would be impossible without spoiling the actuality of Ibsen's criticism of society. If you call a man a rascally idealist, he is not only shocked and indignant but puzzled : in which condition you can rely on his attention. If you call him a rascally idolater, he concludes calmly that you do not know that he is a member of the Church of England. I have therefore left the old wording. [১]

[১] *The Quintessence of Ibsenism.*

বার্নার্ড শ -র অভিমত-বস্তুতন্ত্রতা রবীন্দ্রবাবুর কাব্যে সম্ভবত নেই। কিন্তু রাধাকমলবাবু কখনোই বাংলা সাহিত্যে এ জাতীয় বস্তুতন্ত্রতার চর্চা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না; কেননা তিনি চান যে, সাহিত্য জনসাধারণের মনে উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করবে; অপর পক্ষে বার্নার্ড শ চান যে, সাহিত্য জনসাধারণের মন থেকে তথাকথিত উচ্চ আদর্শসকল দূর করবে।

রিয়ালিজম্ শব্দটি কিন্তু একটি বিশেষ সংকীর্ণ অর্থেই ইউরোপীয় সাহিত্যে সুপরিচিত। এক কথায় রিয়ালিস্টিক সাহিত্য রোমাণ্টিক সাহিত্যের অপর পৃষ্ঠা, এবং ভিক্টর হিউগো প্রমুখ লেখকদের রচিত সাহিত্যের প্রতিবাদস্বরূপেই ফ্লবেয়ার প্রমুখ লেখকেরা এই বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের সৃষ্টি করেন।

রোমাণ্টিসিজমের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ এই যে, সে সাহিত্য মনগড়া সাহিত্য। রোমাণ্টিক কবিদের মানসপুত্র ও মানসীকন্যারা এ পৃথিবীর সন্তান নন এবং যে জগতে তাঁরা বিচরণ করেন সেটি কবিদের স্বকপোলকল্পিত জগৎ। এক কথায় সে রূপের রাজ্যটি রূপকথার রাজ্য। উক্ত শ্রেণীর কবিরা নিজের কুক্ষিস্থ উপাদান নিয়ে যে মাকড়সার জাল বুনেছিলেন ফরাসি রিয়ালিজম্ তারই বক্ষে নখাঘাত করে। এ অভিযোগের মূলে যে অনেকটা সত্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না। এক গীতিকাব্য বাদ দিলে ফরাসিদেশের গত শতাব্দীর রোমাণ্টিক লেখকদের বহু নাটক-নভেল যে অশরীরী এবং প্রাণহীন, সে কথা সত্য। কিন্তু একমাত্র সুন্দরের চর্চা করতে গিয়ে সত্যের জ্ঞান হারানো যেমন রোমাণ্টিকদের দোষ, সত্যের চর্চা করতে গিয়ে সুন্দরের জ্ঞান হারানোটা রিয়ালিস্টদের তেমনি দোষ; প্রমাণ, জোলা Zola। আকাশগংগা অবশ্য কাল্পনিক পদার্থ। কিন্তু তাই বলে কাব্যে মন্দাকিনীর পরিবর্তে খোলা নর্দমাকে প্রবাহিত করার অর্থ তার জীবনদান করা নয়। রাধাকমলবাবু অবশ্য এ জাতীয় রিয়ালিজমের পক্ষপাতী নন। কেননা তাঁর মতে যেটি এ দেশের আদর্শ কাব্য অর্থাৎ রামায়ণ, সেটি হচ্ছে সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান রোমান্স। জোলা প্রভৃতি রিয়ালিজমের দলবল সরস্বতীকে আকাশপুরী হতে শুধু নামিয়েই সন্তুষ্ট হন নি, তাঁকে জোর করে মর্তের ব্যাধি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়েছেন। কারণ রোগ যে-বাস্তব, সে কথা আমরা চিৎকার করে মানতে বাধ্য।

৩

রাধাকমলবাবু যখন দেশী কাব্যের গায়ে বিলাতি ফুলের গন্ধ থাকাতেই আপত্তি করেন, তখন অবশ্য তিনি আমাদের সাহিত্যে বিলাতি ওষুধের গন্ধ আমদানি করতে চান না। তিনি বস্তুতন্ত্রতা অর্থে কি বোঝেন, তা তাঁর প্রদত্ত দুটি-একটি উপমার সাহায্যে আমরা কতকটা আন্দাজ করতে পারি। রাধাকমলবাবু বলেন—

মৃণাল না থাকিলে লতিকা না থাকিলে পদ্ম যে ঢলিয়া পড়িবে। বাস্তবকে অবলম্বন না করিলে সাহিত্যের সৌন্দর্য কি করিয়া ফুটিয়া উঠিবে?

জীবন্ত গাছ হইতেছে সাহিত্যের আসল বাস্তব। সে গাছ তাহার শিকড়ের দ্বারা জাতির অন্তরতম হৃদয়ের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অটুট রাখিয়াছে, সমস্ত জাতির হৃদয় হইতে তাহার রসসঞ্চার হয়। এই রসসঞ্চারই সাহিত্যে বাস্তবতার লক্ষণ।

একটা গোলাপগাছের যদি আশা হয়, সে স্থান কাল ও অবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া নীচের মাটি হইতে রস সঞ্চয় না করিয়া, আলোক ও বাতাসের দানকে অবজ্ঞা করিয়া, এক কথায় বাস্তবকে না মানিয়া, সে লিলি ফুল ফুটাইবে— তাহা হইলে তাহার যেরূপ বিড়ম্বনা হয়, কোনো দেশের সাহিত্যের পক্ষে দেশের সমাজ ও যুগধর্ম বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া সৌন্দর্যসৃষ্টির চেষ্টাও সেইরূপ ব্যর্থ হয়।

এর অনেক কথাই যে সত্য, সে বিষয়ে আর দ্বিমত নেই। মৃণালের অস্তিত্ব না থাকলে পদ্মের ঢলে পড়ার চাইতেও বেশি দুরবস্থা ঘটবে, অর্থাৎ তার অস্তিত্বই থাকবে না। তবে মৃণাল যদি বাস্তব হয়, পদ্ম যে কেন তা নয়, তা বোঝা গেল না। সম্ভবত তাঁর মতে যে যার নীচে থাকে সেই তার বাস্তব। ফুলের তুলনায় তার বৃন্ত, বৃন্তের তুলনায় শাখা, শাখার তুলনায় কাণ্ড, কাণ্ডের তুলনায় শিকড় এবং শিকড়ের তুলনায় মাটি উত্তরোত্তর অধিক হতে অধিকতর এবং অধিকতম বাস্তব হয়ে ওঠে। পঙ্কজের অপেক্ষা পঙ্কে যে অধিক পরিমাণে বাস্তবতা আছে, এই বিশ্বাসে জোলা প্রভৃতি বস্তুতান্ত্রিকেরা মানবমনের এবং মানবসমাজের পঙ্কোদ্ধার করে সরস্বতীর মন্দিরে জড়ো করেছিলেন। রাধাকমলবাবু কি চান যে আমরাও তাই করি? গোলাপগাছের পক্ষে লিলি প্রসব করবার প্রয়াসটি যে একেবারেই ব্যর্থ শুধু তাই নয়, মাটি হতে রস সঞ্চয় না করে আলোক ও বাতাসের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত করে সে গোলাপও ফোটাতে পারবে না, কেননা ওরূপ ব্যবহার করলে গোলাপগাছ দুদিনেই দেহত্যাগ করতে বাধ্য হবে।

গাছের ফুল আকাশে ফোটে কিন্তু তার মূল যে মাটিতে আবদ্ধ, সে কথা আমরা সকলেই জানি; সুতরাং কবিতার ফুল ফুটলেই আমরা ধরে নিতে পারি যে মনোজগতে কোথাও-না-কোথাও তার মূল আছে। কিন্তু সে মূল ব্যক্তিবিশেষের মনে নিহিত নয়, সমাজের মনে নিহিত, এই হচ্ছে নূতন মত। এ মত গ্রাহ্য করবার প্রধান অন্তরায় এই যে, সামাজিক মন বলে কোনো বস্তু নেই; ও পদার্থ হচ্ছে ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যাব্‌সট্র্যাক্‌শন।

সে যাই হোক, রাধাকমলবাবু এই সহজ সত্যটি উপেক্ষা করেছেন যে, গোলাপের গাছে অবশ্য লিলি ফোটে না কিন্তু একই ক্ষেত্রে গোলাপও জন্মে লিলিও জন্মে। স্বদেশের ক্ষেত্রেও যে বিদেশী ফুলের আবাদ করা যায়, তার প্রমাণ স্বয়ং গোলাপ। পারস্যদেশের ফুল আজ ভারতবর্ষের ফুলের রাজ্যে গৌরব এবং সৌরভের সহিত নবাবি করছে।

বহির্জগতে যদি এক ক্ষেত্রে নানা ফুল ফোটে, তা হলে মনোজগতের যে-কোনো ক্ষেত্রে অসংখ্য বিভিন্নজাতীয় ফুল ফোটবার কথা। কেননা, খুব সম্ভব মনোজগতের ভূগোল আমাদের পরিচিত ভূগোলের অনুরূপ নয়। সে জগতে দেশভেদ থাকলেও পরস্পরের মধ্যে অন্তত অলঙ্ঘ্য পাহাড়পর্বতের ব্যবধান নেই, এবং মানুষের-হাতে-গড়া সে রাজ্যের সীমান্ত-দুর্গসকল এ যুগে নিত্য ভেঙে পড়ছে।

ভাবের বীজ হাওয়ায় ওড়ে এবং সকল দেশেই অনুকূল মনের ভিতর সমান অঙ্কুরিত হয়। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে লিলি ফুটলে আঁতকে ওঠবার কোনো কারণ নেই। রাধাকমলবাবু বলেছেন—

জাতীয় মনের ক্ষেত্র হইতেই কবির মন রস সঞ্চয় করে।

যদি এ কথা সত্য হয় তা হলে যদি কোনো কাব্য শুষ্ক কাষ্ঠ মাত্র হয় তা হলে তার জন্য কবি দায়ী নন, দায়ী হচ্ছে সামাজিক মন। জাতীয় মন যদি নীরস হয় তা হলে কাব্য কোথা হতে রস সঞ্চয় করবে? উপমান্তরে দেশমাতার স্তনে যদি দুগ্ধ না থাকে তা হলে তাঁর কবিপুত্রকে যে পেঁচোয় পাবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

কিন্তু রাধাকমলবাবুর এ মত সম্পূর্ণ সত্য নয়। কবির মনের সঙ্গে জাতীয় মনের যোগাযোগ থাকলেও কবিপ্রতিভা সামাজিক মনের সম্পূর্ণ অধীন নয়।

রাধাকমলবাবু উদ্ভিদ্‌জগৎ হতে যে উপমা দিয়েছেন, ইউরোপে ঘোর মেটিরিয়ালিজমের যুগে ঐ উপমাটি জড়জগৎ ও মনোজগতের মধ্যে যোগসাধনের সেতুস্বরূপ ব্যবহৃত হত। মাটি জল আলো ও বাতাস প্রভৃতির যোগাযোগে জীব সৃষ্ট হয়েছে এবং জীবের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে তার মনের সৃষ্টি হয়েছে, এই বিশ্বাস-বশতই ইউরোপের একদল বস্তুতান্ত্রিক-দার্শনিক ধর্ম কাব্য আর্ট নীতি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ব্যাপারসকলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, ওরূপ ব্যাখ্যায় পারিপার্শ্বিক অবস্থারই বর্ণনা করা হয়েছিল, কাব্য প্রভৃতির বিশেষধর্মের কোনো পরিচয় দেওয়া হয় নি। দার্শনিক ভাষায় বলতে গেলে, তাঁরা কাব্যের উপাদান-কারণকে তার নিমিত্ত-কারণ বলে ভুল করেন। তাঁরা বাহ্যশক্তিতে বিশ্বাস করতেন, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করতেন না ; সুতরাং তাঁদের মতে কবির আত্মশক্তি নয়, পারিপার্শ্বিক সমাজের বাহ্যশক্তিই কাব্যের উৎপত্তির কারণ বলে স্থিরীকৃত হয়েছিল। কবিতার জন্ম ও কবির জন্মবৃত্তান্ত যে স্বতন্ত্র, এই সত্য উপেক্ষা করবার দরুন সাহিত্যতত্ত্ব সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভূত হয়ে পড়েছিল।

রাধাকমলবাবুর বস্তুতন্ত্রতা ইউরোপের গত শতাব্দীর মেটিরিয়ালিজমের অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি বই আর কিছু নয়।

আসল কথা এই যে, প্রতি কবির মন এক-একটি স্বতন্ত্র রসের উৎস। কবির কার্য হচ্ছে সামাজিক মনকে সরস করা। কবির মনের সঙ্গে অবশ্য সামাজিক মনের আদান-প্রদানের সম্পর্ক আছে। কবি কিন্তু সমাজের নিকট হতে যা গ্রহণ করেন সমাজকে তার চাইতে ঢের বেশি দান করেন। যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, কবি এই অতিরিক্ত রস কোথা হতে সংগ্রহ করেন? তার উত্তরে আমরা বলব, আধ্যাত্মিক জগৎ হতে; সে জগৎ অবাস্তবও নয় এবং তা কোনো পরম ব্যোমেতেও অবস্থিতি করে না। সে জগৎ আমাদের সত্তার মূলে ও ফুলে সমান বিদ্যমান। কারণ আত্মা হচ্ছে সেই বস্তু—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্‌ বাচো হ বাচম্‌।
স উ প্রাণস্য প্রাণঃ...॥

রামানুজ বলেন, আমরা বন্ধমুক্ত জীব। আমাদের মন যে অংশে এবং যে পরিমাণে

বহির্জগতের অধীন, সেই অংশে এবং সেই পরিমাণে তা বন্ধ; এবং যে অংশে ও যে পরিমাণে তা স্বাধীন সে অংশে ও সে পরিমাণে তা মুক্ত। আমরা যখন বহির্জগতের সত্যসুন্দরমঙ্গলের কেবলমাত্র দ্রষ্টা, তখন আমরা বন্ধ জীব; এবং আমরা যখন নূতন সত্যসুন্দরমঙ্গলের স্রষ্টা, তখন আমরা মুক্ত জীব। যাঁর স্বাধীনতা নেই তাঁর সাহিত্যে কোনো কিছুরই সৃষ্টি করবার ক্ষমতা নেই। তিনি বড়োজোর বিশ্বের রিপোর্টার হতে পারেন, তার বেশি নয়। ধর্মপ্রবর্তক কবি আর্টিস্ট প্রভৃতিই মানবের যথার্থ শিক্ষক, কেননা তাঁরাই মানবসমাজে নূতন প্রাণের সঞ্চার করেন। এই কারণে যিনি যথার্থ কবি তিনি সমাজের ফরমায়েশ খাটতে পারেন না, তার জন্য যদি তাঁকে আত্মম্ভরি বল তাতে তিনি আত্মনির্ভরতা ত্যাগ করবেন না। যে দেশে আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করাই সাধনার চরম লক্ষ্য বলে গণ্য, সে দেশে কবিকে আত্মতান্ত্রিক বলে নিন্দা করা বড়োই আশ্চর্যের বিষয়।

৪

দেশকালের ভিতর সম্পূর্ণ বন্ধ না করতে পারলে অবশ্য জড়বস্তুর সঙ্গে মানবমনের ঐক্য প্রমাণ করা যায় না। মেটিরিয়ালিজমের পাকা ভিতের উপর খাড়া না করলে রিয়ালিজমের গোড়ায় গলদ থেকে যায়। অতএব রাধাকমলবাবু কবিপ্রতিভাকে কেবলমাত্র স্বদেশ নয়, স্বকালেরও সম্পূর্ণ অধীন করতে চান। তিনি বলেন—

> সাহিত্যের চরম সাধনা হইয়াছে যুগধর্ম প্রকাশ করা, নবযুগ আনয়ন করা।

যদি তাই সত্য হয়, তা হলে মহাভারতাদি ব্যতীত অপর কোনো কাব্য স্বদেশী এবং জাতীয় নয়, এ কথা বলবার সার্থকতা কি? ও-জাতীয় কাব্য আমরা রচনা করতে পারি নে, কেননা আমরা ত্রেতা কিংবা দ্বাপর যুগের লোক নই। ন্যাশনাল এপিক রচনা করা এ যুগে অসম্ভব, কেননা ও-সকল মহাকাব্যকে অপৌরুষেয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ সাহিত্য কোনো-এক ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয় নি। যুগে যুগে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েই ভারতী-কথা মহাভারতে পরিণত হয়েছে। যুগধর্ম যাই হোক, কোনো অতীত যুগের পুনরাবৃত্তি করা কোনো যুগেরই ধর্ম নয়।

যদি যুগধর্ম অনুসরণ করতে হয়, তা হলে এ যুগে কবিদের পক্ষে বিদেশী এবং বিজাতীয় ভাববর্জিত সাহিত্য রচনা করা অসম্ভব, কেননা আমরা বাংলার মাটিতে বাস করলেও বিলাতের আবহাওয়ায় বাস করি। আমাদের মনের নবদ্বার দিয়ে ইউরোপীয় মনোভাব অহর্নিশি আমাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করছে। কাজেই যুগধর্ম অনুসারে আমরা আমাদের সাহিত্যে একটি নব এবং মিশ্র মনোভাব প্রকাশ করে থাকি। আমাদের সাহিত্যের গুণও এই, দোষও এই।

এ সাহিত্যের গুণাগুণ এই দেশী-বিলাতি মনোভাবের যথাযথ মিলনের উপর নির্ভর করে। দু ভাগ হাইড্রোজেনের সঙ্গে এক ভাগ অক্সিজেন মিশ্রিত হলে জলের সৃষ্টি হয়; যা পান করে মানবের পিপাসা নিবারণ হয়। অপর পক্ষে দু ভাগ অক্সিজেনের সঙ্গে এক ভাগ হাইড্রোজেন মিশ্রিত হলে যে বাষ্পের সৃষ্টি হয়,

তা নাকে-মুখে ঢুকলে হয়তো আমরা দম আটকে মারা যাই। শুধু তাই নয়, মাত্রা ঠিক থাকলেও হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনে মিলে জল হয় না, যদি না তাদের উভয়ের রাসায়নিক যোগ হয় অর্থাৎ যদি না ও-দুটি ধাতু পরস্পর পরস্পরের ভিতর সম্পূর্ণ অনুপ্রবিষ্ট হয়।

এই রাসায়নিক যোগসাধনের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য চাই। সুতরাং এই দেশী-বিলাতি ভাবের মিশ্রণে এ যুগের সাহিত্যে অমৃত ও বিষ দুইই রচিত হচ্ছে। যে মনের ভিতর আত্মার বৈদ্যুতিক তেজ আছে, সে মনে এ যুগের রাসায়নিক যোগ হয়; এবং যে মনে সে তেজ নেই, সেখানে এ দুই শুধু মিশে যায়, মিলে যায় না।

যুগধর্ম প্রকাশ করাই সাহিত্যের চরম সাধনা, এ কথা সত্য নয়। তার কারণ, প্রথমত, যুগধর্ম বলে কোনো যুগের একটিমাত্র বিশেষ ধর্ম নেই। একই যুগে নানা পরস্পরবিরোধী মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, মন-পদার্থটি কোনো বিশেষ কাল সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারে না। আত্মা এক অংশে কালের অধীন, অপর অংশে মুক্ত ও স্বাধীন। কাব্য ধর্ম আর্ট প্রভৃতি মুক্ত আত্মারই লীলা। সুতরাং ইতিহাস এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, প্রতি যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে সমসাময়িক যুগধর্ম পরীক্ষিত এবং বিচারিত হয়েছে।

নব যুগধর্ম আনয়ন করা যদি সাহিত্যের চরম সাধনা হয়, তা হলে সাহিত্য বর্তমান যুগধর্ম অতিক্রম করতে বাধ্য। যে আদর্শ সমাজে নেই, সে আদর্শের সাক্ষাৎ শুধু মনশ্চক্ষুতে পাওয়া যায় এবং জীবনে নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে হলে সমাজের দখলিস্বত্ববিশিষ্ট আদর্শের উচ্ছেদ করা দরকার, অর্থাৎ যুগধর্মের বিরোধী হওয়া আবশ্যক।

বার্নার্ড শ অবজ্ঞার সহিত বলেছেন যে তিনি 'art for art'এর দলের নন। তার কারণ, তিনি এবং তাঁর গুরু ইবসেন ইউরোপে সভ্যতার নবযুগ আনয়ন করাই জীবনের ব্রত করে তুলেছেন। এঁদের রচিত নাটকাদি যে সাহিত্য, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে সে যে কতটা তাঁদের মতের গুণে এবং কতটা তাঁদের আর্টের গুণে, তা আজকের দিনে বলা কঠিন। কেননা, তাঁরা যে সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করতে উদ্যত হয়েছেন, তার সঙ্গে সকলেরই সামাজিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে। এ কথা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, এ শ্রেণীর সাহিত্যে শক্তির অনুরূপ শ্রী নেই। সাহিত্যকে কোনো-একটি বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়স্বরূপ করে তুললে তাকে সংকীর্ণ করে ফেলা অনিবার্য। আমরা সামাজিক জীব, অতএব নূতন-পুরাতনের যুদ্ধেতে একপক্ষে-না-একপক্ষে আমাদের যোগ দিতেই হবে, কিন্তু আমাদের সমগ্র মনটিকে যদি আমরা এই যুদ্ধে নিয়োজিত করি তা হলে আমরা সনাতনের জ্ঞান হারাই। যা কোনো-একটি বিশেষ যুগের নয়, কিন্তু সকল যুগেরই হয় সত্য নয় সমস্যা, তাই হচ্ছে মানবমনের পক্ষে চিরপুরাতন ও চিরনূতন, এক কথায় সনাতন। এই সনাতনকে যদি রাধাকমল-বাবু নিত্যবস্তু বলেন, তা হলে সাহিত্যের যে নিত্যবস্তু আছে এ কথা আমি অস্বীকার করব না; কিন্তু ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিকেরা তা অগ্রাহ্য করবেন। একান্ত

বিষয়গত সাহিত্যের হাত থেকে মুক্তি লাভ করবার ইচ্ছা থেকেই 'art for art' মতের উৎপত্তি হয়েছে। কাব্য বল, ধর্ম বল, দর্শন বল, এ-সকল হচ্ছে বিষয়ে নির্লিপ্ত মনের ধর্ম। এই সত্য উপেক্ষা করার দরুন ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য প্রতিভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। রাধাকমলবাবু প্রমুখ লেখকদের বস্তুতান্ত্রিকতা যে ইউরোপের রিয়ালিজম্ ব্যতীত আর কিছুই নয়, তার প্রমাণস্বরূপ অয়কেন-বর্ণিত উক্ত মতের লক্ষণগুলি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। উক্ত জর্মান দার্শনিকের মত শিরোধার্য করতে রাধাকমলবাবুই যখন আমাদের আদেশ করেছেন, তখন সে মত অবশ্য তাঁর নিকট গ্রাহ্য হবে। অয়কেন বলেন যে, রিয়ালিজম্

প্রকৃতিকেই সব বলে ধরে নেয় এবং যে বস্তুর বাহির্জগতে অস্তিত্ব আছে তাই হচ্ছে একমাত্র বাস্তব।

এ দলের অধিকাংশ লোক, যা ইন্দ্রিয়গোচর তাই সত্য বলে গ্রাহ্য করেন এবং জনকতক আছেন, যাঁদের মতে বিশ্ব একটি যন্ত্র মাত্র এবং যেহেতু মাপজোখের সাহায্য ব্যতীত যন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং যে বস্তুকে মাপা যায় এবং ওজন করা যায় তাই হচ্ছে বাস্তব।

অর্থাৎ যা আঁকা যায় এবং যার আঁক-কষা যায় তাই একমাত্র সত্য। তার পর এ মতে—

ভাবরাজ্যে কোনোরূপ আইডিয়ালের অস্তিত্ব ভ্রান্তি মাত্র, কিন্তু নীতির রাজ্যে আইডিয়াল (আদর্শ) আছে এবং থাকা উচিত। কেননা এ মতে জ্ঞানের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সমাজ বহু ব্যক্তিকে জোড়া দিয়ে তৈরি একটি যন্ত্র মাত্র; আবার কর্মের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, তা একটি অর্গানিজম্ (অঙ্গী) এবং প্রতি ব্যক্তি তার অঙ্গ, অতএব ব্যক্তি-মাত্রেই সমাজের সম্পূর্ণ অধীন। স্বাধীনতা বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্ব বিশ্বেও নেই, মানবের অন্তরেও নেই। অথচ এ মতে রাজনীতি এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা-সাধনাই হচ্ছে পরম ধর্ম।

মানবসমাজকে হয় যন্ত্র নয় অঙ্গী স্বরূপে গ্রাহ্য করলে এবং মানবের আত্মার অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করলে এই যন্ত্রের অংশ অথবা এই অঙ্গীর অঙ্গ যে-ব্যক্তি তার অপর-সকল ধর্মকর্মের ন্যায় তার সাহিত্যরচনাও সম্পূর্ণ সমাজের অধীন, এবং সমাজ যখন অঙ্গী তখন তা অবশ্য সম্পূর্ণ যুগধর্মের অধীন এবং তার প্রতি অঙ্গও সেই একই যুগধর্মের অধীন। সুতরাং কোনো ব্যক্তির পক্ষে মনোজগতে যুগধর্ম অতিক্রম করবার চেষ্টা শুধু ধৃষ্টতা নয়, একেবারেই বাতুলতা। আমাদের দেশে যাঁরা বস্তুতন্ত্রতার ধুয়ো ধরেছেন, তাঁরা যে ইউরোপের এই জাতীয় রিয়া-লিজমের চর্বিতচর্বণ রোমন্থন করেছেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আমি অয়কেনের আর-একটি কথা উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধ শেষ করছি—

All spiritual creation possesses a superiority as compared with the age and liberates man from its compulsion, nay, it wages an unceasing struggle against all that belongs to the things of mere time.

যথার্থ কবির নিকট এ সত্য প্রত্যক্ষ; সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের চোখরাঙানি হেলায় উপেক্ষা করতে পারেন।

৫

আসল কথা, এ-সকল ন্যায়ের তর্কের সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ সার্থকতা নেই। অর্থহীন বস্তু কিংবা পদার্থহীন ভাব, এ দুয়ের কোনোটাই সাহিত্যের যথার্থ উপাদান নয়। রিয়ালিজমের পুতুলনাচ এবং আইডিয়ালিজমের ছায়াবাজি উভয়ই কাব্যে অগ্রাহ্য। কাব্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ। এবং যেহেতু জীবে চিৎ এবং জড় মিলিত হয়েছে, সে কারণ যা হয় বস্তুহীন নয় ভাবহীন তা কাব্য নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই একাধারে রিয়ালিস্ট এবং আইডিয়ালিস্ট; কি বহির্জগৎ কি মনোজগৎ দুয়ের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। তা ছাড়া কবির দৃষ্টি সাধারণ জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে।

The light that never was on land or sea—সেই আলোকে বিশ্বদর্শন করবার শক্তিকেই আমরা কবিপ্রতিভা বলি, কেননা সে জ্যোতি বাহ্যজগতে নেই, অন্তর্জগতেই তা আবির্ভূত হয়।

রিয়ালিজমের এই উচ্চবাচ্য ইউরোপীয় সাহিত্যেই যখন বিরক্তিজনক, তখন বাংলা সাহিত্যে তা একেবারেই অসহ্য। ইউরোপ বিজ্ঞানের বলে বস্তুজগতের উপর প্রভুত্ব করছে, অপর পক্ষে বৈজ্ঞানিক-দর্শন আমাদের মনের উপর প্রভুত্ব করছে। অর্থাৎ জড়বিজ্ঞানের যে অংশটি খাঁটি সেইটি ইউরোপের হাতে পড়েছে, এবং তার যে অংশটি ভুয়ো সেইটিই আমাদের মনে ধরেছে। ইউরোপ পঞ্চভূতকে তার দাসত্বে নিযুক্ত করেছে, আর আমরা তাদের পঞ্চদেবতা করে তোলবার চেষ্টায় আছি।

মাঘ ১৩২১

অভিভাষণ

উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত

আজ বাইশ বৎসর পূর্বে এই রাজশাহি শহরে আমি সর্বজনসমক্ষে সসংকোচে দুটি-চারিটি কথা বলি। আমার জীবনে সেই সর্বপ্রথম বক্তৃতা। কোনো দূর-ভবিষ্যতে আমি যে এই সভার মুখপাত্রস্বরূপে আবার আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব, সেদিন এ কথা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আজিকার ব্যাপারে যাঁহারা কর্মকর্তা সেদিনও তাঁহারাই কর্মকর্তা ছিলেন। মহারাজ নাটোর এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের উদ্‌যোগেই সে সভা আহূত হয়। এবং তাঁহাদের অনুরোধেই আমি সে সভার প্রধান বক্তা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদানুসরণ করি। এ সভারও পতির আসন রবীন্দ্রনাথের জন্যই রচিত হইয়াছিল; তাঁহার অনুপস্থিতিতে পূর্বোক্ত বন্ধুদ্বয়ের অনুরোধে এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়মত আমি তাঁহার ত্যক্ত এই রিক্ত আসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। যাঁহারা আমাকে প্রথমে আসরে নামান, তাঁহারাই আজ আমাকে এ আসরের প্রধান নায়ক সাজাইয়া খাড়া করিয়াছেন। এ পদ অধিকার করিবার আমার কোনোরূপ যোগ্যতা আছে কি না, সে বিচার তাঁহারাও করেন নাই, আমাকেও করিতে দেন নাই।

এ আসন গ্রহণ করিবার অধিকার যে আমার নাই, তাহা আমার নিকট অবিদিত নয়। আমি অবসরমত সাহিত্যচর্চা করি, কিন্তু সে গৃহকোণে এবং নির্জনে। বক্তা ও লেখক একজাতীয় জীব নন; ইঁহাদের পরস্পরের প্রকৃতিও ভিন্ন, রীতিও ভিন্ন। বক্তা চাহেন, তিনি শ্রোতার মন জবরদখল করেন; অপর পক্ষে লেখক পাঠকের মনের ভিতর অলক্ষিতে এবং ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে চাহেন। বক্তা শ্রোতার মনকে বিশ্রাম দেন না; লেখক পাঠকের অবসরের সাথি। অক্ষরের নীরব ভাষায় একটি অদৃশ্য শ্রোতার কানে কানে আমরা নানা ছলে নানা কথা বলিতে পারি; কিন্তু জনসমাজে আমাদের সহজেই বাক্‌রোধ হয়। যে বাণী সবুজ পত্রের আবডালে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে তাহা সূর্যের নগ্ন কিরণের স্পর্শে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। অথচ গুণীসমাজে সুপরিচিত হইবার লোভও আমাদের পুরামাত্রায় আছে। সাহিত্যের রঙ্গভূমিতে দর্শকের নয়ন-মন আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা নিত্য লালায়িত, অথচ লেখকের ভাগ্যে পাঠকের সাক্ষাৎকারলাভ ক্বচিৎ ঘটে। প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি এবং নিন্দার শিলাবৃষ্টি উভয়ই আমাদের শিরোধার্য, একমাত্র উপেক্ষাই আমাদের নিকট চির অসহ্য। সুতরাং সাহিত্য-সমাজে যথাযোগ্য আসন লাভ করাতেই আমরা কৃতার্থতা লাভ করি। দণ্ডী বলিয়াছেন যে—

ক্লেশে কবিত্বেঽপি জনাঃ কৃতশ্রমা
বিদগ্ধগোষ্ঠীষু বিহর্তুমীশতে।

আমাদের ন্যায় প্রতিভাবঞ্চিত লেখকদিগের সকল শ্রম বিদগ্ধগোষ্ঠীতে স্থানলাভ করাতেই সার্থক হয়।

অতএব অন্য কারণাভাবেও অন্তত দুদিনের জন্যও উত্তরবঙ্গের বিদগ্ধগোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতি হইবার লোভ সম্ভবত আমি সংবরণ করিতে পারিতাম না।

২

কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার বিশেষ করিয়া একটি নিজস্ব কারণ আছে, যাহার দরুন আমি স্বেচ্ছায় এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে এ আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। এ স্থলে কোনোরূপ বিনয়ের অভিনয় করা আমার অভিপ্রায় নয়। অযোগ্য ব্যক্তিকে উচ্চপদস্থ করা যে তাহাকে অপদস্থ করিবার অতি সহজ উপায়, এ জ্ঞান আমার আছে। এ সত্ত্বেও আমি যে আপনাদের সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি তাহার কারণ উত্তরবঙ্গের আহ্বান আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। আমার দেশ বলিতে আমি প্রথমত এই প্রদেশই বুঝি। বারেন্দ্র সমাজের সহিত আমার নাড়ির যোগ আছে, বরেন্দ্রভূমির প্রতি আমার রক্তের টান আছে। উত্তরবঙ্গের প্রতি আমার অনুরাগকে এক হিসাবে মৌলিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কেননা এই দেশের মাটিতেই এ দেহ গঠিত। আমার বিশ্বাস, বাস্তুভিটার প্রতি মানুষমাত্রেরই যে স্বাভাবিক টান আছে, সেই আদিম মনোভাবের অটল ভিত্তির উপরেই সভ্য মানবের স্বদেশবাৎসল্য প্রতিষ্ঠিত। অতীত-অনাগতের এই মিলনক্ষেত্রেই আমরা আমাদের আত্মার সহিত আমাদের পূর্বপুরুষদিগের আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় পাই। এই বাস্তুপ্রীতিই ক্রমে প্রসারলাভ করিয়া স্বদেশপ্রীতিতে পরিণত হয়। সুতরাং যে দেশের যে ভূভাগ আমাদের পূর্বপুরুষদিগের স্মৃতির সহিত একান্ত জড়িত, সে প্রদেশের প্রতি অন্তরের টান থাকা মানুষের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। আমার পারিবারিক পূর্বকাহিনী এই বরেন্দ্রমণ্ডলের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ। সে সীমা লঙ্ঘন করিয়া আমার জাতীয় পূর্বজন্মের স্মৃতি, আর্যাবর্ত দূরে থাক্, কান্যকুব্জেও গিয়া পৌঁছায় না। সুতরাং বরেন্দ্রভূমির প্রতি আমার যে প্রগাঢ় অনুরাগ আছে সে কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত। এবং সেই মজ্জাগত প্রীতিবশতই উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যপরিষৎ যে গুরুভার আমার মস্তকে ন্যস্ত করিয়াছেন, আমি তাহা বিনা আপত্তিতে নতশিরে গ্রহণ করিয়াছি।

৩

এই প্রসঙ্গে আমি এইরূপ প্রাদেশিক সাহিত্যসভার সার্থকতা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। কাহারো কাহারো মতে এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ পরিষদের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্য-সমাজেও প্রাদেশিকতার সৃষ্টি করা হয়। এ অভি-যোগের অর্থ আমি অদ্যাবধি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস,

বাংলাদেশে এই জাতীয় সভাসমিতির সংখ্যা যত বৃদ্ধিলাভ করিবে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। এবং আমার মতে এই-সকল প্রাদেশিক সাহিত্যসমিতির পক্ষে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করাই শ্রেয়। আমি শিক্ষা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে ডিসেণ্ট্রালাইজেশনের পক্ষপাতী। কোনো-একটি আদ্যপরিষদের শাসনাধীন থাকিলে প্রাদেশিক পরিষৎগুলি সম্যক্ স্ফূর্তি লাভ করিতে পারিবে না। আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের প্রধান ত্রুটি তাহার বৈচিত্র্যের অভাব। বঙ্গদেশের সহিত বঙ্গ সাহিত্যের সাক্ষাৎপরিচয় ঘটিলে এ অভাব দূর হইতে পারে। বঙ্গ সাহিত্যে আমি দক্ষিণবঙ্গের প্রাধান্য অস্বীকার করি না। আমার বিশ্বাস, এক ভাষার গুণে দক্ষিণবঙ্গ চিরকাল সে প্রাধান্য রক্ষা করিবে; সুতরাং উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের সাহিত্যপরিষদের প্রতি কোনোরূপ কটাক্ষপাত করা কলিকাতার পক্ষে সংগতও নহে, শোভনও নহে। বস্তুত সমগ্র বঙ্গ সাহিত্যের উপর নবনাগরিক-সাহিত্যের প্রভাব এত বেশি যে, আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যে প্রাদেশিকতার নামগন্ধও থাকে না। এমন-কি, কোনো হতভাগ্য লেখকের রচনা যদি নাগরিক মতে নাগরিকতা-দোষে দুষ্ট বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে সকল প্রদেশেই সে রচনা প্রাদেশিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

৪

উত্তরবঙ্গের বিরুদ্ধে আর-একটি অভিযোগ এই যে, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক আবিষ্কৃত বরেন্দ্রমণ্ডলের পূর্বগৌরবের নিদর্শনসকলের বলে উত্তরবঙ্গের মনে ঈষৎ অহংজ্ঞান জন্মলাভ করিয়াছে। এ কথা সত্য কি না তাহা আমি জানি না। যদিই বা উত্তরবঙ্গ তাহার অতীত-গৌরবে গৌরবান্বিত মনে করে তাহাতেই বা ক্ষতি কি। সমগ্র বঙ্গের আত্মসম্মান রক্ষা করিতে হইলে প্রদেশমাত্রেরই অহংকাব সুপ্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য।

কেহ কেহ বলেন যে, কোনোরূপ প্রদেশবাৎসল্যের প্রশ্রয় দেওয়া কর্তব্য নহে, কেননা ঐরূপ সংকীর্ণ মনোভাব উদার স্বদেশবাৎসল্যের প্রতিবন্ধক। আমি পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতেই আপনারা অনুমান করিতে পারেন যে, ইঁহারা যে মনোভাবকে সংকীর্ণ বলেন আমি তাহাকেই প্রকৃত উদার মনোভাবের ভিত্তিস্বরূপ জ্ঞান করি। যে স্থলে কোনো অংশের প্রতি প্রীতি নাই, সে স্থলে সমগ্রের প্রতি ভক্তির মূল কোথায় তাহা আমি খুঁজিয়া পাই না।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, যে-মনোভাবকে অতি উদার বলা হয় তাহার কোনোরূপ ভিত্তি নাই। বাংলাদেশের সহিত, বাংলার ইতিহাসের সহিত, বঙ্গ সাহিত্যের সহিত কিছুমাত্র পরিচয় নাই অথচ বঙ্গমাতার নামে মুগ্ধ, এইরূপ লোক আমাদের শিক্ষিত সমাজে বিরল নহে। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইঁহাদের প্রতাপ দুর্দান্ত এবং প্রতিপত্তি অসীম। এইরূপ উদার মনোভাবের অবলম্বন কোনো বস্তুবিশেষ নয়, কিন্তু একটি নাম মাত্র। এইরূপ স্বদেশপ্রীতির মূল হৃদয়ে নয়, মস্তিষ্কে। এইরূপ স্বদেশী মনোভাব বিদেশী পুস্তক হইতে সংগৃহীত। এইরূপ পুঁথিজাত এবং পুঁথিগত পেট্রিয়টিজমের সাহায্যে রাষ্ট্রগঠন করা যায় কি যায় না তাহা আমার

অবিদিত, কিন্তু সাহিত্য যে সৃষ্টি করা যায় না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। নামের মাহাত্ম্য আমি অস্বীকার করি না। সদলবলে উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তন করিতে করিতে মানুষে দশাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঐরূপ ক্ষণিক উত্তেজনার প্রসাদে পৃথিবীর কোনো কার্য সুসিদ্ধ হয় না। সিদ্ধি সাধনার অপেক্ষা রাখে এবং সাধনা স্থিরবুদ্ধির অপেক্ষা রাখে। সুতরাং তথাকথিত সংকীর্ণ প্রদেশবাৎসল্য যদি এই-জাতীয় উদার মনোভাবের বিরোধী হয়, তাহা হইলে এইরূপ সংকীর্ণ মনোভাবের চর্চা করা আমি একান্ত শ্রেয় মনে করি। কিন্তু আসলে এ-সকল অভিযোগের মূলে কোনো সত্য নাই। কেননা একমাত্র সাহিত্যই এ পৃথিবীতে মানবমনের সকলপ্রকার সংকীর্ণতার জাতশত্রু। জ্ঞানের প্রদীপ যেখানেই জ্বালো-না কেন, তাহার আলোক চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িবে; ভাবের ফুল যেখানেই ফুটুক-না কেন, তাহার গন্ধ দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। মনোজগতে বাতি জ্বালানো এবং ফুল ফোটানোই সাহিত্যের একমাত্র ধর্ম এবং একমাত্র কর্ম। কোনো জাতির মনের ঐক্য-সাধনের প্রধান উপায় সাহিত্য; কেননা ভাষার ঐক্যই জাতীয় ঐক্যের মূল। ভারতবর্ষ একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র হইতে পারে কিন্তু বাঙালি যে একটি বিশিষ্ট জাতি তাহার কারণ, এক-ভাষার বন্ধনে এ দেশের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, ব্রাহ্মণ শূদ্র হিন্দু মুসলমান সকলেই আবদ্ধ। সকলপ্রকার স্বার্থের বন্ধনের অপেক্ষা ভাষার বন্ধন দৃঢ়। এ বন্ধন ছিন্ন করিবার শক্তি কাহারো নাই, কেননা ভাষা অশরীরী। শব্দ বহির্জগতে ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মনোজগতে চিরস্থায়ী। এই চির-স্থায়ী ভিত্তির উপরই আমরা সরস্বতীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করি।

৫

যে সভার বিষয় পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি সেই সভাতে এই রাজশাহি শহরে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন যে, আমাদের স্কুল-কলেজে বঙ্গ ভাষার সম্যক্ চর্চা হওয়া একান্ত কর্তব্য এবং আমি সে প্রস্তাবের সমর্থন করি। বঙ্গসন্তানের শিক্ষা যতদূর সম্ভব বঙ্গ ভাষাতেই হওয়া সংগত, এরূপ প্রস্তাব সে যুগের শিক্ষিত লোকদের মনঃপূত হয় নাই। এ প্রস্তাব শুনিয়া অনেকে হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই, অনেকে আবার অসম্ভবরূপ বিরক্তও হইয়াছিলেন। এ প্রস্তাবের প্রতি যে সেকালে কতদূর অবজ্ঞা দেখানো হইয়াছিল তাহার প্রমাণ, প্রকাশ্যে কেহ এ কথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাও আবশ্যক মনে করেন নাই। কবির কবিত্ব এবং বিদূষকের ভাঁড়ামি সুবুদ্ধি চিরকালই হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। আজ মাতৃভাষার চর্চা করিতে বলিলে কাহারো ধৈর্যচ্যুতি হয় না, কেননা ইতিমধ্যে সে ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কোণে একটুখানি স্থান লাভ করিয়াছে। এমন-কি, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পাষাণমূর্তির পাদপীঠে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ করা হইয়াছে তাঁহার যত্নে এবং তাঁহার চেষ্টায়— The mother's tongue has been put in the step-mother's hall, অর্থাৎ বিমাতার আলয়ে মাতার রসনা স্থাপিত হইয়াছে। দেশসুদ্ধ লোক ইহা গৌরবের কথা মনে করিতেছেন। কিন্তু বিমাতার মন্দিরে

মাতৃভাষা যে অদ্যাপি যথাযোগ্য স্থান লাভ করেন নাই, ঐ বিমাতৃভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপিই তাহার পরিচয়। এবং উক্ত লিপি ইহাও প্রমাণ করিতেছে যে, ভাষাসম্বন্ধেও আত্মবশ হওয়াই সুখের এবং পরবশ হওয়াই দুঃখের কারণ। সত্য কথা এই যে, মাতৃভাষার সাহায্যেই আমরা যথার্থ ভাষাজ্ঞান লাভ করি এবং সে জ্ঞানের অভাবে আমরা পরভাষাও যথার্থরূপে আয়ত্ত করিতে পারি না। যেদিন আমাদের সকল বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা প্রাধান্য লাভ করিবে এবং ইংরাজি ভাষা দ্বিতীয় আসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে সেইদিন বঙ্গসন্তান যথার্থ শিক্ষালাভের অধিকারী হইবে।

একদিন যেমন বাংলা পড়িতে বলিলে অনেকে মনে প্রমাদ গনিতেন, আজ তেমনি বাংলা লিখিতে বলিলে অনেকে মনে প্রমাদ গনেন। সেকালে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, আমরা নবশিক্ষার আভিজাত্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি ; একালে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, আমরা নবসাহিত্যের আভি-জাত্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমাদের জাতীয় ভাষা যে এত হেয় যে, তাহার স্পর্শে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা সব মলিন হইয়া যায়, এ কথা বলায় বাঙালি অবশ্য তাঁহার আভিজাত্যের পরিচয় দেন না, পরিচয় দেন শুধু তাঁহার বিজাতীয় নবশিক্ষার। যে কারণেই হউক, অনেকে যে মাতৃভাষার পক্ষপাতী নহেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমি এই উপলক্ষেই পাইয়াছি। যেদিন আমি এই সভার সভাপতি নির্বাচিত হই সেদিন আমার কোনো শুভার্থী বন্ধু আমাকে সতর্ক করিয়া দেন যে, এ সভাস্থলে 'বীরবলী ঢঙ চলবে না'। যে-কোনো সভাতেই হউক-না কেন, বিদূষকের আসন যে, সভাপতির আসনের বহু নিম্নে সে জ্ঞান যে আমার আছে তাহা অবশ্য আমার বন্ধুর অবিদিত ছিল না। অপর পক্ষে আমার উপর তাঁহার এ ভরসাটুকুও ছিল যে, এই সুযোগে আমি এই উচ্চ আসন হইতে সভার গায়ে বীরবলিক্ অ্যাসিড নিক্ষেপ করিব না। আসলে তিনি এ ক্ষেত্রে আমাকে বীর-বলের ভাষা ত্যাগ করিতেই পরামর্শ দিয়াছিলেন, কেননা সে ভাষা আটপহুরে, পোশাকি নয়। সভ্যসমাজে উপস্থিত হইতে হইলে সমাজসম্মত ভদ্রবেশ ধারণ করাই সংগত, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সে বেশ যতই অনভ্যস্ত হউক-না কেন। আমি তাঁহার পরামর্শ অনুসারে 'পররুচি পরনা'— এই বাক্য শিরোধার্য করিয়া এ যাত্রা সাধুভাষাই অঙ্গীকার করিয়াছি। কেননা সাধুভাষা যে ধোপদুরস্ত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ইহাতে একটুও রঙ নাই এবং অনেকখানি মাড় আছে, ফলে ইহা স্বতই ফুলিয়াও উঠে এবং খড়খড়ও করে। আশা করি, এ সন্দেহ কেহ করিবেন না যে, এই বেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মতেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সময়োচিত বেশ ধারণ করা আমাদের সমাজের সনাতন প্রথা। আমরা কৈশোরের প্রারম্ভে অন্তত তিনদিনের জন্যও কর্ণে সুবর্ণকুণ্ডল এবং দেহে গৈরিক বসন ধারণ করিয়া মুণ্ডিতমস্তকে ঝুলি-স্কন্ধে দণ্ডহস্তে নগ্নপদে ভিক্ষা মাগি। এই আমাদের প্রথম সংস্কার। তাহার পর যৌবনের প্রারম্ভে অন্তত একদিনের জন্যও আমরা রাজবেশ ধারণ করিয়া তক্ত-রাঙায় চড়িয়া ঢাকঢোল বাজাইয়া পাত্রমিত্র-সমভিব্যাহারে কনে নামক একটি অবলা প্রাণীর গৃহাভিমুখে রণযাত্রা করি। ইহাই

আমাদের দ্বিতীয় সংস্কার। আমরা যখন রাজাও সাজিতে জানি, ব্রহ্মচারীও সাজিতে জানি, তখন সভ্য সাজা তো আমাদের পক্ষে অতি সহজ। জীবনে সভ্যতার সাজ খোলাই কঠিন, পরা সহজ।

৬

ভাষা সাহিত্যের মূল উপাদান, সুতরাং সাহিত্যপরিষদে ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। লেখকেরা ভাষার সৌন্দর্যের দ্বারাই পাঠকের মনোরঞ্জন করেন এবং ভাষার শক্তির দ্বারাই পাঠকের মন হরণ করেন। কাজেই কোনো লেখক আর সাধ করিয়া শ্রীহীন এবং শক্তিহীন ভাষা ব্যবহার করেন না। আমরা যে লেখায় মৌখিক ভাষার পক্ষপাতী তাহার কারণ, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের মাতৃভাষা রূপে-যৌবনে তথাকথিত সাধুভাষা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কথা আমি নানা সময়ে নানা স্থানে নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছি। আত্মমত সমর্থনের জন্য কখনো বা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, বিরুদ্ধমত খণ্ডনের জন্য কখনো বা তাহার উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছি। এ স্থলে সে-সকল কথার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা, পুনরুক্তি ওকালতিতে যে পরিমাণে সার্থক, সাহিত্যে সেই পরিমাণে নিরর্থক।

আপাতত আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে এই সাধুভাষার জন্মবৃত্তান্তের পরিচয় দিতেছি, তাহা হইতেই আপনারা অনুমান করিতে পারিবেন যে ইহার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবার চেষ্টা কেবলমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা কি আর-কিছু।

বাংলার প্রাচীন সাহিত্য আছে— কিন্তু সে সাহিত্য পদ্যে রচিত, গদ্যে নয়। আজ প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে আমাদের গদ্যসাহিত্য জন্মলাভ করে, এবং সাধুতা এই সাহিত্যেরই ধর্ম। শতবর্ষ পরমায়ু, বিধির এই নিয়মানুসারে এ সাহিত্যের এখন পরিণত দেহ ত্যাগ করিয়া নবকলেবর ধারণ করা উচিত।

সে যাহা হউক, এ সাহিত্য জাতীয় মন হইতে গড়িয়া উঠে নাই। ইংরেজ রাজপুরুষদের ফরমায়েশে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কর্তৃক নিতান্ত অযত্নে ইহা গঠিত হইয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার কালের হিসাব এবং ক্ষমতার হিসাব, দুই হিসাবেই এই শ্রেণীর লেখকদিগের অগ্রগণ্য। তাঁহার রচিত প্রবোধচন্দ্রিকা ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'প্রবোধচন্দ্রিকায়াং প্রথমস্তবকে মুখবন্ধে ভাষাপ্রশংসানাম প্রথম কুসুমং'-এর শেষাংশে লিখিত আছে যে—

গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত প্রবোধচন্দ্রিকা নামে গ্রন্থ রচিতেছেন।...

বঙ্গ ভাষা সম্বন্ধে বিদ্যালংকারমহাশয়ের ধারণা কিরূপ ছিল তাহার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়াছেন—

অস্মদাদির ভাষার যুগপৎ বৈখরীরূপতামাত্র প্রতীতি সে উচ্চারণক্রিয়ার অতিশীঘ্রতা-প্রযুক্ত উপর্যধোভাবাবস্থিত কোমলতর-বহুল-কমলদল সূচীবেধন ক্রিয়ার মত। এতদ্রূপে প্রবর্তমান সকল ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা উত্তমা, বহুবর্ণময়ত্বপ্রযুক্ত একবর্ণাক্ষর পশুপক্ষি-

ভাষা হইতে বহুতরাক্ষর মনুষ্যভাষার মত ইত্যনুমানে সংস্কৃত ভাষা সর্বোত্তমা ইহা নিশ্চয়।

উক্ত ভাষা যে অস্মদাদির ভাষা নহে, তাহা বলা বাহুল্য। এবং এই ভাষায় অভিনব যুবক সাহেবজাতেরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে কোনোই দুঃখ নাই; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অভিনব যুবক বঙ্গজাতেরাও যুগে যুগে এইরূপ ভাষা উত্তমা ভাষা হিসাবে শিক্ষা করিয়াছেন। কেননা এই রচনাই সাধুভাষার প্রথম সংস্করণ, এবং বিলাতি ছাপাখানার ছাপমারা এই ভাষাই কালক্রমে অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হইয়া আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত হইয়াছে। ইহার জন্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলীকে আমি দোষী করি না। তাঁহাদের বঙ্গ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিবার কোনোরূপ অভিপ্রায় ছিল না; কেননা দেশী ভাষায় যে কোনো-রূপ শাস্ত্র রচিত হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের ধারণার বহির্ভূত ছিল।

ফলত, এ-সকল বিদ্যালংকারমহাশয়ের নিজের রচনা নহে। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যকে ছন্দোমুক্ত এবং বিভক্তিচ্যুত করিয়া বিদ্যালংকার-মহাশয় এই কিম্ভূতকিমাকার গদ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপ রচনায় কোনো-রূপ যত্ন কোনোরূপ পরিশ্রমের লেশমাত্রও নিদর্শন নাই। বিদ্যালংকারমহাশয় নিজে কখনোই এরূপ রচনাকে গদ্যের আদর্শ মনে করেন নাই। সংস্কৃত পদ্যের ছন্দঃপাত করিলে তাহা যে বাংলা গদ্যে পরিণত হয়, এরূপ ধারণা যে তাঁহার মনে ছিল, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। কেননা তিনি এক দিকে যেমন সাধুভাষার আদি লেখক, অপর দিকেও তিনি তেমনি চলতি ভাষারও আদর্শ লেখক। নিম্নে তাঁহার চলতি ভাষার নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

মোরা চাস্ করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো ছেলেপিলাগুলিণ পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মসুর শাক পাত শামুক গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কণ্টী তুষ ও বিলঘুটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কাপাস তুলি তুলা করি ফুড়ী পিঁজী পাইজ করি চরকাতে সুতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাটে ঘাটে বেড়াইয়া ফলফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাতায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পোণেক দশ গণ্ডা যা পাই। ও মিন্সা পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস্ খাটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পায় তাহাতে তাঁতির বাণী দি ও তেল লুণ করি কাটনা কাটি ভাড়া ভানি ধান কুড়াই ও সিজাই শুকাই ভানি খুদ কুঁড়া ফেণ আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই সে দিন তো জন্মতিথি।... শীতের দিনে কাঁথা খানী ছালিয়া গুলিকের গায় দি আপনারা দুই প্রাণী বিচালি বিছাইয়া পোয়ালের বিঁড়ায় মাতা দিয়া মেলের মাদুর গায় দিয়া শুই। বাসন গহনা কখন চক্ষেও দেখিতে পাই না যদি কখন পাথরায় খাইতে পাই ও রাঙ্গা তালের পাতা কাণে পরিতে ও পুঁতির মালা গলায় পরিতে ও রাঙ্গ সীসা পিতলের বালা তাড় মল খাড়ু গায় পরিতে পাই তবেতো রাজরাণী হই। এ দুঃখেও দুরন্ত রাজা হাজা শুকা হইলেও আপন রাজস্বের কড়া গণ্ডা ক্রান্তি বট ধূল ছাড়ে না এক আদ দিন আগে পাছে সহে না। যদ্যপিস্যাৎ কখন হয় তবে তার সুদ দাম২ বুঝিয়া লয় কড়া কপর্দকও ছাড়ে না। যদি দিবার যোত্র না হয় তবে সানা মোড়ল পাটোয়ারি ইজারদার তালুকদার জমীদারেরা পাইক

পেয়াদা পাঠাইয়া হাল যোয়াল ফাল হালিয়া বলদ দামড়া গরু বাছুর বক্‌না কাঁথা পাতরা চুপড়ী কুলা ধুচনীপর্যন্ত বেচিয়া গোবাড়িয়া করিয়া পিটিয়া সর্বস্ব লয়। মহাজনের দশগুণ সুদ দিয়াও মূল আদায় করিতে পারি না কতো বা সাধ্য সাধনা করি হাতে ধরি পায় পড়ি হাত জুড়ি দাঁতে কুটা করি। হে ঈশ্বর দুঃখির উপরেই দুঃখ ওরে পোড়া বিধাতা আমাদের কপালে এত দুঃখ লেখিস্‌ তোর কি ভাতের পাতে আমরাই ছাই দিয়াছি।

এ ভাষা অস্মদীয় ভাষা হউক আর না হউক, ইহা যে খাঁটি বাংলা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ ভাষা সজীব সতেজ সরল স্বচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গতি মুক্ত, ইহার শরীরে লেশমাত্র জড়তা নাই। এবং এ ভাষা যে সাহিত্যরচনার উপযোগী, উপরোক্ত নমুনাই তাহার প্রমাণ। এই ভাষার গুণেই বিদ্যালংকারমহাশয়ের রচিত পল্লীচিত্র পাঠকের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। এ বর্ণনাটি সাধুভাষায় অনুবাদ কর, ছবিটি অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। অপর পক্ষে বিদ্যালংকারমহাশয়ের ভাষা সম্বন্ধে পূর্বোদ্ধৃত উক্তিটি ভাষায় অনুবাদ কর, তাঁহার বক্তব্য কথা সুস্পষ্ট হইয়া আসিবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের পূর্ববর্তী লেখকেরা যদি বিদ্যালংকার-মহাশয়ের রচনার এই বঙ্গীয় রীতি অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে কালক্রমে এই ভাষা সুসংস্কৃত এবং পুষ্ট হইয়া আমাদের সাহিত্যের শ্রী বৃদ্ধি করিত। কিন্তু তাঁহারা বিদ্যালংকারমহাশয়ের গৌড়ীয় রীতিকেই গ্রাহ্য করিয়া তাহাকে সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পণ্ডিতগণের ত্যক্ত দায় আমরা উত্তরাধিকারীস্বত্বে লাভ করিয়া অদ্যাপি তাহাই ভোগদখল করিয়া আসিতেছি। প্রবোধচন্দ্রিকার তৃতীয় স্তবকের কুসুমগুলি মেঠো হইলেও স্বদেশী ফুল। আর প্রথম স্তবকের কুসুমগুলি শুধু কাগজের নয়, তুলোট কাগজের ফুল। আবাদ করিতে জানিলে কাঠগোলাপ বসরাই গোলাপে পরিণত হয়। কিন্তু কালের কবলে ছিন্নভিন্ন বিবর্ণ হওয়া ব্যতীত কাগজের ফুলের গত্যন্তর নাই।

৭

কাহারো কাহারো বিশ্বাস যে, এই দুই ভাষার মিলনসূত্রেই বর্তমান সাধুভাষা জন্মলাভ করিয়াছে। কিন্তু আমার ধারণা অন্যরূপ। বর্ণে ও গঠনে এই দুই ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক্‌ জাতীয়, সুতরাং ইহাদের যোগাযোগে কোনোরূপ নূতন পদার্থের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। বহুকাল যাবৎ এ দুই পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবেই চর্চা করা হইয়াছিল। একের পরিণতি কালী সিংহ মহাশয়ের মহাভারতে, অপরের পরিণতি তাঁহার হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায়। ইহার কারণও স্পষ্ট। হুতোমি ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করা মূর্খতা এবং মহাভারতের ভাষায় সামাজিক নক্‌শা রচনা করা ছন্নতা মাত্র।

যে ভাষা আসলে এক, জোর করিয়া তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এই দুই ভাষা রচিত হয়। সে ভাঙা জোড়া লাগাইবার চেষ্টা বৃথা। আমাদের মৌখিক ভাষা নিছক চাষার ভাষাও নহে, নিটোল সংস্কৃতও নহে। আমাদের মুখের ভাষায় বহু তৎসম শব্দ এবং বহু তদ্ভব শব্দ আছে। দেশীয় শব্দও যে নাই তাহা নহে,

তবে তাহাদের সংখ্যা এত অল্প যে নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হয় তৎসম নয় তদ্ভব শব্দ বর্জন করিয়া বাংলা লেখার অর্থ ভাষার উপর অত্যাচার করা; অকারণে অযথারূপে তাহাকে হয় স্ফীত করিয়া তোলা, নয় শীর্ণ করিয়া ফেলা। সুতরাং এ দুই পথের ভিতর কোনো মধ্যপথ রচনা করিবার কোনো আবশ্যকতা ছিল না; কেননা সে মধ্যপথ তো চিরকালই আমাদের মুখস্থ ছিল। বঙ্গ ভাষা সংস্কৃতের ভার কতদূর সয়, মৌখিক ভাষার প্রতি কর্ণপাত করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এ জ্ঞান আর কাহারো থাক্ আর নাই থাক্, রামমোহন রায়ের ছিল।

৮

তিনি তাঁহার বেদান্তগ্রন্থের (খৃ ১৮১৫) 'অনুষ্ঠানে' লিখিয়াছেন যে—

প্রথমত বাংগলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল কথকগুলিন শব্দ আছে এভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের [sentence] অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয় অতএব বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ ২ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পাবেন এনিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদেব অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক..

সকল দেশেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথোপকথনের ভাষার যে ঐশ্বর্য আছে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাষার তাহা নাই। সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা ধনে ও মনে সমান দরিদ্র। তাহাদের জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ এবং ভাষাও সংকীর্ণ। যদি ভদ্রসমাজের মৌখিক ভাষা সাধুভাষা হয়, তাহা হইলে সাধুভাষাই সাহিত্যের একমাত্র উপযোগী ভাষা। এ স্থলে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, লৌকিক ভাষা এই সাধুভাষার অন্তর্ভূত, বহির্ভূত নয়। রামমোহন রায় যাহাকে 'গৃহব্যাপার নির্বাহের যোগ্য' শব্দ বলেন সেই শব্দসমূহই সকল ভাষার মূলধন।

রামমোহন রায় বলিয়াছেন যে, এ ভাষা সংস্কৃতের অধীন। এ কথাও আমরা মানিতে বাধ্য। কিন্তু সে অধীনতা অভিধানের অধীনতা, ব্যাকরণের নয়; এই সত্যটি মনে রাখিলে ব্যাকরণ আমাদের নিকট বিভীষিকা হইয়া দাঁড়ায় না। ভাষার স্বাতন্ত্র্য যে তাহার গঠনের উপর নির্ভর করে এ সত্য রামমোহন রায়ের নিকট অবিদিত ছিল না। তাঁহার মতে—

...ভিন্ন ২ দেশীয় শব্দের বর্ণগত নিয়ম ও বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি যে গ্রন্থের অভিধেয় হয়, তাহাকে সেই ২ দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ কহা যায়।

অতএব এক ভাষা অপর ভাষার ব্যাকরণের অধীন হইতে পারে না।

আমরা যখন দৈনিক জীবনের অন্নবস্ত্রের সুখদুঃখের অতিরিক্ত কোনো বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তখন সংস্কৃত অভিধানের আশ্রয় লওয়া ব্যতীত আমাদের

উপায়ান্তর নাই। নানা ভাষার মধ্যে শব্দের পরস্পর আদান-প্রদান আবহমানকাল সভ্যসমাজে চলিয়া আসিতেছে। আবশ্যকমত ঐরূপ শব্দ আত্মসাৎ করায় ভাষার কান্তি পুষ্ট হয়, স্বরূপ নষ্ট হয় না। নিতান্ত বাধ্য না হইলে এ কাজ করা উচিত নয়, কেননা পরভাষার শব্দ আহরণ কিংবা হরণ করা সর্বত্র নিরাপদ নহে। শব্দের আভিধানিক অর্থ তাহার সম্পূর্ণ অর্থ নয়, আভিধানিক অর্থে ভাবের আকার থাকিলেও তাহার ইঙ্গিত থাকে না। লৌকিক শব্দের আদ্যোপান্ত বর্জন এবং অপর ভাষার অন্বয়ের অনুকরণেই ভাষার জাতি নষ্ট হয়। মৌখিক ভাষার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিবার জো নাই। সুতরাং শিক্ষিত লোকের সকল অত্যাচার লিখিত ভাষাকেই নীরবে সহ্য করিতে হয়।

রামমোহন রায় যে মৌখিক ভাষার উপরেই তাঁহার রচনার ভাষা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার ব্যবহৃত পদসকল অবৈধসন্ধিবন্ধ কিংবা সমাস-বিড়ম্বিত নহে। তিনি জানিতেন যে—

সংস্কৃত সন্ধিপ্রকরণ ভাষায় উপস্থিত করিলে, তাবৎ গুণদায়ক না হইয়া বরঞ্চ আক্ষেপের কারণ হয়; .

সমাস সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে—

এইরূপ পদ গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্যমতে ব্যবহারে আইসে না।

তাঁহার মতে 'হাতভাঙা' 'গাছপাকা' প্রভৃতি পদই বাংলা সমাসের উদাহরণ। তাঁহার পরবর্তী লেখকেরা যদি এই সত্যটি বিস্মৃত না হইতেন তবে তাঁহারা বাংলা সাহিত্যকে সংস্কৃতের জাগ দিয়া পাকাইতে চাহিতেন না এবং হাতভাঙা পরিশ্রম করিয়া দাঁতভাঙা সমাসের সৃষ্টি করিতেন না। তিনি মৌখিক ভাষার সহজ সাধুত্ব গ্রাহ্য করিয়াছিলেন বলিয়া বানান-সমস্যারও অতি সহজ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে খাঁটি সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত রীতি-অনুসারেই লিখিত হওয়া কর্তব্য এবং তদ্ভব ও দেশীয় শব্দের বানান তাহার উচ্চারণের অনুরূপ হওয়া কর্তব্য। অর্থাৎ যে স্থলে শ্রুতিতে-স্মৃতিতে বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধে স্মৃতি মান্য এবং বাংলা শব্দ সম্বন্ধে শ্রুতি মান্য। রামমোহন রায় বঙ্গ সাহিত্যের যে সহজ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন সকলে যদি সেই পথের পথিক হইতেন তাহা হইলে আমাদের কোনোরূপ আক্ষেপের কারণ থাকিত না।

কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গ সাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনাপদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য, আমরা যাহাকে modern prose বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়। সুতরাং আমাদের দেশে ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যে পণ্ডিত যুগের অবসান হইল এবং ইংরেজি যুগের সূত্রপাত হইল। ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শেই আমরা বঙ্গ সাহিত্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মিল্টন না পড়িলে বাঙালি মেঘনাদবধ লিখিত না, স্কট না পড়িলে দুর্গেশনন্দিনী লিখিত না এবং বায়রন না পড়িলে পলাশীর যুদ্ধ লিখিত না। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বঙ্গ সাহিত্য ইংরেজি সাহিত্যের একান্ত অধীন হইয়া পড়িল। ফলে বঙ্গ

সাহিত্য তাহার স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ আবার হারাইয়া বসিল। এই ইংরেজিনবিশ লেখকদিগের হস্তে বঙ্গ ভাষা এক নূতন মূর্তি ধারণ করিল। সংস্কৃতের অনুবাদ যেমন পণ্ডিতদিগের মতে সাধুভাষা বলিয়া গণ্য হইত, ইংরেজির কথায় কথায় অনুবাদ তেমনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সাধুভাষা বলিয়া গণ্য হইল। এই অনুবাদের ফলে এমন বহু শব্দের সৃষ্টি করা হইল যাহা বাঙালির মুখেও নাই এবং সংস্কৃত অভিধানেও নাই। এবং এই-সকল কষ্টকল্পিত পদই এখন বঙ্গ সাহিত্যের প্রধান সম্বল। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই-সকল নব শব্দ গড়িবার কোনোই আবশ্যকতা ছিল না। সংস্কৃত দর্শনে বিজ্ঞানে কাব্যে অলংকারে যথেষ্ট শব্দ আছে, যাহার সাহায্যে আমরা আমাদিগের নবশিক্ষালব্ধ সকল মনোভাব বঙ্গ ভাষার জাতি ও প্রকৃতি রক্ষা করিয়া অনায়াসে ব্যক্ত করিতে পারি। আমরা তথাকথিত সাধুভাষার বিরোধী, কেননা আমাদের বিশ্বাস বঙ্গ ভাষা ব্রাত্য-সংস্কৃতও নহে, শাপভ্রষ্ট ইংরেজিও নহে। এই কারণে আমরা মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, কারণ সে ভাষা সহজ সরল সুঠাম এবং সুস্পষ্ট।

সুতরাং আমাদের এ চেষ্টা যে মাতৃভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক, এ অভিযোগের কোনোরূপ বৈধ কারণ নাই। যদি কেহ বলেন যে 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ', সুতরাং সে পথ অনুসরণ না করা ধৃষ্টতামাত্র, তাহার উত্তরে আমরা বলিব, বঙ্গ সাহিত্যের মহাজনেরা যুগভেদ এবং শিক্ষাভেদ অনুসারে নানা বিভিন্ন পথের পথিক। দর্শনের ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রেও মার্গভেদ আছে ; আমাদের পূর্ববর্তী মহাজনেরা এই ভাষা লইয়া এক্সপেরিমেণ্ট করিয়াছেন ; সুতরাং নূতন এক্সপেরিমেণ্ট করিবার অধিকার আমাদের আছে। গদ্যসাহিত্যের বয়স এখন সবে একশো বৎসর, কাজেই তাহার পরীক্ষার বয়স আজও পার হয় নাই। টোলের ও কলেজের বাহিরে যে ভাষা মুখে মুখে চলিতেছে, সে ভাষার অন্তরে কতটা শক্তি আছে সে পরীক্ষা আজ পর্যন্ত করা হয় নাই। আমরা সেই পরীক্ষা করিতে চাই। লোকে বলে, যখন প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে গদ্য ছিল না তখন গত শতাব্দীর গদ্যই আমাদের একমাত্র আদর্শ। আমরা নিত্য যে ভাষায় কথাবার্তা কই তাহারই নাম যে গদ্য, এ সত্য মোলিয়েরের নাটকের নিরক্ষর ধনী বণিকের জানা ছিল না, কিন্তু আমাদের আছে। সাহিত্যে সেই সনাতন আদর্শই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

আমি ভাষা সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম তাহার কারণ, এইরূপ সভাসমিতিতে সাহিত্যের যাহা সাধারণ সম্পত্তি তাহার আলোচনা এবং তাহার বিচার হওয়াই সংগত।

৯

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে ভাষার নাম 'কাব্যশরীর'। কিন্তু এ শরীর ধরাছোঁয়ার মতো পদার্থ নয় বলিয়া যাঁহারা এ পৃথিবীতে শুধু স্থূলের চর্চা করেন, সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের চিরদিনই একটি আন্তরিক অবজ্ঞা থাকে, এবং ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অর্বাচীন বঙ্গ সাহিত্যই বিশেষ করিয়া অবজ্ঞার সামগ্রী হইয়াছিল। এই বিরাট কুসংস্কারের সহিত সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হইবার শক্তি ও সাহস পূর্বে ছিল কেবলমাত্র দু-চারি জন ক্ষণজন্মা পুরুষের। কিন্তু সাহিত্যচর্চা যে জীবনের একটি মহৎ কাজ, এ ধারণা যে আজ বাঙালির মনে বদ্ধমূল হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই সম্মিলনী। আমাদের নবশিক্ষার প্রসাদে আমরা জানি যে, সাহিত্য জাতীয়-জীবন-গঠনের সর্বপ্রধান উপায়, কেননা সে জীবন মানবসমাজের মনের ভিতর হইতে গড়িয়া উঠে। মানুষের মন সতেজ ও সজীব না হইলে মানবসমাজ ঐশ্বর্যশালী হইতে পারে না। যে মনের ভিতর জীবনীশক্তি আছে তাহার স্পর্শেই অপরের মন প্রাণলাভ করে এবং মানুষে একমাত্র শব্দের গুণেই অপরের মন স্পর্শ করিতে পারে। অতএব সাহিত্যই একমাত্র সঞ্জীবনী মন্ত্র। আমাদের সামাজিক জীবনের দৈন্য জগৎবিখ্যাত এবং সে দৈন্য দূর করিবার জন্য আমরা সকলেই ব্যগ্র। এই কারণেই শিক্ষিত লোকমাত্রেরই দৃষ্টি আজ সাহিত্যের উপর বদ্ধ। সাহিত্যই আমাদের প্রধান ভরসাস্থল বলিয়াই বর্তমান সাহিত্যের প্রতি আমাদের অসন্তোষও নানা আকারে প্রকাশ পাইতেছে। এ অসন্তোষের কারণ এই যে, লোকে সাহিত্যের নিকট যতটা আশা করে, প্রচলিত সাহিত্য সে আশা পূর্ণ করিতে পারিতেছে না। কাজেই নানা দিক হইতে নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে নানা লোকে এই শিশুসাহিত্যের উপর আক্রমণ করিতেছেন। এই-সকল সমালোচনার মোটামুটি পরিচয় নেওয়াটা আবশ্যক।

১০

আজ আমরা সকলে মিলিয়া এ সাহিত্যের জাতিবিচার করিতে বসিয়াছি। এ নবপণ্ডিতের বিচার, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বিচার নহে। কেননা বঙ্গ সাহিত্য স্বজাতীয় কি বিজাতীয়, সে বিচার ইউরোপীয় শাস্ত্রের অধীন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যের পুষ্পচয়ন করি আর না করি, ইউরোপীয় শাস্ত্রের পল্লব যে গ্রহণ করি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের নব সমালোচকেরা প্রধানত দুই শাখায় বিভক্ত। এক দলের অভিযোগ এই যে, নবসাহিত্য জাতীয় নয়, কেননা তাহা প্রাচীন নয়। অপর দলের অভিযোগ এই যে, বর্তমান সাহিত্য জাতীয় নয়, কেননা তাহা লৌকিক নহে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় গত দুই বৎসর ধরিয়া লোকারণ্যে এই বলিয়া রোদন করিতেছেন যে, দেশের সর্বনাশ হইল, সুকুমার সাহিত্য মারা গেল। তাঁহার আক্ষেপ এই যে, তাঁহার কথায় কেহ কান দেয় না, কেননা বাঙালি আজ তাঁহার মতে—

মস্তিষ্কের তীব্র চালনাগুণে পাইতেছে জ্ঞানবিজ্ঞান বিদ্যাদর্শন পুরাবৃত্ত ইতিহাস প্রত্ন-তত্ত্ব জীবতত্ত্ব; হারাইতে বসিয়াছে দয়ামায়া প্রণয়ভক্তি স্নেহমমতা কারুণ্যআতিথ্য আনুগত্য শিষ্যত্ব। আমরা কোমলপ্রাণ বাঙালি, আমাদের আশংকা হয়, আমরা কোমলতা হারাইয়া বুঝি-বা সর্বস্ব হারাইয়া ফেলি।

বাঙালির হৃদয়ের রক্ত সব যে মাথায় চড়িয়া গিয়াছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অবশ্য বাঙালির জীবনসংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তবে মস্তিষ্কের চালনা ব্যতীত এ যুগে যে সাহিত্য রচনা করা যাইতে পারে না, এ কথা নিশ্চিত। সরকারমহাশয় প্রাচীন সাহিত্যের পক্ষপাতী, কেননা তাঁহার বিশ্বাস, অতিনিকট-অতীতে

বাঙালি গ্রামে গ্রামে পালোয়ান বাগদি পোদ চণ্ডাল প্রহরী রাখিয়া আপনাদের বিত্তস্বত্ব রক্ষা করিত।

এবং তাহার প্রধান কাজ ছিল

আহারান্তে খড়ের চণ্ডীমণ্ডপে খুঁটি হেলান দিয়া মুটকলমে ইতিহাস পুরাণ অবলম্বনে পুঁথি লেখা।

এ ভাবে অবশ্য আমরা পুঁথি লিখিতে পারি না, কেননা আমাদের বিত্ত উপার্জন করিতে হয় বলিয়া আমরা আহারান্তে আপিসে যাই এবং পেন্-কলমে ইংরেজি ভাষাতে ছাইপাঁশ কত কি লিখি। কিন্তু সরকারমহাশয় কোথা হইতে এ সত্য সংগ্রহ করিলেন যে পলাশীযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে বাংলা আলস্যের স্বর্গ ছিল? যাঁহারা পুরাতত্ত্বের সন্ধানে ফেরেন, তাঁহারা তো অদ্যাবধি এ বাংলার সাক্ষাৎ লাভ করেন নাই। বোধ হয় সেই কারণেই ইতিহাস সরকারমহাশয়ের কোমল বাঙালি-প্রাণে এত ব্যথা দেয়। 'বাঙ্গালা সাহিত্যে যে ইতিহাসের পর দর-ইতিহাস, তাহার পর ছে-ইতিহাস দাখিল হইতেছে, আবার ইদানীং সওয়ালজবাবও যে আরম্ভ হইয়াছে' ইহা অক্ষয়বাবুর নিকট, অর্থাৎ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নিকট, একে-বারেই অসহ্য। কেননা এ শ্রেণীর ইতিহাসরচনার জন্য মস্তিষ্কচালনার প্রয়োজন আছে। অপর পক্ষে সরকারমহাশয়ের রচিত পুরাবৃত্ত কেবলমাত্র কল্পনা-চালনার দ্বারাই সৃষ্ট হয় এবং তাহার গঠনে কিংবা পঠনে বাঙালির কোমলতা হারাইবার কোনো আশংকা নাই। আমি সরকারমহাশয়ের মতামত এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, কেননা নানা দিক হইতে ইহার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এ মত সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এ-সকল কথার মূল্য যে কত, তাহা নির্ধারণ করিতে কোনোরূপ মস্তিষ্কচালনার আবশ্যকতা নাই। বঙ্গ সাহিত্য যতই শিশু হউক-না কেন, আমার বিশ্বাস, এরূপ আক্রমণে তাহা মারা যাইবে না।

১১

অপর শ্রেণীর সমালোচকেরা আধুনিক কাব্যসাহিত্যের বিরোধী। ইঁহাদের মতে সে সাহিত্য নেহাত বাজে, কেননা তাহা সমাজের কোনো কাজে লাগে না। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য কাব্যসকল যদি সরকারমহাশয়ের বর্ণিত আলস্যজাত সুকুমার সাহিত্য হয়, তাহা হইলে সে কাব্য যে সম্পূর্ণ নিরর্থক এবং সর্বথা

উপেক্ষণীয় সে বিষয়ে আর দ্বিমত নাই। সরকারমহাশয়ের অভিযোগ এই যে, বর্তমান সাহিত্য জাতীয় চরিত্রের অবনতি ঘটাইতেছে; ইঁহাদের অভিযোগ এই যে, সে সাহিত্য জাতীয় চরিত্রের উন্নতিসাধন করিতেছে না। এ সাহিত্য লোকশিক্ষার সহায় নয়, কেননা ইহা লৌকিক নয়, অতএব ইহা জাতীয় জীবন গঠনের উপযোগী নয়।

এ যুগের সাহিত্য যে লৌকিক নহে তাহা সকলেই জানেন, কেননা এ সাহিত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে-গড়া সাহিত্য। আমাদের সাহিত্য যদি এই কারণে নিরর্থক হয়, তাহা হইলে তাহার এই সমালোচনা আরো বেশি নিরর্থক। শিক্ষিত লোক এবং অশিক্ষিত লোকের মনের প্রভেদ বিস্তর। এই পার্থক্য যদি দোষের হয়, তাহা হইলে এ দেশে শিক্ষার পাট উঠাইয়া দেওয়া উচিত। শিক্ষিত লোকের রচিত সাহিত্যে শিক্ষিত মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইবে। পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এই শ্রেণীরই সাহিত্য। শকুন্তলা, হ্যামলেট, ডিভাইনা কমেডিয়া প্রভৃতি স্বল্পবুদ্ধি এবং অল্পজ্ঞানের যোগাযোগে রচিত হয় নাই। মনেরও উপর্যুপরি নানা লোক আছে এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মানসিক ঊর্ধ্বলোকেরই বস্তু। জাতির মনকে লোক হইতে লোকান্তরে লইয়া যাওয়াই সাহিত্যের ধর্ম। কামলোক হইতে রূপলোকে উঠিবার জন্য জনসাধারণের পক্ষে শিক্ষার আবশ্যক, সাধনার আবশ্যক। কবি যাহা দান করেন, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য অপরের উপযুক্ত শক্তি থাকা আবশ্যক। মনোজগতে অমনি-পাওয়া বলিয়া কোনো পদার্থ নাই, সবই দেওয়া-নেওয়ার জিনিস। এ যুগে এ দেশে যদি এমন কাব্য রচিত হইয়া থাকে যাহা সকল দেশের শ্রেষ্ঠ মনের পূজার সামগ্রী, তাহা হইলে বঙ্গ সাহিত্যের যে কোনো সার্থকতা নাই, এরূপ কথার কোনো অর্থ থাকে না। বিশ্বমানবের কাছে আমাদের কাব্যসাহিত্য যে সে-মর্যাদা লাভ করিয়াছে তাহা তো সর্বজনবিদিত। ইউটিলিটে-রিয়ানিজমের সাহায্যে সাহিত্যের মূল্য নির্ণয় করা যায় না। সাহিত্যের অবনতির দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধন করা যায় না। ফাউস্টের প্রথমভাগ শিশুশিক্ষা-তৃতীয়-ভাগ নহে বলিয়া জর্মান পেট্রিয়টিজম্ সে কাব্যের বিরুদ্ধে কখনো খড়্গহস্ত হয় নাই। প্রতিভাশালী লেখকেরা যে লোকশিক্ষক নহেন তাহার কারণ, তাঁহারা দুনিয়ার শিক্ষকদিগের শিক্ষক।

১২

লোকরচিত কিংবা লোকপ্রিয়, এ দুই অর্থেই লৌকিকসাহিত্য গান ও গল্পের সাহিত্য। সে গানের বিষয় দৈনিক জীবনের সুখ ও দুঃখ, এবং সে গল্পের বিষয় দৈনিক জীবনের বহির্ভূত আশ্চর্যকর ঘটনাবলী। গল্প ও গুজবে মিলিয়া যে আজগুবি ব্যাপারের সৃষ্টি হয় তাহাই জনসাধারণের চিরপ্রিয়। গীতিকবিতা এবং রূপকথাই লোকসাহিত্যের চিরসম্বল। এ সাহিত্য আমাদের নিকট তুচ্ছ নয়, কেননা আমরাও মানুষ এবং এইরূপ সুখদুঃখের আমরাও সমান অধীন। গল্প শুনিতে আমরাও ভালোবাসি এবং রূপকথার মায়া আমরাও কাটাইতে পারি না। আমাদের রচিত উপন্যাস-নবন্যাসাদিতেও যদি রূপ না থাকে তাহা হইলে তাহা কথা বলিয়া

গ্রাহ্য হয় না। আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হউক, আমাদের কল্পনা তাহার সীমা লঙ্ঘন করিতে সদাই উৎসুক। আমাদের দর্শন-বিজ্ঞানের কথাও কতক অংশে স্বরূপকথা, কতক অংশে রূপকথা ; এবং এই কারণেই তাহা মানুষের শুধু মন নয়, হৃদয়ও আকর্ষণ করে। ইভলিউশনের ইতিহাসের ন্যায় বিচিত্র কথা কোনো রাজা-রানীর উপাখ্যানেও নাই। আমাদের বিজ্ঞানের আলয় আমাদের নিকটেও এক হিসাবে জাদুঘর। জনসাধারণের সহিত কৃতবিদ্য লোকের প্রভেদ এই যে, তাহাদের নিকট তাহা জাদুঘর ব্যতীত আর কিছুই নয়। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল এবং অবৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ভিতর ব্রাহ্মণশূদ্র-প্রভেদ। শূদ্র-সাহিত্যে দ্বিজের সম্পূর্ণ অধিকার আছে কিন্তু দ্বিজ-সাহিত্যে শূদ্রের অধিকার আংশিক মাত্র। শূদ্রের শাস্ত্রে অধিকার নাই, অধিকার আছে শুধু পুরাণ-ইতিহাসে। কারণ এ সাহিত্য গীত হয় এবং ইহা অপূর্ব জল্পনা এবং অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। সাহিত্য-চর্চায় যে অধিকারীভেদ আছে তাহা অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হয়। আধুনিক বঙ্গ সাহিত্য লৌকিক না হইলেও যে লোকায়ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান এবং বঙ্কিমের গল্প জনসাধারণের আদরের সামগ্রী হইতে পারে, কিন্তু সমালোচকদের আলোচনা-গবেষণা-প্রবন্ধ-নিবন্ধাদিই তাহাদের বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য।

১৩

পূর্বোক্ত সমালোচকেরা বঙ্গ সাহিত্যের যথার্থ কীর্তিগুলির প্রতিই বিমুখ। যদি বঙ্গ সাহিত্যের গৌরব করিবার মতো কোনো বস্তু থাকে, তাহা হইলে তাহা বঙ্কিমের উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের নব্য ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের আবিষ্কৃত বঙ্গদেশের পুরাতত্ত্ব। কিন্তু এই জাতীয় সাহিত্যই তাঁহাদের নিকট অগ্রাহ্য, কেননা তাহা জাতীয় নয়। কিন্তু যাহা, জাতীয় হউক বিজাতীয় হউক, সাহিত্যই নয় তাহার বিরুদ্ধে তাঁহারা কোনোরূপ উচ্চবাচ্য করেন না। সর্বাঙ্গসুন্দর সাহিত্য রচনা করিবার রহস্য ও কৌশল যদি সমালোচকদিগের জানা থাকে, তবে তাঁহারা স্বয়ং যে সে-সাহিত্য রচনা করেন না ইহা বড়োই দুঃখের বিষয়। কেননা বঙ্গ সাহিত্যের দৈন্যই এই যে, দু-একটি প্রথমশ্রেণীর লেখক বাদ দিলে বাদবাকি তৃতীয়-চতুর্থ-শ্রেণীভুক্তও নন। ইউরোপের যে-কোনো দেশের হউবা, বর্তমান সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলে এ সত্য সকলের নিকটই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে। এ দৈন্য ইচ্ছা করিলেই আমরা ঘুচাইতে পারি। সাহিত্যের দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণী অধিকার করিবার জন্য অসাধারণ প্রতিভা চাই না, চাই শুধু যত্ন এবং পরিশ্রম। দণ্ডী বলিয়াছেন—

> ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্ববাসনা
> গুণানুবন্ধি প্রতিভানমদ্ভুতম্।
> শ্রুতেন যত্নেন চ বাগুপাসিতা
> ধ্রুবং করোত্যেব কমপ্যনুগ্রহম্ ॥

অর্থাৎ অদ্ভুত প্রতিভা এবং প্রাক্তন সংস্কারের অভাব সত্ত্বেও আমরা যদি সযত্নে সরস্বতীর উপাসনা করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহার কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইব না।

বাঙালি জাতির হৃদয়ে রস আছে মস্তিষ্কে তেজ আছে, তবে যে আমাদের সাধারণ সাহিত্য যথোচিত রস ও শক্তি -বঞ্চিত তাহার জন্য দোষী আমাদের নবশিক্ষা। আমাদের ত্রুটি কোথায় এবং কিসের জন্য, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

মানুষের সকল চিন্তার, সকল ভাবের, একটি-না-একটি অবলম্বন আছে। বস্তুজ্ঞানের উপরেই সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত, সে বস্তু মনোজগতের হউক আব বহির্জগতেরই হউক। বিদ্যালয়ে আমরা কোনো বিশেষ বস্তুর পরিচয় লাভ করি না, কিন্তু অনেক নাম শিখি। আমরা ইংরেজি ভাষায়, ইংরেজি সাহিত্যে শিক্ষিত হই, অথচ ইংরেজি জীবনের সহিত আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়া দূরে থাকুক, তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ-পরিচয়ও নাই, কাজেই সে শিক্ষার প্রসাদে আমরা সঞ্চয় করি শুধু কথা। আমরা কংক্রিটের জ্ঞান হারাই এবং তাহার পরিবর্তে পাই শুধু অ্যাব্‌সট্রাক্‌শন্‌স্‌। ফুল বলিয়া কোনো পদার্থ জগতে নাই, আছে শুধু ভাষায়। পৃথিবীতে আছে শুধু যূথী জাতী মল্লিকা মালতী প্রভৃতি। বর্ণে গন্ধে আকারে একটি অপরটি হইতে বিশিষ্ট। যতক্ষণ পর্যন্ত ইহারা আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইহারা আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। হথর্ন লাইলাক জ্যাসমিন ভায়োলেট আমাদের নিকট নামমাত্র। এ নাম আমাদের কানেব ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে না, আমাদের মনে কোনোরূপ পূর্বস্মৃতি জাগরূক করে না, কাজেই ফুলমাত্রেই আমাদের নিকট flower হইয়া উঠে। অর্থাৎ অদৃষ্ট বর্ণ, অজ্ঞাত আকার এবং অননুভূত গন্ধের একটি নামাশ্রিত সমষ্টিমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। ফলে, ইংরেজি সাহিত্য হইতে আমরা অধিকাংশ স্থলে কতকগুলি জাতিবাচক সম্বন্ধবাচক এবং ভাববাচক শব্দ সংগ্রহ করি। অথচ সে জাতি সে সম্বন্ধ সে ভাব যে কাহার, তাহার কোনো খোঁজ নাই। কাজেই আমরা মানুষের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া মনুষ্যত্বের বিচার করিতে বসি। অথচ পৃথিবীতে মানুষ আছে কিন্তু মনুষ্যত্ব নামক জাতিবাচক শব্দের পশ্চাতে কোনো পদার্থ নাই। সকল বিশেষ্যের সকল বিশেষণ বাদ দিয়াই আমরা সর্বনাম লাভ করি। এই সর্বনামেরও অবশ্য সকল ভাষাতেই স্থান আছে। কিন্তু এরূপ পদের ব্যবহারের সার্থকতা সেই স্থলেই আছে যে স্থলে মুহূর্তের মধ্যে আমরা সর্বনামকে ভাঙাইয়া বিশেষ্যে পরিণত করিতে পারি। যে সর্বনাম নামমাত্র, তাহা কেবল অদৃষ্টার্থ ধ্বনিমাত্র। আমরা আমাদের শিক্ষালব্ধ অ্যাব্‌সট্রাক্‌শন্‌ লইয়া সাহিত্যে কারবার করি বলিয়াই আমাদের লেখায় না আছে দেহ, না আছে প্রাণ। ইউরোপীয় সাহিত্যও আমরা ত্যাগ করিতে পারিব না, আমরা সদলবলে ইউরোপে গিয়া উপনিবেশও স্থাপন করিতে পারিব না। তবে এ রোগের ঔষধ কি? আমার বিশ্বাস, আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ রিয়ালিটির প্রতি মনোযোগ দিলে আমরা এই অ্যাব্‌সট্রাক্‌শনের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইব। অনুভূতিই যে সকল জ্ঞানের মূল, এই সত্যের সম্যক্‌ উপলব্ধি না হইলে আমাদের রচিত সাহিত্য অর্থহীন শব্দাড়ম্বরসার হইতে বাধ্য। আমাদের দেশেও ফুলফল গাছপালা আছে, নরনারী ধনীদরিদ্র আছে। এই-সকল বস্তুবিশেষ এবং ব্যক্তি-বিশেষের জ্ঞানের উপরেই যথার্থ বঙ্গ সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই কারণেই আমি সাহিত্যে প্রাদেশিকতার পক্ষপাতী। যাঁহারা চিরজীবন প্রকৃতির সহিত মুখোমুখি

করিয়া বাস করেন, আশা করা যায়, তাঁহাদের রচনায় এই রিয়ালিটির রূপ ফুটিয়া উঠিবে। আমি খাঁটি বাংলা ভাষার পক্ষপাতী, কারণ সে ভাষা কংক্রিট (বিশেষ-সংজ্ঞক)-শব্দবহুল। প্রবোধচন্দ্রিকা হইতে আমি খাঁটি বাংলার যে নমুনা উদ্‌ধৃত করিয়া দিয়াছি তাহাতে দেখিতে পাইবেন যে, প্রায় প্রতি শব্দই কংক্রিট। এই বিশেষ জ্ঞানের অভাববশত আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে সংগৃহীত সামান্য ভাবগুলিও যথাযোগ্য প্রয়োগ করিতে পারি না। যে ভাব জীবনসংগ্রামে আমাদের হাতে অস্ত্র হওয়া উচিত, তাহাকে হয়তো আমরা ভূষণস্বরূপে দেহে ধারণ করি। এবং যাহা ভূষণমাত্র, তাহারও আমরা অযথা ব্যবহার করি। ইউরোপের পায়ের মল গলার হারস্বরূপে বঙ্গ সরস্বতীকে কণ্ঠস্থ করিতে দেখা গিয়াছে।

পরীক্ষা ব্যতীত কোনো বস্তুরই সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু কোনো বস্তুকেই পরীক্ষা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। ইহাও আমাদের শিক্ষার দোষে। দিব্যাবদানে দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধযুগে জম্বুদ্বীপে কুলপুত্রদিগকে অষ্টবিধ বস্তু পরীক্ষা করিবার শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু এ যুগে স্কুলকলেজে আমরাই পরীক্ষিত হই, কিছুই পরীক্ষা করিতে শিখি না। আমরা যদি রত্ন পরীক্ষা করিতে শিখিতাম তাহা হইলে আমরা সাহিত্যে কাচকে মণি এবং মণিকে কাচ বলিতে ইতস্তত করিতাম। আমাদের পক্ষে পরীক্ষা-বিদ্যা শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা নানা দেশের নানা যুগের নানা শাস্ত্র পড়ি অথচ দেশী বিদেশী নানা মুনির নানা মতের মধ্যে কোন্‌টি গ্রাহ্য এবং কোন্‌টি অগ্রাহ্য, তাহা স্থির করিতে পারি না। আমরা বর্তমান ইউরোপ এবং প্রাচীন ভারতবর্ষ উভয়কেই সম্বোধন করিয়া বলি— 'ব্যামিশ্রেণ বাক্যেন মোহয়সি মাম্'। এ অবস্থায় সকল বিষয়েরই যে দুটি দিক আছে, এইমাত্র আমরা জানি; কিন্তু কোন্‌টি যে তার দক্ষিণ আর কোন্‌টি যে বাম, সে জ্ঞান আমাদের নাই। মাসেরও যে দুটি পক্ষ আছে, এই জ্ঞান আমরা পঞ্জিকা হইতেও সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্তু তাহার কোন্‌টি কৃষ্ণ এবং কোন্‌টি শুক্ল তাহা জানিবার জন্য চোখ খুলিয়া দেখা আবশ্যক।

বঙ্গ সাহিত্যের পক্ষে মহা আশার কথা এই যে, অন্তত ইহার একটি শাখায় এই পরীক্ষার কার্য আরম্ভ হইয়াছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির নিকট ইহার জন্য আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। সুহৃদ্‌বর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ বরেন্দ্রমণ্ডলের ভূগর্ভে লুক্কায়িত দেবদেবীগণকে টানিয়া বাহির করিয়া তাঁহাদিগকে ইতিহাসের কাঠগড়ায় খাড়া করিয়া আজ প্রশ্ন করিতেছেন, জেরা করিতেছেন। কেবলমাত্র জবানবন্দী লইয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন না, আবশ্যকমত সওয়ালজবাব করিতেও তাঁহারা প্রস্তুত। এরূপ পরীক্ষাকার্যে বাঙালির কোমল প্রাণে ব্যথা দিতেও যে নব ঐতিহাসিকেরা কুণ্ঠিত নন, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি তাঁহাদের কৃত কার্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চাই—

মালদহ জেলার অন্তর্গত খালিমপুর গ্রামের উত্তরাংশে হলকর্ষণ করিতে গিয়া এক কৃষক একটি তাম্রপট্টলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে তাহাকে সিন্দুরলিপ্ত করিয়া আমরণ পূজা

এই তাম্রশাসনখানি ঐতিহাসিকদের হাতে পড়িয়া সিন্দুরচর্চিত এবং পূজিত হইতেছে না, পরীক্ষিত হইতেছে।

বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমাদেরও ইঁহাদের প্রদর্শিত পদ্ধতিই অবলম্বন করিতে হইবে। তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ, ভূর্জপত্রে লিখিত এবং বিলাতি কাগজে মুদ্রিত লিপিকে সিন্দুরলিপ্ত করিয়া পূজা করিবার যুগ চলিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে লিপিমাত্রই, সে প্রাচীনই হউক আর অর্বাচীনই হউক, বাঙালির হাতে পরীক্ষিত হইবে। কেবলমাত্র লিপি পরীক্ষা করিয়াই আমরা নিরস্ত হইব না। ধর্ম, রীতি-নীতি, আচারব্যবহার, সমাজের মন, নিজের মন—এই-সকল বিষয়ই সাহিত্যের বিচারালয়ে পরীক্ষা দিতে বাধ্য হইবে। এ বিচার কেবল দর্শনে-বিজ্ঞানে নয়, নাটকে-নভেলেও হইবে। কেননা বিদ্যার সহিত সম্পর্কহীন সাহিত্য সভ্যসমাজে আদৃত হইতে পারে না। সমাজের সকল জ্ঞান সাহিত্যে কেন্দ্রীভূত এবং প্রতিফলিত হইতে বাধ্য। যে কথা বিনা পরীক্ষায় ডবল প্রমোশন পায়, সে কথা ভবিষ্যতের সাহিত্যে স্থান লাভ করিবে না। সত্যের স্পর্শ সহ্য করিবার অক্ষমতার নাম যদি কোমলতা হয়, তাহা হইলে জাতীয় মন হইতে সে কোমলতা দূর করিতে হইবে। কেননা ও কোমলতা দুর্বলতারই নামান্তর, এবং যুক্তিতর্কের উপর্যুপরি আঘাতে সে মনকে কঠিন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের সাহিত্যের সৌকুমার্য নষ্ট হইবার কোনো আশংকা নাই।

ভবভূতি বলিয়াছেন, মহাপুরুষের মন যুগপৎ বজ্রকঠিন এবং কুসুমসুকুমার। জাতীয় মহাপুরুষত্বলাভই সাহিত্যসাধনার ধ্রুবলক্ষ্য হওয়া কর্তব্য।

এই প্রসঙ্গে আমি বঙ্গ সাহিত্যের আর-একটি ত্রুটির বিষয় উল্লেখ করিতে চাহি। আমাদের গদ্যের ভাষা ও ভাব দুইই শিথিলবন্ধ। আমাদের রচনায় পদ, বাক্য—কিছুই সুবিন্যস্ত নয় এবং আমাদের বক্তব্য কথাও সুসম্বন্ধ নয়। ইহা যে শক্তি-হীনতার লক্ষণ তাহা বলা বাহুল্য। যে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকলের পরস্পরসম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নয়, সে দেহের শক্তিও নাই, সৌন্দর্যও নাই। প্রতি জীবন্ত ভাষারই একটি নিজস্ব গঠন আছে, নিজস্ব ছন্দ আছে। সেই গঠন রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের রচনা সুগঠিত হয় না, সেই ছন্দ রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের গদ্য স্বচ্ছন্দ হয় না।

ভাষার ন্যায় ভাবও রচনা করিতে হয়। আমাদের চিত্তবৃত্তি স্বতই বিক্ষিপ্ত। যাহা বিক্ষিপ্ত তাহাকেই সংক্ষিপ্ত করা সাহিত্যের কাজ। মনের ভিতর যাহা অস্পষ্ট তাহাকে স্পষ্ট করা, যাহা নিরাকার তাহাকে সাকার করাই আর্টের ধর্ম।

যে-সকল মনোভাব গ্রন্থিবদ্ধ নয়, তাহাদের বিশৃঙ্খল সমষ্টি সমগ্রতা নয়। চিন্তাগঠনের প্রণালীকেই আমরা লজিক বলি। লজিক এবং আর্টের সম্পর্ক যে অতি ঘনিষ্ঠ, গ্রীক সভ্যতাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা আর্ট এবং লজিক, এই দুই এ সভ্যতার সর্বপ্রধান কীর্তি। প্রকরণভঙ্গ সংস্কৃত সাহিত্যে মহাদোষ বলিয়া গণ্য। আমাদের গদ্যরচনা যে এ দোষে অপরিবস্তর দুষ্ট, এ কথা অস্বীকার করিবার জো নাই। এ দোষ বর্জন করিবার জন্য প্রতিভার প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন আছে শুধু মনোযোগের। সাহিত্যের সাধনাও একরূপ যোগাভ্যাস। ধ্যানধারণা

ব্যতীত এ ক্ষেত্রেও সিদ্ধিলাভ করা যায় না। ধ্যানধারণা করা আর না করা আমাদের ইচ্ছাধীন। সুতরাং ইচ্ছা করিলেই আমরা আমাদের রচনা দৃঢ়বন্ধ করিতে পারি।

আমার বিশ্বাস, বাঙালি জাতির হৃদয়মনের ভিতর অপূর্ব শক্তি আছে। যে শক্তি আজ আংশিক ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, সেই প্রচ্ছন্ন শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তিই আমাদের সকল সাধনার বিষয় হওয়া কর্তব্য। এই কারণেই আমি যে ভাষা ও যে ভাব সাহিত্যের সেই শক্তির পূর্ণবিকাশের বাধাস্বরূপ মনে করি, তাহার দূরীকরণের প্রস্তাব করিতে সাহসী হইয়াছি।

এ যুগে নিজের মতকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ নিজের মনে যাহা সত্য বলিয়া ধারণা, তাহা প্রকাশ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সুতরাং যাঁহারা আমার মত গ্রাহ্য করিতে অক্ষম, তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন বিনা বিচারে এ মতের প্রতি সাহিত্যরাজ্য হইতে নির্বাসনদণ্ড প্রচার না করেন। আমি একটিমাত্র সত্যকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সে সত্য এই যে, বাঙালি জাতির দেহে প্রাণ আছে। প্রাণের অস্তিত্বের প্রধান লক্ষণ বাহ্যবস্তুর স্পর্শে তাহা সাড়া দেয়। আজ এক শত বৎসর ধরিয়া বাঙালির মনের সকল অঙ্গ ইউরোপীয় সভ্যতার স্পর্শে যথোচিত সাড়া দিয়াছে। এই ধ্রুবসত্যের উপরেই সাহিত্য সম্বন্ধে আমার সকল মতামত প্রতিষ্ঠিত।

ফাল্গুন ১৩২১

চুটকি

সমালোচকেরা আমার রচনার এই একটি দোষ ধরেন যে, আমি কথায়-কথায় বলি 'হচ্ছে'। এটি যে একটি মহাদোষ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই, কেননা ও কথা বলায় সত্যের অপলাপ করা হয়। সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয়, বাংলায় কিছু 'হচ্ছে না'। এ দেশের কর্মজগতে যে কিছু হচ্ছে না, সে তো প্রত্যক্ষ; কিন্তু মনোজগতেও যে কিছু হচ্ছে না তার প্রমাণ বর্ধমানের গত সাহিত্যসম্মিলন।

উক্ত মহাসভার পঞ্চ সভাপতি সমস্বরে বলেছেন যে, বাংলায় কিছু হচ্ছে না—না দর্শন, না বিজ্ঞান, না সাহিত্য, না ইতিহাস।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রধান বক্তব্য এই যে, আমরা না পাই সত্যের সাক্ষাৎ, না করি সত্যাসত্যের বিচার। আমরা সত্যের স্রষ্টাও নই, দ্রষ্টাও নই ; কাজেই আমাদের দর্শনচর্চা রিয়ালও নয়, ক্রিটিকালও নয়।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে, কি মূর্ত-বিজ্ঞান, কি অমূর্ত-বিজ্ঞান, এ দুয়ের কোনোটিই বাঙালি অদ্যাবধি আত্মসাৎ করতে পারে নি। অর্থাৎ বিজ্ঞানের যন্ত্রভাগও আমাদের হাতে পড়ে নি, তার তন্ত্রভাগও আমাদের মনে ধরে নি। আমরা শুধু বিজ্ঞানের স্থূল সূত্রগুলি কণ্ঠস্থ করেছি, এবং তার পরিভাষার নামতা মুখস্থ করেছি। যে বিদ্যা প্রয়োগপ্রধান, কেবলমাত্র তার মন্ত্রের শ্রবণে এবং উচ্চারণে বাঙালি জাতির মোক্ষলাভ হবে না। এক কথায়, আমাদের বিজ্ঞানচর্চা রিয়াল নয়।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মতে ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্য সত্যের আবিষ্কার এবং উদ্ধার ; এ সত্য নিত্য এবং গুপ্ত সত্য নয়, অনিত্য এবং লুপ্ত সত্য। অতএব এ সত্যের দর্শনলাভের জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক। অতীতের জ্ঞান লাভ করবার জন্য হীরেন্দ্রবাবুর বর্ণিত বোধির (intuition) প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন আছে শুধু শিক্ষিত বুদ্ধির। অতীতের অন্ধকারের উপর বুদ্ধির আলো ফেলাই হচ্ছে ঐতিহাসিকের একমাত্র কর্তব্য, সে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া নয়। অথচ আমরা সে অন্ধকারে শুধু ঢিল নয়, পাথর ছুঁড়ছি। ফলে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের ঐতিহাসিকদের দেহ পরস্পরের শিলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ছে। এক কথায়, আমাদের ইতিহাসচর্চা ক্রিটিকাল নয়।

অতএব দেখা গেল যে, সম্মিলনের সকল শাখাপতি এ বিষয়ে একমত যে, কিছু হচ্ছে না। কিন্তু কি যে হচ্ছে, সে কথা বলেছেন স্বয়ং সভাপতি। তিনি বলেন, বাংলা সাহিত্যে যা হচ্ছে, তার নাম চুটকি। এ কথা লাখ কথার এক কথা। সকলেই জানেন যে, যখন আমরা ঠিক কথাটি ধরতে না পারি তখনই আমরা লাখ কথা বলি। এই চুটকি নামক বিশেষণটি খুঁজে না পাওয়ায় আমরা বঙ্গসরস্বতীর গায়ে 'বিজাতীয়' 'অভিজাতীয়' 'অবাস্তব' 'অবান্তর' প্রভৃতি নানা নামের ছাপ মেরেছি, অথচ তার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারি নি।

তার কারণ, এ-সকল ছোটো ছোটো বিশেষণের অর্থ কি, তার ব্যাখ্যা করতে বড়ো

বড়ো প্রবন্ধ লিখতে হয়। কিন্তু চুটকি যে কি পদার্থ, তা যে আমরা সকলেই জানি, তার প্রমাণ হাতে-হাতেই দেওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অভিভাষণ যে চুটকি নয়, এ কথা স্বয়ং শাস্ত্রীমহাশয়ও স্বীকার করতে বাধ্য। কেননা এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ভাবে ও ভাষায় এর চাইতে ভারী অঙ্গের গদ্যবন্ধ জর্মানির বাইরে পাওয়া দুষ্কর।

হীরেন্দ্রবাবুর অভিভাষণও চুটকি নয়। তবে শাস্ত্রীমহাশয় এ মতে সায় দেবেন কি না জানি নে। কেননা হীরেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ একে সংক্ষিপ্ত, তার উপর আবার সহজবোধ্য, অর্থাৎ সকল দেশের সকল যুগের সকল দার্শনিক তত্ত্ব যে পরিমাণে বোঝা যায়, হীরেন্দ্রবাবুর দার্শনিক তত্ত্বও ঠিক সেই পরিমাণে বোঝা যায়, তার কমও নয় বেশিও নয়। শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে, যে কাব্য মহাকায় তাই হচ্ছে মহাকাব্য। গজমাপে যদি সাহিত্যের মর্যাদা নির্ণয় করতে হয়, তা হলে হীরেন্দ্রবাবুর রচনা অবশ্য চুটকি। কেননা, তার ওজন যতই হোক-না কেন, তার আকার ছোটো।

অপর পক্ষে শাস্ত্রীমহাশয়ের অভিভাষণযুগল যে চুটকি-অঙ্গের, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

শাস্ত্রীমহাশয়ের নিজের কথা এই—

একখানা বই পড়িলাম, অমনি আমার মনের ভাব আমূল পরিবর্তন হইয়া গেল, যতদিন বাঁচিব ততদিন সেই বইয়ের কথাই মনে পড়িবে, এবং সেই আনন্দেই বিভোর হইয়া থাকিব।

এরকম যাতে হয় না, তারই নাম চুটকি। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে জিজ্ঞাসা করি, বাংলায় এরকম ক'জন পাঠক আছেন যাঁরা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে, শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রবন্ধ পড়ে তাঁদের ভিতরটা সব ওলটপালট হয়ে গেছে?

শাস্ত্রীমহাশয় বাংলা সাহিত্যে চুটকির চেয়ে কিছু বড়ো জিনিস চান। বড়ো বইয়ের যদি ধর্মই এই হয় যে, তা পড়বামাত্র আমাদের মনের ভাবের আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে, তা হলে সেরকম বই যত কম লেখা হয় ততই ভালো। কারণ দিনে একবার করে যদি পাঠকের অন্তরাত্মার আমূল পরিবর্তন ঘটে, তা হলে বড়ো বই লেখবার লোক যেমন বাড়বে, পড়বার লোকও তেমনি কমে আসবে। তিনি চুটকির সম্বন্ধে যে দুটি ভালো কথা বলেন নি, তা নয়; কিন্তু সে অতি মুরুব্বিয়ানা করে। ইংরেজেরা বলেন, স্বল্পস্তুতির অর্থ অতিনিন্দা। সুতরাং আত্মরক্ষার্থ চুটকি সম্বন্ধে তাঁর মতামত আমাদের পক্ষে একটু যাচিয়ে দেখা দরকার। তিনি বলেন—

চুটকির একটি দোষ আছে, যখনকার তখনই, বেশি দিন থাকে না।

এ কথা যে ঠিক নয় তা তাঁর উক্তি থেকেই প্রমাণ করা যায়। সংস্কৃত অভিধানে চুটকি শব্দ নেই, কিন্তু ও বস্তু যে সংস্কৃত সাহিত্যে আছে সে কথা শাস্ত্রীমহাশয়ই আমাদের বলে দিয়েছেন। তাঁর মতে—

কালিদাস ও ভবভূতির পর চুটকি আরম্ভ হইয়াছিল, কেননা শতক দশক অষ্টক সপ্তশতী এই-সব তো চুটকি-সংগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়।

তথাস্তু। শাস্ত্রীমহাশয়ের বর্ণিত সংস্কৃত চুটকির দুটি-একটি নমুনার সাহায্যেই দেখানো যেতে পারে যে, আর্যযুগেও চুটকি কাব্যাচার্যদিগের নিকট অতি উপাদেয় ও মহার্ঘ বস্তু বলেই প্রতিপন্ন হত। ভর্তৃহরির শতক-তিনটি সকলের নিকটই সুপরিচিত, এবং গাথাসপ্তশতীও বাংলাদেশে একেবারে অপরিচিত নয়। ভর্তৃহরি ভবভূতির পূর্ববর্তী কবি, কেননা জনরব এই যে তিনি কালিদাসের ভ্রাতা, এবং ইতিহাসের অভাবে কিংবদন্তীই প্রামাণিক। সে যাই হোক, গাথাসপ্তশতী যে কালিদাসের জন্মের অন্তত দু-তিনশো বছর পূর্বে সংগৃহীত হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তা হলে দাঁড়াল এই যে, আগে আসে চুটকি তার পর আসে মহাকাব্য এবং মহানাটক। অভিব্যক্তির নৈসর্গিক নিয়মই এই যে, এ জগতে সব জিনিসই ছোটো থেকে ক্রমে বড়ো হয়। সাহিত্যও ঐ একই নিয়মের অধীন। তার পর পূর্বোক্ত শতকত্রয় এবং পূর্বোক্ত সপ্তশতী যখনকার তখনকারই নয়, চিরদিনকারই। এ মত আমার নয়, বাণভট্টের। গাথাসপ্তশতী শুধু চুটকি নয়, একেবারে প্রাকৃত-চুটকি, তথাপি শ্রীহর্ষচরিতকারের মতে—

অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎসাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোশং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ॥

তার পর ভর্তৃহরি যে এক-শ'র পান্না, এক-শ'র চুনি এবং এক-শ'র নীলা, এই তিন-শ'র রত্নমালা সরস্বতীর কণ্ঠে পরিয়ে গেছেন, তার প্রতি রত্নটি যে বিশুদ্ধজাতীয় এবং অবিনাশী, তার আর সন্দেহ নেই। যাবচ্চন্দ্রদিবাকর এই তিন শত বর্ণোজ্জ্বল শ্লোক সরস্বতীর মন্দির অহর্নিশ আলোকিত করে রাখবে।

আসল কথা, চুটকি যদি হেয় হয়, তা হলে কাব্যের চুটকিত্ব তার আকারের উপর নয়, তার প্রকারের অথবা বিকারের উপর নির্ভর করে, নচেৎ সমগ্র সংস্কৃত কাব্যকে চুটকি বলতে হয়। কেননা সংস্কৃত ভাষায় চার ছত্রের বেশি কবিতা নেই, কাব্যেও নয় নাটকেও নয়। শুধু কাব্য কেন, হাতে-বহরে বেদও চুটকির অন্তর্ভূত হয়ে পড়ে। শাস্ত্রীমহাশয় বলেন যে, বাঙালি ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান বলে বেদাভ্যাস করেন না। কর্ণবেধের জন্য যতটুকু বেদ দরকার, ততটুকুই এ দেশে ব্রাহ্মণসন্তানের করায়ত্ত। অথচ বাঙালি বেদপাঠ না করেও এ কথা জানে যে, ঋক্ হচ্ছে ছোটো কবিতা এবং সাম গান। সুতরাং আমরা যখন ছোটো কবিতা ও গান রচনা করি, তখন আমরা ভারতবর্ষের কাব্যরচনার সনাতন রীতিই অনুসরণ করি।

শাস্ত্রীমহাশয় মুখে যাই বলুন, কাজে তিনি চুটকিরই পক্ষপাতী। তিনি আজীবন চুটকিতেই গলা সেধেছেন, চুটকিতেই হাত তৈরি করেছেন, সুতরাং কি লেখায়, কি বক্তৃতায় আমরা তাঁর এই অভ্যস্ত বিদ্যারই পরিচয় পাই। তিনি বাঙালির যে বিংশপর্ব মহাগৌরব রচনা করেছেন তা ঐতিহাসিক চুটকি বই আর কিছুই নয়, অন্তত সে রচনাকে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় অন্য-কোনো নামে অভিহিত করবেন না।

এ কথা নিশ্চিত যে, তিনি সরকারমহাশয়ের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন নি, সম্ভবত এই বিশ্বাসে যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে আবিষ্কৃত সত্য বাঙালির

পক্ষে পুষ্টিকর হতে পারে, কিন্তু রুচিকর হবে না। সরকারমহাশয় বলেন যে, এ দেশের ইতিহাসের সত্য যতই অপ্রিয় হোক বাঙালিকে তা বলতেও হবে শুনতেও হবে। অপর পক্ষে শাস্ত্রীমহাশয়ের উদ্দেশ্য তাঁর রচনা লোকের মুখরোচক করা, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য তিনি নানারকম সত্য ও কল্পনা একসঙ্গে মিলিয়ে ঐতিহাসিক সাড়ে-বত্রিশ-ভাজার সৃষ্টি করেছেন। ফলে এ রচনায় যে মাল আছে, তাও মসলা থেকে পৃথক্ করে নেওয়া যায় না। শাস্ত্রীমহাশয়ের কথিত বাংলার পুরাবৃত্তের কোনো ভিত্তি আছে কি না বলা কঠিন। তবে এ ইতিহাসের যে গোড়াপত্তন করা হয় নি, সে বিষয়ে আর দ্বিমত নেই। ইতিহাসের ছবি আঁকতে হলে প্রথমে ভূগোলের জমি করতে হয়। কোনো একটি দেশের সীমার মধ্যে কালকে আবদ্ধ না করতে পারলে সে কালের পরিচয় দেওয়া যায় না। অসীম আকাশের জিয়োগ্রাফি নেই, অনন্ত কালেরও হিস্টরি নেই। কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয় সেকালের বাঙালির পরিচয় দিতে গিয়ে সেকালের বাংলার পরিচয় দেন নি ; ফলে গৌরবটা উত্তরাধিকারীস্বত্বে আমাদের কি অপরের প্রাপ্য, এ বিষয়েও সন্দেহ থেকে যায়। শাস্ত্রীমহাশয়ের শক্ত হাতে পড়ে দেখতে পাচ্ছি অঙ্গ ভয়ে বঙ্গের ভিতর সেঁধিয়েছে। কেননা যে 'হস্ত্যায়ুর্বেদ' আমাদের সর্বপ্রথম গৌরব, সে শাস্ত্র অঙ্গরাজ্যে রচিত হয়েছিল। বাংলার লম্বাচোড়া অতীতের গুণবর্ণনা করতে হলে বাংলাদেশটাকেও একটু লম্বাচোড়া করে নিতে হয়। সম্ভবত সেইজন্য শাস্ত্রী-মহাশয় আমাদের পূর্বপুরুষদের হয়ে অঙ্গকেও বেদখল করে বসেছেন। তাই যদি হয়, তা হলে বরেন্দ্রভূমিকে ছেঁটে দেওয়া হল কেন? শুনতে পাই, বাংলার অসংখ্য প্রস্তররাশি বরেন্দ্রভূমি নিজের বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখেছে। বাংলার পূর্বগৌরবের পরিচয় দিতে গিয়ে বাংলার যে-ভূমি সবচেয়ে প্রস্তরগর্ভা, সে প্রদেশের নাম পর্যন্ত উল্লেখ না করবার কারণ কি? যদি এই হয় যে, পূর্বে উত্তরবঙ্গের আদৌ কোনো অস্তিত্ব ছিল না, এবং থাকলেও সে দেশ বঙ্গের বহির্ভূত ছিল, তা হলে সে কথাটাও বলে দেওয়া উচিত। নচেৎ বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি আমাদের মনে একটা ভুল ধারণা এমনি বদ্ধমূল করে দেবে যে, তার 'আমূল পরিবর্তন' কোনো চুটকি ইতিহাসের দ্বারা সাধিত হবে না।

শাস্ত্রীমহাশয় যে তাম্রশাসনে শাসিত নন, তার প্রমাণ তিনি পাতায় পাতায় বলেন 'আমি বলি' 'আমার মতে' এই সত্য। এর থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শাস্ত্রীমহাশয়ের ইতিহাস বস্তুতন্ত্রতার ধার ধারে না, অর্থাৎ এক কথায় তা কাব্য; এবং যখন তা কাব্য তখন তা যে চুটকি হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি।

শাস্ত্রীমহাশয়ের, দেখতে পাই আর-একটি এই অভ্যাস আছে যে, তিনি নামের সাদৃশ্য থেকে পৃথক্ পৃথক্ বস্তু এবং ব্যক্তির ঐক্য প্রমাণ করেন। একীকরণের এ পদ্ধতি অবশ্য বৈজ্ঞানিক নয়। কৃষ্ট এবং খৃস্ট, এ-দুটি নামের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও ও-দুটি অবতারের প্রভেদ শুধু বর্ণগত নয়, বর্গগতও বটে। কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয়ের অবলম্বিত পদ্ধতির এই একটি মহাগুণ যে, ঐ উপায়ে অনেক পূর্বগৌরব আমাদের হাতে আসে, যা বৈজ্ঞানিক হিসাবে ন্যায়ত অপরের প্রাপ্য। কিন্তু উক্ত উপায়ে অতীতকে হস্তান্তর করার ভিতর বিপদও আছে। এক দিকে

যেমন গৌরব আসে, অপর দিকে তেমনি অগৌরবও আসতে পারে। অগৌরব শুধু যে আসতে পারে তাই নয়, বস্তুত এসেওছে।

স্বয়ং শাস্ত্রীমহাশয় ঐতরেয় আরণ্যক হতে এই সত্য উদ্ধার করেছেন যে, প্রাচীন আর্যেরা বাঙালি জাতিকে পাখি বলে গালি দিতেন। সে বচনটি এই—

বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা

প্রথম-পরিচয়ে আর্যেরা যে বাঙালি জাতির সম্বন্ধে অনেক অকথা-কুকথা বলেন, তার পরিচয় আমরা এ যুগেও পেয়েছি *vide* Macaulay। সুতরাং প্রাচীন আর্যেরাও যে প্রথম-পরিচয়ে বাঙালিদের প্রতি নানারূপ কটুকাটব্য প্রয়োগ করেছিলেন, এ কথা সহজেই বিশ্বাস হয়। তবে এ ক্ষেত্রে এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, যদি গালি দেওয়াই তাঁদের অভিপ্রায় ছিল, তা হলে আর্যেরা আমাদের পাখি বললেন কেন। পাখি বলে গাল দেবার প্রথা তো কোনো সভ্যসমাজে প্রচলিত দেখা যায় না। বরং বুলবুল ময়না প্রভৃতি এ দেশে আদরের ডাক বলেই গণ্য, এবং ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হলে আমরা তাকে ঘুঘু উপাধি দানে সম্মানিত করি। অপমান করবার উদ্দেশ্যে মানুষকে যে-সব প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে তারা প্রায়শই ভূচর এবং চতুষ্পদ, দ্বিপদ এবং খেচর নয়। পাখি বলে নিন্দা করবার একটিমাত্র শাস্ত্রীয় উদাহরণ আমার জানা আছে। বাণভট্ট তাঁর সমসাময়িক কুকবিদের কোকিল বলে ভর্ৎসনা করেছেন; কেননা তারা বাচাল, কামকারী, এবং তাদের 'দৃষ্টি রাগাধিষ্ঠিত' অর্থাৎ তাদের চক্ষু রক্তবর্ণ। গাল হিসেবে এ যে যথেষ্ট হল না সে কথা বাণভট্টও বুঝেছিলেন, কেননা পরবর্তী শ্লোকেই তিনি বলেছেন যে, কুকুরের মতো কবি ঘরে ঘরে অসংখ্য মেলে, কিন্তু শরভের মতো কবি মেলাই দুর্ঘট। এ স্থলে কবিকে প্রশংসাচ্ছলে কেন শরভ বলা হল, এ কথা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন তার উত্তর শরভ জানোয়ার হলেও চতুষ্পদ নয়, অষ্টপদ; এবং তার অতিরিক্ত চারখানি পা ভূচর নয়, খেচর।

এই-সব কারণে কেবলমাত্র শব্দের সাদৃশ্য থেকে এ অনুমান করা সংগত হবে না যে, আর্য ঋষিরা অপর এত কড়া কড়া গাল থাকতে আমাদের পূর্বপুরুষদের কেবলমাত্র পাখি বলে গাল দিয়েছেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে আমাদের সঙ্গে মাগধ এবং চের জাতিও এ গালির ভাগ পেয়েছে। কেননা, তাঁর মতে, বঙ্গা হচ্ছে বাঙালি, বগধা হচ্ছে মগধা এবং চেরপাদা হচ্ছে চের নামক অসভ্য জাতি। 'চেরপাদা' যে কি করে 'চের'তে দাঁড়াল, তা বোঝা কঠিন। বাক্যের পদচ্ছেদের অর্থ পা কেটে ফেলা নয়। অথচ শাস্ত্রীমহাশয় 'চেরপাদা'র পা-দুখানি কেটে ফেলেই 'চের' খাড়া করেছেন।

'বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা'— এই যুক্তপদের, শুনতে পাই, সেকেলে পণ্ডিতেরা এইরূপ পদচ্ছেদ করেন— বঙ্গা+অবগধা+চ+ইরপাদা।

ইরপাদা অর্থে সাপ। তা হলে দাঁড়াল এই যে, বাঙালি ও বেহারিকে প্রথমে পাখি এবং পরে সাপ বলা হয়েছে। উক্ত বৈদিক নিন্দার ভাগ আমি বেহারিদের দিতে পারি নে। অবগধা মানে যে মাগধ, এর কোনো প্রমাণ নেই। অতএব শাস্ত্রীমহাশয় যেমন 'চেরপাদা'র শেষ দুই বর্ণ ছেঁটে দিয়ে 'চের' লাভ করেছেন

আমিও তেমনি 'অবগধা' শব্দের প্রথম দুটি বর্ণ বাদ দিয়ে পাই 'গধা'। এইরূপ বর্ণবিচ্ছেদের ফলে উক্ত বচনের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আর্য ঋষিদের মতে বাঙালি আদিতে পক্ষী, অন্তে সর্প, এবং ইতিমধ্যে গর্দভ।

'অবগধা'কে 'গধা'য় রূপান্তরিত করা সম্বন্ধে কেউ কেউ এই আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন যে, সেকালে যে গাধা ছিল তার কোনো প্রমাণ নেই। শাস্ত্রীমহাশয় বাঙালির প্রথম গৌরবের কারণ দেখিয়েছেন যে, পুরাকালে বাংলায় হাতি ছিল, কিন্তু বাঙালির দ্বিতীয় গৌরবের এ কারণ দেখান নি যে, সেকালে এ দেশে গাধাও ছিল। কিন্তু গাধা যে ছিল, এ অনুমান করা অসংগত হবে না। কেননা যদি সেকালে গাধা না থাকত তো একালে এ দেশে এত গাধা এল কোথা থেকে? ঘোড়া যে বিদেশ থেকে এসেছে তার পরিচয় ঘোড়ার নামেই পাওয়া যায়, যথা, পগেয়া ভুটিয়া তাজি আরবি ইত্যাদি। কিন্তু গর্দভদের এরূপ কোনো নামরূপের প্রভেদ দেখা যায় না। এবং ও-জাতি যে যে-কোনো অর্বাচীন যুগে বঙ্গদেশে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, তারও কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে, রাসভকুল অপর সকল দেশের ন্যায় এ দেশে এখনো আছে, পূর্বেও ছিল। তবে একমাত্র নামের সাদৃশ্য থেকে এরূপ অনুমান করা অসংগত হবে যে আর্য ঋষিরা পুরাকালের বাঙালিদের এরূপ তিরস্কারে পুরস্কৃত করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় 'বঙ্গ' শব্দের অর্থ বৃক্ষ। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আরণ্যক-শাস্ত্রে বৃক্ষ পক্ষী সর্প প্রভৃতি আরণ্য জীবজন্তুরই উল্লেখ করা হয়েছে, বাঙালির নামও করা হয় নি। অতএব আমাদের অতীত অতি-গৌরবেরও বস্তু নয়, অতি-অগৌরবেরও বস্তু নয়।

আর-একটি কথা। হীরেন্দ্রবাবু দর্শন শব্দের এবং যোগেশবাবু বিজ্ঞান শব্দের নিরুক্তের আলোচনা করেছেন, কিন্তু যদুবাবু ইতিহাসের নিরুক্ত সম্বন্ধে নীরব। ইতিহাস শব্দ সম্ভবত হস্ ধাতু হতে উৎপন্ন, অন্তত শাস্ত্রীমহাশয়ের ইতিহাস যে হাস্যরসের উদ্রেক করে, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। এমন-কি, আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে শাস্ত্রীমহাশয় পুরাতত্ত্বের ছলে আত্মশ্লাঘাপরায়ণ বাঙালি জাতির সঙ্গে একটি মস্ত রসিকতা করেছেন।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২২

সাহিত্যে খেলা

জগৎ-বিখ্যাত ফরাসি ভাস্কর রোদ্যাঁ, যিনি নিতান্ত জড় প্রস্তরের দেহ থেকে অসংখ্য জীবিতপ্রায় দেব-দানব কেটে বার করেছেন তিনিও, শুনতে পাই, যখন-তখন হাতে কাদা নিয়ে, আঙুলের টিপে মাটির পুতুল তৈয়ের করে থাকেন। এই পুতুল গড়া হচ্ছে তাঁর খেলা। শুধু রোদ্যাঁ কেন, পৃথিবীর শিল্পীমাত্রেই এই শিল্পের খেলা খেলে থাকেন। যিনি গড়তে জানেন, তিনি শিবও গড়তে পারেন বাঁদরও গড়তে পারেন। আমাদের সঙ্গে বড়ো বড়ো শিল্পীদের তফাত এইটুকু যে, তাঁদের হাতে এক করতে আর হয় না। সম্ভবত এই কারণে কলারাজ্যের মহাপুরুষদের যা-খুশি-তাই করবার যে অধিকার আছে, ইতর শিল্পীদের সে অধিকার নেই। স্বর্গ হতে দেবতারা মধ্যে মধ্যে ভূতলে অবতীর্ণ হওয়াতে কেউ আপত্তি করেন না, কিন্তু মর্তবাসীদের পক্ষে রসাতলে গমন করাটা বিশেষ নিন্দনীয়। অথচ এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, যখন এ জগতে দশটা দিক আছে তখন সেই-সব দিকেই গতায়াত করবার প্রবৃত্তিটি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মন উঁচুতেও উঠতে চায়, নিচুতেও নামতে চায়। বরং সত্য কথা বলতে গেলে সাধারণ লোকের মন স্বভাবতই যেখানে আছে তারই চার পাশে ঘুরে বেড়াতে চায়, উড়তেও চায় না ডুবতেও চায় না। কিন্তু সাধারণ লোকে সাধারণ লোককে কি ধর্ম, কি নীতি, কি কাব্য, সকল রাজ্যেই অহরহ ডানায় ভর দিয়ে থাকতেই পরামর্শ দেয়। একটু উঁচুতে না চড়লে আমরা দর্শক এবং শ্রোতৃ-মণ্ডলীর নয়ন-মন আকর্ষণ করতে পারি নে। বেদীতে না বসলে আমাদের উপদেশ কেউ মানে না, রঙ্গমঞ্চে না চড়লে আমাদের অভিনয় কেউ দেখে না, আর কাষ্ঠমঞ্চে না দাঁড়ালে আমাদের বক্তৃতা কেউ শোনে না। সুতরাং জনসাধারণের চোখের সম্মুখে থাকবার লোভে আমরাও অগত্যা চব্বিশ ঘণ্টা টঙে চড়ে থাকতে চাই, কিন্তু পারি নে। অনেকের পক্ষে নিজের আয়ত্তের বহির্ভূত উচ্চস্থানে ওঠবার চেষ্টাটাই মহাপতনের কারণ হয়। এ-সব কথা বলবার অর্থ এই যে, কণ্টকর হলেও আমাদের পক্ষে অবশ্য মহাজনদের পথ অনুসরণ করাই কর্তব্য। কিন্তু ডাইনে-বাঁয়ে ছোটোখাটো গলিঘুঁজিতে খেলাচ্ছলে প্রবেশ করবার যে অধিকার তাঁদের আছে, সে অধিকারে আমরা কেন বঞ্চিত হব? গান করতে গেলেই যে সুর তারায় চড়িয়ে রাখতে হবে, কবিতা লিখতে হলেই যে মনের শুধু গভীর ও প্রখর ভাব প্রকাশ করতে হবে, এমন কোনো নিয়ম থাকা উচিত নয়। শিল্পরাজ্যে খেলা করবার প্রবৃত্তির ন্যায় অধিকারও বড়ো-ছোটো সকলেরই সমান আছে। এমন-কি, এ কথা বললেও অত্যুক্তি হয় না যে, এ পৃথিবীতে একমাত্র খেলার ময়দানে ব্রাহ্মণশূদ্রের প্রভেদ নেই। রাজার ছেলের সঙ্গে দরিদ্রের ছেলেরও খেলায় যোগ দেবার অধিকার আছে। আমরা যদি একবার সাহস করে কেবলমাত্র

খেলা করবার জন্য সাহিত্যজগতে প্রবেশ করি, তা হলে নির্বিবাদে সে জগতের রাজা-রাজড়ার দলে মিশে যাব। কোনোরূপ উচ্চ আশা নিয়ে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেই নিম্নশ্রেণীতে পড়ে যেতে হবে।

২

লেখকেরাও অবশ্য দশের কাছে হাততালির প্রত্যাশা রাখেন, বাহবা না পেলে মনঃক্ষুণ্ণ হন। কেননা তাঁরাই হচ্ছেন যথার্থ সামাজিক জীব, বাদবাকি সকলে কেবলমাত্র পারিবারিক। বিশ্বমানবের মনের সঙ্গে নিত্যনূতন সম্বন্ধ পাতানোই হচ্ছে কবি-মনের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম। এমন-কি, কবির আপন মনের গোপন কথাটিও গীতিকবিতাতে রঙ্গভূমির স্বগতোক্তিস্বরূপেই উচ্চারিত হয়, যাতে করে সেই মর্মকথা হাজার লোকের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু উচ্চমঞ্চে আরোহণ করে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চবাচ্য না করলে যে জনসাধারণের নয়ন-মন আকর্ষণ করা যায় না, এমন কোনো কথা নেই। সাহিত্যজগতে যাঁদের খেলা করবার প্রবৃত্তি আছে, সাহস আছে ও ক্ষমতা আছে, মানুষের নয়ন-মন আকর্ষণ করবার সুযোগ বিশেষ করে তাঁদের কপালেই ঘটে। মানুষে যে খেলা দেখতে ভালোবাসে তার পরিচয় তো আমরা এই জড় সমাজেও নিত্যই পাই। টাউনহলে বক্তৃতা শুনতেই বা ক'জন যায় আর গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখতেই বা ক'জন যায়। অথচ এ কথাও সত্য যে, টাউনহলের বক্তৃতার উদ্দেশ্য অতি মহৎ— ভারত-উদ্ধার, আর গড়ের মাঠের খেলোয়াড়দের ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি আগাগোড়া অর্থশূন্য এবং উদ্দেশ্য-বিহীন। আসল কথা এই যে, মানুষের দেহমনের সকলপ্রকার ক্রিয়ার মধ্যে ক্রীড়া শ্রেষ্ঠ, কেননা তা উদ্দেশ্যহীন। মানুষে যখন খেলা করে, তখন সে এক আনন্দ ব্যতীত অপর কোনো ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখে না। যে খেলার ভিতর আনন্দ নেই কিন্তু উপরিপাওনার আশা আছে, তার নাম খেলা নয়, জুয়াখেলা। ও ব্যাপার সাহিত্যে চলে না, কেননা ধর্মত জুয়াখেলা লক্ষ্মীপূজার অঙ্গ, সরস্বতীপূজার নয়। এবং যেহেতু খেলার আনন্দ নিরর্থক অর্থাৎ অর্থগত নয়, সে কারণ তা কারো নিজস্ব হতে পারে না। এ আনন্দে সকলেরই অধিকার সমান।

সুতরাং সাহিত্যে খেলা করবার অধিকার যে আমাদের আছে, শুধু তাই নয়, স্বার্থ এবং পরার্থ এ দুয়ের যুগপৎ সাধনের জন্য মনোজগতে খেলা করাই হচ্ছে আমাদের পক্ষে সর্বপ্রধান কর্তব্য। যে লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে ফলের চাষ করতে ব্রতী হন, যিনি কোনোরূপ কার্য-উদ্ধারের অভিপ্রায়ে লেখনী ধারণ করেন, তিনি গীতের মর্মও বোঝেন না, গীতার ধর্মও বোঝেন না। কেননা খেলা হচ্ছে জীব-জগতে একমাত্র নিষ্কাম কর্ম, অতএব মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। স্বয়ং ভগবান বলেছেন, যদিচ তাঁর কোনোই অভাব নেই তবুও তিনি এই বিশ্ব সৃজন করেছেন, অর্থাৎ সৃষ্টি তাঁর লীলামাত্র। কবির সৃষ্টিও এই বিশ্বসৃষ্টির অনুরূপ, সে সৃজনের মূলে কোনো অভাব দূর করবার অভিপ্রায় নেই— সে সৃষ্টির মূল অন্তরাত্মার স্ফূর্তি এবং তার ফুল আনন্দ। এক কথায় সাহিত্যসৃষ্টি জীবাত্মার লীলামাত্র, এবং সে লীলা বিশ্বলীলার অন্তর্ভূত; কেননা জীবাত্মা পরমাত্মার অঙ্গ এবং অংশ।

৩

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারো মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্যে খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙা লাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক— এই-সব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না। কারণ পাঠকসমাজ যে-খেলনা আজ আদর করে, কাল সেটিকে ভেঙে ফেলে— সে প্রাচ্যই হোক আর পাশ্চাত্যই হোক, কাশীরই হোক আর জর্মানিরই হোক, দুদিন ধরে তা কারো মনোরঞ্জন করতে পারে না। আমি জানি যে, পাঠকসমাজকে আনন্দ দিতে গেলে তাঁরা প্রায়শই বেদনাবোধ করে থাকেন। কিন্তু এতে ভয় পাবার কিছুই নেই; কেননা কাব্যজগতে যার নাম আনন্দ, তারই নাম বেদনা। সে যাই হোক, পরের মনোরঞ্জন করতে গেলে সরস্বতীর বরপুত্রও যে নটবিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্বয়ং ভারতচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য না হলে তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করতেন না, কিন্তু তাঁর হাতে বিদ্যা ও সুন্দরের অপূর্ব মিলন সংঘটিত হত; কেননা knowledge এবং art উভয়ই তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল। বিদ্যাসুন্দর খেলনা হলেও রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা— সুবর্ণে গঠিত, সুগঠিত এবং মণিমুক্তায় অলংকৃত। তাই আজও তার যথেষ্ট মূল্য আছে, অন্তত জহুরীর কাছে। অপর পক্ষে এ যুগে পাঠক হচ্ছে জনসাধারণ, সুতরাং তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হলে আমাদের অতি সস্তা খেলনা গড়তে হবে, নইলে তা বাজারে কাটবে না। এবং সস্তা করার অর্থ খেলো করা। বৈশ্য লেখকের পক্ষেই শূদ্র পাঠকের মনোরঞ্জন করা সংগত। অতএব সাহিত্যে আর যাই কর-না-কেন, পাঠকসমাজের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা কোরো না।

৪

তবে কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককে শিক্ষা দেওয়া?— অবশ্য নয়। কেননা কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত। স্কুল না বন্ধ হলে যে খেলার সময় আসে না, এ তো সকলেরই জানা কথা। কিন্তু সাহিত্যরচনা যে আত্মার লীলা, এ কথা শিক্ষকেরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। সুতরাং শিক্ষা ও সাহিত্যের ধর্ম কর্ম যে এক নয়, এ সত্যটি একটু স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যক। প্রথমত শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু যা লোকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়, অপর পক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয় সানন্দে পান করে; কেননা শাস্ত্রমতে সে রস অমৃত। দ্বিতীয়ত শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে বিশ্বের

খবর জানানো, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো; কাব্য যে সংবাদপত্র নয়, এ কথা সকলেই জানেন। তৃতীয়ত অপরের মনের অভাব পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যেই শিক্ষকের হস্তে শিক্ষা জন্মলাভ করেছে, কিন্তু কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে আনন্দদান করা, শিক্ষাদান করা নয়, একটি উদাহরণের সাহায্যে তার অকাট্য প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। বাল্মীকি আদিতে মুনিঋষিদের জন্য রামায়ণ রচনা করেছিলেন, জনগণের জন্য নয়। এ কথা বলা বাহুল্য যে, বড়ো বড়ো মুনিঋষিদের কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু রামায়ণ শ্রবণ করে মহর্ষিরাও যে কতদূর আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন তার প্রমাণ তাঁরা কুশীলবকে তাঁদের যথাসর্বস্ব, এমন-কি, কৌপীন পর্যন্ত, পেলা দিয়েছিলেন। রামায়ণ কাব্য হিসাবে যে অমর এবং জনসাধারণ আজও যে তার শ্রবণে-পঠনে আনন্দ উপভোগ করে তার একমাত্র কারণ, আনন্দের ধর্মই এই যে তা সংক্রামক। অপর পক্ষে লাখে একজনও যে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের ছায়া মাড়ান না তার কারণ, সে বস্তু লোককে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল, আনন্দ দেবার জন্যে নয়। আসল কথা এই যে, সাহিত্য কস্মিন্‌কালেও স্কুলমাস্টারির ভার নেয় নি। এতে দুঃখ করবার কোনো কারণ নেই। দুঃখের বিষয় এই যে, স্কুলমাস্টারেরা একালে সাহিত্যের ভার নিয়েছেন।

কাব্যরস নামক অমৃতে যে আমাদের অরুচি জন্মেছে, তার জন্য দায়ী এ যুগের স্কুল এবং তার মাস্টার। কাব্য পড়বার ও বোঝবার জিনিস, কিন্তু স্কুলমাস্টারের কাজ হচ্ছে বই পড়ানো ও বোঝানো। লেখক এবং পাঠকের মধ্যে এখন স্কুলমাস্টার দণ্ডায়মান। এই মধ্যস্থদের কৃপায় আমাদের সঙ্গে কবির মনের মিলন দূরে যাক, চার চক্ষুর মিলনও ঘটে না। স্কুলঘরে আমরা কাব্যের রূপ দেখতে পাই নে, শুধু তার গুণ শুনি। টীকা-ভাষ্যের প্রসাদে আমরা কাব্য সম্বন্ধে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব জানি, কিন্তু সে যে কি বস্তু তা চিনি নে। আমাদের শিক্ষকদের প্রসাদে আমাদের এ জ্ঞান লাভ হয়েছে যে, পাথুরে-কয়লা হীরার সবর্ণ না হলেও সগোত্র; অপর পক্ষে হীরক ও কাচ যমজ হলেও সহোদর নয়। এর একের জন্ম পৃথিবীর গর্ভে, অপরটির মানুষের হাতে; এবং এ উভয়ের ভিতর এক দা-কুমড়ার সম্বন্ধ ব্যতীত অপর কোনো সম্বন্ধ নেই। অথচ এত জ্ঞান সত্ত্বেও আমরা সাহিত্যে কাচকে হীরা এবং হীরাকে কাচ বলে নিত্য ভুল করি, এবং হীরা ও কয়লাকে একশ্রেণীভুক্ত করতে তিলমাত্রও দ্বিধা করি নে, কেননা ওরূপ করা যে সংগত তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আমাদের মুখস্থ আছে। সাহিত্য শিক্ষার ভার নেয় না, কেননা মনোজগতে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কবির কাজের ঠিক উলটো। কারণ কবির কাজ হচ্ছে কাব্য সৃষ্টি করা, আর শিক্ষকের কাজ হচ্ছে প্রথমে তা বধ করা, তার পরে তার শবচ্ছেদ করা, এবং ঐ উপায়ে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করা ও প্রচার করা। এই-সব কারণে নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, কারো মনোরঞ্জন করাও সাহিত্যের কাজ নয়, কাউকে শিক্ষা দেওয়াও নয়। সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়। বিচারের সাহায্যে এই মাত্রই প্রমাণ করা যায়। তবে বস্তু যে কি, তার জ্ঞান অনুভূতিসাপেক্ষ, তর্কসাপেক্ষ নয়। সাহিত্যে মানবাত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ

করে। এ কথার অর্থ যদি স্পষ্ট না হয় তা হলে কোনো সুদীর্ঘ ব্যাখ্যার দ্বারা তা স্পষ্টতর করা আমার অসাধ্য।

এই-সব কথা শুনে আমার জনৈক শিক্ষাভক্ত বন্ধু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সাহিত্য খেলাচ্ছলে শিক্ষা দেয়। এ কথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, সরস্বতীকে কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষয়িত্রীতে পরিণত করবার জন্য যতদূর শিক্ষা-বাতিকগ্রস্ত হওয়া দরকার, আমি আজও ততদূর হতে পারি নি।

শ্রাবণ ১৩২২

বর্তমান বঙ্গ সাহিত্য

অনেকে বলে থাকেন যে, আমাদের সাহিত্যের সত্যযুগ ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গেই এ দেশ থেকে অন্তর্ধান হয়েছে। এখন ঘোর কলি, কেননা এ যুগে সাহিত্যের যে একটিমাত্র পদ অবশিষ্ট আছে সে হচ্ছে সমালোচনা এবং আমাদের যতকিছু লাফা-ঝাঁপি সে-সব ঐ এক পায়ের উপর, তার পর ভবিষ্যতে যখন উক্ত পদের আস্ফালন বন্ধ হবে, তখন মন্বন্তর। এ-সব কথা শুনে আমি হতাশ হয়ে পড়ি নে, কেননা অতীতের চাইতে ভবিষ্যতের প্রতি আমার ভক্তি ও ভালোবাসা দুইই বেশি আছে। আমরা ইভলিউশন-পন্থী; সুতরাং আমাদের সত্যযুগ পিছনে পড়ে নেই, সুমুখে গড়ে উঠছে। আমাদের কল্পিত ধরার স্বর্গ অতীতের ভুঁই ফুঁড়ে উঠবে না, বর্তমানের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং আমাদের কাছে অতীতের অপেক্ষা বর্তমান ঢের বেশি মূল্যবান। অতীতের সাহায্যে আমরা বড়োজোর বর্ত-মানের ব্যাখ্যা করতে পারি, তাও আবার আংশিক ভাবে, কিন্তু বর্তমানের সাহায্যে আমরা ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারি। আবিষ্কার করার চাইতে নির্মাণ করা যে-পরিমাণে শ্রেষ্ঠ অতীতের জ্ঞানের চাইতে বর্তমানের জ্ঞান লাভ করা সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মানুষ বর্তমানকেই সবচাইতে কম চেনে এবং কম জানে। এ পৃথিবীতে যা চিরপরিচিত তাই সবচেয়ে অপরিচিত। যা চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের চোখের সুমুখে থাকে, তার দিকে আমরা বড়ো-একটা দৃষ্টিপাত করি নে। ঐ কারণেই বর্তমানের চেহারা আমাদের চোখে পড়ে না এবং তার রূপ আমাদের মনে ধরে না। তা ছাড়া বর্তমান একটি প্রবাহ, দিনের পর দিন হচ্ছে কালের ঢেউয়ের পরে ঢেউ, সুতরাং এ বর্তমানের ইয়ত্তা করতে হলে কালের ঢেউ গুনতে হয়। অপর পক্ষে অতীত হচ্ছে একটি জমাট নিরেট জড় পদার্থ, তার চারি দিকে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করা যায়। সুতরাং অতীতের গুণকীর্তন করা নেহাত সহজ, বিশেষত চোখ বুজে। আর-এক কথা, স্বদেশের অতীত হচ্ছে প্রতি জাতির পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি এবং তা সমাজের ভোগ-দখলের বিষয়, অতএব তার প্রতি সাংসারিক মনের টানও বেশি মানও বেশি। বর্তমানের দুর্ভাগ্য এই যে, তা অস্থাবর। এবং তার যা ভোগ সে শুধু কর্মভোগ। এই কারণে বর্তমানকে ছোঁয়া যায়, ধরা যায় না। বর্তমান সাহিত্য হচ্ছে বর্তমানেরই একটি অঙ্গ, কাজেই বর্তমান সাহিত্যিকরা গেঁয়ো যোগীর ন্যায় সমাজের কাছে ভক্তি পাওয়া দূরে থাক্, ভিখও পান না। অথচ এই উপেক্ষিত বর্তমানই যখন আমাদের অদূর-ভবিষ্যতের নির্ভরস্থল, তখন এ যুগের সাহিত্যের যথাসম্ভব পরিচয় নেবার চেষ্টা করাটা আবশ্যক। চেষ্টা করলে হয়তো এর ভিতর থেকেও একটা আশার চেহারা বার করা যেতে পারে।

আমাদের পক্ষে নবসাহিত্যের নিন্দা করা যেমন সহজ,—প্রশংসা করা তেমনি

কঠিন। কেননা খ্যাতনামা লেখকদের বিচার করবার অধিকার যেখানে কারো নেই, সেখানে অখ্যাতনামা লেখকদের উপরে জজ্ হয়ে বসবার অধিকার সকলেরই আছে। জন্মাবধি উঠতে বসতে খেতে শুতে যে বস্তুর সুখ্যাতি শুনে আসছি, সে বস্তু যে মহার্ঘ এ বিশ্বাস অজ্ঞাতসারে আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। গুরুজনদের তৈরি মত আমরা বিনা বাক্যে মেনে নিই, কেননা তা মেনে নেবার ভিতর মনের কোনো খাটুনি নেই। যদি আমরাই চিন্তামার্গে ক্লেশ করব, তা হলে গুরুর দরকার কি। আর যদি আমরাই পুজো করব তা হলে পুরোহিতের দরকার কি। কেননা গুরুপুরোহিতেরা সমাজের হাতে-গড়া, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক labour-saving machines। নবসাহিত্যের দুর্ভাগ্যই এই যে, তা অতীতের ডিপ্লোমা নিয়ে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয় না ; এ সাহিত্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হলে নিজের অনুভূতি দিয়ে তা যাচাই করতে হয়, নিজের বুদ্ধি দিয়ে তা পরীক্ষা করতে হয়। আমরা ক'জনে সে পরিশ্রমটুকু করতে রাজি? সুতরাং নবসাহিত্যের প্রশংসার চাইতে নিন্দাই যে বেশির ভাগ শোনা যায়, তাতে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই। এই-সকল নিন্দাবাদের বিচারসূত্রেই আমরা প্রকারান্তরে নবসাহিত্যের গুণাগুণের বিচার করতে চাই।

নবসাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তা অপর্যাপ্ত ও সস্তা, বিশেষত্বহীন ও প্রতিভাহীন, চুটকি ও নকল। আমি একে একে এই-সকল অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

নবসাহিত্যের পরিমাণ যে অপর্যাপ্ত তা অস্বীকার করবার জো নেই। বর্তমানে এত নিত্যনূতন পুস্তক এবং পুস্তিকা, পত্র এবং পত্রিকা ভূমিষ্ঠ হচ্ছে যে, এ যুগের তুলনায় বঙ্গদর্শনের যুগের বঙ্গসরস্বতীকে বন্ধ্যা বললেও অত্যুক্তি হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের নামে এই অপবাদ ছিল যে, বাঙালি রসনাসর্বস্ব, বিংশ শতাব্দীতে আমরা যদি কিছু হই তো রচনাসর্বস্ব। এমন-কি, এই নবযুগধর্মের শাসনে গত যুগের অনেক পাকা বক্তারা কেঁচে আবার লেখক হয়ে উঠছেন নইলে যে তাঁদের গাদে পড়ে থাকতে হয়।

এক কথায়, আজকের দিনে বাংলার সাহিত্যসমাজ লোকে লোকারণ্য ; এবং এ জনতার মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আছেন। বঙ্গ সাহিত্যের মন্দিরে বঙ্গমহিলারা যে শুধু প্রবেশ লাভ করেছেন তা নয়, অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসেছেন। বসেছেন বলা বোধ হয় ঠিক হল না, কারণ এ স্থলে এঁরা বসে নেই, পুরুষদের সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলছেন। ইংরেজি রাজনীতির ভাষায় যাকে বলে peaceful penetration, সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে স্ত্রীজাতি আমাদের সাহিত্যরাজ্য ধীরে ধীরে এতটা দখল করে নিচ্ছেন যে, আমার সময়ে সময়ে আশঙ্কা হয় যে, এ রাজ্য হয়তো ক্রমে নারীরাজ্য হয়ে উঠবে। এ আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক নয়, তার প্রমাণ গত মাসের 'ভারতবর্ষে'র প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। সাহিত্যসমাজের এই পরদাপার্টিতে অন্তত চল্লিশ জন ভদ্রমহিলা যোগদান করেছিলেন। যে দেশে স্ত্রীশিক্ষা নেই, সে দেশে স্ত্রীসাহিত্যের এতটা প্রসার ও পসার বৃদ্ধির ভিতর কি একটু রহস্য নেই? এতেই কি প্রমাণ হয় না যে, এই নব-

সাহিত্যের মূলে এমন-একটি অজ্ঞাত অবাধ্য এবং অদম্য শক্তি নিহিত রয়েছে, যার স্ফূর্তি কোনোরূপ বাহ্য ঘটনার অধীন নয়? বালিকাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয় স্থলেই নবসাহিত্য যে সমভাবে ও সমতেজে অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হচ্ছে, এর থেকে বোঝা উচিত যে, আমাদের জাতীয় মন কোনো নৈসর্গিক কারণে সহসা অসম্ভব রকম উর্বর হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে আশার বীজ বপন করাই সংগত, নিরাশার নয়ন-আসার নয়।

এ স্থলে নিজের কৈফিয়তস্বরূপে একটা কথা বলে রাখা আবশ্যক। কেউ মনে করবেন না যে, আমি লেখিকাদের উপর কোনোরূপ কটাক্ষ করে এ-সব কথা বলছি। কেননা তাঁদের রচিত সাহিত্যে এক স্বাক্ষর ব্যতীত স্ত্রীহস্তের অপর কোনো চিহ্ন নেই। ও-সব লেখা শ্রী-স্বাক্ষরিত হলে তার থেকে 'মতী'-ভ্রংশতার পরিচয় কেউ পেতেন না। এ দেশে স্ত্রী-পুরুষের যে কোনো প্রভেদ আছে তা বঙ্গ সাহিত্য থেকে ধরবার জো নেই।

এত বেশি লোক যে এত বেশি লেখা লিখছে, তাতে আনন্দিত হবার অপর কারণও আছে। এই অজস্র রচনা এই সত্যের পরিচয় দেয় যে, বাঙালি জাতি এ যুগে আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। যদি কেউ এ স্থলে এ কথা বলেন যে, বাঙালির রচনা যে-পরিমাণে প্রকাশিত হচ্ছে সে-পরিমাণে কিছুই প্রকাশ করছে না, তার উত্তরে আমি বলব যে, বাঙালির জাতীয় আত্মা আজও গড়ে ওঠে নি এবং সে আত্মা গড়ে তোলবার পক্ষে সাহিত্য একমাত্র না হলেও একটি প্রধান উপায়। মানুষের দেহ যেমন দৈহিক ক্রিয়াগুলির চর্চার সাহায্যে গড়ে ওঠে, মানুষের মনও তেমনি মানসিক ক্রিয়ার সাহায্যে গড়ে ওঠে। জাতীয় আত্মা আবিষ্কার করবার বস্তু নয়, নির্মাণ করবার বস্তু। আত্মাকে প্রকাশ করবার উদ্যম এবং প্রযত্ন থেকেই আত্মার আবির্ভাব হয়, কেননা সৃষ্টি বহির্মুখী। অবশ্য আমি তাই বলে এ দাবি করি নে যে, আজকাল যত কথা ছাপায় উঠছে তার সকল কথাই জাতীয় মনের উপর ছাপ রেখে যাবে। 'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর'—ভারতচন্দ্রের এ উক্তি ব্যক্তির পক্ষে যেমন সত্য, জাতির পক্ষে তেমনি সত্য। সুতরাং বাঙালি জাতি যে অনেক বাক্য বৃথা ব্যয় করছেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যে কথা বলবার কোনো আবশ্যকতা ছিল না সে কথা বলা হয়েছে বলেই যে তা টিঁকে যাবে, এমন ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। সাহিত্যজগৎও যোগ্যতরের উদ্‌বর্তনের নিয়মের অধীন। কালের নির্মম কবলে পড়ে যা ক্ষীণজীবী তা অচিরে বিনাশ-প্রাপ্ত হবেই হবে। তবে বহু লোকে বহু কথা বললে অনেক সত্য কথা উক্ত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। নানা মুনির নানা মত থাকাটা দুঃখের বিষয় নয়, নানা মুনির মতের ঐক্যটাই সাহিত্যসমাজে আসল দুঃখের বিষয়। কেননা সে মত যদি ভুল হয় তা হলে সাহিত্যের ষোলো-কড়াই কানা হয়ে যায়। এবং মুনিদের যে মতিভ্রম হয় এ কথা সংস্কৃতেও লেখা আছে। এ যুগের বঙ্গসরস্বতী বহুভাষী হলেও যে বহুরূপী নন এ তো প্রত্যক্ষ সত্য। তবে আমাদের সাহিত্যের সুর যে একঘেয়ে তার কারণ আমাদের জীবন বৈচিত্র্যহীন, এবং এই বৈচিত্র্যহীনতার চর্চা আমরা একটা জাতীয় আর্ট করে তুলেছি। উদাহরণস্বরূপে দেখানো যেতে পারে যে আমাদের

বন্ধমূল ধারণা এই যে, নানা যন্ত্র এক সুরে বেঁধে তাতে এক সুর বাজালেই ঐকতান হয়। আর্ট-জগতে এই অদ্বৈতবাদের হাত থেকে উদ্ধার না পেলে বঙ্গ সাহিত্য মুক্তিলাভ করবে না, এবং যতদিন এ দেশে আবার নূতন চৈতন্যের আবির্ভাব না হবে ততদিন আমরা এক কথাই একশো বার বলব, কেননা সে কথা বলার ভিতরেও মন নেই, শোনার ভিতরেও মন নেই। তাই বলে আমাদের সকল লেখাপড়া একেবারেই অনর্থক নয়। আমরা আর-কিছু করি আর না করি ভাবী গুণীর জন্য আসর জাগিয়ে রাখছি। পাঠকসমাজকে ঘুমিয়ে পড়তে না দেওয়াটাও একটা কম কাজ নয়।

আমরা সদলবলে সাহিত্য তৈরি করি আর না করি, সদলবলে পাঠক তৈরি করছি।

পূর্বে যা বলা গেল, তা অবশ্য সকলের সমান মনঃপূত হবে না, কিন্তু এ কথা আপনারা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য যে, যে ক্ষেত্রে লেখকের সংখ্যা অগণ্য, সে ক্ষেত্রে কোনো লেখক-এরণ্ড সাহিত্য-দ্রুম স্বরূপে গ্রাহ্য হবেন না। এ বড়ো কম লাভের কথা নয়। হাজার অপ্রিয় হলেও এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের কোনো কোনো এরণ্ড এমন মহাবোধিবৃক্ষত্ব লাভ করেছিলেন যে, অদ্যাবধি বঙ্গ সাহিত্যের পুরোনো পাণ্ডারা তাঁদের গায়ে সিঁদুর লেপে অপরকে পূজা করতে বলেন। অমুকে কি লিখেছেন কেউ না জানলেও তিনি যে একজন বড়ো লেখক তা সকলেই জানেন, এমন প্রথিতযশা প্রবীণ সাহিত্যিকের দৃষ্টান্ত বঙ্গ-দেশে বিরল নয়।

এ সাহিত্যের বিরুদ্ধে চুটকিত্বের যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, সে অপবাদের সত্যাসত্য একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ছোটো গল্প, খণ্ড কবিতা, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা এবং প্রক্ষিপ্ত দর্শনই এ সাহিত্যের প্রধান সম্বল। সমালোচকদের মতে এই কৃশতাই হচ্ছে এ সাহিত্যের দুর্বলতার লক্ষণ। বিংশ শতাব্দীতে যে কোনো নূতন মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার কিংবা শকুন্তলাতত্ত্ব লেখা হয় নি, এ কথা সত্য। এ যুগের কবিদের বাহু যে আজানুলম্বিত নয়, তার জন্য আমাদের লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই। বধ এবং সংহার ছাড়া কাব্যের যে অপর কোনো কর্তব্য নেই, এ কথা একালে মানা কঠিন। আর যদি এ কথা সত্য হয় যে, মার্‌কাট্‌ ব্যাপার না থাকলে কাব্য মহাকাব্য হয় না তা হলে বলতে হয় যে, সাহিত্যজগতের এমন কোনো বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই যার দরুন যুগে যুগে সকলকে শুধু মহাকাব্যই লিখতে হবে। প্যারাডাইস লস্ট-এর পরে ইংরেজি ভাষায় আর দ্বিতীয় মহাকাব্য লেখা হয় নি, এবং ফরাসি ভাষায় ও-শ্রেণীর কাব্য কস্মিন্‌কালেও রচিত হয় নি, তাই বলে ফরাসি সাহিত্য এবং মিল্টনের পরবর্তী ইংরেজি সাহিত্যের যে কোনোরূপ গৌরব নেই, এ কথা বলবার দুঃসাহস কোনো পাশ্চাত্য সমালোচক তাঁদের রক্তমাংসের শরীরে ধারণ করেন না।

তার পর আমরা যে শকুন্তলার চাইতে দ্বিগুণ বড়ো শকুন্তলাতত্ত্ব রচনা করি নে, তার জন্য আমাদের কাছে পাঠকসমাজের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তত্ত্ব হচ্ছে বস্তুর সার, অতএব সংক্ষিপ্ত। এ বিশ্বটি এত বিরাট যে, তাকে সচরাচর অনন্ত ও অসীম বলা হয়ে থাকে, অথচ তাত্ত্বিকেরা বিশ্বতত্ত্ব দু-চারটি ক্ষীণ সূত্রেই আবদ্ধ

করে থাকেন। সুতরাং আমরা কোনো সৃষ্ট পদার্থের বিষয় দুশো হাত তত্ত্বজাল বুনতে সাহসী হই নে, অন্তত কোনো কাব্যরত্নকে সে জালে জড়াতে চাই নে। কাব্যের আগুনের পরিচয় দেবার জন্য তাকে সমালোচনার ছাইচাপা দেওয়াটা সুবিবেচনার কার্য নয়, কেননা সে গুণের পরিচায়ক হচ্ছে অনুভূতি।

এ যুগের রচনার নাতিদীর্ঘতা এই সত্যেরই প্রমাণ দেয় যে, একালের লেখকেরা পাঠকদের মান্য করতে শিখেছেন। হিন্দুস্থানিরা বলেন যে, 'আক্কেলিকো ইসারা বাস্'। যাঁদের শ্রোতার আক্কেলের উপর কোনো আস্থা নেই, তাঁরাই একটুখানি কথাকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে অনেকখানি করে তুলতে ব্যস্ত।

সমালোচকদের মতে বর্তমানের আর-একটি অপরাধ এই যে, এ যুগে এমন কোনো লেখক জন্মগ্রহণ করেন নি, যাঁর প্রতিভায় দেশ উজ্জ্বল করে রেখেছে। এ আমাদের দুর্ভাগ্য, দোষ নয়; প্রতিভার জন্মের রহস্য কোনো দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক অদ্যাবধি উদ্ঘাটন করতে পারেন নি। তবে এটুকু আমরা জানি যে, প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্য চাই। এ কথা যদি সত্য হয় তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে, নূতন সাহিত্য গড়বার যে সুযোগ গত শতাব্দীর লেখকেরা পেয়েছিলেন, সে সুযোগ আমরা অনেকটা হারিয়েছি।

গত যুগের লেখকেরা সবাই প্রধান না হোন, সবাই স্বাধীন ছিলেন। তৎপূর্ব-যুগের বঙ্গ সাহিত্যের চাপের ভিতর থেকে তাঁদের তেড়ে-ফুঁড়ে বেরতে হয় নি। একটি সম্পূর্ণ নূতন এবং প্রভূত ঐশ্বর্য ও অপূর্ব সৌন্দর্য-শালী সাহিত্যের সংস্পর্শেই ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ সাহিত্য জন্মলাভ করে। সে সাহিত্যের উপর প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের বঙ্গ সাহিত্যের কোনোরূপ প্রভুত্ব ছিল না। অন্নদামঙ্গলের ভাষা ও ছন্দের কোনোরূপ খাতির রাখলে মাইকেল মেঘনাদবধ রচনা করতেন না, এবং বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কাহিনীর কোনোরূপ খাতির রাখলে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশ-নন্দিনী রচনা করতেন না। মিল্টন এবং স্কট যাঁদের গুরু, তাঁদের কাছে ভারতচন্দ্রের ঘেঁষবার অধিকার ছিল না।

কিন্তু আজকের দিনে ইংরেজি সাহিত্য আমাদের কাছে এতটা পরিচিত এবং গা-সওয়া হয়ে এসেছে যে, তার থেকে আমরা আর বিশেষ কোনো নূতন উদ্দীপনা কিংবা উত্তেজনা লাভ করি নে। আমাদের মনে ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম পরিচয়ের চমক ভেঙেছে, কিন্তু বিশেষ পরিচয়ের প্রভাব স্থান পায় নি। সুতরাং আমরা গত যুগের সাহিত্যেরই জের টেনে আসছি। আমাদের পক্ষে তাই নতুন কিছু করা একরকম অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতিভাশালী লেখকের সাক্ষাৎ আমরা সেই যুগে পাই, যে যুগে একটা নূতন এবং প্রবল ভাবের প্রবাহ হয় ভিতর থেকে ওঠে নয় বাইরে থেকে আসে। গত যুগে যে ভাবের জোয়ার বাইরে থেকে এসেছিল, এ যুগে তার তোড় এত কমে এসেছে যে, ভাটা শুরু হয়েছে বলা যেতে পারে। এদিকে ভিতর থেকেও একটা নূতন কোনো ভাবের উৎস খুলে যায় নি। বরং সমাজের মনের টান আজ পুরাতনের দিকে, এও তো ভাবের প্রবাহের ভাটার অন্যতম লক্ষণ। এই ভাটার মুখে নতুন কিছু করতে হলে কালের স্রোতে উজান বইতে হয়। তা করা সহজ নয়। এ অবস্থায় যা করা সহজ তা হচ্ছে সনাতন জ্যাঠামি।

সুতরাং নবসাহিত্যকে বিশেষত্বহীন এবং প্রতিভাহীন বলায় সহৃদয়তার পরিচয় দেওয়া হয় না। আরো বিপদের কথা এই যে, আমরা উভয়সংকটে পড়েছি। কেননা যদি আমরা গত শতাব্দীর সাহিত্যের অনুসরণ করি, তা হলে সমালোচকদের মতে আমরা নকল সাহিত্য রচনা করি। আর যদি অনুকরণ না করি, তা হলে পূর্বোক্ত মতে আমরা কাব্যের উচ্চ আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হই। অথচ আসল ঘটনা এই যে, নবযুগ কতক অংশে পূর্ব যুগের অধীন এবং কতক অংশে স্বাধীন। এই কারণে নবীন সাহিত্যিকেরা গত যুগের সাহিত্যের কোনো কোনো অংশের অনুকরণ করতে অক্ষম এবং কোনো কোনো অংশের অনুসরণ করতে বাধ্য। একালে যে মেঘনাদবধ কিংবা দুর্গেশনন্দিনীর অনুকরণে গদ্য এবং পদ্য কাব্য রচিত হয় না, তার কারণ বাঙালি জাতির মনের কলে স্কট মিল্টন মিল্ ও কং-এর চাবির দম ফুরিয়ে এসেছে। অপর পক্ষে বর্তমান কাব্যসাহিত্যের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে অতিবিস্তৃত এবং অপ্রতিহত, তা অস্বীকার করবার জোও নেই, প্রয়োজনও নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বর্তমান কাব্যসাহিত্যের একমাত্র আদর্শ বলে যে সে-সাহিত্যের কোনো মূল্য কিম্বা মর্যাদা নেই এ কথা বলায় শুধু স্থূলদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয়। সুতরাং নবসাহিত্যকে নকল সাহিত্য বলার কি সার্থকতা আছে, তাও একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

সাধারণত লোকের বিশ্বাস যে, পরের লেখার অনুকরণ কিম্বা অনুসরণ করে সাহিত্য রচনা করা যায় না। এ কথাটা ষোলো-আনা সত্য নয়। ও উপায়ে অবশ্য কালিদাস হওয়া যায় না, কিন্তু শ্রীহর্ষ হওয়া যায়। রত্নাবলী মালবিকাগ্নিমিত্রের ছাঁচে ঢালা, অথচ সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি উপাদেয় নাটক। পৃথিবীর মহাপ্রাণ কবিদের স্পর্শে বহু লেখক প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন, এবং এই কারণেই তাঁদের অবলম্বন করেই সাহিত্যের নানা স্কুল গড়ে ওঠে। ফরাসি এবং জর্মান সাহিত্যে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্যেটের আনুগত্য স্বীকার করাতে শিলারের প্রতিভার হ্রাস হয় নি। ভিক্টর হিউগোর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুস্‌সে Musset অ-কবির দেশে গিয়ে পড়েন নি। এবং ফ্লোবেয়রের কাছে শিক্ষানবিশি করার দরুন গী দ্য মোপাসাঁর গল্প সাহিত্য-সমাজে উপেক্ষিত হয় নি। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যেও এরূপ ঘটনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যাকে আমরা বৈষ্ণব কবিতা বলি, তা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীর অনুকরণেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস লোচনদাস অনন্তদাসের রচনার যে কোনো মূল্য নেই, এ কথা কোনো সমালোচক সজ্ঞানে বলতে পারবেন না। আর যদি এ কথা সত্য হয় যে, পর-সাহিত্যের অনুকরণে সাহিত্য গঠিত হয় না, তা হলে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সাহিত্য রচিত হয় নি—কেননা গত শতাব্দীর মধ্যযুগের গল্প এবং উপন্যাস, কাব্য এবং মহাকাব্য, সবই যে-সাহিত্যের অনুকরণে রচিত হয়েছিল, সে-সাহিত্য আমাদের নিতান্তই পর; তা অপর দেশের অপর জাতের অপর ভাষায় লিখিত। এ সত্ত্বেও আমরা গত যুগের এই আহেলা বিলাতি সাহিত্যকে বাংলা সাহিত্য বলে আদর করি। তার কারণ এই যে, যে সাহিত্য উপর-সাহিত্য, তা অপরই হোক আর আপনই হোক, মানবমনের উপর তার প্রভাব অনিবার্য।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে এবং অনুসরণে যে কাব্যসাহিত্য রচিত হয়েছে, তা নকল সাহিত্য বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

এই নবকবিদের রচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই নজরে পড়ে যে, এ-সকল রচনা ভাষার পারিপাট্যে এবং আকারের পরিচ্ছন্নতায় পূর্বযুগের কবিতার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। যেমন কেবলমাত্র মনের আনন্দে গান গাইলে তা সংগীত হয় না, তেমনি কেবলমাত্র মনের আবেগে স্বচ্ছন্দে লিখে গেলেও তা কবিতা হয় না। মনের ভাবকে ব্যক্ত করবার ক্ষমতার নামই রচনাশক্তি। মনের ভাবকে গড়ে না তুলতে পারলে তা মূর্তিধারণ করে না, আর যার মূর্তি নেই তা অপরের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হতে পারে না। কবিতা শব্দকায়। ছন্দ মিল ইত্যাদির গুণেই সে কায়ার রূপ ফুটে ওঠে। মনোভাবকে তার অনুরূপ দেহ দিতে হলে শব্দজ্ঞান থাকা চাই, ছন্দমিলের কান থাকা চাই। এ জ্ঞান লাভ করবার জন্য সাধনা চাই, কেননা সাধনা ব্যতীত কোনো আর্টে কৃতিত্ব লাভ করা যায় না। নবকবিরা যে সে-সাধনা করে থাকেন তার কারণ এ ধারণা তাঁদের হৃদয়ংগম হয়েছে যে, লেখা জিনিসটে একটা আর্ট। নবীন কবিদের রচনার সহিত হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' কিংবা নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী'র তুলনা করলে নবযুগের কবিতা পূর্বযুগের কবিতার অপেক্ষা আর্ট-অংশে যে কত শ্রেষ্ঠ তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে। শব্দের সম্পদে এবং সৌন্দর্যে, গঠনের সৌষ্ঠবে এবং সুষমায়, ছন্দে ও মিলে, তালে ও মানে এ শ্রেণীর কবিতা সাহিত্যের ইভলিউশনের এক ধাপ উপরে উঠে গেছে। এ স্থলে হয়তো পূর্বপক্ষ এই আপত্তি উত্থাপন করবেন যে, ভাবের অভাব থেকেই ভাষার এই-সব কারিগরি জন্মলাভ করে। যে কবিতার দেহের সৌন্দর্য নেই, তার যে আত্মার ঐশ্বর্য আছে, এ কথা আমি স্বীকার করতে পারি নে। এলোমেলো ঢিলেঢালা ভাষার অন্তরে ভাবের দিব্যমূর্তি দেখবার মতো অন্তর্দৃষ্টি আমার নেই। প্রচ্ছন্ন মূর্তি ও পরিচ্ছন্ন মূর্তি এক রূপ নয়। ভাব যে কাব্যের আত্মা এবং ভাষা তার দেহ, এ কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কাব্যের দেহ থেকে আত্মা পৃথক্ করা অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। কোথায় দেহের শেষ হয় এবং আত্মার সূত্রপাত হয়, সে সন্ধান কোনো দার্শনিকের জানা নেই। যাঁর রসজ্ঞান আছে তাঁর কাছে এ-সব তর্কের কোনো মূল্য নেই। কবিতা-রচনার আর্ট নবীন কবিদের অনেকটা করায়ত্ত হয়েছে, এ কথা যদি সত্য হয় তা হলে তাঁদের লজ্জা পাবার কোনো কারণ নেই। ভারতচন্দ্র মালিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে—

আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।

স্বয়ং ভারতচন্দ্রের কবিতার যদি ঠাট বাদ দেওয়া যায়, তা হলে যে গুঁড়া অবশিষ্ট থাকে তাতে ফোঁটা দেওয়াও চলে না, কেননা সে গুঁড়া চন্দনের নয়। অথচ ভারতচন্দ্র যে কবি, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। নবীন কবিদের যে ভাবসম্পদ নেই, এ কথা বলায়, আমার বিশ্বাস, কেবলমাত্র অন্যমনস্কতার পরিচয় দেওয়া হয়। মহাকবি ভাস বলেছেন যে, পৃথিবীতে ভালো কাজ করবার লোক সুলভ, চেনবার লোকই দুর্লভ।

মহাকাব্যের দিন যে চলে গেছে, তার প্রমাণ বর্তমান ইউরোপেও পাওয়া যায়। সে দেশে কবিতা আজও লেখা হয়ে থাকে, কিন্তু হাতে-বহরে সে সবই ছোটো। ফরাসিদেশের বিখ্যাত লেখক আঁদ্রে জীদ্ বলেন যে, গীতাঞ্জলি মুষ্টিমেয় না হলে বর্তমান ইউরোপ তা করজোড়ে গ্রহণ করত না। তাঁর ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষে রামায়ণ-মহাভারতের চাইতে ছোটো কিছু লেখা হয় নি এবং হতে পারে না। এ কথা অবশ্য সত্য নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন এক দিকে রামায়ণ-মহাভারত আছে, অপর দিকে তেমনি দু-লাইন চার-লাইন কবিতারও ছড়াছড়ি। ভারতবর্ষে পূর্বে যা ছিল না, সে হচ্ছে এ দুয়ের মাঝামাঝি কোনো পদার্থ। একালে আমরা যে ব্যাস-বাল্মীকির অনুকরণ না করে অমরু-ভর্তৃহরির অনুসরণ করি, সে যুগধর্মের প্রভাবে। যে কারণে ইউরোপে আর মহাকাব্য লেখা হয় না সেই একই কারণে এ দেশেও মহাকাব্য লেখা স্থগিত রয়েছে। এ যুগের কবিতা হচ্ছে হৃদয়ের স্বগতোক্তি, সুতরাং সে উক্তি একটি দীর্ঘনিশ্বাসের চাইতে দীর্ঘ হতে পারে না। কিন্তু একালে গল্প আমরা গদ্যে বলি, কেননা আমরা আবিষ্কার করেছি যে, দুনিয়ার কথা দুনিয়ার লোকের কাছে পোঁছে দেবার জন্য গদ্যের পথই প্রশস্ত। সুতরাং গল্পের উত্তরোত্তর দেহ সংকুচিত হওয়াটা ক্রমোন্নতির লক্ষণ নয়। ইউরোপে আজও গদ্যে এমন-এমন নভেল লেখা হয়ে থাকে, যা আকারে মহাভারতের সমান না হলেও রামায়ণের তুল্যমূল্য। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ নভেলিস্ট টলস্টয়ের এক-একখানি নভেল এক-একখানি মহাকাব্যবিশেষ। ও দেশের গদ্যসাহিত্যে যেমন এক দিকে ব্যাস-বাল্মীকি আছে, অপর দিকে তেমনি অমরু-ভর্তৃহরিরও অভাব নেই। যে ক্ষেত্রে হাজার হাজার পাতার দু-চারটি গল্প জন্মলাভ করছে, সেই ক্ষেত্রেই আবার দু-পাতা চার-পাতার হাজার হাজার গল্প জন্মলাভ করছে—এতেই পরিচয় দেয় যে, ইউরোপের মনের ক্ষেত্র কত সরস কত সতেজ কত উর্বর। সুতরাং আমাদের নব-গদ্যসাহিত্যে যে ছোটোগল্প ছাড়া আর কিছু গজায় না তাতে অবশ্য এ সাহিত্যের দৈন্যেরই পরিচয় দেয়। কিন্তু এ দীনতা ইউরোপীয় সাহিত্যের তুলনায় যতটা ধরা পড়ে, উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ সাহিত্যের তুলনায় ততটা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে গত যুগের গল্পসাহিত্যে সঞ্জীবচন্দ্রের কণ্ঠমালা এবং তারক গাঙ্গুলির স্বর্ণলতা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এ যুগের গল্প-লেখকেরা যে সাধারণত ছোটোগল্প রচনার পক্ষপাতী তার কারণ এই যে, আমাদের জীবন ও মন এতই বৈচিত্র্যহীন এবং সে মনে ও সে জীবনে ঘটনা এত অল্পই ঘটে, এবং যা ঘটে তাও এতটা বিশেষত্বহীন যে, তার থেকে কোনো বিরাট কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করা যায় না। এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে অ্যানা-ক্যারেনিনা কিংবা লে মিজারেব্‌ল্ গড়তে বসায় বাচালতার পরিচয় দেওয়া হয়, প্রতিভার নয়।

এ সমাজে যা পাওয়া যায়, এবং সম্ভবত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সে হচ্ছে ছোটোগল্পের খোরাক। আমাদের জীবনের রঙ্গভূমি যতই সংকীর্ণ হোক-না কেন, তারই মধ্যে হাসিকান্নার অভিনয় নিত্য চলছে, কেননা আমরা আমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব করেও নিজেদের মানুষ ছাড়া অপর কোনো শ্রেণীর জীবে পরিণত করতে পারি নি। ভয়-আশা উদ্যম-নৈরাশ্য ভক্তি-ঘৃণা মমতা-নিষ্ঠুরতা ভালোবাসা-দ্বেষহিংসা

বীরত্ব-কাপুরুষতা, এক কথায় যা নিয়ে এই মানবজীবন, তা মিনিয়েচারে এ সমাজে সবই মেলে। সুতরাং যখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের গল্পসাহিত্যের এই নূতন পথটি খুলে দিলেন তখন আমরা দলে দলে সোৎসাহে সেই পথে এসে পড়লুম। এ অবশ্য আপসোসের কথা নয়। এবং এর জন্যও দুঃখ করবার দরকার নেই যে, এ পথে এখন এমন বহু লোক দেখা যায়, যাদের কাজ হচ্ছে শুধু সে পথের ভিড় বাড়ানো। কি ধর্মে, কি সাহিত্যে, কোনো মহাজন কর্তৃক একটি নূতন পন্থা অবলম্বিত হলে সেখানে চিরদিনই এমনি জনসমাগম হয়ে থাকে, তার মধ্যে দু-চারজন শুধু এগিয়ে যান। এর থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, সে পথ বিপথ ; কিন্তু এই প্রমাণ হয় যে, বেশির ভাগ লোক দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য। Many are called but few are chosen, বাইবেলের এ কথা হচ্ছে এ সম্বন্ধে শেষ কথা। এ যুগে কোনো অসাধারণ প্রতিভাশালী উপন্যাসকার না থাকলেও এমন অনেক গল্প লেখা হয়ে থাকে যা গত শতাব্দীর কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকের কলম হতে বেরত না। সুতরাং নবসাহিত্যে যদি chosen few থাকেন, তা হলে আমাদের ভগ্নোদ্যম

ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়

রামমোহন লাইব্রেরিতে পঠিত*

আমি আপনাদের সম্মুখে ফরাসি সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে প্রস্তুত হয়েছি, এ সংবাদ শুনে আমার কোনো শুভার্থী বন্ধু অতিশয় ব্যতিব্যস্তভাবে আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন যে, 'তুমি ফরাসি সাহিত্য সম্বন্ধে এত কম জানো যে, আমি ভেবে পাচ্ছি নে কি ভরসায় তুমি এ কাজ করতে উদ্যত হয়েছ।' আমি উত্তর করি, 'এই ভরসায় যে, আমার শ্রোতৃমণ্ডলী এ বিষয়ে আমার চাইতেও কম জানেন।'

এ কথা স্বীকার করতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই যে, ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি যৎসামান্য ; কেননা সে সাহিত্য এত বিপুল ও এত বিস্তৃত যে, তার সম্যক্ পরিচয় লাভ করতে একটি পুরো জীবন কেটে যায়। খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দী হতে আরম্ভ করে অদ্যাবধি এই নশো বৎসর ধরে ফরাসি জাতি অবিরাম সাহিত্যসৃষ্টি করে আসছে। সুতরাং ফরাসি সরস্বতীর ভাণ্ডারে যে ঐশ্বর্য সঞ্চিত রয়েছে তার আদ্যোপান্ত পরিচয় নেবার সুযোগ এবং অবসর আমার জীবনে ঘটে নি। এর যে অংশের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে, সে হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যসাহিত্য। প্রাচীন ফরাসি সাহিত্যের উদ্যানে আমি শুধু পল্লবগ্রহণ করেছি। কিন্তু এই স্বল্পপরিচয়ের ফলে আমার মনে ফরাসি সভ্যতার প্রতি একটি আন্তরিক অনুরাগ জন্মলাভ করেছে। সে সাহিত্যের এমন-একটি মোহিনীশক্তি আছে যে, যিনিই তার চর্চা করেন তাঁরই মন ফরাসি সভ্যতার প্রতি একান্ত অনুকূল হয়। যিনিই ফরাসি সাহিত্য ভালোবাসেন তিনিই ফরাসি জাতির সুখের সুখী ব্যথার ব্যথী হয়ে ওঠেন। আজকের দিনে ফ্রান্স তার জাতীয় জীবনের অণুপরমাণুতে যে অত্যাচারের বেদনা অনুভব করছে আমরাও তার অংশীদার। জর্মানির দেহ-বলের নিকট ফ্রান্সের আত্মবল, জর্মানির যন্ত্রশক্তির নিকট ফ্রান্সের মন্ত্রশক্তি যদি পরাভূত হয়, যদি এই যুদ্ধে ফরাসি সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তা হলে ইউরোপের মনোজগতের আলো নিবে যাবে। কি গুণে ফ্রান্স অপর জাতির ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করতে পারে সে বিষয়ে সুবিখ্যাত মার্কিন নভেলিস্ট হেন্‌রি জেম্‌সের কথা নিম্নে উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি—

Our heroic friend sums up for us, in other words, and has always summed up, the life of the mind and the life of the senses alike, taken together, in the most irrepressible freedom of either, and, after that fashion, positively lives for us, carries on experience for us...

She is sole and single in this, that she takes charge of those of

the interests of man which most dispose him to fraternise with himself, to pervade all his possibilities and to taste all his faculties, and in consequence to find and to make the earth a friendlier, an easier, and specially a more various sojourn...

She has gardened where the soil of humanity has been most grateful and the aspect, so to call it, most toward the sun, and there at the high and yet mild and fortunate centre, she has grown the precious, intimate, the nourishing, finishing things that she has inexhaustively scattered abroad.[১]

এই কথাগুলি যেমন সুন্দর তেমনি সত্য।

ইহজীবনে আমাদের দেহমনের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য। আমাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় পরস্পর-অনুপ্রবিষ্ট। এই সত্যের উপরই ফরাসি সাহিত্যের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত। ফরাসি জাতি চিন্তারাজ্যে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে মিথ্যা বলে উড়িয়েও দেয় নি, অকিঞ্চিৎকর বলেও উপেক্ষা করে নি; সুতরাং ফরাসি সাহিত্যের ভিতর সায়েন্স এবং আর্টের একত্রে সাক্ষাৎলাভ করা যায়। হেন্‌রি জেম্‌স বলেছেন যে, ফরাসি জাতি বিশেষ করে সেই-সকল মনোভাবের অনুশীলন করেছেন যাতে করে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা জন্মায়। এই গুণেই ফরাসি সভ্যতা পরকে আপন করতে পারে। ফরাসি সাহিত্য প্রধানত মানবমনের সাধারণ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই তা সর্বলোকগ্রাহ্য এবং সর্বলোকপ্রিয়। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ফরাসি সভ্যতার এই বীজমন্ত্র কোনো ধর্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আপনারা সকলেই জানেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর যে-সকল ফরাসি দার্শনিক বিশ্বমৈত্রীর বার্তা ঘোষণা করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই নাস্তিক ছিলেন। মানবচরিত্রের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপরেই ফরাসি মনোভাব প্রতিষ্ঠিত, এবং সে মনোভাব প্রধানত ফরাসি সাহিত্যই গঠিত করে তুলেছে। হেন্‌রি জেম্‌স বলেছেন যে, ফরাসি মনের চোখ চিরদিনই আলোর দিকে চেয়ে রয়েছে। দিনের আলোয় যা দেখা যায় না, ফরাসি মন স্বভাবতই তা দেখতে চায় না; এর ফলে যে মনোভাব অস্পষ্ট ও অস্ফুট, যে সত্য ধরা দেয় না, শুধু আভাসে ইঙ্গিতে আত্মপরিচয় দেয়, সে মনোভাবের, সে সত্যের সাক্ষাৎ ফরাসি সাহিত্যে বড়ো-একটা পাওয়া যায় না। সরস্বতীদর্শনের কাল, ফরাসি কবিদের মতে, গোধূলিলগ্ন নয়। যা কেবলমাত্র কল্পনার ধন, সে ধনে ফরাসি সাহিত্য অনেক পরিমাণে বঞ্চিত। অপর পক্ষে এই আলোকপ্রিয়তার ফলে সে সাহিত্য অপূর্ব স্বচ্ছতা, অপূর্ব উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। এর তুল্য স্পষ্টভাষী সাহিত্য ইউরোপে আর দ্বিতীয় নেই। আমরা 'স্পষ্টভাষী' শব্দ সচরাচর যে অর্থে ব্যবহার করি, সে অর্থে এ সাহিত্য স্পষ্টভাষী নয়। যিনি দিবারাত্র অপরকে অপ্রিয় কথা বলতে ব্যস্ত, এ দেশে আমরা তাঁকেই স্পষ্টবক্তা বলি— ভাষায় যাকে বলে ঠোঁটকাটা। ফরাসি সাহিত্য কিন্তু ঠোঁটকাটা সাহিত্য নয়।

১ *The Book of France,* Macmillan & Co., 1915.

ফরাসি জাতির ক্ষাত্রধর্ম জগৎবিখ্যাত। ফরাসি লেখকেরা বাক্‌যুদ্ধেও সভ্যতার আইনকানুন মেনে চলেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁরা ধর্মযুদ্ধের পক্ষপাতী। ফরাসি জাতি হাসতে জানে, তাই তারা কথায় কথায় ক্রোধান্ধ হয়ে ওঠে না। তীক্ষ্ম হাসির যে কি মর্মভেদী শক্তি আছে, এ সন্ধান যারা জানে তাদের পক্ষে কটুকাটব্য প্রয়োগ করা অনাবশ্যক। যার হাতে তরবারি আছে, সে লগুড় ব্যবহার করে না। ভল্টেয়ারের হাসির যে বিশ্বজয়ী শক্তি ছিল, তার তুলনায় পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের সকল জেরেমিয়ার উচ্চবাচ্য যে ব্যর্থ, এ সত্য পৃথিবীসুদ্ধ লোক জানে।

ফরাসি সাহিত্য এই অর্থে স্পষ্টভাষী যে, সে সাহিত্যের ভাষায় জড়তা কিংবা অস্পষ্টতার লেশমাত্রও নেই। যে বিষয়ে লেখকের পরিষ্কার ধারণা আছে, সেই কথা অতি পরিষ্কার করে বলাই হচ্ছে ফরাসি সাহিত্যের ধর্ম। আমি পূর্বে বলেছি যে, ফরাসি সাহিত্যের ভিতর সায়েন্স এবং আর্ট দুইই আছে। ফরাসি মনের এই প্রসাদগুণপ্রিয়তার ফলে সে দেশের দর্শন-বিজ্ঞানের ভিতরও সাহিত্যরস থাকে। পাণ্ডিত্য না ফলিয়ে অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় একমাত্র ফরাসি লেখকেরাই দিতে পারেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের ঐকান্তিক চর্চাতেও ফরাসি পণ্ডিতদের সামাজিক বুদ্ধি ও রসজ্ঞান নষ্ট হয় না। প্রকৃত দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক কেবলমাত্র নিজের ব্যবহারের জন্য সত্য আবিষ্কার করতে ব্রতী হন না। মানবজাতির নিকট সত্য প্রকাশ ও প্রচার করাই তাঁর সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং যে সত্য তিনি আবিষ্কার করেছেন, তা পরিষ্কার করে অপরকে দেখিয়ে দেওয়া বুঝিয়ে দেওয়া, যা জটিল তাকে সরল করা, যা কঠিন তাকে সহজ করা তাঁর পক্ষে একান্ত কর্তব্য। এক কথায় সায়েণ্টিস্টের পক্ষে আর্টিস্ট, জ্ঞানীর পক্ষে গুণী হওয়া আবশ্যক। জর্মান পণ্ডিতদের সঙ্গে তুলনা করলেই দেখা যায় ফরাসি পণ্ডিতেরা কত শ্রেষ্ঠ গুণী। জর্মান পণ্ডিতেরা অসাধারণ পরিশ্রম করে যা প্রস্তুত করেন তা অধিকাংশ সময়ে বিদ্যার গ্যাস বই আর কিছুই নয়। অপর পক্ষে ফরাসি পণ্ডিতেরা মানবজাতির চোখের সুমুখে যা ধরে দেন, সে হচ্ছে গ্যাসের আলো। বর্তমান ইউরোপের সর্বপ্রধান দার্শনিক বের্গ্‌স'-র গ্রন্থসকলের সঙ্গে যাঁর সাক্ষাৎপরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, সে-সকল গ্রন্থ কাব্য হিসাবেও সাহিত্যের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে পারে। বের্গ্‌স'-র দর্শন অতি কঠিন, কিন্তু তাঁর রচনা যেমন প্রাঞ্জল তেমনি উজ্জ্বল। দার্শনিকজগতের এই অদ্বিতীয় শিল্পীর হাতে গদ্যরচনা অপূর্ব চমৎকারিত্ব লাভ করেছে। মণিকার যেমন রত্নের সঙ্গে রত্নের যোজনা করেন, বের্গ্‌স'-ও তেমনি পদের সঙ্গে পদের যোজনা করেন। চিন্তারাজ্যের এই ঐন্দ্রজালিকের লেখনীর মুখে বশীকরণমন্ত্র আছে। এই স্বচ্ছতা এই উজ্জ্বলতার বলেই ফরাসি সাহিত্য যুগে যুগে ইউরোপের অপরাপর সাহিত্যের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে। আলোর ধর্ম এই যে, তা দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে এবং সকল দেশকেই নিজের কিরণে উদ্‌ভাসিত করে তোলে। এই কারণেই আমি পূর্বে বলেছি, ফরাসি সভ্যতার নির্বাণের সঙ্গে সঙ্গেই মানবের মনোজগতের আলো নিবে যাবে।

২

এ স্থলে যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, ফরাসি সভ্যতার অধঃপতন হলেও তার পূর্বকীর্তি সবই বিশ্বমানবের জন্য সঞ্চিত থাকবে, অতএব সে সভ্যতার বিনাশে পৃথিবীর এমন কি ক্ষতি হবে। এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব, 'এতে পৃথিবীর যে ক্ষতি হবে তা ইউরোপের অপর কোনো জাতি পূরণ করতে পারবে না।' এ মতের সপক্ষে হেন্‌রি জেম্‌সের আর-একটি কথা উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি। তিনি বলেন যে ফরাসি ইতিহাস ও ফরাসি সাহিত্য বিশ্বমানবকে এ আশা করতে শিখিয়েছে যে, ফরাসি সভ্যতা যুগে যুগে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, এবং এ আশা ভঙ্গ করলে ফ্রান্সের পক্ষে মানবজাতির নিকট বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। তাঁর নিজের কথা এই—

And we have all so taken them from her, so expected them from her as our right, to the point that she would have seemed positively to fail of a passed pledge to help us to happiness if she had disappointed us, this has been because of her treating us to the impression of genius as no nation since the Greeks has treated the watching world and because of our feeling that genius at that intensity is infallible.

সম্প্রতি কোনো কোনো জর্মান প্রফেসার বর্তমান জর্মান জাতির পক্ষ থেকে প্রাচীন গ্রীক জাতির জিনিয়াসের উত্তরাধিকারের দাবি করেছেন ; কিন্তু এ দাবি উক্ত জর্মান প্রফেসার সম্প্রদায় ব্যতীত পৃথিবীর অপর কোনো জাতিই মঞ্জুর করেন নি। অপর পক্ষে ফরাসি জাতির জিনিয়াস যে অদম্য, ফন্‌ব্যুলো Von Bulow প্রভৃতি জর্মান রাজমন্ত্রীরাও তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

জিনিয়াস শব্দের সংস্কৃত প্রতিবাক্য হচ্ছে প্রতিভা। কিন্তু এই প্রতিভা শব্দের অর্থ নিয়ে বিষম মতভেদ আছে। সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে প্রতিভার অর্থ নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি। এ অর্থে ফরাসি জাতি যে অপূর্ব প্রতিভাশালী, তার প্রমাণের জন্য বেশি দূর যাবার দরকার নেই। গত শত বৎসরের ফ্রান্সের ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে তার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্স নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ভোগ করে নি। এই একশো বৎসরের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে ফ্রান্স বারংবার পীড়িত ও বিধ্বস্ত হয়েছে, অথচ এই অশান্তি এই উপদ্রবের ভিতরেও ফ্রান্স মানবজীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই তার নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এসেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাস্তুর এবং দর্শনের ক্ষেত্রে বের্গ্‌স যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষ। আর সাহিত্যক্ষেত্রে হিউগো এবং মুস্‌সে Musset, গোতিয়ে Gautier এবং ভের্‌লেন Verlaine প্রমুখ কবির, রেনাঁ Renan এবং তেইন Taine প্রমুখ সমালোচকের, স্তাঁদাল Stendhal এবং বালজাক, ফ্লোবেয়র এবং মোপাসাঁ, লোতি Loti এবং আনাতোল ফ্রাঁস প্রমুখ উপন্যাসকারের, রোস্তাঁ Rostand এবং ব্রিয় Brieux প্রমুখ নাটককারের নাম ইউরোপের শিক্ষিত-সমাজে কার নিকট অবিদিত? এঁরা সকলেই কাব্যজগতের নব পথের পথিক, নব

বস্তুর স্রষ্টা। এবং এঁদের রচিত সাহিত্য যতই নতুন হোক, এক ফ্রান্স ব্যতীত অপর কোনো দেশে তা রচিত হতে পারত না ; কেননা এ-সকল কাব্যকথা আলোচনার ভিতর থেকে একমাত্র ফরাসি প্রতিভাই ফুটে উঠেছে। এ সাহিত্য সম্পূর্ণ নতুন হলেও বিজাতীয় নয়, পূর্বপূর্ব যুগের ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে এর রক্তের যোগ আছে। ফরাসি প্রতিভা যে কি পরিমাণে অদম্য, দর্শনে বিজ্ঞানে কাব্যে সাহিত্যে এই-সকল নব কীর্তিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অপর পক্ষে জর্মানির দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা কি দেখতে পাই? উনবিংশ শতাব্দী সাংসারিক হিসাবে জর্মানির সত্যযুগ। এই শত বৎসরের মধ্যে জর্মানি বাণিজ্যে ও সাম্রাজ্যে, বাহুবলে ও অর্থবলে অসাধারণ অভ্যুদয় লাভ করেছে। কিন্তু এই অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তার কবিপ্রতিভা তার দার্শনিকবুদ্ধি অন্তর্হিত হয়েছে, গ্যেটে-শিলার-কাণ্ট-হেগেলের বংশ লোপ পেয়েছে। সে দেশে এখন যা আছে সে হচ্ছে ষষ্টি সহস্র বালখিল্য প্রফেসার। এরা সকলেই জ্ঞানরাজ্যের মুটে-মজুর, কেউ রাজা-মহারাজা নয়।

৩

ফরাসি সাহিত্যের বিশেষ ধর্মটি যে কি, আজকে এ সভায় আমি সংক্ষেপে তারই পরিচয় দিতে চাই।

বর্তমান ইউরোপের দুটি সর্বপ্রধান সাহিত্য হচ্ছে ইংরেজি ও ফরাসি। ইউরোপের অপর কোনো দেশের সাহিত্য ঐশ্বর্যে ও গৌরবে এই দুই সাহিত্যের সমকক্ষ নয়।

ইংরেজি সাহিত্যের সহিত আমাদের সকলেরই যথেষ্ট পরিচয় আছে। সুতরাং ইংরেজি সাহিত্যের সহিত ফরাসি সাহিত্যের পার্থক্যের পরিচয় লাভ করতে পারলে আমরা ফরাসি সাহিত্যের বিশেষত্বের সন্ধান পাব।

এক কথায় বলতে গেলে ইংরেজি সাহিত্য রোমান্টিক এবং ফরাসি সাহিত্য রিয়ালিস্টিক।

রিয়ালিজ্‌ম এবং রোমান্টিসিজ্‌ম বলতে ঠিক যে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে সাহিত্যসমাজে বহুকালাবধি বহু তর্কবিতর্ক চলে আসছে। কিছুদিন হল বাংলা সাহিত্যেও সে আলোচনা শুরু হয়েছে।

আজকের এ প্রবন্ধে সে আলোচনার স্থান নেই, তবে সাহিত্যের এ দুই মার্গের মোটামুটি লক্ষণগুলি নির্দেশ করা কঠিন নয়।

রোমান্টিক সাহিত্যের প্রথম লক্ষণ এই যে, তা সাব্‌জেক্‌টিভ। রোমান্টিক কবি প্রধানত নিজের হৃদয়ের কথাই বলেন; নিজের সুখদুঃখ, নিজের আশা-নৈরাশ্য, নিজের বিশ্বাস-সংশয়, এই-সকলই হচ্ছে তাঁর কাব্যের উপাদান ও সম্বল। শুধু তাই নয়, খাঁটি রোমান্টিকের কাছে তাঁর ব্যক্তিত্ব হচ্ছে জগতের সার সত্য। বাংলার সর্বপ্রথম কবি চণ্ডীদাসের কবিতা আগাগোড়া সাব্‌জেক্‌টিভ, অপর পক্ষে সংস্কৃত কবিতা আগাগোড়া অব্‌জেক্‌টিভ। এক ভর্তৃহরি ভিন্ন অপর কোনো সংস্কৃত কবি মানবহৃদয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে 'অহং জানামি' এ কথা বলেন নি। সংস্কৃতের ন্যায় ফরাসি সাহিত্যও প্রধানত অব্‌জেক্‌টিভ, বাহ্যঘটনা ও সামাজিক মন নিয়েই

ফরাসি সাহিত্যের আসল কারবার ; এক কথায় ফরাসি জাতির দিব্যদৃষ্টি অপেক্ষা বহির্দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি ঢের বেশি তীক্ষ্ণ ও প্রখর। সে চোখ মানুষের ভিতর-বাহির দুই সমান দেখতে পায়।

রোমান্টিক সাহিত্যের দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, সে সাহিত্য আধ্যাত্মিক। আমাদের দর্শনে সত্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—এক ব্যাবহারিক, আর-এক তদতিরিক্ত। ফরাসি সাহিত্যে এই ব্যাবহারিক সত্যেরই আলোচনা ও চর্চা হয়ে থাকে। যা ইন্দ্রিয়ের অগোচর আর যা বুদ্ধির অগম্য, ফরাসি সাহিত্যে তার বড়ো-একটা সন্ধান পাওয়া যায় না। The proper study of mankind is man, এই হচ্ছে ফরাসি-মনের মূল কথা। সুতরাং মানবসমাজ মানবমন ও মানবচরিত্রের জ্ঞানলাভ করা ও বর্ণনা করাই ফরাসি সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ জ্ঞান লাভ করতে হলে সামাজিক মানবের আচারব্যবহার লক্ষ্য করতে হয়, এবং সেইসঙ্গে সেই আচারব্যবহারের আবরণ খুলে ফেলে তার আসল মনের পরিচয় নিতে হয় ; তাও আবার সমগ্রভাবে নয়, বিশ্লেষণ ক'রে পরীক্ষা ক'রে। বৈজ্ঞানিক যে ভাবে যে পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে জড়বস্তুর তত্ত্ব নির্ণয় করেন, ফরাসি সাহিত্যিকরাও সেই ভাবে সেই পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে মানবতত্ত্ব নির্ণয় করেন। তাঁরা মানবজাতিকে চরিত্র অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, মানবের কার্যকারণের আভ্যন্তরিক নিয়মাবলী ও যোগাযোগ আবিষ্কার করতে চান। এই কারণে Moliere মোলিয়েরের নাটক ফরাসি প্রতিভার সর্বোচ্চ নিদর্শন। মোলিয়ের ধর্মের আবরণ খুলে পাপের, বিদ্যার আবরণ খুলে মূর্খতার, বীরত্বের আবরণ খুলে কাপুরুষতার, প্রেমের আবরণ খুলে স্বার্থপরতার মূর্তি পৃথিবীর লোকের চোখের সুমুখে খাড়া করে দিয়েছেন। কিন্তু এ-সকল মূর্তি দেখে মানুষের মনে ভয় হয় না, হাসি পায়। মানুষের ভিতর যা-কিছু লজ্জাকর আর হাস্যকর, তাই মোলিয়েরের চোখে পড়েছে, আর যা তাঁর চোখে ধরা পড়েছে তাই তিনি অপরের নিকট ধরিয়ে দিয়েছেন।

ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটককারের সঙ্গে ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটককারের তুলনা করলেই এ উভয়ের প্রতিভার পার্থক্য স্পষ্ট লক্ষিত হবে। শেক্‌স্‌পীয়রের রিচার্ড দি থার্ড, ইয়াগো প্রভৃতির পরিচয়ে দর্শকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। শাইলক আমাদের মনে যুগপৎ করুণা ও ঘৃণার উদ্রেক করে, কিং লিয়রের পাগলামি আমাদের মনকে বেদনা দেয়, এরিয়েল Ariel আমাদের স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যায়। ফরাসি কবিরা শুধু হাস্য ও করুণ, বীর ও মধুর রসের চর্চা করেন। ইংরেজ কবিদের ন্যায় তাঁরা ভয়ংকর ও অদ্ভুত রসের রসিক নন। ফরাসি জাতির ভিতর কোনো শেক্‌স্‌পীয়র জন্মায় নি ও জন্মাতে পারে না। পাগল প্রেমিক ও কবি যে এক জাত, এ কথা কোনো ফরাসি কবি বলেনও নি, স্বীকারও করেন নি। কেননা তাঁরা তাঁদের সংসারজ্ঞান ও তাঁদের শিক্ষিত ও মার্জিত বুদ্ধির উপরেই চিরকাল নির্ভর করে এসেছেন। ফরাসি জাতির দেহে কিংবা মনে কোনো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নেই এবং তাঁরা কস্মিন্‌কালেও তাঁদের মগ্নচৈতন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন নি। এই কারণে ফরাসি কবিতা ইংরেজি কবিতার তুলনায় আবেগহীন ও কল্পনার ঐশ্বর্যে বঞ্চিত ; সে কবিতা মানবমনের গভীরতম দেশ স্পর্শ করে না।

৪

অপর পক্ষে এই সচেতন সচেষ্ট মনের উপর নির্ভর করায় ফরাসি গদ্যসাহিত্য যে শক্তি ও তীক্ষ্ণতা লাভ করেছে ইংরেজি গদ্যসাহিত্যে সে শক্তি সে তীক্ষ্ণতা নেই। পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকের মন সামাজিক, সুতরাং ব্যাবহারিক সত্যের সঙ্গেই তাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় আছে। সেই পরিচিত সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলে মানব-মনের নিকট ফরাসি সাহিত্য এত সহজবোধ্য, এত বহুমূল্য। ইংরেজি কবিতা মানুষের মনকে উত্তেজিত উদ্দীপিত করে, সে মনকে জ্ঞানবুদ্ধির সীমা অতিক্রম করিয়ে কল্পনার স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যায়, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। সে কবিতার মোহ আমাদের মনকে চিরদিনের মতো অভিভূত করে রাখতে পারে না, আমরা আবার এই মাটির পৃথিবীতে দিনের আলোয় ফিরে আসি। এ কবিতার রেশ যে মনের উপর থেকে যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, এবং তার ফলে আমাদের হৃদয়মন যুগপৎ গভীরতা ও উদারতা লাভ করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঐ সামাজিক মনই আমাদের চিরদিনের মন, আর ঐ বুদ্ধিবৃত্তিই আমাদের চিরজীবনের সহায়। ফরাসি সাহিত্য মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জিত করে, চিত্তবৃত্তিকে সুশৃঙ্খল করে। সে সাহিত্য মানুষকে দেবতা হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবেই চিত্রিত করে। অতএব সে সাহিত্য আমাদের মনে মানুষের প্রতি, ভক্তির না হোক, প্রীতির উদ্রেক করে। কেননা তার চর্চায় আমরা স্বজাতিকে চিনতে ও বুঝতে শিখি, এবং সেইসঙ্গে আমরা ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা, গোঁড়ামি আর হামবড়ামি, মানসিক আলস্য ও জড়তা, হয় পরিহার করতে নয় গোপন করতে শিখি। ফরাসি সাহিত্য মানুষকে দেবতা নয়, সুসভ্য করে তোলে। ফরাসি সাহিত্য সকলপ্রকার মিথ্যার সকলপ্রকার কপটতার প্রবল শত্রু এবং ফরাসি-মনের এই নির্ভীক সত্যসন্ধিৎসা সে সাহিত্যের সর্বপ্রধান গুণ। এই কারণেই ফরাসি প্রতিভা ইতিহাসে জীবনচরিতে সামাজিক উপন্যাসে এত ফুটে উঠেছে। এবং এই একই কারণে ফরাসি সমালোচকদের তুল্য সমালোচক পৃথিবীর অপর কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করে নি। এবং ফরাসি সমালোচনার বিষয় কেবলমাত্র সাহিত্য নয়, সমগ্র মানবজীবন। ধর্মনীতি রাজনীতি সমাজ সভ্যতা এ-সকলই ফরাসি জাতির হস্তে যুগে যুগে পরীক্ষিত হয়ে আসছে।

অনেকের ধারণা যে, জোলার নভেলই হচ্ছে ফরাসি রিয়ালিজ্‌মের চূড়ান্ত উদাহরণ। এ কথা সত্য যে, সত্যের অনুসন্ধানে মনোরাজ্যের হেন দেশ নেই যেখানে ফরাসি লেখকেরা যেতে প্রস্তুত নন, সে দেশ যতই অপ্রীতিকর ও যতই অসুন্দর হোক ; এবং সত্যের খাতিরে হেন কথা নেই, যা তাঁরা বলতে প্রস্তুত নন, সে কথা যতই অপ্রিয় যতই অবক্তব্য হোক। কিন্তু আমি রিয়ালিজ্‌ম শব্দ জোলার অনুমত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করি নি। লোকে সচরাচর যাকে আইডিয়ালিজ্‌ম বলে থাকে তাও আমার ব্যবহৃত রিয়ালিজ্‌ম শব্দের অন্তর্ভূত। মানবমন মানব-জীবনের উপর আলো ফেলে যা দেখা যায় তাই হচ্ছে ফরাসি সাহিত্যের বিষয়। বলা বাহুল্য সে আলোয় অনেক সুন্দর, অনেক কুৎসিত, অনেক মহৎ, অনেক ইতর মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে। যা হেয় তাও যেমন সত্য, যা উপাদেয় তাও তেমনি

সত্য। এর ভিতর কোন্ শ্রেণীর সত্যকে প্রাধান্য দেওয়া হবে তা লেখকের ব্যক্তিগত রুচি ও দৃষ্টির উপর নির্ভর করে। সুতরাং আইডিয়ালিজ্‌ম এবং রিয়ালিজ্‌ম সাহিত্যে পাশাপাশি দেখা দেয়। ফরাসি লেখকেরা মানবের অন্তরে এমন এক-একটি মূল প্রবৃত্তির আবিষ্কার করতে চান, অপর প্রবৃত্তিগুলি যার বিবাদী সংবাদী অনুবাদী সুর মাত্র। সুতরাং একই মনোভাব থেকে ফরাসি সাহিত্যে মানবের আইডিয়ালিস্টিক এবং রিয়ালিস্টিক উভয় চিত্রই অঙ্কিত হয়ে থাকে। প্রাচীন ফরাসি সাহিত্যে মানবসমাজের আইডিয়ালিস্টিক চিত্র বিরল নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জোলা প্রভৃতি রিয়ালিস্টগণ যে অতিমাত্রায় কদর্যতার চর্চা করেন, সে কতকটা ভিক্টর হিউগো প্রভৃতি রোমান্টিক লেখকদের প্রতিবাদস্বরূপে। আর-এক কথা, আমার সহিত যত ফরাসি লেখকের পরিচয় আছে, আমার বিশ্বাস, তার মধ্যে এক জোলার গ্রন্থই বিশেষরূপে ফরাসি-ধর্মে বঞ্চিত ; জোলার রচনায় ফরাসিসুলভ লিপিচাতুর্য নেই ; জোলার মন সূর্যকরোজ্জ্বল নয়, সে মন নিশাচর ; জোলা মানুষকে দেবতা হিসেবে দেখেন নি, মানব হিসেবেও দেখেন নি, তাঁর চোখে আমরা সকলেই ছদ্মবেশী দানব। প্রকৃতপক্ষে জোলা ফরাসি লেখক নন, তিনি ছিলেন জাতিতে ইতালিয়ান।

৫

ফরাসি সাহিত্যের দ্বিতীয় বিশেষত্ব হচ্ছে তার আর্ট। ফরাসি সাহিত্য সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন—

The one high principle which, through so many generations, has guided like a star the writers of France is the principle of deliberation, of intention, of a conscious search for ordered beauty; an unwavering, an indomitable pursuit of the endless glories of art.[১]

এই আর্টের গুণেই ফরাসি রচনা আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে।

এক কথায় এ আর্ট রোমান্টিক নয়, ক্ল্যাসিকাল। কি কি গুণের, কি কি লক্ষণের সদ্‌ভাবে রচনা আর্ট হয়, সে বিষয়ে ফরাসি জাতির মত নিম্নে বিবৃত করছি। ফরাসি রচনার রীতির পরিচয় দেবার পূর্বে ফরাসি ভাষার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কেননা ভাষার সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, এত ঘনিষ্ঠ যে এ কথা বললেও অত্যুক্তি হয় না যে, সকল দেশের জাতীয় সাহিত্যের রূপ-গুণ সেই দেশের ভাষার শক্তির উপর নির্ভর করে। এ স্থলে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, জাতীয় সাহিত্য রচিত হবার বহু পূর্বে জাতীয় ভাষা গঠিত হয়। যুগযুগান্তরের আত্মপ্রকাশের চেষ্টার ফলে একটি জাতীয় ভাষা গড়ে ওঠে এবং সেই ভাষার অঙ্গে জাতীয় মনের ছাপ থেকে যায় এবং তার অন্তরে জাতীয় চরিত্র বিধিবদ্ধ হয়ে থাকে।

১ Lytton Strachey, *Landmarks in French Literature*, Home University Library.

বাংলা ভাষার সংগে সংস্কৃত ভাষার যে সম্বন্ধ, ল্যাটিন ভাষার সংগে ফরাসি ভাষার সেই সম্বন্ধ, অর্থাৎ ফরাসি ল্যাটিনের অপভ্রংশ অথবা প্রাকৃত। ফরাসি ভাষার শব্দসমূহ ল্যাটিন হতে উদ্ভূত। সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষায় যাকে তদ্‌ভব বলে, ফরাসি অভিধানের প্রায় সকল শব্দই সেই শ্রেণীভুক্ত, এ-সকলই ল্যাটিনের তদ্‌ভব। এ ভাষায় দেশী এবং বিদেশী শব্দের সংখ্যা এত অল্প যে, তা নগণ্য স্বরূপে ধরা যেতে পারে। ফরাসি ভাষা মূলত এক হওয়ার দরুন এ ভাষার ভিতর এমন-একটি ঐক্য ও সমতা আছে যা রচনার একটি বিশেষ রীতি গড়ে তোলার পক্ষে একান্ত অনুকূল। ইংরেজি ভাষা ঠিক এর বিপরীত। অ্যাংলো-স্যাক্‌সন এবং নর্মান-ফ্রেঞ্চ, এই দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণে বর্তমান ইংরেজি ভাষার উৎপত্তি। এর ফলে সে ভাষার অন্তরে বৈচিত্র্য আছে, সমতা নেই। ইংরেজি রচনার যে কোনো-একটি বিশিষ্ট রীতি নেই, ইংরেজি ভাষার বর্ণসংকরতা তার অন্যতম কারণ; ইংরেজি লেখকেরা যে প্রত্যেকেই নিজের রুচি অনুসারে রচনার স্বতন্ত্র রীতি গড়ে নিতে পারেন, তার প্রচুর এবং প্রকৃষ্ট প্রমাণ এক উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্য হতে পাওয়া যায়। কার্লাইল এবং নিউ-ম্যান, রাস্‌কিন এবং ম্যাথ্যু আর্‌নল্ড, থ্যাকারে এবং মেরেডিথ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং শেলি, টেনিসন এবং ব্রাউনিং— একই যুগে এই-সকল বিভিন্নপন্থী লেখকের আবির্ভাব এক ইংলণ্ড ব্যতীত অপর কোনো দেশে সম্ভব হত না। উনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সের রোমান্টিক এবং রিয়ালিস্টিক লেখকদের রচনার ভিতর এরূপ জাতিগত প্রভেদ নেই। ফরাসি ভাষায় এরূপ বৈচিত্র্যের অবসর নেই। সুতরাং ফরাসি লেখকেরা যুগে যুগে রচনার, বৈচিত্র্য নয়, ঐক্যসাধন করে একটি আদর্শ রীতি গড়ে তোলবার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করেছেন, এবং সে বিষয়ে কৃতকার্যও হয়েছেন। এই যুগযুগান্তরের সাধনার ফলে অধিকাংশ ফরাসি শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট এবং সুপ্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। এ ভাষার ব্যবহারে অশিক্ষিত-পটুত্ব লাভ করবার জো নেই। আমাদের দেশের বাঁধা ঠাটের বাঁধা রাগিণীর মতো এ ভাষা গুণীব্যক্তির হাতেই পূর্ণশ্রী লাভ করে, এবং তার মূর্তি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। একটি বেপর্দায় হাত পড়লে সুর যেমন আগাগোড়া বেসুরো হয়ে যায়, তেমনি একটি অসংগত কথার সংস্পর্শে ফরাসি রচনা আগাগোড়া অশুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরিমিত শব্দে স্পষ্ট মনোভাব ব্যক্ত করবার পক্ষে এ ভাষা যতটা অনুকূল, হৃদয়ের গভীর ও অস্পষ্ট মনোভাব প্রকাশের পক্ষে তাদৃশ অনুকূল নয়। এর ফলে গদ্য-রচনার পক্ষে ফরাসি হচ্ছে ইউরোপের আদর্শ ভাষা।

ভাষা হচ্ছে সাহিত্যের উপাদান, কিন্তু কেবলমাত্র উপাদানের গুণে কোনো শিল্পই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে না, যদি না তা শিল্পীর হাতে পড়ে। আর তা ছাড়া অন্যান্য শিল্পের উপাদানের সংগে সাহিত্যের উপাদানের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে।

পাষাণ কি ধাতু, বর্ণ কি স্বর, আমরা বাইরে থেকে যা পাই তাই আমাদের গ্রাহ্য করে নিতে হয়, কেননা ও-সকল বাহ্যজগতের বস্তু; আমরা তা সৃষ্টি করি নি, অতএব আমরা তার ধাতও বদলে দিতে পারি নে। কিন্তু ভাষা হচ্ছে আমাদেরই সৃষ্টি। সুতরাং পূর্বপুরুষদের নিকট যে ভাষা আমরা উত্তরাধিকারী-স্বত্বে লাভ

করি, তার অংগাবিস্তর রূপান্তর করা আমাদের সাধ্যের অতীত নয়। আমরা যা পড়ে পাই তা চৌদ্দ-আনা, তাকে ষোলো-আনা করা না-করা, সে আমাদের হাত। বর্তমান ফরাসি ভাষা এবং প্রাচীন ফরাসি ভাষা এই দুই মূলত এক হলেও এ দুইয়ের ভিতর প্রভেদ বিস্তর। যুগের পর যুগের ফরাসি লেখকদের যত্নে ও চেষ্টায় এ ভাষা জাতীয় মনোভাব প্রকাশের এমন উপযোগী যন্ত্র হয়ে উঠেছে। ফরাসি ভাষার এ ইভলিউশন আপনি হয় নি, এ উন্নতি এ পরিণতির ভিতর ফরাসি জাতির সুবুদ্ধি ও সুরুচি, যত্ন ও অধ্যবসায়, এ-সকলেরই সমান পরিচয় পাওয়া যায়।

৬

যেদিন থেকে ফরাসি জাতির ধারণা হল যে, সাহিত্যরচনা করা একটি আর্ট, সেইদিন থেকে ফরাসি লেখকেরা কিসে রচনা সুগঠিত হয়, সে বিষয়েও পুরো লক্ষ রেখে আসছেন। কি যে আর্ট আর কি যে আর্ট নয়, সে বিষয়ে অদ্যাবধি বহু মতভেদ আছে। সৌন্দর্যের অর্থ যে কি, সে বিষয়ে দার্শনিক তর্কের আর শেষ নেই। তবে আমাদের সহজ মন এবং সাদা চোখ দিয়ে বিচার করতে গেলে আমরা দেখতে পাই যে, আমরা যাকে বস্তুর রূপ বলি তা অনেক পরিমাণে তার আকারের উপর নির্ভর করে। অন্তত আমরা বাঙালিরা যা কদাকার তাকে সুন্দর বলি নে। মানবমনের এই সহজ প্রকৃতির উপরেই ফরাসি জাতির রচনার আর্ট প্রতিষ্ঠিত। কিসে রচনার অংগসৌষ্ঠব হয় সে বিষয়ে ফরাসি মনীষীরা বহু চিন্তা বহু বিচার করে গেছেন, এবং সেই চিন্তা সেই বিচারের ফলে ফরাসি রচনা এত সাকার, এত পরিচ্ছিন্ন হয়ে উঠেছে।

আমি প্রথমেই বলেছি যে, খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ফরাসি সাহিত্য জন্মলাভ করে; প্রথম তিন শত বৎসরের ফরাসি সাহিত্য আর্টহীন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণচণ্ডী যেমন আর্টহীন, রোমাঁ দ্য রোলাঁ, রোমাঁ দ্য রোজ প্রভৃতি ফ্রান্সের জাতীয় মহাকাব্যও সেইরূপ আর্টহীন। এই যুগের লেখকদের শব্দের নির্বাচন ও পদের যোজনার প্রতি কোনোই লক্ষ ছিল না।

তার পর খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফরাসি জাতি যখন প্রাচীন গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্যের পরিচয় লাভ করলে, তখন হতে লেখা জিনিসটে যে একটি আর্ট এ বিষয়ে ফরাসি কবি এবং ফরাসি গদ্য-লেখকেরা সজ্ঞান হয়ে উঠল। এই ক্ল্যাসিক-সাহিত্যের আদর্শ ফরাসি লেখকদের নিকট একমাত্র আদর্শ হয়ে উঠল এবং এই কারণেই ক্ল্যাসিসিজ্‌ম হচ্ছে সে সাহিত্যের সর্বপ্রধান ধর্ম।

৭

দুই উপায়ে ভাষার রূপান্তর করা যায়; এক, শব্দের যোগের দ্বারা, আর-এক, বিয়োগের দ্বারা। ফরাসি লেখকেরা বর্জনের সাহায্যেই ভাষার সংস্কার করেন। খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মালের্ব Malherbe নামক জনৈক কবি এই ভাষা-সংস্কার-কার্যে ব্রতী হন। তিনি প্যারী নগরীর মৌখিক ভাষাই সাহিত্য-রচনার আদর্শভাষাস্বরূপে গণ্য করেন। কেননা সে ভাষার ভিতর এমন একটি ঐক্যসমতা

প্রসাদগুণ এবং ভদ্রতা ছিল, যা কোনো প্রাদেশিক ভাষার অন্তরে ছিল না। এই কারণে সাহিত্য হতে প্রাদেশিক শব্দসকল বহিষ্কৃত করে দেওয়াই তাঁর মতে হল ভাষাসংস্কারের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান উপায়। মালের্বের মতে এক দিকে যেমন প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহারে কুরুচির পরিচয় দেওয়া হয়, অপর দিকে সাহিত্যে পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারেও তেমনি কুরুচির পরিচয় দেওয়া হয়। এক কথায়, গ্রাম্যতা ও পাণ্ডিত্য, এই দুইই কাব্যের ভাষায় সমান বর্জনীয়। কেননা সে যুগের ফ্রান্সের ভদ্রসমাজের মতে নিরক্ষর লোকের ভাষা ও পুঁথিগত বিদ্যার ভাষা এই দুইই সমান ইতর বলে গণ্য হত। দুয়ের ভিতর পার্থক্য এই যে, এর একটি লজ্জার, অপরটি হাস্যের উদ্রেক করে। এই মত ফ্রান্সের লেখকসমাজে গ্রাহ্য হয়েছিল, কেননা তাঁদের মতে প্রাচীন ফরাসি সাহিত্যের ভাষা এক ভাষা নয়, একটা জোড়াতাড়া দেওয়া ভাষা। এর ফলে রাব্‌লে Rabelais প্রভৃতি প্রাচীন লেখকদের পাঁচরঙা ভাষার পরিবর্তে ফরাসি গদ্যের ভাষা একরঙা হয়ে উঠল।

উপাদান নির্বাচন হচ্ছে শিল্পীর প্রথম কাজ, কিন্তু সেই উপাদানে মূর্তি গঠন করাই তাঁর আসল কাজ। সুতরাং মালের্ব প্রমুখ সমালোচকেরা পদনির্বাচনের ন্যায় পদযোজনার প্রতিও লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমরা পদের সঙ্গে পদের যোজনা করে বাক্যগঠন করি এবং বাক্যের সঙ্গে বাক্যের যোজনা করে একটি কবিতা কিংবা প্রবন্ধ রচনা করি। সুতরাং বাক্য এবং রচনা যাতে সুগঠিত হয় সে বিষয়ে ফরাসি লেখকেরা এই যুগ থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি সমান মনোনিবেশ করে আসছেন। এ গঠনে যাতে রেখার সুষমা থাকে সামঞ্জস্য থাকে, রচনার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যাতে যথাযথ স্থানে বিন্যস্ত হয়, এবং পরস্পরের সঙ্গে সুসম্বদ্ধ হয়, যাতে করে একটি রচনা পূর্ণাবয়ব সর্বাঙ্গসুন্দর এবং সমগ্র হয়ে ওঠে— এই হচ্ছে ফ্রান্সের সাহিত্যশিল্পীর যুগযুগের সাধনার ধন। রচনার দেহ সুগঠিত করবার জন্য সকলপ্রকার বাহুল্য বর্জন করা আবশ্যক। যাঁরা রাগ আলাপ করেন, টিকারির ঝন্‌ঝনানি তাঁদের কানে অসহ্য। খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বোয়ালো Boileau নামক বিখ্যাত সমালোচক বিশেষ করে রচনার অমার্জনীয় দোষের সম্বন্ধে সমাজের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছিলেন। ভাষার কৃত্রিমতা, বৃথা বাগাড়ম্বর, উপমার আতিশয্য, অনুপ্রাসের ঝংকার প্রভৃতি রচনার দোষের প্রতি তিনি চিরজীবন ধরে এমন তীক্ষ্ণ, এমন অজস্র বাণ বর্ষণ করেছিলেন যে, ফরাসি সাহিত্য হতে সকলপ্রকার অত্যুক্তি ও অতিবাদ, কষ্টকল্পনা ও অবোধ পাণ্ডিত্য চিরদিনের জন্য নির্বাসিত হয়েছে।

রচনাকে শব্দাড়ম্বরে গৌরবান্বিত, শব্দালংকারে ঐশ্বর্যবান, পারিভাষিক শব্দপ্রয়োগে মর্যাদাপন্ন এবং বাচালতায় সমৃদ্ধিশালী করবার লোভ সংবরণ করা যে কি কঠিন, তা লেখক মাত্রই জানেন। ফরাসি লেখকেরা এই সংযম নিজেরা অভ্যাস করেন এবং অপরকে অভ্যাস করতে শিক্ষা দেন। পূর্বোক্ত ফরাসি আলংকারিক কর্তৃক প্রদর্শিত সাহিত্যের ত্যাগমার্গ ফরাসি লেখকেরা যে কেন অবলম্বন করেছিলেন, তার একটু বিশেষ কারণ আছে। প্যাস্‌কাল, লা ব্রুইয়ের La Bruyere, বস্যুয়ে Bossuet, ফেনেলঁ Fenelon, রাসীন Racine, মোলিয়ের প্রভৃতি সে যুগের ফ্রান্সের প্রথম শ্রেণীর গদ্যপদ্যলেখক মাত্রেই মালের্ব কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং

বোয়ালো কর্তৃক পরিষ্কৃত রচনার এই নব পথ অবলম্বন করেই সাহিত্যজগতে অমর হয়েছেন। এ'রা যে বিনা আপত্তিতে এই নব আলংকারিক মত গ্রাহ্য করেছিলেন, তার কারণ তাঁরা যে-সকল মনোভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন রচনার এই নবপদ্ধতি সে মনোভাব প্রকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। সে যুগের ফরাসি মনোভাবের পূর্ণ পরিচয় দেকার্তের Descartes দর্শনে পাওয়া যায়। সেই দর্শনে ফরাসি প্রতিভা তার আত্মজ্ঞান লাভ করে। আপনারা অনেকেই জানেন যে, যে-আইডিয়া সুস্পষ্ট পরিচ্ছিন্ন ও সুনির্দিষ্ট, তাই হচ্ছে দেকার্তের মতে সত্যের পরিচায়ক। অর্থাৎ যে জ্ঞান আমাদের জাগ্রত বুদ্ধির আয়ত্তাধীন, এবং যা ন্যায়শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য। এবং দেকার্তের মতে একমাত্র অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই এই শ্রেণীর সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। ফরাসি লেখকেরা মানবমনের ও মানব-চরিত্রের সেই সত্য আবিষ্কার করতে এবং প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, যা জ্ঞানের আলোকে সুস্পষ্ট হবে, যা ন্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। এক কথায়, তাঁরা reasonকে দেবতা করে তুলেছিলেন, এবং reasonable মনোভাব প্রকাশের পক্ষে যে সুসংযত সুসংহত এবং সুশৃঙ্খল ভাষাই সর্বাপেক্ষা উপযোগী, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? রিজ্‌নেব্‌ল মনোভাব রিজ্‌নেব্‌ল ভাষায় ব্যক্ত করার দরুন ফরাসি ক্ল্যাসিকাল লেখকেরা ইউরোপের সাহিত্যসমাজে সর্বাগ্রগণ্য হয়ে উঠে-ছিলেন। এই কারণেই সে সাহিত্যের প্রভাব সমগ্র ইউরোপে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে ও সকল জাতির মন বশীভূত করে। দেশভেদে কালভেদে জাতিভেদে রিজ্‌নের কোনো ভেদ হয় না, ও-বস্তু সর্বলোকসামান্য। ঐ হচ্ছে মনের একমাত্র ক্ষেত্র, যেখানে সকল মনের মিলন হতে পারে। মানুষ যদি সমবুদ্ধি হয়, তা হলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহানুভূতি জন্মাতে বাধ্য। এই কারণেই হেন্‌রি জেম্‌স বলেন যে, ফরাসি জাতি live for us। এমন-কি, রোমান্টিক ইংলন্ড এক শতাব্দীর জন্য স্বধর্ম ত্যাগ করে এই ফরাসি সাহিত্যের অধীনতা স্বীকার করেন। অ্যাডিসন এবং পোপ, লকী এবং হিউম, গিবন এবং গোল্ড্‌স্‌মিথ, সকলেই সাহিত্যের এই ফরাসি রীতিই অনুসরণ করেছিলেন। ইংলন্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্ল্যাসিসিজ্‌ম ফরাসি ক্ল্যাসিসিজ্‌মের অনুকরণ ব্যতীত আর কিছু নয়। ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লবের সময় পর্যন্ত এই রীতি একাধিপত্য করে। ভল্টেয়ারের হাতে ফরাসি ভাষা এত লঘু আর এত তীক্ষ্ম, এত চোস্ত এবং এত সাফ হয়ে উঠেছিল যে, তার পর সে রীতির আর ক্রমোন্নতি হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ভল্টেয়ারের ভাষাই তার চূড়ান্ত পরিণতি। ভাষার ধার এর চাইতে বাড়াতে গেলে যে পরিমাণ শান দিয়ে তার দেহ ক্ষয় করতে হয়, তাতে ভাষার দেহত্যাগ করতে হয়।

৮

অপর সকল গুণকে উপেক্ষা ক'রে একটিমাত্র গুণের অতিমাত্রায় চর্চা করলে কালক্রমে তা দোষ হয়ে দাঁড়ায়। এই সুমার্জিত ভাষা মানুষের চিন্তাপ্রকাশের জন্য যেমন উপযোগী, মানবহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা-আকুলতা আশা-ভয় সংশয়-বিশ্বাস প্রভৃতি অনির্দিষ্ট ভাব প্রকাশের জন্য তেমনি অনুপযুক্ত। ক্রমান্বয়ে ইতর গণ্যে শব্দের পর

শব্দ বর্জন করে এ ভাষা অতিশয় সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এ ভাষায় কোনোরূপ ছবি আঁকা অসম্ভব। কেননা যে শব্দের গায়ে রঙ আছে, সে শব্দ এ সাহিত্যিক ভাষা হতে বহিষ্কৃত হয়েছিল। যে শব্দের বস্তুর সঙ্গে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ সুস্পষ্ট, সেই শব্দই এ সাহিত্যে গ্রাহ্য হত। কিন্তু যে শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তি আছে, অর্থাৎ যার অর্থের অপেক্ষা অনুরণন (suggestiveness) প্রবল, সে শব্দ এ সাহিত্যে উপেক্ষিত হত। ফরাসি বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের পূর্বসভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তার পূর্ব-সাহিত্যের রীতিনীতিও মর্যাদাভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নবীন ফ্রান্সে রিজ্‌ন তার দেবত্ব হারিয়ে বসেছিল। ১৮৩০ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সের নূতন সাহিত্য ক্ল্যাসিসিজ্‌মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। এই সাহিত্যই রোমান্টিক বলে পরিচিত। শাতোব্রিয়াঁ Chateaubriand এর প্রবর্তক, এবং ভিক্টর হিউগো এর নায়ক। ক্ল্যাসিসিজ্‌মের ভাব ও ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহই এ সাহিত্যের লক্ষণ ও বিশেষত্ব। রিজ্‌নের পরিবর্তে কল্পনা, বাঁধাবাঁধি নিয়মের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা, ভাষাপ্রয়োগে কৃপণতার পরিবর্তে অজস্রতা— রোমান্টিক সাহিত্যে এই সবই প্রাধান্য লাভ করেছিল। রোমান্টিক লেখকেরা ইতর বলে কোনো শব্দকেই বর্জন করেন নি, এঁদের প্রসাদে এক দিকে শত শত উপেক্ষিত পতিত ও বিস্মৃত শব্দ, অপর দিকে শিল্পবিজ্ঞান হতে সংগৃহীত শত শত পারিভাষিক শব্দ সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করলে। আমাদের নব্য আলংকারিক-মতে—

ন স শব্দো ন তদ্বাচ্যং ন স ন্যায়ো ন সা কলা
জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গমহো ভারো মহান্ কবেঃ।[১]

ফরাসি নব্য আলংকারিকদেরও এই একই মত এর ফলে সাহিত্যের ভাষা আবার শব্দসম্পদে বিপুল ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠল। এই নূতন ভাষা হৃদয়ের আবেগ প্রকাশের জন্য যেমন উপযোগী, বাহিরের দৃশ্য অঙ্কনের জন্য তেমনি উপযোগী। এ রোমান্টিক সাহিত্য কিন্তু আসলে উচ্ছৃঙ্খল সাহিত্য নয়। ভিক্টর হিউগো, মুসেস প্রমুখ লেখকেরা মুখে অবাধ স্বাধীনতা প্রচার করলেও কাজে আর্টের অধীনতা হতে মুক্ত হন নি। এমন-কি, কোনো কোনো সমালোচকের মতে ভিক্টর হিউগো ফরাসি সাহিত্যের একজন অপূর্ব শিল্পী। তাঁর প্রতি ছত্রে কারিগরের হস্তের পরিচয় পাওয়া যায়। ফরাসি রোমান্টিসিজ্‌ম অনেকটা বস্তুগত। এক কথায়, হিউগো প্রমুখ কবিরা শুধু ভাষার পূণ্টমার্গ অবলম্বন করেছিলেন, কেননা রোমান্টিক মনোভাব এ জাতির মনে কখনোই সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করতে পারে নি। মানুষের সমগ্র মন তার বুদ্ধির চাইতে ঢের বড়ো, এবং যুক্তিতর্কের অপেক্ষা অনুভূতি ঢের বেশি নির্ভরযোগ্য, এই বিশ্বাসের উপরই যথার্থ রোমান্টিক সাহিত্য দাঁড়িয়ে থাকে। এই দৃষ্ট বিশ্বের পিছনে একটি অদৃষ্ট বিশ্ব আছে, মানবমনের এমন একটি ধর্ম আছে, যার গুণে এই নিগূঢ় বিশ্বের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়— এই হচ্ছে রোমান্টিক দর্শনের মূল কথা। আর যে বস্তু যুক্তিতর্কের সাহায্যে জানা যায় না, তা যুক্তিতর্কের সাহায্যে অপরকে জানানো যায় না; তাই রোমান্টিক

---

১ রুদ্রট-ধৃত বচন

কবিরা নিজে যা অনুভব করছেন, অপরকে তা অনুভব করাতে চান। এ স্থলে ভাষার অর্থের চাইতে তার ইঙ্গিতের মূল্য ঢের বেশি।

ফরাসি রোমাণ্টিক সাহিত্যের ভাষার প্রলেপ তুলে ফেললে দেখা যায় যে, তার ভিতরে রোমাণ্টিসজ্‌মের খাঁটি মাল নেই।

রোমাণ্টিসজ্‌ম ফরাসি জাতির ধাতুগত নয়। সুতরাং ফরাসি মনের উপর এ জোর-করা সাহিত্যের প্রভাব চিরস্থায়ী হল না। এই রোমাণ্টিসজ্‌মের প্রতিবাদ স্বরূপেই ফ্রান্সের নব রিয়ালিজ্‌ম জন্মগ্রহণ করে। কল্পনার পরিবর্তে রিজ্‌ন ফরাসি সাহিত্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফরাসি রিয়ালিস্টরা তাদের জাতীয় বুদ্ধির অনুসরণ ক'রে আবার সত্যের সন্ধানে বহির্গত হয়েছিল। এবং সে সত্য কুৎসিতই হোক আর বীভৎসই হোক, ফরাসি রিয়ালিস্টরা তার ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নি। রোমাণ্টিক দল ফরাসি সাহিত্যকে যা দান করে গিয়েছে, সে হচ্ছে অগাধ শব্দসম্পদ। রিয়ালিস্টদের নেতা ফ্লোবেয়র সেই নূতন উপাদান নিয়েই পুরাতন রীতিতে সাহিত্য গঠন করেছেন। এর ফলে ফ্লোবেয়র এবং তাঁর শিষ্য মোপাসাঁর ন্যায় শিল্পী জগতের সাহিত্যে দুর্লভ।

যে বিরাট সৌন্দর্যে মানুষের মনকে স্তম্ভিত অভিভূত করে, যে সৌন্দর্য অতিজগতের আলো ও ছায়ায় রচিত, সে সৌন্দর্য ইংরেজি সাহিত্যে আছে, ফরাসি সাহিত্যে নেই। কিন্তু শিল্পের সৌন্দর্যে ফরাসি সাহিত্য অতুলনীয়।

আমি ফরাসি সাহিত্যের চর্চায় যে আনন্দ লাভ করেছি, সে আনন্দের ভাগ আপনাদের দিতে পারলুম না। সুতরাং সে সাহিত্য হতে যে শিক্ষা লাভ করেছি তারই পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি, যদি তাতে কৃতকার্য হয়ে থাকি, তা হলেই আমার সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

৯

আমি চাই যে আমাদের শিক্ষিতসমাজে ফরাসি সাহিত্যের সম্যক্ চর্চা হয়। আমার বিশ্বাস, সে চর্চার ফলে আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে।

আমি বলেছি যে ইংরেজি সাহিত্য মুখ্যত রোমাণ্টিক, এবং ফরাসি সাহিত্য মুখ্যত রিয়ালিস্টিক। যে দুটি বিভিন্ন মনোভাব থেকে এই দুটি পৃথক্ চরিত্রের সাহিত্য জন্মলাভ করে, প্রতি জাতির মনে সে উভয়েরই স্থান আছে। কোন্ জাতি এর মধ্যে কোন্‌টির উপর ঝোঁক দেন, তার উপরেই জাতীয় সাহিত্যের বিশেষত্ব নির্ভর করে।

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের বাংলা সাহিত্যে দেখতে পাই দুটি পৃথক্ ধারা বরাবর পাশাপাশি চলে এসেছে; একটি সম্পূর্ণ সাব্‌জেক্‌টিভ, অপরটি সম্পূর্ণ অব্‌-জেক্‌টিভ। যে বাঙালি জাতির মন থেকে বৈষ্ণব পদাবলী জন্মলাভ করেছে, সেই বাঙালি জাতির মন থেকেই কবিকঙ্কণচণ্ডী ও অন্নদামঙ্গল জন্মলাভ করেছে। সুতরাং রোমাণ্টিক এবং রিয়ালিস্টিক উভয় সাহিত্যই আমাদের হৃদয়-মন সমান স্পর্শ করতে পারে। ইংরেজি সাহিত্য যেমন আমাদের মনের একটি দিক ফুটিয়ে

তুলেছে, আমাদের মনের আর-একটি দিক আছে যা ফরাসি সাহিত্য তেমনি ফুটিয়ে তুলতে পারে।

ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের সাহিত্যে যে কি সুফল জন্মেছে তা সকলেই জানেন; কিন্তু সেইসঙ্গে যে কি কুফল জন্মেছে তা সকলের কাছে তেমন সুস্পষ্ট নয়।

সংগীতের মতো সাহিত্যও যে একটি আর্ট, এবং যত্ন ও অভ্যাস ব্যতীত এ আর্ট যে আয়ত্ত করা যায় না, এ সত্য আমরা উপেক্ষা করতে শিখেছি। ইংরেজি গদ্যের কুদৃষ্টান্তই এর একমাত্র কারণ। কেননা যে জাতির ক্ল্যাসিক্স হচ্ছে সংস্কৃত, সে জাতির পক্ষে রচনার আর্ট সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া স্বাভাবিক নয়।

একটি ইংরেজ লেখক বলেছেন—

The amateur is very rare in French literature— as rare as he is common in our own.[১]

ইংরেজি সাহিত্যের এই amateurishness আমরা সাদরে অবলম্বন করেছি, কেননা যেমন-তেমন করে যা-হোক-একটা-কিছু লিখে ফেলার ভিতর কোনোরূপ আয়াস নেই, কোনোরূপ আত্মসংযম নেই।

ফরাসি সাহিত্যের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দুইই লেখকদের সংযম অভ্যাস করতে শিক্ষা দেয়। কেননা সংযম ব্যতীত, কি মনোজগতে, কি কর্মজগতে, কোনো বিষয়েই নৈপুণ্য লাভ করা যায় না। সংস্কৃতে একটি কথা আছে যে 'যোগঃ কর্মসু কৌশলং'। রচনা সম্বন্ধে এই কৌশল লাভ করতে হলে লেখকদের পক্ষে যোগ অভ্যাস করা দরকার। অবস্থা ও প্রকৃতি অনুসারে কোথাও বা হঠযোগ, কোথাও বা রাজযোগ। বাহুল্য আর ঐশ্বর্য, স্ফীতি আর শক্তি যে এক বস্তু নয়, এ সত্য ফরাসি সাহিত্য মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

তার পর সাহিত্যের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ, সে বিষয়েও উক্ত সাহিত্য আমাদের চোখ ফুটিয়ে দেয়। আমি পূর্বে বলেছি যে, ভাষা সাহিত্যের উপাদান, কিন্তু এ কথা শুধু আংশিকভাবে সত্য। আসল সত্য এই যে, লেখকদের নিকট ভাষা একাধারে উপাদান ও যন্ত্র। আমাদের দেশে সর্ব শ্রেণীর শিল্পীরা বৎসরে অন্তত একবার যন্ত্রপূজা করে থাকে, একমাত্র এ কালের সাহিত্য-শিল্পীরাই তাঁদের যন্ত্রকে পূজা করা দূরে থাক্, মেজে-ঘষে পরিষ্কারও করেন না। ফরাসি সাহিত্য আমাদের এই যন্ত্রকে লঘু করতে, তীক্ষ্ণ করতে শেখায়। এ শিক্ষা আমরা সহজেই আত্মসাৎ করতে পারি, কেননা, আমার বিশ্বাস, বাংলার সঙ্গে ফরাসি ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। আমাদের ভাষাও মূলত এক, এবং বিদেশী শব্দে তা ভারাক্রান্ত নয়। আমাদের ভাষার অন্তরেও ফরাসি ভাষার গতি ও স্ফূর্তি নিহিত আছে। বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কাব্যগ্রন্থ জর্মানের ন্যায় স্থূলকায় গুরুভার শ্লীপদ ও গজেন্দ্রগামী ভাষায় রচিত হওয়া অসম্ভব। আমার বিশ্বাস, ভারতচন্দ্র যদি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করতেন তা হলে তাঁর প্রতিভা অনুকূল অবস্থার ভিতর আরো

১ G. L. Strachey.

পরিস্ফুট হয়ে উঠত, এবং তাঁর রচনা ফরাসি সাহিত্যের একটি মাস্টারপিস্ বলে গণ্য হত।

আমরা যে-ভাষায় এখন সাহিত্য রচনা করি, সে ভারতচন্দ্রের ভাষা নয়; ইতিমধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের অনুকরণে আমরা সে ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেছি, অর্থাৎ তার গায়ে একরাশ মুখস্থ-করা শব্দ চাপিয়ে দিয়ে তার ভার বৃদ্ধি করেছি, তার গতি মন্দ করেছি। ফরাসি সাহিত্যের শিক্ষা আমাদের মনে বসে গেলে আমরা আবার বহুসংখ্যক পণ্ডিত শব্দকে সসম্মানে বিদায় করব এবং তার পরিবর্তে বহুসংখ্যক তথাকথিত ইতর শব্দকে সাহিত্যে বরণ করে নেব। কেননা এই কৃত্রিম ভাষার চাপে আমাদের জাতীয় প্রতিভা মাথা তুলতে পারছে না।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

বাংলার ভবিষ্যৎ

মির্জাপুর ফিনিক্স ইউনিয়ন লাইব্রেরিতে পঠিত

বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রথম বঙ্গদর্শন প্রকাশ করেন তখন তিনি বাঙালির পক্ষে বাংলা লেখার ঔচিত্য এবং সার্থকতা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করতে বাধ্য হন। বঙ্গদর্শনের 'পত্র সূচনা' বঙ্গসরস্বতীর তরফ থেকে একাধারে আরজি, জবাব ও সওয়ালজবাব। বাংলা লেখার জন্য বাঙালির পক্ষে স্বদেশী শিক্ষিতসমাজের নিকট কোনোরূপ কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন যে একদিন ছিল, এ ব্যাপার আজকের দিনে আমাদের কাছে বড়োই অদ্ভুত ঠেকে—

যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালাভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

বঙ্কিমের এ উক্তির সত্যতা যে যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখে, এ আমাদের ধারণার বহির্ভূত। কেননা এ সত্য আমাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে না উঠলেও স্বীকার্য হয়েছে; কিন্তু বঙ্কিম যে সময়ে লেখনীধারণ করেন, সে সময়ে এ সত্যকে মেনে নেওয়া দূরে থাক্, কেউ ধরে নিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। সে যুগে ছিল ইংরেজির রেওয়াজ এবং ইংরেজিরই প্রতিপত্তি। সেকালের শিক্ষিতসম্প্রদায়, অর্থাৎ ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়, ইংরেজি লিখতেন, ইংরেজি ছাড়া আর-কিছু লিখতেনও না, এবং সম্ভবত কথাবার্তাও কইতেন ঐ রাজভাষাতেই। নতুবা বঙ্কিমের এ কথা বলবার কোনো আবশ্যকতা ছিল না যে—

ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালির সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই।

২

এ খুব বেশি দিনের কথা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এ লেখার তারিখ হচ্ছে পয়লা বৈশাখ, ১২৭৯ সাল। জাতীয় জীবনের হিসাবে পঁয়তাল্লিশ বৎসর অতি স্বল্প কাল, কিন্তু এই স্বল্প কালের মধ্যেই বাংলার শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মনে মাতৃভাষা সম্বন্ধে একটা বিশেষ ভাবান্তর ঘটেছে, বাংলা ভাষার প্রতি অভক্তি স্পষ্টত অতিভক্তিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের মধ্যে বাংলা লেখার প্রবৃত্তি বর্তমানে যে কতটা অদম্য হয়ে উঠেছে, তার পরিচয় আমাদের মাসিক সাহিত্যেই পাওয়া যায়। যে দেশে পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে একখানি মাসিক পত্র বার করতে হলে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় অসাধারণ লেখকেরও জবাবদিহি ছিল, সেই দেশে আজকের দিনে নিত্য নূতন

মাসিক পত্রের জন্ম ও মৃত্যু হচ্ছে, অথচ তার জন্য আমাদের সাধারণ লেখকদেরও কারো কাছে কোনোরূপ কৈফিয়ত দিতে হয় না। এই কলিকাতা শহর থেকে মাসে মাসে কত কাগজের যে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, তারই সংখ্যা নির্ণয় করা অসাধ্য, কেননা এ ক্ষেত্রে জন্মমৃত্যুর কোনো সঠিক রেজেস্টারি রাখা হয় না। যদিচ এখন কাগজের আকাল পড়েছে, তথাপি বাজারে নূতন কাগজের কোনো অভাব নেই। তার পর বাংলার পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের নানা নগরী ও উপনগরী থেকে নানা আকারের নানা বর্ণের নানা পত্র পরস্পর রেষারেষি করে শূন্যমার্গে উড্ডীন হয়ে সাহিত্যগগনের শোভা বৃদ্ধি করছে। বঙ্গসরস্বতীকে ঢাকা দান করেছে 'প্রতিভা', মৈমনসিং 'সৌরভ', বহরমপুর 'উপাসনা', এবং কুচবেহার 'পরিচারিকা'। এক কথায়, এ বিষয়ে অনুষ্ঠানের ত্রুটি বাংলাদেশের কোনো অঞ্চলেই দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, নব- বঙ্গ সাহিত্য বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করে অঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশেও স্বীয় প্রসার লাভ ও প্রভাব বিস্তার করছে। তা ছাড়া এমন কথাও শুনতে পাই যে, গুজরাটি মারাঠি হিন্দি প্রভৃতি হাল সাহিত্যের প্রধান সম্বল হচ্ছে বাংলা বইয়ের ভাষায় অনুবাদ।

৩

এক হিসেবে এটি একটি আশ্চর্য ঘটনা, কেননা এ যুগে এ দেশে ইংরেজির চর্চা কমা দূরে থাক্, এতটা বেড়ে গিয়েছে যে, ইংরেজি ভাষাকে এখন বাঙালির দ্বি-মাতৃভাষা বলা যেতে পারে, যদি না বৈয়াকরণিকেরা মাতৃ-শব্দের ঐরূপ দ্বিত্বে আপত্তি করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি হাতে গোনা যেত, আর আজকের দিনে তাঁদের সংখ্যার সন্ধান নিতে হলে সরকারবাহাদুরের আদম-সুমারির খাতার অনেক পাতা ওলটাতে হয়। সেকালের শিক্ষিতসম্প্রদায়, বঙ্কিম-চন্দ্রের ভাষায় যাকে বলে ইংরাজি-বাচক, তাই ছিলেন কি না জানি নে, কিন্তু এ কথা আমরা সবাই জানি যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এ দেশে এক নব-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, যে সম্প্রদায় বাংলা কথা ভুলেও মুখে আনতেন না, এমন-কি, ঘরেও নয়। সেই ইঙ্গবঙ্গসম্প্রদায়ের লোকেরাও যে আজ বাংলা বলেন, বাংলা লেখেন, এমন-কি, প্রকাশ্য সভাসমিতিতে খাঁটি বাংলায় বক্তৃতা পর্যন্ত করতে পিছপাও হন না, তার পরিচয় লাভ করবার জন্য আপনাদের অন্যত্র যেতে হবে না। আমার এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘটবার কোনোই সম্ভাবনা নেই।

বঙ্গ সাহিত্যের পক্ষে এ-সব অবশ্য খুবই শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু আমাদের সাহিত্যের দেহপুষ্টির এই-সব প্রত্যক্ষ লক্ষণ দেখে যদি কেউ মনে করেন যে, 'বাংলা বনাম ইংরেজি' এই ভাষার মামলায় বাদীর পক্ষে পুরোপুরি জয়লাভ হয়েছে, তা হলে তিনি নিতান্তই ভুল করবেন; যা হয়েছে তা হচ্ছে তরমিম ডিক্রি। ও দিকে একটু দৃষ্টিপাত করলে সকলেই দেখতে পাবেন যে, আমাদের আইন-আদালত স্কুল-কলেজ রাজদরবার-রাজনীতি জ্ঞান-বিজ্ঞান সবই অদ্যাবধি ইংরেজির পুরো

দখলে রয়েছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষিতসম্প্রদায়ের বেশির ভাগ গণ্যমান্য লোকেরা এ-সকল ক্ষেত্রে ইংরেজির দখল বজায় রাখাই সংগত ও কর্তব্য মনে করেন। মাতৃ-ভাষা ইংরেজির হাত থেকে সেইটুকু মাত্র ছাড়া পেয়েছে, যেটুকু তার পক্ষে কেঁদে বাঁচবার জন্য দরকার।

এইই যথেষ্ট প্রমাণ যে, বঙ্গ সাহিত্যের যে বড়োদিন এসেছে, সে দিনে বাংলা ভাষা শিক্ষিতসমাজে অবজ্ঞার পাত্র না হলেও শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠে নি। পূর্বে মাতৃভাষাকে শিক্ষিতসম্প্রদায় যে যথেষ্ট অবজ্ঞা করতেন, তার প্রমাণ, তাঁরা অনেকেই বাংলা লিখতেন না; আর আজ যে সেই সম্প্রদায় সে ভাষাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন না, তার প্রমাণ, তাঁরা প্রায় সকলেই বাংলা লেখেন। 'প্রবৃত্তিরেষা নরাণাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা' এ শাস্ত্রবচন যে লেখা সম্বন্ধেও খাটে, এ জ্ঞান সকলের থাকলে অনেকে বঙ্গ সাহিত্য রচনা করতে প্রবৃত্ত হতেন না। আমি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে এঁদের অনেকের গান ও গল্প পড়ে আমার মনে হয়, বাংলা লেখাটা এঁদের পক্ষে একটা শখ মাত্র, অবসরবিনোদনের একটি বিশিষ্ট উপায়, ভাষায় যাকে বলে বিশুদ্ধ আমোদ। কিন্তু সকলেরই মনে রাখা উচিত যে যা অবকাশ-রঞ্জিনী তা কাব্য নয়, এবং যা অবসরচিন্তা তা দর্শন নয়। ঐ ধ্যান ঐ জ্ঞান না করলে সাহিত্যের যথার্থ চর্চা করা হয় না। লক্ষ্মীর সেবার অবসরে সরস্বতী সেবা করা যে কর্তব্য, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই, তবে প্রশ্ন হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিটি কি। আমার মতে বেশির ভাগ কাজের লোকেরা নিজে না লিখে পরের লেখা পড়েই ছুটির যথেষ্ট সদ্‌ব্যবহার করতে পারেন। জ্ঞানকর্মের বিভাগটা উপেক্ষা করলে কি জ্ঞান কি কর্ম কিছুরই গুণবৃদ্ধি হয় না। মানুষে সাহিত্যে যে ভাবের-ঘর বাঁধে সে খেলার-ঘর নয়, মনের বাসগৃহ। তাসের ঘর কিন্ডারগার্টেনেই শোভা পায়, সাবালক সমাজে নয়। সুতরাং যাঁরা মাতৃভাষার যথার্থ ভক্ত, তাঁদের পক্ষে সে ভাষাকে সাহিত্যের রাজপাটে বসাবার জন্য এখনো বহুদিন ধরে বহু চিন্তা বহু চেষ্টা করতে হবে। বঙ্গসরস্বতীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াই আমাদের এক-মাত্র কাজ নয়; তাতে ভক্তির পরিচয় দেওয়া হতে পারে কিন্তু জ্ঞানকর্মের হয় না। অতএব জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার স্বত্বস্বামিত্ব সাব্যস্ত করবার জন্য প্রতি পক্ষের সঙ্গে আমাদের পদে পদে তর্ক করতে হবে, বিচার করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে বিবাদ-বিসংবাদ করতেও প্রস্তুত হতে হবে। এক কথায় বঙ্গসরস্বতীর সেবককে তাঁর সৈনিকও হতে হবে।

৪

বিদেশী সাহিত্যের ঐশ্বর্যের তুলনায় আমাদের স্বদেশী সাহিত্যের দারিদ্র্যের পরিচয় লাভ করে হতাশ হবার অবশ্য কোনোই কারণ নেই। লোকভাষা যে কোনো দেশেই রাতারাতি স্বরাট্ হয়ে ওঠে নি, তার প্রমাণ বর্তমান ইউরোপের সকল সাহিত্যের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। অপর ভাষা অপর সাহিত্যের অধীনতাপাশ থেকে ইউ-রোপের কোনো নবভাষাই এক দিনে মুক্তি লাভ করতে পারে নি। সাহিত্যে সম্পূর্ণ

আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার পূর্বে ইউরোপের অনেক দেশেই দেশী ভাষাকে পর পর তিনটি বাধাকে অতিক্রম করতে হয়েছে। মোটামুটি ধরতে গেলে, লোকভাষার ক্রমোন্নতির ইতিহাস হচ্ছে এই : প্রথমত কোনো মৃতভাষার, দ্বিতীয়ত কোনো বিদেশী ভাষার এবং তৃতীয়ত কোনো কৃত্রিম ভাষার চাপ থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

প্রায় হাজার বৎসর কাল ল্যাটিন যে ইউরোপের সাহিত্যের ভাষা ছিল, এ সত্য অবশ্য আপনাদের সকলের নিকটই সুবিদিত। এই দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞান দর্শন ধর্মশাস্ত্র ব্যবহারশাস্ত্র ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিষয়সকল একমাত্র ল্যাটিন ভাষাতেই লিখিত হত। অপণ্ডিত লোকে অবশ্য ইউরোপের এই মধ্যযুগেও কথা ও কাহিনী, ছড়া ও পাঁচালি প্রভৃতি নিজ নিজ ভাষাতেই রচনা করত, কিন্তু সেই লোকসাহিত্য শিক্ষিতসমাজে সেকালে সাহিত্য বলে গণ্য হয় নি, সুতরাং সে সাহিত্য সেকালে যে-কোনোরূপ পদমর্যাদা লাভ করে নি, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই ল্যাটিনের হাত থেকে ইউরোপীয় সাহিত্য যে বেশি দিন মুক্তিলাভ করে নি তার প্রমাণ, বেকন তাঁর নোভাম অর্গ্যানাম, স্পিনোজা তাঁর এথিক্‌স, এমন-কি, নিউটনও তাঁর প্রিন্সিপিয়া ল্যাটিন ভাষাতেই রচনা করেন। ইউরোপের কোনো কোনো দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাটিন ভাষায় থিসিস লেখবার পদ্ধতি আজও প্রচলিত আছে। আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন যে, বর্তমান যুগের দিগ্‌বিজয়ী দার্শনিক বের্গ্‌স' তাঁর প্রথম গ্রন্থ আদিতে ল্যাটিন ভাষাতেই রচনা করেন। এ ব্যাপার যথার্থই বিস্ময়কর, কেননা ইউরোপের দার্শনিকসমাজে লিপিচাতুর্যে বের্গ্‌স'র সমকক্ষ দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই; তাঁর হাতের কলম যথার্থই সোনার কাঠি, যার স্পর্শে মনোজগতের শুষ্কতরুও পত্রেপুষ্পে মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে, দর্শনও কাব্য হয়ে ওঠে। লোকভাষার উপর মৃত-ভাষার প্রভাব ও প্রভুত্ব যে কতটা দুরপনেয়, তারই প্রমাণস্বরূপ এ ব্যাপারের উল্লেখ করলুম। জর্মান্ দেশে আজও এমন-সব পণ্ডিত আছেন, যাঁদের পাণ্ডিত্য ল্যাটিন ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু তার কারণ স্বতন্ত্র। শুনতে পাই সে জাতির কোনো কোনো পণ্ডিত স্বভাষায় লিখলে সে লেখা এত জড়ানো হয় যে, তাঁরা নিজেই তা পড়তে পারেন না, অন্যে পরে কা কথা। কাজেই তাঁদের ল্যাটিনের শরণাপন্ন হতে হয়, কেননা সেই ভাষার প্রসাদে তাঁদের মনের ময়লা কেটে যায়। সে যাই হোক, আসল ঘটনা এই যে, ইউরোপের লোকভাষাসকল যেদিন ল্যাটিন ভাষার প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ ক'রে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখলে সেই দিন ইউরোপের মধ্যযুগের অবসান হয়ে নবযুগের সূত্রপাত হল। এক কথায় ইউরোপীয়দের মতে সেই শুভদিনে ইউরোপের মনের রাত কেটে গিয়ে সেখানে দিনের আলো দেখা দিলে।

৫

মৃতভাষার অধীনতা হতে মুক্তিলাভ করবামাত্র দেশী ভাষা সব সময়ে একেবারে আত্মবশ হয়ে উঠতে পারে না, অনেক ক্ষেত্রে তা আবার একটি বিদেশী ভাষার শাসনাধীন হয়ে পড়ে। কোনো দেশের উপর বিদেশীর রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব সেই দেশীয়

ভাষার উপর বিদেশীয় ভাষার প্রভুত্বের একটি স্পষ্ট ও প্রধান কারণ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি বিদেশী ভাষা সরকারি ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বিজিত জাতির ভাষা ও সাহিত্যের উপর জয়লাভ করতে পারে না। গ্রীস রোমের অধীন হয়েও পুরাকালে ভাষায় ও সাহিত্যে তার স্বরাজ্য সম্পূর্ণ রক্ষা করেছিল। ফারসিও এ দেশে বহুকাল সরকারি ভাষা ছিল, কিন্তু আমাদের ভাষার উপর ফারসি ভাষার এবং আমাদের সাহিত্যের উপর ফারসি সাহিত্যের প্রভাব একরকম নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। অপর পক্ষে এমনও দেখা যায় যে, একটি বিদেশী ভাষা রাজভাষা না হয়েও অপর ভাষার উপর একাধিপত্য করেছে। বিজিত গ্রীসের সাহিত্যের হাতের নীচেই রোমের ল্যাটিন সাহিত্য গড়ে ওঠে। একালের ইউরোপেও এ সত্যের যথেষ্ট নিদর্শন আছে। কিছুদিনের জন্য ফরাসি ভাষা ইউরোপে একরাট্ ভাষা হয়ে উঠেছিল, ইউরোপের প্রায় সকল প্রদেশের সাহিত্যই এক যুগে ফরাসি সাহিত্যের প্রতাপে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু ইউরোপের সাহিত্যের ইভলিউশনে ইতালির রিভার্সন reversion যথার্থই একটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। যাঁরা জীবজগতের ইভলিউশন-তত্ত্ব অবগত আছেন তাঁরাই জানেন যে, জীবের ক্রমোন্নতির ধারা একরোখাও নয়, একটানাও নয়। ইভলিউশনের সংগে সংগে রিভার্সন, উন্নতির পিঠ-পিঠ অবনতিও দেখা দেয়। কিছুদূর এগিয়ে তার পর পিছু হটা বোধ হয় মানবসভ্যতারও নৈসর্গিক ধর্ম, নচেৎ যে ভাষায় দান্তে পেত্রার্কা বোক্কাচিয়ো মাকিয়াভেল্লি প্রভৃতি জগদ্‌বিখ্যাত লেখকেরা কাব্যে ও ইতিহাসে সাহিত্যের অক্ষয়কীর্তিসকল রেখে গিয়েছেন, সেই ভাষা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি ভাষার আনুগত্য স্বেচ্ছায় বরণ করে নিত না। ইতালির নবযুগের আদিকবি আল্‌ফিয়েরি Alfieri তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন যে, তিনি তাঁর স্বকালের সাধুপন্থতি অনুসারে প্রথমে ফরাসি ভাষাতেই নাটক রচনা করতেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশত ক্রমে তাঁর এই জ্ঞান জন্মাল যে, সে-সকল নাটক কাব্য নয়, শ্রীহীন শক্তিহীন প্রাণহীন কাঠের পুতুল মাত্র। এ কথা শুনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথমবয়সের কথা মনে পড়ে। এর পরেই ইতালীয় ভাষা আবার তার স্বরাজ্য লাভ করেছে। ইতালির সাহিত্যের খবর আমরা বড়ো-একটা রাখি নে; তার কারণ, ইতালি আল্‌পস পর্বতের এপারের দেশ, অর্থাৎ আমাদের এ দিকের দেশ। আমাদের বিশ্বাস, একালের ইতালীয়েরা পারে শুধু রাস্তায় রাস্তায় অর্গ্যান বাজাতে, আর রঙবেরঙের মিষ্টান্ন তৈরি করতে। কিন্তু সেইসংগে তাদের হাতে কাব্যের অর্গ্যানও যে চমৎকার বাজে, এবং দর্শনের মিষ্টান্নও যে সুন্দর তৈরি হয়, তার প্রমাণ দা'নুন্‌দ্‌জিয়ো D'Annunzio এবং Benedetto Croce বেনেদেত্তো ক্রোচের দক্ষিণ হস্তের কীর্তি।

যে মার্টিন লুথারের প্রচণ্ড আক্রমণে রোমান চর্চ ও ল্যাটিন ভাষার সর্বজনীন প্রভুত্ব চিরদিনের জন্য ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ল, সেই মার্টিন লুথারের স্বদেশ জর্মানির সাহিত্যও আবার পালটে ফরাসি সাহিত্যের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দী ছিল ফরাসি সাহিত্যের একটি স্বর্ণযুগ। এই সাহিত্যের প্রভাব জর্মানির শিক্ষিত মনকে প্রায় একশো বৎসরের জন্য একেবারে অভিভূত ও মায়ামুগ্ধ করে

রেখেছিল। ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত ফরাসি সাহিত্যের অনুকরণে জর্মানিতে যে সাহিত্য রচিত হয়, তার কোনোরূপ মূল্য কোনোরূপ মর্যাদা নেই। এই ফরাসি সাহিত্যের গুণে ফরাসি ভাষাও জর্মানদের কাছে একটি নব ক্লাসিক হয়ে ওঠে। নব জর্মানির আদিকর্তা ফ্রেডারিক দি গ্রেট নিজের রসনা ও লেখনীকে সক্লেশে ফরাসি ভাষাতেই বলতে ও লিখতে শিখিয়েছিলেন, অর্থাৎ যিনি ইউরোপে জর্মান জাতির রাষ্ট্রীয় শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, স্বয়ং তিনিই বাহোসে বাহালতবিয়তে এবং খোশমেজাজে ফরাসি সাহিত্য ও ফরাসি ভাষার সার্বভৌমিক আধিপত্য শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।

কিন্তু এর চাইতেও আশ্চর্যের বিষয় আছে। শুনতে পাই, জগদ্‌বিখ্যাত জর্মান দার্শনিক লাইব্‌নিৎস্ Leibnitz এই যুগে তাঁর দার্শনিক গ্রন্থসকল ফরাসি ভাষাতেই রচনা করেন সম্ভবত এই বিশ্বাসে যে, তাঁর মাতৃভাষা দর্শনরচনার পক্ষে উপযোগী নয়। এ বিশ্বাস যে কতদূর অমূলক তার প্রমাণ তাঁর পরবর্তী এবং ইউরোপের নবযুগের অদ্বিতীয় দার্শনিক কান্টের গ্রন্থসকল। সে-সকল গ্রন্থ যে এ যুগের দর্শনশাস্ত্রের ক্ল্যাসিক হয়ে উঠেছে শুধু তাই নয়, কান্টের রচনার প্রসাদে ইউরোপের মনে এমন একটি ধারণা জন্মে গেছে যে, জর্মান ভাষাই হচ্ছে দর্শন রচনা করবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী ভাষা। অতএব দেখা গেল, মার্টিন লুথার যেমন প্রথমে ল্যাটিনের হাত থেকে উদ্ধার করে জর্মান ভাষাকে পায়ের উপর দাঁড় করান, কান্ট তেমনি পরে স্বভাষাকে ফরাসির অধীনতা থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে সে ভাষাকে নিজের পায়ে চলতে শেখান। স্বভাষায় আত্মপ্রকাশ করবার স্বাধীনতা লাভ করে জর্মান সাহিত্য যে কতদূর ঐশ্বর্য লাভ করেছে, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত, এই এক শত বৎসর হচ্ছে জর্মান সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এ যুগের সাহিত্য-রথীদের নামের ফর্দ দিতে হলে পুঁথি অসম্ভবরকম বেড়ে যায়, এবং সে ফর্দ দেবারও কোনো দরকার নেই। কাব্য দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে জর্মান মহারথীদের নাম শিক্ষিতসমাজে কার নিকট অবিদিত? জর্মান প্রতিভার এই আকস্মিক এবং অভূতপূর্ব বিকাশের প্রত্যক্ষ কারণ এই যে, জর্মান ভাষা এবং সেইসঙ্গে জর্মান আত্মা তার স্বরাজ্য লাভ করেছে।

৬

অপর পক্ষে, যে গুণে ফরাসি ভাষা রুশীয় জর্মান প্রভৃতি ভাষার উপর প্রভুত্ব করেছে, সেই গুণেই তা এ যাবৎ স্বীয় সুনীতি ও সুরুচি রক্ষা করে এসেছে। ফরাসি হচ্ছে বড়ো ঘরের সন্তান, প্রাচীন ল্যাটিনের বংশধর; সুতরাং এ ভাষা তার আত্মজ্ঞান কখনোই হারায় নি, তার আভিজাত্যের অহংকারই তার আত্মরক্ষার কারণ হয়েছে। ফরাসি প্রভৃতি ল্যাটিন জাতিরা বহুকাল যাবৎ জর্মানদের বর্বর বলেই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে এসেছিল। বর্বর শব্দের মৌলিক অর্থ হচ্ছে সেই জাতি, যার ভাষা

বোঝা যায় না। সুতরাং এ জাতি যে কস্মিন্‌কালেও অজ্ঞাতকুলশীল জর্মান ভাষার প্রাধান্য স্বীকার করে নি, তা বলা বাহুল্য।

এমন-কি, যে জর্মান দর্শন গত শতাব্দীতে পৃথিবীর শিক্ষিতসমাজের মনের উপর একছত্র এবং অখণ্ড রাজত্ব করেছে সে দর্শনও ফরাসি মনকে বেশিদিন আত্ম-বশে রাখতে পারে নি। প্রসিদ্ধ ফরাসি লেখক তেইন গত শতাব্দীর মধ্য ভাগে এই মত প্রকাশ করেন যে, জর্মানি তৎপূর্ববর্তী একশো বৎসর যা চিন্তা করেছে, তৎপরবর্তী একশো বৎসর সমগ্র ইউরোপকে সেই চিন্তার পুনশ্চিন্তা করতে হবে। এ ভবিষ্যদ্‌বাণী যে খেটেছে, তার প্রমাণ আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েই পাই। এ যুগের যে ইংরেজি দর্শন আমরা চর্চা করি, তা যে গত যুগের জর্মান দর্শনের পুনরাবৃত্তি মাত্র, তার পরিচয় নব-কাণ্টিয়ান, নব-হেগেলিয়ান প্রভৃতি নামেই পাওয়া যায়। আমরা দূর-এশিয়াবাসী হয়েও জর্মান দর্শনকে দূরে রাখতে পারি নি; বরং সত্য কথা বলতে হলে, গত ত্রিশ বৎসর ধরে আমরাও শুধু জর্মানির তৈরি বৈজ্ঞানিক খাদ্য উদরস্থ করছি, আর তার জাবর কাটছি। মনোজগতে যে ল্যাটিন নামক একটি প্রদেশ আছে যা কুয়াশায় ঢাকা নয়, এ কথা আমরা নিজেরা আলোর দেশের লোক হয়েও একরকম ভুলেই গিয়েছিলুম। একবর্ণ জর্মান না জেনেও Nietsche নিট্‌শের বই আমরা অনেকেই পড়েছি এবং তাঁর কথার দুকূল-ভাসানো বন্যায় হাবুডুবুও খেয়েছি, কিন্তু ফরাসি দার্শনিক Guyot গুইয়োর নাম আমরা অনেকেই শুনি নি, যদিচ উভয়েই মনোরাজ্যে একই পথের পথিক; দুইয়ের ভিতর প্রভেদ এই যে, যে পথে ফরাসি গুইয়ো ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছেন, সেই পথে জর্মান নিট্‌শে তাণ্ডবনৃত্য করেছেন। নকুলীশ-পাশুপতদর্শনে দেখতে পাই যে, পাশুপতসম্প্রদায়ের সাধনমার্গে উপহারসংজ্ঞক ছয়প্রকার ক্রিয়া ছিল। তার মধ্যে প্রধান চারটি হচ্ছে, হা হা করে হাস্য করা, গন্ধর্বশাস্ত্রানুসারে গীত গাওয়া, নাট্যশাস্ত্রানুসারে নৃত্য করা এবং হুড্ডুকার করা অর্থাৎ পুঙ্গবের ন্যায় চিৎকার করা। নিট্‌শের লেখা পড়ে আমার মনে হয় যে, নকুলীশ-পাশুপতদর্শন ভারতবর্ষে তার ভবলীলা সংবরণ করে জর্মানিতে আবার পুনর্জন্ম লাভ করেছে। গ্যেটে এবং কাণ্ট সাহিত্যের জগদ্‌গুরু হলেও এ কথা নিঃসন্দেহ যে, বিশ্বমানবের মনের উপর আধুনিক জর্মান মনের প্রভাব যেমন অকারণ তেমনি মারাত্মক; কেননা জর্মান দর্শন অপর জাতির মনের আকাশ ঘুলিয়ে দেয়; জর্মান আত্মার অশেষ গুণের মধ্যে একটি হচ্ছে কুয়াশা সৃষ্টি করবার শক্তি, এবং সে কুয়াশার গতিরোধ করাও যেমন কঠিন, তার প্রকোপে মনের স্বাস্থ্যরক্ষা করাও তেমনি কঠিন। এ সত্য ফরাসি জাতিই সর্বপ্রথমে আবিষ্কার করে। যে সময়ের জর্মান আত্মা আমাদের ঘাড়ে চড়তে শুরু করে, ঠিক সেই সময়ে তা ফরাসিদের ঘাড় থেকে নেমে যেতে শুরু করে। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে তেইন-এর একটি ধনুর্ধর শিষ্য মরিস বারূরে Maurice Barrés ল্যাটিন মনের উপর জর্মান মনের এই বিজাতীয় উপদ্রবের উচ্ছেদকল্পে লেখনী ধারণ করেন। যে পুস্তকে তিনি মনোজগতে জর্মান শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন, সে পুস্তকের নাম *Under the Eyes of the Barbarians*। জর্মান জাতির আদিম বর্বরতা যে এ যুগে বৈজ্ঞানিক বর্বরতার আকার ধারণ

করেছে, বর্তমান যুদ্ধের বহু পূর্বে তা ফরাসি মনীষীদের কাছে ধরা পড়ে, এবং তাও এক হিসেবে ভাষাসূত্রে। জর্মান সাহিত্যের ফরাসি পাঠকেরা হঠাৎ আবিষ্কার করেন যে, জর্মান অভিধানে এমন একটি কথা আছে, যা ফরাসি অভিধানে নেই, এবং সে হচ্ছে পরশ্রীকাতরতা। অপর পক্ষে জর্মান অভিধানে humanity শব্দের সাক্ষাৎ অণুবীক্ষণের সাহায্যেও লাভ করা যায় না। মাতৃভাষা জাতির পৈতৃক প্রাণরক্ষার পক্ষে যে কতদূর সহায়, তারই প্রমাণস্বরূপ, ঈষৎ অবান্তর হলেও, এ ব্যাপারের উল্লেখ করলুম।

৭

আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, লোকভাষা মৃতভাষা এবং বিদেশী ভাষার অধীনতাপাশ মোচন করতে পারলেও অক্লেশে সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারে না। মৌখিক ভাষার স্বরাজ্যলাভের তৃতীয় পরিপন্থী হচ্ছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষা, অর্থাৎ সাধু-ভাষা। এ বিষয়ে এ প্রবন্ধে আমি বেশি বাক্যব্যয় করতে চাই নে, কেননা ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আমি বহু বক্তৃতা করেছি। সে-সব কথার পুনরুক্তি করা এ ক্ষেত্রে আমার পক্ষে প্রেয়ও নয়, শ্রেয়ও নয়; তবে কথাটা একেবারে ছেঁটে দিলে এ প্রবন্ধের অঙ্গ-হানি হয়, এই কারণে সংক্ষেপে এ বিষয়ে আমার মত বিবৃত করতে বাধ্য হচ্ছি।

মানুষে মৃতভাষা ত্যাগ ক'রে যখন প্রথমে লোকভাষা অর্থাৎ মৌখিক ভাষায় লিখতে আরম্ভ করে, তখন সেই মৃতভাষার রচনাপদ্ধতির আদর্শেই রচনা করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। এর উদাহরণও ইউরোপীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়। পদে ও বাক্যে ল্যাটিনিজ্‌মের আমদানি ইংরেজির আদি গদ্যলেখকেরাও যথেষ্ট করেছিলেন। সুতরাং আমরাও যে তা করব, সে তো নিতান্ত স্বাভাবিক। বাংলা গদ্যের বয়েস সবে একশো বছর হলেও তা এক যুগ পিছনে ফেলে এখন দ্বিতীয় যুগে চলছে। প্রথম যুগে সংস্কৃত গদ্যের অনুকরণে এবং সংস্কৃত শব্দের উপকরণে বাংলা গদ্য লেখা হত। যে যুগ চলছে, অতে বাংলা গদ্য গঠিত হয়েছে ইংরেজি বাক্যের অনু-করণে এবং সংস্কৃত শব্দের উপকরণে। আমার বিশ্বাস, এখন আমরা তার তৃতীয় যুগের, অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার যুগের, মুখে এসে পৌঁচেছি। আমার এ বিশ্বাস ভুল হতে পারে, কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহ যে, পরভাষার অনুকরণে এবং উপকরণে যে লিখিত ভাষা গঠিত হয়, সেই পুঁথিগত ভাষা অনেক অংশে নির্জীব। তার পর আর-একটি কথা আছে। যার জীবন আছে, তার নিত্যনূতন বদল হয়। জীবন হচ্ছে একটি ধারাবাহিক পরিবর্তনের স্রোত মাত্র; সেই কারণেই জীবন্ত ভাষা ক্রমপরিবর্তনশীল, এবং যুগে যুগে তা নূতন মূর্তি ধারণ করে; অপর পক্ষে লিখিত ভাষা অক্ষরের মধ্যে অক্ষয় হয়ে বসে থাকে। নৈসর্গিক কারণেই লিখিত ভাষার কাছ থেকে কথিত ভাষা কালবশে এতটা দূরে সরে যায় যে, সেই দুই ভাষা প্রায় দুটি বিভিন্ন ভাষা হয়ে ওঠে। তখন মৃতভাষার সঙ্গে জীবন্ত ভাষার সেই প্রাচীন বিবাদ আবার নূতন আকারে দেখা দেয়; কেননা পূর্বযুগের লিখিত ভাষা পর-যুগের কাছে সম্পূর্ণ মৃত না হলেও অর্ধমৃত তো বটেই। মৃতভাষার সঙ্গে

জীবন্ত ভাষার বিরোধের চাইতে সাধুভাষার সঙ্গে চলতি ভাষার কলহের কলরবটা কিছু বেশি, কেননা এ হচ্ছে জ্ঞাতিশত্রুতা। তা ছাড়া লিখিত ভাষাই হচ্ছে সাহিত্য-জগতে মৌখিক ভাষার যথার্থ শিক্ষাগুরু। সুতরাং মৌখিক ভাষার পক্ষে সাহিত্য-রাজ্য অধিকার করবার প্রয়াসটা সত্যসত্যই শিষ্যের পক্ষে গুরুকে ছাড়িয়ে ওঠবার চেষ্টা। এ অবস্থায় সাহিত্যের দ্রোণাচার্যেরা যে সাহিত্যের একলব্যদের অঙ্গুলি-চ্ছেদের আদেশ দেবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি। এতে অবশ্য ভয় পেলে স্বভাষাকে স্বরাট্ করে তোলা যাবে না। এ কথাটা শ্রুতিকটু হলেও সত্য যে, গুরুভক্তি না থাকলে যেমন সনাতন বিদ্যা অর্জন করা যায় না, তেমনি গুরুমারা বিদ্যে না শিখলেও নূতন সাহিত্যের সর্জন করা যায় না। প্লেটো-অ্যারিস্টটলের যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি সকল দেশের সকল যুগের সাহিত্যের ইতিহাস এই সত্যের পরিচয় দিয়ে আসছে। অতএব বইয়ের ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার যুদ্ধটা নিরর্থকও নয়, নিষ্ফলও নয়। মৃতভাষার সঙ্গে জীবন্ত ভাষার, বিদেশী ভাষার সঙ্গে স্বদেশী ভাষার লড়াইও তো ঐ বইয়ের ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার জীবন-সংগ্রাম বই আর কিছুই নয়।

৮

ইউরোপ হতে সংগৃহীত এই ইতিহাসের আলোক বঙ্গ ভাষার উপর ফেলে দেখা যাক, আমাদের মাতৃভাষার বর্তমান অবস্থাটা কি। বঙ্গ ভাষার পুরাতত্ত্ব আমরা আজও পুরো জানি নে; কিন্তু বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস আমাদের কাছে একেবারে অবিদিত নয়। এ ইতিহাসের দুটি সম্পূর্ণ পৃথক্ অধ্যায় আছে। আমাদের সাহিত্যের যে যুগ গত হয়েছে সেটিকে নবাবি যুগ, এবং যে যুগ আগত হয়েছে, সেটিকে সাহেবি যুগ বলা যায়।

নবাবি যুগের সাহিত্যে, ছড়া পাঁচালি পদাবলী ও সংস্কৃত কাব্যের প্রাকৃত অনুবাদ ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না; এক কথায় এ সাহিত্য হচ্ছে পদ্যে লেখা গান ও গল্পের সাহিত্য। কিন্তু নবাবি আমলে বাঙালি যে একমাত্র উদরান্ন ব্যতীত অপর কোনো বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করে নি, এ কথা সত্য নয়। সে যুগে এ দেশে ধর্মশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চা ছিল। জনরব যে, মনুসংহিতার মন্বর্থমুক্তাবলীর রচয়িতা কুল্লূকভট্ট তাহিরপুরের রাজবংশের, এবং কুসুমাঞ্জলির প্রণেতা উদয়নাচার্য ভাদুড়িকুলের আদিপুরুষ। এ প্রবাদ সত্য বলে গ্রাহ্য করে নেবার দিকে আমার মনের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে, কেননা আমি জাতিতে বারেন্দ্রব্রাহ্মণ। তৎসত্ত্বেও প্রমাণের অসদ্ভাবহেতু এ কিংবদন্তিতে কোনোরূপ আস্থা স্থাপন করা যায় না। কিন্তু বাঙালির হাতে যে একটি নব্যন্যায় এবং একটি নব্যস্মৃতি গড়ে উঠেছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বঙ্গদেশজাত এ-সকল সংস্কৃতশাস্ত্রের মূল্য যে কি, সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করবার অধিকার আমার নেই। সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত আমার জনৈক দ্রাবিড় বন্ধু বলেন যে, বাংলার নব্যন্যায় যে নব্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা ন্যায় কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।

অষ্টাদশতত্ত্ব রচনা করে রঘুনন্দন বাঙালি জাতির উপকার কি অপকার করেছেন সে বিষয়েও যথেষ্ট মতভেদের অবসর আছে। কিন্তু এই-সকল গ্রন্থই প্রমাণ যে, নবাবি আমলেও বাঙালি জাতির বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে ঘুমিয়ে পড়ে নি, এবং বাঙালি সমাজতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করতে বিচার করতে কখনোই ক্ষান্ত হয় নি। কিন্তু সে যুগে আমাদের জ্ঞান ও চিন্তার একমাত্র বাহন ছিল সংস্কৃত ভাষা, যেমন মধ্যযুগে ইউরোপের ছিল ল্যাটিন। সেকালে বুদ্ধিবিদ্যার বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করবার লোকভাষার কোনোই অধিকার ছিল না। সুতরাং ইংরেজ আসার পূর্বে এ দেশে বাংলা ছিল, মধ্যযুগের ইউরোপে যাকে বলত একটি vulgar tongue, অর্থাৎ ইতর ভাষা।

ইংরেজি আমলে বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু আমাদের দর্শনবিজ্ঞানের বাহন আজ সংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরেজি হয়েছে। কথাটা যে সত্য তার প্রমাণস্বরূপ দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। সার্ জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি দেশপূজ্য মনীষিগণ তাঁদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থসকল ইংরেজি ভাষাতেই রচনা করেন। অর্থাৎ লাইব্‌নিৎসের যুগে জর্মানভাষার যে অবস্থা ছিল, আজ এই বিংশ শতাব্দীতে বাংলাভাষা ঠিক সেই অবস্থাতেই আছে। সাহিত্যের স্কুলে আজও তা প্রমোশন পায় নি, তার ইতরতার কলঙ্ক আজও ঘোচে নি।

৯

বলা বাহুল্য, বঙ্গ সাহিত্য যতদিন কেবলমাত্র গল্প ও গানের গণ্ডির ভিতর আটক থাকবে, ততদিন শিক্ষিতসমাজে বঙ্গ ভাষা যথার্থ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। কেননা শ্রেষ্ঠ কাব্য সাহিত্যের মুকুটমণি হলেও সস্তা কথা ও গাথা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। নিকৃষ্ট কাব্যসাহিত্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াতে কোনো সাহিত্যেরই গৌরব বৃদ্ধি হয় না, এবং অক্ষম হস্তের অযত্নপ্রসূত গান ও গল্প প্রায়ই উৎকৃষ্ট হয় না ; কেননা যথার্থ কাব্যসৃষ্টির জন্য চাই স্রষ্টার প্রাক্তন সংস্কার এবং অসামান্য প্রতিভা। এবং সকলেই অবগত আছেন যে, প্রতিভাশালী লেখক এবেলা-ওবেলা হাটে-বাজারে মেলে না। হালে বঙ্গ সাহিত্যের একটি নূতন চাল দেখে আমি ঈষৎ ভীত হয়ে পড়েছি। সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে রসমাহাত্ম্যকীর্তন ও রসতত্ত্ববিচারের বেজায় ধুম পড়ে গিয়েছে। এতে অবশ্য ভয়ের কোনো কারণ থাকত না, যদি না সাহিত্যে রসের লোভে তার সারের দিকটা উপেক্ষা করবার একটা সম্ভাবনা এসে পড়ত। কদলীবৃক্ষের অন্তরে সার নেই, আছে কেবল রস ; সে কারণ আমরা যদি বঙ্গ সাহিত্যে সেই নিটোল সুগোল মসৃণ চিক্কণ নধর সরস বৃক্ষের চাষের প্রশ্রয় দিই, তা হলে বঙ্গসরস্বতীর কপালে নিশ্চয়ই শুধু কদলীভক্ষণই লেখা আছে। এ স্থলে আমি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ভাষার উৎপত্তি কর্মে, আর তার পরিণতি জ্ঞানে। ভাষা ব্যতীত মানুষের চিন্তা প্রকাশ করবার অপর কোনো উপায় নেই। অপর পক্ষে আমরা যাকে বলি রস, আর ইংরেজরা ইমোশন,

সে বস্তু প্রকাশ করবার নানা উপায় আছে, যথা, স্বেদ কম্প মূর্ছা বেপথু শীৎকার চিৎকার প্রভৃতি। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, জ্ঞান ও চিন্তার বাহন হয়েই ভাষা তার স্বরূপ ও স্বরাজ্য লাভ করে। সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করে কাব্য, কেননা একমাত্র কাব্যেই জ্ঞানের ভাষা কর্মের ভাষা ও ভক্তির ভাষা, এই ত্রিধারার ত্রিবেণীসংগম হয়। তিনিই যথার্থ কবিপদবাচ্য, যাঁর হৃদয়রসের সংগে বহুলপরিমাণে জ্ঞানের সার, যাঁর বুকের রক্তের সংগে অনেকখানি মনের ধাতু অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশ্রিত থাকে। সত্য ও সুন্দর যে কারো কারো হাতে একই বস্তু হয়ে ওঠে, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ কালিদাস শেক্সপীয়ার দান্তে মিল্টন গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাকবিদের কাব্য।

সুতরাং বংগ সাহিত্যের বর্তমান অজ্ঞান অবস্থা আমাদের কাছে মোটেই সন্তোষজনক নয়। বংগসরস্বতী কালে যে আমাদের মনোজগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হবেন, এই দুরাশাই আমাদের উচ্চ আশা। অতএব কি অবস্থায় এবং কি কারণে লোকভাষা পরবশ হয়ে পড়ে, আর কি ব্যবস্থায় এবং কি উপায়ে তা আত্মবশ হয়ে ওঠে, তারও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা দরকার। অবস্থা বুঝলে তার ব্যবস্থা করা সহজ। মাতৃভাষাকে স্বপ্রতিষ্ঠ করবার লোভ যে আমরা কিছুতেই সংবরণ করতে পারি নে, তার কারণ আমরা জানি যে 'সর্বম্ আত্মবশং সুখম্' আর 'সর্বং পরবশং দুঃখম্'।

১০

জীবন্ত ভাষার উপর মৃতভাষার প্রভুত্বের কারণ নির্ণয় করবার জন্য ল্যাটিনের উদাহরণ নেওয়া যাক। পুরাকালে ল্যাটিন যে ইউরোপের পশ্চিম ভাগের উপর একাধিপত্য করেছিল তার কারণ, সেকালে ল্যাটিন ছিল সে ভূভাগের রাজভাষা। গ্রীক ভাষা সে যুগের রোমানদের বিদ্যাশিক্ষার ভাষা হলেও সে ভাষা রাজভাষা নয় বলে রোমের অধীনস্থ অপর দেশসকলে তা অপরিচিত ছিল। তবে রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরও ল্যাটিন যে আর এক হাজার বছর ধরে ইউরোপে নির্বিবাদে প্রভুত্ব করে, তার কারণ রোম তার রাজত্ব হারিয়ে স্বর্গত্ব লাভ করল ; যে রোম ছিল প্রাচীন যুগের কর্মরাজ্যের কেন্দ্র, সেই রোম হয়ে উঠল মধ্যযুগের ধর্মরাজ্যের 'ইটারন্যাল সিটি' অর্থাৎ অমরাপুরী। এক কথায়, রোমানরা খৃস্টধর্ম অবলম্বন করবার পর ল্যাটিন হল দেবভাষা। কোনো বিশেষ ধর্মের ভাষা, অর্থাৎ যজনযাজন ধ্যানধারণা উপাসনা-আরাধনা তন্ত্রমন্ত্র স্তব-স্তোত্রের ভাষা যে সেই ধর্মাবলম্বী লৌকিক মনের অলৌকিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করে, বিশেষত সে ভাষার অর্থ যদি জনগণের জানা না থাকে, এ সত্য তো জগদ্‌বিখ্যাত। ল্যাটিনের প্রতাপ ইউরোপে আজও অক্ষুণ্ণ থাকত, যদি না রেনেসাঁস এবং রিফর্মেশন ইউরোপের মনকে রোমান চর্চের একান্ত বশ্যতা থেকে মুক্ত করত। মধ্যযুগের শেষ ভাগে গ্রীক সাহিত্যের আবিষ্কারের সংগে সংগে ইউরোপ মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও স্বোপার্জিত জ্ঞানের সাক্ষাৎ লাভ করলে। এর ফলে, রোমের ধর্মমন্দিরের অটল ভিত টলটলায়মান হল, এবং সেইসংগে ল্যাটিন ভাষারও দৈবশক্তি লোপ পাবার উপক্রম হল।

গ্রীক ভাষার প্রভূত ঐশ্বর্য ও অপূর্ব সৌন্দর্যের তুলনায় ল্যাটিন ভাষা ইউরোপের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের চোখে ক্ষীণসত্ত্ব ও হীনপ্রভ হয়ে পড়ল। এই গ্রীক সাহিত্যের চর্চায় সে যুগের মনীষিগণ নূতন দর্শনবিজ্ঞানের সৃষ্টি করতে ব্যগ্র হলেন। কিন্তু স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত দর্শনবিজ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মতন্ত্রকে বিচলিত করতে পারলেও বিপর্যস্ত করতে পারে না। এক ধর্মমতের স্থান অধিকার করতে পারে শুধু আর-এক ধর্মমত। তাই লুথারের প্রবর্তিত রিফর্মেশনই জর্মানিক ভাষাসমূহকে ল্যাটিনের অধীনতা থেকে যথার্থ মুক্তি দান করলে।

১১

লুথার যেদিন জর্মানির লোকভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করলেন, সেই দিনই জর্মান সাহিত্যের পাকা বুনিয়াদের পত্তন হল। ভাষার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক যে অতি ঘনিষ্ঠ, এ সত্য সকলের নিকট সুস্পষ্ট না হলেও নিঃসন্দেহ। মানুষের মনের বাইরে ভাষা নেই, এবং ভাষার বাইরেও মন নেই। ভাষা ও মন হচ্ছে একই বস্তুর অন্তর ও বাহির। সুতরাং ধর্মমত ভাষান্তরিত হলে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ইউরোপ খৃস্টধর্ম অবলম্বন করবার অব্যবহিত কাল পরেই সে দেশে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক্ খৃস্টসংঘের সৃষ্টি হল, একটি রোমে, আর-একটি কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লে। রোমান সাম্রাজ্য তার অধঃপতনের মুখে যে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, খৃস্টধর্ম তার অভ্যুত্থানের মুখে ঠিক সেই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এর মূল কারণ যে ভাষার পার্থক্য, তার পরিচয় এ দুটি সংঘের নামেই পাওয়া যায়; একটির নাম গ্রীক চর্চ, অপরটির রোমান। নিউ টেস্টামেণ্ট যদি গ্রীক, অর্থাৎ ইউরোপের ভাষায় লেখা না হত, তা হলে এশিয়ার ধর্ম ইউরোপে গ্রাহ্য হত কি না সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। ভাষার শক্তিতে আমি এতটাই বিশ্বাস করি। এ দেশের বৌদ্ধধর্মও যে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তার মূলেও ছিল ঐ ভাষার পার্থক্য: মহাযানের ভাষা সংস্কৃত, এবং হীনযানের পালি।

অপর পক্ষে পৃথিবীতে যখন কোনো নূতন ধর্মমত জন্মলাভ করে, তখন তার বাহন হয় একটি নূতন ভাষা। বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল পালিতে, এবং জৈনধর্ম মাগধী প্রাকৃতে; সুতরাং লুথার যখন খৃস্টধর্মের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করলেন, তখন তাঁকে ল্যাটিন ত্যাগ করে জর্মান ভাষারই আশ্রয় নিতে হল। তিনি এ উপায় অবলম্বন না করলে প্রোটেস্টাণ্টিজ্‌ম্ ইউরোপে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম হিসেবে কখনোই প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারত না। তার প্রমাণ, ল্যাটিনের অপভ্রংশ যাদের মাতৃভাষা, ইউরোপের সেই-সকল জাতি আজও রোমান ক্যাথলিক; রোমান ভাষাই রোমান চর্চের সঙ্গে তাদের মনের প্রধান যোগসূত্র। অপর পক্ষে যে-সকল জাতির ভাষা জর্মানিক, সেই-সকল জাতিই প্রোটেস্টাণ্ট। একই কারণে বাংলা সংস্কৃতের প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করেছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরেই বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়েছে। মহাপ্রভু যেদিন ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে বৈষ্ণবধর্মের, জ্ঞান ও

কর্মের উপরে ভক্তির প্রাধান্য প্রচার করতে উদ্যত হলেন, সেদিন তাঁকে সংস্কৃত ত্যাগ করে বাংলার আশ্রয় নিতে হল। চৈতন্যের ধর্মসংস্কারকে বাংলাদেশের রিফর্মেশন বলা অসংগত নয়। তার পর এসেছে আমাদের রেনেসাঁস; ইউরোপ একদিন যেমন গ্রীক সাহিত্য আবিষ্কার ক'রে ল্যাটিন ভাষার একাধিপত্য থেকে মুক্তি লাভ করে, আমরাও তেমনি ইংরেজি সাহিত্য আবিষ্কার ক'রে সংস্কৃত ভাষার একাধিপত্য হতে মুক্তিলাভ করেছি এবং সে একই কারণে। পশ্চিম ইউরোপে গ্রীক, ধর্মের নয়, বিদ্যাশিক্ষার ভাষা বলেই গ্রাহ্য হয়েছিল; আমাদের কাছেও ইংরেজি তেমনি ধর্মের নয়, বিদ্যাশিক্ষার ভাষা বলেই গ্রাহ্য হয়েছে। ল্যাটিন অবশ্য তাই বলে ইউরোপে বাতিল হয়ে যায় নি, সে ভাষার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা আজও সে দেশে সজোরে চলছে। কিন্তু সে বিদ্যাশিক্ষার ভাষা হিসাবে। অবশ্য রোমান ক্যাথলিক জাতির কাছে সে ভাষা আজও কতক পরিমাণে ধর্মের ভাষা বলে মান্য কিন্তু প্রধানত বিদ্যাশিক্ষার ভাষা বলেই গণ্য। আমাদের বাঙালিদের কাছে সংস্কৃত আজকের দিনে ঐ হিসাবেই গণ্য ও মান্য।

১২

অতএব দেখা গেল যে, পরভাষা, তা মৃতই হোক আর বিদেশীই হোক লোকভাষার উপর প্রভুত্ব করে এই গুণে যে, তা জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষা, এক কথায় বিদ্যাশিক্ষার ভাষা; বলা বাহুল্য, ধর্মের ভাষাও আসলে বিদ্যার ভাষা। অপর বিদ্যার সঙ্গে এ বিদ্যার প্রভেদ এই যে, তা অপরা বিদ্যা নয়, তা হচ্ছে থিয়োলজি অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। এই গুণেই ইংরেজি আজ বাংলার উপর প্রভুত্ব করছে। এ প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাংলাকে বিদ্যাশিক্ষার ভাষা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ভাষা, এক কথায় বিদ্যালয়ের ভাষা করে তোলা। আমাদের উচ্চ আশা এই যে, ভবিষ্যতে বাংলা উচ্চশিক্ষার ভাষা হবে; শুধু বাল্যবিদ্যালয়ে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়েও এ ভাষা পাবে প্রথম আসন, এবং ইংরেজি দ্বিতীয় আসন গ্রহণ করবে। যতদিন বাংলা, হয় বিদ্যালয়ের বহির্ভূত হয়ে থাকবে, নয় ইংরেজির অনুচর কিম্বা পার্শ্বচর হিসাবে সেখানে স্থান পাবে, ততদিন বাংলা সাহিত্য সর্বাঙ্গসুন্দর ও সর্বশক্তিশালী হয়ে উঠবে না। এবং বাঙালির প্রতিভাও ততদিন পূর্ণবিকাশ লাভ করবার পূর্ণ সুযোগ পাবে না। সাহিত্যেই জাতীয় মনের প্রকাশ, অতএব সাহিত্যের ঐশ্বর্যেই জাতীয় মনের ঐশ্বর্যের পরিচয়। আমি পূর্বেই বলেছি, ভাষা ও মন একই বস্তুর এপিঠ আর ওপিঠ। বাংলা ভাষাকে বিদ্যালয়ের ভাষা করে-তোলবার পথে কত এবং কি গুরুতর বাধা আছে, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। তৎসত্ত্বেও আমি বলি, সে-সকল বাধা আমাদের অতিক্রম করতেই হবে, নচেৎ বাঙালির মন চিরকাল অর্ধপক্ক অবস্থাতেই থেকে যাবে। বঙ্গ সাহিত্যের গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি পাঠ করলেই দেখা যায় যে, সে-সকল রচনা কোনো অংশে পাকা আর কোনো অংশে কাঁচা। এ-সব লেখার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের উত্তর-পত্রের একটা পারিবারিক সাদৃশ্য আছে। পঠিত পুস্তকের স্মৃতি লেখকদের

যেখানে অক্ষুন্ন সেখানে লেখা পাকা, আর যেখানে ক্ষুন্ন সেখানে কাঁচা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে-মনের পরিচয় পেয়ে ইউরোপ যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে, সেই পক্কবয়ার মন আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে একান্ত দুর্লভ। এর কারণ, আমাদের মনকে দিবারাত্র পরভাষার জাগ দিয়ে অকালপক্ক করে তোলা হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের ভাষা না হলে আমাদের ভাষা যে তার পূর্ণ শ্রী পূর্ণ শক্তি লাভ করবে না, এ কথাও যেমন সত্য, অপর পক্ষে আমাদের সাহিত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহিত্য না হলেও যে তা বিদ্যালয়ে গ্রাহ্য হবে না, এ কথাও তেমনি সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় লিখেছেন—

এদিকে কোন সুশিক্ষিত বাঙ্গালিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "মহাশয়, আপনি বাঙ্গালি— বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পত্রাদিতে আপনি এত হতাদর কেন?" তিনি উত্তর করেন, "কোন্ বাঙ্গলা গ্রন্থে বা পত্রে আদর করিব? পাঠ্য রচনা পাইলে অবশ্য পড়ি।" আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, এ কথার উত্তর নাই।

আজকের দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা যদি আমাদের ঐরূপ প্রশ্ন করেন, তা হলে আমাদেরও মুক্তকণ্ঠে না হোক, রুদ্ধকণ্ঠে স্বীকার করতে হবে যে, সে প্রশ্নের উত্তর নেই। তবে আমাদের এ ক্ষেত্রে কর্তব্য যে কি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষায় আমাদের বিদ্যার সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে, এবং সেজন্য বহু শিক্ষিত লোককে কায়মনোবাক্যে বহুদিন ধরে পরিশ্রম করতে হবে। ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মাতৃভাষাতেই ইতিহাস এবং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসকল রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন; কিন্তু সে সাহিত্যের যে তেমন কিছু গৌরব কিম্বা সৌরভ নেই তার কারণ, এক দিকে ইংরেজি ভাবের আর-এক দিকে সংস্কৃত ভাষার চাপের মধ্যে পড়ে আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে ভাবতেও পারি নে, মুক্তহস্তে লিখতেও পারি নে।

১৩

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, মৃতভাষা ও পরভাষার প্রভুত্ব থেকে মাতৃভাষাকে আমি মুক্ত করতে চাই বলে এ ভুল যেন কেউ না করেন যে, আমি সংস্কৃত ও ইংরেজির পঠনপাঠন বন্ধ করে দিতে চাই। আমার বিশ্বাস, তা করলে বঙ্গ সাহিত্যে ইভ্লিউশন হওয়া দূরে থাক্, একটা বিষম ও সম্ভবত ভীষণ রিভার্সন এসে পড়বে। সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যের চর্চা থেকেই আমরা সেই মনের বল ও হাতের কৌশল লাভ করব, যা আমাদের সাহিত্যের মুক্তির কারণ হবে। বর্তমানে ইউরোপের সকল ভাষাই গ্রীক-ল্যাটিনের অধীনতা হতে মুক্তিলাভ করেছে, কিন্তু তাই বলে সে দেশে গ্রীক-ল্যাটিনের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বন্ধ হয় নি। বরং সাহিত্যরাজ্যে ইউরোপের এই স্বদেশী যুগে উপরোক্ত দুটি ক্ল্যাসিকের চর্চা যত গভীর ও বিস্তৃত হয়েছে, ক্ল্যাসিক-শাসিত যুগে তার সিকির সিকিও হয় নি।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, ক্ল্যাসিক চর্চা করবার সার্থকতা কি, তা হলে সে দেশের কাব্যরসের রসিক উত্তর দেবেন যে, ঐ দুটি প্রাচীন ভাষায় যে কাব্যামৃত

সঞ্চিত রয়েছে, তার রসাস্বাদ না করলে মানবজনম বিফল হয়; দার্শনিক বলবেন, মনের উদারতা ও হৃদয়ের গভীরতা লাভ করবার জন্য অতীতের সাহিত্যের পরিচয় লাভ করা একান্ত প্রয়োজন; বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করতে উদ্যত হবেন যে, অতীতের সভ্যতার সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচয় না থাকলে আমরা বর্তমান সভ্যতার যথার্থ প্রকৃতি ও মতিগতির পরিচয় পাব না, কেননা বর্তমান ক্রমগঠিত হয়েছে অতীতের গর্ভে; এবং আর্টিস্ট দেখিয়ে দেবেন যে, ক্ল্যাসিক সাহিত্যের এমন-একটি গুণ আছে যা বর্তমান সাহিত্যে পাওয়া দুর্ঘট এবং সে গুণের নাম হচ্ছে আভিজাত্য। এ-সকল উক্তিই সত্য, সুতরাং সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক্ চর্চা আমাদের চিরদিনই করতে হবে। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর অসংখ্য মৃতভাষার মধ্যে গ্রীক ল্যাটিন ও সংস্কৃত, এই তিনটি আর্যভাষাই ক্ল্যাসিক, অপর কোনোটিই নয়। এ স্থানে একটি কথার উল্লেখ করা দরকার। অলংকারশাস্ত্রের ভাষায় বলতে গেলে, ইউরোপে গ্রীক-ল্যাটিনের বাণী সেকালে ছিল প্রভুসম্মিত, একালে তা হয়েছে সুহৃদসম্মিত; অর্থাৎ আগে যা ছিল বেদবাক্য, এখন তা হয়েছে ন্যায়কথা। আশা করি, কালে সংস্কৃতসরস্বতীর বাণীও আমাদের কাছে তার প্রভুসম্মিত চরিত্র হারিয়ে সুহৃদসম্মিত হয়ে উঠবে। তা যে দূর-ভবিষ্যতেও কান্তাবাণী হয়ে উঠবে, সে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। এই তিনটি ক্ল্যাসিকের মহা গুণ এই যে, তার প্রত্যেকটিই পুরুষালি সাহিত্য, মেয়েলি নয়; সে সাহিত্যে আধআধ ভাব কিম্বা গদ্‌গদ ভাবের স্থান নেই; সে সাহিত্য যেখানে কোমল সেখানে দুর্বল নয়, যেখানে সানুরাগ সেখানে সানুনাসিক নয়। এ কারণেও সংস্কৃতের চর্চা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং অবশ্যকর্তব্য, কেননা বাংলার বাণীর কান্তাসম্মিত হয়ে পড়বার দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক এবং রোখ আছে।

আজকের দিনে ইউরোপের কোনো ভাষাই অপর কোনো ভাষার আওতায় পড়ে নেই, সে ভূভাগে এখন সবাই স্বাধীন সবাই প্রধান; অথচ সে দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় এই জাতিস্বাতন্ত্র্যের যুগেও স্বদেশী ভাষা ব্যতীত আরো অন্তত দুটি-তিনটি বিদেশী ভাষা সাগ্রহে এবং সানন্দে শিক্ষা করেন। এর কারণ কি? এর কারণ সভ্যজগতের এ জ্ঞান জন্মেছে যে, মানুষের মনোজগৎ কেউ আর এক-হাতে গড়ে নি, এর ভিতর নানা যুগের নানা দেশের হাত আছে। সে কারণ, বিদেশী ভাষা ও বিদেশী সাহিত্যের চর্চা ছেড়ে দিলে মানুষকে মনোরাজ্যে একঘরে এবং কুনো হয়ে পড়তে হয়। একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের চর্চায় মানুষের মন জাতীয় ভাবের গণ্ডির মধ্যেই থেকে যায়, এবং এ বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই যে, মনো-রাজ্যে কূপমণ্ডূক হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, সে কূপের পরিসর যতই প্রশস্ত ও তার গভীরতা যতই অগাধ হোক-না কেন। এবং এ কথাও অস্বীকার করবার জো নেই যে, যে জাতি মনে যতই বড়ো হোক-না কেন, তার মনের একটা বিশেষ-রকম সংকীর্ণতা আছে, এবং তার মনের ঘরের দেয়াল ভাঙবার জন্য বিদেশী মনের ধাক্কা চাই। বিদেশীর প্রতি অবজ্ঞা বিদেশী মনের অজ্ঞতা থেকেই জন্মলাভ করে এবং এই সূত্রে জাতির প্রতি জাতির দ্বেষ-হিংসাও প্রশ্রয় পায়। অপরের মনের সম্পর্কে এসে তার সঙ্গে মনের মিল হওয়াটা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; কেননা

তখন দেখা যায় যে, অপর জাতির লোকরাও আসলে মানুষ, এবং অনেকটা আমাদের মতোই মানুষ। সুতরাং বিদেশী সাহিত্যের চর্চায়, শুধু আমাদের মন নয়, হৃদয়ও উদারতা লাভ করে; আমরা শুধু মানসিক নয়, নৈতিক উন্নতিও লাভ করি। অতএব মনোজগতে যথার্থ মুক্তি লাভ করতে হলে আমাদের পক্ষে বিশ্বমানবের মনের সংস্পর্শে আসা দরকার। সত্য কথা এই যে, মনোজগতে বৈচিত্র্য থাকলেও কোনো দেশভেদ নেই ; আমরা আমাদের মনগড়া বেড়া দিয়ে তার মনগড়া ভাগবাটোয়ারা করি, সত্যের আলোকে এ-সব অলীক প্রাচীর কুয়াশার মতো মিলিয়ে যায়। এ কথা আমি বিশ্বাস করি বলে, আমার মতে আমাদের পক্ষে শুধু ইংরেজি নয়, সেইসঙ্গে ফরাসি এবং জর্মানও শেখা দরকার। ইংরেজি ভাষা অবশ্য সমগ্র ইউরোপের সমস্ত জ্ঞান ও চিন্তা আমাদের মনের ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে, কিন্তু অনুবাদের মারফত সাহিত্য পড়া গ্রামোফোনের মারফত গান শোনার মতো; অর্থাৎ ও উপায়ে মানুষের প্রাণের কথা আমাদের কানে যন্ত্রধ্বনির আকারে এসে পৌঁছয়। সে যাই হোক, আজকের দিনে ইংরেজির চর্চা ত্যাগ করলে বিশ্বমানবের বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার স্বহস্তে বন্ধ করে দেওয়া হবে। বাংলা আমাদের শিক্ষার প্রধান ভাষা হলে ইংরেজি বাণী আর প্রভুসম্মিত থাকবে না, সুহৃদ্‌সম্মিত হয়ে উঠবে; প্রভু তখন যথার্থ সখা হয়ে উঠবে। আর-একটি কথা বলেই আমার প্রবন্ধ শেষ করব।

১৪

আজকের দিনে ভারতবাসীর মুখে 'স্বরাজ' ছাড়া অপর কোনো কথা নেই। দেশের স্বরাজ্য পরের কাছে হাত পেতে পাওয়া যায় কি যায় না, তা আমি বলতে পারি নে। কিন্তু এ কথা আমি খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, মনের স্বরাজ্য নিজ হাতে গড়ে তুলতে হয়। তার পর দেশের স্বরাজ্য ইংরেজি ভাষার প্রতাপে লাভ করা গেলেও মনের স্বরাজ্য একমাত্র স্বভাষার প্রসাদেই লাভ করা যায়। সুতরাং সাহিত্য-চর্চা আমাদের পক্ষে একটা শখ নয়, জাতীয় জীবন গঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। কেননা এ ক্ষেত্রে যা-কিছু গড়ে উঠবে তার মূলে থাকবে জাতীয় আত্মা এবং জাতীয় কৃতিত্ব।

এক জাতের বুদ্ধিমান লোক আছেন যাঁরা বলেন যে, আমাদের পক্ষে একটা বড়ো সাহিত্য গড়ে তোলবার চেষ্টাটা সম্পূর্ণ বৃথা। তাঁদের মতে সাহিত্যের অভ্যুদয় জাতীয় অভ্যুদয়কে অনুসরণ করে। এবং নিজের মতের সপক্ষে তাঁরা পেরিক্লিসের এথেন্স, অগাস্টাসের রোম, এলিজাবেথের ইংলণ্ড এবং চতুর্দশ লুইয়ের ফ্রান্সের নজির দেখান। এ মত গ্রাহ্য করার অর্থ আত্মার উপর বাহ্যবস্তুর শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করা। কিন্তু অদৃষ্টবাদ মানুষের পুরুষকারকে খর্ব করে, অতএব বিজ্ঞান-সম্মত হলেও তা অগ্রাহ্য। সুখের বিষয়, এ মত মেনে নেবার কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ নেই। যদি সাহিত্যের অভ্যুদয় একমাত্র রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভর করত, তা হলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জর্মানিতে অমন অপূর্ব সাহিত্যের সৃষ্টি হত না, কারণ সে যুগে জর্মানির রাষ্ট্রীয় শক্তি শূন্যের কোঠায় গিয়ে পড়েছিল।

নেপোলিয়ন যেদিন সমবেত জর্মান জাতিকে পদদলিত করে জেনা নগরে প্রবেশ করেন, সেদিন সে নগরে গ্যেটে ও হেগেল উভয়েই উপস্থিত ছিলেন, এবং সম্ভবত এ'দের একজন কাব্যের, আর-একজন দর্শনের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন; কেননা বিজয়ী ফরাসিদের তোপের গর্জন যে এ'দের যোগনিদ্রা ভঙ্গ করেছিল এ কথা ইতিহাসে লেখে না। আর এ যুগে জর্মান জাতি সাংসারিক হিসাবে অপূর্ব অভ্যুদয় লাভ করেছে কিন্তু জর্মান সাহিত্য সে অভ্যুদয়ের অনুসরণ করে নি। বরং সত্য কথা এই যে, সে দেশে লক্ষ্মীর আস্ফালনে সরস্বতী পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়েছেন।

আসল ঘটনা এই যে, যুগবিশেষে দেশবিশেষের জাতীয় আত্মা যখন সজ্ঞান ও সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখন কি সাহিত্য কি সমাজ সবই এক নূতন শক্তি লাভ করে, এক নূতন মূর্তি ধারণ করে। তখন জাতির আত্মশক্তি নানা দিকে নানা ক্ষেত্রে বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। পেরিক্লিসের এথেন্স প্রভৃতি এই সত্যের নিদর্শন। কিন্তু এমন হওয়া আশ্চর্য নয় যে, জাতীয় আত্মা প্রবুদ্ধ হয়ে উঠলেও অবস্থার গুণে বা দোষে তা বিশেষ একটা দিকেই মাথা তুলতে পারে, হয় সাহিত্যের দিকে, নয় শিল্প-বাণিজ্যের দিকে। সুতরাং জাতি হিসাবে আমরা শক্তিশালী নই বলে আমাদের সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা যে বিড়ম্বনা, তা হতেই পারে না। তা ছাড়া সাহিত্যের প্রধান কাজই যখন জাতীয় আত্মাকে প্রবুদ্ধ করা, তখন তার অবসর চিরকালই আছে। আমার শেষ কথা এই যে, বাংলার ভবিষ্যৎ ও বাঙালির ভবিষ্যৎ মূলে একই বস্তু।

অগ্রহায়ণ ১৩২৪

বই পড়া

কটেজ লাইব্রেরি ও ভবানীপুর ইন্‌স্টিটিউটের সাহিত্যশাখার অধিবেশনে পঠিত

প্রবন্ধ আমি লিখি এবং সম্ভবত যত লেখা উচিত তার চাইতে বেশিই লিখি, কিন্তু সে প্রবন্ধ সর্বজনসমক্ষে পাঠ করতে আমি স্বভাবতই সংকুচিত হই। লোকে বলে, আমার প্রবন্ধ কেউ পড়ে না। যে প্রবন্ধ লোকে স্বেচ্ছায় পড়ে না, সে প্রবন্ধ অপরকে পড়ে শোনানোটা অবশ্য শ্রোতাদের উপর অত্যাচার করারই শামিল।

এ সত্ত্বেও আমি আপনাদের অনুরোধে আজ যে একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে প্রস্তুত হয়েছি তার কারণ, লাইব্রেরি সম্বন্ধে কথা কইবার আমার কিঞ্চিৎ অধিকার আছে।

কিছুদিন পূর্বে সাহিত্য পত্রে আমার সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয় যে, আমি একজন 'উদাসীন গ্রন্থকীট'। এর অর্থ, কোনো-কোনো লোক যেমন সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে বনে গমন করেন, আমিও তেমনি সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে লাইব্রেরিতে আশ্রয় নিয়েছি। পুস্তকাগারের অভ্যন্তরে আমি যে আজীবন সমাধিস্থ হয়ে রয়েছি, এ জ্ঞান আমার অবশ্য ইতিপূর্বে ছিল না। সে যাই হোক, আমার আকৈশোর বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির দত্ত এই সার্টিফিকেটের বলে এ ক্ষেত্রে বই পড়া সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে সাহসী হয়েছি। লাইব্রেরিতে বইয়ের গুণগান করাটা, আমার বিশ্বাস, অসংগত হবে না।

২

আজকের সভায় যে দু-চার কথা বলব, সে আলাপের ভাষায় ও আলাপের ভাবে, অর্থাৎ তাতে কাজের কথার চাইতে বাজে কথা ঢের বেশি থাকবে। এই বিংশ শতাব্দীতে লাইব্রেরির সার্থকতা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ কোনো কথা বলবার কি প্রয়োজন আছে? এ সম্বন্ধে যা বক্তব্য তা ইতিপূর্বে হাজার বার কি বলা হয় নি? তবে বই পড়ার অভ্যাসটা যে বদ অভ্যাস নয়, এ কথাটা সমাজকে এ যুগে মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক; কেননা মানুষে এ কালে বই পড়ে না, পড়ে সংবাদপত্র। এ যুগে সভ্যসমাজ ভোরে উঠে করে দুটি কাজ: এক চা-পান, আর সংবাদপত্রপাঠ। একটি বিলাতি কবি চায়ের সম্বন্ধে বলেছেন যে, The cup that cheers but not inebriates, অর্থাৎ, চা পান করলে নেশা হয় না অথচ ফুর্তি হয়। চা পান করলে নেশা না হোক, চা-পানের নেশা হয়। সংবাদপত্র সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে। তার পর অতিরিক্ত চা-পানের ফলে মানুষের যেমন আহারে অরুচি হয়, অতিরিক্ত সংবাদপত্রপাঠের ফলেও মানুষের তেমনি

সাহিত্যে অরুচি হয়। আমরা দেশসুদ্ধ লোক আজকের দিনে এই মানসিক মন্দাগ্নিগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং সাহিত্যচর্চা করবার প্রথাটা যে সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ, এই সত্যটার চার দিকে আজ প্রদক্ষিণ করবার সংকল্প করেছি।

৩

কাব্যচর্চা না করলে মানুষে জীবনের একটা বড়ো আনন্দ থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হয়। এ আনন্দের ভাণ্ডার সর্বসাধারণের ভোগের জন্য সঞ্চিত রয়েছে। সুতরাং কোনো সভ্যজাতি কস্মিন্‌কালে তার দিকে পিঠ ফেরায় নি; এ দেশেও নয়, বিদেশেও নয়। বরং যে জাতির যত বেশি লোক যত বেশি বই পড়ে, সে জাতি যে তত সভ্য, এমন কথা বললে বোধ হয় অন্যায় কথা বলা হয় না। নিদ্রা-কলহে দিনযাপন করার চাইতে কাব্যচর্চায় কালাতিপাত করা যে প্রশংসনীয়, এমন কথা সংস্কৃতেই আছে। সংস্কৃত কবিরা সকলেই সংসার-বিষবৃক্ষের অমৃতোপম ফল কাব্যামৃতের রসাস্বাদ করবার উপদেশ দিলেও সেকালে সে উপদেশ কেউ গ্রাহ্য করতেন কি না, সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে। কিছুদিন পূর্বে আমারও ছিল। কেননা নিজের কলমের কালি লেখকেরা যে অমৃত বলে চালিয়ে দিতে সদাই উৎসুক, তার পরিচয় একালেও পাওয়া যায়। কিন্তু একালেও আমরা যখন ও-সব কথায় ভুলি নে, তখন সেকালেও সম্ভবত কেউ ভুলতেন না; কেননা সেকালে সমজদারের সংখ্যা একালের চাইতে ঢের বেশি ছিল। কিন্তু আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে, হিন্দুযুগে বই পড়াটা নাগরিকদের মধ্যে একটা মস্ত বড়ো ফ্যাশান ছিল। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, 'নাগরিক' বলতে সেকালে সেই শ্রেণীর জীব বোঝাত একালে ইংরেজিতে যাকে man about town বলে। বাংলা ভাষায় ওর কোনো নাম নেই, কেননা বাংলাদেশে ও-জাত নেই। ও বালাই যে নেই, সেটা অবশ্য সুখের বিষয়।

৪

যদি অনুমতি করেন তো এই সুযোগে প্রাচীন ভারতবর্ষের নাগরিক সভ্যতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। সেকালে এ দেশে যেমন এক দল ত্যাগী পুরুষ ছিলেন, তেমনি আর-এক দল ভোগী পুরুষও ছিলেন। ভারতবর্ষের আরণ্যক ধর্মের সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচয় আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু তার নাগরিক ধর্মের ক্রিয়াকলাপ আমাদের অনেকের কাছেই অবিদিত। এর ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ধারণাটা আমাদের মনে নিতান্ত একপেশো হয়ে উঠেছে। সে সভ্যতার, শুধু আত্মার নয়, দেহের সন্ধানটাও আমাদের নেওয়া কর্তব্য, নচেৎ তার স্বরূপের সাক্ষাৎ আমরা পাব না। সেকালের নাগরিকদের মতিগতি রীতিনীতির আদ্যোপান্ত বিবরণ পাওয়া যায় কামসূত্রে। এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল অন্তত দেড় হাজার বৎসর পূর্বে, এবং এ গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছেন ন্যায়দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার স্বয়ং বাৎস্যায়ন; অতএব কামসূত্রের বর্ণনা আমরা সত্য বলেই গ্রাহ্য করতে বাধ্য, বিশেষত ও-সূত্র

যখন সংস্কৃত সাহিত্যে শাস্ত্রহিসেবেই চিরকাল গণ্য ও মান্য হয়ে এসেছে। আমি উক্ত গ্রন্থ থেকে নাগরিকদের গৃহসজ্জার আংশিক বর্ণনা এখানে উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি—

বাহিরের বাসগৃহেও অতিশুভ্রচাদরপাতা শয্যা একটি থাকিবে, এবং তাহার উপর দুইটি অতি সুন্দর বালিশ রাখিতে হইবে। তাহার পার্শ্বে থাকিবে প্রতিশয্যিকা। এবং তাহার শিরোভাগে কূর্চস্থান ও বেদিকা স্থাপিত করিবে। সেই বেদিকার উপর রাত্রি-শেষে অনুলেপন, মাল্য, শিক্‌থকরণ্ডক, সৌগন্ধিকপুটিকা, মাতুলুঙ্গত্বক্‌, তাম্বুল প্রভৃতি রক্ষিত হইবে। ভূমিতে থাকিবে পতৎগ্রহ। ভিত্তিগাত্রে নাগদন্তাবসক্তা বীণা। চিত্রফলক। বর্তিকা-সমুদ্‌গকঃ। এবং যে কোনো পুস্তক।

উপরোক্ত বর্ণনা একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। কেননা এর অনেক শব্দই বাংলা-ভাষায় প্রচলিত নেই। আমি কতকটা টীকা ও কতকটা অভিধানের সাহায্যে ঐ-সকল অপরিচিত শব্দের বাচ্যপদার্থের যে পরিচয় লাভ করেছি, তা আপনাদের জানাচ্ছি। প্রতিশয্যিকার অর্থ ক্ষুদ্র পর্যঙ্ক, ভাষায় যাকে বলে খাটিয়া; এ খাটিয়া অবশ্য নাগরিকরা নিজেদের গঙ্গাযাত্রার জন্য প্রস্তুত রাখতেন না। তার মাথার গোড়ায় থাকত কূর্চস্থান; কূর্চ শব্দের সাক্ষাৎ আমি কোনো অভিধানে পাই নি। তবে টীকাকার বলেন, শয্যার শিরোভাগে ইষ্টদেবতার আসনের নাম কূর্চ; আত্মবান নাগরিকেরা ইষ্টদেবতার স্মরণ ও প্রণাম না করে শয়নগ্রহণ করতেন না; সুতরাং কূর্চ হচ্ছে একপ্রকার ব্র্যাকেট। সেকালের এই বিলাসীসম্প্রদায়, আমরা যাকে বলি নীতি, তার ধার এক-কড়াও ধারতেন না; কিন্তু দেবতার ধার ষোলো-আনা ধারতেন। এ ব্যাপার অবশ্য অপূর্ব নয়। একালেও দেখা যায় মানুষের প্রতি অত্যাহিত অত্যাচার করবার সময় মানুষে ইষ্টদেবতাকে ঘন ঘন স্মরণ ও প্রণাম করে। যাক ও-সব কথা। এখন দেখা যাক, বেদিকা বস্তুটি কি। বেদিকাতে যতপ্রকার দ্রব্য রাখবার ব্যবস্থা আছে, তাতে মনে হয় ও হচ্ছে টেবিল; এবং টীকাকারের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, এ অনুমান ভুল নয়; তিনি বলেন, বেদিকা ভিত্তিসংলগ্ন, হস্তপরিমিত চতুষ্কোণ এবং কৃতকুট্টিম অর্থাৎ inlaid। অনুলেপন দ্রব্যটি হয় চন্দন, নয় মেয়েরা যাকে বলে রূপটান, তাই। মাল্য অবশ্য ফুলের মালা; কি ফুল তার উল্লেখ নেই, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আর যাই হোক গাঁদা নয়; কেননা তাঁরা বর্ণগন্ধের সৌকুমার্য বুঝতেন। শিক্‌থকরণ্ডক হচ্ছে মোমের কৌটা; সেকালে নাগরিকেরা ঠোঁট আগে মোম দিয়ে পালিশ করে নিয়ে তার পর তাতে আলতা মাখতেন। সৌগন্ধিকপুটিকা হচ্ছে ইংরেজিতে যাকে বলে পাউডার-বক্স; বোতল না হয়ে বাক্স হবার কারণ, সেকালে অধিকাংশ গন্ধদ্রব্য চূর্ণ আকারেই ব্যবহৃত হত। দেয়াল ছেড়ে ঘরের মেজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই চোখে পড়ে পতৎগ্রহ, অর্থাৎ পিকদানি। তার পর চোখ তুললে নজরে পড়ে, ভিত্তিসংলগ্ন হস্তিদন্তে বিলম্বিত বীণা; টীকাকার বলেন, সে বীণা আবার 'নিচোল-অবগুণ্ঠিতা'; বাংলার অনেক পদ্যলেখকদের ধারণা নিচোল অর্থে শাড়ি, শাড়িপরা বীণার অবশ্য কোনো মানে নেই; নিচোল অর্থে গেলাপ; জয়দেব যে শ্রীরাধিকাকে বলেছিলেন 'নীলনিচোলং' তার অর্থ নীল রঙের একটি ঘেরাটোপ পরো; ইংরেজি ভাষায় ওর তর্জমা

হচ্ছে, put on a dark-blue cloak। এখন আবার প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে আসা যাক। তার পর পাই চিত্রফলক; সংস্কৃত কাব্যের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়, পুরাকালে ছবি কাঠের উপরে আঁকা হত, কাপড়ের উপরে নয়। বর্তিকা-সমুদ্‌গকের অর্থ তুলি ও রঙ রাখবার বাক্স। তার পর বই।

নাগরিকদের গৃহের এবং দেহের এই সাজসজ্জার বর্ণনা থেকেই বুঝতে পারবেন তাঁরা কি চরিত্রের লোক ছিলেন। তার পর প্রশ্ন ওঠে, বই নিয়ে এ প্রকৃতির লোকেরা কি করতেন? কেননা নাগরিকেরা আর যাই হোন, তাঁরা যে সব উদাসীন গ্রন্থকীট ছিলেন না, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। পুস্তক কি তবে এঁদের গৃহসজ্জার জন্য রক্ষিত হত, যেমন আজকাল কোনো কোনো ধনীলোকের গৃহে হয়? এ সন্দেহ দৃঢ় হয়ে আসে, যখন টীকাকারের মুখে শুনতে পাই যে,

এই-সকল বীণাদিদ্রব্য সর্বদা উপঘাতের, অর্থাৎ ব্যবহার করিয়া নষ্ট করিবার জন্য, নহে। কেবল বাসগৃহের শোভা সম্পাদনার্থ ভিত্তিনিহিত হস্তিদন্তে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। কালে ভদ্রে কখনো প্রয়োজন হইলে তাহা সেখান হইতে নামাইতে হইবে।

পূর্বোক্ত সন্দেহের আরো কারণ আছে। সূত্রকার যখন বলেছেন— 'যঃ কশ্চিৎ পুস্তকং', অর্থাৎ যা হোক একটা বই, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সে-বই, আর যে কারণেই হোক, পড়বার জন্য রাখা হত না। কিন্তু টীকাকার আমাদের এ সন্দেহ ভঞ্জন করেছেন। তাঁর কথা এই—

'যঃ কশ্চিৎ' এটি সামান্য নির্দেশ হইলেও তখনকার যে-কোনো কাব্য তাহাই পড়িবার জন্য রাখিবে, ইহাই যে সূত্রকারের উপদেশ, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

টীকাকারের এ সিদ্ধান্ত আমি গ্রাহ্য করি। বীণা ও পুস্তক দুই সরস্বতীর দান হলেও ও-দুই গ্রহণ করবার সমান শক্তি এক দেহে প্রায় থাকে না। বীণাবাদন বিশেষ সাধনাসাধ্য, পুস্তকপঠন অপেক্ষাকৃত ঢের সহজ। সুতরাং বই পড়ার অধিকার যত লোকের আছে, বীণা বাজাবার অধিকার তার সিকির সিকি লোকেরও নেই। এই কারণে সকলকে জোর করে বিদ্যাশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা এ যুগের সকল সভ্য দেশেই আছে, কিন্তু কাউকে জোর করে সংগীতশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কোনো অসভ্য দেশেও নেই। অতএব নাগরিকেরা বীণা দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতেন বলে যে পুথির ডুরির খুলতেন না, এরূপ অনুমান করা অসংগত হবে। সে যাই হোক, টীকাকার বলেছেন, 'যে-সে বই নয়, তখনকার বই'; এই উক্তিই প্রমাণ যে, সে বই পড়া হত। যে বই এখনকার নয় কিন্তু সেকালের, যাকে ইংরেজিতে বলে ক্ল্যাসিক, তা ভদ্রসমাজে অনেক লোক ঘরে রাখে পড়বার জন্য নয়, দেখবার জন্য। কিন্তু হালের বই লোকে পড়বার জন্যই সংগ্রহ করে, কেননা অপর কোনো উদ্দেশ্যে তা গৃহজাত করবার কোনোরূপ সামাজিক দায় নেই। আর-এক কথা। আমরা বর্তমান ইউরোপের সভ্যসমাজেও দেখতে পাই যে, 'এখনকার' বই পড়া সে সমাজের সভ্যদের ফ্যাশনের একটি প্রধান অঙ্গ। আনাতোল ফ্রাঁসের টাটকা বই পড়ি নি, এ কথা বলতে প্যারিসের নাগরিকেরা যাদৃশ লজ্জিত হবেন, সম্ভবত কিপ্‌লিঙের কোনো সদ্যপ্রসূত বই পড়ি নি বলতে লন্ডনের নাগরিকেরাও তাদৃশ লজ্জিত হবেন; যদিচ আনাতোল ফ্রাঁসের লেখা যেমন সুপাঠ্য, কিপ্‌লিঙের লেখা তেমনি অপাঠ্য। এ

কথা আমি আন্দাজে বলছি নে। বিলেতে একটি ব্যারিস্টারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। জনরব, তিনি মাসে দশ-বিশ হাজার টাকা রোজগার করতেন। অত না হোক, যা রটে তা কিছু বটেই তো। এই থেকেই আপনারা অনুমান করতে পারেন, তিনি ছিলেন কত বড়ো লোক। এত বড়ো লোক হয়েও তিনি একদিন আমার কাছে, অস্কার ওয়াইল্ডের বই পড়েন নি, এই কথাটা স্বীকার করতে এতটা মুখ কাঁচুমাচু করতে লাগলেন, যতটা চোর-ডাকাতরাও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে guilty plead করতে সচরাচর করে না। অথচ তাঁর অপরাধটা কি? অস্কার ওয়াইল্ডের বই পড়েন নি, এই তো? ও-সব বই পড়েছি স্বীকার করতে আমরা লজ্জিত হই। শেষটা তিনি এর জন্য আমার কাছে কৈফিয়ত দিতে শুরু করলেন। তিনি বললেন যে, আইনের অশেষ নজির উদরস্থ করতেই তাঁর দিন কেটে গিয়েছে, সাহিত্য পড়বার তিনি অবসর পান নি। বলা বাহুল্য, এরকম ব্যক্তিকে এ দেশে আমরা একসঙ্গে রাজনীতির নেতা এবং সাহিত্যের শাসক করে তুলতুম। কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, এ কথা কবুল করতে তিনি যে এতটা লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন তার কারণ, তাঁর এ জ্ঞান ছিল যে, তিনি যত আইনজ্ঞই হোন, আর যত টাকাই করুন, তাঁর দেশে ভদ্রসমাজে কেউ তাঁকে বিদগ্ধজন বলে মান্য করবে না।

সংস্কৃত বিদগ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ cultured। বাৎস্যায়ন যাকে নাগরিক বলেন, টীকাকার তাঁকে বিদগ্ধ নামে অভিহিত করেন। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, এ দেশে পুরাকালে কালচার জিনিসটা ছিল নাগরিকতার একটা প্রধান গুণ। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, একালে আমরা যাকে সভ্য বলি সেকালে তাকে নাগরিক বলত। অপর পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় গ্রাম্যতা এবং অসভ্যতা পর্যায়-শব্দ, ইংরেজিতে যাকে বলে synonyms।

৫

এর উত্তরে হয়তো অনেকে এই কথা বলবেন যে, সেকালে বই পড়াটা ছিল বিলাসের একটা অঙ্গ। বাৎস্যায়নই যখন আমার প্রধান সাক্ষী, তখন এ অভিযোগের প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে কঠিন। এ যুগে অবশ্য আমরা সাহিত্যচর্চাটা বিলাসের অঙ্গ বলে মনে করি নে, ও চর্চা থেকে আমরা ঐহিক এবং পারত্রিক নানারূপ সুফল-লাভের প্রত্যাশা রাখি। আপনারা সকলেই জানেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে 'মাল্য-চন্দন-বনিতা' এ-তিন একসঙ্গেই যায়, এবং ও-তিনই ছিল এক পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু আমাদের কাছে মাল্যচন্দনের শামিল বনিতাও নয়, কবিতাও নয়। কাজেই আমাদের চোখে সেকালের নাগরিকসমাজের রীতিনীতি অবশ্য দৃষ্টিকটু ঠেকে। কেননা আমাদের চোখের পিছনে আছে আমাদের মন, এবং আমাদের মনের পিছনে আছে আমাদের বর্তমান সামাজিক বুদ্ধি। এই কারণেই প্রাচীন সমাজের প্রতি সুবিচার করতে হলে সে সমাজকে ঐতিহাসিকের চোখ দিয়ে দেখা কর্তব্য। তাই আমি উদাসীন গ্রন্থকীট হিসেবে নাগরিকদের উক্তরূপ সাহিত্যচর্চার ফলাফল একটুখানি আলোচনা করে দেখতে চাই। বলা বাহুল্য, ঐতিহাসিক হতে হলে প্রথমত

বর্তমানের প্রতি উদাসীন হওয়া চাই, দ্বিতীয়ত প্রাচীন গ্রন্থের কীট হওয়া চাই; আরো অনেক হওয়া চাই, কিন্তু ও-দুটি না হলে নয়।

যে সমাজে কাব্যচর্চা হচ্ছে বিলাসের একটি অঙ্গ, সে সমাজ যে সভ্য এই হচ্ছে আমার প্রথম বক্তব্য। যা মনের বস্তু তা উপভোগ করবার ক্ষমতা বর্বর জাতির মধ্যে নেই, ভোগ অর্থে তারা বোঝে কেবলমাত্র দৈহিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। ক্ষুৎ-পিপাসার নিবৃত্তি পশুরাও করে, এবং তা ছাড়া আর-কিছু করে না। অপর পক্ষে যে সমাজের আয়েসির দলও কাব্যকলার আদর করে, সে সমাজ সভ্যতার অনেক সিঁড়ি ভেঙেছে। সভ্যতা জিনিসটে কি, এ প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করলে দু কথায় তার উত্তর দেওয়া শক্ত। কেননা যুগভেদে ও দেশভেদে পৃথিবীতে সভ্যতা নানা মূর্তি ধারণ করে দেখা দিয়েছে, এবং কোনো সভ্যতাই একেবারে নিরাবিল নয়; সকল সভ্যতার ভিতরই যথেষ্ট পাপ ও যথেষ্ট পাঁক আছে। নীতির দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রভেদ যে আকাশপাতাল, এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় না। তবে মানুষের কৃতিত্বের মাপে যাচাই করতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কাব্য-কলায় শিল্পে-বাণিজ্যে সভ্যজাতি ও অসভ্যজাতির মধ্যে সাত-সমুদ্র তেরো-নদীর ব্যবধান। জনৈক ফরাসি লেখক বলেছেন যে, যিনিই মানবের ইতিহাস চর্চা করেছেন, তিনিই জানেন যে, মানুষকে ভালো করবার চেষ্টা বৃথা। এ হচ্ছে অবশ্য ক্ষুব্ধ মনের ক্রুদ্ধ কথা, অতএব বেদবাক্য হিসেবে গ্রাহ্য নয়। সে যাই হোক, এ কথার উত্তরে আমি বলি যে, মানুষকে ভালো না করা যাক, ভদ্র করা যায়। পৃথিবীতে সুনীতির চাইতে সুরুচি কিছু কম দুর্লভ পদার্থ নয়। পুরাকালে সাহিত্যের চর্চা মানুষকে নীতিমান্ না করলেও রুচিমান্ করত। সমাজের পক্ষে এও একটা কম লাভ নয়।

ধরে নেওয়া যাক, সেকালের নাগরিকসমাজ কাব্যকে মনের বেশভূষার উপকরণ হিসেবে দেখত। তাঁরা যে হিসাবে ওষ্ঠে যাবক ধারণ করতেন, সেই হিসাবেই কণ্ঠে শ্লোক ধারণ করতেন। এ অনুমান নিতান্ত অমূলক নয়। সংস্কৃত ভাষায় একটি নাতিহ্রস্ব শ্লোকসংগ্রহ আছে, যার নাম বিদগ্ধমুখমণ্ডনম্। ওরকম নামকরণের ফলে কাব্য অবশ্য রঙের কোঠায় পড়ে যায়। সে যাই হোক, নাগরিকদের বই পড়া যে একেবারে ভস্মে ঘি ঢালার শামিল ছিল না, এবং তাঁদের বৈদগ্ধ্য যে তাঁদের মনুষ্যত্ব অনেকটা রক্ষা করেছিল, একটি উদাহরণের সাহায্যে তার প্রমাণ দিচ্ছি। চরিত্রহীন অথচ কলাকুশল নাগরিকদের সেকালে সাধারণ সংজ্ঞা ছিল 'বিট'। এই বিটের একটি ছবি আমরা মৃচ্ছকটিকে দেখতে পাই। ঐ নাটকের রাজশ্যালক শকারের সঙ্গে বিটের তুলনা করলেই নিরক্ষর ও বিদগ্ধ জনের প্রকৃতির তারতম্য স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। উভয়েই সমান বিলাসভক্ত, কিন্তু শকার পশু আর বিট সুজন। শকারের ব্যবহার দেখলে ও কথা শুনলে তাকে অর্ধচন্দ্র দিতে হাত নিশপিশ করে; অপর পক্ষে বিটের ব্যবহারের সৌজন্য, ভাষার আভিজাত্য, মনের সরসতা এত বেশি যে, তাঁকে সাদরসম্ভাষণ করে ঘরে এনে বসাতে ইচ্ছে যায় দু-দণ্ড আলাপ করবার জন্য। বৈদগ্ধ্য যে একটি সামাজিক গুণ, এ কথা অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হবে। মার্জিত রুচি, পরিষ্কৃত বুদ্ধি, সংযত ভাষা ও বিনীত ব্যবহার

মানুষকে চিরকাল মুগ্ধ করে এসেছে এবং সম্ভবত চিরকাল করবে। এ-সকল বস্তু সমাজকে উন্নত না হোক, অলংকৃত করে। এবং এ-সকল গুণ কাব্য ও কলার চর্চা ব্যতীত রক্তমাংসের শরীরে আপনা হতে ফুটে ওঠে না। তবে এ কথা ঠিক যে, প্রাচীন সভ্যতা এ-সকল গুণের যতটা মূল্য দিত, আমরা ততটা দিই নে। তার কারণ, সেকালের সভ্যতা ছিল অ্যারিস্টোক্র্যাটিক, আর একালের সভ্যতা হতে চাচ্ছে ডেমোক্র্যাটিক; সেকালে তাঁরা চাইতেন আকার, আমরা চাই বস্তু। তাঁরা দেখতেন মানুষের ব্যবহার, আমরা দেখতে চাই তার ভিতরটা। তাঁরা ছিলেন রূপভক্ত, আমরা গুণলুব্ধ। ক্ল্যাসিক সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের তুলনা করলে এ প্রভেদ সকলেরই চোখে ধরা পড়বে। এ যুগের সাহিত্যমাত্রেই রোমান্টিক, অর্থাৎ তাতে আর্টের ভাগ কম এবং আত্মার ভাগ বেশি। এর কারণ, এ যুগের কবিরা কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেন; এ যুগের কবি জনগণের প্রতিনিধিও নন, মুখপাত্রও নন; সুতরাং সে কবির মন নিজের মন, লৌকিক মনও নয় সামাজিক মনও নয়। আর সেকালের কবিরা সামাজিকদের মনোরঞ্জন করতে চেষ্টা করতেন। সেকালের সামাজিকেরা কলাবিৎ ছিলেন বলে সেকালের কবিরা রচনায় বস্তুর অপেক্ষা তার আকারের দিকেই বেশি মনোযোগ দিতে বাধ্য হতেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে দেখতে পাই, কবি কি বললেন, তার চাইতে কি ভাবে বললেন তার মর্যাদা ঢের বেশি। সুতরাং নাগরিকদের কাব্যচর্চার ফলে প্রাচীন সাহিত্য যে আর্টিস্টিক হয়েছে, এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে। এই-সব কারণে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, নাগরিকদের কাব্যচর্চা একেবারে নিষ্ফল হয় নি, কেননা তার গুণে ক্ল্যাসিক সাহিত্য অসামান্য সুষমা ও সামঞ্জস্য লাভ করেছে।

কাব্যে আর্টের মূল্য যে কত বড়ো, সে আলোচনায় আজ প্রবৃত্ত হব না, কেননা সে আলোচনা দু কথায় শেষ করবার জো নেই। বহু যুক্তি বহু তর্কের সাহায্যে ও-সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা আমি পূর্বেই বলেছি, এ যুগের ডেমোক্র্যাটিক আত্মা আর্টকে উপেক্ষা করে, অবজ্ঞা করে, সম্ভবত মনে মনে হিংসাও করে; বোধ হয় এই কারণে যে, আর্টের গায়ে আভিজাত্যের ছাপ চিরস্থায়ী রূপে বিরাজ করে। অথচ ডেমোক্র্যাসির এ সত্য সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, লৌকিক মন বস্তুগত বলেই তা মেটিরিয়ালিজ্‌মের দিকে সহজেই ঝোঁকে। এ বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আর্টের চর্চা আবশ্যক।

৬

বই পড়ার শখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হলেও আমি কাউকে শখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাই নে। প্রথমত সে পরামর্শ কেউ গ্রাহ্য করবেন না, কেননা আমরা জাত হিসেবে শৌখিন নই; দ্বিতীয়ত অনেকে তা কুপরামর্শ মনে করবেন, কেননা আমাদের এখন ঠিক শখ করবার সময় নয়। আমাদের এই রোগশোক-দুঃখদারিদ্র্যের দেশে জীবনধারণ করাই যখন হয়েছে প্রধান সমস্যা, তখন সে জীবনকে সুন্দর করা মহৎ করার প্রস্তাব অনেকের কাছেই নিরর্থক এবং সম্ভবত নির্মমও

ঠেকবে। আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে আজ প্রস্তুত নই; কিন্তু শিক্ষার ফললাভের জন্য আমরা সকলেই উদ্‌বাহু। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই দূর করবে। এ আশা সম্ভবত দুরাশা; কিন্তু তা হলেও আমরা তা ত্যাগ করতে পারি নে, কেননা আমাদের উদ্ধারের অন্য কোনো সদুপায় আমরা চোখের সুমুখে দেখতে পাই নে। শিক্ষার মাহাত্ম্যে আমিও বিশ্বাস করি, এবং যিনিই যা বলুন, সাহিত্যচর্চা যে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লোকে যে তা সন্দেহ করে, তার কারণ এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তার কোনো নগদ বাজার-দর নেই। এই কারণেই ডেমোক্রাসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা। ডেমো-ক্রাসির গুরুরা চেয়েছিলেন সকলকে সমান করতে, কিন্তু তাঁদের শিষ্যেরা তাঁদের কথা উলটো বুঝে প্রতিজনেই হতে চায় বড়োমানুষ। একটি বিশিষ্ট অভিজাত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা ডেমোক্রাসির গুণগুলি আয়ত্ত করতে না পারি, তার দোষগুলি আত্মসাৎ করেছি। এর কারণও স্পষ্ট। ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়। আমাদের শিক্ষিতসমাজের লোলুপ দৃষ্টি আজ অর্থের উপরেই পড়ে রয়েছে, সুতরাং সাহিত্যচর্চার সুফল সম্বন্ধে আমরা অনেকেই সন্দিহান। যাঁরা হাজারখানা ল-রিপোর্ট কেনেন, তাঁরা একখানা কাব্য-গ্রন্থও কিনতে প্রস্তুত নন; কেননা তাতে ব্যাবসার কোনো সুসার নেই। নজির না আউড়ে কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে দাঁড়িয়ে হারতে হবে, সে তো জানা কথা। কিন্তু যে কথা জজে শোনে না, তার যে কোনো মূল্য নেই, এইটেই হচ্ছে পেশাদারদের মহাভ্রান্তি। জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ধনের ভাণ্ডার নয়, এ সত্য তো প্রত্যক্ষ; কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও এও সমান সত্য যে এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য, সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী। তার পর যে জাতি মনে বড়ো নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড়ো নয়; কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞানসাপেক্ষ, তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টিও মনসাপেক্ষ। এবং মানুষের মনকে সবল সচল সরাগ ও সমৃদ্ধ করবার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের উপর ন্যস্ত হয়েছে। কেননা মানুষের দর্শন-বিজ্ঞান ধর্ম-নীতি অনুরাগ-বিরাগ আশা-নৈরাশ্য তার অন্তরের স্বপ্ন ও সত্য, এই-সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে, সে-সব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ; তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে। দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি সব হচ্ছে মনগঙ্গার তোলা জল, তার পূর্ণ স্রোত আবহমান কাল সাহিত্যের ভিতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে; এবং সেই গঙ্গাতে অবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল পাপ হতে মুক্ত হব।

অতএব দাঁড়াল এই যে, আমাদের বই পড়তেই হবে, কেননা বই পড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চার উপায়ান্তর নেই। ধর্মের চর্চা চাইকি মন্দিরের বাইরেও করা চলে, দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে, এবং বিজ্ঞানের চর্চা জাদুঘরে; কিন্তু সাহিত্যের চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরি। ও চর্চা মানুষে কারখানাতেও করতে পারে না, চিড়িয়াখানাতেও নয়।

এ-সব কথা যদি সত্য হয়, তা হলে আমাদের মানতেই হবে যে, লাইব্রেরির মধ্যেই

আমাদের জাত মানুষ হবে। সেইজন্য আমরা যত বেশি লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে।

আমার মনে হয়, এ দেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয়, এবং স্কুলকলেজের চাইতে কিছু বেশি। এ কথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন, কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন। কিন্তু আমি জানি, আমি রসিকতাও করছি নে, অদ্ভুত কথাও বলছি নে; যদিচ এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সমরেখায় চলে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। অতএব আমার কথার আমি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। আমার বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, তার সত্যমিথ্যার বিচার আপনারা করবেন। সে বিচারে আমার কথা যদি না টেকে, তা হলে তা রসিকতা হিসেবেই গ্রাহ্য করবেন।

আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রেই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যার দাতার অভাব নেই, এমন-কি, এ ক্ষেত্রে দাতা কর্ণেরও অভাব নেই; এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাঁদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিন্ত থাকি, এই বিশ্বাসে যে, সেখান থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে, যার সুদে তারা বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যেও দান গ্রহণসাপেক্ষ, অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একেবারেই ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতুম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধি-বৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, তার জ্ঞানপিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন, এর বেশি আর-কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্‌-বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত-বিদ্যা নিজে অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

আমাদের স্কুলকলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উলটো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। একটা জানাশোনা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক। আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন, যাঁরা শিশুসন্তানকে ক্রমান্বয়ে গোরুর দুধ গেলানোটাই শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ও বলবুদ্ধির সর্বপ্রধান উপায় মনে করেন। গোদুগ্ধ অবশ্য অতিশয় উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু তার উপকারিতা যে ভোক্তার জীর্ণ করবার শক্তির উপর নির্ভর করে, এ জ্ঞান ও-শ্রেণীর মাতৃকুলের নেই। তাঁদের বিশ্বাস, ও বস্তু পেটে গেলেই উপকার হবে। কাজেই শিশু যদি তা গিলতে আপত্তি করে, তা হলে সে যে ব্যাদড়া ছেলে, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। অতএব তখন তাকে ধরে-বেঁধে জোরজবরদস্তি দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা

হয়। শেষটা সে যখন এই দুগ্ধপানক্রিয়া হতে অব্যাহতি লাভ করবার জন্য মাথা নাড়তে, হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করে, তখন স্নেহময়ী মাতা বলেন 'আমার মাথা খাও, মরা মুখ দেখো, এই ঢোক, আর-এক ঢোক, আর-এক ঢোক' ইত্যাদি। মাতার উদ্দেশ্য যে খুব সাধু, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, উক্ত বলা-কওয়ার ফলে মা শুধু ছেলের যকৃতের মাথা খান, এবং ঢোকের পর ঢোকে তার মরা মুখ দেখবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে চলেন। আমাদের স্কুলকলেজের শিক্ষাপদ্ধতিটাও ঐ একই ধরনের। এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সবল মন যে ইন্‌ফ্যান্টাইল লিভারে গতাসু হচ্ছে, তা বলা কঠিন। কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়, আত্মার মৃত্যুর হয় না।

৭

আমরা কিন্তু এই আত্মার অপমৃত্যুতে ভীত হওয়া দূরে থাক্, উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমরা ভাবি, দেশে যত ছেলে পাস হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে; পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া যে এক বস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই! শিক্ষাশাস্ত্রের একজন জগদ্‌বিখ্যাত ফরাসি শাস্ত্রী বলেছেন যে, এক সময় ফরাসিদেশে শিক্ষাপদ্ধতি এতই বেয়াড়া ছিল যে, সে যুগে France was saved by her idlers : অর্থাৎ যারা পাস করতে পারে নি কিংবা চায় নি, তারাই ফ্রান্সকে রক্ষা করেছে। এর কারণ, হয় তাদের মনের বল ছিল বলে কলেজের শিক্ষা তারা প্রত্যাখ্যান করে-ছিল, নয় সে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিল বলেই তাদের মনের বল বজায় ছিল। তাই এই স্কুল-পালানো ছেলেদের দল থেকে সে যুগের ফ্রান্সের যত কৃতকর্মা লোকের আবির্ভাব হয়েছিল।

সে যুগে ফ্রান্সে কিরকম শিক্ষা দেওয়া হত তা আমার জানা নেই, তবুও আমি জোর করে বলতে পারি যে, এ যুগে আমাদের স্কুলকলেজে শিক্ষার যে রীতি চলছে, তার চাইতে সে শিক্ষাপদ্ধতি কখনোই নিকৃষ্ট ছিল না। সকলেই জানেন যে, বিদ্যালয়ে মাস্টারমহাশয়েরা নোট দেন এবং সেই নোট মুখস্থ করে ছেলেরা হয় পাস। এর জুড়ি আর-একটি ব্যাপারও আমাদের দেশে দেখা যায়। এ দেশে একদল বাজিকর আছে, যারা বন্দুকের গুলি থেকে আরম্ভ করে উত্তরোত্তর কামানের গোলা পর্যন্ত গলাধঃকরণ করে। তার পর একে একে সবগুলি উগলে দেয়। এর ভিতর যে অসাধারণ কৌশল আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গেলা আর ওগলানো দর্শকের কাছে তামাশা হলেও বাজিকরের কাছে তা প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ ব্যাপার। ও কারদানি করা তার পক্ষে যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি অপকারী। বলা বাহুল্য, সে বেচারা ঐ লোহার গোলাগুলির এক কণাও জীর্ণ করতে পারে না। আমাদের ছেলেরাও তেমনি নোট নামক গুরুদত্ত নানা আকারের ও নানাপ্রকারের গোলাগুলি বিদ্যালয়ে গলাধঃকরণ করে পরীক্ষালয়ে তা উদ্‌গিরণ করে দেয়। এর জন্য সমাজ তাদের বাহবা দেয় দিক, কিন্তু মনে যেন না ভাবে যে, এতে জাতির প্রাণশক্তি বাড়ছে। স্কুলকলেজের শিক্ষা যে অনেকাংশে ব্যর্থ, সে বিষয়ে প্রায়

অধিকাংশ লোকই একমত। আমি বলি, শুধু ব্যর্থ নয়, অনেক স্থলে মারাত্মক; কেননা আমাদের স্কুলকলেজ ছেলেদের স্বশিক্ষিত হবার যে সুযোগ দেয় না, শুধু তাই নয়, স্বশিক্ষিত হবার শক্তি পর্যন্ত নষ্ট করে। আমাদের শিক্ষাযন্ত্রের মধ্যে যে যুবক নিষ্পেষিত হয়ে বেরিয়ে আসে, তার আপনার বলতে আর বেশি কিছু থাকে না, যদি না তার প্রাণ অত্যন্ত কড়া হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই ক্ষীণপ্রাণ জাতির মধ্যেও জনকতক এমন কঠিন প্রাণের লোক আছে, এহেন শিক্ষাপদ্ধতিও যাদের মনকে জখম করলেও একেবারে বধ করতে পারে না।

আমি লাইব্রেরিকে স্কুলকলেজের উপরে স্থান দিই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি -অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুলকলেজ বর্তমানে আমাদের যে অপকার করছে, সে অপকারের প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। আমি পূর্বে বলেছি যে, লাইব্রেরি হাসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়; তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল।

৮

অতঃপর আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, বই পড়ার পক্ষ নিয়ে এ ওকালতি করবার, বিশেষত প্রাচীন নজির দেখাবার, কি প্রয়োজন ছিল? বই পড়া যে ভালো, তা কে না মানে? আমার উত্তর, সকলে মুখে মানলেও, কাজে মানে না। মুসলমান-ধর্মে মানবজাতি দুই ভাগে বিভক্ত : এক যারা কেতাবি, আর-এক যারা তা নয়। বাংলার শিক্ষিতসমাজ যে পূর্বদলভুক্ত নয় এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় না; আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায় মোটের উপর বাধ্য না হলে বই স্পর্শ করেন না। ছেলেরা যে নোট পড়ে এবং ছেলের বাপেরা যে নজির পড়েন, সে দুইই বাধ্য হয়ে, অর্থাৎ পেটের দায়ে। সেইজন্য সাহিত্যচর্চা দেশে একরকম নেই বললেই হয়, কেননা সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে উদরপূর্তির কাজে লাগে না। বাধ্য হয়ে বই পড়ায় আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়েছি যে, কেউ স্বেচ্ছায় বই পড়লে আমরা তাকে নিষ্কর্মার দলেই ফেলে দিই, অথচ এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, যে জিনিস স্বেচ্ছায় না করা যায়, তাতে মানুষের মনের সন্তোষ নেই। একমাত্র উদরপূর্তিতে মানুষের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি হয় না। এ কথা আমরা সকলেই জানি যে, উদরের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না; কিন্তু এ কথা আমরা সকলে মানি নে যে, মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না। দেহরক্ষা অবশ্য সকলেরই কর্তব্য, কিন্তু আত্মরক্ষাও অকর্তব্য নয়। মানবের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে যে, মানুষের প্রাণ মনের সম্পর্ক যত হারায়, ততই তা দুর্বল হয়ে পড়ে। মনকে সজাগ ও সবল রাখতে না পারলে জাতির প্রাণ যথার্থ স্ফূর্তিলাভ করে না। তার পর যে জাতি যত নিরানন্দ, সে জাতি তত নির্জীব। একমাত্র আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মনপ্রাণ

সজীব সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। সুতরাং সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জাতির জীবনীশক্তির হ্রাস করা, অতএব কোনো নীতির অনুসারেই তা কর্তব্য হতে পারে না, অর্থনীতিরও নয় ধর্মনীতিরও নয়।

কাব্যামৃতে যে আমাদের অরুচি ধরেছে, সে অবশ্য আমাদের দোষ নয়, আমাদের শিক্ষার দোষ। যার আনন্দ নেই সে নির্জীব, এ কথা যেমন সত্য, যে নির্জীব তারও যে আনন্দ নেই, সে কথাও তেমনি সত্য। আমাদের শিক্ষাই আমাদের নির্জীব করেছে। জাতীয় আত্মরক্ষার জন্য এ শিক্ষার উলটো টান যে আমাদের টানতে হবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের বলেই আমি স্বেচ্ছায় সাহিত্যচর্চার সপক্ষে এত বাক্যব্যয় করলুম। সে বাক্যে আপনাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছি কি না জানি নে; সম্ভবত হই নি। কেননা আমাদের দুরবস্থার কথা যখন স্মরণ করি, তখন খালি কোমল সুরে আলাপ করা আর চলে না; মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে মাঝে মাঝেই কড়ি লাগাতে হয়।

আপনাদের কাছে আমার আর-একটি নিবেদন আছে। এ প্রবন্ধে প্রাচীন যুগের নাগরিক সভ্যতার উল্লেখটা, কতকটা ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হয়েছে। এ কাজ আমি বিদ্যে দেখাবার জন্য করি নি, পুঁথি বাড়াবার জন্যও করি নি। এই ডেমোক্রাটিক যুগে অ্যারিস্টোক্রাটিক সভ্যতার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। আমার মতে এ যুগের বাঙালির আদর্শ হওয়া উচিত প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা, কেননা এ উচ্চ আশা অথবা দুরাশা আমি গোপনে মনে পোষণ করি যে, প্রাচীন ইউরোপে এথেন্স যে স্থান অধিকার করেছিল, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে বাংলা সেই স্থান অধিকার করবে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে, তা ছিল একাধারে ডেমোক্রাটিক এবং অ্যারিস্টোক্রাটিক; অর্থাৎ সে সভ্যতা ছিল সামাজিক জীবনে ডেমোক্রাটিক এবং মানসিক জীবনে অ্যারিস্টোক্রাটিক। সেই কারণেই গ্রীক সাহিত্য এত অপূর্ব, এত অমূল্য। সে সাহিত্যে আত্মার সংগে আর্টের কোনো বিচ্ছেদ নেই; বরং দুইয়ের মিলন এত ঘনিষ্ঠ যে, বুদ্ধিবলে তা বিশ্লিষ্ট করা কঠিন। আমাদের কর্মীর দল যেমন এক দিকে বাংলায় ডেমোক্রাসি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন, তেমনি আর-এক দিকে আমাদেরও পক্ষে মনের অ্যারিস্টোক্রাসি গড়ে তোলবার চেষ্টা করা কর্তব্য। এর জন্য চাই সকলের পক্ষে কাব্যকলার চর্চা। গুণী ও গুণজ্ঞ উভয়ের মনের মিলন না হলে কাব্যকলার আভিজাত্য রক্ষা করা অসম্ভব। সাহিত্যচর্চা করে দেশসুদ্ধ লোক গুণজ্ঞ হয়ে উঠুক, এই হচ্ছে দেশের লোকের কাছে আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা।

শ্রাবণ ১৩২৫

রামমোহন রায়

কোনো-একটি সাহিত্যসভায় পড়া হবে বলে লিখিত

আপনাদের সেক্রেটারি মহাশয় আমাকে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দু-চার কথা বলবার জন্যে বহুদিন ধরে অনুরোধ করে আসছেন। কতকটা অবসরের অভাবের দরুন, কতকটা আলস্যবশত সে অনুরোধ আমি এতদিন রক্ষা করতে পারি নি। তিনি যে বিষয়ে আমাকে বলতে অনুরোধ করেন, সে বিষয়ে ভালো করে কিছু বলবার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত হওয়া দরকার, এবং তার জন্য কতকটা অবসরও চাই, কতকটা পরিশ্রমও চাই। রামমোহন রায় সম্বন্ধে যেমন-তেমন করে যা-হোক একটা প্রবন্ধ গড়ে তুলতে আমার নিতান্ত অপ্রবৃত্তি হয়। যে ব্যক্তিকে আমি এ যুগের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলে মনে করি, তাঁকে মৎফরাক্কা রকম একটা সার্টিফিকেট দিতে উদ্যত হওয়াটা আমার মতে ধৃষ্টতার চরম সীমা।

শেষটা আপনাদের সেক্রেটারি মহাশয় যখন আমাকে কথোপকথনচ্ছলে এই মহাপুরুষের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবার অনুমতি দিলেন, তখন আমি তাঁর উপরোধ এড়িয়ে যাবার কোনো পথ দেখতে পেলুম না।

কিছুদিন পূর্বে প্রবাসী পত্রিকা এ যুগের বাংলাদেশের সবচাইতে বড়ো লোক কে, পাঠকদের কাছ থেকে এই প্রশ্নের জবাব চেয়েছিল। পাঠকদের ভোটে স্থির হয়ে গেল যে, সে ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায়। দেশের লোক যে এ সত্য আবিষ্কার করেছে, এ দেখে আমি মহা খুশি হলুম। কিন্তু সেইসঙ্গে আমার মনে একটি প্রশ্নও জেগে উঠল। রামমোহন রায় যে বাংলার, শুধু বাংলার নয়, বর্তমান ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ, এ সত্য বাঙালি কি উপায়ে আবিষ্কার করলে? রামমোহন রায়ের লেখার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে এমন লোক আমার পরিচিতের মধ্যে একান্ত বিরল, অথচ এঁদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছেন যথোচিত সুশিক্ষিত এবং দস্তুরমত স্বদেশভক্ত। লোকসমাজে অনেকেরই বিশ্বাস যে, রামমোহন রায় বাংলা গদ্যের সৃষ্টি করেছেন। তিনি বাংলার সর্বপ্রথম গদ্যলেখক কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; কিন্তু যে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তা এই যে, তিনি হচ্ছেন বাংলা গদ্যের প্রথম লেখকদের মধ্যে সর্বপ্রধান লেখক। অথচ তাঁর লেখার সঙ্গে বাংলা লেখকদেরও পরিচয় এত কম যে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এ কথা লিখতেও কুণ্ঠিত হন না যে, রামমোহন রায় ইংরেজি গদ্যের অনুকরণে বাংলা গদ্য রচনা করেছিলেন। এর পর যদি কেউ বলেন যে, শঙ্করের গদ্য হার্বার্ট স্পেন্সারের অনুকরণে রচিত হয়েছিল তাতে আশ্চর্য হবার কোনোই কারণ নেই।

২

এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, রামমোহন রায় এই অল্পকালের মধ্যেই ইতিহাসের বহির্ভূত হয়ে কিংবদন্তির অন্তর্ভূত হয়ে পড়লেন কেন। এ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, সাধারণত লোকের মনে এইরকম একটা ধারণা আছে যে, রামমোহন রায় বাঙালি জাতির একজন মহাপুরুষ নন, কিন্তু বাংলার একটি নব ধর্মসম্প্রদায়ের একজন মহাজন।

এ ভুল ধারণার জন্য দোষী কে? ব্রাহ্মসমাজ না হিন্দুসমাজ? এ প্রশ্নের উত্তর আজকের সভায় দিতে আমি প্রস্তুত নই, কেননা তা হলেই নানারূপ মতভেদের পরিচয় পাওয়া যাবে, নানারূপ তর্ক উঠবে এবং সে তর্ক শেষটা বাক্‌বিতণ্ডায় পরিণত হবে। ইংরেজদের ভদ্রসমাজে ধর্ম ও পলিটিক্সের আলোচনা নিষিদ্ধ, কেননা বহুকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলে প্রমাণ হয়েছে যে, এই দুই বিষয়ের আলোচনায় লোকে সচরাচর ধৈর্যের চাইতে বীর্য বেশির ভাগ প্রকাশ করে। ফলে বন্ধুবিচ্ছেদ জ্ঞাতিবিরোধ প্রভৃতি জন্মলাভ করে, এক কথায় হাত হাত সমাজের শান্তিভঙ্গ হয়। এ ক্ষেত্রে আমি রামমোহন রায়ের ধর্মমতের আলোচনায় যদি প্রবৃত্ত হই, তা হলে তাঁর সমসাময়িক সেই পুরোনো কলহের আবার সৃষ্টি করব। একশো বৎসর আগে রামমোহন রায়কে তাঁর বিপক্ষ দলের কাছ থেকে যে-সকল যুক্তিতর্ক শুনতে হত, আজকের দিনে আমাদেরও সেই-সব যুক্তিতর্ক শুনতে হবে। রামমোহন রায়ের রচিত পথ্যপ্রদান প্রভৃতি পড়ে দেখবেন, সে যুগের ধর্মসংস্থাপনকারীরা যে ভাবে যে ভাষায় তাঁর মতের প্রতিবাদ করেছিলেন, এ যুগেও সেই ভাব সেই ভাষায় নিত্য প্রকাশ পায়। এই একশো বৎসরের ভিতর মনোরাজ্যে আমরা বড়ো বেশিদূর এগোই নি। অতএব এ ক্ষেত্রে রামমোহন রায়ের ধর্মমত সম্বন্ধে নীরব থেকে তাঁর সামাজিক মতেরই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। তার থেকেই দেখতে পাবেন যে, তাঁর চাইতে বড়ো মন ও বড়ো প্রাণ নিয়ে এ যুগে ভারতবর্ষে অপর কোনো ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নি। মানুষমাত্রেরই জ্ঞানের আশ্রয় হচ্ছে দুটি বাইরের জিনিস; এক মানবসমাজ, আর-এক বিশ্ব। ইংরেজি দর্শনের ভাষায় যাকে cosmic consciousness এবং social consciousness বলে, মানুষমাত্রেরই মনে এ দুই consciousness অল্পবিস্তর আছে।

এ বিশ্বের অর্থ কি, এর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি, সে সম্বন্ধ ইহজীবনের কি অনন্তকালের, এই শ্রেণীর প্রশ্নের মূল হচ্ছে কস্‌মিক কন্‌শাস্‌নেস; এবং সকল ধর্ম, সকল দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই-সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া। অপর পক্ষে ইহ-জীবনে কি উপায়ে আমার অভ্যুদয় হবে, সমাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি, তার প্রতি আমার কর্তব্যই বা কি, কিরূপ কর্ম সমাজের পক্ষে এবং সামাজিক ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলকর, এই শ্রেণীর প্রশ্নের মূল হচ্ছে সোশ্যাল কন্‌শাস্‌নেস ; তাই পলিটিক্স আইন শিক্ষা প্রভৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজের মঙ্গল সাধন করা।

নিত্য দেখতে পাই যে, এ দেশের লোকের মনে এদানিক এই ভুল বিশ্বাস জন্মলাভ করেছে যে, ভারতবর্ষে পুরাকালে ছিল একমাত্র কস্‌মিক কন্‌শাস্‌নেস

এবং ইউরোপে বর্তমানে আছে শুধু সোশ্যাল কন্‌শাস্‌নেস। আমাদের দেশের শাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে এর প্রতিবাদ করছে। যাকে আমরা মোক্ষশাস্ত্র বলি, তা কস্‌মিক কন্‌শাস্‌নেস হতে উদ্ভূত, আর যাকে আমরা ধর্মশাস্ত্র বলি, তা সোশ্যাল কন্‌-শাস্‌নেস হতে উদ্ভূত। জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গ সেকালে ছিল ঠিক উলটো উলটো পথ। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে কর্মজিজ্ঞাসার যে কি প্রভেদ, তা যিনি বেদান্তের দু-পাতা উলটেছেন তিনিই জানেন। এ দুই যে বিভিন্ন শুধু তাই নয়, এ উভয়ের ভিতর স্পষ্ট বিরোধ ছিল। কর্ম যখন ক্রিয়াকলাপে পরিণত হয় তখন জ্ঞানকাণ্ড তার প্রতিবাদ করতে বাধ্য, আর ধর্ম যখন কর্মহীন জ্ঞানে পরিণত হয় তখন কর্ম-কাণ্ড তার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়। জ্ঞানকর্মের সমন্বয় করবার জন্য ভারতবর্ষে যুগে যুগে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, যাঁদের কাছে এ সত্য প্রত্যক্ষ ছিল যে, কর্মহীন জ্ঞান পঙ্গু এবং জ্ঞানহীন কর্ম অন্ধ। রামমোহন রায় এঁদেরই বংশধর, এঁদের পাঁচজনেরই একজন।

৩

তিনি যে জ্ঞানকর্মের সমন্বয় করতে ব্রতী হয়েছিলেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই, সেকালে তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল যে, তিনি গৃহী হয়েও ব্রহ্মজ্ঞানী হবার ভান করতেন, এক কথায় তিনি ছিলেন একজন 'ভাক্তজ্ঞানী'।

এই 'ভাক্ত' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে গৌণ, অপ্রধান ইত্যাদি। এই বিশেষণে বিশেষিত হতে রামমোহন রায় কখনোই আপত্তি করেন নি। তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন যে, তিনি যে ব্রহ্মের স্বরূপ জানেন, এমন স্পর্ধা তিনি কখনোই রাখেন নি। তবে গৃহীর পক্ষে যে বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপই একমাত্র সেব্য ধর্ম এবং গৃহস্থের পক্ষে যে ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব, এ কথা যেমন ন্যায়বিরুদ্ধ, তেমনি অশাস্ত্রীয়। এ কথার উত্তরে ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা যোগবাশিষ্ঠের একটি বচন তাঁর গায়ে ছুঁড়ে মেরেছিলেন। সে বচনটি হচ্ছে এই—

সংসারবিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোঽস্মীতিবাদিনম্।
কর্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সংসারসুখে আসক্ত হইয়া আমি ব্রহ্মজ্ঞানী ইহা কহে, সে কর্ম-ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট, অতএব অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাজ্য হয়।

এ সম্বন্ধে রামমোহন রায় বলেন—

যোগবাশিষ্ঠে ভাক্তজ্ঞানীর বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ বটে।

এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই দেখিয়ে দেওয়া যে, কর্ম ও ব্রহ্ম -জ্ঞানের একসঙ্গে চর্চা করা যেতে পারে কি না, এইটিই ছিল সে যুগের আসল বিবাদস্থল। এ বিবাদ আমরা আজ করি নে, কেননা দেশসুদ্ধ লোক এখন গীতা-পন্থী; এবং আপনারা সকলেই জানেন যে, লোকের ধারণা যে, গীতায় শুধু জ্ঞান-কর্মের নয়, সেইসঙ্গে ভক্তিরও সমন্বয় করা হয়েছে। দেশসুদ্ধ লোক আজ যে পথের পথিক হয়েছে, সে পথের প্রদর্শক হচ্ছেন রামমোহন রায়। সুতরাং ধর্মমত

সম্বন্ধেও তিনি হচ্ছেন এ যুগের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান মহাজন। যে শাস্ত্রের বচনসকল আজ শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল লোকের মুখে মুখে ফিরছে, রামমোহন রায়কে সেই বেদান্তশাস্ত্রের আবিষ্কর্তা বললেও অত্যুক্তি হয় না। আপনারা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, সেকালে একদল পণ্ডিত তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন যে, উপনিষদ্ ব'লে সংস্কৃত ভাষায় কোনো শাস্ত্রই নেই, ঈশ কেন কঠ প্রভৃতি নাকি তিনি রচনা করেছিলেন। এ অভিযোগ এত লোকে সত্য ব'লে বিশ্বাস করেন যে, রামমোহন এই মিথ্যা অভিযোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবার জন্য প্রকাশ্যে এই জবাব দিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, এই কলিকাতা শহরে শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের বাড়িতে গেলেই সকলে দেখতে পাবেন যে, বেদান্ত-শাস্ত্রের সকল পুঁথিই তাঁর ঘরে মজুত আছে। বিশেষ করে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের নাম উল্লেখ করবার কারণ এই যে, তিনি ছিলেন রামমোহন রায়ের বিপক্ষদলের সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত।

স্কচ দার্শনিক ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট Dugald Stewart বলেছিলেন যে, সংস্কৃত বলে কোনো ভাষাই নেই, ইংরেজদের ঠকাবার জন্য ব্রাহ্মণেরা ঐ একটি জাল ভাষা বার করেছে। এ কথা শুনে এককালে আমরা সবাই হাসতুম, কেননা সেকালে আমরা জানতুম না যে, এই বাংলাদেশেই এমন একদল টোলের পণ্ডিত ছিলেন, যাঁদের মতে বেদান্ত বলে কোনো শাস্ত্রই নেই, বাঙালিদের ঠকাবার জন্য রামমোহন রায় ঐ একটি জাল শাস্ত্র তৈরি করেছেন। এই জালের অপবাদ থেকে রামমোহন রায় আজও মুক্তি পান নি। আমাদের শিক্ষিতসমাজে আজও এমন-সব লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাঁদের বিশ্বাস মহানির্বাণতন্ত্র রামমোহন রায় এবং তাঁর গুরু হরিহরানন্দনাথ তীর্থ-স্বামী এই উভয়ে মিলে জাল করেছেন। এঁরা ভুলে যান যে, দলিল লোকে জাল করে শুধু আদালতে পেশ করবার জন্য। এই কারণেই টোলের পণ্ডিতমহাশয়েরা দত্তকচন্দ্রিকা নামক একখানি গোটা স্মৃতিগ্রন্থ রাতারাতি জাল করে ইংরেজের আদালতে পেশ করেছিলেন। সে জাল তখন ধরা পড়ে নি, পড়েছে এদানিক। ঈশ কেন কঠ, এমন-কি, মহানির্বাণতন্ত্র পর্যন্ত, কোনো আদালতে গ্রাহ্য হবে না, ও-সবই irrelevant ব'লে rejected হবে। সুতরাং রামমোহন রায়ের পক্ষে মোক্ষশাস্ত্র জাল করবার কোনোই প্রয়োজন ছিল না। তবে যে লোকে মহানির্বাণকে জাল মনে করে, তার কারণ তারা বোধ হয় দত্তকচন্দ্রিকাকেও genuine মনে করে। এই শ্রেণীর বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মূলে আছে একমাত্র জনশ্রুতি। এই একশো বৎসরের শিক্ষাদীক্ষার বলে আমাদের বিচারবুদ্ধি যে আজও ফণা ধরে ওঠে নি, তার কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সে বুদ্ধি স্বল্পজ্ঞানের সংকীর্ণ গণ্ডির ভিতর আটকে পড়েছিল, আর এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সে বুদ্ধি আমাদের অতিজ্ঞানের চাপে মাথা তুলতে পারছে না। আমি আশা করি, একবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাঙালির বিদ্যার বোঝা কতকটা লঘু হয়ে আসবে, আর তখন বাঙালির বুদ্ধি স্বচ্ছন্দে খেলে বেড়াবার একটু অবসর পাবে।

রামমোহন রায় সম্বন্ধে আর-একটি লৌকিক ভুল ধারণা এই যে, তিনি ছিলেন ইংরেজি শিক্ষার একটি product, অর্থাৎ ইউরোপের কাব্য ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞানের প্রভাবেই তাঁর মন তৈরি হয়েছিল, এক কথায় তিনি আমাদেরই জাত। আমার ধারণা যে অন্যরূপ সে কথা আমি পূর্বেই বলেছি। আমি আজ বছর তিনেক আগে এই মত প্রকাশ করি যে—

Bengal produced in the last century a man of colossal intellect and marvellous clairvoyance—Rajah Ram Mohan Roy...British India up to now has not produced a greater mind, and he remains for all time the supreme representative of the spirit of the new age and the genius of our ancient land. He looked at European civilisation from the pinnacle of Indian culture and saw and welcomed all that was living and life-giving in it.

আমি অতঃপর আপনাদের কাছে যা কিছু নিবেদন করব, তা সবই স্বমত সমর্থন করবার অভিপ্রায়ে।

রামমোহন রায় যে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করবার পূর্বে একমাত্র ন্যায় এবং যুক্তির সাহায্যে ধর্মবিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার দলিল আছে। এ বিষয়ে তিনি কতক আরবি এবং কতক ফারসি ভাষায় যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন তাতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আজকালকার ভাষায় যাকে স্বাধীন চিন্তা বলে তা তিনি কোনো বিলেতি গুরুর কাছে শিক্ষা করেন নি। নির্ভীকতায় চিন্তাশীলতায় তাঁর হাতের এই প্রথম রচনা Millএর *Three Essays on Religion* প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে এক আসন গ্রহণ করবার উপযুক্ত।

তার পর তাঁর বাংলা ও ইংরেজি লেখার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, পৌত্তলিকতার মতো খৃস্টানধর্মকেও তিনি সমান প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে ও-ধর্মও আসলে একটি পৌরাণিক ধর্ম, অতএব তাঁর মতো শংকরের শিষ্যের নিকট তা অগ্রাহ্য। রামমোহন রায়কে শংকরের শিষ্য বলায় আমি নিজের মত প্রকাশ করছি নে। গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮) পড়ে দেখবেন যে, তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, তিনি আচার্যের শিষ্য। আজকের দিনে এ শিষ্যত্ব অস্বীকার করাতেই আমরা সাহসের পরিচয় দিই; কিন্তু সেকালে এ কথা স্বীকার করায় তিনি অতিসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলাদেশে তখন বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতিপত্তি সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে অপ্রতিহত ছিল। আর যাঁরা চৈতন্য-চরিতামৃত আলোচনা করেছেন তাঁরাই জানেন যে, উক্ত ধর্মের প্রবর্তক স্বয়ং চৈতন্যদেব সার্বভৌমকে স্পষ্টাক্ষরে বলেছিলেন যে, তিনি বেদান্ত মানেন কিন্তু আচার্য মানেন না, অর্থাৎ তিনি উপনিষদ্ মানেন কিন্তু তার শাংকরভাষ্য মানেন না। সে যাই হোক, এ কথা নিঃসন্দেহ যে, ইউরোপের ধর্মমত রামমোহন রায়ের মনের উপর প্রভুত্ব করে নি।

তার পর ইউরোপের প্রাচীন কিংবা অর্বাচীন দর্শনের সঙ্গে যে তাঁর কোনোরূপ পরিচয় ছিল তার প্রমাণ তাঁর লেখা থেকে পাওয়া যায় না। অতএব আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, সে শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকলেও তার শিক্ষা তাঁর মনের উপর দিয়ে অয়েলক্লথের উপর দিয়ে জল যেরকম গড়িয়ে যায়, সেই ভাবে গড়িয়ে গিয়েছিল, তাতে করে তাঁর মনকে ভেজাতে পারে নি।

অতএব আমি জোর করে বলতে পারি যে, রামমোহনের cosmic consciousness ছিল ষোলো-আনা ভারতবর্ষীয়। সত্য কথা বলতে গেলে তিনি এ যুগে বাংলা-দেশে প্রাচীন আর্য মন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে মনের পরিচয় আমি এখানে দু কথায় দিতে চাই। আপনারা সকলেই জানেন যে কাণ্টের দর্শন তিন ভাগে বিভক্ত : প্রথম pure reason, দ্বিতীয় practical reason, আর তৃতীয় aesthetic judgment। আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষীয় আর্যেরা যার বিশেষভাবে চর্চা করেছিলেন, সে হচ্ছে এক pure reason, আর-এক practical reason ; এবং রামমোহনের অন্তরে এই দুই reasonই পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। তিনি অলংকারশাস্ত্রকে কখনো দর্শনশাস্ত্র বলে গ্রাহ্য করেন নি, রসতত্ত্বকে আত্মতত্ত্ব বলে ভুল করেন নি, অর্থাৎ মানুষের মনের aesthetic অংশের তাঁর কাছে বিশেষ কিছু মর্যাদা ছিল না। বেদান্তের ধর্ম spiritual, কিন্তু emotional নয় ; মীমাংসার ধর্ম ethical, কিন্তু emotional নয়। অপর পক্ষে খৃস্টান বৈষ্ণব মুসলমান প্রভৃতির ধর্মে emotional অংশ অতি প্রবল এবং সকল দেশের সকল মূর্তিপূজার মূলে মানুষের সৌন্দর্যবোধ আছে।

পাছে আমার কথা কেউ ভুল বোঝেন সেইজন্য এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে emotion শব্দ আমি মানুষের প্রতি মানুষের রাগদ্বেষ অর্থেই ব্যবহার করেছি, কেননা anthropomorphic ধর্মমাত্রেরই সেই emotion হচ্ছে যুগপৎ ভিত্তি ও চূড়া। এ ছাড়া অবশ্য cosmic emotion বলেও একটি মনোভাব আছে, কেননা তা না থাকলে মানুষের মনে cosmic consciousness জন্মাতই না। আদিরসই এ জগতে একমাত্র রস নয়, অনাদিরস বলেও একটি রস আছে ; যাঁরা এ রসের রসিক তাঁদের কাছেই উপনিষদ্‌ হচ্ছে মানবমনের গগনচুম্বী কীর্তি। বলা বাহুল্য, মানুষ-মাত্রেরই মনে এই উভয়বিধ emotionএর স্থান আছে। এর মধ্যে কার মনে কোন্‌টি প্রধান সেই অনুসারেই তাঁর ধর্মমত আকার ধারণ করে।

কিছুদিন পূর্বে রামমোহন রায়ের একটি নাতিদীর্ঘ জীবনচরিত ইংরেজি ভাষায় বিলাতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার তাঁর নাম গোপন রেখেছেন। এ পুস্তকে তাঁর সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আছে। তার মধ্যে একটি কথা হচ্ছে এই যে, তিনি বিলাতে গিয়ে খৃস্টধর্মের প্রতি অনুকূল হয়েছিলেন, এবং, লেখকের বিশ্বাস, তিনি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে সম্ভবত খৃস্টধর্ম অবলম্বন করতেন। এ কথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে তিনি যে উক্ত ধর্মের সঙ্গে বিশেষ পরিচয়ের ফলে তার প্রতি অনুকূল হয়েছিলেন, এ কথা গ্রাহ্য করায় বাধা নেই। বাইবেলের যে অংশ, রামমোহনের ভাষায় বলতে হলে, 'বড়াই বুড়ির কথায়' পরিপূর্ণ, তিনি সেই অংশের উপরেই বরাবর তাঁর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করে এসেছিলেন ; কিন্তু

খৃস্টধর্মের যে অংশ spiritual এবং ethical সে অংশের প্রতি অনুকূল হওয়া ছাড়া উদারচেতা লোকের উপায়ান্তর নেই। আর রামমোহনের স্বভাবের আর যে দোষই থাকুক তিনি সংকীর্ণমনা ছিলেন না। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অন্তরে যে গোঁড়ামির লেশমাত্র ছিল না, তিনি যে একটি নতুন সম্প্রদায় গড়তে চান নি, কিন্তু স্বজাতিকে সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, তার পরিচয় আদিব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্ট ডীডে পাবেন। পৃথিবীতে আমরা দু জাতীয় অতিমানুষের সাক্ষাৎ পাই, এক যাঁরা saviour অর্থাৎ অবতার হিসেবে গণ্য, আর-এক যাঁরা liberator হিসেবে গণ্য। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন এই শেষোক্ত শ্রেণীর একজন মহাপুরুষ।

৫

আজকের সভায় আমি বিশেষভাবে রামমোহন রায়ের social consciousnessএর পরিচয় দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছি। তবে তাঁর ধর্মবুদ্ধির পরিচয় না দিলে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা অঙ্গহীন হয় বলে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে তাঁর দার্শনিক মনোভাবের পরিচয় দিতে বাধ্য হয়েছি। কারো ছবি আঁকতে বসে তাঁর মাথা বাদ দিয়ে দেহটি আঁকলে সে চিত্র যে পূর্ণাঙ্গ হয় না তা বলাই বাহুল্য।

রামমোহন রায় যখন যুবক তখন ইংরেজ এ দেশের একছত্র রাজা হয়ে বসেছেন। সমগ্র দেশ তখন ইংরেজের রাষ্ট্রনীতির অধীন হয়ে পড়েছে, আমাদের সমগ্র জীবনের উপর ইঙ্গ-সভ্যতার প্রভাব এসে পড়েছে। ইংরেজের শাসন ও ইংরেজি সভ্যতার প্রভাব যে আমাদের জাতীয় জীবনের মহা পরিবর্তন ঘটাবে, এ সত্য সর্বপ্রথমে রামমোহন রায়ের চোখেই ধরা পড়ে। এই অতুলশক্তিশালী নবসভ্যতার সংঘর্ষে ভারতবাসীদের অন্তত আত্মরক্ষার জন্যও সে সভ্যতার ধর্মকর্মের পরিচয় নেওয়াটা নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। এই যুগসন্ধির মুখে একমাত্র রামমোহন রায়ের অন্তরে সমগ্র ভারতবর্ষ তার আত্মজ্ঞান লাভ করেছিল। রামমোহন এই মহাসত্য আবিষ্কার করেন যে, এই নবসভ্যতার সাহায্যে ভারতবাসী, শুধু আত্মরক্ষা নয়, স্বজাতির আত্মোন্নতি করতে পারবে। তাই জাতীয় আত্মোন্নতির যে পথ তিনি ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, অদ্যাবধি আমরা সেই পথ ধরে চলেছি। ইতিমধ্যে আর কেউ কোনো পথ আবিষ্কার করেছেন বলে তো আমার জানা নেই। যাকে সময়ে সময়ে আমরা নূতন পথে যাত্রা বলি, সে রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত মার্গে পিছু হটবার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬

পৃথিবীতে যে-সকল লোককে আমরা মহাপুরুষ বলি, তাঁরা প্রত্যেকেই জাতীয় মন ও জাতীয় জীবনকে এমন একটা নতুন পথ ধরিয়ে দেন, যে পথ ধরে মানুষে মনে ও জীবনে অগ্রসর হয়। যে পথে অগ্রসর হয়ে অতীত ভারতবর্ষ বর্তমান ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছে সে পথের তিনিই হচ্ছেন সর্বপ্রথম দ্রষ্টা এবং প্রদর্শক। আমাদের জীবনে যে নবযুগ এসেছে তিনিই হচ্ছেন সে যুগের আবাহক।

ইংরেজের হাতে পড়ে আমাদের জীবনের ও মনের যে আমূল পরিবর্তন ঘটবে. ভারত-সভ্যতা যে নবকলেবর ধারণ করবে, এ সত্য সর্বাগ্রে রাজা রামমোহন রায়ের চোখেই ধরা পড়ে। সে যুগে তিনি ছিলেন একমাত্র লোক, যাঁর অন্তরে ভারতেব ভবিষ্যৎ সাকার হয়ে উঠেছিল। তাঁর সমসাময়িক অপরাপর বাংলা লেখকের লেখা পড়লে দেখা যায় যে, এক রামমোহন রায় ব্যতীত অপর কোনো বাঙালির এ চৈতন্য হয় নি যে, নবাবের রাজ্য কোম্পানির হাতে পড়ায় শুধু রাজার বদল হল না, সেই-সংগে জাতীয় জীবনের মহা পরিবর্তনের সূত্রপাত হল। ইংরেজের সংগে সংগে দেশে এমন সব নবশক্তি এসে পড়ল যার সমবায়ে ও সংঘর্ষে ভারতবর্ষে একটি নূতন সমাজ ও নূতন সভ্যতা গঠিত হল। এবং সে-সকল শক্তি যে কি এবং তার ভিতর কোন্ কোন্ শক্তি আমাদের জাতিগঠনের সহায় হতে পারে, সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞান ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিকে দিব্যদৃষ্টি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না, কেননা দেড়শো বৎসর ইংরেজের রাজ্যে বাস করে এবং প্রায় একশো বৎসর ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেও আমাদের মধ্যে আজ খুব কম লোক আছেন, শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা সম্বন্ধে সমাজ সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা রাজা রামমোহন রায়ের তুল্য স্পষ্ট। সম্যক্ জ্ঞানের অন্তরে কোনো দ্বিধা নেই, কোনো ইতস্তত নেই। সে জ্ঞান কিন্তু শুধু স্কুলকলেজে বই পড়ে লাভ করা যায় না, ভগবদ্দত্ত প্রতিভা ব্যতীত কেউ আর যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন না। আপনারা মনে রাখবেন যে, রাজা রামমোহন ইংরেজের স্কুলকলেজে কখনো পড়েন নি, এবং ইংরেজি শিক্ষার সম্বল নিয়ে মনের দেশে যাত্রা শুরু করেন নি। সংস্কৃত আরবি ও ফারসি, এই তিন ভাষায় ও শাস্ত্রে শিক্ষিত মন নিয়েই তিনি ইংরেজি সভ্যতার দোষগুণ বিচার করতে বসেন এবং তার কোনো অংশ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার কোনো কোনো শক্তিকে সঞ্জীবনী শক্তি হিসেবে অঙ্গীকার করেন।

৭

জনরব এই যে, রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করে দেশের লোককে খৃস্টধর্মের আক্রমণ হতে রক্ষা করেছেন ; সে আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি যে লেখনী ধারণ করেছিলেন সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই। আমি নিম্নে তাঁর একটি লেখা থেকে কতক অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, তার থেকে আপনারা রামমোহন রায়ের মনের ও সেইসংগে তাঁর বাংলা রচনার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাবেন—

শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রিস্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তকসকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের

ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতাসূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খিৃষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও য়িশুখিৃষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের ঔৎকর্য্যের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না সেই রূপ মিসনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালাদেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব্বদা সংকুচিত হয়েন তাহাতে যদি সেই দুর্ব্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে তাহার মর্ম্মান্তিক কোনোমতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্ব্ব প্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়। লোকের স্বভাবসিদ্ধ প্রায় এই যে যখন এক দেশীয় লোক অন্য দেশকে আক্রমণ করে সেই প্রবলের ধর্ম্ম যদ্যপিও হাস্যাস্পদ স্বরূপ হয় তথাপি ঐ দুর্ব্বল দেশীয়ের ধর্ম্ম ও ব্যবহারের উপহাস ও তুচ্ছতা করিয়া থাকে[১]...

যুক্তিযুক্ত ও সত্যমূলক হলে বিদ্রূপ যথেষ্ট ভদ্র হয়েও যে কতদূর সাংঘাতিক হতে পারে, উপরোক্ত বাক্য ক'টি তার একটি চমৎকার উদাহরণ। এই শ্রেণীর মারাত্মক বিদ্রূপে রামমোহন রায় সিদ্ধহস্ত। বিপক্ষের সংগে তর্কযুদ্ধে শিষ্টতা তিনি কখনো ত্যাগ করেন নি ; কিন্তু 'হিংসা ত্যাগকে ধর্ম জানা' তাঁর স্বভাব ও শিক্ষা দুইয়েরই বিরুদ্ধে ছিল। প্রসিদ্ধ জর্মান কবি হাইনরিখ হাইনে Heinrich Heine বলে গিয়েছিলেন যে, তাঁর গোরের উপর যেন এই ক'টি কথা লেখা থাকে যে, 'He was a brave soldier in the war of liberation of humanity'—এ খ্যাতি রামমোহন রায় অনায়াসে আত্মসাৎ করতে পারেন। মানুষের মুক্তির জন্য তিনি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিলেন। জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি অহিংসামূলক ধর্ম তাঁর মনের উপর কখনো প্রভুত্ব করে নি, তিনি ছিলেন বেদপন্থী ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ রাজসিকতার মাহাত্ম্য তাঁর নিকট অবিদিত ছিল না। তামসিকতা যে অনেক স্থলে সাত্ত্বিকতার ছদ্মবেশ ধারণ করে, এ সত্যও তাঁর সম্পূর্ণ জানা ছিল। আমরা, এ যুগের বাঙালি লেখকেরা, তাঁর কাছ থেকে একটি মহাশিক্ষা লাভ করতে পারি। তর্কক্ষেত্রে সৌজন্য রক্ষা ক'রে কী ক'রে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করা যায়, তার সন্ধান আমরা রামমোহন রায়ের লেখার ভিতর পাব, অবশ্য যদি আমরা সাহিত্যে একমাত্র বৈধ-হিংসার চর্চা করতে প্রস্তুত থাকি। যা অসত্য, যা অন্যায়, যা অবৈধ, তার পক্ষে যিনি লেখনী ধারণ করবেন তাঁর গুরু রামমোহন রায় কখনোই

১ ব্রাহ্মণসেবধি (১৮২১)

হতে পারেন না। কেননা তাঁর শাস্ত্রশাসিত মন অধর্মযুদ্ধের একান্ত্ প্রতিকূল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, এ ক্ষেত্রে রামমোহন রায় কিসের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করেছিলেন। খৃস্টধর্মের বিরুদ্ধে নয়, কেননা কোনো ধর্মমতের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল না। তাঁর নিজের কথা এই—

...নিন্দা ও তিরস্কারের দ্বারা অথবা লোভ প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম সংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচারসহ হয় না তবে বিচারবলে হিন্দুর ধর্ম্মের মিথ্যাত্ব ও আপন ধর্ম্মের উৎকৃষ্টত্ব ইহা স্থাপন করেন সুতরাং ইচ্ছাপূর্ব্বক অনেকেই তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেক অথবা স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়েন এরূপ বৃথা ক্লেশ করা ও ক্লেশ দেওয়া হইতে ক্ষমাপন্ন হইবেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপজীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন যেহেতু সত্য ও ধর্ম্ম সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিয়ম নহে।[১]...

অতএব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, তিনি এ দেশে খৃস্টধর্মের প্রচারের পদ্ধতির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন। কেননা উক্ত উপায়ে লোকের ধর্মমতের পরিবর্তন ঘটানো সকল দেশেই উপদ্রববিশেষ এবং প্রবল রাজার জাতের পক্ষে দুর্বল-প্রজার জাতের উপর এরূপ ব্যবহার নিতান্ত অত্যাচার। রামমোহন রায় সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধেই নির্ভীক প্রতিবাদ করেছিলেন। যে যুগে ইংরেজের নামমাত্রে লোকে ভীত হত, সে যুগে ইংরেজের বিরুদ্ধে এই তীব্র প্রতিবাদ করায় তিনি যে অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, সে সাহস সকল দেশে সকল যুগেই দুর্লভ।

৮

আজকের দিনে যে মনোভাবকে আমরা জাতীয় আত্মমর্যাদাজ্ঞান বলি, রামমোহন রায়ের এই ক'টি কথায় তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সমসাময়িক অপর কোনো ব্যক্তির মনে এ মনোভাবের যে লেশমাত্র ছিল, তার কোনো নিদর্শন নেই। কিন্তু যেটা বিশেষ করে আমাদের চোখে পড়ে সে হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে মিছা আত্মশ্লাঘার নামগন্ধও নেই, অপর পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে আত্মগ্লানিও আছে। সে যুগের বাঙালি যে দুর্বল ভয়ার্ত ও দীন ছিল সে কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, এবং কিসে স্বজাতির দুর্বলতা ভীরুতা ও দীনতা দূর করা যায় সেই ছিল তাঁর একমাত্র ভাবনা, আর তাঁর জাতীয় উন্নতি সাধনের সকল চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্বজাতিকে মনে ও জীবনে শক্তিশালী ও ঐশ্বর্যবান্ করে তোলা। এই কথাটি মনে রাখলে তাঁর সকল কথা সকল কার্যের প্রকৃত অর্থ আমরা বুঝতে পারি। তার পর স্বজাতিকে তিনি উন্নতির যে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন সে পথ সুপথ কি কুপথ তার বিচার করতে হলে রামমোহন রায় কোন্ সত্যের উপর তাঁর মতামতের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার সন্ধান নেওয়া আবশ্যক।

পৃথিবীতে যে-সকল লোকের মতামতের কোনো মূল্য আছে তাঁদের সকল

১ ব্রাহ্মণসেবধি (১৮২১)

মতামতের মধ্যে একটা সংগতি একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কেননা তাঁদের নানা বিষয়ে নানা জাতীয় মতের মূলে আছে একটি বিশেষ মানসপ্রকৃতি। রাজা রাম-মোহন রায় কি আধ্যাত্মিক, কি সাংসারিক, যে-কোনো বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন সে-সকলের ভিতর দিয়ে তাঁর অসামান্য স্বাধীনতাপ্রিয়তা সদর্পে ফুটে বেরিয়েছে। তিনি যে বেদান্তের এত ভক্ত তার কারণ, ও-শাস্ত্র হচ্ছে মোক্ষশাস্ত্র। যে জ্ঞানের লক্ষ্য মুক্তি, ফল মুক্তি, সেই জ্ঞানকে আয়ত্ত করবার উপদেশ তিনি চিরজীবন স্বজাতিকে দিয়েছেন। এ মুক্তি কিসের হাত থেকে মুক্তি? এর দার্শনিক উত্তর হচ্ছে, অবিদ্যার হাত থেকে। এই অবিদ্যা বস্তু যে কি, সে বিষয়ে তর্কের আর শেষ নেই; ফলে অদ্যাবধি কেউ এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। অবিদ্যার মেটাফিজিক্যাল রহস্য ভেদ করবার বৃথা চেষ্টা না করেও সহজ বুদ্ধির সাহায্যে বোঝা যায়— বেদান্তের প্রতিপাদ্য মোক্ষ হচ্ছে ব্রহ্মবিষয়ক লৌকিক ধর্মের সংকীর্ণ ধারণা হতে মনের মুক্তি।

আপনারা সকলেই জানেন যে, বেদান্তশাস্ত্র নেতিমূলক। বেদান্তের 'নেতি নেতি'র সার্থকতা সাধারণ লোকের ব্রহ্মবিষয়ক সকল অলীক ধারণার নিরাস করায়। এ বিষয়ে শংকরের মত তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক। বেদান্তের চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যের দুটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

অস্যার্থ : তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান যিনি ইদন্তারূপে (এই, অমুক) অথবা অন্য কোনোপ্রকারে উপাসিত হন না।

ন হি শাস্ত্রমিদন্তয়া বিষয়ীভূতং ব্রহ্ম প্রতিপিপাদয়িষতি।

অস্যার্থ : বেদান্তশাস্ত্র তাঁহাকে ইদন্তারূপে (কোনোরূপ বিশেষণ দিয়া) প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছুক নহে। শাস্ত্র এইমাত্র প্রতিপাদন করে যে, ব্রহ্মপদার্থ ইদং জ্ঞানের অবিষয়।

বলা বাহুল্য ধর্মজ্ঞানের রাজ্যে, এহেন মুক্তির বারতা পৃথিবীর অপর কোনো দেশে অপর কোনো শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। এ মত কিন্তু নাস্তিক মত নয়, এ মত শুধু সকলপ্রকার সংকীর্ণ আস্তিক মতের বিরোধী।

আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা যেমন প্রাচীন ভারতবর্ষের আর্যসভ্যতার চরম বাণী, সামাজিক সভ্যতা তেমনি বর্তমান ইউরোপীয় আর্যসভ্যতার চরম বাণী। এ সত্য আজকের দিনে আমাদের সকলেরই নিকট প্রত্যক্ষ, কেননা এ যুগের ইউরোপীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র যে কী তা ইংরেজি শিক্ষার প্রসাদে আমরা সবাই জানি। কিন্তু এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টির বহুপূর্বে, অর্থাৎ একশো বৎসর পূর্বে, একমাত্র রামমোহন রায়ের চোখে এ সত্য ধরা পড়ে। ইউরোপের ঐ মহামন্ত্রই যে আমাদের যথার্থ সঞ্জীবনী মন্ত্র হবে, এই বিশ্বাসই ছিল তাঁর সকল কথা সকল ব্যবহারের অটল ভিত্তি। তাই তিনি এক দিকে যেমন ইউরোপের পৌরাণিক ধর্ম অগ্রাহ্য করেছিলেন, অপর দিকে তিনি তেমনি ইউরোপের সামাজিক ধর্ম সোৎসাহে সানন্দে অঙ্গীকার করেছিলেন। এই লিবার্টির ধর্মকেই আত্মসাৎ করে ভারতবাসী যে আবার নবজীবন নবশক্তি লাভ করবে এই সত্য প্রচার করাই ছিল তাঁর জীবনের মহাব্রত।

১

লিবার্টি শব্দটা আজকের দিনে এত অসংখ্য লোকের মুখে মুখে ফিরছে, এক কথায় এতটা বাজারে হয়ে উঠেছে যে, ভয় হয় যে, অধিকাংশ লোকের মুখে ওটা একটা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। গীতার নিষ্কাম ধর্মের কথাটাকে আমরা যে একটা বুলিতে পরিণত করেছি, এ কথা তো আর সজ্ঞানে অস্বীকার করা চলে না। যে কথা মুখে আছে মনে নেই, যদিও বা মনে থাকে তো জীবনে নেই, তারই নাম না বুলি? অতএব এ স্থলে, বর্তমান ইউরোপ লিবার্টি শব্দের অর্থে কি বোঝে সে সম্বন্ধে বর্তমান ইতালির একজন অগ্রগণ্য লেখকের কথা এখানে বাংলায় অনুবাদ করে দিচ্ছি—

প্রাচীনকালে লিবার্টি শব্দের অর্থে লোকে বুঝত শুধু দেশের গভর্নমেণ্টকে নিজের করায়ত্ত করা। বর্তমানে লোকে লিবার্টি বলতে শুধু রাজনৈতিক নয়, সেইসঙ্গে মানসিক ও নৈতিক স্বাধীনতার কথাও বোঝে, অর্থাৎ এ যুগে লিবার্টির অর্থ, চিন্তা করবার স্বাধীনতা, কথা বলবার স্বাধীনতা, লেখবার স্বাধীনতা, নানা লোক একত্র হয়ে দল বাঁধবার স্বাধীনতা, বিচার করবার স্বাধীনতা, নিজের মত গড়বার এবং সে মত প্রকাশ করবার, প্রচার করবার স্বাধীনতা। মানুষমাত্রেই এ-সকল ক্ষেত্রে সমান স্বাধীনতার স্বভাবতই অধিকারী, এ স্বাধীনতা, কোনো চার্চ (ধর্মসংঘ) কর্তৃকও দত্ত নয়, কোনো রাজশক্তি কর্তৃকও দত্ত নয়। এর উলটো মত হচ্ছে এই যে, হয় ধর্মসংঘ নয় রাজশক্তি সর্বশক্তিমান্, অতএব ব্যক্তির ব্যক্তিহিসেবে কোনোই স্বাধীনতা নেই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একটা জাতীয় সমূহের অন্তরে লীন হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়, সে সমূহ রাজাই হোক আর রাজ্যই হোক, চার্চই হোক আর পোপই হোক।

লেখকের মতে, যে দেশে যে সমাজে ব্যক্তিমাত্রেই এই-সকল মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার অধিকারী নয়, সে দেশের লোকমাত্রেই দাস; সে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা মিছা ও অর্থশূন্য। আমি ইচ্ছা করেই De Sanctisএর মত আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, কেননা উক্ত লেখককে ইতালির রাজনৈতিক স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য আজীবন অশেষ অত্যাচার, বিশেষ শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল।

রাজা রামমোহন রায় লিবার্টি শব্দের এই নূতন অর্থই গ্রহণ করেছিলেন, এবং স্বজাতিকে মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দাসত্ব হতে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। লিবার্টির নূতন ধারণার ভিতর একটি দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে, সে তত্ত্ব এই যে, স্বাধীনতার মধ্যেই ব্যক্তিমাত্রেরই জীবনীশক্তি স্ফূর্তি লাভ করে। এবং বহু লোকের মনে ও জীবনে এই শক্তি স্ফূর্ত হলেই জাতীয় জীবন যুগপৎ শক্তি ও উন্নতি লাভ করে। মানুষকে দাস রেখে মানবসমাজকে স্বাধীন করে তোলার যে কোনো অর্থ নেই এ জ্ঞান রামমোহন রায়ের ছিল, কেননা তিনি হেগেল প্রমুখ জর্মান দার্শনিকদের শিষ্য ছিলেন না।

১০

রামমোহন রায় জানতেন যে, তাঁর স্বজাতি দুর্বল ভয়ার্ত ও দীন, এবং এরূপ হবার কারণ, সে জাতির নয়শো বছরের পূর্ব ইতিহাস এবং এই দুর্বল ভয়ার্ত ও দীন জাতির দুর্বলতা ভয় ও দৈন্য কি উপায়ে দূর করা যায়, এই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ভাবনা। সুতরাং তাঁকে এক দিকে যেমন গভর্নমেণ্টের আইনকানুনের দিকে নজর রাখতে হয়েছিল, অপর দিকে বাঙালির মানসিক ও সামাজিক মুক্তির উপায়ও নির্ধারণ করতে হয়েছিল।

ইংরেজিতে যাকে বলে civil and religious liberty, তার অভাবে কোনো জাতি যে মানুষ হয়ে ওঠবার সুযোগ পায় না, এ সত্য তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল। এই কারণে স্বজাতির সিভিল ও রিলিজিয়াস লিবার্টির রক্ষাকল্পে তখনকার ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জকে তিনি যে একখানি খোলাচিঠি লেখেন, সে পত্রে তিনি এতদূর স্বাধীন মনের পরিচয় দিয়েছিলেন যে, বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক বেন্থাম এ রচনাকে দ্বিতীয় Areopagitica স্বরূপে শিরোধার্য করেন। পৃথিবীর স্বাধীনতার ইতিহাসে এ পত্রখানি একখানি মহামূল্য দলিল। দুঃখের বিষয় এই যে, খুব কম বাঙালির এ দলিলখানির সঙ্গে পরিচয় আছে এবং এ কালের পলিটিশিয়ানদের মোটেই নেই। নেই যে, সেটি বড়োই আশ্চর্যের কথা, কেননা যে কংগ্রেস তাঁদের রাজনৈতিক ব্যাবসার প্রধান সম্বল, সেই কংগ্রেসের মূল সূত্রগুলির স্থাপনা ১৮৩২ খৃস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ই করেন। অদ্যাবধি আমরা শুধু তার টীকাভাষ্যই করছি।

আধ্যাত্মিক দাসবুদ্ধির মতো সামাজিক দাসবুদ্ধিরও মূলে আছে অবিদ্যা। আজকালের ভাষায় আমরা যাকে অজ্ঞতা বলি, শাস্ত্রের ভাষায় তাকে ব্যাবহারিক অবিদ্যা বলা যেতে পারে।

জাতীয় মনকে এই অবিদ্যার মোহ থেকে উদ্ধার করবার জন্য রামমোহন রায় এ দেশে ইউরোপীয় শিক্ষাকে আবাহন করে নিয়েছিলেন। যে জ্ঞান সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় কিন্তু ছেরেপ কল্পনামূলক, সে জ্ঞান মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না। রামমোহন রায় আবিষ্কার করেন যে, ইউরোপীয়দের অন্তত দুটি শাস্ত্র আছে, সত্য যার ভিত্তি : এক বিজ্ঞান, আর-এক ইতিহাস। এই বিজ্ঞানের প্রসাদে এ বিশ্বের গঠন ও ক্রিয়ার যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়, আর এই ইতিহাসের কাছ থেকে মানবসমাজের উত্থান-পতন-পরিবর্তনের যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়; অন্তত এ দুইয়ের চর্চার ফলে মানুষের মন মানুষ সম্বন্ধে ও বিশ্ব সম্বন্ধে 'বড়াই বুড়ির কথা'র প্রভুত্ব হতে নিষ্কৃতি লাভ করে। যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক-না কেন, অবিদ্যার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার নাম মুক্তিলাভ করা এবং মুক্তপুরুষই যথার্থ শক্তিমান্ পুরুষ। কিন্তু যথার্থ মুক্তি সাধনাসাপেক্ষ। রামমোহন রায় দেশের লোককে এই সত্যমূলক ইউরোপীয় শাস্ত্রমার্গে সাধনা করতে শিখিয়ে গিয়েছিলেন। তারই ফলে বর্তমান ভারতবর্ষে বাঙালি জাতির স্থান সবার উপরে। কি সাহিত্যে, কি আর্টে, কি বিজ্ঞানে, কি রাজনীতির ক্ষেত্রে, বাঙালি যে আজ ভারতবর্ষের সর্বাগ্রগণ্য জাতি, বাঙালির চিন্তা, বাঙালির কর্ম আজ যে বাকি ভারতবর্ষের আদর্শ, বাঙালি

যে এ যুগে মানসিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতবর্ষের যুগপৎ শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু, তার কারণ একটি বাঙালি মহাপুরুষের প্রদর্শিত মার্গে বাঙালির মন, বাঙালির জীবন আজ একশো বৎসর ধরে অগ্রসর হয়েছে। এক কথায় আমাদের জাতীয় প্রতিভা রামমোহন রায়ের মনে ও জীবনে সম্পূর্ণ সাকার হয়ে উঠেছিল।

সুতরাং রামমোহন রায়ের মনে বাঙালি জাতি ইচ্ছা করলে তার নিজের মনের ছবি দেখতে পারে। বাঙালি জাতির মনে যে-সকল শক্তি প্রচ্ছন্ন ও বিক্ষিপ্ত ছিল, রামমোহন রায়ের অন্তরে সেই-সকল শক্তি সংহত ও প্রকট হয়ে উঠেছিল। এর প্রমাণ রামমোহন রায়ের মন ও প্রকৃতি যদি অবাঙালি হত তা হলে আমরা পুরুষানুক্রমে কখনোই শিক্ষায় ও জীবনে অজ্ঞাতসারে তাঁর পদানুসরণ করতুম না।

এ কথাটা আজ স্বজাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার। কারণ বাঙালি যদি তার স্বধর্ম হারায় তাতে যে শুধু বাংলার ক্ষতি, তাই নয়, সমস্ত ভারতবর্ষেরও ক্ষতি। আমরা যদি আমাদের মনের প্রদীপ জোর করে নেবাতে চেষ্টা করি, তা হলে যে ধূমের সৃষ্টি হবে তাতে সমস্ত ভারতবর্ষের মনের রাজ্য অন্ধকার হয়ে যাবে। একদল আত্মহারা বাঙালি আজকের দিনে স্বধর্ম বর্জন করতে উদ্যত হয়েছেন বলে রামমোহন রায়ের আত্মাকে স্বজাতির সুমুখে খাড়া করা অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করি।

আশ্বিন ১৩২৭

বীরবল

আমি সেদিন দিল্লি গিয়ে আবিষ্কার করে এসেছি যে, আর্যাবর্তে আমি 'বীরবল' ব'লে পরিচিত, অবশ্য শুধু প্রবাসী বাঙালিদের কাছে। এ আবিষ্কারে আমি উৎফুল্ল হয়েছি কি মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছি, বলা কঠিন। লেখক হিসেবে আমি যে বাংলার বাইরেও পরিচিত, এ তো অবশ্য আহ্লাদের কথা; কিন্তু আমার ধার-করা নামের পিছনে যে আমার স্বনাম ঢাকা পড়ে গেল, এইটিই হয়েছে ভাবনার কথা; কারণ আমি স্বনামেও নানা কথা ও নানারকম জিনিস লিখি। এর পর আমি যে কেন ও-নাম আত্মসাৎ করেছি ও বীরবল লোকটি যে কে ছিলেন সংক্ষেপে তার পরিচয় দেওয়াটা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

আমি যখন বালক, তখন আমার পিতার কর্মস্থল ছিল বেহার। কাজেই তিনি সেকালে বছরের বেশির ভাগ সময় সেই দেশেই বাস করতেন। আর আমি বাস করতুম বাংলায়, স্কুলে পড়বার জন্য। আমার বিশ্বাস এর কারণ, বাবা মনে করতেন বেহারের আবহাওয়ায় মানুষের মাথা তাদৃশ খোলে না, যাদৃশ ফোলে তার দেহ।

এর ফলে তিনি আপিসের পুজোর ছুটিতে বাংলায় আসতেন, আর আমরা কেউ কেউ বেহারে যেতুম স্কুলের শীতের ছুটিতে।

আমার বয়েস যখন এগারো বৎসর, তখন একবার আমি শীতকালে মজঃফরপুর যাই। সঙ্গে ছিলেন আমার একটি ভ্রাতা ও একটি ভগ্নী। আমিই ছিলুম সবচাইতে বয়ঃকনিষ্ঠ। দিনটে একরকম খেলাধুলোয় কেটে যেত। সন্ধের পর বাড়ির জন্য মন কেমন করত।

বাবা তাই ঘরের ভিতর প্রকাণ্ড একটা আগুঠি জ্বালিয়ে তার চার পাশে আমাদের বসিয়ে একখানি উর্দু বই থেকে আমাদের কেচ্ছা পড়ে শোনাতেন। এর অধিকাংশ কেচ্ছাই এই বলে শুরু হত 'আক্‌বর বীরবল নে পুছা', আর শেষ হত বীরবলের উত্তরে।

২

আমি তখন তারিণীচরণের ভারতবর্ষের ইতিহাসের পারগামী হয়েছি, সুতরাং আকবরশাহের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল; অর্থাৎ তিনি যে জাহাঙ্গীরের বাবা ও হুমায়ুনের ছেলে, এ কথা আমার জানা ছিল।

কিন্তু বীরবল লোকটি যে কে, হিন্দু কি মুসলমান, বাদশাহের মন্ত্রী কি ইয়ার, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলুম; কারণ তারিণীচরণ তাঁর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি।

কিন্তু সেই-সব উদর্দ্‌ কেচ্ছা শোনাবার ফলে আমার মনে বীরবলের নাম বসে যায়। আকবরের প্রশ্নের উত্তরে বীরবলের চোখাচোখা জবাব শন্‌নে আমি মনে মনে তাঁর মহাভক্ত হয়ে উঠলন্‌ম। প্রশ্ন করতে পারে সবাই, কিন্তু উত্তর দিতে পারে ক'জন? আর যে পারে, আমার বালক-বন্‌দ্ধি তাকেই প্রশ্নকর্তার চাইতে উ'চু আসনে বসিয়ে দিলে। মন্‌খের চাইতে হাত যে বড়ো হাতিয়ার, বন্‌দ্ধিবলের চাইতে বাহন্‌বল যে শ্রেষ্ঠ, সে কথা আমি তখন বন্‌ঝতুম না; কারণ সে বয়েসে আমি সভ্য হই নি, ছিলন্‌ম শন্‌ধন্‌ আদিম মানব। সেকালে বাহন্‌বলের একমাত্র পরিচয় পেতুম গন্‌রন্‌-জনদের ও গন্‌রন্‌মহাশয়দের বাহন্‌তে। জোয়ান লোকদের কর্তৃক ছোটো ছোটো ছেলেদের গালে চপেটাঘাত ও কর্ণমর্দনের মাহাত্ম্য ও-বয়েসে হৃদয়ংগম করতে পারি নি। আমাদেরই ভালোর জন্য যে তাঁরা আমাদের কানের রঙ লাল করে দিচ্ছেন ও আমাদের গালে তাঁদের পাঁচ আঙন্‌লের ছাপ দেগে দিচ্ছেন, তা বোঝবার মতো সন্‌ক্ষ্মবন্‌দ্ধি তখন আমার ছিল না। এই পরোপকারের চেষ্টাটা সেকালে অত্যাচার বলেই রক্তমাংসে অনন্‌ভব করতুম। তাই তখন মনে ভাবতুম, হায়, আমার মন্‌খে যদি বীরবলের রসনা থাকত, তা হলে এই-সব ঘ'রো আকবরশাহদের বোকা বানিয়ে দিতুম। দন্‌র্বলের উপর বলপ্রয়োগের নামই যে বীরত্ব, তা বন্‌ঝলন্‌ম ঢের পরে, যখন কার্লাইলের *Hero-Worship* পড়লন্‌ম।

৩

এর পর বহন্‌কাল যাবৎ বীরবলের নাম আমার গন্‌প্তচৈতন্যে সন্‌প্ত হয়ে ছিল। আমার যখন পন্‌র্ণযৌবন, তখন আবার তা জেগে উঠল। বিলেতে আমার অনেক মন্‌সলমান বন্ধন্‌ জোটে, তাঁদের কারো বাড়ি লক্ষ্ণৌ, কারো দিল্লি, কারো নাগপন্‌র, কারো হাইদ্রাবাদ। এ'দের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন আবার নবাবজাদা।

এই নববন্ধন্‌দের মন্‌খে বীরবলের রসিকতার দেদার গল্প শন্‌নি। এ-সব রসিকতা যে অন্য লোকের বানানো, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা এ-সব গল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রমাণ করা যে, আকবরের সভায় বীরবলের চাইতেও আর-একজন ঢের বড়ো রসিক ছিলেন, যিনি কথায় কথায় বীরবলকে উপহাসাস্পদ করতেন। এই রসিকরাজের নাম হচ্ছে মৌলবী দো-পি'য়াজা। উক্ত মৌলবী সাহেবের সন্‌ভাষিতা-বলী যে সাহিত্যে স্থান লাভ করে নি, তার কারণ তাঁর রসিকতা তাঁর নামেরই অনন্‌রূপ তীব্রগন্ধী, সে রসিকতা শন্‌নে যন্‌গপৎ কানে হাত ও নাকে কাপড় দিতে হয়।

এই-সব কেচ্ছা শন্‌নে আমার এই ধারণা জন্মালো যে, বীরবল ছিলেন আকবর-শাহের বিদন্‌ষক, আর তিনি জাতিতে ছিলেন হিন্দন্‌। বিদন্‌ষক হিসেবে তিনি হিন্দন্‌স্থানে দেশব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছিলেন বলে তাঁর পালটা জবাব দিতে পারে এমন একজন মন্‌সলমান রসিক কল্পিত হয়েছে। তাঁর নামেই প্রমাণ যে, উক্ত নামধারী কোনো মৌলবী আকবরশাহের সভাসদ হতে পারত না।

সে যাই হোক, বছর কুড়িক আগে আমি যখন দেশের লোককে রসিকতাচ্ছলে

কতকগুলি সত্য কথা শোনাতে মনস্থ করি, তখন আমি না ভেবেচিন্তে বীরবলের নাম অবলম্বন করলুম। এ নামের দুইটি স্পষ্ট গুণ আছে : প্রথমত নামটি ছোটো, দ্বিতীয়ত শ্রুতিমধুর। এ নাম গ্রহণ করে আমি স্বজাতিকে বাদশাহের পদবীতে তুলে দিয়েছি, সুতরাং তাঁদের এতে খুশি হবারই কথা। আর মুসলমান ভ্রাতৃগণের কাছে নিবেদন করছি যে, আমি যত বড়োই রসিক হই-না কেন, মৌলবী দো-পিঁয়াজার নাম গ্রহণ করা আমার শক্তিতে কুলোয় না। ইংরেজিশিক্ষিত ব্রাহ্মণ-সন্তান অকাতরে পলাণ্ডু ভক্ষণ করতে পারে, কিন্তু নিজেকে পলাণ্ডু বলে ভদ্রসমাজে পরিচিত করতে পারে না। জাতি জিনিসটে এমনি বালাই।

৪

মৌলবী দো-পিঁয়াজার অস্তিত্ব অসিদ্ধ, প্রমাণাভাবাৎ। কিন্তু বীরবল যে এককালে সশরীরে বর্তমান ছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই; কারণ আকবরের সমসাময়িক ঐতিহাসিক মৌলবী সাহেবেরা তাঁর মৃত্যুর বর্ণনা খুব ফূর্তি করে করেছেন। যার মৃত্যু হয়েছে, সে অবশ্য এককালে বেঁচে ছিল। তিনি আকবরশাহের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। ফলে আকবরের বহু প্রসাদবিত্তদের তিনি সমান অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আর ইতিহাসে সেই ব্যক্তিরই নাম স্থান পায়, যে নিন্দাপ্রশংসা দুইয়েরই সমান ভাগী। বীরবলের ভাগ্যে দুই যে সমান জুটেছিল, তার পরিচয় পরে দেব।

জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক ফারসিভাষায় সব পাঁজিপুথি ঘেঁটে বীরবলের আসল নামধাম উদ্ধার করেছেন। বীরবল নামটিও রাজদত্ত।

বীরবলের প্রকৃত নাম ছিল মহেশ দাস। তিনি ১৫২৮ খৃস্টাব্দে কাল্পি নগরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান প্রথমে জয়-পুরের রাজা ভগবান দাসের আশ্রয়ে বাস করতেন, পরে রাজাবাহাদুর তাঁকে বাদশাহের কাছে পাঠিয়ে দেন। মহেশ দাসের কবিতা, তাঁর সংগীত, তাঁর রসালাপ, তাঁর গল্প আকবরকে এত মুগ্ধ করে যে, তিনি তাঁকে 'কবিরায়' উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐতিহাসিকেরা তাঁকে কখনো আকবরের মন্ত্রী, কখনো বা প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করেছেন। পরে আকবরশাহ তাঁকে 'রাজা বীরবল' উপাধি দেন, এবং সেইসঙ্গে বুন্দেলখণ্ডের কালাঞ্জর রাজ্য ও কাংরা প্রদেশ জায়গীর দেন। ১৫৮৬ খৃস্টাব্দে আকবর বীরবলকে সেনাপতি করে কাবুল-যুদ্ধে পাঠান, এবং সেই যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানদের হস্তে তিনি ভবলীলা সংবরণ করেন।

৫

এই-সব তথ্য আমি ইংরেজ ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের *Akbar the Great Moghul* নামক পুস্তক হতে সংগ্রহ করেছি। আমি পূর্বে বলেছি যে, বীরবলের প্রতি মৌলবী সাহেবেরা যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে, এবং এ অসন্তোষের কারণও ছিল। আবদুল কাদির নামক আকবরশাহের জনৈক ঘোর

সুন্নি সভাসদের তারিখ-ই-বাদাউনি নামক পুস্তকের একবার পাতা উলটে গেলেই দেখতে পাবেন যে, তার প্রায় পাতায় পাতায় বীরবলের উপর গালিগালাজ আছে। এমন-কি, স্বধর্মনিষ্ঠ মৌলবী সাহেব বীরবলের নাম পর্যন্ত মুখে আনেন না, তার পূর্বে 'দাসীপুত্র' বিশেষণটি জুড়ে না দিয়ে। মৌলবী সাহেবের রাগের কারণ পরে উল্লেখ করব। এ স্থলে একটি কথা বলে রাখা দরকার। আকবরশাহের আমলের যত ইতিহাস ফারসি থেকে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে, তার মধ্যে তারিখ-ই-বাদাউনিই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এর প্রথম কারণ, মৌলবী সাহেব অত্যন্ত স্পষ্টভাষী ; দ্বিতীয়ত, তাঁর মনে রাগদ্বেষ ছিল বলে তাঁর লেখায় নুন-ঝাল দুই আছে ; অপরাপর ইতিহাসের মতো তা পানসে নয়। তা ছাড়া, তাঁর গ্রন্থ ইতিহাস না হোক, সাহিত্য। যদিচ বইখানির নাম তারিখ, তা হলেও সেটি শুধু ক্রনোলজি নয়, অর্থাৎ পাঁজি নয়, পুথি। তিনি যাঁদের নাম করেছেন, তাঁদেরই চেহারা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। আকবর, আবুল ফজল, ফৈজি, বীরবল প্রভৃতি তাঁর লেখায় শুধু নামমাত্র নয়, রূপবিশিষ্টও বটে। তিনি মহা রাগী পুরুষ ছিলেন ; তার জন্য দুঃখ করবার কোনো কারণ নেই ; কেননা কথায় বলে রাগই পুরুষের লক্ষণ। তাঁকে অবশ্য নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বলা যায় না, কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি ইতিহাসের দরবারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেন নি। তিনি ভুল করতে পারেন কিন্তু জেনেশুনে মিছে কথা বলেন নি। বাদাউনি বলেছেন যে, বীরবল প্রথমে রেওয়ার রাজা রামচন্দ্রের আশ্রয়ে ছিলেন, তিনিই বীরবল ও তানসেনকে তাঁর সভার দুটি রত্ন হিসেবে বাদশাহকে উপঢৌকন দেন। এই কথাই, আমার বিশ্বাস, সত্য।

বীরবলের উপর বাদাউনির রাগ বোঝা যায় ; কিন্তু স্মিথ সাহেবও যে কি কারণে বীরবলের প্রতি বিরক্ত তা বোঝা কঠিন, কারণ তিনি মুসলমানও নন, মুসলমান-প্রণয়ীও নন, তা যে তিনি নন যে-কেউ তাঁর *Oxford History of India* পড়েছেন, তিনিই জানেন। স্মিথ সাহেব বীরবলকে অবশ্য দাসীপুত্র বিশেষণে বিশিষ্ট করেন না, কিন্তু ফাঁক পেলেই তিনি বীরবলকে আকবরশাহের ভাঁড় বলে উল্লেখ করেন। যে ব্যক্তি একাধারে কবি গায়ক গল্পরচয়িতা ও সুরসিক, তাঁকে শুধু জেস্টার বলে উল্লেখ করে স্মিথ সাহেব গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন নি। স্মিথ সাহেব বলেন যে, বীরবল যে আকবরবাদশার মন্ত্রী ছিলেন, এ কথা ভুল ; তিনি অনুমান করেন যে, বীরবল ছিলেন আকবরের আস্তাবলের জমাদার। তাঁর ভাষায় কবিরায়ের ইংরেজি প্রতিবাক্য হচ্ছে পোয়েট-লরিয়েট। টেনিসনকে ইংলণ্ডের রাজা তাঁর অশ্বপালনে নিযুক্ত করেন নি, আর এ দেশে আকবরবাদশা যে তাঁর কবিরায়কে ঘোড়ার খিদমতগারিতে নিযুক্ত করেছিলেন, এমন কথা মৌলবী বাদাউনিও বলেন নি। যদি তিনি করতেন, তা হলে তিনি Akbar the Great হতেন না, হতেন শুধু Akbar the Moghul।

কিন্তু এই অদ্ভুত অনুমানের কারণ আরো অদ্ভুত। আকবর ফতেপুর-শিক্রীতে বীরবলের বাসের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন, সে ইমারত আজও দাঁড়িয়ে আছে। সে বাড়ির বর্ণনা স্মিথ সাহেবের কথাতেই নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি— "

The exquisite structure at Fathpur-Sikri known as Raja Birbal's house was erected in 1571 or 1572... The beauty and lavishness of the decoration testify to the intensity of Akbar's affection for the Raja...

The proximity of his beautiful house in the palace of Fathpur-Sikri to the stables has suggested the hypothesis that he may have been Master of Horse.

বিলেতি লজিকের কোন্ সূত্র অনুসারে যে এইরূপ প্রিমিসটি থেকে এইরূপ হাইপথেসিস্এ পেঁছনো যায়, তা আমার কাছে সম্পূর্ণ অবিদিত। আমি মিল্-এর ইন্ডাক্টিব লজিক পড়ি নি; তাই আস্তাবলের পাশে যার বাড়ি, সেই যে সহিস এ কথা মেনে নিতে আমি কুণ্ঠিত। আলিপুরে লাটসাহেবের বাড়ির পাশেই আছে পশুশালা, এর থেকে লাটসাহেবকে পশুশালার অধ্যক্ষ বলে ধরে নেওয়াটা ঐতিহাসিক বুদ্ধির কাজ হতে পারে, কিন্তু সহজ বুদ্ধির কাজ নয়।

বর্তমান যুগে আমি একটিমাত্র ব্যক্তিকে জানি, যিনি একাধারে কবি গায়ক গল্প-রচয়িতা ও সুরসিক, তাঁর নাম শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর বাড়ির দু হাত দূরে আস্তাবল আছে। আমি তাঁর কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন ও-আস্তাবল অবিলম্বে ভূমিসাৎ করেন, নচেৎ ভবিষ্যতের স্মিথ সাহেবরা তাঁর সম্বন্ধে কি যে হাইপথেসিস্ করবেন, তা বলা যায় না।

৬

বীরবলের মৃত্যুটি একটু গোলমেলে ব্যাপার। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আকবর-শাহ যেমন শোকাতুর হয়েছিলেন, মৌলবী বাদাউনি প্রভৃতি তেমনি আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছিলেন। স্মিথ সাহেব এ মৃত্যুকে বলেছেন inglorious death ; কারণ যে যুদ্ধে তাঁর প্রাণ যায়, সে যুদ্ধে তাঁর সৈন্যসামন্ত প্রায় সমূলে নিপাত হয়। যুদ্ধে হারাটা দুঃখের বিষয় হতে পারে, কিন্তু সব সময়ে লজ্জার বিষয় নয়। রানী দুর্গাবতী আকবরের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে যুদ্ধে হেরেছিলেন ও যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ-ত্যাগ করেছিলেন ; অথচ ঐতিহাসিক মাত্রেই তাঁর মৃত্যুকে glorious death বলেছে।

স্মিথ সাহেবের বিশ্বাস যে—

The disaster appears to have been due in large part to his folly and inexperience. Akbar made a serious mistake in sending such people as Birbal and the Hakim to command military forces operating in a difficult country against a formidable enemy.

৭

আকবরশাহের সভাকবি যে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না, এ কথা সহজেই মনে হয়। টেনিসনকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সেনাপতি করে পাঠালে যে একটা-না-একটা

বিভ্রাট ঘটত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। তবে বীরবল তো শুধু কবি ছিলেন না, উপরন্তু তিনি ছিলেন বিদূষক ও গল্পরচয়িতা। ভাসের অবিমারক নামক নাটকে পড়েছি যে, রাজপুত্র তাঁর বিদূষককে হারিয়ে এই বলে দুঃখ করেছিলেন যে 'আমার এমন বয়স্য গেল কোথায়, যে ঘরে ছিল নর্মসচিব ও যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রগণ্য যোদ্ধা'। অতএব বিদূষকও যে যোদ্ধা হতে পারে, তার সংস্কৃত নজির আছে।

আর গল্পরচয়িতাও যে সেনাপতি হতে পারে, তার প্রমাণ টলস্টয় ছিলেন ক্রিমিয়ান ওয়র্-এ রুশ পক্ষের একজন সেনাপতি। সে যুদ্ধে রুশপক্ষ জয়লাভ করে নি; এবং তার জন্য টলস্টয় ইউরোপীয় সমাজে অবজ্ঞার পাত্র হন নি। ক্রিমিয়াতে রুশপক্ষের যত লোক যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে, তার চাইতে ঢের বেশি সৈন্য প্রাণত্যাগ করে ওলাউঠায়। উক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ও-রোগের এমন ভীষণ প্রকোপ হয়েছিল যে, টলস্টয় পাছে ও-রোগে আক্রান্ত হন এই ভয়ে, স্বয়ং জার তাঁকে সেখান থেকে চলে আসতে আদেশ করেছিলেন। কিন্তু টলস্টয় সে আদেশ অমান্য করেন এই বলে যে, তিনি তাঁর অধীনস্থ দীনহীন অসহায় সৈনিকদের এই বিপদের মধ্যে ত্যাগ করে নিজের প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন করতে প্রস্তুত নন, রাজার হুকুমেও নয়।

সুতরাং কাবুলের যুদ্ধে যে বীরবলের অজ্ঞতা ও কাপুরুষতার দরুনই হার হয়েছিল, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। বিশেষত স্মিথ সাহেব এই ঘটনা যখন আকবরেরও আহাম্মকির প্রমাণস্বরূপ গণ্য করেন, তখন তাঁর মত একেবারেই অগ্রাহ্য। ধরে নিচ্ছি যে, বীরবলের রসিকতাই আকবরকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু যুদ্ধ করা যে রসিকতা নয়, তা আর কেউ না জানেন, আকবর জানতেন। আর কোন্ লোকের দ্বারা কোন্ কাজ উদ্ধার হয়, তাও যে তিনি জানতেন, তার পরিচয় তিনি চিরজীবনই দিয়েছেন। সুতরাং স্মিথ সাহেবের 'it appears' কথাটার কোনোরূপ ঐতিহাসিক মূল্য নেই। স্মিথ সাহেব কিন্তু শুধু বীরবলকে অজ্ঞ ও অক্ষম বলেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি আরো বলেন যে—

He seems to have frankly run away in a vain attempt to save his life.

৮

স্মিথ সাহেব এ সত্য কোথা থেকে উদ্ধার করলেন? অবশ্য তারিখ-ই-বাদাউনি থেকে। সুতরাং মৌলবী সাহেব বীরবলের মৃত্যু সম্বন্ধে কি বলেন, তা তাঁর মুখেই শোনা যাক। বাদাউনির কথা হচ্ছে এই—

Birbal also, who had fled from fear of his life, was slain, and entered the row of the dogs in hell, and thus got something for the abominable deeds he had done during his lifetime.

বাদাউনির কথা যদি বেদবাক্য হিসেবে মেনে নিতে হয়, তা হলে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, বীরবল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এক দৌড়ে গিয়ে নরকের কুকুরের দলে ভর্তি হয়েছিলেন। অর্থাৎ জীবনে যিনি বাস করতেন ঘোড়ার সঙ্গে, মরে তিনি গিয়ে বাস করতে লাগলেন কুকুরের সঙ্গে। এ ঘটনা যে ঘটে নি তা বলা

অসম্ভব, কারণ নরকে যে Birbal's House ঠিক কোন্ জায়গায়, তা বাদাউনিও নিজচক্ষে দেখেন নি, স্মিথ সাহেবও দেখেন নি। সুতরাং বাদাউনির উক্তির শেষ অংশটা যদি ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে অগ্রাহ্য হয়, তা হলে তার প্রথম অংশটা সত্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবসর থাকে।

শাস্ত্রে বলে 'যঃ পলায়তে স জীবতি'। আর শাস্ত্রবচন যে মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ উক্ত যুদ্ধক্ষেত্র হতে যে-দুটি মুসলমান সেনাধ্যক্ষ পলায়ন করেছিলেন, তাঁরা দুজনেই বেঁচেছিলেন। এই কারণে এ বিষয়ে আবুল ফজল তাঁর আকবরনামায় যা লিখেছেন, it seems to me, সেই কথাটাই সত্য। তাঁর কথা এই—

In the conflict 500 men perished. Among them was Rajah Birbal, whose loss the Emperor greatly deplored.

যদি স্মিথ সাহেব বলেন যে, আবুল ফজলের উক্তি অগ্রাহ্য, কেননা তাতে বীরবলের প্রতি গালি-গালাজ নেই; তা হলে বলি আবুল ফজল বলেছেন যে, বীরবল মরেছেন—আর মরার বাড়া গাল নেই।

৯

বীরবল কি ভাবে মরেছিলেন—শুয়ে কি বসে, দাঁড়িয়ে কিম্বা দৌড়তে দৌড়তে—তা জানবার কোনোরূপ কৌতূহল আমার নেই। আমি জানতে চাই তাঁর জীবন, তাঁর মৃত্যু নয়। কেননা মৃত্যুতে আমরা সবাই এক, শুধু জীবনে বিভিন্ন।

তাঁর মৃত্যুর কথাটা তুলেছি এইজন্য যে, উক্ত ঘটনায় আর পাঁচজনে কতটা আনন্দিত বা দুঃখিত হন, তার থেকে তাঁর চরিত্র কতকটা অনুমান করা যায়।

বীরবলের মৃত্যুসংবাদে আকবর যে শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, সে বিষয়ে সকল ঐতিহাসিক একই সাক্ষ্য দিয়েছেন। অপর পক্ষে বীরবলের মৃত্যুতে দেশের পাপ গেল মনে করে বাদাউনি প্রমুখ মৌলবীর দল তাঁদের উল্লাস যে কিরকম তারস্বরে ব্যক্ত করেছিলেন, তার পরিচয় তো বাদাউনির পূর্বোক্ত কথাতেই পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, বীরবল জীবনে যে-সকল জঘন্য কাজ করেছিলেন, সেই-সব পাপের শাস্তিস্বরূপ তিনি নরকের কুকুরশ্রেণীভুক্ত হয়েছেন। এই জঘন্য কাজগুলি কি?

আকবরশাহ স্বধর্মের মায়া কাটিয়ে স্বকল্পিত এক নতুন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন। বাদাউনির বিশ্বাস বীরবলই তাঁকে ধর্মভ্রষ্ট করে।

আকবরের সভায় মোল্লা মহম্মদ ইয়াজিজি নামক এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে সুন্নি মতের নানারূপ নিন্দা করে বাদশাহকে শিয়া মতাবলম্বী করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, পরে বাদাউনির ভাষায়—

This man was soon left behind by Birbal, that bastard, and by Shaik Abul-Fazal.

এঁদের কুপরামর্শে আকবরশাহ কতদূর ধর্মভ্রষ্ট হয়েছিলেন তার পরিচয় বাদাউনির বক্ষ্যমাণ কথাগুলিতেই পাওয়া যায়—

The daily prayers, the fasts and prophecies were all pronounced delusions, as being opposed to sense. Reason and not revelation was declared to be the basis of religion.

আর এ-সবই বীরবলের কুবুদ্ধিতে। আকবর যে একজন রিজ্‌নএর ভক্ত অর্থাৎ র‍্যাশনালিস্ট হয়েছিলেন, এ কথা সহজেই বিশ্বাস হয়। কারণ বৈষয়িক লোকমাত্রেই দার্শনিক হতে গেলেই র‍্যাশনালিস্ট হয়। র‍্যাশনালিস্ট হলে মানুষের মাথা খোলে না, কিন্তু তার হৃদয় খুব উদার হয়। আকবরেরও তাই হয়েছিল। তিনি র‍্যাশনালিস্ট হবার পর প্রকাশ্য দরবারে বলেন যে, 'আমি পূর্বে বহু ব্রাহ্মণকে জোর করে মুসলমান করেছি, আর তারা প্রাণভয়ে সে ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এখন বুঝছি যে, আমি অতি গর্হিত কাজ করেছি।' তাঁর এ কথায় সকলেই সায় দেবে।

১০

ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কোনো ব্যক্তিবিশেষের মনের অথবা মতের কি বদল হয়, তাতে অপরের কিছু যায় আসে না, যতক্ষণ সে অপরের ক্রিয়াকলাপের উপর হস্তক্ষেপ না করে। আকবরশাহ তাঁর নব মতানুসারে যে-সব হুকুম প্রচার করেন, তার দরুনই স্বধর্ম-নিরত মুসলমানগণ ক্ষোভে আক্রোশে অধীর হয়ে উঠেছিল। স্মিথ সাহেব তাঁর গ্রন্থে এই-সব নব রাজশাসনের যে ফর্দ দিয়েছেন, সংক্ষেপে তার পরিচয় দিচ্ছি—

১ কোনো বালকের 'মহম্মদ' এই নাম রাখা হবে না। যদি কারো নাম মহম্মদ থাকে তো তার সে নাম বদলে নতুন নাম দিতে হবে;

২ তাঁর রাজ্যে কোনো নূতন মসজিদ কেউ নির্মাণ করতে পারবে না— আর জীর্ণ মসজিদের কোনোরূপ সংস্কার কেউ করতে পারবে না;

৩ তাঁর রাজ্যে গোহত্যা নিষিদ্ধ। আর এ আজ্ঞা অমান্য করবার শাস্তি প্রাণদণ্ড। উপরন্তু বৎসরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে একশো দিন মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ;

৪ তাঁর রাজ্যে দাড়ি কেউ রাখতে পারবে না, সকলকেই তা কামাতে হবে;

৫ পিঁয়াজ রশুন ও গোমাংস ভক্ষণ তাঁর রাজ্যে নিষিদ্ধ;

৬ উপাসনার সময় হিন্দুমুসলমান নির্বিচারে সকলকে পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণ ধারণ করতে হবে।

এইরকম আরো অনেক খামখেয়ালি রাজাজ্ঞা তিনি প্রচার করেছিলেন। পুঁথি বেড়ে যায় বলে সে-সবের আর উল্লেখ করলুম না। স্মিথ সাহেব বলেছেন যে—

The whole gist of the regulations was to further the adoption of Hindu, Jaina, and Parsee practices, while discouraging or positively prohibiting essential Muslim rites.

স্মিথ সাহেব যখন এ-সকল বিধিনিষেধকে silly regulations বলেছেন, তখন বাদাউনি যে তাকে abominable deeds বলবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি। আর র‍্যাশনালিস্ট-এর এই-সব বাদশাহী পাগলামির জন্য বাদাউনি বীরবলকেই প্রধানত

দায়ী মনে করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, ফৈজী, আবুল ফজল ও বীরবল, এই তিন গ্রহ একত্র মিলে আকবরের কুবুদ্ধি ঘটায়; আর এ তিনের মধ্যে শনি ছিলেন বীরবল।

১১

অপর পক্ষে সেকালের হিন্দুরা যে বীরবলের মহাভক্ত ছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় কেশবদাসের কবিতায়। আকবরশাহের আমলে তুলসীদাস প্রমুখ অনেক হিন্দি কবির আবির্ভাব হয়, কেশবদাস তাঁদের অন্যতম। কেশবদাস রামসিংহ নামক বুন্দেলখণ্ডের জনৈক রাজার ভ্রাতা ইন্দ্রজিত সিংহের সভাকবি ছিলেন। তিনি রসিকপ্রিয়া নামক একখানি কাব্য হিন্দি ভাষায় রচনা করেন। হিন্দিভাষীরা এ কাব্যকে আজও হিন্দি কাব্যসাহিত্যের একখানি রত্ন বলে মনে করেন।

বীরবলের মৃত্যুসংবাদ শুনে কেশবদাসের শোক নিম্নলিখিত শ্লোকরূপ ধারণ করে—

পাপকে পুংজ পখাবজ কেসব সোককে সংখ শুনে সুষমা মে'।
ঝুটকী ঝালরি ঝাঁঝ অলীককে আবঝ জুথন জানি জমা মে'॥
ভেদ কী ভেরী বড়ে ডরকে ডফ কৌতুক ভো কলি কে কুরমা মে'।
জুঝত হী বলবীর বজে বহু দারিদ কে দরবার দমামে'॥

আন্দাজ করছি পূর্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ের কথা এই যে—

কেশব পাপপুঞ্জের পাখোয়াজ আর শোকশঙ্খের সুষমা শুনতে পাচ্ছে। মিথ্যা কথার কাঁসর বাজছে, আর জানি যে অলীকের আওয়াজ, যেখানেই পশুপাল জমা হচ্ছে সেখানেই শোনা যাচ্ছে। ভেদের ভেরীর ভয়ংকর জোর ডঙ্কা বাজছে। কলি কুকর্মে বড়ো কৌতুক লাভ করেছে। কিন্তু বহু দরিদ্র লোকের দরবারে বীরবল যুদ্ধ করেছেন ও তাঁর নামের দামামা বাজছে।

হিন্দি ভাষা আমি শিক্ষা করি নি। সুতরাং আমার অনুবাদের মধ্যে এখানে-ওখানে ভুল থাকতে পারে। তবে কবি কেশবদাসের মোদ্দা কথাটা বোঝা যাচ্ছে। বীরবলের মৃত্যুতে এক দিকে মিথ্যা কথার ঢাক-ঢোল ও ঘোর ভেদের ভেরী বেজে উঠেছিল। আর সেই ভীষণ ধ্বনির প্রতিধ্বনি ইতিহাসের মধ্যে আজও শোনা যাচ্ছে। অপর দিকে আবার তেমনি শোকশঙ্খের ধ্বনিও লোকের কানে ও মনে বেজে উঠেছিল। বহু দরিদ্রের দরবারে তাঁর সুযশ ঘোষিত হয়েছিল। যার মৃত্যুতে দরিদ্রসমাজে শোকশঙ্খ নিনাদিত হয়, তার জীবনও ধন্য আর তার মৃত্যুও glorious death।

বীরবলের জীবনচরিত সম্বন্ধে উপরে যা নিবেদন করেছি, তার বেশি আর কিছু জানি নে। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেই বুঝতে পারবেন যে, তাঁর নাম অবলম্বন করে আমি কতটা সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছি। আমি কবিও নই, গায়কও নই, গল্পরচয়িতাও নই। তার পর রাজদরবার আমি কখনো দূর থেকেও দেখি নি। কাবুলে যুদ্ধ করতে যাবার আমার কোনোরূপ অভিপ্রায়ও নেই,

সম্ভাবনাও নেই। তার পর আমি কাউকে নূতন ধর্ম প্রচার করতে কখনো প্ররোচিত করি নি। আমি বাঙালি জাতির বিদূষক মাত্র। তবে রসিকতাচ্ছলে সত্য কথা বলতে গিয়ে ভুল করেছি। কারণ নিত্য দেখতে পাই যে, অনেকে আমার সত্য কথাকে রসিকতা ব'লে, আর আমার রসিকতাকে সত্য কথা ব'লে ভুল করেন।

এখন এ ভুল শোধরাবার আর উপায় নেই। পাঠকেরা যে আমার লেখার ভিতর সত্য না পান, রস পেয়েছেন, এতেই আমি কৃতার্থ।

চৈত্র ১৩৩৩

মহাভারত ও গীতা

দেশপূজ্য ও লোকমান্য স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার একখানি বিরাট ভাষ্য রচনা করেছেন, এবং মহাত্মা তিলকের অনুরোধে স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সে গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছেন।[১] সে ভাষ্য যে কত বিরাট তার ইয়ত্তা সকলে এই থেকেই করতে পারবেন যে, গীতার সপ্ত শত শ্লোকের মর্ম প্রায় সপ্তবিংশতি সহস্র ছত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ ভাষ্য এত বিশাল হবার কারণ এই যে, এতে বেদ উপনিষদ্‌ ব্রাহ্মণ নিরুক্ত ব্যাকরণ ছন্দ জ্যোতিষ পুরাণ ইতিহাস কাব্য দর্শন প্রভৃতি সমগ্র সংস্কৃত শাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সুবিচার করা হয়েছে। মহাত্মা তিলক এ গ্রন্থে যে বিপুল শাস্ত্রজ্ঞান, যে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তা যথার্থই অপূর্ব। সমগ্র মহাভারতের নৈলকণ্ঠীয় ভাষ্যও, আমার বিশ্বাস, পরিমাণে এর চাইতে ছোটো। তাইতে মনে হয় যে, এ ভাষ্য মহাত্মা তিলক প্রাকৃতে না লিখে সংস্কৃতে লিখলেই ভালো করতেন। কারণ এ গ্রন্থের পারগামী হতে পারেন শুধু সর্বশাস্ত্রের পারগামী পণ্ডিতজনমাত্র, আমাদের মতো সাধারণ লোক এ গ্রন্থে প্রবেশ করা মাত্রই বলতে বাধ্য হবে যে—

ন হি পারং প্রপশ্যামি গ্রন্থস্যাস্য কথঞ্চন।
সমুদ্রস্যাস্য মহতো ভুজাভ্যাং প্রতরন্নরঃ॥[২]

২

মহাত্মা তিলক এ গ্রন্থের নাম দিয়েছেন কর্মযোগ। কেননা তিনি ঐ সুবিস্তৃত বিচারের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, গীতা কর্মত্যাগের শিক্ষা দেয় না, শিক্ষা দেয় কর্মযোগের। আর যোগ মানে যে 'কর্মসু কৌশলং', এ কথা তো স্বয়ং বাসুদেব গোড়াতেই অর্জুনকে বলেছেন। এই ব্যাখ্যাসূত্রে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। নীলকণ্ঠ গীতার ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন এই ক'টি কথা বলে—

প্রণম্য ভগবৎপাদান্‌ শ্রীধরাদীংশ্চ সদ্‌গুরূন্‌
সম্প্রদায়ানুসারেণ গীতাব্যাখ্যাং সমারভে॥

নীলকণ্ঠ অতি সাদা ভাবে স্বকীয় ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যে কথা মুখ ফুটে বলেছেন, গীতার সকল টীকাকারই সে কথা স্পষ্ট করে না বললেও চাপা দিতে পারেন না। সকলেই স্বসম্প্রদায় অনুসারে ও-গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন। যিনি জ্ঞানমার্গের পথিক

১ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতারহস্য। অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। কলিকাতা, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ।

২ মহাভারতের উপরোক্ত শ্লোকের আমি কেবল একটি শব্দ বদলে দিয়েছি, 'দুঃখস্যাস্য' পরিবর্তে 'গ্রন্থস্যাস্য' বসিয়ে দিয়েছি। আশা করি, তাতে অর্থের কোনো ক্ষতি হয় নি।

তিনি গীতাকে জ্ঞানপ্রধান ও যিনি ভক্তিমার্গের পথিক তিনি গীতাকে ভক্তিপ্রধান শাস্ত্র হিসাবেই আবহমান কাল ব্যাখ্যা করে এসেছেন। মহাত্মা তিলক তাঁর ভাষ্যে উক্ত কাব্য অথবা স্মৃতির পঞ্চদশখানি পূর্ব-টীকার যুগপৎ বিচার ও খণ্ডন করেছেন। উক্ত পনেরোখানিই যে স্ব স্ব সম্প্রদায় অনুসারেই রচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মহাত্মা তিলকও স্বসম্প্রদায় অনুসারেই তার নূতন ব্যাখ্যা করেছেন। যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, মহাত্মা তিলক কোন্ সম্প্রদায়ের লোক? তার উত্তর, এ যুগে আমরা সকলেই যে সম্প্রদায়ের লোক, তিনিও সেই একই সম্প্রদায়ের লোক। এ যুগ জ্ঞানের যুগ নয়, বিজ্ঞানের যুগ; ভক্তির যুগ নয়, কর্মের যুগ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে, আমাদের জন্মভূমি হচ্ছে কর্মভূমি। ভারতবর্ষ পৌরাণিক যুগে মানুষের কর্মভূমি ছিল কি না জানি না, কিন্তু ভারতবর্ষের এ যুগ যে ঘোরতর কর্মযুগ, সে বিষয়ে, আশা করি, শিক্ষিত সমাজে দ্বিমত নেই। এতদ্দেশীয় ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক সকলেই, জীবনে না হোক মনে, doctrine of actionএর অতি ভক্ত। সন্ন্যাসী হবার লোভ আমাদের কারো নেই; যদি কারো থাকে তো সে একমাত্র পলিটিকাল সন্ন্যাসী হবার। বলা বাহুল্য যে, পলিটিক্স কর্মকাণ্ডের ব্যাপার, জ্ঞানকাণ্ডের নয়, ভক্তিকাণ্ডেরও নয়। সংসারের প্রতি বিরক্তি নয়, আত্যন্তিক অনুরক্তিই পলিটিক্সের মূল। ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রধান প্রভেদ এই কি নয় যে, সে দেশের লোক 'অজরামরবৎ' বিদ্যা ও অর্থের চর্চা করে, আর আমরা 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা' ধর্মচিন্তা করি। আমার কথা যে সত্য তার টাটকা প্রমাণ, মহাত্মা তিলকের একটি আজীবন পলিটিকাল সহকর্মী লালা লাজপৎ রায় এই সেদিন সকলকে বলে গেলেন যে হিন্দুধর্ম আসলে সন্ন্যাসের ধর্ম নয়, কর্মের ধর্ম; এবং সেইসঙ্গে আমাদের সকলকে কায়মনোবাক্যে কর্মে প্রবৃত্ত করবার জন্য গীতার মাত্র দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করবার আদেশ দিয়ে গেলেন, বোধ হয় এই ভয়ে যে, মনোযোগ সহকারে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা পাঠ করলে আমাদের কর্মপ্রবৃত্তি হয়তো নিস্তেজ হয়ে পড়তে পারে। এ ভয় অমূলক নয়।

৩

ইংরেজের শিষ্য আমরা যেমন কর্মের উপাসক, শ্রীধরের শিষ্য নীলকণ্ঠও তেমনি ভক্তির উপাসক ছিলেন, তথাপি তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে—

ভারতে সর্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্বশাস্ত্রময়ী মতা॥
কর্মোপাস্তিজ্ঞানভেদৈঃ শাস্ত্রং কাণ্ডত্রয়াত্মকম্।
অন্যো তৃপাসনাকাণ্ডাত্তৃতীয়ো নাতিরিচ্যতে॥
তদেব ব্রহ্ম বিদ্ধি ত্বং নেদং যত্তদুপাসতে।
ইতি শ্রুত্যৈব বেদস্য হ্যুপাস্যাদন্যতেরিতা॥
ইয়মষ্টাদশাধ্যায়ী ক্রমাৎ ষটক্ত্রিকেণ হি।
কর্মোপাস্তিজ্ঞানকাণ্ডত্রিতয়াত্মা নিগদ্যতে॥

নীলকণ্ঠের এই সরল কথাই হচ্ছে সত্যকথা। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় যে

কর্মকাণ্ডের, মধ্যের ছয় অধ্যায় যে ভক্তিকাণ্ডের, আর শেষ ছয় অধ্যায় যে জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত, এরকম তিন অংশে সমান ও পরিপাটি ভাগবাটোয়ারার হিসেব আমরা না মানলেও, এ কথা সকলেই মানতে বাধ্য যে, ও-শাস্ত্রে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি তিনই আছে। ও-গ্রন্থ একে তিন, কিন্তু তিনে এক নয়। গীতায় ও ত্রিকাণ্ডের রাসায়নিক যোগের ফলে কোনো একটি নবকাণ্ডের সৃষ্টি হয় নি। এই কারণে গীতার এমন কোনো এক ব্যাখ্যা হতে পারে না, যা চূড়ান্ত হিসেবে সর্বলোকগ্রাহ্য হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে তিনরকম ব্যাখ্যারই সমান অবসর আছে। গীতার অন্তরে নানারূপ ধাতু আছে। কোনো ভাষ্যকারই তাকে ব্যাখ্যার বলে তাঁর মনোমত এক ধাতুতে পরিণত করতে কৃতকার্য হবেন না— তা সে ধাতু জ্ঞানের স্বর্ণই হোক আর কর্মের লৌহই হোক। পূর্বাচার্যেরা প্রধানত গীতাভাষ্যে জ্ঞানভক্তিমার্গই অবলম্বন করেছিলেন; গীতার ধর্ম যে মুখ্যত সন্ন্যাসের ধর্ম নয়, ভগবদ্‌গীতা যে অবধূত-গীতা ও অষ্টাবক্রগীতার জ্যেষ্ঠ সহোদর নয়, এ কথা কিন্তু আজ আমরা জোর করে বলতে পারি।

গীতার মতকে কর্মযোগ বলবার আমাদের অবাধ অধিকার আছে। আর যুগ-ধর্মানুসারে আমরা গীতা নিংড়ে সেই মতই বার করবার চেষ্টা করব। আর, এ প্রবন্ধ মহাত্মা তিলকের তুল্য আর কে করতে পারেন? এ যুগের তিনিই যে হচ্ছেন অদ্বিতীয় কর্মযোগী, এ সত্য আর শিক্ষিত অশিক্ষিত কোন্‌ ভারতবাসীর নিকট অবিদিত? এই গীতাভাষ্যও মহাত্মা তিলকের কর্মযোগের অদ্ভুত ক্রিয়া। জ্ঞানের তরফ থেকে শংকরের ভাষ্য যেমন একমেবাদ্বিতীয়ম্‌, কর্মের তরফ থেকে মহাত্মা তিলকের ভাষ্যও, আমার বিশ্বাস, তেমনি একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ হয়ে থাকবে।

৪

গীতা কর্মমার্গের জ্ঞানমার্গের কি ভক্তিমার্গের শাস্ত্র, এ তর্ক হচ্ছে এ দেশের ও সেকালের। কিন্তু এই গ্রন্থ নিয়ে এ যুগে এক নূতন তর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সে তর্কটা যে কি তা মহাত্মা তিলকের ভাষাতেই বিবৃত করছি—

গ্রন্থ কোথায় রচিত হইয়াছে, কে রচনা করিয়াছে, তাহার ভাষা কিরূপ—কাব্যদৃষ্টিতে তাহাতে কতটা মাধুর্য ও প্রসাদগুণ আছে, গ্রন্থের শব্দরচনা ব্যাকরণশুদ্ধ অথবা তাহাতে কতকগুলি আর্ষপ্রয়োগ আছে, তাহাতে কোন্‌ কোন্‌ মতের স্থলের কিম্বা ব্যক্তির উল্লেখ আছে, এই-সকল ধরিয়া গ্রন্থের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে কি না...

এরূপ আলোচনাকে মহাত্মা তিলক 'বহিরঙ্গ পর্যালোচনা' বলেন। এ আলোচনা আমরা অবশ্য বিলেত থেকে আমদানি করেছি।

পরন্তু, এক্ষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনুকরণে এ দেশের আধুনিক বিদ্বানেরা গীতার বাহ্যাংশেরই বিশেষ অনুশীলন করিতেছেন।

এরূপ আলোচনার প্রতি যাঁরা আসক্ত তাঁদের প্রতি মহাত্মা তিলক যে আসক্ত নন, তার পরিচয় তিনি নিজ মুখেই দিয়েছেন। তিনি বলেন—

বাগ্‌দেবীর রহস্যজ্ঞ ও তাহার বহিরঙ্গ-সেবক, এই উভয়ের ভেদ দর্শন করিয়া মুরারি কবি এক সরস দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

অব্ধির্লঙ্ঘিত এব বানরভটৈঃ কিং ত্বস্য গম্ভীরতাম্।
আপাতালনিমগ্নপীবরতনুর্জানাতি মন্থাচলঃ॥

আর গ্রন্থরহস্য মধ্যে মন্দার পর্বতের মতো আপাতাল-নিমজ্জিত হওয়ারই নাম অন্তরঙ্গ পর্যালোচনা। মুরারি কবির এই সরস উক্তিটি অবশ্য দেশী বিলেতি বহিরঙ্গ-সেবকদের কর্ণে একটু বিরস ঠেকবে। কিন্তু এ বিষয়ে যাঁরা মদমত্ত জর্মান পাণ্ডিত্যের উল্লম্ফন নিরীক্ষণ করেছেন, তাঁদের পক্ষে মুরারি কবির উক্তির পুনরুক্তি করবার লোভ সংবরণ করা কঠিন।

কাব্যের অন্তরঙ্গের সাধনা ও বহিরঙ্গের সেবা এ দুটি ক্রিয়ার ভিতর যে শুধু প্রভেদ আছে তাই নয়, এর একটি প্রযত্ন অপরটির অন্তরায়। কাব্যের ভিতর থেকে ইতিহাস উদ্ধার করতে বসলে দেখা যায় যে, তার কাব্যরস শুকিয়ে এসেছে আর তার ভিতর নিমজ্জিত ঐতিহাসিক উপলখণ্ড সব দন্তবিকাশ করে হেসে উঠেছে। আমাদের মতো কাব্যরসিকরা কাব্যের সমগ্র রূপ দেখেই মোহিত হই, অপর পক্ষে পণ্ডিতরা কাব্যের রস জিনিসটিকে উপেক্ষা করেন, অন্তত জর্মান পণ্ডিতরা কাব্যের সম্মুখীন হবামাত্র তাকে সম্বোধন করে বলেন—

মাইরি রস দূরে বোস্,
দাঁত দেখি তোর বয়েস কতো।

এরই নাম স্কলারশিপ।

তবে এরকম ঐতিহাসিক কৌতূহল যখন মানুষের মনে একবার জেগেছে, তখন কাব্যের ঐ বহিরঙ্গ পর্যালোচনায় যোগ দেবার প্রবৃত্তি দমন করা অসম্ভব, বিশেষত আধুনিক বিদ্বান্ ব্যক্তিদের পক্ষে। অন্যে পরে কা কথা, মহাত্মা তিলকও গীতার বহিরঙ্গ পর্যালোচনার মায়া কাটাতে পারেন নি। তিনি তাঁর গীতাভাষ্যের পরিশিষ্টে অতি বিস্তৃত ভাবেই এই বাহ্যবিচার করেছেন। এতে আমি মোটেই আশ্চর্য হই নি। এই পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শাস্ত্রবিচারের এ দেশে রাজা ছিলেন স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর। আর মহাত্মা তিলক যে-পুরীকে পুণ্যপুনাপুর বলেন, সেই পুরীই হচ্ছে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের রাজধানী এবং সেই পুরীতেই এ দেশের যত বড়ো বড়ো ওরিয়েণ্টালিস্ট অবতীর্ণ হয়েছেন। কর্মযোগে যত-সব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের উল্লেখ আছে সে-সবই মহারাষ্ট্রীয়, একটিও বঙ্গদেশীয় নয়। স্বয়ং মহাত্মা তিলক হচ্ছেন এই বিলেতি-দস্তুর-পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এ বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব এতই অসামান্য যে, পাশ্চাত্য ওরিয়েণ্টালিস্ট সমাজেও তিনি অতি উচ্চ আসন লাভ করেছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বিশেষ করে এই মহা প্রশ্ন তুলেছেন যে, মহাভারতে ভগবদ্‌গীতা প্রক্ষিপ্ত কি না। মহাত্মা তিলক এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে—

যে ব্যক্তি বর্তমান মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন তিনিই বর্তমান গীতাও বিবৃত করিয়াছেন।

এ সিদ্ধান্তে তিনি অবশ্য উপনীত হয়েছেন বাহ্যপ্রমাণের বলে। কেননা তিনি এ কথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে—

যাঁহারা বাহ্যপ্রমাণকে মানেন না এবং নিজেরই সংশয়পিশাচকে অগ্রস্থান দেন, তাঁহাদের বিচারপদ্ধতি নিতান্ত অশাস্ত্রীয় সুতরাং অগ্রাহ্য।

মহাত্মা তিলকের মতে—

গীতাগ্রন্থ ব্রহ্মজ্ঞানমূলক, এই ধারণা হইতেই এই সন্দেহ তো প্রথমে বাহির হয়।

আমি অবশ্য আচার্যের শিষ্য নই অর্থাৎ শংকরপন্থী বৈদান্তিক নই, এমন-কি, শংকরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলতেও আমার তিলমাত্র দ্বিধা নেই। তবুও মহাত্মা তিলকের সংগৃহীত বাহ্যপ্রমাণ আমার মনের সন্দেহ-পিশাচকে একেবারে বধ করতে পারে নি। এর প্রকৃত কারণ তিনিই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সন্দেহ নিরঙ্কুশ। আমি অবিদ্বান্, কিন্তু 'এতদ্দেশীয়' ও আধুনিক। অতএব আমার মনেও অনেক বিষয়ে সন্দেহ আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। মনোজগতে 'আধুনিক' ও 'সংশয়গ্রস্ত' এ দুটি কথা পর্যায়শব্দ। যাঁর মনে কোনোরূপ সংশয় নেই তাঁর একালে জন্ম আসলে অকালে জন্ম; কারণ দেহে তিনি একেলে হলেও, মনে সেকেলে। এ প্রবন্ধে আমার সেই সন্দেহই আমি ব্যক্ত করতে চাই। পণ্ডিতের বিচারে অবশ্য যোগদান করবার অধিকার আমার নেই, কেননা পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রস্থানভূমি 'সন্দেহ' হলেও নিঃসন্দিগ্ধ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই হচ্ছে তাঁদের গম্যস্থান। আর তাঁরা অবলীলাক্রমেই সেখানে পৌঁছে যান। অপর পক্ষে আমি মহাভারতের নানা দেশ পর্যটন করে অবশেষে কোনো মানসিক রাজপুতনায় উপনীত হতে পারি নি। কারণ মহাভারতের ভিতর আমার পর্যটন শুধু 'ভ্রমণ কারণ'। সুতরাং আমি অপণ্ডিত ও কাব্যরসিক বাঙালি হিসেবেই এ বিষয়ে একটু উচ্চবাচ্য করতে চাই।

৫

আমাদের শাস্ত্র সম্বন্ধে এই 'প্রক্ষিপ্ত' কথাটা চল করেছেন ইউরোপীয় পণ্ডিতরা। এর একটি স্পষ্ট কারণ আছে। আঁদ্রে জিদ নামক জনৈক বিখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির উপর একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি আরম্ভেই বলেছেন যে, গীতাঞ্জলির তনুতা দেখেই তিনি পুলকিত হয়েছিলেন। কারণ তাঁর ভয় ছিল যে, যে দেশের মহাকাব্যের শ্লোক-সংখ্যা হচ্ছে শত সহস্র, সে দেশের গীতিকাব্যের শ্লোক-সংখ্যা হবে অন্তত এক সহস্র। আঁদ্রে জিদ সংস্কৃত জানেন না, যদি জানতেন তো তিনি মহাভারতের গোড়াতেই দেখতে পেতেন যে, লোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবা বলেছেন যে, বর্তমান মহাভারত হচ্ছে মূল মহাভারতের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—

বিস্তীর্যৈতন্মহজ্‌জ্ঞানমৃষিঃ সংক্ষিপ্য চাব্রবীৎ।

লোমহর্ষণ-পুত্রের এ কথা শুনলে জিদ সাহেবের যে শুধু লোমহর্ষণ হত তাই নয়, তিনি হয়তো মূর্ছিত হয়ে পড়তেন।

ইউরোপীয়েরা হোমারের ইলিয়াডের পরিমাণকেই মহাকাব্যের স্ট্যাণ্ডার্ড মাপ ধরে নিয়েছেন। কিন্তু গ্রীস নামক ক্ষুদ্র দেশের পরিমাণের সঙ্গে ভারতবর্ষ নামক

মহাদেশের পরিমাণের তুলনা করলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন, কেন ইলিয়াডের মাপের সঙ্গে মহাভারতের মাপ মেলে না ও মিলতে পারে না। কিন্তু ভৌগোলিক হিসেব অনুসারেই যে কাব্যের দেহ সংকুচিত ও প্রসারিত হতে হবে, এ কথা তাঁরা মানতে প্রস্তুত নন। তাঁরা বলেন, মানচিত্রের সঙ্গে মন-চিত্রের কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। অতএব মহাভারত যখন কাব্য, তখন নৈসর্গিক নিয়মে তা এতাদৃশ মহাকায় হতে পারে না। কাব্যের কথা ছেড়ে দিলেও কাব্যরচয়িতা কবির তো দম বলে একটা জিনিস আছে। কোনো কবি এক দমে মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের পাল্লা ছুটতে পারতেন না। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, মহাভারতের মধ্যে অধিকাংশ শ্লোকই প্রক্ষিপ্ত। এর উত্তর হচ্ছে, ইউরোপীয় পণ্ডিতরা ঐ কাব্য-নামেই ভুলেছেন। মহাভারত কাব্য নয়, মহাভারত হচ্ছে একটি এনসাইক্লোপিডিয়া; সুতরাং এক লক্ষ শ্লোকের অর্থাৎ দু লক্ষ ছত্রের বিশ্বকোষকে সংক্ষিপ্ত বললে আঁদ্রে জিদও কোনো আপত্তি করতে পারবেন না। এ গ্রন্থের নাম সংহিতা না হয়ে কাব্য কি করে হল, তার পরিচয় মহাভারতেই আছে। বেদব্যাসের মনে যখন এ গ্রন্থ জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি ব্রহ্মাকে বলেন যে, আমি মনে মনে একখানি কাব্য রচনা করেছি। সে কাব্যে কি কি জিনিস থাকবে, বেদব্যাসের মুখে তার ফর্দ শুনে স্বয়ং ব্রহ্মাও একটু চমকে ওঠেন ও থমকে যান; তার পর তিনি সসম্ভ্রমে বলেন যে, হে বেদব্যাস, তুমি যখন ও-গ্রন্থকে কাব্য বলতে চাও, তখন ওর নাম কাব্যই হবে, কেননা তুমি কখনো মিথ্যা কথা বল না। এর থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান মহাভারতকে কাব্য বলা যায় কি না, সে বিষয়ে স্বয়ং ব্রহ্মারও সন্দেহ ছিল। কিন্তু তিনি যে ও-গ্রন্থকে অবশেষে কাব্য বলতে স্বীকৃত হয়েছিলেন, তার কারণ মহাভারত একাধারে কাব্য আর এনসাইক্লোপিডিয়া; এবং এই দুই বস্তু একই গ্রন্থের অন্তর্ভূত হলেও মিলেমিশে একদম একাকার হয়ে যায় নি, মোটামুটি হিসেবে উভয়েই চিরকাল নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে আসছে। মহাভারতের যে অংশ আমাদের মতো অবিদ্বান্ লোকেরা পড়ে এবং উপভোগ করে সেই অংশ তার কাব্যাংশ; আর যে অংশ বিদ্বান্ লোকেরা কষ্টভোগ করে পর্যালোচনা করেন, সেই অংশই তার এনসাইক্লোপিডিয়ার অংশ। এ বিষয়ে বোধ হয় অপণ্ডিত মহলে কোনো মতভেদ নেই।

মহাভারতের এই যুগলরূপের প্রহেলিকাই হচ্ছে ইউরোপীয় পাণ্ডিত্যের শান্তিভঙ্গের মূল কারণ। এ হেঁয়ালির যাহোক-একটা হেস্তনেস্ত না করতে পারলে পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁদের পণ্ডিতি মনের শান্তি ফিরে পাবেন না। এর জন্য তাঁরা সকলে মিলে পাণ্ডিত্যের দাবাখেলা খেলতে শুরু করেছেন। এ খেলায় সকলেই সকলকে মাৎ করতে চান। আমি সে খেলার দর্শক হিসেবে দুটি-একটি উপর-চাল দিচ্ছি। সে চাল নেওয়া না-নেওয়া নির্ভর করছে খেলোয়াড়দের উপর। একটু চোখ চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন যে, পণ্ডিতের দল ভারতবর্ষের অতীতকে প্রায় বেদখল করে নিয়েছে। বেদ এখন ফিললজির, ইতিহাস নিউমিস্‌ম্যাটিক্সের এবং আর্ট আর্‌কিঅলজির অন্তর্ভূত হয়ে পড়েছে—অর্থাৎ একাধারে বিজ্ঞানের ও ইংরেজির। এ অবস্থায় মহাভারত যাতে বাংলা সাহিত্যের হাতছাড়া না হয়ে যায়,

সে চেষ্টা আমাদের করা আবশ্যক। তার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিচারের হট্টগোলে যোগ দেওয়া। হেঁয়ালি সম্বন্ধে বাংলায় একটা কথা আছে যে—

মূর্খেতে বুঝিতে পারে, পণ্ডিতের লাগে ধন্ধ।

এই প্রবচনের উপর ভরসা রেখে এ হেঁয়ালির উত্তর দিতে চেষ্টা করছি।

৬

বলা বাহুল্য যে, কাব্য আর এনসাইক্লোপিডিয়া এক বৃন্তের দুটি ফুল নয়। কাব্য মানুষের অন্তর হতে আবির্ভূত হয়, আর এনসাইক্লোপিডিয়া বাহির থেকে সংগৃহীত। সুতরাং এ উভয়েই যে এক স্থানে ও এক ক্ষণে জন্মলাভ করেছে, এ কথা অবিশ্বাস্য। সুতরাং আমাদের ধরে নিতেই হবে যে, এ দুই পৃথক্ বস্তু; গোড়ায় পৃথক্ ছিল, পরে কালবশে জড়িয়ে গিয়েছে। তার পর প্রশ্ন ওঠে এই যে, কাব্যের স্কন্ধে এনসাইক্লোপিডিয়া ভর করেছে, না, এনসাইক্লোপিডিয়ার অন্তরে কাব্য কোনো ফাঁকে ঢুকে গেছে। এখন এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভয়ে দেওয়া যেতে পারে। বিশ্ব অবশ্য কাব্যের পূর্বে সৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু বিশ্বকোষ কাব্যের অনেক পরে নির্মিত হয়েছে। এ গ্রন্থের কথার বয়স ওর বক্তৃতার বয়সের চাইতে ঢের বেশি; অর্থাৎ ও-গ্রন্থের সার ওর ভারের চাইতে অনেক প্রাচীন। আর ভাগ্যিস ও-সারটুকু তার উপর চাপানো ভারের ভরে মারা যায় নি, তাই ও-কাব্য আজও বজায় আছে। ও-গ্রন্থের কাব্যাংশ অর্থাৎ সারাংশ যদি বিশ্বকোষের চাপে পিষে যেত, তা হলে মহাভারত হত অর্ধেক বৃহৎসংহিতা আর অর্ধেক বৃহৎকথা; অর্থাৎ তা সকলের পাঠ্য হত না, পাঠ্য হত এক দিকে বৃদ্ধের, অপর দিকে বালকের। এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে পণ্ডিতমণ্ডলী প্রায় একমত। তাঁরা নানা শাস্ত্র ঘেঁটে এই সত্য আবিষ্কার করেছেন যে, মূলে এ কাব্যের নাম ছিল ভারত, তার পরে তার নাম হয়েছে মহাভারত। এ সত্য উদ্ধারের জন্য, আমার বিশ্বাস, নানা শাস্ত্র অনুসন্ধান করবার প্রয়োজন ছিল না। বর্তমান মহাভারতেই ও-দুটি নামই পাওয়া যায়। আর ভারত যে মহাভারত হয়ে উঠেছে তার মহত্ত্ব ও গুরুত্বের গুণে, অর্থাৎ তার পরিমাণ ও ওজনের জন্যে, এ কথা আদিপর্বেই লেখা আছে।

অতঃপর দেখা গেল যে, মহাভারতের পূর্বে ভারত নামক একখানি কাব্য ছিল। মহাভারত আছে, কিন্তু ভারত নেই। অতএব এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভারত গেল কোথায়? সে গ্রন্থ লুপ্ত হয়েছে, না, গুপ্ত হয়েছে? এ প্রশ্নের একটা সোজা উত্তর পেলেই আমরা বর্তমান মহাভারতের কোন্ অংশ তার অপরিমিত মহত্ত্ব ও গুরুত্বের কারণ, তা অনুমান করতে পারব। মহাত্মা তিলক এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, তা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তাঁর বক্তব্য এই যে—

সরল শব্দার্থে 'মহাভারত' অর্থে 'বড় ভারত' হয়।...বর্তমান মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, উপাখ্যানসমূহের অতিরিক্ত মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা চব্বিশ হাজার, এবং পরে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, প্রথমে উহার নাম 'জয়' ছিল। 'জয়' শব্দে ভারতীয় যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় বিবক্ষিত বলিয়া বিবেচিত হয়; এবং এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে,

ইহাই প্রতীত হয় যে, ভারতীয় যুদ্ধের বর্ণনা প্রথমে 'জয়' নামক গ্রন্থে করা হইয়াছিল, পরে সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যেই অনেক উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়া উহাই ইতিহাস ও ধর্মাধর্মবিচারেরও নির্ণয়কারী এই এক বড় মহাভারতে পরিণত হইয়াছে।

অর্থাৎ জয় ওরফে ভারত-কাব্য লুপ্ত হয় নি, মহাভারতের অন্তরেই তা গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তাই যদি হয় তা হলে মহাভারতের মহত্ত্ব ও গুরুত্বের চাপের ভিতর থেকে জয়ের ক্ষুদ্র দেহ উদ্ধার করা অসম্ভব। ভারত যে লুপ্ত হয় নি, এ বিষয়ে আমি মহাত্মা তিলকের মত শিরোধার্য করি, কারণ সে কাব্যের লুপ্ত হবার কোনো কারণ নেই। সেকালে ছাপাখানা ছিল না, সব গ্রন্থই হাতে লিখতে হত, সুতরাং উপযুক্ত লেখকের অভাবে বড়ো ভারতেরই লুপ্ত হবার কথা, ছোটো ভারতের নয়। সেকালে একটানা শত-সহস্র শ্লোক লেখবার লোক যে কতদূর দুষ্প্রাপ্য ছিল তার প্রমাণ, স্বয়ং ব্রহ্মাও বেদব্যাসের মনঃকল্পিত গ্রন্থ লেখবার ভার গণেশের উপর দিয়েছিলেন। দেশে লেখবার মানুষ পাওয়া গেলে আর হিমালয় থেকে লম্বোদর দেবতাকে টেনে আনতে হত না। ভগবান গজাননও যে ইচ্ছাসুখে এই বিরাট গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করতে রাজি হন নি, তার প্রমাণ তিনি লেখা ছেড়ে পালাবার এক ফন্দি বার করেছিলেন। তিনি ব্যাসদেবকে বলেন যে, আমি বৃথা সময় নষ্ট করতে পারব না। আপনি যদি গড়গড় করে শ্লোক আবৃত্তি করে যান, তা হলে আমি ফস্‌ফস্‌ করে লিখে যাব। আর আপনি যদি একবার মুখ বন্ধ করেন তো আমি একেবারে কলম বন্ধ করব। বেদব্যাস কি চালাকি করে হাঁপ ছেড়ে জিরিয়েছিলেন অথচ হেরম্বকে দিয়ে আগাগোড়া মহাভারত লিখিয়ে নিয়েছিলেন, সে কথা তো সবাই জানে। গণেশকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেবার জন্য তিনি অষ্টসহস্র অষ্টশত শ্লোক রচনা করেন, যার অর্থ তিনি বুঝতেন আর শুকদেব বুঝতেন, আর সঞ্জয় হয়তো বুঝতেন, হয়তো বুঝতেন না; সেই ৮৮০০ শ্লোক যদি কেউ মহাভারত থেকে বেছে ফেলতে পারেন, তা হলে তিনি আমাদের মহা উপকার করবেন। তবে জর্মান পণ্ডিত ছাড়া এ কাঁটা বাছবার কাজে আর কেউ হাত দেবেন না।

তার পর, বড়ো বই লেখাও যেমন শক্ত, পড়াও তেমনি শক্ত। এমন-কি, সেকালের পণ্ডিত লোকেও বড়ো বই ভালোবাসতেন না। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জর্মান পণ্ডিত-দের মতো হাজার হাজার পাতা বই গেলা এতদ্দেশীয়দের পক্ষে অসম্ভব। এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদের বিরাট গ্রন্থ যে ইষ্ট ছিল না, সে কথা মহাভারতেই আছে—

ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্‌।

সুতরাং লেখার হিসেব থেকে হোক আর পড়ার হিসেব থেকেই হোক, দু হিসেব থেকেই আমরা মানতে বাধ্য যে, ভারত লুপ্ত হয় নি, ও-কাব্য মহাভারতের অন্তরে সেই ভাবে অবস্থিতি করছে, যে ভাবে শকুন্তলার আংটি মাছের পেটে অবস্থিতি করেছিল।

আমরা যদি মহাভারতের ভিতর থেকে ভারতকে টেনে বার করতে পারি তা হলে ভারতের অন্তরে ও অঙ্গে কোন্‌ কোন্‌ উপাখ্যান ইতিহাস দর্শন ও ধর্মাধর্মের বিচার প্রক্ষিপ্ত ও নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তার একটা মোটামুটি হিসেব পাই। আর যদি ধরে নিই যে, মহাভারতের অতিরিক্ত মালমসলা সব ঐ ভারত-কাব্যের ভিতর

interpolated হয়েছে, তা হলে অবশ্য ঐ শ্লোকস্তূপের ভিতরে ভারতের সন্ধান আমরা পাব না। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি গ্রীক দেবতা হার্কিউলিসের মতো ওরকম পঙ্কোদ্ধার করতে প্রবৃত্ত হবেন। অপর পক্ষে গ্রীক বীর অ্যালেক-জান্ডারের মতো এই জটিল গ্রন্থের Gordian Knot যদি আমরা দ্বিখণ্ড করতে পারি, তা হলে হয়তো মহাভারত থেকে ভারতকে পৃথক্ করে নিতেও পারি।

৭

ইন্টারপোলেশনের দৌলতেই ভারত যে মহাভারতে পরিণত হয়েছে, সে বিষয়ে দেশী বিলেতি সকল আধুনিক পণ্ডিত একমত।

কিন্তু এই ইন্টারপোলেশন, ভাষান্তরে 'প্রক্ষিপ্ত', কথাটা তাঁরা যে কি অর্থে ব্যবহার করেন, সেটা যথেষ্ট স্পষ্ট নয়।

যদি তাঁদের মত এই হয় যে, যেমন মোরগের পেটে চাল পুরে দিয়ে একাধারে কাবাব ও পোলাও বানানো হয়, তেমনি ভারতের অন্তরে নানা বস্তু নানা যুগে পুরে দিয়ে তার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সাধন করা হয়েছে, তা হলে সে মত আমি সন্তুষ্ট মনে গ্রাহ্য করতে পারি নে।

আমার বিশ্বাস, বর্তমান মহাভারতের কতক অংশ ভারতের ভিতর পুরে দেওয়া হয়েছে, এবং অনেক অংশ তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রক্ষিপ্ত অংশের বিচার এখন স্থগিত রেখে যদি আমরা তার সংযোজিত অংশকে ভারতকাব্য থেকে বিযুক্ত করতে পারি, তা হলে আমাদের সমস্যা অনেক সরল হয়ে আসে।

আমরা যদি সাহস করে এক কোপে মহাভারতকে দ্বিখণ্ড করে ফেলতে পারি, তা হলে, আমার বিশ্বাস, ভারতকে মহাভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি। বর্তমান মহাভারতের নয় পর্ব হচ্ছে প্রাচীন ভারত আর তার বাদবাকি নয় পর্ব হচ্ছে অর্বাচীন মহাভারত— এই হিসেবটাই হচ্ছে গণিতের হিসেবে সোজা; অতএব অপণ্ডিতদের কাছে গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

প্রথম নয় পর্বের ভিতর অবশ্য অনেক প্রক্ষিপ্ত বিষয় আছে, যা পূর্বে ভারত-কাব্যের অঙ্গস্বরূপ ছিল না; কিন্তু শেষ নয় পর্বের ভিতর সম্ভবত এমন একটি কথাও নেই, যা পূর্বে ভারতকাব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সংক্ষেপে দুইখানি বই একসঙ্গে জুড়ে মহাভারত তৈরি করা হয়েছে। এ দুইখানি গ্রন্থকে পূর্বভারত ও উত্তরভারত আখ্যা দেওয়া চলে। সকলেই জানেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে এরকম কাব্য আরো অনেক আছে। কাদম্বরী কুমারসম্ভব মেঘদূত প্রভৃতির এইরকম দুটি স্পষ্ট ভাগ আছে। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ অবশ্য একই হাতের লেখা এবং একই কাব্যের বিভিন্ন অঙ্গ। কাদম্বরীর পূর্বভাগ বাণ-ভট্টের রচনা, আর উত্তরভাগ তাঁর পুত্রের। কুমারসম্ভবের পূর্বভাগ কালিদাসের রচনা, আর উত্তরভাগ, আর যারই লেখা হোক, কালিদাসের লেখা নয়। এমন-কি রামায়ণের উত্তরকাণ্ড যে বাল্মীকির লেখনীপ্রসূত নয় সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

৮

মহাভারতকে এরকম দ্বিধাবিভক্ত করা নেহাত গোঁয়ারতুমি নয়। সত্যসত্যই দুটি আধখানিকে গ্রথিত করে মহাভারত নামে একখানি গ্রন্থ করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ চিরকালই রয়ে যাবে, কেননা মহাভারত সংক্রান্ত বড়ো বড়ো আবিষ্কার সম্বন্ধে সমান সন্দেহ রয়ে গেছে। একটি দৃষ্টান্ত দিই। ডালমান Dahlmann নামক জনৈক ধনুর্ধর জর্মান পণ্ডিত আজীবন গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মহাভারত খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হয়েছে। অপর পক্ষে? হোল্‌ৎস্‌মান Holtzmann নামক অপর-একটি সমান ধনুর্ধর জর্মান পণ্ডিত আজীবন গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মহাভারত খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই উভয় আবিষ্কারই যুগপৎ সমান সত্য হতে পারে না। ফলে এর একটিও সত্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ লোকের মনে থেকেই যায়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও জর্মান পণ্ডিতদের প্রতি ভক্তি কারো কমে নি। বিদ্বান্ ব্যক্তিদের পদানুসরণ করেই আমি আমার মত ব্যক্ত করছি। সে মত যাঁর খুশি গ্রাহ্য করতে পারেন, যাঁর খুশি অগ্রাহ্য করতে পারেন; শুধু আমার মতকে সম্পূর্ণ গাঁজাখুরি মনে করবেন না। আমার মত আমি শূন্যে খাড়া করি নি। এ সত্যের মূল মহাভারতের ভিতরেই আছে। আপনাদের পূর্বে বলেছি যে, পুরাকালে ভারত-কাব্যের অপর নাম ছিল জয়-কাব্য; অর্থাৎ এ কাব্যে ছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও যুদ্ধজয়ের কথা; সুতরাং যুদ্ধজয়ের পরবর্তী কোনো বিষয়ের বর্ণনা বা আলোচনা এতে ছিল না। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন যে, মহাভারত হচ্ছে যুদ্ধপ্রধান গ্রন্থ, এবং ও-কাব্যের প্রধান বিষয় যা, তা শেষ হয়েছে সৌপ্তিকপর্বে। এ কথা যে সত্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। যুদ্ধ করবার লোক না থাকলে আর যুদ্ধ করা যায় না। আর সৌপ্তিকপর্বের শেষে দেখতে পাই যে, অশ্বত্থামা মুমূর্ষু দুর্যোধনকে বলেছেন যে, উভয় পক্ষের সকল যোদ্ধা নিহত হয়েছে; অবশিষ্ট আছে শুধু কৌরব পক্ষের তিনজন— কৃপাচার্য কৃতবর্মা ও স্বয়ং অশ্বত্থামা। অপর পক্ষে পাণ্ডবদের ভিতর অবশিষ্ট আছে সাতজন, পঞ্চপাণ্ডব সাত্যকি ও কৃষ্ণ। এ কথা বলেই অশ্বত্থামা চলে গেলেন মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের আশ্রমে, কৃতবর্মা স্বরাষ্ট্রে ও কৃপাচার্য হস্তিনাপুরে। এইখানেই ভারত-নাটকের যবনিকাপতন হয়েছে। এর পর মহাভারতে যা আছে সে হচ্ছে যুদ্ধের নয়, শান্তির কথা। বর্তমান মহাভারত অবশ্য এ দেশের ওঅর অ্যান্ড পীস্ নামক মহাকাব্য। কিন্তু মূল ভারত ছিল ইলিঅডের মতো শুধু যুদ্ধকাব্য। কাব্যকে আমরা ফুল বলি। এ হিসেবে সৌপ্তিকপর্বকেই আমরা ভারত-কাব্যের শেষ পর্ব বলে স্বীকার করতে বাধ্য। আদিপর্বে আছে যে, মহাভারত নামক মহাবৃক্ষের সৌপ্তিকপর্ব হচ্ছে প্রসূন, আর শান্তিপর্ব মহাফল। ফুল যখন ফলে পরিণত হয়, তখনই তা কাব্যের বহির্ভূত হয়ে পড়ে। আমার এ অনুমান যদি সত্য হয়, তা হলে এই উত্তরভারতে কোন্ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত আর কোন্ শ্লোক নয়, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই, কারণ ও-গ্রন্থ আগাগোড়াই প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত অংশের

সন্ধান করতে হবে পূর্বভারতে। এতে এই খোঁজাখুঁজির কাজটা অর্ধেক কম হয়ে আসে কি না?

৯

সৌপ্তিকপর্ব ভারত-কাব্যের অন্তর্ভূত স্বীকার করলে আমার কল্পিত বিভাগ দুটি ঠিক সমান হয় না। কারণ সৌপ্তিকপর্ব হচ্ছে বর্তমান মহাভারতের দশম পর্ব। কিন্তু আসলে আমার হিসেবে ভুল হয় নি। মহাভারতের একটি পর্ব যা পূর্বভাগে স্থান পেয়েছে, তা আসলে উত্তরভাগের জিনিস। আদিপর্ব হচ্ছে মহাভারতের অন্তপর্ব। ও-পর্বের প্রথম অধ্যায় হচ্ছে আমরা যাকে বলি Preface, দ্বিতীয় অধ্যায় Table of Contents এবং তার পরবর্তী কথা-প্রবেশপর্ব হচ্ছে Introduction। এখন এ কথা কে না জানে যে, মুখপত্র সূচি ও ভূমিকা বইয়ের গোড়াতে ছাপা হলেও লেখা হয় সবশেষে। আমার মত যে সত্য, তার প্রমাণ 'আদি' শব্দের ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ স্পষ্ট বলেছেন—

আদিত্বঞ্চাস্য ন প্রাথম্যাৎ।

তিনি অবশ্য এর পরে একটা কথা জুড়ে দিয়েছেন, যথা—

কিন্তু সর্বেষামাদিরুৎপত্তিরিহ কীর্ত্যতে ইতি।

কোনো কাব্যের গোড়াতেই কবি কখনো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি কীর্তন করেন না। এই বিশ্বসৃষ্টির বিবরণ ভারত-কাব্যের বিষয় নয়, ভারত বিশ্বকোষের অঙ্গ।

মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বকে দুটি সমান ভাগে বিভক্ত করবার আর-একটি মুশকিল আছে। ভারত-কাব্য সৌপ্তিকপর্বে শেষ করলে ও-কাব্যের ভিতর থেকে স্ত্রীপর্ব বাদ পড়ে। কিন্তু ও-পর্বকে ভারতের কাব্যাংশ থেকে আমি কিছুতেই বহিষ্কৃত করতে পারি নে। গান্ধারীর বিলাপ না থাকলে ভারত-কাব্যের অঙ্গহানি হয়। অপর পক্ষে ও-বিলাপকে আমি কিছুতেই উত্তরভারতের অন্তর্ভূত করতে পারি নে। এপিকের সুর যার কানে লেগেছে সে ব্যক্তি কখনোই স্ত্রীপর্বকে এনসাইক্লোপিডিয়ার অঙ্গ বলে স্বীকার করতে পারে না। এর প্রমাণস্বরূপ আমি গান্ধারীর মুখের একটি শ্লোক উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি। শ্মশানে পরিণত যুদ্ধক্ষেত্রে দুঃখের চরম দশায় উপনীত গান্ধারী যখন শ্রীকৃষ্ণকে বিগতেশ্বর কুরুকুলাঙ্গনাদের একে একে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন তিনি নিজের কন্যা দুঃশলাকে দেখিয়ে বলেন—

হা হা ধিগ্‌দুঃশলাং পশ্য বীতশোকভয়ামিব।
শিরোভর্তুরনাসাদ্য ধাবমানামিতস্ততঃ॥

যাঁরা শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্ব লিখেছেন, তাঁরা শতসহস্র শ্লোক লিখলেও এর তুল্য একটি শ্লোক লিখতে পারেন না। এর প্রতি কথার ভিতর থেকে মহাকবির হাত ফুটে বেরচ্ছে। ভারত-কাব্যের ভিতর যদি স্ত্রীপর্বকে স্থান দেওয়া যায়, তা হলে সেখান থেকে আর-একটি পর্বকে স্থানচ্যুত করতে হয়। আমি বনপর্বকে পূর্বভারত থেকে বহিষ্কৃত করতে প্রস্তুত আছি। ও-পর্বের যে পনেরো-আনা-

তিন-পাই প্রক্ষি[illegible], মায় তিলক, একমত। সেই এক পাই আমি বিরাটপর্বে[illegible] করে, বাদবাকি অংশটি উপাখ্যানপর্ব নামে উত্তরভারতে স্থান দিতে চাই। আর তাতে যদি কারো আপত্তি থাকে তা হলে বলি, পূর্বভারত দশ পর্ব, আর উত্তরভারত অষ্ট পর্ব।

১০

আমি জনৈক বন্ধুর মুখে শুনলুম যে, শান্তিপর্ব থেকে শুরু করে স্বর্গারোহণপর্ব পর্যন্ত অষ্টপর্ব যে মহাভারতের অন্তরে পাইকেরি হিসেবে প্রক্ষিপ্ত, এ কথা নাকি সবাই জানে। যদি তাই হয় তো আমার এ গবেষণার ফল হচ্ছে পণ্ডিতের তেলা মাথায় তেল ঢালা। কিন্তু আমার এই গবেষণা যে বৃথা হয় নি, তার প্রমাণ, মহাত্মা তিলক এ সত্য হয় জানতেন না, নয় মানতেন না। আর পাণ্ডিত্যের হিসেবে তিনি কোনো জর্মান পণ্ডিতের চাইতে কম ছিলেন না। তিনি বলেছেন যে, বর্তমান মহাভারত এক হাতের লেখা। বর্তমান মহাভারত যে এক হাতের লেখা নয়, এবং এক সময়ের লেখা নয়, তাই প্রমাণ করবার জন্য আমি এই অনধিকারচর্চা করতে বাধ্য হয়েছি।

আমার আসল জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, গীতা মহাভারতের ভিতর প্রক্ষিপ্ত কি না। বর্তমান মহাভারতের শেষ আট পর্ব ছেঁটে দিলেও এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না, কেননা গীতা পূর্বভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্ভূত, উত্তরভারতের নয়। সুতরাং যে সমস্যার মীমাংসা করতে হবে সে হচ্ছে এই যে, গীতা ভারত-কাব্যের অঙ্গ, না, তার অঙ্গস্থ পরগাছা? গীতাকাব্যের রূপ দেখেই আমরা ধরে নিতে পারি নে যে, ও ফুল ভারত-কাব্যের অন্তর থেকে ফুটে উঠেছে। অর্কিডের ফুলও চমৎকার, কিন্তু তার মূল ঝোলে আকাশে।

উক্ত বিচার আমার সময়ান্তরে করবার ইচ্ছা আছে। এ স্থলে শুধু একটা কথা বলে রাখি। আদিপর্বে ভীষ্মপর্বকে বিচিত্রপর্ব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্বের এই বৈচিত্র্যের কারণ, এতে যুদ্ধপ্রসঙ্গ ব্যতীত হরেকরকমের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ আছে। ভীষ্মপর্ব এক হাতের লেখা নয়। এ-সব প্রসঙ্গের বেশির ভাগই প্রক্ষিপ্ত এবং গীতাও তাই কি না, সেইটিই বিচার্য।

কার্তিক ১৩৩৪

চিত্রাঙ্গদা

িস কলেজ রবীন্দ্রপরিষদে পঠিত

রবীন্দ্রপরিষদের পক্ষ শ্রীমান সোমনাথ মৈত্র আমাকে আপনাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সম্বন্ধে চার কথা বলবার জন্য বহুবার অনুরোধ করেছেন। তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে আমি সদাই প্রস্তুত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি বরাবরই ইতস্তত করেছি। কারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সমালোচনা করতে আমি ভয় পাই।

এ বিষয়ে যখনই কিছু বলবার প্রবৃত্তি মনে জেগে ওঠে, তখনই এ প্রশ্নও আমার মনে উদয় হয় যে, কাব্য সমালোচনা করবার সার্থকতা কি? আমি জানি যে, সমালোচনা জিনিসটে সাহিত্যজগতের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। বরং আমাদের স্কুলকলেজে কবির চাইতে সমালোচকেরই প্রাধান্য বেশি। প্রসিদ্ধ ফরাসি দার্শনিক তেইন্-এর ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস আমরা অনেকেই পড়েছি। কেননা ইংরেজি সাহিত্যের এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য সে বই আমরা অধ্যয়ন করতে ও যথাসাধ্য কণ্ঠস্থ করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু উক্ত বিপুল সাহিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎপরিচয় আমাদের ক'জনের আছে? এ ক্ষেত্রে সমালোচনা কাব্যের রসাস্বাদ করবার পক্ষে একটি অন্তরায় মাত্র। কোনো বিশেষ ভাষার সমগ্র কাব্যের ইতিহাসের কথা ছেড়ে দিলেও একটি বিশেষ কবির কাব্যের রসাস্বাদ করবার পক্ষেও তার উক্তরূপ সমালোচনা তেমন অনুকূল নয়। গেরিফিনুস্ Gervinus অথবা Dowden ডাউডেনের সমালোচনা পড়ে ক'জন পাঠক শেক্‌সপীয়ারের কাব্যের রসগ্রাহী হয়েছেন? আমরা যখন তেইন্ পড়ি অথবা গেরিফিনুস্ পড়ি, তখন আসলে সমাজ ও সংসার সম্বন্ধে তাঁদের ফিলসফিই পড়ি। এ জাতীয় ঐতিহাসিক দার্শনিক সমালোচনার গলদ এই যে, কাব্যের আত্মা দেশকালের মধ্যে আবদ্ধ নয়, আর কাব্যরসিক মাত্রই জানে যে, কাব্য হচ্ছে ফিলসফির বহির্ভূত, কারণ মানবাত্মার যে মূর্তির সাক্ষাৎ কাব্যে পাওয়া যায়, তার সাক্ষাৎ দর্শনে মেলে না।

২

আমার কথা ভুল বুঝবেন না। আমি এ কথা বলতে চাই নে যে, কবি ফিলসফার হতে পারে না, আর ফিলসফার কবি হতে পারে না। পৃথিবীতে এমন কবিও আছেন যাঁকে লোকে মহাদার্শনিক মনে করে, অপর পক্ষে এমন দার্শনিক আছেন যাঁকে লোকে মহাকবি মনে করে। প্লেটোর দর্শন তো কাব্য বলে ইউরোপে বহুকাল থেকে গণ্য হয়েছে। এমন-কি, স্পিনোজার এথিক্‌স, জিয়োমেট্রির

পদ্ধতিতে লেখা হলেও তা অনেকের কাছে একখানি মহাকাব্য। অপর পক্ষে শেলি শেক্‌সপীয়ারের ফিলসফি নিয়ে ইংলণ্ডে কত-না আলোচনা হয়েছে। এমন-কি, ফিলসফি অব্‌ রবীন্দ্রনাথ নামক একখানি গ্রন্থ আছে। অপর পক্ষে উপনিষদ্‌, কাব্য কি দর্শন, তা মনীষিবৃন্দ আজও ঠিক করতে পারেন নি। কবির সঙ্গে দার্শনিকের প্রভেদ কোথায়, intuitionএর সঙ্গে conceptএর প্রভেদ কি সে তর্ক আজ তুলতে চাই নে, কেননা সে আলোচনা হবে আগাগোড়া দার্শনিক, অতএব অপ্রাসঙ্গিক। উপরন্তু আমার পক্ষে সে চর্চা নিতান্তই অনধিকারচর্চা।

আমি শুধু এই সত্যটি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কাব্যসমালোচক মাত্রেই কতক অংশে ফিলসফার হতে বাধ্য। আমাদের দেশের অলংকারশাস্ত্র দর্শনশাস্ত্রের একটি শাখাবিশেষ। গ্রীসে অ্যারিস্টটল যে শ্রেণীর লোক ছিলেন, এ দেশে অভিনবগুপ্তও সেই শ্রেণীর লোক। উভয়েই নৈয়ায়িক।

আগে একটা দার্শনিক মত খাড়া ক'রে তার পর সেই মতানুসারে কাব্যের হীনতা বা শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করবার চেষ্টা যে বৃথা, সে জ্ঞান আজকের লোকের হয়েছে। তাতেই ফরাসি দেশের নবযুগের সমালোচকরা নিজেদের ইম্‌প্রেশনিস্ট বলে পরিচয় দেন, অর্থাৎ তাঁদের মতে কাব্যবস্তু হচ্ছে সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী। কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁরা এ আশাও করেন যে, তাঁদের মতামতের universal validity আছে। কোনো সমালোচকের পক্ষে এ আশা ত্যাগ করা অসম্ভব। কারণ আমি যখনই কোনো মতকে সত্য বলে মনে করি, তখনই মনে করি যে, তা সকলের পক্ষে সত্য। তেমনই, যখনই বলি এ বস্তু সুন্দর তখনই এ কথাটা উহ্য রয়ে যায় যে, তা সকলের কাছেই সুন্দর। ইউনিভার্সাল ভ্যালিডিটি অবশ্য দর্শনের বিষয়। সুতরাং আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে যতই অদার্শনিক কথা বলি না কেন, একটা-না-একটা ফিলসফি তার মধ্যে থেকে উঁকি মারবে। আর সে ফিলসফি যে কত কাঁচা অথবা পচা, তা ধরা পড়বে আপনাদের দার্শনিক-চূড়ামণি প্রেসিডেণ্টের কাছে। অথচ কি করা যায়? কাব্য ম্যাজিক হতে পারে, কিন্তু সমালোচনা লজিক হতে বাধ্য।

৩

আর-এক জাতীয় সমালোচনা আছে যার রিজ্‌নএর সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক নেই, যা ষোলো-আনা আন্‌রিজ্‌নএর ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এ জাতীয় সমালোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো কাব্যবিশেষের নিন্দা কিম্বা প্রশংসা করা। প্রায়ই দেখা যায়, এ নিন্দা-প্রশংসার মূল হচ্ছে রাগ-দ্বেষ। কোনো কারণে কবি নামক মানুষটির উপর বিরক্ত হলে সমালোচক তাঁর কাব্যের নিন্দা করেন এবং অনুরক্ত হলে প্রশংসা করেন। এ অনুরাগ-বিরাগ কাব্যজগতের কথা নয়; আমাদের এই চিরদিনের সমাজ-সংসারের কথা। এরকম সমালোচনার জন্মস্থান হচ্ছে হৃদয়। আলংকারিকরা যে হৃদয়ের কথা বলেন এ সে হৃদয় নয়, রক্তমাংসে গড়া সেই হৃদয়, যা প্রাণী মাত্রেরই বুকের ভিতর দিবারাত্র ধড়ফড় করছে। সুখের বিষয়, এই মাংসপিণ্ড হতে আমি কোনোরূপ মতামত উদ্ধার করতে পারি নে। তা যে পারি নে

তার প্রমাণ, সাহিত্যিক হিসাবে কেউ কেউ আমার সুখ্যাতি করেন, কেউ কেউ বা অখ্যাতি। কিন্তু এ বিষয়ে সবাই একমত যে, আমার অন্তরে হৃদয় বলে পদার্থটি নেই। আপচ্ছান্তি।

এতদ্ব্যতীত আর-এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন যাঁরা কাব্যের বিচারক। এই-সব কাব্যজগতের ধর্মাধিকরণের দল, কোন্ কবি কাব্যের কোন্ বিধি পালন করেছেন ও কোন্ নিষেধ অমান্য করেছেন, সেই অনুসারেই কাব্যের সপক্ষে বা বিপক্ষে রায় দেন। আমি কাব্যের এরূপ বিচারক হতে পারি নে, কারণ কাব্যজগতের অলঙ্ঘ্য নিয়মাবলীর অস্তিত্ব আমি মানি নে। কাব্যেরও অবশ্য law আছে, কিন্তু প্রতি যথার্থ কবিই হচ্ছেন তাঁর rulesএর স্রষ্টা। যে নিয়মের সাক্ষাৎ কালিদাসের নাটকে দেখতে পাই সে নিয়মাবলীর সাহায্যে শেক্সপীয়ারের নাটক বিচার করা যায় না। বের্গ্‌স' যাকে বলেন creative evolution, কাব্যজগতে সৃষ্টির মূল পদ্ধতি যে তাই সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। তা ছাড়া আপনারা আমাকে রবীন্দ্র সাহিত্যের উপর জজিয়তি করবার জন্য আহ্বান করেন নি, কারণ সে কাজের ভার তো মাসিক সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রেরাই অযাচিত ভাবেই নিয়েছে।

৪

রবীন্দ্রপরিষদের প্রস্তাবে সম্মত হবার পূর্বে আমার ইতস্ততের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আমাকে বক্তৃতা করতে হবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। আমাকে কি এ ক্ষেত্রে প্রমাণ করতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ একজন কবি? জগদ্‌বিখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচে কাব্যসমালোচকদের বিদ্রূপ করে বলেছেন, পৃথিবীতে, কোনো দেশে কোনো কালে মানবজাতি কি তোমাদের সার্টিফিকেটের উপর আস্থা রেখে কাউকে কবি বলে স্বীকার করেছে, না, লোকমতে যাঁরা কবি বলে গণ্য ও মান্য হয়েছে, তাঁদের সম্বন্ধেই তোমরা মুখর হয়ে উঠেছ? ইতালিতে দান্তে ও বিলাতে শেক্সপীয়ার লোকমতে বড়ো কবি বলে গণ্য হবার পরেই না তোমরা তাঁদের বিষয়ে বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেছ? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে, হাঁ, তাই। এ কথা যে সত্য তার প্রমাণের জন্য সাগর লঙ্ঘন করবার প্রয়োজন নেই। রামায়ণ ও মহাভারত যে মহা-কাব্য সে বিষয়ে লোকমত সমালোচকের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

এ থেকে এই প্রমাণ হয় যে, কবিবিশেষ যে কবি, এই কথাটা মেনে নিয়েই তাঁর কাব্যের আমরা আলোচনা করতে পারি। কারণ কবিত্বশক্তি বস্তু যে কি, তা লজিকের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না। তা যে যায় না তা মানুষ বহুকাল পূর্বে বুঝতে পেরেছে। আমাদের দেশের প্রাচীন আলংকারিক বামনাচার্য বলেছেন যে, 'কবিত্ববীজং প্রতিভানম্', এবং উক্ত সূত্রের তিনি বক্ষ্যমাণরূপ ব্যাখ্যা করেছেন—

কবিত্বস্য বীজং কবিত্ববীজং, জন্মান্তরাগতসংস্কারবিশেষঃ।

এ ব্যাখ্যা কি খুব পরিষ্কার? 'জন্মান্তরাগতসংস্কারবিশেষঃ' বলায় শুধু বলা হয় যে, কবিত্বশক্তি অলৌকিক শক্তি অর্থাৎ মিস্টিরিয়স্। আমরা অপরের প্রতিভা থাকলে তা চিনতে পারি, কিন্তু তা যে কি তা স্পষ্ট করে বলতে পারি নে। এর

কারণ প্রতিভা স্বপ্রকাশ। কিন্তু তা প্রকাশ করে বলবার প্রয়াস বৃথা। এই চেষ্টা যে ব্যর্থ তার প্রমাণ অ্যারিস্টটল থেকে হেগেল পর্যন্ত সকল দার্শনিকই দিয়েছেন। প্রতিভার সন্ধান যে সাইকলজি নামক বিজ্ঞানের মধ্যে পাওয়া যায় না তার প্রমাণ, ও-বস্তুর মূল কারণ একালের বৈজ্ঞানিকরা ফিজিঅলজির অন্তরে খুঁজেছেন। প্রতিভা যে একরকম insanity এ মতও ইউরোপে প্রাদুর্ভূত হয়েছে। সে মত সত্য কি মিথ্যা সে কথা আমি বলতে পারি নে। আমার বক্তব্য এই যে, প্রতিভা যদি একরকম ইন্‌স্যানিটি হয় তা হলে এ জাতীয় ইন্‌স্যানিটি অনেকেই বরণ করে নেবেন, অন্তত আমি তো নেবই। এই প্রতিভার স্পষ্ট কার্য হচ্ছে আমাদের মনকে উদ্দীপ্ত ও আলোকিত করা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের স্পর্শে যাঁদের মন আলোকিত হয়ে ওঠে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নিজেই realise করেছেন, আর সে আলোক যাঁদের অন্তরে প্রবেশ করে নি লজিকের সাহায্যে তাঁদের অন্তরের রুদ্ধ বাতায়ন উন্মুক্ত করে দিতে আমি পারব না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ একজন কবি ও মহাকবি এই কথাটি মেনে নিয়েই তাঁর একটি বিশেষ কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করব।

৫

কোনো কবিকে বড়ো কবি বলে স্বীকার করতে বাধ্য হলেও তাঁর কাব্য সম্বন্ধে নানা-প্রকার জিজ্ঞাসা আমাদের মনে উদয় হয়। এ ক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হচ্ছে, কাব্যের প্রয়োজন কি? প্রশ্ন বহু পুরাতন। আমাদের দেশে প্রাচীন আলংকারিকরা এ প্রশ্নের যা হোক একটা-না-একটা উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমি তাঁদের দু-একটা মতের উল্লেখ করব। এ স্থলে বলে রাখা আবশ্যক যে, আমি ফাঁক পেলেই যে সংস্কৃত আলংকারিকদের মতামত পাঁচজনকে ফূর্তি করে শোনাই, তার কারণ এ নয় যে, আমি তাঁদের কথা এ বিষয়ে চূড়ান্ত বলে বিশ্বাস করি কিম্বা তাঁদের মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করি। আলংকারিক হিসাবে অ্যারিস্টটল বড়ো কিম্বা দণ্ডী বড়ো, হেগেল বড়ো কিম্বা বিশ্বনাথ বড়ো, সে বিচার করবার শক্তিও আমার নেই, প্রবৃত্তিও আমার নেই। আমি যে সংস্কৃত আলংকারিকদের দোহাই দিই তার একমাত্র কারণ আমি বাংলা ভাষায় কথা কই, আর সংস্কৃত কথা বাংলা ভাষার মধ্যে যত সহজে বেমালুম খাপ খায়, গ্রীক ও জর্মান কথা ততই সহজে সমালুম বেখাপ্পা হয়।

এখন প্রস্তুত বিষয়ে ফিরে আসা যাক। বামনাচার্য বলেছেন—

কাব্যং সদ্দৃষ্টাদৃষ্টার্থম্ প্রীতিকীর্তিহেতুত্বাৎ।

বামন নিজেই উক্ত সূত্রের বক্ষ্যমাণ ব্যাখ্যা করেছেন—

কাব্যং সচ্চারু দৃষ্টপ্রয়োজনম্ প্রীতিহেতুত্বাৎ।
অদৃষ্টপ্রয়োজনম্ কীর্তিহেতুত্বাৎ॥

সংস্কৃত শাস্ত্রকারেরা এত সাঁটে কথা কন যে, আমাদের পক্ষে তাঁদের রচিত সূত্র যেমন সহজবোধ্য তার ব্যাখ্যাও প্রায় তদ্রূপ। আমি অনুমান করছি যে, বামনাচার্যের কাব্যের দৃষ্টপ্রয়োজন হচ্ছে কাব্যভোক্তার প্রীতি, আর তার অদৃষ্টপ্রয়োজন হচ্ছে

কাব্যকর্তার কীর্তি। এখন এই অদৃষ্টপ্রয়োজনের কথা মুলতবি রেখে দৃষ্টপ্রয়োজনের কথাটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করা যাক, কারণ আজকের সভায় যারা একত্র হয়েছি তাদের কেউই কাব্যের কর্তা নন—সবই ভোক্তা। কর্তা যে আমরা নই তার প্রমাণ, কবিকীর্তি আমরা কেউই লাভ করি নি, যদিচ আমরা কেউ কেউ পদ্য লিখেছি।

৬

কাব্যরস আস্বাদ করে যে আমরা প্রীতি লাভ করি এ তো প্রত্যক্ষ সত্য, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর তর্ক নেই। কেননা, যা দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ তা স্বতঃসিদ্ধ। তবে মনে রাখবেন, যে বিষয়ে তর্ক নেই সেই বিষয়েই মানুষের তর্কের শেষ নেই। তাই এই প্রীতিকথা নিয়ে দেদার তর্ক করা যেতে পারে, কেননা যুগ-যুগ ধরে করা হয়েছে। প্রীতি অর্থ যদি হয় pleasure, তা হলেই বামনাচার্যের মতকে hedonismএর কোঠায় ফেলে দেওয়া যায়। কাব্য সম্বন্ধে ও-মত অগ্রাহ্য, কেননা ও-মতানুসারে কাব্য বিলাসের একটি উপকরণ হয়ে পড়ে, অর্থাৎ মাল্যচন্দনবনিতার দলে পড়ে যায়। এ তর্ক ইউরোপীয় পণ্ডিতরা দেদার করেছেন। বোধ হয় তাঁদেব সমধর্মী পণ্ডিতের দল এ দেশে সেকালেও ছিলেন। সে কারণ নব্য আলংকারিকরা প্রীতির বদলে 'আনন্দ' শব্দের উপরেই ঝোঁক দিয়েছেন। এমন-কি, নব্য আলংকারিকদের আদিগুরুর নাম আনন্দবর্ধনাচার্য। এ আনন্দ যে কোনো লৌকিক আনন্দ নয় সে কথা নব্য আলংকারিকরা স্পষ্টাক্ষরে লিখে গেছেন। আনন্দের ইংরেজি pleasure নয়, joy। A thing of beauty is a joy for ever—কবি কীট্সের এ বাণী তাঁরা বিনাবাক্যে শিরোধার্য করে নিতেন, কারণ নিরানন্দ হওয়াটাই সংসারের দাসত্বের ফল, আর আনন্দই মুক্তি। প্রীতি দৃষ্ট-প্রয়োজন এ কথা বলার অর্থ কাব্যামৃত-রসাস্বাদ করার আনন্দ ব্যতীত কাব্যের অপব কোনো দৃষ্টপ্রয়োজন নেই। মানবমনের প্রীতিসাধনই কাব্যের একমাত্র utility।

এ কথা প্রসন্নমনে মেনে নেওয়া অনেকের পক্ষে পুরাকালেও কঠিন ছিল, আর একালে একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কারণ একালে মানুষের রক্তমাংসের যা প্রয়োজন তাই মানবজীবনের একমাত্র প্রয়োজন বলে গণ্য হয়েছে এবং সেই প্রয়োজনের কায়মনোবাক্যে সাধনা করাই জীবনের প্রধান কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং কাব্যের সার্থকতা আমরা মানুষের সাংসারিক প্রয়োজনের মাপ-কাঠিতে যাচাই করতে সদাই প্রস্তুত।

৭

কাব্যামৃতরসের আস্বাদ যে মুক্তির আস্বাদ এ মতে সায় দেওয়া আমাদের পূর্ব-পুরুষদের পক্ষে অতি সহজ ছিল, কেননা তাঁদের মতে জীবনটা হচ্ছে নিছক ভব-যন্ত্রণা। জীবনের ধর্ম হচ্ছে আত্মাকে তার দাস করা, আর মনের এই দাসত্ব হতে

মুক্তির প্রসাদেই মানবাত্মা আনন্দ লাভ করে। আমি পূর্বেই বলেছি যে, সকল দেশেই সকল যুগেই অলংকারশাস্ত্র হচ্ছে দর্শনশাস্ত্রের একটি শাখা মাত্র। সুতরাং আমাদের দেশের দর্শনশাস্ত্রের মুক্তির সঙ্গে কাব্যচর্চার মুক্তির জ্ঞাতিত্ব আছে ও উভয়েই স্বজাতীয়।

একালে জীবনের প্রতি আমাদের দার্শনিক অবজ্ঞা নেই, আছে অন্ধভক্তি। কারণ, জীবন আমাদের পক্ষে এখন আর নিরর্থক নয়। আমরা এখন জানি যে, জীবন হচ্ছে ক্রমবর্ধনশীল, এবং তার চরম সার্থকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে ভবিষ্যতে। মর্তকে স্বর্গে পরিণত করবার শক্তি মানুষের হাতেই আছে, সুতরাং আমাদের কাম্য পদার্থ মোক্ষ নয়, ভূস্বর্গ। জীবন আজও দুঃখময়, কিন্তু আমাদের পক্ষে পরম-পুরুষার্থ হচ্ছে এই দুঃখময় জীবন থেকে পলায়ন করা নয়, তাকে জয় করা। কামনাকে বশ করা জীবনীশক্তির হ্রাস করা, কারণ সে শক্তির যথার্থ কার্য হচ্ছে কাম্য বস্তুকে বশীভূত ও আয়ত্ত করা। এখন আমরা Evolution নামক নূতন বিশ্বকর্মার সন্ধান পেয়েছি, তাই আমরা progress নামক তার চাকা ঘোরানোকে পরমপুরুষার্থ বলে মনে করি। কাল আগে ছিলেন প্রলয়কর্তা, ইভলিউশনের দৌলতে তিনি হয়ে উঠেছেন সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং মানুষের যতপ্রকার সাংসারিক প্রয়োজন আছে তার সাধনা করাই এ যুগে যথার্থ মানবধর্ম। ফলে অর্থ কাম আমাদের আরাধ্য বস্তু হয়ে উঠেছে। তাই এ যুগে আমরা সবাই হয় economical, নয় political, নয় social সমস্যার হাতে-কলমে মীমাংসা করবার জন্য ব্যগ্র। ফলে কাব্য আমাদের এই-সব প্রচেষ্টার কতদূর সহায় কি অন্তরায়, সেই হিসেব থেকে কাব্যের মূল্য নির্ধারণ করবার প্রবৃত্তি আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এ-সব দিক থেকে কাব্যের সমালোচনা করায় শুধু অল্পবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়। কারণ এ জাতীয় সমালোচকের মনের কথা হচ্ছে, কাব্য থেকে কি শিক্ষা লাভ করলুম, কি আনন্দ লাভ করলুম, তা নয়। এ জাতীয় সমালোচক সেকালেও ছিল এবং তাদের লক্ষ্য করে দশরূপকার ধনঞ্জয় বলেছেন—

আনন্দনিস্যন্দিষু রূপকেষু
ব্যুৎপত্তিমাত্রং ফলমল্পবুদ্ধিঃ
যোঽপীতিহাসাদিবদাহ সাধুঃ
তস্মৈ নমঃ স্বাদুপরাঙ্মুখায়।

এ সংস্কৃত মত আমি শিরোধার্য করি, কেননা এই হচ্ছে অতি-আধুনিক মত। যে মত অতিপুরাতন এবং সেইসঙ্গে অতিনূতন সে মত যদি ভুল হয় তো তা নাছোড় ভুল, অর্থাৎ সত্য।

৮

রবীন্দ্রনাথ আজকের দিনে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় কবি, সুতরাং তাঁর কাব্যে আমরা সুশিক্ষা অশিক্ষা কি কুশিক্ষা কোন্ জাতীয় শিক্ষা লাভ করি এ প্রশ্ন অনেক সমালোচক করেছেন এবং সে-সব প্রশ্নের উত্তর নিজেরাই দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ

তাঁর একখানি কাব্যের উল্লেখ করব, যার উপর অল্পবুদ্ধি সাধু লোকেরা বহু বাণ বর্ষণ করেছেন; যদিচ তাঁদের মধ্যে অনেকে সেখানি যে যথার্থ কাব্য তা অস্বীকার করতে পারেন নি। সে কাব্যের নাম চিত্রাঙ্গদা। এই চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে প্রতিকূল সমালোচনার সার সংগ্রহ করেছেন টম্‌সন নামক জনৈক ইংরেজ মিশনারি। তাঁর প্রথম বক্তব্য হচ্ছে—

It is his loveliest drama; a lyrical feast, though its form is blankverse.... It is almost perfect in unity and conception, magical in expression.

যাঁরা কাব্যের রস উপভোগ করেন তাঁরা এর বেশি কোনো কাব্য সম্বন্ধে আর কি জানতে চান? কিন্তু সাধু ব্যক্তিদের আরো একটি বলবার কথা আছে। এ কাব্য সাধু কি অসাধু তার বিচার তাঁরা না করে থাকতে পারেন না। তাই টম্‌সন বলেছেন—

The play was attacked as immoral, and to this day offends many readers, not all of whom are either fools or milksops.

...the purpose of the play has been represented as being the glorification of sexual abandonment.

...the play, in these earlier passages, repeatedly trembles on the edge of the bog of lubricity.

তার পর এর চাইতেও এ কাব্যের নাকি একটি বড়ো দোষ আছে। টম্‌সন বলেন—

The most serious charge that can be brought against Chitrangada is against its attitude.

টম্‌সন সাহেবের কৃত চিত্রাঙ্গদা কাব্যের দোষগুণ-বিচারের বিচার করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমি কবির উপর জজিয়তি করতে ভয় পাই, কিন্তু সমালোচকের সঙ্গে ঝগড়া আমি সানন্দে করতে পারি।

৯

চিত্রাঙ্গদা একটি স্বপ্নমাত্র, মানবমনের একটি অনিন্দ্যসুন্দর জাগ্রত স্বপ্ন। এ চিত্রাঙ্গদা সেকালের মণিপুরের রাজকন্যা নন, সর্বকালের মানুষের মনপুরীর রাজরানী, হৃদয়নাটকের রত্নপাত্রী। আমরা যাকে আর্ট বলি তা হচ্ছে মানবমনের জাগ্রত স্বপ্নকে হয় রেখায় ও বর্ণে, নয় সুরে ও ছন্দে, নয় ভাষায় ও ভাবে আবদ্ধ করবার কৌশল বা শক্তি।

অনঙ্গ-আশ্রম হচ্ছে একটি কল্পলোক, যেমন মেঘদূতের অলকা ও কুমার-সম্ভবের শৈল-আশ্রম একটি কল্পলোক মাত্র। জিয়োগ্রাফিতে এ-সব লোকের সন্ধান মেলে না, কারণ, মাটির পৃথিবীতে তাদের স্থান নেই, তাদের সৃষ্টি স্থিতি শুধু মানুষের মনে।

মানুষের মন অবশ্য এই পৃথিবী হতে মনোমত উপাদান সংগ্রহ ক'রে এই কল্পলোক রচনা করে ; যেমন মানুষে গুটিকতক পার্থিব উপাদান দিয়েই স্বর্গলোক অর্থাৎ সর্বলোককাম্য একটি অপার্থিব কল্পলোকের সৃষ্টি করেছে।

এই কল্পলোক বাস্তব জগৎ থেকে বিভিন্ন হলেও বিচ্ছিন্ন নয়। ভালো কথা, আমরা যাকে বস্তুজগৎ বলি সে বস্তুই বা কি? সে জগতও তো মানুষের মন রচনা করেছে। কবিতার কল্পলোক ও বুদ্ধির প্রকৃত লোক দুইই মানবমনের সৃষ্টি। এ দুয়ের ভিতর যথার্থ প্রভেদ এই যে, এ দুটি মানবমনের দুটি বিভিন্ন শক্তির রচনা। কথাটা শুনে চমকে উঠবেন না। আপাতদৃষ্টিতে যা বাহ্যবস্তু বলে মনে হয় তাকে যাচিয়ে দেখতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় তার অন্তরে রয়েছে logical mind। আমরা যাকে object বলি তা যে subjectএরই বিকার তা স্বয়ং লজিকই মানতে বাধ্য।

এই বস্তুজগৎ ওরফে মানুষের কর্মভূমির যথার্থ স্রষ্টা হচ্ছে মানুষের কর্ম-প্রবৃত্তি। কর্মজগৎ ও কল্পজগৎ এ দুই জগৎই সমান সত্য, কেননা আমাদের মনে যেমন কর্মের প্রতি আসক্তি আছে তেমনি কর্মজগৎ থেকে মুক্তি পাবারও আকাঙ্ক্ষা আছে। এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় আমাদের স্বকপোলকল্পিত ধর্মে ও আর্টে। সুতরাং চিত্রাঙ্গদা যে-জাতীয় স্বপ্ন সে স্বপ্নেরও আমাদের আন্তরিক প্রয়োজন আছে। এ প্রয়োজনের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন শুধু সেই জাতীয় বুদ্ধিমান লোকেরা যাঁদের অন্তর একান্ত বিষয়বাসনার গণ্ডীবদ্ধ, সে বিষয়বাসনা ব্যক্তিগতই হোক আর জাতিগতই হোক। এঁদের মনে কর্মজিজ্ঞাসার অতিরিক্ত জিজ্ঞাসা নেই। এই একচক্ষু হরিণের দল ভুলে যান যে, মানুষমাত্রই বাস করে কতকটা কর্মজগতে আর কতকটা স্বপ্নলোকে।

১০

এই স্বপ্নকে যাঁরা সম্পূর্ণ সাকার করে তুলতে পারেন, অর্থাৎ সমগ্র ও পরিচ্ছিন্ন রূপ দিতে পারেন, তাঁরাই হচ্ছেন পূর্ণ আর্টিস্ট। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্য মানুষের যৌবনস্বপ্নের একটি অপূর্ব এবং সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র।

ছবি গান ও কবিতার বিষয় আলোচনা করতে হলেই আমরা 'সুন্দর' শব্দটি বার বার ব্যবহার করতে বাধ্য হই— যেমন দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা করতে বসলে আমরা বার বার 'সত্য' শব্দটি ব্যবহার করতে বাধ্য হই। অথচ beauty ও truthএর বাচ্য পদার্থের মতো অনির্দেশ্য বস্তু আর ভূভারতে নেই। তাই আমরা 'সৌন্দর্য' শব্দের বদলে সৌন্দর্যের নানারকম উপকরণের উল্লেখ করি, যথা, মাধুর্য ঔদার্য কান্তি দীপ্তি সুষমা সৌকুমার্য লালিত্য লাবণ্য চমৎকারিত্ব মনোহারিত্ব ইত্যাদি। এ-সব নামই সৌন্দর্যের বেনামি হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। ফলে এ-সবের প্রসাদে সৌন্দর্যের অর্থ স্পষ্টতর হয় না, কিন্তু সৌন্দর্য নামক গুণটির অনুভূতি লোক-সামান্য। সুতরাং সেই অস্পষ্ট অনুভূতির উপরই আমার এ আলোচনা প্রতিষ্ঠিত করব। আর তা করায় ক্ষতি নেই। কারণ যে-সকল দার্শনিক beauty, truth

প্রভৃতি শব্দের চুলচেরা বিচার করেন, তাঁরা অনেকেই সোনা ফেলে আঁচলে গিঁট দেন। অর্থাৎ নামের সন্ধান করতে রূপের সন্ধান হারিয়ে ফেলেন।

কোনো কাব্যের আত্মার পরিচয় দেওয়ার চাইতে তার দেহের পরিচয় দেওয়াটা ঢের সহজ, কেননা দেহ জিনিসটে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরিচ্ছিন্ন। আর, সকলেই জানেন যে, ভাষা হচ্ছে ভাবের দেহ। নীরব কবি বলে পৃথিবীতে কোনোপ্রকার জীব নেই, কেননা এ পৃথিবীতে ভাষাহীন ভাব নেই। সুতরাং আমি যদি চিত্রাঙ্গদার ভাষার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি তা হলে আশা করি তার আত্মার সাক্ষাৎকার আপনারা আপনা হতেই পাবেন। আমাদের দেশে লোকে ভগবানকে কায়াহীন সত্তা হিসাবে ধারণা করতে পারতেন না, তাই বৌদ্ধরা তাঁকে ধর্ম-কায় ও বৈষ্ণবেরা মন-কায় বলে উপলব্ধি করতেন। সুতরাং কাব্যকে ভাষা-কায় বলায় আমরা কাব্যের আত্মা সম্বন্ধে নাস্তিক অথবা দেহাত্মবাদী বলে অন্তত এ দেশে গণ্য হব না।

১১

কবিকঙ্কণ বলেছেন যে, চণ্ডীকাব্য তিনি লেখেন নি কিন্তু চণ্ডী তাঁর হাত ধরে লিখিয়েছেন। ভারতচন্দ্রও ঐ একই কথা বলেছেন। তিনিও অন্নপূর্ণার আদেশে ও প্রসাদে অন্নদামঙ্গল রচনা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এ চণ্ডী এ অন্নপূর্ণা সরস্বতী ব্যতীত অন্য কোনো দেবতা নন। কবিকঙ্কণ সরস্বতীর গুণ-বর্ণনা করতে একটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছেন যে তাঁর

বীণাগুণে তরল অঙ্গুলি

কবিকঙ্কণের অঙ্গুলি কিন্তু তরল নয়, স্থূল। আর ভারতচন্দ্রের অঙ্গুলি লঘু হলেও সে অঙ্গুলি কখনো বীণাগুণ স্পর্শ করে নি, কারণ তাঁর অঙ্গুলি ছিল মেজরাপ-মণ্ডিত। চিত্রাঙ্গদার কবির অঙ্গুলি যে বীণাগুণে পূর্ণমাত্রায় তরল তা যাঁর ভাষার সুরের কান আছে তিনি চিত্রাঙ্গদার দু লাইন পড়লেই বুঝতে পারবেন। চিত্রাঙ্গদা একটি সম্পূর্ণ রাগিণী। এর কোথাও একটি বেসুরো কথা নেই, আর এ ভাষার গতি যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি সলীল। ও-কাব্যের অন্তরে যেমন একটিও বেসুরো কথা নেই তেমনি একটিও উচ্ছৃঙ্খল ছত্র নেই। এ কাব্যের ধ্বনি এক মুহূর্তের জন্যও বাণীকে ছাপিয়ে কিংবা ছাড়িয়ে ওঠে নি। ভাষার সমতা ও ধ্বনির মসৃণতা গুণে চিত্রাঙ্গদা মেঘদূত ও কুমারসম্ভবের স্বজাতীয় ও সমকক্ষ। এ ভাষা যেমন প্রসন্ন তেমনি সপ্রাণ, যেমন উজ্জ্বল তেমনি স্নিগ্ধ। এ ভাষা পরিপূর্ণ প্রাণের আবেগে মুক্ত ছন্দে অবলীলাক্রমে বয়ে যাচ্ছে। এ প্রবাহিণীর সুর ললিত, তাল মধ্যমান। এ কাব্য সরস্বতী নিজ হাতে লিখেছেন বললে আমরা সে কথায় অবিশ্বাস করতুম না।

ভারতচন্দ্র স্থানান্তরে বলেছেন যে, অন্নদা তাঁকে ভরসা দিয়েছিলেন যে—

যে কবে সে হবে গীত, আনন্দে লিখিবে।

চিত্রাঙ্গদার কবি, যার মুখ দিয়ে যা বলেছেন তা সবই গীত হয়েছে। এ ভাষা কবির

মুখে স্বয়ং বসন্ত দিয়েছিলেন। চিত্রাঙ্গদা বসন্তের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে—

বড় ইচ্ছা হয়েছিল সে যৌবনোচ্ছ্বাসে
সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে
অপূর্বপুলকভরে উঠে প্রস্ফুটিয়া
লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন।
হে বসন্ত, হে বসন্তসখে, সে বাসনা
পুরাও আমার শুধু দিনেকের তরে।

বসন্তসমীরণের স্পর্শে চিত্রাঙ্গদার দেহের অনুরূপ চিত্রাঙ্গদা কাব্যেরও দেহ অপূর্ব পুলকভরে ফুটে উঠেছে। এ ভাষা নবীন প্রাণের স্পর্শে আগাগোড়া মুকুলিত ও পুলকিত।

১২

আমাদের নিত্যকর্মের ভাষার সঙ্গে কবির ভাষার যে একটি স্পষ্ট প্রভেদ আছে, তা সকলেই জানেন। দৈনিক সংবাদপত্রের ইংরেজি ভাষা ও শেক্‌সপীয়ারের ভাষা যে এক নয়, তা যে-কোনো সংবাদপত্রের এক পৃষ্ঠা পড়বার পর শেক্‌সপীয়ারের নাটকের এক পৃষ্ঠা পড়লেই সকলের কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। প্রভেদ যে ঠিক কোথায় তা বলা অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে উপায়ান্তরের অভাবে আমরা নানারূপ বিশেষণের আশ্রয় নিই। কিন্তু সে-সব বিশেষণের সার্থকতাও অনুভূতিসাপেক্ষ। যে-কোনো বিষয়ের আমরা ব্যাখ্যা শুরু করি নে কেন, লজিকের সাহায্যে কতক দূর অগ্রসর হবার পর আমরা দেখতে পাই যে, লজিকের হাত ধরে আর বেশি দূর এগনো চলে না। কেননা তখন আমরা এমন-একটি সত্যের সাক্ষাৎলাভ করি যার নাম mystery। এর কারণ ভগবান্ কৃষ্ণ বলে দিয়েছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

এই ব্যক্তমধ্যই লজিকের এলাকা। আমরা যদি বলি কবির ভাষায় প্রাণ আছে, তা হলে বলা হয় যে, কবির ভাষা অনির্বচনীয়; কেননা প্রাণ পদার্থটিও একটি mystery, তবে উপমার সাহায্যে ব্যাপারটি একটু পরিষ্কার করা যায়। আমাদের কর্মের ভাষা static, অর্থাৎ পদার্থের নামকরণ করেই তার কর্মের অবসান হয়; কবির ভাষা dynamic, অর্থাৎ সে ভাষার অন্তরে গমক আছে, অকবির ভাষার অন্তরে তা নেই। আলংকারিকরা বলেছেন—

ইদমন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে।

কবির মুখনিঃসৃত এই শব্দাখ্য-জ্যোতি মনের নানাদেশে সঞ্চারিত হয় এবং নানা ভাবকে অঙ্কুরিত করে; ফলে আমাদের মনোজগতের প্রাণের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে দেয়। কবির বাণী তার অন্তর্গূঢ় শক্তির বলে কি বাহ্যজগৎ কি অন্তর্জগতের বিরাট অব্যক্ত অংশের রহস্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। চিত্রাঙ্গদার ভাষা সেই জাতীয় জাদুকরী ভাষা, যার সাক্ষাৎ আমরা ইংরেজ কবি কীট্‌সের কবিতায় পাই।

এক কথায় এ হচ্ছে লৌকিক ভাষার অলৌকিক সংস্করণ। এ ভাষার মোহিনী-শক্তির মূল হচ্ছে কবির আত্মায়। সে যাই হোক, ভাষার সঙ্গে কাব্যের এতটা আত্মীয়তা আছে যে, ইউরোপে অনেকে কবিকে a great voice বলে আখ্যা দিয়েছেন।

১৩

প্রাচীন আলংকারিকদের মতে কাব্যের সৌন্দর্য নগ্ন নয়, অলংকৃত। এমন-কি, তাঁদের মতে—

কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ।

যে অলংকারের গুণে কাব্য গ্রাহ্য সে গুণটি কি? বামনাচার্য বলেছেন যে—

সৌন্দর্যমলংকারঃ।

সৌন্দর্য অর্থ অলংকার, আর অলংকার অর্থ সৌন্দর্য ; এরকম ব্যাখ্যা শুনে এ বিষয়ে আমরা যে তিমিরে আছি সেই তিমিরে থেকে যাই। আমি বালককালে একটি বঙ্গ-দেশীয় মুসলমানের মুখে একটি 'হররা' ঘোড়ার কথা শুনি। 'হররা' অর্থ কি, জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করলেন 'বোরা'। তার পর 'বোরা' কাকে বলে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন 'মুসকি'। এইরূপ ব্যাখ্যা শুনে আমি অবশ্য তাঁর আরবি ও ফারসি ভাষায় পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট তারিফ করি, কিন্তু সেইসঙ্গে আমার ধারণা হয় ভদ্রলোক কি বলতে চান তা তিনি নিজেও জানেন না, কেননা যদি জানতেন তো ও-রঙের বাংলা নামটাই বলে দিতেন। সুতরাং বামনাচার্য যখন অলংকার শব্দ কি connote করে তা বলতে না পেরে কি denote করে তাই বললেন, তখন তাঁর বক্তব্য বোঝা গেল। যখন শুনলুম—

পুনরলংকার শব্দোঽয়মুপমাদিষু বর্ততে

তখন নিশ্চিত হলুম।

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত কাব্যজিজ্ঞাসা নামক একটি অতি সুন্দর ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাংলায় লিখেছেন। সে প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে, নব্য আলংকারিকদের মতে উপমাদি অলংকারের প্রাচুর্য সত্ত্বেও বাক্য কাব্য হয় না, অপর পক্ষে বহু অনলংকৃত বাক্য চমৎকার কাব্য। এর প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যে দেদার আছে। কিন্তু অলংকার যে কাব্যকে শোভাহীন করে এমন কথা কোনো আলংকারিক বলতে পারেন না, তা তিনি যতই নব্য হোন-না কেন। কেননা, উপমাদি যদি কাব্যদেহের কলঙ্ক হত তা হলে কালিদাসের কাব্য পা থেকে মাথা পর্যন্ত কলঙ্কিত। অতএব কোন্ স্থলে কিরূপ উপমাদি প্রকৃতি-সুন্দর কাব্যের শোভা বৃদ্ধি করে, সে সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা আবশ্যক।

আমি এ স্থলে শুধু দুটি মূল অলংকারের কথা বলব। একটি অনুপ্রাস, অপরটি উপমা। সংস্কৃত মতে একটির নাম শব্দালংকার, অপরটির নাম অর্থালংকার। কিন্তু এ উভয়ই মূলত সমধর্মী। দণ্ডী বলেছেন—

যয়া কয়াচিচ্ছ্রুত্যা যৎ সমানমনুভূয়তে।
তদ্রূপাহি পদাসত্তিঃ সানুপ্রাসা রসাবহা।

তার পর

যথাকথঞ্চিৎ সাদৃশ্যং যত্রোদ্ভূতং প্রতীয়তে
উপমা নাম সা তস্যাঃ প্রপঞ্চোঽয়ং নিদর্শ্যতে।

অর্থাৎ এক অলংকারের প্রসাদে কানের কাছে শব্দসমূহ সমান অনুভূত হয়, অপর অলংকারের প্রসাদে মনের কাছে বস্তুসদৃশ প্রতীয়মান হয়।

এ বিশ্বে আমাদের আপাতদৃষ্টিতে যা বিভিন্ন তার সমীকরণ করাই হচ্ছে কাব্যের ধর্ম, অর্থাৎ যা-কিছু পরস্পরবিচ্ছিন্ন তাদের নিরবচ্ছিন্ন রূপ দিতে আর প্রক্ষিপ্ত জগৎকে সংক্ষিপ্ত করতে পারে শুধু কবিপ্রতিভা। পরাবিদ্যা যেমন আমাদের লৌকিক ভেদবুদ্ধি নষ্ট করে, কাব্যও তেমনি আমাদের লৌকিক ভেদদৃষ্টি নষ্ট করে। এই বিশ্বে বহুর সমপ্রাণতা ও আত্মীয়তার অনুভূতিই হচ্ছে মুক্তির রসাস্বাদ। কারণ যে মুহূর্তে ভেদবুদ্ধি অপসারিত হয় সেই মুহূর্তে অহং আত্মা হয়ে ওঠে।

আমার এ ধারণা যদি সত্য হয় তো বলা বাহুল্য যে, অনুপ্রাস ও উপমা দুইই কাব্যের বিশেষ অন্তরঙ্গ। কারণ দৃশ্যজগৎ ও শব্দজগতের নিগূঢ় সত্য ব্যক্ত করাই এদের ধর্ম। এ দুই যখন কাব্যে অন্তরঙ্গ না হয়ে বাহ্য অলংকার হয় তখনই তা অগ্রাহ্য। ভাষার ও ভাবের খেলো জমির উপর উপমা-অনুপ্রাসের চুমকি বসানো শুধু মন্দ কবির কারদানি। চিত্রাঙ্গদা কাব্যের অনুপ্রাস ও উপমা উভয়ই ও-কাব্যের অন্তরঙ্গ। এ কাব্যে এমন একটিও অনুপ্রাস কিংবা উপমা নেই যা এ কাব্য-অঙ্গে প্রক্ষিপ্ত, এবং অন্তর থেকে উদ্ভূত নয়। সংগীতে যেমন সেই তানের চমৎকারিত্ব আছে যে তান রাগিণীর প্রাণ থেকে স্বত-উৎসারিত, তেমনি চিত্রাঙ্গদা-রূপ রাগিণীর অন্তরে বহু অনুপ্রাস আছে যা উক্ত রাগিণীর অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে—

সেই সুপ্ত সরসীর স্নিগ্ধ শষ্পতটে
শয়ন করেন সুখে নিঃশঙ্ক বিশ্রামে...
শেফালিবিকীর্ণতৃণ বনস্থলী দিয়ে...
ধন্য সেই মুগ্ধ মূর্খ ক্ষীণতনুলতা
পরাবলম্বিতা লজ্জাভয়ে-লীনাঙ্গিনী
সামান্য ললনা...

এ-সব অনুপ্রাস যে চমৎকার তার সাক্ষী কান। কিন্তু এ-সব অনুপ্রাস অযত্নসুলভ। ধ্বনি আপনিই দানা বেঁধে উঠেছে সমগ্র সংগীতপ্রাণ কাব্যের অন্তর হতে। টম্‌সন সাহেব বলেছেন যে, এ কাব্য magical in expression, যদিচ তা অমিত্রাক্ষরে রচিত। এ কাব্যে যে অন্ত-অনুপ্রাস নেই তার কারণ সমগ্র কাব্যখানিই একটি একটানা অনুপ্রাস।

১৪

আসল কথা এই যে, অলংকার হচ্ছে কাব্যের একরূপ ভাষা। নব্য আলংকারিকরা অলংকারের জাতিভেদ স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে অতিশয়োক্তি হচ্ছে একমাত্র অলংকার। প্রাচীনেরাও এ অলংকারকে সর্বোত্তম অলংকার ব'লে গণ্য করেছেন। এ অলংকার যে কি, তা প্রাচীন আলংকারিকদের মুখেই শোনা যাক—

বিবক্ষা যা বিশেষস্য লোকসীমাতিবর্তিনী
অসাবতিশয়োক্তিঃ স্যাদলংকারোত্তমা যথা।

লোকসীমাতিবৃত্তস্য বস্তুধর্মস্য কীর্তনম্
ভবেদতিশয়ো নাম সম্ভবোঽসম্ভবো দ্বিধা।

চিত্রাঙ্গদা কাব্যের উপমা-রূপকাদি উক্ত অর্থে অতিশয়োক্তি, অর্থাৎ তাদের গুণে বর্ণিত বিষয় সব লোকসীমা অতিক্রম করে, ইংরেজিতে যাকে বলে transcend করে। এই সর্বোত্তম অলংকারের স্পর্শে সমগ্র কাব্যশরীরের রূপলাবণ্যও লোকোত্তর হয়ে উঠেছে, অর্থাৎ যা natural তা supernatural বলে প্রতিভাত হয়। আমি নিম্নে চিত্রাঙ্গদা থেকে দু-চারটি ঐ জাতীয় উক্তি উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি। তাদের নাম উপমাই হোক, রূপকই হোক, আর উৎপ্রেক্ষাই হোক, তার প্রতিটি যে অপূর্ব অতিশয়োক্তি সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। চিত্রাঙ্গদা মদনের বরে ক্ষণিকের জন্য ফুলের মতো ফুটে উঠে বলেছেন—

যেন আমি ধরাতলে
এক দিনে উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের
পিতৃমাতৃহীন ফুল ; শুধু এক বেলা
পরমায়ু— তারি মাঝে শুনে নিতে হবে
ভ্রমরগুঞ্জনগীতি, বনবনান্তের
আনন্দমর্মর, পরে নীলাম্বর হতে
ধীরে নামাইয়া আঁখি, নুমাইয়া গ্রীবা
টুটিয়া লুটিয়া যাব বায়ুস্পর্শভরে
ক্রন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে
কুসুমকাহিনীখানি আদি-অন্ত-হারা।

এমন সুন্দর এমন মর্মস্পর্শী পরিপূর্ণ যৌবনের কুসুমকাহিনী আর কোনো কবির মুখে কেউ কখনো শুনেছেন ?

১৫

পুষ্পরাজ্যেও আবিষ্কৃত আর-একটি উপমার পরিচয় দিই। চিত্রাঙ্গদা যেদিন তার সদ্যঃপ্রস্ফুটিত অলোকসামান্য রূপের প্রথম সাক্ষাৎ পান—

সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেত শতদল যেন কোরকবয়স
যাপিল নয়ন মুদি ; যেদিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেইদিন
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবরজলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে।

এই শব্দচিত্রের দিকে সহৃদয় ব্যক্তি চিরকাল 'রহিবে চাহিয়া সবিস্ময়ে'।

আলংকারিকদের মতে কবির যে জাদুমন্ত্রের বলে সাদৃশ্য সাযুজ্যে similarity identityতে পরিণত হয় সেই উক্তিই অতিশয়োক্তি। তাঁরা উদাহরণস্বরূপ বক্ষ্যমাণ শ্লোকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—

মল্লিকামালভারিণ্যঃ সর্বাঙ্গীণার্দ্রচন্দনাঃ
ক্ষৌমবত্যো ন লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নায়ামভিসারিকাঃ।

অর্থাৎ অভিসারিকা জ্যোৎস্নার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছেন, কেননা তিনি মল্লিকার মালা ধারণ করেছেন, সর্বাঙ্গে চন্দন লেপন করেছেন, এবং ক্ষৌমবাস পরিধান করেছেন। এখন চিত্রাঙ্গদার বিষয়ে কবির একটি উক্তি শোনা যাক—

উষার কনকমেঘ দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায় পূর্বপর্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি
করি বিকশিত, তেমনি বসন তার
মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে
সুখাবেশে।

এ কবির সাক্ষাৎ পেলে প্রাচীন আলংকারিকদের যে দশা ধরত সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। এরূপ উক্তির চিত্রাঙ্গদায় আর অন্ত নেই। এ ক্ষেত্রে আমি আলংকারিকদের ভাষায় বলতে বাধ্য হচ্ছি 'স্বয়ং পশ্য বিচারয়'। এখানে আর দুটি মাত্র উপমার উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি নে। চিত্রাঙ্গদা সুপ্ত অর্জুনের সম্বন্ধে বলেছেন—

শ্রান্ত হাস্য লেগে আছে ওষ্ঠপ্রান্তে তাঁর
প্রভাতের চন্দ্রকলা-সম, রজনীর
আনন্দের শীর্ণ অবশেষ…

দ্বিতীয়টি অর্জুনের উক্তি

তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি
যেমন নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা-অন্ধকার।

উক্ত কথা ক'টিতে কবির বাণী তার চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। সনৎকুমার নারদকে বলেছিলেন, 'অতিবাদী হও ; আর লোকে যদি তোমাকে অতিবাদী বলে তো বোলো যে, হাঁ আমি অতিবাদী।' কবিমাত্রই অতিবাদী। আর এই 'অতি' শব্দের মর্ম যিনি গ্রহণ করতে পারেন তিনিই মর্মে মর্মে অনুভব করবেন যে, চিত্রাঙ্গদার কবি চরম কবি।

১৬

আমি পূর্বে বলেছি, চিত্রাঙ্গদা একটি সম্পূর্ণ রাগিণী। টম্সন সাহেব এ কথা অস্বীকার করেন নি, কেননা তিনি বলেছেন It is a lyrical feast। কিন্তু উক্ত feast উপভোগ করে নাকি মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। কারণ উক্ত রাগিণীর আস্থায়ী erotic এবং অন্তরা immoral।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে, কবিতা সংগীতের স্বজাতীয়, তা হলে জিজ্ঞাসা করি, কানাড়া moral এবং কেদারা immoral, ভূপালী শ্লীল ও ভৈরবী অশ্লীল—এ-রকম কথা বলায় ছন্নতা ও মূর্খতা ছাড়া আর কিসের পরিচয় দেওয়া হয়?

যদি এ মত কেবলমাত্র শ্রীযুক্ত টম্সনের মত হত তা হলে এ বিষয়ে কোনো কথা বলবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, আর্টের moralityর বিচার করতে অনেকে সদাই উৎসুক। আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের পক্ষে মর‍্যালিটি অত্যাবশ্যক এবং সেই কারণে জীবনের এই অত্যাবশ্যক বস্তুটি আমরা সর্বত্রই খুঁজতে চাই। চুরি করা যে অধর্ম, এ বিষয়ে আমরা সকলে একমত। যাঁর নিজে চুরি করতে আপত্তি নেই, তিনিও তাঁর জিনিস পরে চুরি করলে তাঁকে পুলিসে ধরিয়ে দেন।

মৃচ্ছকটিক নাটকে পরের ঘরে সিঁদ কেটে চুরির একটি চমৎকার বর্ণনা আছে এবং শর্বিলকের মুখে চুরিবিদ্যার একটি সরস গুণকীর্তন আছে। যা মানুষ মাত্রেরই মতে immoral, সেই বিষয় নিয়ে কবি তাঁর কল্পনা খাটিয়েছেন, অথচ অদ্যাবধি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি সংস্কৃত সাহিত্য হতে মৃচ্ছকটিকের ও-অংশ বহিষ্কৃত করবার প্রস্তাব করেন নি। এর কারণ কি? এর কারণ সমাজে যা অধর্ম, কাব্যে তা রসে পরিণত হয়েছে। ফলে মৃচ্ছকটিক পড়ে কারো মনে চুরি করবার প্রবৃত্তি জন্মায় নি। মর‍্যালিটি হচ্ছে মানুষের ব্যাবহারিক আত্মার জিনিস, আর কাব্য তার অন্তরাত্মার। এই অন্তরাত্মার সঙ্গে ব্যাবহারিক আত্মার প্রভেদ কি তা জানতে চান তো দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করুন। কাব্যের যে জীবনের উপর কোনো প্রভাব নেই, এ কথা অবশ্য আমি বলতে চাই নে; কাব্যের আবেদন মানুষের moral senseএর কাছে নয়, spiritual senseএর কাছে। যা স্পিরিচুয়াল হিসাবে অমৃত তা যে মর‍্যাল হিসাবে বিষ এ কথা শোভা পায় শুধু জড়বুদ্ধির মুখে। বরং মানুষে চিরকাল এই বিশ্বাস করে এসেছে যে, মনের স্পিরিচুয়াল খোরাক মানবাত্মার সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি সাধন করে। এ বিশ্বাস ভ্রান্তি নয়।

১৭

চুলোয় যাক অন্তরাত্মা। ব্যাবহারিক আত্মার দিক থেকেই দেখা যাক। কবির স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ধারণা (attitude) কি হিসেবে জঘন্য? তা যে ঘৃণ্য সে কথা রোলো Rollo নামক অপর একটি অধ্যাপক স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন। তাঁর কথা হচ্ছে এই: one hates the view; এবং টম্সন এ কথা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। কবির মতে নাকি woman exists for man's sake; চিত্রাঙ্গদার শেষ কথাগুলিই নাকি কবির মনের কথা। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক যে তাই।

চিত্রাঙ্গদার শেষ নিবেদন এই যে, তিনি অর্জুনের শুধু প্রণয়িনী নয় তাঁর সহধর্মিণীও হতে চেয়েছিলেন। এই সহধর্মিণীর আদর্শ নাকি সেকালের অসভ্যদের আদর্শ, হিন্দুদের আদর্শ। কিন্তু একালের সভ্য মানবের, অর্থাৎ ইংরেজের, আদর্শ হচ্ছে স্ত্রীলোকের পুরুষের সহধর্মী হওয়া। পিতা যখন চিত্রাঙ্গদাকে

পুত্র করেছিলেন তখন অর্জুনের কর্তব্য ছিল তাঁকে ত্রাতা করা। তা হলেই টম্সন এবং রোলোর কাছে এ কাব্য জঘন্য না হয়ে বরেণ্য হত।

যখন এঁদের মুখে এ-সব বুলি শুনি, তখনই মনে হয় যে, বর্তমান সভ্যতার বুলিগুলি যেমন সাধু তেমনি ভুয়ো। Equality of the sexes বহুলোকের মুখে একটি সম্পূর্ণ নিরর্থক কথা, কেননা এ ক্ষেত্রে সাম্যের সঙ্গে ঐক্য শব্দের অর্থের প্রভেদের প্রতি তাঁরা নজর দেন নি। Woman exists for man's sake এ কথাটা তেমনি হাস্যকর যেমন man exists for woman's sake কথাটা হাস্যকর। সত্য কথা এই যে, এই দুটো কথাই আংশিক হিসাবে সত্য। টম্সন পরে বলেছেন যে, individual rights of womenএ চিত্রাঙ্গদার কবি বিশ্বাস করেন না। যদি তিনি না করেন, তার কারণ, অপরের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত ইন্‌ডিভিজুয়াল বলেও কোনো জীব নেই; অতএব তার কোনো রাইট্স্‌ও নেই। অধিকার কর্তব্য ইত্যাদি সামাজিক মানবের কথা, সুতরাং প্রতি অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই অসংখ্য কর্তব্য-বন্ধন আছে। স্ত্রীজাতিকে তার মনের ও জীবনের নানারূপ বন্ধন থেকে মুক্ত করে আমরা womanকে man করতে পারব না, পারব শুধু তাকে female করতে, কারণ instinctএর বন্ধন থেকে কোনো জীবকে মুক্ত করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। টম্সন যে-সভ্যতার মুখপাত্র সে-সভ্যতার বোধ হয় এই বিশ্বাস যে, স্ত্রীলোককে কোনোরকমে দ্বিতীয় পুরুষ করতে পারলেই বিশ্বমানব উত্তম পুরুষ হয়ে উঠবে।

স্ত্রীজাতি যে মানুষ হিসাবে পুরুষ জাতির equal, খৃস্টধর্মাবলম্বীরা এ সত্যের সন্ধান যুগযুগান্তরের পরে পেয়েছে। বাইবেলের মতে নারী আদিম মানবের একখানি পাঁজরার হাড় হতে সৃষ্ট। যুগ যুগ ধরে তারা এ কথা বেদবাক্য জ্ঞানে মেনে এসেছে। অতঃপর তাদের যখন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল তখন তারা সেই অস্থিজ জীবকে আবার মানুষ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল এবং তাদের কাছে যথার্থ মানুষ হচ্ছে পুরুষমানুষ। তাই তারা কাজে না হোক কথায় বিধির নিয়ম উলটে দিতে চায়। হিন্দুর কল্পনা কিন্তু চিরকালই বিভিন্ন। কালিদাস বলেছেন—

> স্ত্রীপুংসাবাত্মভাগৌ তে ভিন্নমূর্তেঃ সিসৃক্ষয়া।
> প্রসূতিভাজঃ সর্গস্য তাবেব পিতরৌ স্মৃতৌ॥

এ শুধু কবিকল্পনা নয়, ধর্মশাস্ত্রের ঐ একই কথা। মনু বলেছেন—

> দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমর্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
> অর্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥

১৮

মদন চিত্রাঙ্গদাকে বলেছিলেন—

> আমিই চেতন ক'রে দিই
> একদিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষণে
> নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ।

এই কাব্য এই শুভ পুণ্যক্ষণের কল্পনা। এবং কবিপ্রতিভার বলে এ পুণ্যমুহূর্ত একটি অনন্তমুহূর্ত হয়ে উঠেছে। যা জীবনে ক্ষণিকের, তাকেই মনোজগতে চিরদিনের করবার কৌশলের নামই আর্ট।

বসন্ত বলেছেন—

একটি প্রভাতে ফুটে অনন্ত জীবন...

আর মদন—

সংগীতে যেমন, ক্ষণিকের
তানে, গুঞ্জরি কাঁদিয়া ওঠে অন্তহীন
কথা।

চিত্রাঙ্গদা কাব্যের মর্মকথা মদন ও বসন্তই অমরবাণীতে বলে দিয়েছেন।

যে দেব 'নারীরে হইতে নারী পুরুষে পুরুষ' চেতন ক'রে দেয় তাঁর গ্রীক নাম Eros, এবং এই কারণেই পূর্বোক্ত শ্রেণীর সমালোচকরা এ কাব্যকে erotic বলেন।

এখন ইংরেজি ভাষায় এ শব্দটি হীন অর্থে ব্যবহৃত হয়। Erotic loveএর বাংলা আমি জানি নে, সম্ভবত তাঁরা যাকে platonic love বলেন, এ love তার উলটো। এবং এই জাতীয় সমালোচকদের কাছে উক্ত কারণে চিত্রাঙ্গদা অশ্লীল। এখন, এ কাব্য শ্লীল বা অশ্লীল সে বিচার করবার একটি বাধা আছে'। চিত্রাঙ্গদা যে অশ্লীল নয় তা প্রমাণ করতে হলে আমার যুক্তি সব অশ্লীল হয়ে পড়বে, আর আমি যখন দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনা করছি নে, তখন শ্লীলতার সামাজিক বন্ধন লঙ্ঘন করবার আমার কোনো অধিকার নেই। আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সৌন্দর্য, সত্য নয় ; সুতরাং এ ক্ষেত্রে রুচির কথাটা বড়ো কথা।

Love বিষয়ে শ্লীলতা রক্ষা করে আলোচনা করা যে অসম্ভব তার সাক্ষী স্বয়ং প্লেটো। তাঁর যে পুস্তক থেকে প্লেটনিক লভ্-এর কিংবদন্তী জন্মগ্রহণ করেছে সেই *Banquet* নামক অপূর্ব দার্শনিক বিচার বাংলায় কথায় কথায় অনুবাদ করা চলে না, কারণ অদার্শনিক পাঠকদের কাছে তা ঘোর অশ্লীল বলে গণ্য হবে। প্লেটনিক লভ্-এর বিচারই যদি এতাদৃশ ভয়াবহ হয়, তো অ-প্লেটনিক লভ্-এর বিচার যে বীভৎস হবে তা বলাই বাহুল্য।

১৯

প্লেটনিক লভ্ একটি আকাশকুসুম। সুতরাং এক দলের লোকের কাছে তা যেমন বিদ্রূপের বিষয়, অপর আর-এক দল লোকের কাছে তা তেমনি শ্রদ্ধার বিষয়। এখন, উক্ত মতের ভক্তদের জিজ্ঞাসা করি, কুসুম মাত্রই কি আকাশকুসুম নয়? গাছের মূল থাকে মাটিতে, কিন্তু তার ফুল ফোটে আকাশে। ফুল দেখবামাত্র যে-লোকের তার মূলের কথাই বেশি করে মনে পড়ে সে ফুলের যথার্থ সাক্ষাৎ পায় না, পায় শুধু মাটির। সুন্দরের হিসেব থেকে ফুল আকাশকুসুম মাত্র, এবং তাতেই তার সার্থকতা ; কিন্তু সত্যের হিসেব থেকে তা সমগ্র সৃষ্টিপ্রকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে অনুস্যূত। আমরা যাকে প্রেম বলি, তাও মনোজগতের বস্তু হলেও

দেহের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত নয়। যেমন পার্থিব ফুলের রূপ তার একমাত্র গুণ নয়, উপরন্তু তার প্রাণ আছে ; তেমনি মানবপ্রেম শুধু চিদাকাশের কুসুম নয়, দেহ ও মন উভয় জগৎ অধিকার করেই তা বিরাজ করে। তার পর দেহ-মনের বিভাগটা কি তেমন সুনির্দিষ্ট? দেহের কোথায় শেষ ও মনের কোথায় আরম্ভ, তা কি আমাদের প্রত্যক্ষ?

ভারতচন্দ্র বলেছেন—

ভূতময় দেহ নবদ্বার গেহ নব-নারী কলেবরে।
গুণাতীত হয়ে নানা গুণ লয়ে দোঁহে নানা খেলা করে॥
উত্তম অধম স্থাবর জঙ্গম সব জীবের অন্তরে
চেতনাচেতনে মিলি দুই জনে দেহিদেহ রূপ ধরে।
অভেদ হইয়া ভেদ প্রকাশিয়া একি করে চরাচরে॥

যদি কোনো কবির কল্পনায় দেহ-দেহীর ভেদাভেদজ্ঞান মূর্ত হয়ে ওঠে তা হলে সে কবির কল্পনাকে কি শুধু দৈহিক বলা চলে? যা কেবলমাত্র দৈহিক তার অন্তরে সত্য আছে কিন্তু সৌন্দর্য নেই। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করতেন যে, কামলোকের উপরে রূপলোক বলে আর-একটি লোক আছে। যে ব্যক্তি তাঁর বর্ণিত বিষয়কে কামলোক থেকে রূপলোকে তুলতে পারেন তিনিই যথার্থ কবি। চিত্রাঙ্গদা যে রূপলোকের বস্তু, কামলোকের নয়, তা যাঁর অন্তরে চোখ আছে তিনিই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। যাঁদের তা নেই, অর্থাৎ যাঁরা অন্ধ, তাঁদের সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা।

অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

কিছু
তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে। এক-
বিন্দু স্বর্গ শুধু, ভূমিতলে ভুলে প'ড়ে
গেছে?

চিত্রাঙ্গদা

তাই বটে।

এ কাব্য সম্বন্ধে এই শেষ কথা। Erotic কাব্য বলে কোনো বস্তু নেই, কেননা যে মুহূর্তে কবির কল্পনা কাব্য-আকার ধারণ করে সেই মুহূর্তেই তা eroticism অতিক্রম করে। আমি পূর্বে বলেছি চিত্রাঙ্গদা, মেঘদূত ও কুমারসম্ভবের স্বজাতি এবং মেঘদূত ও কুমারের মতোই তা কাব্যজগতে অমর। চিত্রাঙ্গদা একাধারে কাব্য চিত্র ও সংগীত, অতএব তা চরম কাব্য। কেননা চিত্রাঙ্গদায় আর্টের ত্রিধারার পূর্ণ মিলন হয়েছে। আর্ট হিসাবে চিত্রাঙ্গদার আর-একটি মহাগুণ তার পরিমিত ও পরিচ্ছিন্ন আয়তন, এর আস্থায়ী-অন্তরার পর যদি আভোগ-সঞ্চারী থাকত, অর্থাৎ এ স্বপ্ন যদি আরো বিস্তৃত হত, তা হলে পাঠকের মন স্বপ্নলোক হতে সুষুপ্তিলোকে চলে যেত।

চৈত্র ১৩৩৪

ভারতচন্দ্র

শান্তিপুর সাহিত্য-সম্মিলনীতে সভাপতির অভিভাষণ

গত বছর দু-তিন ধরে বাংলাদেশের মফস্বলে নানা সাহিত্য-সমিতির বাৎসরিক উৎসবে যোগদান করবার জন্য আমি নিয়মিত নিমন্ত্রিত হই। বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের অনুরক্ত ভক্তবৃন্দ যে আমাকে তাঁদের সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করেন, এ আমার পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নয়। কারণ এই সূত্রে প্রমাণ হয় যে, আমার পক্ষে বঙ্গ সাহিত্যের চর্চাটা বৃথা কাজ বলে গণ্য হয় নি। ভারতচন্দ্র বলেছেন—

যার কর্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে

বাঙালি জাতি যে মনে করে লেখা জিনিসটি আমার সাজে, এ কি আমার পক্ষে কম শ্লাঘার কথা ?

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ অধিকাংশ নিমন্ত্রণই আমি রক্ষা করতে পারি নে। ইংরেজিতে যাকে বলে The spirit is willing, but the flesh is weak, আমার বর্তমান অবস্থা হয়েছে তাই। সমস্ত বাংলাদেশময় ছুটে বেড়াবার মতো আমার শরীরে বলও নেই, স্বাস্থ্যও নেই। যে স্বল্পপরিমাণ শারীরিক বল ও স্বাস্থ্যের মূলধন নিয়ে জীবনযাত্রা আরম্ভ করি, কালক্রমে তার অনেকটাই ক্ষয় হয়েছে ; যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকু কৃপণের ধনের মতো সামলে ও আগলে রাখতে হয়। তৎসত্ত্বেও শান্তিপুরের নিমন্ত্রণ আমি অগ্রাহ্য করতে পারলুম না। এর কারণ নিবেদন করছি।

প্রথমত, একটি চিরস্মরণীয় লেখক সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে, এবং সে-সব কথা শোনবার অনুকূল শ্রোতার অভাব, আমার বিশ্বাস, এ নগরীতে হবে না। দ্বিতীয়ত, উক্ত সূত্রে আমার নিজের সম্বন্ধেও দু-একটি ব্যক্তিগত কথা বলতেও আমি বাধ্য হব। সমালোচকেরা যখন সাহিত্য-সমালোচনা করতে ব'সে কোনো সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও চরিত্রের আলোচনা শুরু করেন, তখন প্রায়ই তা আক্ষেপের বিষয় হয় ; কারণ কোনো লেখকের লেখা থেকে তাঁর জীবন-চরিত উদ্ধার করা যায় না। তবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা-প্রণোদিত সমালোচক-দের কৌতূহল যথাসাধ্য চরিতার্থ করাও আমি এ যুগের সাহিত্যিকদের কর্তব্য বলে মনে করি। যুগধর্মানুসারে একালে সাহিত্য-সমালোচনাও একরকম বিজ্ঞান। এবং তার জন্য নাকি লোকের ঘরের খবর জানা চাই।

সম্প্রতি কোনো সমালোচক আবিষ্কার করেছেন যে, আমি হচ্ছি এ যুগের ভারতচন্দ্র, অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের বংশধর। এমন কথা বলার উদ্দেশ্য আমার নিন্দা করা কি ভারতচন্দ্রের প্রশংসা করা, তা ঠিক বোঝা গেল না। যদি আমার নিন্দা হয় তো

ভারতচন্দ্র সে নিন্দার ভাগী হতে পারেন না ; আর যদি ভারতচন্দ্রের প্রশংসা হয় তো সে প্রশংসার উত্তরাধিকারী আমি নই। সম্ভবত সমালোচকের মুখে ভারত-চন্দ্রের স্তুতি ব্যাজস্তুতি, অর্থাৎ বর্ণচোরা নিন্দা মাত্র। এখন এ স্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, যে-জাতীয় নিন্দা-প্রশংসার আমরা অধিকারী ভারতচন্দ্র সে-জাতীয় নিন্দা-প্রশংসার বহির্ভূত।

ভারতচন্দ্র আজ থেকে প্রায় একশো আশি বৎসর পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করেছেন, অথচ আজও আমরা তাঁর নাম ভুলি নি, তাঁর রচিত কাব্যও ভুলি নি, এমন-কি, তাঁর রচিত সাহিত্য নিয়ে আজও আমরা উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করছি।

অপর পক্ষে আজ থেকে একশো আশি বৎসর পরে বাংলার ক'জন সাহিত্যিকের নাম বাঙালি জাতি মনে করে রাখবে? আমার বিশ্বাস, বর্তমান সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। এতদ্ব্যতীত আরো দু-এক জনের নাম হয়তো আগামীকালের বঙ্গ সাহিত্যের কোনো ইতিহাসের ভিতর খুঁজে পাওয়া যাবে ; বাদবাকি আমরা সব জলবুদ্‌বুদ্‌, জলে মিশিয়ে যাব।

আর-একটি কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, গত একশো আশি বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সভ্যতার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। দেশ এখন ইংরেজের রাজ্য ; আমাদের কর্মজীবন এখন ইংরেজরাজের প্রবর্তিত মার্গ অবলম্বন করেছে। ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার ফলে আমাদের মনোজগতেও বিপ্লব ঘটেছে। অথচ দেশের লোকের জীবনে ও মনে এই খণ্ডপ্রলয়ের মধ্যেও ভারতচন্দ্র চিরজীবী হয়ে রয়েছেন। এরই নাম সাহিত্যে অমরতা। আর এ ক্ষেত্রে সমালোচনার কার্য লৌকিক নিন্দা-প্রশংসা নয়, এই অমরতার কারণ আবিষ্কার করা ; কিন্তু তা করতে হলে মনকে রাগদ্বেষ থেকে মুক্ত করতে হয়। অথচ দুর্বিনীত সাহিত্যে রাগই পুরুষের লক্ষণ বলে গণ্য।

সকল দেশের সকল সাহিত্যেরই এমন দু-একটি সাহিত্যিক থাকেন, যাঁরা লোকমতে যুগপৎ বড়ো লেখক ও দুষ্ট লেখক বলে গণ্য। উদাহরণ স্বরূপ ইতালিদেশের মাকিয়াভেলির নাম করা যেতে পারে। মাকিয়াভেলির *The Prince* সাহিত্য হিসেবে ও রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে যে ইউরোপীয় সাহিত্যের একখানি অপূর্ব ও অতুলনীয় গ্রন্থ, এ কথা ইউরোপের কোনো মনীষী অস্বীকার করেন না, অথচ মাকিয়াভেলি নামটি গাল হিসারেই প্রসিদ্ধ।

আমাদের ভাষার ক্ষুদ্রপ্রাণ সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের নামটিও উক্ত পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে। ভারতচন্দ্রের এ দুর্নামের মূলে কতটা সত্য আছে, সেটা এখন যাচিয়ে দেখা দরকার। কারণ কুসংস্কার মাত্রই কালক্রমে সমাজে সুসংস্কার বলে গণ্য হয়। সাহিত্যসমাজেও অনেক সময়ে উক্ত হিসেবে কু সু এবং সু কু হয়ে উঠে।

ভারতচন্দ্রের সঙ্গে কোন্ কোন্ বিষয়ে এ যুগের সাহিত্যিকদের কতটা মিল আছে সে বিষয়ে ঈষৎ লক্ষ্য করলেই ভারতচন্দ্রের যথার্থ রূপ ফুটে উঠবে।

প্রথমে তাঁর জীবনচরিত আলোচনা করা যাক। বলা বাহুল্য, তাঁর জীবন সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা নেই। তবে তিনি নিজমুখেই তাঁর জীবনের দুটি-চারটি মোটা ঘটনা প্রকাশ করেছেন।

আমার অকরুণ সমালোচক বলেছেন যে, ভারতচন্দ্র ও আমি— আমরা উভয়েই— উচ্চব্রাহ্মণবংশে উপরন্তু ভূসম্পন্ন ব্যক্তির ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি। ভারত-চন্দ্রের সম্বন্ধে ঘটনা যে তাই, তিনি তা গোপন করতে চেষ্টা করেন নি। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছেন যে—

> ভুরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়
> মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
> ভারত তনয় তাঁর অন্নদামঙ্গল সার
> কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

এখন জিজ্ঞাসা করি, কোনো লেখকের লেখা বিচার করতে বসে তার কুলের পরিচয় নেবার ও দেবার সার্থকতা কি। বিশেষত, সে বিচারের উদ্দেশ্য যখন লেখককে অপদস্থ করা।

যদি পৃথিবীর এমন কোনো নিয়ম থাকত যে, লেখক উচ্চব্রাহ্মণবংশীয় হলেই তাঁকে নিম্নশ্রেণীর লেখক হতে হবে, তা হলে সমালোচক অবশ্য কুলজ্ঞ হতে বাধ্য। কিন্তু ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করাটা তো সাহিত্যসমাজে লজ্জার বিষয় নয়। ভারত-চন্দ্রের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু কবি তো জাতিতে ব্রাহ্মণ, এবং তার জন্য তাঁদের ইতিপূর্বে কেউ তো হীনচক্ষে দেখে নি।

শুনতে পাই, ভারতবর্ষের দক্ষিণাপথে Non-Brahmin Movement নামক একটি ঘোর আন্দোলন চলছে, কিন্তু সে শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে। আমি উক্ত আন্দোলনের পক্ষপাতী। কিন্তু উত্তরাপথের সাহিত্যক্ষেত্রেও যে ব্রাহ্মণনিগ্রহের জন্য কোনো দল বদ্ধপরিকর হয়েছে, এমন কথা আজও শুনি নি। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে স্বীকার করছি যে, আমিও সেই সম্প্রদায়ের লোক, যে সম্প্রদায়ের গায়ত্রীমন্ত্রে জন্মসুলভ অধিকার আছে। এ বংশে জন্মগ্রহণ করাটা এ যুগে অবশ্য গৌরবের কথা নয়, কিন্তু অগৌরবের কথাও তো নয়।

সম্ভবত সমালোচকের মতে একে ব্রাহ্মণ তায় ভূসম্পন্ন হওয়াটা, একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধের সংযোগের তুল্য। ভারতচন্দ্র এ জাতীয় সমালোচকের মতে যতটা অবজ্ঞার পাত্র, কবিকঙ্কণ বোধ হয় ততটা নন। কারণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীকাব্যের আরম্ভে এই বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন যে—

> দামুন্যায় চাষ চষি।

কিন্তু চাষ না চষলে যে বড়ো লেখক হওয়া যায় না, সাহিত্যজগতে তারও কোনো প্রমাণ নেই। কারণ ধানের চাষ পৃথিবীতে একমাত্র চাষ নয়, মনের চাষ বলেও একরকম চাষ আছে, আর সেই চাষেরই ফসল হচ্ছে সাহিত্য। অন্তত এতদিন তাই ছিল।

আমার মনে হয় যে, ভারতচন্দ্রের জাতি ও সম্পত্তির উপর কটাক্ষ করবার এক-মাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ইঙ্গিতে এই কথাটা সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, এরূপ বংশে জন্মগ্রহণ করবার জন্যই সাহিত্যচর্চা তাঁর পক্ষে বিলাসের একটি অঙ্গমাত্র ছিল। সুতরাং তিনি যে সাহিত্য রচনা করেছেন, সে হচ্ছে বিলাসী সমাজের প্রিয়। আজীবন বিলাসের মধ্যে লালিত-পালিত হলে লোকে যে-সরস্বতীর সেবা করে তাঁর নাম নাকি দুষ্ট সরস্বতী। লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলন সাহিত্যজগতে যে অনর্থ ঘটায়, এমন কথা অপরের মুখেও, অপর কোনো কবির সম্বন্ধেও শুনেছি। সুতরাং ভারতচন্দ্রের জীবন কতটা বিলাসবৈভবপূর্ণ ছিল, তারও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

সমালোচকরা আবিষ্কার করেছেন যে, আমার জীবন হচ্ছে একটি ট্রাজেডি। এক হিসেবে মানুষমাত্রেরই জীবন একটা ট্রাজেডি এবং আমি অবশ্য সাধারণ মানবধর্ম-বর্জিত নই। কিন্তু কি কারণে আমার জীবন অনন্যসাধারণ ট্রাজেডি সে কথাটা তাঁরা প্রকাশ করে বলেন নি, বোধ হয় এই কারণে যে, আমার জীবন সুখময় কি দুঃখময়, তা অপরের কাছে সম্পূর্ণ অবিদিত। আর আমার জীবনের যে-পরিচয় সকলেই পান, তাকে ঠিক ট্রাজেডি বলা চলে না। আমার মাথার উপর চাল আছে, আর সে চালে খড় আছে, আমার ঘরে ক্ষুধার চাইতে বেশি অন্নের সংস্থান আছে, উপরন্তু আমার পরিধানের বস্ত্র আছে, ইংরেজি বাংলা দুরকমেরই। এর বেশি সামাজিক লোকে আর কি চায়? আর যে progressএর আমরা জাতকে জাত অনুরক্ত ভক্ত হয়ে পড়েছি, তারই বা চরম পরিণতি কি? সকলের পেটে ভাত ও পরনে কাপড়ই এ যুগে মানবসভ্যতার চরম আদর্শ নয় কি? সম্ভবত আমার গুণগ্রাহী সমালোচকদের বক্তব্য হচ্ছে, আমার সাংসারিক জীবন নয়, সাহিত্যিক জীবনই একটা মস্ত ট্রাজেডি; অর্থাৎ আমার সাংসারিক জীবন মহা ট্রাজেডি হলে আমার সাহিত্যিক জীবন এত বড়ো প্রহসন হত না।

সে যাই হোক, ও বিষয়ে ভারতচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের কোনো মিল নেই। ভারতচন্দ্রের সাংসারিক জীবন ছিল সত্যই একটি অসাধারণ ট্রাজেডি। সংক্ষেপে ভারতচন্দ্রের জীবনের মূল ঘটনাগুলি বিবৃত করছি, তার থেকেই প্রমাণ পাবেন যে, তাঁর জীবনের তুল্য ট্রাজেডি বাংলার কোনো সাহিত্যিকেরই জীবনে নেই : এমন-কি, তাঁদেরও নেই যাঁদের সাহিত্যিক জীবন হচ্ছে একেবারে ডিভাইন কমেডি।

ভারতচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে আমি কোনোরূপ গবেষণা করি নি, কারণ এ জ্ঞান আমার বরাবরই ছিল যে, ভগবান আমাকে কোনো বিষয়ে গবেষণা করবার জন্য এ পৃথিবীতে পাঠান নি। সুতরাং পরের মুখের কথার উপরই আমাকে নির্ভর করতে হবে।

১৩০২ শতাব্দে দ্বারকানাথ বসু নামক জনৈক ব্যক্তি 'কবির জীবনী সম্বলিত' ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন। এই অখ্যাতনামা প্রকাশকের প্রস্তাবনা হতে

আমি ভারতচন্দ্রের জীবনী সংগ্রহ করেছি। আমার বিশ্বাস, বসুমহাশয়ের দত্ত বিবরণ সত্য। কারণ বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থে প্রায় একই গল্প বলেছেন; শুধু বসুমহাশয়ের বঙ্গাব্দ সেনমহাশয়ের হাতে খৃস্টাব্দে পরিণত হয়েছে, এই তফাত।

১৭১২ খৃস্টাব্দে ভারতচন্দ্র হুগলি জেলার অন্তর্গত পেঁড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভূরসুট পরগনার অধিপতি ছিলেন। বর্ধমানাধিপতির সঙ্গে বিবাদে তিনি সর্বস্বান্ত হন।

ভারতচন্দ্রের বয়স তখন এগারো বছর। এই অল্প বয়সেই তিনি বিদ্যাভ্যাসার্থ লালায়িত হন। পিতার বর্তমান নিঃস্ব অবস্থায় যথারীতি বিদ্যাশিক্ষার অসুবিধা হওয়ায় তিনি 'পলায়ন পূর্বক' মাতুলালয়ে গমন করেন; এবং তথায় সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান অতি যত্নসহকারে অধ্যয়ন করেন। উভয় বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ ক'রে তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে পেঁড়োয় ফিরে আসেন। অতঃপর তাঁর বিবাহ হয়।

অর্থকরী পারস্য ভাষা শিক্ষা না করে অনর্থকরী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের দ্বারা ভর্ৎসিত হয়ে তিনি পুনরায় গৃহত্যাগ করেন।

তার পর দেবানন্দপুর গ্রামের জমিদার রামচন্দ্র মুনশির আশ্রয়ে থেকে তিনি অতিপরিশ্রমপূর্বক পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করেন। বিদ্যাভ্যাসের জন্য তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করেছিলেন। দিনে স্বহস্তে একবার মাত্র রন্ধন করে তাই দু বেলা আহার করতেন। অনেক সময়ে বেগুনপোড়া ছাড়া আর-কিছু তাঁর কপালে জুটত না। এই সময়ে ভারতচন্দ্র কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন। পারস্য ভাষায় বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করে তিনি বিশ বৎসর বয়সে বাড়ি ফেরেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তখন তাঁর অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে ভারতচন্দ্রকে তাঁদের মোক্তার নিযুক্ত করে বর্ধমানের রাজধানীতে তাঁদের হয়ে দরবার করতে পাঠান। রাজকর্মচারীদের চক্রান্তে ভারতচন্দ্র বর্ধমানে কারারুদ্ধ হন। তার পর কারাধ্যক্ষের কৃপায় জেল থেকে পালিয়ে কটকে মারহাট্টাদের সুবেদার শিবভট্টের আশ্রয়ে কিছুকাল বাস করেন। পরে তিনি শ্রীক্ষেত্রে বৈষ্ণবদের সঙ্গে বাস করে শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং বৈষ্ণবগ্রন্থনিচয় পাঠ করেন। ফলে তিনি ভক্তিমান্‌ বৈষ্ণব হয়ে গেরুয়া বসন ধারণ করে সদাসর্বদা ধর্মচিন্তায় কালাতিপাত করতেন। তার পর বৃন্দাবনধাম-দর্শন-মানসে তিনি শ্রীক্ষেত্র হতে পদব্রজে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথিমধ্যে খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামে তাঁর শ্যালীপতি ভ্রাতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁরই অনুরোধে ভারতচন্দ্র আবার সংসারী হতে স্বীকৃত হন, এবং অর্থোপার্জনের জন্য ফরাসডাঙায় দুপ্লে সাহেবের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কিছুদিন পরে নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র টাকা ধার কববার জন্য ইন্দ্র-

নারায়ণ চৌধুরীর নিকট উপস্থিত হন, এবং তাঁরই অনুরোধে কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে মাসিক চল্লিশ টাকা মাইনেয় নিজের সভাসদ্ নিযুক্ত করেন।

এই সময়ে তিনি অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্নদামঙ্গল শুনে খুশি হয়ে ভারতচন্দ্রকে মুলাজোড় গ্রাম ইজারা দেন এবং সেখানে বাড়ি তৈরি করবার জন্য এককালীন একশো টাকা দান করেন। এই গ্রামেই তিনি ৪৮ বৎসর বয়েসে ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

তাঁর শেষবয়েসের ক'টা দিন যে কি ভাবে কেটেছিল, তার পরিচয় তাঁর রচিত নাগাষ্টকে পাওয়া যায়। আমি উক্ত অষ্টকের তিনটি মাত্র চৌপদী এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

গতে রাজ্যে কার্যে কুলবিহিতবীর্যে পরিচিতে
ভবেদ্দেশে শেষে সুরপুরবিশেষে কথমপি।
স্থিতং মুলাজোড়ে ভবদনুবলাৎ কালহরণং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥
বয়শ্চত্বারিংশত্তব সদসি নীতং নৃপ ময়া
কৃতা সেবা দেবাদধিকমিতি মত্বাপ্যহরহঃ।
কৃতাবাটী গঙ্গাভজনপরিপাটী পুটকিতা
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥
পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরহিণী
হতাশাদাসাদ্যাশ্চকিতমনসো বান্ধবগণাঃ।
যশঃ শাস্ত্রং শস্ত্রং ধনমপি চ বস্ত্রং চিরচিতং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥

যিনি রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করে এগারো বৎসর বয়সে পরভাগ্যোপজীবী হতে বাধ্য হন, যিনি এগারো থেকে বিশ বৎসর পর্যন্ত পরের আশ্রয়ে পরান্নভোজনে জীবন-ধারণ করে বিদ্যা অর্জন করেন, তার পর আত্মীয়স্বজনের জন্য ওকালতি করতে গিয়ে কারারুদ্ধ হন, তার পর জেল থেকে পালিয়ে স্বদেশ ত্যাগ করে কটকে গিয়ে মারহাট্টাদের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, তার পর শ্রীক্ষেত্রে বৈষ্ণবশাস্ত্র চর্চা করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তার পর আবার গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবার জন্য প্রথমে দুপ্লে সাহেবের দেওয়ানের, পরে কৃষ্ণনগরের রাজার নিকট আশ্রয় পান, আর তথায় মাসিক চল্লিশ টাকা মাইনের চাকর হয়ে কাব্যরচনা করেন, এবং শেষকালে গঙ্গাতীরে বাস করতে গিয়ে আবার বর্ধমান-রাজার কর্মচারিগণ কর্তৃক নানারকম উৎপীড়িত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন, তিনি যে কতটা বিলাসের মধ্যে লালিতপালিত হয়েছিলেন তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন।

এরূপ জীবন কল্পনা করতেও আমাদের আতঙ্ক হয়। আমাদের জীবন আজও অবশ্য হ্রাসবৃদ্ধির নিয়মের অধীন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মতো অবস্থার বিপর্যয় আজ কারো কপালে ঘটে না। ভারতচন্দ্রের জীবন দেশব্যাপী ভূমিকম্প ও ঝড়-

জলের ভিতর কেটে গেছে। সেকালের দেশের অবস্থা যদি কেউ জানতে চান, তা হলে তিনি অন্নদামঙ্গলের গ্রন্থসূচনা পড়ুন। সেকালে এ দেশের লোকের আরামও ছিল না, বিলাসী হবার সুযোগও ছিল না। ভারতচন্দ্র বলেছেন—

ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।

সে যুগে দেশের কোনো লোকের হাতে ক্ষণেকের জন্য চাঁদ আসুক আর না আসুক, অনেকের ভাগ্যেই ক্ষণে হাতে দড়ি পড়ত। ভারতচন্দ্রের তুলনায় আমরা সকলেই আলালের ঘরের দুলাল, অর্থাৎ আমরা সকলেই কলের জল খাই, রেলগাড়িতে ঘোরাফেরা করি, পদব্রজে পুরী থেকে বৃন্দাবন তো দূরের কথা, শ্যামবাজার থেকে কালীঘাটে যেতে প্রস্তুত নই; এবং চল্লিশ টাকা মাস-মাইনেয় কাব্য লেখা দূরে থাক্, অত কমে আমরা কেউ মাসিক পত্রের এডিটারি করতেও নারাজ। নিজেরা আরামে আছি বলে আমরা মনে করি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যাঁরা কবিতা লিখতেন, তাঁরা সব দাঁতে হীরে ঘষতেন আর তাঁদের ঘরে রুইমাছ ও পালং শাক ভারে ভারে আসত।

এ হেন অবস্থায় পড়লে শতকরা নিরানব্বই জন লোকের মন বিষাক্ত ও রসনা কণ্টকিত হয়ে ওঠে, এবং বিলাসীর মন তো একেবারে জীবন্মৃত হয়ে পড়ে। এখন দেখা যাক, সাংসারিক জীবনের এত দুঃখকষ্ট ভোগ করে ভারতচন্দ্রের মনের আলো নিবে গিয়েছিল, না, আরো জ্বলে উঠেছিল। ভারতচন্দ্র তাঁর স্ত্রীর মুখ দিয়ে যে পতিনিন্দা করিয়েছেন, সেই নিন্দার ভিতরই আমরা তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাব। সেই নিন্দাবাদটি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব আমার দুঃখ কর অবগতি॥
মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র জোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে॥
নানাশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলংকার।
কত মতে কত বলে বলিহারি তার॥
শাঁখা সোনা রাঙা শাড়ি না পরিনু কভু।
কেবল কাব্যের গুণে প্রমোদের প্রভু॥

এই ব্যাজনিন্দা হচ্ছে ভারতচন্দ্রের আত্মকথা। ঐ কথা শুনে আমরা দুটি জিনিসের পরিচয় পাই: রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ হয়েও তাঁর দারিদ্র্য ঘোচে নি, এবং দারিদ্র্য তাঁকে নিরানন্দ করতে পারে নি, করেছিল শুধু 'প্রমোদের প্রভু'। এ প্রভুত্ব হচ্ছে ব্যাবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রভুত্ব। যথার্থ আর্টিস্টের মন সকল দেশেই সংসারে নির্লিপ্ত, কস্মিন্‌কালে বিষয়বাসনায় আবদ্ধ নয়। যে লোক ইউরোপে দ্বিতীয় শেক্‌সপীয়ার বলে গণ্য, সেই Cervantes সের্‌ভান্তেসের জীবন বিষম

দুঃখময় ছিল, অথচ তাঁর হাসিতে সাহিত্যজগৎ চির-আলোকিত। এই হাসিকে ইউরোপীয়েরা বলেন বীরের হাসি। এ-জাতীয় হাসির ভিতর যে বীরত্ব আছে তা অবশ্য পল্টনী বীরত্ব নয়, ব্যাবহারিক জীবনের সুখদুঃখকে অতিক্রম করবার ভিতর যে বীরত্ব আছে, তাই। এ হাসির মূলে কি আছে ভারতচন্দ্র নিজেই বলে দিয়েছেন। তাঁর কথা হচ্ছে এই—

চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচেতচিত্ত সেই সদা দুখী॥

৮

পূর্বেই বলেছি ভারতচন্দ্রের জীবনীর বিষয় বিশেষ কিছু জানা নেই। তাঁর রচিত অন্নদামঙ্গল, মানসিংহ, সত্যনারায়ণের পুঁথি প্রভৃতিতে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাই অবলম্বন করে এবং লোকমুখে তাঁর সম্বন্ধে কিংবদন্তী শুনে কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর যে জীবনচরিত লেখেন, সেই জীবনচরিত থেকেই তাঁর পরবর্তী লেখকেরা তাঁর জীবনের ইতিহাস গড়ে তুলেছেন। সেই ইতিহাসটি আপনাদের কাছে এইজন্য ধরে দিলুম যে, আপনারা সকলেই দেখতে পাবেন যে, তাঁর কাব্যের দোষগুণ তাঁর অসার চরিত্রের ফুল কিংবা ফল নয়, বরং ঠিক তার উলটো। তাঁর কাব্যের চরিত্র যাই হোক, তাঁর নিজের চরিত্র ছিল অনন্যসাধারণ আত্মবশ। দ্বিতীয়ত, তাঁর ঘোর দুঃখময় জীবনের ছায়া তাঁর কাব্যের গায়ে পড়ে নি। ব্যাপারটির প্রতি সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য। কারণ তথাকথিত ইংরেজি শিক্ষার প্রসাদে আমাদের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, মানুষের মন তার জীবনের বিকার মাত্র। বিশেষত, যারা অচেতচিত্ত, তাদের মনে এই ধারণা একেবারে বদ্ধমূল হয়েছে। তা যে হয়েছে তার প্রমাণ, এ যুগে ইউরোপে বহু কবি আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁরা শুধু নিজের সুখদুঃখের গান গেয়েছেন— কখনো হেসে, কখনো কেঁদে। প্রথমপুরুষকে উত্তমপুরুষ গণ্যে তারই কথাই হয়েছে তাঁদের কাব্যের মাল ও মসলা। কিন্তু এ'দেরও এই স্ব বস্তুটি যে ক্ষেত্রে অহং সে ক্ষেত্রে তাঁরা অকবি, আর যে ক্ষেত্রে তা আত্মা সে ক্ষেত্রে তাঁরা কবি। অহং ও আত্মা যে এক বস্তু নয়, সে কথা কি এ দেশে বুঝিয়ে বলা দরকার? ভারতচন্দ্র ছোটো হোন বড়ো হোন— জাতকবি, সুতরাং তাঁর অহংএর পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই। ভারত-চন্দ্রের কাব্যের যথার্থ বিচার করতে হলে তিনি যে রাজার ছেলে এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ, আর কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র যে দূষিত এ-সব কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে হবে। সুখের বিষয়, সংস্কৃত কবিদের জীবনচরিত আমাদের কাছে অবিদিত, নচেৎ সমা-লোচকদের হাতে তাঁরাও নিস্তার পেতেন না।

৯

আন্দাজ দশ-বারো বৎসর আগে আমি দারজিলিং শহরে একটি সাহিত্যসভায় রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে ইংরেজি ভাষায় একটি

নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করি। পরে দেশে ফিরে সেই প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করি। বলা বাহুল্য, প্রাক-বৃটিশ যুগের, ভাষান্তরে নবাবি আমলের, বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতচন্দ্রের নাম উহ্য রাখা চলে না। তাই উক্ত প্রবন্ধে বিদ্যাসুন্দর-নামক কাব্যের দোষগুণ বিচার করতে আমি বাধ্য হই। সে প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের অতিপ্রশংসাও নেই, অতিনিন্দাও নেই। এর কারণ নিন্দা-প্রশংসায় যাঁরা সিদ্ধহস্ত, তাঁদের ও-বিষয়ে অতিক্রম করবার আমার প্রবৃত্তিও নেই, শক্তিও নেই। কারো পক্ষে অথবা বিপক্ষে জোর ওকালতি করা আমার সাধ্যের অতীত। প্রমাণ, আমি ব্যারিস্টারি পরীক্ষা পাস করেছি কিন্তু আদালতের পরীক্ষায় ফেল হয়েছি। ভারতচন্দ্র বলেছেন, উকিলের—

সবে গুণ, যত দোষ মিথ্যা কয়ে সারে।

সাহিত্যের আদালতে এ গুণের গুণগ্রাহীরা আমাকে নির্গুণ বলেই প্রচার করেছেন।

সে যাই হোক, উক্ত প্রবন্ধ থেকেই সাধু সাহিত্যাচার্যেরা ধরে নিয়েছেন যে, আমি আর ভারতচন্দ্র দুজনে হচ্ছি পরস্পরের মাসতুতো ভাই। আমি উক্ত ইংরেজি প্রবন্ধটি আজ আবার পড়ে দেখলুম, তাতে এমন একটিও কথা নেই যা আমি তুলে নিতে প্রস্তুত। সমালোচকদের স্থূলহস্তাবলেপের ভয়ে আমি আমার মতামতকে ডিগবাজি খাওয়াতে শিখি নি।

যা একবার ইংরেজিতে বলেছি, বাংলায় তার পুনরুক্তি করবার সার্থকতা নেই। শুধু তার একটি মত সম্বন্ধে এ ক্ষেত্রে দু-চার কথা বলতে চাই। সে কথাটি এই—

Bharatchandra, as a supreme literary craftsman, will ever remain a master to us writers of the Bengali language.

১০

আমি এখন লেখক হিসেবেই, পাঠক হিসেবে নয়, ভারতচন্দ্রের লেখার সম্বন্ধে আরো দু-চারটি কথা বলতে চাই। আমি যে একজন লেখক, সে কথা অবশ্য তাঁরা স্বীকার করেন না, যাঁরা আমার লেখা আদ্যোপান্ত পড়েছেন, এমন-কি, তার microscopic examination করেছেন। ভাগ্যিস আমাদের চোখের জ্যোতি এক্‌স-রে নয়, তা হলে আমরা চার পাশে শুধু নরকঙ্কাল দেখতে পেতুম। কিন্তু আপনারা যে আমাকে লেখক বলে গণ্য করেন, তার প্রমাণ, আপনারা আমাকে এই উচ্চ আসন দিয়েছেন, আমি বক্তা বলে নয়, লেখক বলে।

ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলের আরম্ভেই একবার বলেছেন—

কৃষ্ণচন্দ্রভক্তি আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।

তার পর আবার বলেছেন—

নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।

কথা যুগপৎ সরল করে ও সরস করে বলতে চায় শুধু সাহিত্যিকরা ; কারণ কোনো সাহিত্যিকই অসরস ও অসরল কথা ইচ্ছে করে বলে না ; তবে কারো কারো স্বভাবের দোষে বিরস ও কুটিল কথা মুখ থেকে অনর্গল বেরোয়।

আমি এ কথা স্বীকার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই যে, আমি সরল ও সরস ভাষায় লিখতে চেষ্টা করেছি। তবে তাতে অকৃতকার্য হয়েছি কি না, তার বিচারক আমি নই, সাহিত্যসমাজ।

ভাষামার্গে আমি ভারতচন্দ্রের পদানুসরণ করেছি। এর কারণ আমিও কৃষ্ণ-চন্দ্রের রাজধানীতে দীর্ঘকাল বাস করেছি। আমি পাঁচ বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগরে আসি, আর পনেরো বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগর ছাড়ি। এই দেশই আমার মুখে ভাষা দিয়েছে, অর্থাৎ এ দেশে আমি যখন আসি তখন ছিলুম আধ-আধভাষী বাঙাল, আর স্পষ্টভাষী বাঙালি হয়ে এ দেশ ত্যাগ করি। আমার লেখার ভিতর যদি সরলতা ও সরসতা থাকে তো সে দুটি গুণ এই নদীয়া জিলার প্রসাদে লাভ করেছি। ফলে বাংলায় যদি এমন কোনো সাহিত্যিক থাকেন, যিনি

কহিলে সরস কথা বিরস বাখানে,

তাঁকে দূর থেকে নমস্কার করি মনে মনে এই কথা ব'লে যে, তোমার হাতযশ আর আমার কপাল।

১১

ভারতচন্দ্রের লেখার ভিতর কোন্ কোন্ গুণের আমরা সাক্ষাৎ লাভ করব তার সন্ধান তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেন যে—

পড়িয়াছি যেই মতো লিখিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥

ভারতচন্দ্র যা পড়েছিলেন তা যে লিখতে পারতেন, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই, কারণ নিত্য দেখতে পাই হাজার হাজার লোক তা করতে পারে। এই বাংলাদেশে প্রতি বৎসর স্কুলকলেজের ছেলেরা যখন পরীক্ষা দেয় তখন তারা যেই মতো পড়িয়াছে সেই মতো লেখা ছাড়া আর কি করে? আর যে যত বেশি পড়া দিতে পারে সে তত বেশি মার্ক পায়। তবে সে-সব লেখা যে, 'বুঝিবারে ভারি' তা তিনিই হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছেন, যিনি দুর্ভাগ্যক্রমে কখনো কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোনো বিদ্যার পরীক্ষক হয়েছেন। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, ও-জাতীয় লেখার ভিতর প্রসাদগুণও নেই, রসও নেই, আছে শুধু বই-পড়া মুখস্থ পাণ্ডিত্য। আশা করি, বাঙালি জাতি কস্মিন্‌কালেও বিলেতি 'বিদ্যাভ্যাসাৎ' এতদূর জড়বুদ্ধি হয়ে উঠবে না যে, উক্ত জাতীয় লেখাকে সাহিত্য বলে মাথায় তুলে নৃত্য করবে। ভারতচন্দ্র কি পড়েছিলেন ও ছিলেন জানেন?—

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপক॥
পুরাণ-আগমবেত্তা নাগরী পারসী।

কিন্তু তিনি যেই মতো পড়েছিলেন, সেই মতো লেখেন নি কেন, তাই বুঝলে সাহিত্যের ধর্ম যে কি, সকলের কাছেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এ যুগে আমরা কোনো কবির জজ কিংবা উকিলকে ক্রিটিক বলে গণ্য করি নে, সাহিত্যসমাজের পাহারাওয়ালাদের তো নয়ই। তাঁকেই আমরা যথার্থ সমালোচক বলে স্বীকার করি, যিনি সাহিত্যরসের যথার্থ রসিক। এ জাতীয় রসগ্রাহীরা জানেন যে, সাহিত্যের রস এক নয়, বহু এবং বিচিত্র। সুতরাং কোন্ লেখকের লেখায় কোন্ বিশেষ রস বা বিশেষ গুণ ফুটে উঠেছে তাই যিনি ধরতে পারেন ও পাঁচজনের কাছে ধরে দিতে পারেন, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ ক্রিটিক।

১২

এখন, ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রসাদগুণ যে অপূর্ব, এ সত্য এতই প্রত্যক্ষ যে, সে-গুণ সম্বন্ধে কোনো চক্ষুষ্মান্ বাঙালির পক্ষে অন্ধ হওয়া অসম্ভব। এখন, এই সর্ব-আলংকারিক-পূজিত গুণটি কি? যে লেখা সর্বসাধারণের কাছে সহজবোধ্য সেই লেখাই কি প্রসাদগুণে গুণান্বিত? তা যদি হত, তা হলে কালিদাসের কবিতার চাইতে মল্লিনাথের টীকার প্রসাদগুণ ঢের বেশি হত। তা যে নয় তা সকলেই জানে। প্রসাদগুণ হচ্ছে ভাষার একটি বিশিষ্ট রূপ। ভারতচন্দ্রের হাতে বঙ্গ-সরস্বতী একেবারে 'তন্বীশ্যামা শিখরদশনা' রূপ ধারণ করেছেন। যাঁর অন্তরে বঙ্গ ভাষা এই প্রাণবন্ত সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ লাভ করেছে, তাঁর যে কবিপ্রতিভা ছিল. সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষাকে শাপমুক্ত করা যদি তাঁর একমাত্র কীর্তি হত তা হলেও আমরা বাঙালি লেখকেরা তাঁকে আমাদের গুরু বলে স্বীকার করতে তিলমাত্র দ্বিধা করতুম না। অমন সরল ও তরল ভাষা তাঁর পূর্বে আর কেউ লিখেছেন বলে আমি জানি নে। আর আমি অপর কোনো সাহিত্য জানি আর না-জানি, বাংলা সাহিত্য অল্পবিস্তর জানি।

আমি পূর্বোক্ত ইংরেজি প্রবন্ধে চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষার মহা গুণকীর্তন করি, কিন্তু সে ভুল করে। সেকালে আমার চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। এখন দেখছি উক্ত পদাবলীর ভাষা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা নয়। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মুখে রূপান্তরিত হয়েই চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষা যে তার বর্তমান রূপ লাভ করেছে, সে বিষয়ে আমি এখন নিঃসন্দেহ। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের হিস্টরি লেখা হয়েছে, কিন্তু এখনো সে সাহিত্যের জিয়োগ্রাফি লেখা হয় নি। যখন সে জিয়োগ্রাফি রচিত হবে তখন সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন যে, ভারতচন্দ্রের এ উক্তি সত্য যে, নবদ্বীপ সেকালে ছিল—

ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ।

আমি বলেছি যে, প্রসাদগুণ ভাষার গুণ, কিন্তু এ কথা বলা বাহুল্য যে, ভাষা ছাড়া ভাব নেই। নীরব কবিদের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি নে। যা আমরা ভাষার গুণ বলি তা হচ্ছে মনের গুণেরই প্রকাশ মাত্র। অপ্রসন্ন অর্থাৎ ঘোলাটে

মন থেকে প্রসন্ন ভাষা আবির্ভূত হতে পারে না। সুতরাং প্রসাদগুণ হচ্ছে আসলে মনেরই গুণ, ও-বস্তু হচ্ছে মনের আলোক।

১৩

ভারতচন্দ্র চেয়েছিলেন যে, তাঁর কাব্যে প্রসাদগুণ থাকবে ও তা হবে রসাল। এ দুই বিষয়েই তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে। গোল তো এইখানেই। যে রস তাঁর কাব্যের একটি বিশেষ রস সে রস এ যুগে অস্পৃশ্য। কেননা তা হচ্ছে আদিরস। উক্ত রসের শারীরিক ভাষ্য এ যুগের কাব্যে আর চলে না, চলে শুধু দেহতত্ত্ব নামক উপবিজ্ঞানে।

সাদা কথায় ভারতচন্দ্রের কাব্য অশ্লীল। তাঁর গোটা কাব্য অশ্লীল না হোক, তার অনেক অংশ যে অশ্লীল সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। তা যে অশ্লীল তা স্বয়ং ভারতচন্দ্রও জানতেন, কারণ তাঁর কাব্যের অশ্লীল অঙ্গসকল তিনি নানাবিধ উপমা অলংকার ও সাধুভাষায় আবৃত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

এ স্থলে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁর পূর্ববর্তী বাংলা ও সংস্কৃত কবিরা কি খুব শ্লীল? রামপ্রসাদ অনেকের কাছে মহা সাধুকবি বলে গণ্য। গান-রচয়িতা রামপ্রসাদ নিষ্কলুষ কবি, কিন্তু বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতা রামপ্রসাদও কি তাই? চণ্ডীদাস মহাকবি, কিন্তু তাঁর রচিত কৃষ্ণকীর্তন কি বিদ্যাসুন্দরের চাইতেও সুরুচিসম্পন্ন? এ দুয়ের ভিতর প্রভেদ এই মাত্র কি না যে, বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতা আবৃত ও কৃষ্ণকীর্তনের অনাবৃত? আমি ভারতচন্দ্রের কাব্যের এ কলঙ্কমোচন করতে চাই নে, কেননা তা করা অসম্ভব ও অনাবশ্যক। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যে দোষে প্রাচীন কবিরা প্রায় সকলেই সমান দোষী, সে দোষের জন্য একা ভারতচন্দ্রকে তিরস্কার করবার কারণ কি? এর প্রথম কারণ, ভারতচন্দ্রের কাব্য যত সুপরিচিত অপর কারো তত নয়। আর দ্বিতীয় কারণ, ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতর art আছে, অপরের আছে শুধু nature। ভারতচন্দ্র যা দিয়ে তা ঢাকা দিতে গিয়েছিলেন তাতেই তা ফুটে উঠেছে। তাঁর ছন্দ ও অলংকারের প্রসাদেই তাঁর কথা কারো চোখ-কান এড়িয়ে যায় না। পাঠকের পক্ষে ও-জিনিস উপেক্ষা করবার পথ তিনি রাখেন নি। তবে এক শ্রেণীর পাঠক আছে যাদের কাছে ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা ততটা চোখে পড়ে না যতটা পড়ে তাঁর আর্ট। তার পর ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা গম্ভীর নয়, সহাস্য।

১৪

ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস কিন্তু আদিরস নয়, হাস্যরস। এ রস মধুর রস নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়, মস্তিষ্ক, জীবন নয়, মন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে এ রসের নাম আছে, কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে এ রসের বিশেষ স্থান

নেই। সংস্কৃত নাটকে বিদূষকদের রসালাপ শুনে আমাদের হাসি পায়, কিন্তু সে তাদের কথায় হাস্যরসের একান্ত অভাব দেখে। ও হচ্ছে পেটের দায়ে রসিকতা।

বাংলার প্রাচীন কবিরা কেউ এ রসে বঞ্চিত নন। শুধু ভারতচন্দ্রের লেখায় এটি বিশেষ করে ফুটেছে। ভারতচন্দ্র এ কারণেও বহু সাধু ব্যক্তিদের কাছে অপ্রিয়। হাস্যরস যে অনেক ক্ষেত্রে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে, তার পরিচয় আরিস্টফেনিস থেকে আরম্ভ করে আনাতোল ফ্রাঁস পর্যন্ত সকল হাস্যরসিকের লেখায় পাবেন। এর কারণ হাসি জিনিসটেই অশিষ্ট, কারণ তা সামাজিক শিষ্টাচারের বহির্ভূত। সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।

ভারতচন্দ্রের কাব্য যে অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট সে কথা তো সকলেই জানেন, কিন্তু তাঁর হাসিও নাকি জঘন্য। সুন্দরের যখন রাজার সুমুখে বিচার হয় তখন তিনি বীরসিংহ রায়কে যে-সব কথা বলেছিলেন তা শুনে জনৈক সমালোচক-মহাশয় বলেছিলেন যে, শ্বশুরের সঙ্গে এহেন ইয়ার্কি কোন্ সমাজের সুরীতি? আমিও জিজ্ঞাসা করি, এরূপ সমালোচনা কোন্ সাহিত্যসমাজের সুরীতি? এর নাম ছেলেমি না জ্যাঠামি? তাঁর নারীগণের পতিনিন্দাও দেখতে পাই অনেকের কাছে নিতান্ত অসহ্য। সে নিন্দার অশ্লীলতা বাদ দিয়ে তার বিদ্রূপেই নাকি পুরুষের প্রাণে ব্যথা লাগে। নারীর মুখে পতিনিন্দার সাক্ষাৎ তো ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী অন্যান্য কবির কাব্যেও পাই। এর থেকে শুধু এই প্রমাণ হয় যে, বঙ্গদেশের স্ত্রীজাতির মুখে পতিনিন্দা এষো ধর্মঃ সনাতনঃ। এ স্থলে পুরুষজাতির কিং কর্তব্য? হাসা না কাঁদা? বোধ হয় কাঁদা, নচেৎ ভারতের হাসিতে আপত্তি কি! আমি উক্তজাতীয় স্বামী-দেবতাদের স্মরণ করিয়ে দিই যে, দেবতার চোখে পলকও পড়ে না, জলও পড়ে না। আমাদের দেবদেবীর পুরাণকল্পিত চরিত্র. অর্থাৎ স্বর্গের রূপকথা, নিয়ে ভারতচন্দ্র পরিহাস করেছেন। এও নাকি তাঁর একটি মহা অপরাধ। এ যুগের ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায় উক্ত রূপকথায় কি এতই আস্থাবান যে উক্ত পরিহাস তাঁদের অসহ্য? ভারত-সমালোচনার যে ক'টি নমুনা দিলুম তাই থেকেই দেখতে পাবেন যে, অনেক সমালোচক কোন্ রসে একান্ত বঞ্চিত। আশা করি, যে হাসতে জানে না সেই যে সাধুপুরুষ ও যে হাসাতে পারে সেই যে ইতর. এহেন অদ্ভুত ধারণা এ দেশের লোকের মনে কখনো স্থান পাবে না। আমি লোকের মুখের হাসি কেড়ে নেওয়াটা নৃশংসতা মনে করি।

আমি আর-একটা কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করেই এ যাত্রা ক্ষান্ত হব। এ দেশে ইংরেজের শুভাগমনের পূর্বে বাংলাদেশ বলে যে একটা দেশ ছিল, আর সে দেশে যে মানুষ ছিল, আর সে মানুষের মুখে যে ভাষা ছিল, আর সে ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হত, এই সত্য আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়াই এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেননা ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এ সত্য বিস্মৃত হওয়া আমাদের পক্ষে সহজ, যেহেতু আমাদের শিক্ষাগুরুদের মতে বাঙালি জাতির জন্ম-তারিখ হচ্ছে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দ।

সর্বশেষে আপনাদের কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে, সে প্রার্থনা ভারত-চন্দ্রের কথাতেই করি। আপনারা আমাকে এ সভায় কথা কইতে আদেশ করেছেন—

সেই আজ্ঞা অনুসারি কথা শেষে ভয় করি
ছল ধরে পাছে খল জন।
রসিক পণ্ডিত যত, যদি দেখো দুষ্ট মতো
সারি দিবা এই নিবেদন।

শ্রাবণ ১৩৩৫

কাব্যে অশ্লীলতা—আলংকারিক মত

সাহিত্যসমাজ মানুষের আর পাঁচরকম সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্মী নয়। এ সমাজেও দলাদলি আছে, বকাবকি আছে, যুদ্ধবিগ্রহ আছে, জয়পরাজয় আছে। ইংরেজরা বলে Fight is the salt of existence। সাহিত্যের হাটে এ নুনের কারবার আমরা সবাই করি।

যখন কোনো জাতির অন্তরে কাব্যরস শুকিয়ে আসে তখন প্রায়ই দেখা যায় যে, সাহিত্যিকদের পিত্ত সেইসঙ্গে প্রকুপিত হয়ে ওঠে; আর তখন সাহিত্য কি হওয়া উচিত তাই নিয়ে মহা বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। গত বর্ষের গ্রীষ্মকালে এ দেশের সাহিত্যসমাজ অকস্মাৎ মহা উত্তেজিত হয়ে ওঠে সাহিত্যের একটি গুণ কিংবা অগুণের বিচার নিয়ে। অশ্লীলতা কাব্যের দোষ কি গুণ, এই সমস্যার মীমাংসা করতে অনেকেই বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। আমি এ বাগ্‌যুদ্ধে যোগ দিই নি; কারণ, এ লড়াই ইউরোপের খৃস্টান সমাজ যুগ যুগ ধরে করে এসেছে, অথচ তার ফলে সাহিত্যের বিশেষ কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে হয় না। অনেকে এ জাতীয় যুদ্ধকে সাহিত্যজগতের ধর্মযুদ্ধ মনে করেন। তবে এ কথাও ঠিক যে, religious warএর প্রসাদে ধর্মরক্ষা হয় না।

সে যাই হোক, কাব্যজগতে এই শ্লীলতা-অশ্লীলতার বিচার আবহমানকাল যে চলে আসছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান গুণ তার শ্লীলতা নয়। এমন-কি, গত শতাব্দীর ইংরেজি মতে তা ঘোর অশ্লীল। হল্‌ Hall নামক জনৈক ইংরেজ ওরিয়েণ্টালিস্ট বাসবদত্তার যে সংস্করণ প্রকাশ করেন, তার ভূমিকার প্রতি নজর দিলেই সমগ্র সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে সেকালের ইংরেজি ওরফে খৃস্টানি সাধু মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় সকলেই পাবেন।

২

সংস্কৃত সাহিত্য শ্লীলই হোক আর অশ্লীলই হোক, অশ্লীলতা যে কাব্যের একটি স্পষ্ট দোষ সে বিষয়ে সংস্কৃত আলংকারিকরা বোধ হয় সকলেই একমত। বোধ হয় বলছি এই কারণে যে, অলংকারশাস্ত্রের সকল গ্রন্থের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই; সুতরাং এমনও হতে পারে যে, কোনো আলংকারিক এ বিষয়ে বিপরীত মতাবলম্বী। চার্বাক যদি অলংকারশাস্ত্র লিখতেন তা হলে এ বিষয়ে অনেক পিলে-চমকানো মতের সাক্ষাৎ আমরা নিশ্চয়ই পেতুম। তবে আমার বিশ্বাস, অশ্লীলতা যে কাব্যদেহের শোভা বৃদ্ধি করে না, এ বিষয়ে আলংকারিকদের মতভেদ নেই।

আমি দু-একটি আলংকারিকের দু-চারটি কথা ধরে সেকালের বিদগ্ধমণ্ডলীর

এ বিষয়ে রুচির পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। বলা বাহুল্য, শ্লীলতা-অশ্লীলতা সুরুচির কথা, সুনীতির কথা নয়।

কাব্যের দোষগুণের একটি সহজবোধ্য ফর্দের সাক্ষাৎ আমরা কাব্যাদর্শেই পাই। কাব্যাদর্শ পুরোনো গ্রন্থ, সুতরাং এ বিষয়ে প্রথমেই কাব্যাদর্শের কথা ধরা যাক। দণ্ডী বলেছেন—

কামং সর্বোঽপ্যলংকারো রসমর্থে নিষিঞ্চতি,
তথাপ্যগ্রাম্যতৈবৈনং ভারং বহতি ভূয়সা।

অর্থাৎ, যদিও সর্বপ্রকার অলংকার অর্থে রসসিঞ্চন করে, তবুও অগ্রাম্যতাই এ ভার বিশেষরূপে বহন করে। দণ্ডীর মতে অলংকারের সার্থকতা হচ্ছে কাব্যের অর্থের রস ফুটিয়ে তোলায়, কিন্তু অগ্রাম্য মনোভাব ও অগ্রাম্য শব্দের সাহায্যেই তা সুসাধ্য হয়। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন—

সালংকারতয়া রসব্যঞ্জকোঽর্থো মধুর ইতি প্রতিপাদিতম্।

প্রাচীন আলংকারিকদের মতে—

বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ।

অতএব দাঁড়াল এই যে, কাব্যের অর্থগত মাধুর্য অলংকারের সাহায্যে আরো মধুর হয়, যদি না কাব্যের শব্দ ও অর্থ গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট হয়।

আমরা অশ্লীল বলতে যা বুঝি, দণ্ডী গ্রাম্য বলতে তাই যে বুঝতেন তার প্রমাণ তাঁর উদাহৃত কোনো কোনো শ্লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই পাওয়া যায়। গ্রাম্য শব্দের অর্থ অবশ্য vulgar, তবে ইংরেজিতে যাকে indecent বলে তাকে vulgar বললে অত্যুক্তি হয় না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অশ্লীলতা কাব্যের দোষ কেন। আলংকারিকদের মতে যা রসের প্রতিবন্ধক তাই দোষ, এবং যেহেতু অশ্লীলতা বিশেষরূপে রসের প্রতিবন্ধক, সে কারণ তা কাব্যের বিশেষ দোষ।

রসের স্থিতি বস্তুতে কি মানুষের মনে? কাব্যরস অলংকারের সংযোগে ফুটে ওঠে কি চেপে যায়, অশ্লীলতা রসের প্রতিবন্ধক কি সহায়ক? এ-সব দার্শনিক তর্ক এ স্থলে তোলবার প্রয়োজন নেই। কারণ আলংকারিকদের বক্তব্য যে কি, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তাঁদের মতে অশ্লীলতাদোষ হচ্ছে কাব্যদেহের দোষ, অপর কোনো বস্তুর নয়। তাঁদের বিচার পোয়েটিক্‌সএর অন্তর্ভূত, এথিক্‌সএর নয়। সম্ভবত এই কারণে হল্ প্রমুখ ইংরেজদের মতে যে কাব্য ঘোর অশ্লীল ব'লে গণ্য, সে কাব্য আলংকারিকদের কাছে সরস ব'লে মান্য হয়েছে। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের কাব্যবিচারের মার্গ ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর ইঙ্গমার্গ হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রকাশকার বলেছেন যে, কবির ভারতী—

নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।

যাঁদের মতে কবির প্রতিভা নিয়তিকৃত নিয়মের অধীন নয়, তাঁরা যে কবিপ্রতিভাকে মানুষের হাতগড়া সামাজিক বিধিনিষেধের অধীন ব'লে স্বীকার করবেন না সে কথা বলাই বাহুল্য। সেকালে কাব্য নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াত, সত্য অথবা শিবের হাত ধ'রে নয়।

৪

গ্রাম্যতা অবশ্য শব্দেরও দোষ, অর্থেরও দোষ। একালের মতো সেকালেও ভাষা, সাধু-ভাষা ও ইতরভাষা এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সংস্কৃত ভাষার সাধু শব্দের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় আছে, ইতর শব্দের সঙ্গে নেই বললেই হয়। সুতরাং শব্দের গুণ-দোষ বিচার না ক'রে আলংকারিকদের মতে শব্দের অর্থগত গ্রাম্যতার পরিচয় নেওয়া যাক। সেকালে গ্রাম্যতার অর্থ একালের চেয়ে ঢের ব্যাপক ছিল। দণ্ডীর মতে—

কন্যে কাময়মানং মাং ন ত্বং কাময়সে কথম্।

উক্তিটি অর্থের গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট। অপর পক্ষে—

কামং কন্দর্পচাণ্ডালো ময়ি বামাক্ষি নির্দয়ঃ।

এই উক্তিটি শুধু 'অগ্রাম্যোঽর্থঃ' নয়, উপরন্তু রসাবহ।

এ উভয়ের ভিতর প্রভেদ কোথায়, তা ধরতে একটু চেষ্টা করা যাক। কেননা বিনা চেষ্টায় তা ধরা শক্ত। এক বিষয়ে এ দুয়ের ভিতর একটা মস্ত মিল আছে। এ দুটি উক্তিই সমান কবিত্ব-ছুট্। তার পর দুটিতেই একই মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে ; দুয়ের ভিতর প্রভেদ মাত্র এই যে, প্রথমটি স্পষ্ট কথায় বলা হয়েছে, দ্বিতীয়টি একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। এর থেকে অনুমান করা যায়, প্রাচীনদের মতে কথা সোজাসুজিভাবে বললে তা গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট হয়, আর বেঁকিয়ে চুরিয়ে বললেই তা শুধু অগ্রাম্য নয়, রসাবহ হয়। অর্থাৎ বুক ও মুখের ভিতর কর্ড লাইনই গ্রাম্য এবং লুপ অগ্রাম্য। যেমন বিভিন্ন লোকের রুচি বিভিন্ন, তেমনি বিভিন্ন কালের রুচি বিভিন্ন। একালে অনেকে হয়তো উক্ত প্রথম পদটিই বেশি পছন্দ করবেন ; কারণ, তার ভিতর আর কিছু না থাক্ স্পষ্ট passion আছে, আর শেষ পদটির ভিতর যা আছে, সে শুধু সেকালের সাহিত্যিক fashion মাত্র। সে যাই হোক, সেকালের সমালোচকদের দল কি বলা হল তাতে বিচলিত হতেন না, কি ক'রে বলা হল তাই ছিল তাঁদের কাছে বড়ো জিনিস। একালের ভাষায়, contentএর চাইতে formকে তাঁরা বেশি মর্যাদা দিতেন। বিশেষ ক'রে এ দুটি উদাহরণের উল্লেখ করলুম এই জন্যে যে, দণ্ডী না ব'লে দিলে এর কোন্‌টি গ্রাম্য ও কোন্‌টি অগ্রাম্য, তা আমরা চট্ করে ধরতে পারতুম না।

৫

কালক্রমে গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা বাক্যের পৃথক্ পৃথক্ দোষ ব'লে গণ্য হয়। দণ্ডীর পরবর্তী আলংকারিক বামন এই উভয়বিধ দোষের উল্লেখ করেছেন। বামনের পরবর্তী আলংকারিকরা তাঁর মতই অনুসরণ করেছেন।

এখন দেখা যাক এ দুই দোষের মূলে কি আছে। বামন বলেন—

লোকমাত্রপ্রযুক্তং গ্রাম্যম্।

অর্থাৎ যে কথা শুধু জনসাধারণের মুখে শোনা যায় কিন্তু শাস্ত্রে যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, সেই কথাই গ্রাম্য। এ কথা শুনে মনে হয় যে, তাঁরা লোকভাষা ও শাস্ত্রীয় ভাষাকে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাষা বলে গণ্য করতেন; অর্থাৎ লেখায় মুখের কথা চলবে না, আর মুখে বইয়ের কথার স্থান নেই। সংক্ষেপে, সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে মৌখিক ভাষার কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। এরকমের মত একালের অনেক বঙ্গ-আলংকারিক ব্যক্ত করেন। সংস্কৃত আলংকারিকরা অবশ্য এ মতের সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে গ্রাম্য পদের ন্যায় 'অপ্রতীত' পদ কাব্যে অব্যবহার্য। অপ্রতীত শব্দের অর্থ কি?—

শাস্ত্রমাত্রপ্রযুক্তমপ্রতীতম্

অর্থাৎ

শাস্ত্র এব প্রযুক্তং যন্ন লোকে, তদপ্রতীতং পদম্

অর্থাৎ পাণ্ডিতি শব্দ ও গ্রাম্য শব্দ দুই কবির কাছে সমান অস্পৃশ্য। এ বিষয়ে আমাদের দেশের আলংকারিকদের সঙ্গে ফরাসিদেশের ক্ল্যাসিকাল আলংকারিকদের মতের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। তাঁরাও সাহিত্যরাজ্য থেকে pedantic ও ভাল্‌গার শব্দসকল বহিষ্কৃত ক'রে দেবার জন্য ধনুক ধারণ করেছিলেন। আমরাও যখন চল্‌তি ভাষার বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করি, তখন আমরাও সে ভাষাকে ইতর ভাষার কোঠাতে ফেলে দিই; যদিচ চল্‌তি কথার সঙ্গে ইতর কথার প্রভেদ যে কি, তা সকলেই জানেন। আর যিনি তা না জানেন, তাঁর পক্ষে নীরব থাকাই শ্রেয়।

৬

এর থেকে বোঝা গেল, বামন প্রমুখ আলংকারিকদের মতে গ্রাম্যতা হচ্ছে শুধু শব্দের দোষ। বামন এই সূত্রে যে উদাহরণ দিয়েছেন তার প্রতি লক্ষ করলেই দেখা যায় যে, বাক্য অশ্লীল না হয়েও গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট হতে পারে—

কষ্টং কথং রোদিতি ফুৎকৃতেয়ম্।

এ উক্তিতে অশ্লীলতার নামগন্ধও নেই, কিন্তু 'ফুৎকৃতি' ঐ শব্দই রোদনের রসভঙ্গ করেছে। অবশ্য বাংলা ভাষায় ফুৎকার ইতর শব্দ নয়, তবুও ফোঁ ফোঁ করে কাঁদছে কথাটা আমাদের কানে করুণরসাবহ নয়।

অপর পক্ষে অগ্রাম্য শব্দের সাহায্যেও যথেষ্ট অশ্লীল বাক্য রচনা করা যায়। সুতরাং অশ্লীলতা-দোষ কাকে বলে, তা আলংকারিকদের মুখে শোনা যাক। বামন বলেছেন যে, সেই বাক্য অশ্লীল যা

ব্রীড়াজুগুপ্সামঙ্গলাতঙ্কদায়ী

অর্থাৎ যে কথা শুনে মনে লজ্জা ঘৃণা অথবা অমঙ্গলের আশঙ্কা উদয় হয়, সেই বাক্যই অশ্লীল। এই হচ্ছে এ বিষয়ে অলংকারশাস্ত্রের শেষ কথা। কারণ কাব্য-প্রকাশ সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি নামজাদা অলংকারশাস্ত্রের অর্বাচীন গ্রন্থসকলে ঐ বামনের উক্তিই পুনরুক্ত হয়েছে, এবং, আমার বিশ্বাস, এই কথাই এ বিষয়ে চরম

কথা। অমঙ্গলের আশঙ্কার কথা ছেড়ে দিলে যাতে লোকের মনে লজ্জা কিংবা জুগুপ্সার জন্ম দেয় তাই হচ্ছে অশ্লীল বাক্য। এখন জিজ্ঞাস্য, কার মনে? আলংকারিকদের মতে, সামাজিকদের মনে। তাঁরা সামাজিক বলতে বুঝতেন সেই সম্প্রদায়ের লোক যাঁরা যুগপৎ সভ্য ও সহৃদয়, এক কথায় কাল্‌চার্ড সোসাইটি। দেশভেদে ও যুগভেদে কাল্‌চার্ড সোসাইটিরও রুচি বিভিন্ন। আনাতোল ফ্রাঁসের কথা ইংরেজের রুচিতে অশ্লীল ঠেকে, ফরাসিদের রুচিতে নয়। আলংকারিকরা অবশ্য স্বদেশী সামাজিকদের কথা বলেছেন, বিদেশী সামাজিকদের নয়।

৭

শ্লীলতা-অশ্লীলতা সম্বন্ধে আলংকারিকদের সেকেলে মতামত একালের লোককে স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্য কি? আমাদের দেহে এখন তো আর সেকালের মন নেই। যুগে যুগে লোকের মনের পরিবর্তন ঘটে, সুতরাং সেকালের বিধিনিষেধের একালে সার্থকতা নেই। এ কথা সত্য বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। মানুষের মতামত যে পরিমাণে বদলায়, তার মনের প্রকৃতি সে পরিমাণে বদলায় না। অতএব অনেক সেকেলে মতামতের অন্তরে যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় সে মনোভাব কস্মিন্‌কালেও একেবারে বাতিল হয়ে যায় না, এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা আবিষ্কার করি যে, প্রাচীন মন বর্তমান মনের চাইতে এক ধাপ উঁচুতে উঠেছিল। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর রচিত কাব্যজিজ্ঞাসায় প্রমাণ করেছেন যে, যে সমাজের মনে কাব্যজিজ্ঞাসা নেই সে সমাজ কখনো কাব্যমীমাংসায় উপনীত হতে পারে না। এই কারণেই আমাদের কাব্যবিচার প্রায়ই বাজে ও এড়ো হয়। আলংকারিকদের কাব্যবিচারের আর যাই ত্রুটি থাক্‌ সে বিচার কখনো ভুল পথে যায় নি; বেশি দূর যেতে না পারে, কিন্তু ঠিক পথেই গিয়েছে।

সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন কথার আবির্ভাব হয়েছে। সে কথাটি হচ্ছে 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা'। এখন, এ কথা জোর করে বলা যেতে পারে যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা সাহিত্যের স্বাস্থ্য নিয়ে কখনো মাথা ঘামান নি; তাঁরা যার আলোচনা করেছেন, সে হচ্ছে কাব্যের রূপ। আর, যার রূপ নেই তা যে কাব্য নয়, এ কথা অবিসম্বাদী। এই রূপের বিচার করাই সমালোচকের একমাত্র কর্তব্য।

৮

আলংকারিকদের মতে অশ্লীলতা একটি দোষ; কেননা, তা কাব্যের রূপ নষ্ট করে। কারণ ব্রীড়া জুগুপ্সা প্রভৃতি মনোভাব কাব্যের রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটায়, একটি বদ সুর লাগালে যেমন রাগের রূপ নষ্ট হয়; কারণ, শ্রোতার কানে তা বেসুরা লাগে।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, বেসুর তার কানেই শুধু ধরা পড়ে যার কানে ও প্রাণে সুর আছে। অশ্লীলতা কাব্যের দোষ, কেননা তা সামাজিক লোকের রুচিতে বেখাপ্পা ঠেকে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক বলতে আলংকারিকরা বুঝতেন কাব্যরসিক।

মানুষের ভিতর কাব্যরসিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সংগীতরসিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আছে। এ জাতিভেদ ডিমোক্রাসিও দূর করতে পারবে না। আলংকারিকদের মতে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার কষ্টিপাথর হচ্ছে কাব্যরসিক-সমাজের রুচি।

এখন, সকল সমাজের লোক সমান কাব্যরসিক নয়। দার্শনিক হিসাবে জর্মানদের যেমন খ্যাতি আছে, নৈতিক হিসাবে ইংরেজদের, কাব্যরসিক হিসাবে ফরাসিদের তেমনই খ্যাতি আছে। ফরাসিদের সুরুচি সম্বন্ধে কাইজারলিঙের মত অবাধে গ্রাহ্য করা যেতে পারে, কারণ তিনি একাধারে ঘোর দার্শনিক ও পুরো জর্মান। তাঁর কথা এই—

The French taste is in itself so good that the *on* of Paris—that impersonal anonymous they—has a surer judgment than any save the most unusual individual.[১]

অথচ ফরাসি রুচি ইংরেজি রুচির সঙ্গে মেলে না। সুতরাং আমাদের পূর্ব-পুরুষদের অশ্লীলতা সম্বন্ধে ধারণা ইংরেজদের ধারণার সঙ্গে মেলে না বলে যে তা নিকৃষ্ট, এমন কথা মূর্খ ছাড়া আর কেউই বলবেন না। কাব্য সম্বন্ধে সুরুচি ও কুরুচি লোকের কাব্যজ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে, কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক দার্শনিক নৈতিক কিংবা সামাজিক মতামতের উপর নির্ভর করে না। এই সত্যটিই আলংকারিকরা বহু পূর্বে আবিষ্কার করেছিলেন।

৯

সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা বাক্যটি সম্পূর্ণ নিরর্থক। সাহিত্যের স্বাস্থ্য জিনিসটি কি এবং কোন্ কোন্ বস্তুর সদ্ভাবের উপর তা নির্ভর করে, তার নির্ভুল হিসাব আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পেরেছেন বলে আমি জানি নে। আর যদিই ধরে নেওয়া যায়, সাহিত্যেরও স্বাস্থ্য বলে একটা গুণ আছে, তা হলে সে স্বাস্থ্য রক্ষা করবেন কে এবং কি উপায়ে? পুলিস ও সমালোচক সাহিত্যের উপর কড়া শাসনের বলে? বলা বাহুল্য, যাঁরা এরূপ শাসনের পক্ষপাতী তাঁরা স্বাস্থ্যের বিষয় সব জানতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যের বিষয় কিছুই জানেন না।

আমার মনে হয়, যাঁরা মুখে বলেন সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা, তাঁরা আসলে চান সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা। আর তাঁদের কাছে সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার অর্থ সমাজরক্ষা। সমাজ সুস্থই হোক আর অসুস্থই হোক তা যেমন আছে সেই ভাবেই টিকে থাক্, এই হচ্ছে তাঁদের আন্তরিক কামনা; এবং এ জাতীয় লোক কথাকে অত্যন্ত ডরান, কারণ তাঁদের ধারণা সামাজিক মনের উপর কথার প্রভাব মারাত্মক, বিশেষত সে কথা যদি উজ্জ্বল ও মনোহারী হয়। পার্লামেন্টারিয়ানরা যখন সমাজের উপরে খড়্গহস্ত হন, তখন এই দল বিশেষ বিচলিত হন না; কারণ তাঁরা জানেন ও হচ্ছে কাজের কথা। কবির উক্তিই তাঁদের কাছে অসহ্য, কেননা এ হচ্ছে ভাবের কথা।

১ *Europe.*

আর ভাবের স্পর্শেই মানুষের মনোভাব বদলে দিতে পারে, তেল-নুন-লকড়ির কথাতে পারে না; কারণ সে কথা মানুষের অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে বাক্য সামাজিক লোকদের মনে এই জাতীয় আশঙ্কার উদ্রেক করে, সে বাক্য রসের প্রতিবন্ধক কি না।

১০

সংস্কৃত আলংকারিকরা ইংরেজিতে যাকে বলে মর‍্যালিটি তার বিশেষ বিচার করেন নি। তবুও এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, যে উক্তি মানুষের মর‍্যাল সেন্‌স্‌কে পীড়িত করে, তাও ছিল তাঁদের মতে কাব্যে বর্জনীয়। কবি রাজশেখর তাঁর কাব্যমীমাংসায় বলেছেন—

অসদুপদেশকত্বাত্তর্হি নোপদেষ্টব্যং কাব্যম্ ইত্যপরে।

অর্থাৎ অপর আলংকারিকদের মতে কাব্যে অসদুপদেশ দেওয়া অকর্তব্য। কিন্তু তাঁর মতে

অস্ত্যয়মুপদেশঃ কিন্তু নিষেধ্যত্বেন ন বিধেয়ত্বেন।

অর্থাৎ অসাধুপদেশেরও কাব্যে স্থান আছে, কিন্তু নিষেধ হিসাবে, বিধি হিসাবে নয়। রাজশেখরের সংগে অপর আলংকারিকদের মতের প্রভেদ কোথায়, বোঝা কঠিন। বোধ হয় অপর আলংকারিকদের মতে অসদুপদেশ কাব্যে একেবারে বর্জনীয়, কিন্তু রাজশেখরের মতে কাব্যে সে উপদেশ থাকতে পারে, কবি যদি সে উপদেশকে অসৎ বলেই উল্লেখ করেন। কাব্যের প্রভাব যে লোকের মনের উপর প্রবল, সে ধারণা তাঁদেরও ছিল। রাজশেখর বলেছেন—

কবিবচনায়ত্তা লোকযাত্রা। সা চ নিঃশ্রেয়সমূলম্।

এর বাংলা: লোকের জীবনযাত্রা কবিবচনের আয়ত্ত এবং সে জীবনযাত্রার মূল হচ্ছে নিঃশ্রেয়স, ইংরেজিতে যাকে বলে virtue, welfare। যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে মর‍্যালিটি হচ্ছে জীবনযাত্রার মূল, তাঁদের মতে কাব্যের ফুল সে মূল হতে বিচ্ছিন্ন নয় এবং সে মূলের সংস্কার কাব্যকুসুমের অন্তর্নিহিত। এর থেকে দেখা যায় অশ্লীলতার ন্যায় অসদুপদেশও সেকালেও কাব্যের দোষ বলেই গণ্য ছিল। তবে আমাদের সংগে তাঁদের প্রভেদ এই মাত্র যে, তাঁরা অসৎ বাক্যকে এস্‌থেটিক ইমোশনের প্রতিবন্ধক হিসেবে দুষ্ট মনে করতেন, অপর পক্ষে আমরা আমাদের সোনার সংসার ছারখারে যাবে, এই ভয়েই অস্থির। এ প্রভেদ মস্ত প্রভেদ। কাব্য-মীমাংসার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন beautyর অনুরক্ত, আমরা হয়েছি utilityর ভক্ত।

১১

আমরা যে এস্‌থেটিক ইমোশনকে আমল দিই নে, তার কারণ আমরা ইংরেজি-শিক্ষিত। ইংলণ্ডের জনসাধারণ যে এ রসে বঞ্চিত, এ কথা সর্ববাদিসম্মত। আমি পূর্বে বলেছি, ইংরেজ জাতি ঘোর নৈতিক ব'লে গণ্য, তবে মর‍্যালিটিকে তারা ইউটিলিটিতে পরিণত করেছে। আমরা ইংরেজের শিষ্য, ফলে আমাদের সুন্দর-অসুন্দর সৎ-অসৎ সত্যমিথ্যার জ্ঞান, ইংরেজি জ্ঞানের অনুরূপ। কাব্য-

জিজ্ঞাসা ও ধর্মজিজ্ঞাসার প্রভেদ আমরা ধরতে পারি নে। আমাদের কাব্যে সুরুচি ইংরেজি অরুচির তর্জমা মাত্র। আমি এ প্রবন্ধ শুরু করেছি হল্ সাহেবের সংস্কৃত কাব্যে অরুচির উল্লেখ ক'রে। আর শেষ করছি এই বিংশ শতাব্দীর একটি ইংরেজ ওরিয়েণ্টালিস্টের কথা দিয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর এ বিষয়ে মতামত বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ বিদগ্ধমণ্ডলীর কাছে একেবারেই অগ্রাহ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের মন ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি মতের দাসত্ব হতে মুক্তি লাভ করে নি। এখন বাসবদত্তা সম্বন্ধে কীথের কথা শোনা যাক—

It would be quite unjust to accuse Subandhu of indecency or savagery as one distinguished editor did. To apply mid-Victorian conceptions of propriety to India is obviously absurd and wholly misleading. Indian writers, not excluding Kalidasa, indulge habitually *con amore* in minute descriptions of the beauty of women and the delights of love which are not in accord with western conventions of taste. But the same condemnation was applied by contemporaries to Swinburne and Shakespeare's frankness is more resented by English than by German taste. What is essential is to repel the connection of such description with immorality and to assert that they must be approved or condemned on artistic grounds alone. There is all the world of difference between what we find in the great poets of India and the frank delight of Martial and Petronius in descriptions of immoral scenes.[১]

সেকালের আলংকারিকরা যদি একালে সশরীরে উপস্থিত থাকতেন এবং ইংরেজি ভাষা জানতেন, তা হলে কীথ সাহেবের কথায় তাঁরা সম্পূর্ণ সায় দিতেন, বিশেষত তাঁর বক্ষ্যমাণ উক্তিটি তাঁদের কাছে ষোলো-আনা গ্রাহ্য হত। কীথ সাহেব বলেছেন যে—

What is essential is to assert that they must be approved or condemned on artistic grounds.

বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় মতের সঙ্গে যে হিন্দু যুগের ভারতবর্ষীয় মতের ঐক্য থাকবে, এটা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। মানুষ এককালে যে-সত্যের সন্ধান পায় তা চিরকালের সত্য, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তা অজ্ঞতার আবরণে ঢাকা পড়ে, আবার কাল-ক্রমে সে আবরণ মুক্ত হয়; তখন লোকে মনে ভাবে যে, সেটি নূতন-আবিষ্কৃত সত্য।

আমি এ প্রবন্ধে কাব্যে অশ্লীলতা নামক দোষ সম্বন্ধে সংস্কৃত আলংকারিকদের মতের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করলুম এই কারণে যে, সে মত প্রাচীন হলেও অনবীন নয়।

বৈশাখ ১৩৩৬

১ *A History of Sanskrit Literature.*

হর্ষচরিত

বাণভট্ট বলেছেন—

সাধূনামুপকর্তুং লক্ষ্মীং দ্রষ্টুং বিহায়সা গন্তুম।
ন কুতূহলি কস্য মনশ্চরিতং চ মহাত্মনাং শ্রোতুম্॥

লক্ষ্মীকে দেখবার লোভ আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু সাধু ব্যক্তির উপকার করতে অথবা মহাপুরুষের জীবনচরিত শুনতে আমাদের সকলেরই সমান কৌতূহল আছে কি না বলা শক্ত। আর আকাশে উড়বার শখ আমাদের ক'জনের আছে জানি নে। যদিচ এই গরুড়যন্ত্রে, ভাষান্তরে এরোপ্লেনের আমলে, নিজের পকেট কিঞ্চিৎ হালকা করলেই ও-উড়োগাড়িতে অনায়াসে চ'ড়ে হাওয়া খাওয়া যায়। বাণভট্টের যুগে, অর্থাৎ আজ থেকে তেরোশো বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের জনগণের 'বিহায়সা গন্তুম্'এর যে প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল, এ কথা একেবারেই অবিশ্বাস্য।

তবে বাণভট্টের সকল কথারই যখন দ্ব্যর্থ আছে, তখন খুব সম্ভবত তিনি বলেছেন যে, মহাত্মার জীবনচরিত শোনা হচ্ছে মনোজগতে মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠা—ইংরেজিতে যাকে বলে higher plane আমাদের সাংসারিক মনকে সেই ঊর্ধ্বলোকে তোলা।

অপর মহাপুরুষদের বিষয় যাই হোক, যথা বুদ্ধদেব অথবা যীশুখৃস্ট—বাণভট্ট যে-মহাপুরুষের জীবনচরিত বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ মহারাজ হর্ষবর্ধনের, সে-মহাপুরুষের আখ্যান শোনবার জন্য এ যুগে আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর কৌতূহল আছে। কারণ, তিনি নিজ বাহুবলে দিগ্বিজয় ক'রে উত্তরাপথের সম্রাট্ হয়েছিলেন। এ যুগে আমাদের সামরিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা বিন্দুমাত্র নেই; সুতরাং পুরাকালে যে-যে স্বদেশী রাজা ভারতবর্ষে দিগ্বিজয়ী রাজচক্রবর্তী হয়েছিলেন তাঁদের জীবনচরিত আমরা সকলেই মন দিয়ে শুনতে চাই। পৃথিবীর দাবাখেলায় এখন আমরা বড়ের জাত; তাই আমরা যদি এ খেলায় কাউকে বাজিমাৎ করতে চাই, সে হচ্ছে বড়ের চালে চালমাৎ। সুতরাং আমাদের জাতের মধ্যেও যে অতীতে রাজা ও মন্ত্রী ছিলেন, এ আমাদের কাছে মহা সুসমাচার। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ শ্রেণীর এক-রাটের দর্শন বড়ো বেশি মেলে না। প্রথম ছিলেন অশোক, তার পর সমুদ্রগুপ্ত, আর শেষ হচ্ছেন হর্ষবর্ধন—আর যদি কেউ থাকেন তো তিনি ইতিহাসের বহির্ভূত।

দুঃখের বিষয়, এ মহাপুরুষ সম্বন্ধে কৌতূহল চরিতার্থ করা আমাদের, অর্থাৎ বর্তমান যুগের ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের, পক্ষে একরকম অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না।

হর্ষ সম্বন্ধে দুজন লোক দু ভাষায় দুখানি বই লিখেছেন, এবং সেই দুখানি বইয়ের উপরই আমাদের হর্ষচরিত খাড়া করতে হবে। একটি লেখক হচ্ছেন হিউয়েন সাং ওরফে ইউয়ান চোয়াং নামক চৈনিক পরিব্রাজক ; এবং দ্বিতীয় লেখক হচ্ছেন বাণভট্ট। চীনে লেখক অবশ্য চীনে ভাষাতেই লিখেছেন, আর বলা বাহুল্য, সে ভাষায় বর্ণপরিচয় আমাদের কারো হয় নি। ফলে তাঁর গ্রন্থ থেকে হর্ষের ইতিহাস উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য।

তার পর বাণভট্টের হর্ষচরিতের অর্থ গ্রহণ করা অসাধ্য না হোক, দুঃসাধ্য ; শুধু আমাদের পক্ষে নয়, পণ্ডিতমহাশয়দের পক্ষেও।

বাংলাদেশে ১৯৩৯ সংবতে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে মূল হর্ষচরিত প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন—

বাণভট্ট হর্ষচরিত নামে গদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, ইহা আমি পূর্বে অবগত ছিলাম না।

এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, অপর কোনো পণ্ডিতই অবগত ছিলেন না। আর বোধ হয়, সহজবোধ্য নয় বলেই বাংলার পণ্ডিতসমাজে এ গ্রন্থের পঠন-পাঠন ছিল না। এ গ্রন্থ যে দুষ্পাঠ্য, তার প্রমাণ, বিদ্যাসাগর মহাশয় আরো বলেছেন যে, হর্ষচরিতের 'অনায়াসে অর্থবোধ জন্মে না'। শুধু বাংলার পণ্ডিত কেন, অন্য প্রদেশের পণ্ডিতদেরও ঐ একই মত। মহাকবি-চূড়ামণি শংকর, হর্ষ-চরিতের সংকেত নামক যে ব্যাখ্যা লিখেছেন, তা এই ব'লে শেষ করেছেন—

দুর্বোধে হর্ষচরিতে সম্প্রদায়ানুরোধতঃ।
গূঢ়ার্থোন্মুদ্রণাং চক্রে শংকরো বিদুষাং কৃতে॥

অর্থাৎ হর্ষচরিতের ব্যাখ্যাও আমাদের জন্য লেখা হয় নি, লেখা হয়েছিল 'বিদুষাং কৃতে' ; ফলে এ মহাপুরুষের চরিত 'শ্রোতুং' আমাদের কৌতূহল থাকলেও সে কৌতূহল চরিতার্থ করবার সুযোগ আমাদের ছিল না।

৩

আমাদের মহা সৌভাগ্য এই যে, উক্ত উভয় গ্রন্থই ইংরেজিতে ভাষান্তরিত হয়েছে, এবং সেই দুখানি ইংরেজি অনুবাদের সাহায্যে শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় একখানি নব-হর্ষচরিত রচনা করেছেন।

তাঁর রচিত হর্ষচরিত আমরা অবলীলাক্রমে পড়তে পারি, কিন্তু তিনি অবলীলাক্রমে এ গ্রন্থ রচনা করেন নি। বহু পরিশ্রম ক'রে তাঁকে তা রচনা করতে হয়েছে। প্রথমত, বাণভট্টের ইংরেজি তরজমাও সুপাঠ্য নয়। তার পর বাণভট্ট লিখেছিলেন কাব্য, সুতরাং সমস্ত কাব্যখানিই তাঁর মনঃকল্পিত কি না, এ বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। কেননা, স্বয়ং বাণভট্টই তাঁর রচিত কাদম্বরীর গোড়াতেই লিখেছেন যে—

অলব্ধবৈদগ্ধ্যবিলাসমুগ্ধয়া ধিয়া নিবদ্ধেয়মতিদ্বয়ী কথা।

অর্থাৎ যদিচ তাঁর কোনোরূপ বৈদগ্ধ্য ছিল না, তবুও তিনি শখের বশীভূত হয়ে

কাদম্বরী নামক 'অতিদ্বয়ী' কথা একমাত্র মন থেকে গড়েছেন। 'অতিদ্বয়ী কথা'র অর্থ সেই কথা যা বাসবদত্তা ও বৃহৎকথাকে অতিক্রম করে। এ হেন চরিত্রের লেখকের কোনো কথার উপর আস্থা রেখে ইতিহাস লেখা চলে না, কেননা, ইতিহাসের কথা মনগড়া কথা নয়। অথচ বাণভট্টের কথা প্রত্যাখ্যান করাও চলে না। কারণ, হর্ষের বালচরিত একমাত্র বাণই বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে রাধাকুমুদবাবুকে বাণভট্টের প্রতি কথাটি যাচিয়ে নিতে হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় যাকে inscription বলে, তাই হচ্ছে ইতিহাসের কষ্টিপাথর। হর্ষের বিষয়ে ইন্‌সক্রিপ্‌শনও আছে, আর সেই-সব ইন্‌সক্রিপ্‌শনের সাহায্যে তিনি যাচিয়ে দেখেছেন যে, বাণভট্টের হর্ষচরিত অক্ষরডম্বর হলেও কেবলমাত্র ধ্বনিসার নয়। তাঁর প্রায় প্রতি কথাই সত্য, সুতরাং নির্ভয়ে এ কবির কাব্য ইতিহাসের ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। আর হিউয়েন সাংএর কথা যে ইতিহাস, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ; কেননা, তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তকে কোনো হিসাবেই কাব্য বলা চলে না। ও-গ্রন্থ হচ্ছে একাধারে হিস্টরি ও জিয়োগ্রাফি।

৪

রাধাকুমুদবাবু তাঁর নব-হর্ষচরিত রচনা করেছেন ইংরেজি ভাষায় ; আমি সেই গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করব। কিন্তু প্রথমেই একটু মুশকিলে পড়েছি। সেকালে অজ্ঞাতকুলশীল কোনো কবি বলেছেন—

হেম্নো ভারশতানি বা মদমুচাং বৃন্দানি বা দন্তিনাং
শ্রীহর্ষেণ সমর্পিতানি গুণিনে বাণায় কুত্রাদ্য তৎ।
যা বাণেন তু তস্য সূক্তিবিসরৈরুট্টঙ্কিতাঃ কীর্তয়-
স্তাঃ কল্পপ্রলয়েঽপি যান্তি ন মনাঙ্মন্যে পরিম্লানতাম্ ॥[১]

এ শ্লোকের নির্গলিতার্থ হচ্ছে এই যে, শ্রীহর্ষ বাণভট্টকে যে-ধনদৌলত দিয়েছিলেন, আজ তা কোথায়? অপর পক্ষে বাণভট্ট শ্রীহর্ষের যে কীর্তিকলাপ উট্টঙ্কিত করেছেন, তা কল্পান্তেও ম্লান হবে না।

শ্রীহর্ষ বাণভট্টকে কি সোনারুপো হাতিঘোড়া দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব। কিন্তু বাণ যে হর্ষের বিশেষ কিছু কীর্তিকলাপ বর্ণনা করেছেন, তাও নয়। হর্ষচরিত একখানি অদ্ভুত বই। এই অষ্টাধ্যায়ী ইতিহাসের প্রথম দু অধ্যায় বাণচরিত, আর শেষ দু অধ্যায় হর্ষচরিত। বাণভট্ট রাজসভায় উপস্থিত হয়ে প্রথম এই কথা ব'লে আত্মপরিচয় দেন—

ব্রাহ্মণোঽস্মি জাতঃ সোমপায়িনাং বংশে বাৎস্যায়নানাম্।

তার পর আছে নিজের গুণকীর্তন। এ কবির নিজের আভিজাত্য ও বিদ্যার এতদূর গর্ব ছিল যে, তিনি ঐ ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থের অনেক অংশ নিজের বংশের ও নিজের কথায় ভরিয়ে দিয়েছেন। ও-কাব্য থেকে রাজচরিত উদ্ধার করা ঢের বেশি লোভনীয় ও সহজ। কিন্তু সে লোভ এখন আমি সংবরণ করতে বাধ্য, নইলে

[১] সুভাষিতাবলী ১৮০

হর্ষচরিত লেখা হবে না। বারান্তরে বাণচরিত বর্ণনা করব, কারণ, তা করা আমার আয়ত্তের মধ্যে। বাণচরিত লিখতে কোনো চৈনিক গ্রন্থ কিংবা শিলালিপির সাহায্য নিতে হবে না।

৫

কথাবসাবিঘাতেন কাব্যাংশস্য চ যোজনা।

এ জ্ঞান সংস্কৃত কবিদেরও ছিল। তবে বাণভট্ট বোধ হয় মনে করতেন যে, হর্ষচরিতের কথায় কোনো রস নেই, তাতে যা-কিছু রস আছে, সে তাঁর লেখায়। সুতরাং উক্ত গ্রন্থে কথাবস্তু অতি যৎসামান্য।

অপর পক্ষে রাধাকুমুদবাবু লিখেছেন ইতিহাস। সুতরাং বাণভট্টের রচনার ফুলপাতা বাদ দিয়ে তার কথাবস্তুর উপরই তাঁর হর্ষচরিত রচনা করতে হয়েছে। আর-এক কথা : বাণভট্ট যখন হর্ষচরিত শেষ করেছেন, তখন হর্ষের ম্যাট্রিকুলেশন দেবারও বয়স হয় নি। সুতরাং সে-চরিতের অন্তরে ঐতিহাসিক মাল অতি কম, আর কাব্যের মসলাই বেশি। অথচ এ গ্রন্থ উপেক্ষা ক'রে হর্ষচরিতের প্রথম ভাগ লেখা অসম্ভব। আমি রাধাকুমুদবাবুর পদানুসরণ ক'রে শ্রীহর্ষের বাল্যজীবন বাংলায় বলব, শুধু বাণভট্টের যে-সব কথা তিনি ইংরেজি ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, আমি সে-সব যথাসম্ভব বাণভট্টের নিজের কথাতেই বলব। এ কথা শুনে ভয় পাবেন না। হর্ষচরিত অতি দুর্বোধ হলেও বাণভট্ট কাজের কথা অতি সংক্ষেপে সহজবোধ্য সংস্কৃত ভাষাতেই বলেন। তা ছাড়া এ লেখার গায়ে একটু সেকেলে গন্ধও থাকা চাই।

পুরাকালে ভারতবর্ষে শ্রীকণ্ঠ নামে একটি দেশ ছিল, এবং সেই দেশে স্থাণ্বীশ্বর নামক জনপদের রাজবংশে শ্রীহর্ষ জন্মগ্রহণ করেন। এ বংশ পুষ্পভূতির বংশ ব'লে বিখ্যাত। এই বংশে প্রভাকরবর্ধন নামে একটি রাজা নিজ-বাহুবলে নানা দেশ জয় ক'রে পরমভট্টারক উপাধি লাভ করেন। তিনি 'প্রতাপশীল' এই অপর নামেও বিখ্যাত। তিনি হয়ে উঠেছিলেন—

হূনহরিণকেশরী সিন্ধুরাজজ্বরো
গুর্জরপ্রজাগরঃ গান্ধারাধিপগন্ধদ্বিপকূটপাকলঃ
লাটপাটবপাটচ্চরঃ মালবলক্ষ্মীলতাপরশুঃ।

বাণভট্ট এ-সব শব্দযোজনা সত্যের খাতিরে কি অনুপ্রাসের খাতিরে করেছেন, বলা কঠিন।

৬

যদিও তাঁর কথা সত্য হয় তো সে সত্য অনুপ্রাসের ভারে চাপা পড়েছে। প্রভাকরবর্ধন হূনহরিণের কেশরী, সিন্ধুরাজের জ্বর, গুর্জরের অনিদ্রা, গান্ধাররাজরূপ গন্ধহস্তীর পিত্তজ্বর, লাটচোরের উপর বাটপাড়, ও মালবলক্ষ্মীলতার কুঠার। অর্থাৎ উপরি-উক্ত রাজ্য সব তিনি জয় করুন আর না করুন, ও-সকল রাজ্যের

রাজারা তাঁর ভয়ে কম্পান্বিত ছিল। বলা বাহুল্য, এ-সব দেশ উত্তরাপথের পশ্চিমখণ্ড।

শ্রীহর্ষ প্রভাকরবর্ধনের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ৫৯০ খৃস্টাব্দে মহারানী যশোবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্ধন তাঁর চাইতে বছর চারেকের বড়ো, এবং তাঁর ভগ্নী রাজ্যশ্রী বছর দুয়েকের ছোটো।

বাণভট্ট কাদম্বরীর রাজকুমার চন্দ্রাপীড় কোথায়, কি কি শাস্ত্রে, কি ভাবে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছিলেন, তার লম্বা বর্ণনা করেছেন; কিন্তু হর্ষবর্ধনের শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ে তিনি একেবারে নীরব। শুধু রাজকুমারদ্বয়ের কে কে অনুচর ছিলেন, সেই কথা বাণ আমাদের বলেছেন।

রাজ্যশ্রীর জন্মের পর প্রভাকরবর্ধন, রানী যশোবতীর ভ্রাতুষ্পুত্র

ভণ্ডিনামানমনুচরং কুমারয়োরর্পিতবান্।

এই ভণ্ডিই পরে কি যুদ্ধক্ষেত্রে, কি মন্ত্রণাগৃহে, প্রথমে রাজ্যবর্ধনের পরে শ্রীহর্ষের প্রধান সহায় ছিলেন।

কিছুকাল পরে প্রভাকরবর্ধন মালবরাজের পুত্র কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে কুমারদ্বয়ের অনুচর করেছিলেন। এই মাধবগুপ্তই পরে হর্ষবর্ধনের অতি অন্তরঙ্গ সুহৃৎ হন।

কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত যে hostage স্বরূপে প্রভাকরবর্ধনের নিকট রক্ষিত হয়েছিলেন, এরকম অনুমান করা অসংগত নয়। কারণ, প্রভাকরবর্ধন ছিলেন মালবলক্ষ্মীলতার পরশু।

কিন্তু ভণ্ডি কে? তিনি ছিলেন রানী যশোবতীর ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু যশোবতী কার কন্যা, সে বিষয়ে বাণভট্ট সম্পূর্ণ নীরব; যদিচ তিনি রাজারানীদের কুলের খবর বিশেষ ক'রে রাখতেন।

৭

কালক্রমে রাজ্যশ্রী বিবাহযোগ্যা হলেন। যখন তাঁর বিবাহ হয়, তখন তিনি বালিকা কিংবা কিশোরী, বাণভট্ট সে কথা খুলে বলেন নি। কিন্তু তিনি যা বলেছেন, তার থেকে অনুমান করা যায় যে, একালে সার্দা আইনে সে বিবাহ বাধত।

একদিন প্রভাকরবর্ধন বাহ্যকক্ষস্থ কোনো পুরুষ কর্তৃক গীয়মান বক্ষ্যমাণ আর্যাটি শুনলেন।

উদ্বেগমহাবর্তে পাতয়তি পয়োধরোন্নমনকালে।
সরিদিব তটমনুবর্ষং বিবর্ধমানা সুতা পিতরম্॥

এই গানটি শোনবামাত্র তিনি যশোবতীকে সম্বোধন করে বললেন—

দেবি তরুণীভূতা বৎসা রাজ্যশ্রীঃ।

অতএব আর কালবিলম্ব না ক'রে ওর বিবাহ দেওয়া কর্তব্য।

এর পরেই প্রসিদ্ধ মৌখরী-বংশের তিলকস্বরূপ কান্যকুব্জের রাজা অবন্তি-বর্মার জ্যেষ্ঠপুত্র গ্রহবর্মার সঙ্গে রাজ্যশ্রীর বিবাহ হল। এ বিবাহ খুব ঘটা ক'রে

দেওয়া হয়েছিল, কেননা বাণভট্ট খুব ঘটা ক'রে তার বর্ণনা করেছেন। দুঃখের বিষয়, বিবাহ-উৎসব ও বিবাহমণ্ডপের সাজসজ্জার বর্ণনা ভালো বোঝা যায় না। বিবাহমণ্ডপ—

স্ফুরদ্ভিরিন্দ্রায়ুধসহস্রৈরিব সংছাদিতম্।

কিসের দ্বারা?—

ক্ষৌমৈশ্চ বাদরৈশ্চ দুকূলৈশ্চ লালাতন্তুজৈশ্চাংশুকৈশ্চ নেত্রৈশ্চ
নির্মোকনিভৈরকঠোররম্ভাগর্ভকোমলৈর্নিশ্বাসহার্যৈঃ স্পর্শানুমেয়ৈর্বাসোভিঃ।

এ-সব জিনিস কি? টীকাকার বলেন, বস্ত্রবিশেষ; অভিধানেও এর বেশি কিছু বলে না। তবে আমরা এই পর্যন্ত অনুমান করতে পারি যে, 'বাদর' খদ্দর নয়, কেননা, বাদরের রূপ ইন্দ্রধনুর, আর তা ফুঁয়ে উড়ে যায়, নাহয় তো দেখতে সাপের খোলসের মতো আর অকঠোররম্ভাগর্ভকোমল। সংক্ষেপে এ-সব কাপড় এত মিহি যে, তারা কেবলমাত্র স্পর্শানুমেয়। এ বর্ণনা থেকে এইমাত্র জানা যায় যে, হর্ষযুগের ভারতবর্ষ মোটা ভাত মোটা কাপড়ের দেশ ছিল না। বাণভট্টের হর্ষ-চরিত থেকে, রাজরাজড়াদের না হোক, অন্নবস্ত্রের ইতিহাস উদ্ধার করা সহজ।

এর কিছুদিন পরে রাজা প্রভাকরবর্ধন হূনপশুদের বধ করবার জন্য রাজ্য-বর্ধনকে উত্তরাপথে পাঠিয়েছিলেন। হর্ষবর্ধনও হিমালয়ের উপকণ্ঠে বাঘভালুক শিকার করতে গেলেন। বলা বাহুল্য যে, হর্ষদেব

স্বল্পীয়োভিরেব দিবসৈর্নিঃশ্বাপদান্যরণ্যানি চকার।

এমন সময়ে তিনি খবর পেলেন যে প্রভাকরবর্ধন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি রাজধানীতে ফিরে এলেন, এবং পরদিনই তাঁর পিতার মৃত্যু হল ও রানী যশোবতী সহমরণে গেলেন।

তার পর রাজ্যবর্ধন দেশে ফিরে এসে কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন; কারণ পূর্ব হতেই সংসার ত্যাগ করবেন বলে তিনি মন স্থির করেছেন, উপরন্তু পিতৃশোক তাঁকে একান্ত কাতর করে ফেলেছে। রাজ্য-বর্ধন স্পষ্টই বললেন যে—

স্ত্রিয়ো হি বিষয়ঃ শুচাম্। তথাপি কিং করোমি। স্বভাবস্য সেয়ং কাপুরুষতা বা স্ত্রৈণং বা যদেবমাস্পদং পিতৃশোকহুতভুজো জাতোঽস্মি।

কিন্তু হর্ষ কিছুতেই বড়ো ভাইকে টপকে সিংহাসনে চড়ে বসতে সম্মত হলেন না।

৮

শোকবিমূঢ় ভ্রাতৃদ্বয় কিংকর্তব্য স্থির করতে পারছেন না, এমন সময় রাজ্যশ্রীর সংবাদক নামক পরিচারক এসে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলে—

যেদিন অবনীপতির মৃত্যুর সংবাদ এল, সেইদিনই দুরাত্মা মালবরাজ গ্রহবর্মাকে বধ ক'রে রাজ্যশ্রীর পায়ে বেড়ি পরিয়ে কান্যকুব্জের কারাগারে নিক্ষেপ করেছে।

এ সংবাদ শুনে রাজ্যবর্ধনের হৃদয়ে শোকাবেগের পরিবর্তে রোষাবেগ স্থান লাভ করলে, ও তিনি হর্ষকে সম্বোধন করে বললেন—

এ রাজ্য তুমি পালন করো। আমি আজই মালবরাজকুলের ধ্বংসের জন্য যাত্রা করছি। একমাত্র ভণ্ডি দশ সহস্র অশ্ব-সৈন্য নিয়ে আমার অনুসরণ করুক।

হর্ষও এ কথা শুনে বললেন, আমিও তোমার অনুগমন করতে প্রস্তুত—

যদি বাল ইতি নিতরাং তর্হি ন ত্যাজ্যোঽস্মি। অশক্ত ইতি ক্ব পরীক্ষিতোঽস্মি।

কিন্তু রাজ্যবর্ধন এ পরীক্ষা করতে স্বীকৃত হলেন না, বালক হর্ষকে ত্যাগ ক'রে একাই যুদ্ধযাত্রা করলেন।

এর কদিন পরেই কুন্তল নামক অশ্ববার এসে সংবাদ দিলে যে, রাজ্যবর্ধন মালব-সৈন্যের উপর জয়লাভ করবার পর

গৌড়াধিপেন মিথ্যোপচারোপচিতবিশ্বাসং মুক্তশস্ত্রমেকাকিনং বিশ্রব্ধং স্বভবন এব ভ্রাতরং ব্যাপাদিতম্—

ঐ গৌড়াধিপের নাম শশাংক। এ সংবাদ শুনে প্রভাকরবর্ধনের বৃদ্ধ সেনাপতি হর্ষকে বললেন—

কিং গৌড়াধিপেনৈকেন। তথা কুরু যথা নান্যোঽপি কশ্চিদাচরত্যেবং ভূয়ঃ।

হর্ষদেব উত্তর করলেন—

শ্রূয়তাং মে প্রতিজ্ঞা

পরিগণিতৈরেব বাসরৈর্নির্গৌড়াং করোমি মেদিনীম্।

তার পর অবন্তি নামক মহাসন্ধিবিগ্রহকারককে আদেশ করলেন যে, উদয়াচল হতে অস্তগিরি পর্যন্ত সকল দেশের সকল রাজাদের কাছে এই মর্মে ঘোষণাপত্র পাঠাও যে—

সর্বেষাং রাজ্ঞাং সজ্জীক্রিয়ন্তাং করাঃ করদানায় শস্ত্রগ্রহণায় বা।

এর পরেই তিনি মান্ধাতা-প্রবর্তিত দিগ্‌বিজয়ের পথ অবলম্বন করলেন।

৯

হর্ষদেব হাতিঘোড়া লোকলস্কর নিয়ে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হবেন, এমন সময়

ভণ্ডিরেকেনৈব বাজিনা কতিপয়-কুলপুত্রপরিবৃতো রাজদ্বারমাজগাম।

ভণ্ডির পরিধানে মলিন বাস আর সর্বাঙ্গ শত্রুশস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত। হর্ষ ভণ্ডির কাছে ভ্রাতৃমরণ-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলেন এবং ভণ্ডিও আগাগোড়া সকল কথা বললেন। তার পর নরপতি জিজ্ঞাসা করলেন, রাজ্যশ্রীর অবস্থা কি? ভণ্ডি উত্তর করলেন, রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর দেবী রাজ্যশ্রী কুশস্থলে গুপ্ত কর্তৃক গৃহীত হন, পরে বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সপরিবারে বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করেছেন, এ কথা আমি লোকমুখে শুনেছি এবং তাঁর খোঁজে বহু লোক পাঠিয়েছি; কিন্তু তারা কেউ ফিরে আসে নি।

এ কথা শুনে হর্ষ বললেন, অন্য লোকের কি প্রয়োজন? অন্য কর্ম ত্যাগ ক'রে যেখানে রাজ্যশ্রী আছেন সেখানে স্বয়ং আমি যাব, আর তুমি সৈন্যসামন্ত নিয়ে গৌড়াভিমুখে গমন করো।

এর পর হর্ষ মালবরাজকুমার মাধবগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করলেন, এবং বৌদ্ধভিক্ষু দিবাকর মিত্রের আশ্রমে রাজ্যশ্রীর সাক্ষাৎ পেলেন।

যখন হর্ষ দিবাকর মিশ্রের আশ্রমে উপস্থিত হলেন তখন রাজ্যশ্রী চিতায় প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছেন। হর্ষ ও দিবাকর মিশ্র তাঁকে আত্মহত্যা থেকে নিরস্ত করলেন। রাজ্যশ্রী বৌদ্ধভিক্ষুণীর ধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য দিবাকর মিশ্রের কাছে প্রার্থনা জানালেন। দিবাকর মিশ্র সে প্রার্থনা মঞ্জুর করতে স্বীকৃত হলেন না দুকারণে। প্রথমত রাজ্যশ্রীর বয়স অল্প, দ্বিতীয়ত সে শোকগ্রস্ত। তার পর হর্ষ যখন ভগ্নীকে কথা দিলেন যে, তিনিও ভ্রাতৃমরণের প্রতিশোধ নিয়ে পরে কাষায়-বসন ধারণ করবেন, তখন রাজ্যশ্রী সে ক'টা দিন অপেক্ষা করতে স্বীকৃত হলেন।

এইখানেই বাণভট্টের হর্ষচরিত শেষ হল।

১০

বাণভট্ট যে কেন এইখানেই থামলেন, তা আমাদের অবিদিত, এবং তা জানবারও কোনো উপায় নেই। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু নানারূপ অনুমান করতে পারি, কিন্তু সে-সব অনুমানের হর্ষচরিতে কোনো অবসরও নেই, সার্থকতাও নেই। তবে যে কারণেই হোক, তিনি যে আট অধ্যায়কে অষ্টাদশ করেন নি, এ আমাদের মহা সৌভাগ্য। কারণ, ও-ধরনের লেখা এর বেশি আর পড়া অসাধ্য। ইংরেজিতে বলে life is short ; সুতরাং আর্ট যদি অতি লম্বা হয় তো এক জীবনে তার চর্চা ক'রে ওঠা যায় না।

সে যাই হোক, বাণভট্ট হিস্টরি লেখেন নি, লিখেছেন হর্ষের বায়োগ্রাফি। জীবনচরিত লেখবার আর্ট একরকম portrait paintingএর আর্ট। এ আর্টের বিষয় বাহ্য ঘটনা নয়। এর একমাত্র বিষয় হচ্ছে একটি মানুষ। মানুষের বাইরের চাইতে অন্তরই জীবনচরিত-লেখকের মনকে বেশি টানে। ফলে এর থেকে সেকালের রাজারাজড়াদের ইতিহাস উদ্ধার করা অসম্ভব।

হর্ষ যে দিগ্‌বিজয় করেছিলেন তার প্রমাণ তিনি 'সকল উত্তরাপথেশ্বর' হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দিগ্‌বিজয়ের বিবরণ হর্ষচরিতে নেই, হিউয়েন সাংএর ভ্রমণবৃত্তান্তেও নেই।

হর্ষচরিত থেকে আমরা এই মাত্র জানতে পাই যে, প্রভাকরবর্ধন লাট সিন্ধু গান্ধার ও মালবদেশের রাজাদের শত্রু ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরেই মালবরাজ কান্যকুব্জ আক্রমণ ক'রে গ্রহবর্মাকে বধ করেন। কিন্তু এ মালবরাজ যে কে, হর্ষ-চরিতে তাঁর নাম নেই। ভণ্ডি বলেছেন গুপ্তনাম্না, এর বেশি কিছু নয়।

রাধাকুমুদবাবু প্রমাণ পেয়েছেন, এ গুপ্ত হচ্ছে দেবগুপ্ত, এবং তিনি ছিলেন হর্ষের সহচরদ্বয় মাধবগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রাজ্যবর্ধন এঁকে পরাভূত ক'রে কান্যকুব্জরাজ্য উদ্ধার করেন, এবং হর্ষ এই ভগ্নীপতির সিংহাসন অধিকার করেন।

১১

এখন, এই ভণ্ডি নামক ব্যক্তিটি কে? তিনি যে হর্ষবর্ধনের প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর যখন অপরাপর

মন্ত্রীরা হর্ষকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করতে ইতস্তত করছিলেন, তখন ভণ্ডির পরামর্শেই তাঁরা বালক হর্ষকে রাজা করেন। মালবরাজের বিরুদ্ধে রাজ্যবর্ধন যখন যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন ভণ্ডিই দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তাঁর অনুগমন করেন এবং সে-যুদ্ধে জয়লাভ করেন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর ভণ্ডিই হর্ষের আদেশে গৌড়াধিপ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যান। সুতরাং তিনিই যে হর্ষদেবের friend, philosopher and guide ছিলেন, এরূপ অনুমান করা অসংগত নয়। এই কারণেই ভণ্ডি লোকটি কে, জানবার জন্য কৌতূহল হওয়া ঐতিহাসিকের পক্ষে স্বাভাবিক।

বাণভট্ট এইমাত্র বলেছেন যে, ভণ্ডি যশোবতীর ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু যশোবতী যে কার কন্যা ও কার ভগ্নী, সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নীরব।

রাধাকুমুদবাবু বলেন যে, যশোবতী হূনারি যশোবর্মনের কন্যা। যশোবর্মন যে-সে রাজা নন। হূনরাজ মিহিরকুলকে যুদ্ধে পরাভূত ক'রে তিনি ভারতবর্ষ নির্হূন করেন, এবং এক দিকে ব্রহ্মপুত্র হতে পশ্চিমসমুদ্র ও আর-এক দিকে হিমালয় হতে মহেন্দ্রপর্বত পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের সম্রাট্ হন। যশোবতী এ হেন রাজচক্রবর্তীর কন্যা হলে বাণভট্ট সে কথা গোপন করতেন না। আর যশোবর্মনের পুত্র শিলাদিত্যই নাকি ভণ্ডির পিতা, যে রাজার বিরুদ্ধে ল'ড়ে ভণ্ডি ও রাজ্যবর্ধন জয়লাভ করেন। রাধাকুমুদবাবু যা বলেছেন, তা হতে পারে। কিন্তু এ বংশাবলী আঁকে মেলে না। যশোবর্মন হূন নিপাত করেছিলেন ৫২৮ খৃস্টাব্দে আর হর্ষের জন্ম হয় ৫৯০ খৃস্টাব্দে; সুতরাং বিয়ের সময়ে যশোবতীর বয়স কত ছিল? সেকালে রাজারাজড়াদের ঘরের মেয়েদের কোন্ বয়সে বিয়ের ফুল ফুটত, তা রাজ্যশ্রীর বিবাহ থেকেই জানা যায়। সুতরাং ভণ্ডি যে যশোবর্মনের পৌত্র, এ অনুমান প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ।

১২

তারিখ না থাকলে ইতিহাস হয় না। সুতরাং ভারতবর্ষের ইতিহাস জানা একরকম অসম্ভব, কারণ সংস্কৃত সাহিত্য তারিখছুট্। সেইজন্যই আমাদের দেশের কোনো ব্যক্তির অথবা কোনো ঘটনার তারিখ জানতে হলে বিদেশে যেতে হয়। চীনে লেখকদের মহাগুণ এই যে, তাঁদের সকলেরই মহাকালের না হোক, ইহকালের জ্ঞান ছিল। ভাগ্যিস হিউয়েন সাং এ দেশে এসেছিলেন, তাই আমরা হর্ষবর্ধনের সঠিক কালনির্ণয় করতে পারি। উক্ত চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে ও কতকটা ইন্‌সক্রিপ্‌শনের সাহায্যে আমরা জানি যে, হর্ষ জন্মেছিলেন ৫৯০ খৃস্টাব্দে, রাজা হয়েছিলেন ৬০৬ খৃস্টাব্দে, আর তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ৬৪৮ খৃস্টাব্দে।

তারিখ বাদ দিয়ে ইতিহাস হয় না, একমাত্র প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাস ছাড়া। কিন্তু তাই ব'লে ইতিহাস মানে প্রাচীন পঞ্জিকামাত্র নয়; এমন-কি, রাজরাজড়ার জীবনচরিতও নয়। আমরা একটা বিশেষ দেশের, বিশেষ কালের, বিশেষ সমাজের মতিগতি সব জানতে চাই। কিন্তু সে জ্ঞান লাভ করবার মালমসলা হর্ষচরিতেও

নেই, হিউয়েন সাংএর ভ্রমণবৃত্তান্তেও নেই। রাধাকুমুদবাবু হর্ষচরিত লিখেছেন *Rulers of India* নামক সিরিজের জন্য। সুতরাং হর্ষের শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁকে একটি পুরো অধ্যায় লিখতে হয়েছে। কিন্তু এ অধ্যায়টি তাঁকে এই অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে যে, হর্ষযুগের রাজশাসন তার পূর্ব-বর্তী গুপ্তযুগের অনুরূপ; সুতরাং তিনি এ বিষয়ে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা গুপ্তযুগের বিবরণ—যদিও হর্ষের রাজ্য গুপ্তরাজ্যের মতো নিরুপদ্রব ছিল না। হিউয়েন সাংকে বহুবার চোরডাকাতের হাতে পড়তে হয়েছিল, কিন্তু ফা-হিয়েনের কেউ কেশস্পর্শ করে নি। হর্ষের পূর্বে দেশ অরাজক হয়ে পড়েছিল, আর হর্ষের মৃত্যুর পর আবার অরাজক হয়েছিল। ইতিমধ্যে যে তিনি দেশকে সম্পূর্ণ সুশাসিত করতে পারেন নি, এতে আর আশ্চর্য কি?

১৩

আমি পূর্বে বলেছি যে, রাধাকুমুদবাবু তাঁর হর্ষচরিত লিখেছেন রুলার্স অব ইণ্ডিয়া নামক ইংরেজি সিরিজের দেহ পুষ্ট করবার জন্য। এ সিরিজের নামাবলী পড়ে মনে হয় যে, ভারতবর্ষের শাসনকর্তা কখনো ভারতবাসী হয় না, হয় শুধু বিদেশী। একমাত্র অশোক এ দলে স্থানলাভ করেছেন। ফলে অশোক যে বিদেশী, তাই প্রমাণ করতে এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা উঠে-পড়ে লেগেছেন। রাধাকুমুদবাবু হর্ষকেও এই ছত্রপতি রাজাদের দলভুক্ত করেছেন। সুতরাং দুদিন পরে হয়তো শুনব যে, অশোক যেমন পারসিক, হর্ষ তেমনি হূন। হর্ষের মাতুলপুত্র হচ্ছেন ভণ্ডি, এবং হূন ভাষার পণ্ডিতরা বলেন যে, ভণ্ডি নাম হূন নাম। তা যদি হয় তো হর্ষের মাতৃকুল যে হূন-কুল, এ অনুমান করা ঐতিহাসিক পদ্ধতি-সংগত।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে, অশোক সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষ তিনজনই স্বদেশী রাজা ছিলেন, তা হলে এ তিনজন যে কি করে রাজা থেকে মহারাজাধিরাজ হয়ে উঠলেন, তার একটা হিসেব পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষ চিরকালই নানা খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল; অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে ইউনিটারি গবর্নমেণ্ট, এত প্রকাণ্ড দেশে সে জাতীয় গবর্নমেণ্ট স্বাভাবিক নয়। যখনই কোনো প্রবল বিদেশী শত্রুর হাত থেকে ভারতবাসীদের পক্ষে আত্ম-রক্ষা করবার প্রয়োজন হয়েছে, এবং যে রাজা সে বহিঃশত্রুর কবল থেকে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন, তখনই তিনি, সমগ্র ভারতবর্ষের না হোক, উত্তরা-পথের সম্রাট্ হয়েছেন। গ্রীক সম্রাট্ আলেকজান্দারের ভারতবর্ষের ব্যর্থ আক্রমণের অব্যবহিত পরেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং অশোক হচ্ছেন তাঁর পৌত্র। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত শকারিবিক্রমাদিত্য। এবং যেকালে দেশ থেকে হূন-পশু বহিষ্কৃত হয়, সেই কালেই হর্ষবর্ধন সকল উত্তরাপথেশ্বর হয়ে উঠেছিলেন। যবনদের হাত থেকে দেশ রক্ষা করবার জন্য মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা। শকদের কবল থেকে পশ্চিমভারত উদ্ধার করবার ফলেই গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠা। আর হূন-হরিণ-কেশরী ব'লেই হর্ষ দেশের পরমেশ্বর হয়েছিলেন। অর্থাৎ একমাত্র

বিদেশীই ভারতবর্ষের ruler হয় না— বিদেশীর হাত থেকে যে দেশরক্ষা করতে পারে, সেও সেকালে ভারতবর্ষের ruler হত। মেধাতিথি আর্যাবর্ত নামক দেশের এই ব'লে পরিচয় দিয়েছেন—

আর্যা বর্তন্তে তত্র পুনঃ পুনরুদ্ভবন্ত্যাক্রম্যাপি তত্র ন চিরং ম্লেচ্ছাঃ স্থাতারো ভবন্তি।

এই উত্থানপতনের ইতিহাসই ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস।

১৪

বাণভট্ট হূনদের বরাবর হূন-হরিণী ব'লে এসেছেন; কিন্তু তারা ঠিক হরিণ-জাতীয় ছিল না, না রূপে, না গুণে। হূনরা ছিল হিংস্র বনমানুষ। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেন—

Indian authors having omitted to give any detailed description of the savage invaders who ruthlessly oppressed their country for three quarters of a century, recourse must be had to European writers to obtain a picture of the devastation wrought and the terror caused to settled communities by the fierce barbarians.

হূন নামক যে ঘোর নৃশংস বর্বর জাতি পঞ্চম শতাব্দীতে ইউরোপের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে, সেই জাতিরই একটি বিশেষ শাখা পারস্যদেশ ও ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। সুতরাং ইউরোপের লোক তাদের যে বর্ণনা করেছে, তার থেকে আমরা হূনদের রূপগুণের পরিচয় পাই। স্মিথ বলেন—

The original accounts are well summarised by Gibbon :

The numbers, the strength, the rapid motions and the implacable cruelty of the Huns, were felt and dreaded and magnified by the astonished Goths, who beheld their fields and villages consumed with flames and deluged with indiscriminate slaughter. To these real terrors, they added the surprise and abhorrence which were excited by the shrill voice, the uncouth gestures, and the strange deformity of the Huns. They were distinguished from the rest of the human species by their broad shoulders, flat noses and small black eyes, deeply buried in their head ; and as they were almost destitute of beards, they never enjoyed the manly graces of youth or the venerable aspect of age.

যে হূনরা ইউরোপ আক্রমণ করেছিল, তাদেরই জাতভাইরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল, সুতরাং রূপে ও চরিত্রে তারা যে পূর্বোক্ত হূনদের অনুরূপ ছিল, এরূপ অনুমান করা অসংগত নয়। তারা যে ঘোর অসভ্য ও ঘোর নৃশংস নরপশু, শুনতে পাই, এ বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্যও সাক্ষ্য দেয়।

এ দেশে যাঁরা আসেন, ইউরোপীয়রা তাঁদের White Huns বলেন; কি কারণে, তা জানি নে। কিন্তু তাঁরা যে কৃষ্ণকায় ছিলেন না, তার প্রমাণ বক্ষ্যমাণ সংস্কৃত পদে পাওয়া যায়।

সদ্যো মুণ্ডিতমত্তহূনচিবুকপ্রস্পর্ধি নারঙ্গকম্।

এ উপমা থেকে এই জানা যায় যে. হূনের রঙ ছিল হলদে, ও তাদের চিবুক ছিল almost destitute of beards। কারণ, তাদের যে নামমাত্র দাড়ি ছিল, তা কামালে মাতাল হূনের চিবুক নারঙ্গের রূপ ধারণ করত।

এই কিম্ভূতকিমাকার জাতির আচারব্যবহারও অতিশয় কদর্য ছিল। হিন্দুর মতো শুদ্ধাচারী জাতির পক্ষে এ কারণেও হূনজাতি অসহ্য হয়েছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ই-সিং তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে এ কথা উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং হূনদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ভারতবাসীদের পক্ষে একটা মারাত্মক রোগের দ্বারা আক্রান্ত হবার স্বরূপ হয়ে উঠেছিল। যে ব্যক্তি ভারতবর্ষকে এ রোগের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন, তাঁকে যে দেশের লোক মহাপুরুষ ব'লে গণ্য করবে, এতে আশ্চর্য কি?

১৫

ভারতবর্ষ সেকালে ছিল নানা রাজার দেশ। সুতরাং রাজায় রাজায় যুদ্ধ ছিল সেকালে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু কোন্ রাজা কা'কে মারলে, তাতে সমাজের বেশি কিছু যেত আসত না। মনুর বিধান আছে যে—

জিত্বা সম্পূজয়েদ্দেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ধার্মিকান্।
প্রদদ্যাৎ পরিহারাংশ্চ খ্যাপয়েদভয়ানি চ॥
সর্বেষান্তু বিদিত্বৈষাং সমাসেন চিকীর্ষিতম্।
স্থাপয়েৎ তত্র তদ্বংশ্যং কুর্যাৎ চ সময়ক্রিয়াম্॥[১]

উপরি-উক্ত শ্লোকদ্বয়ের মেধাতিথিকৃত ভাষ্যানুবাদ—

বিজয়ী রাজা পররাজ্য জয় করবার পর পুরী ও জনপদের প্রশমন ক'রে, তত্রস্থ দেবদ্বিজ ও ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের রণার্জিত ধনের চতুর্থাংশ ও ধূপদীপগন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করবেন। তার পর সে দেশের গৃহস্থ ব্যক্তিরা যাতে কোনোরূপ কষ্টে না পড়ে, তজ্জন্য তাদের এক বৎসর কিংবা দু বৎসরের কর ও শুল্করূপ ভার থেকে মুক্তি দেবেন, যাতে তাদের জীবনযাত্রার কোনোরূপ ব্যাঘাত না হয়। তার পর নগরের ও জনপদের অভয়দান করবেন, অর্থাৎ ডিণ্ডিম প্রভৃতির দ্বারা ঘোষণা করবেন যে, যারা পূর্বস্বামীর প্রতি অনুরাগবশত আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাদের আমি ক্ষমা করলুম, তারা যেন নির্ভয়ে স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত হয়ে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে।

বিজিত রাজ্যের জনসাধারণকে পূর্বোক্ত উপায়ে শান্ত ও সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেও বিজয়ী রাজা যদি জানতে পান যে, সে রাজ্যের প্রজাদের পূর্বস্বামীর উপর

[১] মনু। ৭ অধ্যায় ২০১-২০২ শ্লোক

অনুরাগ অতি প্রবল, এবং তারা কোনো নূতন রাজা ও রাজশাসন চায় না, তা হলেও তিনি সংক্ষেপে প্রজাদের মনোভাবের বিষয় অবগত হয়ে সেই বংশের অপর কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এবং তদ্দেশের সমবেত প্রজামণ্ডলী ও রাজপুরুষদের সম্মতিক্রমে ও তাদের সমক্ষে সেই নব অভিষিক্ত রাজার সঙ্গে এই মর্মে সন্ধি করবেন যে, তোমার আয়ের অর্ধেক আমি পাব, এবং তুমি আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সকল বিষয়ে কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করবে; আর আমি যদি দৈবক্রমে এবং অকারণে বিপদ্‌গ্রস্ত হই, তুমি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তোমার অর্থ ও বলের দ্বারা আমার সাহায্য করবে।

মনুর বিধান law নয়, custom; সমাজে যা ঘটত, তারই বিবরণ। সুতরাং সেকালে জয়-পরাজয়ের ফলে রাজা বদলালেও রাজ্য বদলাত না।

অপর পক্ষে শক যবন হূন প্রভৃতির আক্রমণে সমগ্র সমাজ যুগপৎ বিপর্যস্ত ও নিপীড়িত হত। কারণ, এই বিদেশী শত্রুরা দেবদ্বিজ রাজাপ্রজা কারো মর্যাদা রক্ষা করতেন না, সকলেরই উপর সমান অত্যাচার করতেন। সুতরাং হূন প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুধু রাজার যুদ্ধ নয়, রাজাপ্রজা উভয়ের মিলিত আত্মরক্ষার প্রয়াস। এ অবস্থায় যখনই হিন্দুরা আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে তখনই তাদের আনন্দ আর্টে-সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। হিন্দু-প্রতিভা পরবশ হলেই নিদ্রিত হয়ে পড়ে, আত্মবশ হলেই আবার জাগ্রত হয়।

অশোকের যুগ ভারতবর্ষের স্থাপত্যশিল্পের যুগ। গুপ্তযুগ কালিদাসের কাব্যের ও অজন্তাগুহার চিত্রশিল্পের যুগ। আর হর্ষের যুগ কাদম্বরী ও ভর্তৃহরিশতকের যুগ।

প্রাচীন ভারতের এই চক্রবর্তী মহারাজরা সত্যসত্যই মহাপুরুষ ছিলেন। কারণ, তাঁরা একমাত্র যোদ্ধা ছিলেন না, দেশের সকলপ্রকার গুণীর তাঁরা গুণগ্রাহী ভক্ত ছিলেন, এবং তাঁদের সাহায্যেই দেশের কাব্য আর্ট প্রভৃতি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষবর্ধন নিজেরাও আর্টিস্ট ছিলেন। হর্ষ দেশের ধর্ম ও সাহিত্যকে যে কতদূর বাড়িয়ে তুলেছিলেন, তার পরিচয় রাধাকুমুদবাবুর পুস্তকে সকলেই পাবেন।

ভাদ্র ১৩৩৭

পাঠান-বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ

আমার বিশ্বাস, নবাবি আমলের বঙ্গ সাহিত্যের অন্তর থেকে অনেক ছোটোখাটো ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধার করা যায়। বলা বাহুল্য, সত্য মাত্রেই ঐতিহাসিক সত্য নয়, যেমন fact মাত্রেই scientific fact নয়। সত্যেরও একটা জাতিভেদ আছে।

ইতিহাসেরও একটা Evidence Act আছে। যে ঘটনা উক্ত আইনের বাঁধাধরা নিয়মের ভিতর ধরা না পড়ে, সে ঘটনা যে সত্য, এ কথা ইতিহাসের আদালতে গ্রাহ্য হয় না। সুতরাং যে ঘটনা আমরা মনে জানি সত্য, তা যে ঐতিহাসিক সত্য, এমন কথা মুখ ফুটে বলবার সাহস পাই নে, রীতিমত দলিলদস্তাবেজের অভাবে।

আর বাংলা সাহিত্যে যে শুধু ছোটোখাটো ঐতিহাসিক সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাঁর কারণ সেকালে কোনো বাঙালি ইতিহাস লেখেন নি, লিখতে চেষ্টাও করেন নি; প্রসঙ্গত এখানে-ওখানে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যার গায়ে সত্যের স্পষ্ট ছাপ আছে। আর আমার বিশ্বাস যে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে ছোটো-বড়োর বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। সত্যের যদি কোনো মূল্য থাকে তো সে মূল্য ছোটোর অন্তরেও আছে, বড়োর অন্তরেও আছে। সুতরাং সেকেলে বঙ্গ সাহিত্যের অন্তরে যে-সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলি তুচ্ছ বলে উপেক্ষা করবার জিনিস নয়।

চৈতন্যচরিতামৃতের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় যে অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ করেছেন, সে ঘটনা যে প্রকৃত, কবিকল্পিত নয়, এই আমার চিরকেলে ধারণা। এবং এর ফলে, যাঁরা ঐতিহাসিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেছেন, উক্ত ঘটনাটির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার ইচ্ছা আমার বরাবরই ছিল। পূর্বে যে করি নি, সে কতকটা আলস্য ও কতকটা সংকোচবশত। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল উক্ত ঘটনা অবলম্বন ক'রে প্রবাসী পত্রিকায় একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখেছেন।

তিনি বলেন যে, তাঁরও বিশ্বাস ও-গল্পটি বৈষ্ণবদের কল্পিত নয়, সত্য ঘটনা। আমরা যদি সে যুগের ইতিহাসের অন্তর থেকে পাঠান-বৈষ্ণব বিজুলি খাঁকে বা'র করতে পারি, তা হলে কবিরাজ গোস্বামী বর্ণিত বিবরণ যে সত্য সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। উক্ত কারণেই শীল মহাশয় বিজুলি খাঁর পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, চৈতন্যচরিতামৃতে যাঁকে বিজুলি খাঁ বলা হয়েছে, তাঁর প্রকৃত নাম আহম্মদ খাঁ। আমার ধারণা অন্যরূপ। আমার বিশ্বাস, চৈতন্যের যুগে বিজুলি খাঁ নামে একটি স্বতন্ত্র ও স্বনামখ্যাত রাজকুমার ছিলেন, এবং কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় তাঁরই কথা বলেছেন। কি কারণে আমার মনে এ ধারণা জন্মেছে, সেই কথাটাই এ প্রবন্ধে বলতে চাই।

চৈতন্যচরিতামৃত হতে যদি সমগ্র বর্ণনাটি পাঠকদের চোখের সম্মুখে ধরে দিতে পারতুম, তা হলে ঘটনাটি যে কত অদ্ভুত তা সকলেই দেখতে পেতেন। কিন্তু এ প্রবন্ধের ভিতর তার অবসর নেই, কারণ বর্ণনাটি একটু লম্বা। তা ছাড়া যিনি ইচ্ছা করেন. তিনিই চৈতন্যচরিতামৃতে তা দেখে নিতে পারেন। আমি সংক্ষেপে এবং যতদূর সম্ভব কবিরাজ মহাশয়ের জবানিতেই ব্যাপার কি হয়েছিল বলবার চেষ্টা করব। কারণ ঘটনাটি না জানলে তার বিচার পাঠকদের মনে লাগবে না। ঘটনাটি অদ্ভুত হলেও যে মিথ্যা নয়, এবং একেবারে বিচারসিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য, তাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করব। সকলেই মনে রাখবেন যে, ঐতিহাসিক সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। অতীতে যা একবার ঘটেছিল, তা পৃথিবীতে আর দুবার ঘটে না। ইংরেজিতে যাকে বলে historical fact, তার repetition নেই। আর যে-জাতীয় ঘটনা বার বার ঘটে এবং ঘটতে বাধ্য, সেই জাতীয় ঘটনা নিয়েই বিজ্ঞানের কারবার। সুতরাং ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমরা যাকে প্রমাণ বলি, তা অনুমান মাত্র।

মহাপ্রভু বৃন্দাবন-অঞ্চলে তীর্থভ্রমণ ক'রে দেশে যখন প্রত্যাবর্তন করছিলেন. তখন একদিন পথশ্রান্তি দূর করবার জন্য একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় নেন। তাঁর সঙ্গী ছিল তিনটি বাঙালি শিষ্য আর দুটি হিন্দুস্থানি ভক্ত; একজন রাজপুত অপরটি মাথুর ব্রাহ্মণ। এ দুই ব্যক্তিকেই তিনি মথুরাতে সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি গাছতলায় বসে আছেন, এমন সময়—

আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনি মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হইল॥
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িল।
মুখে ফেন পড়ে নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈল॥
হেনকালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইলা।
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা॥
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতি-পাশ ছিল সুবর্ণ অপার॥
এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লইয়া॥
যবে সেই পাঠান পঞ্চজনেরে বান্ধিল।
কাটিতে চাহে গৌড়িয়া কাঁপিতে লাগিল॥

এর থেকে বোঝা যায় যে, ভয় জিনিসটে আমরা বিলেত থেকে আমদানি করি নি। বাঙালি তিনজন ভয়ে কাঁপতে লাগলেন দেখে মহাপ্রভুর হিন্দুস্থানি ভক্ত দুজন তাঁদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। কারণ—

কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় সে বড়ো।
সেই বিপ্র নির্ভয় মুখে বড়ো দড়॥

সেই 'মুখে বড়ো দড়ো' ব্রাহ্মণ পাঠান আসোয়ারদের বললেন—

এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়েত মূর্ছিত।
অবহি চেতন পাব হইব সংবিত॥
ক্ষণেক ইহা বৈস বান্ধি রাখহ সবারে।
ই'হাকে পুছিয়া তবে মারিহ আমারে॥

এ কথা শুনে

পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা দুইজন।
গৌড়িয়া ঠক এই কাঁপে তিনজন॥

বাঙালি বেচারারা ভয়ে কাঁপছে, তার থেকে প্রমাণ হল তারাই মহাপ্রভুকে খুন করেছে। একালেও আদালতে demeanour থেকে অপরাধের প্রমাণ হয়। সুতরাং সে তিন বেচারার হাতে হাতে প্রাণদণ্ড দেওয়াই স্থির হল। এ ক্ষেত্রেও উক্ত গোবেচারাদের প্রাণরক্ষা করলেন সেই নির্ভীক রাজপুত বৈষ্ণব।

কৃষ্ণদাস কহে আমার ঘর এই গ্রামে।
দুইশত তুরুকী আছে দুই শত কামানে॥
এখনি আসিবে সব আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া পিড়া লুটি লবে তোমা সবা মারি॥
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে তুমি বাটপাড়।
তীর্থবাসী লুট আর চাহ মারিবার॥
শুনিয়া পাঠানমনে সংকোচ বড় হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল॥

এর পর পাঠানদের মধ্যে যে একজন পীর ছিলেন, তার সঙ্গে মহাপ্রভুর শাস্ত্রবিচার শুরু হয়, এবং সে বিচারে পরাস্ত হয়ে পীর সাহেব মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, এবং

রামদাস বলি প্রভু তার কৈল নাম।
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলিখান॥
অল্পবয়স তার রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার॥
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেহ মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায়॥

এই হচ্ছে পূর্বোক্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পীর ও প্রভুর শাস্ত্রবিচারের পরিচয় পরে দেব; কারণ সে বিচার অতি বিস্ময়-জনক। তার পর কি কারণে রাজকুমার বিজুলি খাঁকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি মনে করি তা বলব। প্রথমে এরকম ঘটনা ঘটা যে সম্ভব তাই দেখাবার জন্য দেশ-কালের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

শীল মহাশয় অনুমান করেন যে, মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন-অঞ্চলে তীর্থভ্রমণে যান তখন সিকন্দর লোদি দিল্লির পাতশা এবং আগ্রা ছিল তাঁর রাজধানী। ১৫১৭

খৃস্টাব্দে সিকন্দর লোদির মৃত্যু হয়। সুতরাং চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লিখিত ঘটনা সম্ভবত ১৫১৬ খৃস্টাব্দে ঘটে। আমার বিশ্বাস, এ অনুমান সংগত। কবিরাজ গোস্বামীর কথা মেনে নিলেও ঐ তারিখই পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন যে মহাপ্রভুর—

মধ্যলীলার করিল এই দিগ্‌দরশন।
ছয় বৎসর করিল যৈছে গমনাগমন॥
শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ-সঙ্গে করে কীর্তন-উল্লাস॥[১]

এখন, ঐতিহাসিকদের মতে চৈতন্যদেব চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৫০৯ খৃস্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এবং তার কিছুদিন পরেই তীর্থপর্যটনে বহির্গত হন। ঠিক কতদিন পরে তা আমরা জানি নে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে তাঁর 'গমনাগমন' শুরু হয় ১৫১০ খৃস্টাব্দে, তা হলে তিনি কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের হিসেবমত ১৫১৬ সালে 'মথুরা হইতে প্রয়াগ গমন' করেন। অপর পক্ষে তাঁর মৃত্যুর আঠারো বৎসরের আগের হিসেব ধরলেও ঐ একই তারিখে পেঁছানো যায়, কারণ মহাপ্রভুর তিরোভাবের তারিখ হচ্ছে ১৫৩৪ খৃস্টাব্দ।

সিকন্দর লোদি ছিলেন হিন্দুধর্মের মারাত্মক শত্রু। উক্ত পাতশার পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত কথা-ক'টি হতে পাওয়া যাবে—

The greatest blot on his character was relentless bigotry. The wholesale destruction of temples was not the best method of conciliating the Hindus of a conquered district.[২]

চৈতন্যদেব যখন বৃন্দাবনে উপস্থিত হন, তখন সে দেশে যে দেবমন্দির ও বিগ্রহাদির ধ্বংসলীলা চলছিল, তা চৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি হতেই জানা যায়। মহাপ্রভু অতিকষ্টে গোপালজির দর্শনলাভ করেন। কারণ—

অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত-লোকের সেই গ্রামেতে বসতি॥
একজন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধারী সাজিল॥
আজি রাত্রে পলাহ না রহিও একজন।
ঠাকুর লইয়া ভাগ আসিবে কালযবন॥
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঠুলিগ্রামে থুইল॥
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল পলাইল সর্বজন॥
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে কিবা গ্রামান্তরে॥

---

[১] চৈতন্যচরিতামৃত, ২৫ পরিচ্ছেদ, ১৮৫ শ্লোক

[২] *Cambridge History of India*, vol. 3, p. 246.

পূর্বোক্ত ইংরেজ ঐতিহাসিক সিকন্দর লোদি সম্বন্ধে আরো বলেন যে—

The accounts of his conquests resemble those of the protagonists of Islam in India. Sikandar Lodi's mind was warped by habitual association with theologians.

পাঠান বীরপুরুষেরা প্রথম যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন তাঁরা যেভাবে হিন্দুর মন্দির-মঠ-দেবদেবীর উপর যুদ্ধঘোষণা করেন, তার পাঁচশো বৎসর পরে পাঠানরাজ্যের যখন ভগ্নদশা, তখন আবার পাঠান পাতশারা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে নব জেহাদ প্রচার করেন কেন? যেকালে সিকন্দর লোদি বৃন্দাবন-অঞ্চলে দেব-মন্দিরাদির ধ্বংস করেন, ঠিক সেই একই সময়ে গৌড়ের পাতশাহ হুসেন শাহও

ওড্রদেশে কোটিকোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক, কতকত করিল প্রমাদ॥[১]

৪

এই সময়েই হিন্দুধর্ম নূতন প্রাণ পায়। তাই উক্ত ধর্মের প্রতি পাতশাদের মনে নববিদ্বেষও জাগ্রত হয়। এই নবহিন্দুধর্ম নবরূপ ধারণ ক'রে আবির্ভূত হয়। জ্ঞান-কর্মকে প্রত্যাখ্যান ক'রে এ ধর্ম একমাত্র ভক্তিপ্রধান হয়ে ওঠে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামানন্দ যে ভক্তির ধর্ম উত্তরাপথে প্রচার করেন, সে ধর্ম বহু-লোকের হৃদয়-মন স্পর্শ করে। 'শুষ্ক জ্ঞান' ও 'বাহ্যকর্মের' ব্যবসায়ীদের, অর্থাৎ হিন্দুসমাজের ধর্মযাজকদের ও বেদান্তশাস্ত্রীদের, যে এই ভক্তিধর্মের প্রতি অসীম অবজ্ঞা ছিল, তার প্রমাণ বৈষ্ণবগ্রন্থে পাতায় পাতায় আছে।

অপর পক্ষে মৌলবিদের অর্থাৎ মুসলমান-ধর্মশাস্ত্রীদের বিদ্বেষের একটি বিশেষ কারণ ছিল। তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন যে, এই প্রবল ভক্তির স্রোতে অনেক মুসলমানও হয়তো ভেসে যাবে, এবং আমার বিশ্বাস, এই শাস্ত্রীদের দ্বারা প্ররোচিত হয়েই সেকালের মুসলমান পাতশারা এই নবহিন্দুধর্মের উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। অন্তত সিকন্দর লোদির মন তো was warped by habitual association with theologians।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল সেকালের জনৈক ব্রাহ্মণের নবধর্মমত প্রচার করার অপরাধে প্রাণদণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন। *Cambridge History of India* থেকে উক্ত ঘটনাটির বিবরণ নিম্নে উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি—

Sikandar had an opportunity while at Sambul of displaying the bigotry which was a prominent feature of his character. A Brahman of Bengal excited some interest and, among precisians, much indignation, by publicly maintaining that the Mahomedan and Hindu religions were both true, and were but different paths by which God might be approached. A'zam-i-Humayun, governor of

[১] চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়

Bihar, was directed to send the daring preacher and two rival doctors of Islamic law to court, and theologians were summoned from various parts of the kingdom to consider whether it was permissible to preach peace. They decided that since the Brahman had admitted the truth of Islam, he should be invited to embrace it with the alternative of death in the event of refusal. The decision commended itself to Sikandar and the penalty was exacted from the Brahman, who refused to change his faith.

এ বাঙালি ব্রাহ্মণটি যে কে জানি নে। কিন্তু তাঁর সমকালবর্তী কবীরের মতও ঐ, চৈতন্যেরও তাই। চৈতন্যের শিষ্য যবন হরিদাসের যখন গৌড়ের বাদশার দরবারে বিচার হয়, তখন হরিদাসও ঐ একই মত প্রকাশ করেন, এবং বাংলার ও আগ্রার মৌলবিদের মতে যে it was not permissible to preach peace, তার কারণ তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন যে উক্ত ধর্মের প্রশ্রয় দিলে কোনো কোনো পাঠানও এই নববৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হবে, যেমন বিজুলি খাঁ পরে হয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস, আদিতে এই বৈষ্ণবধর্ম একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম ছিল না। পূর্বোক্ত বাঙালি ব্রাহ্মণ যেমন স্বধর্ম ত্যাগ না করেও মুসলমানধর্মের অনুকূল হয়েছিলেন, আমার বিশ্বাস কোনো কোনো পাঠানও তেমনি স্বধর্ম ত্যাগ না করেও পরমভাগবত হয়েছিলেন এবং বিজুলি খাঁ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

এখন প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে আসা যাক। যে অবস্থায় ও যে কারণে মহাপ্রভুর দলবল পথ-চলতি তুরুখ-সোয়ারদের হাতে গ্রেপ্তার হন, তার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ঐ সূত্রে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বলেছেন যে—

সেই ম্লেচ্ছমধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কালো বস্ত্র পরে তা'তে লোকে কহে পীর॥

এই পীরের সঙ্গে মহাপ্রভু শাস্ত্রবিচার ক'রে তাঁকে স্বমতাবলম্বী করেন। পরে পাঠান রাজকুমার বিজুলি খাঁও স্বীয় গুরুর পদানুসরণ করেন। এই শাস্ত্রবিচারের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব, কারণ এ বিচার অদ্ভুত। সেই পীরের

চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুরে দেখিয়া

এবং সে

নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাইয়া॥
অদ্বয় ব্রহ্মবাদ সেই করিল স্থাপন।
তারি শাস্ত্রযুক্ত্যে প্রভু করিলা খণ্ডন॥

মুসলমান পীর যে শংকরপন্থী অদ্বৈতবাদী, এ কথা কি বিশ্বাস্য? তার পর মহাপ্রভুর উত্তর আরো আশ্চর্য। তিনি বললেন—

তোমার পণ্ডিত সবের নাহি শাস্ত্রজ্ঞান।
পূর্ব পর বিধিমধ্যে পর বলবান্॥

নিজ শাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া।
কি লিখিয়াছে শেষ নির্ণয় করিয়া॥...
প্রভু কহে তোমার শাস্ত্রে স্থাপ নির্বিশেষ।
তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ॥
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশ্বর।
সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ তেহোঁ শ্যামকলেবর॥
সচ্চিদানন্দ দেহ পূর্ণব্রহ্মরূপ।
সর্বাত্মা সর্বজ্ঞ নিত্য সর্বাদিস্বরূপ॥

মহাপ্রভুর মুখে এ কথা শুনে পীর উত্তর করলেন যে—

অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছশাস্ত্র হৈতে।
সাধ্যসাধনবস্তু নারি নির্ধারিতে॥...
আমি বড়ো জ্ঞানী এই গেল অভিমান॥

এই কথোপকথন আমাদের বড়োই আশ্চর্য ঠেকে, কারণ মুসলমানধর্মের God যে personal God, বহু দেবতাও নয়, এক নির্গুণ পরব্রহ্মও নয়, এ কথা আমরা সকলেই জানি। সুতরাং কোনো পরমগম্ভীর মুসলমান পীরকে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে মহাপ্রভুর পক্ষে আবশ্যক হয়েছিল, এ কথাটা প্রথমে নিতান্তই আজগুবি মনে হয়। কিন্তু যাঁদের মুসলমানধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন যে, কালক্রমে মুসলমানধর্মও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে, এবং তাদের মধ্যে কোনো কোনো সম্প্রদায় জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে, এবং কোনো ধর্মেরই জ্ঞানমার্গীরা সগুণ ঈশ্বর অঙ্গীকার করে না। উক্ত পীর যে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তা তাঁর পরিধানের কালো বস্ত্র থেকেই বোঝা যায়। সুফীদের সাম্প্রদায়িক-বেশ স্বতন্ত্র। সুতরাং পীর মহাশয় সুফী নন। তবে তিনি কি? যাঁরা মুসলমানধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তাঁরা বলতে পারেন।

তার পর আরো আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে মহাপ্রভুর মুসলমান শাস্ত্রের বিচার। শ্রীচৈতন্য যে মহাপণ্ডিত ছিলেন তা আমরা সকলেই জানি, তবে তিনি যে আরবি শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, এ কথা কারো মুখে শুনি নি। তবে এ বিচারের কথাটা কি আগাগোড়া মিথ্যা। আমার ধারণা অন্যরূপ। আমার বিশ্বাস, সে-যুগে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পণ্ডিতমহলে শাস্ত্রবিচার চলত, এবং হিন্দু-মুসলমান শাস্ত্রীরা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মমতের আসল কথা সব জানতেন। সিকন্দর লোদি গোঁড়া মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর দরবারে জনৈক বাঙালি ব্রাহ্মণের সহিত মৌলবিদের শাস্ত্রবিচারের বৈঠক বসান। আমার এ অনুমান যদি সত্য হয় তো মহাপ্রভু যে মুসলমান শাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হন, এ কথা অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই।

৬

কবিরাজ গোস্বামীর এ-সব কথা যদি সত্য হয়, এবং আমার বিশ্বাস তা মূলত সত্য, তা হলে এই প্রমাণ হয় যে, মহাপ্রভু যেমন পুরীতে সার্বভৌমকে, কাশীতে

প্রকাশানন্দকে, জ্ঞানমার্গ ত্যাগ ক'রে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিলেন, তেমনি তিনি সৌরক্ষেত্রে জনৈক পরমগম্ভীর অদ্বৈতবাদী মুসলমান পীরকেও ভগবদ্‌ভক্ত করে তুলেছিলেন, এবং একমাত্র কোরানের দোহাই দিয়ে। এবং তিনি পূর্বেও যেমন হিন্দু শাস্ত্রীদের নিকট মুসলমানধর্ম প্রচার করেন নি, এ ক্ষেত্রেও তেমনি তিনি মুসলমান শাস্ত্রীর নিকট হিন্দুধর্ম প্রচার করেন নি। কিন্তু উভয় ধর্মমতেরই যা greatest common measure, অর্থাৎ ভগবদ্‌ভক্তি, তারই মর্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন। এবং, আমার বিশ্বাস, ইতিপূর্বে সিকন্দর লোদি যে-ব্রাহ্মণ বেচারাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন, সে বেচারির অপরাধ সে একই মত প্রচার করে, কিন্তু তাই বলে স্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্ম অঙ্গীকার করতে রাজি হয় না—প্রাণ বাঁচাবার খাতিরেও নয়।

ও-যুগটা ছিল এ দেশের ধর্মের ইন্‌টারন্যাশনালিজ্‌মের যুগ।। আজও এমন বহু লোক আছেন যাঁরা ইন্‌টারন্যাশনালিজ্‌ম্‌ কথাটায় ভয় পান, কারণ তাঁদের বিশ্বাস ও-মনোভাব ন্যাশনালিজ্‌মের পরিপন্থী। সেকালেও অনেকে ধর্ম বলতে বুঝতেন, হয় হিন্দুধর্ম, নয় মুসলমানধর্ম। কিন্তু মানুষে যাকে ধর্মমনোভাব বলে, তার প্রাণ যে ভগবদ্‌ভক্তি, এ জ্ঞান যার আছে, তার অন্তরে নানা ধর্মের ভেদজ্ঞানটাই অবিদ্যা। আমার বিশ্বাস, সে যুগে ভগবদ্‌ভক্ত ও বৈষ্ণব এ দুটি পর্যায়-শব্দ ছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণের মতো পাঠানও স্বধর্ম রক্ষা করেও পরমবৈষ্ণব অর্থাৎ পরমভাগবত হতে পারত। সকল ধর্মেরই কথা এক, শুধু ভাষা বিভিন্ন। বৈষ্ণবধর্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে—

সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

এ কথা বলাও যা আর স্বধর্ম রক্ষা ক'রে মামেকং শরণং ব্রজ, এ কথা বলাও কি তাই নয়?

৭

হিন্দু যে স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে স্বেচ্ছায় মুসলমানধর্ম গ্রহণ করে, এ ঘটনা আজও ঘটে কিন্তু মুসলমান যে স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে, আজ তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কারণেই চৈতন্যচরিতামৃতের কথা বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, হিন্দুধর্ম অর্থাৎ হিন্দু-সমাজের দরজা আজ বন্ধ হলেও অতীতে খোলা ছিল। আজ আমরা এ সমাজ থেকে অনেক হিন্দুকে বহিষ্কৃত করতে পারি, কিন্তু কোনো অহিন্দুকে তার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি নে, কারণ আজকের দিনে হিন্দুসমাজের অর্থ হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-ধর্মের অর্থ হিন্দুসমাজ। আর হিন্দুসমাজ হচ্ছে অপর সকল মানবসমাজ হতে বিচ্ছিন্ন ও একঘরে; কিন্তু ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন যে, হিন্দুযুগে অসংখ্য শক ও যবন বৌদ্ধধর্মের শরণ গ্রহণ করেন, এবং বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা মাত্র; আর এ ধর্মমন্দিরের দ্বার বিশ্বমানবের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

ভারতবর্ষের মধ্যযুগের এই নববৈষ্ণবধর্মও সনাতন হিন্দুধর্মের একটি নব শাখা মাত্র। তবে এ নবত্বের কারণ, মুসলমানধর্মের প্রভাব। মুসলমানধর্ম যে

প্রধানত ঐকান্তিক ভক্তির ধর্ম, এ কথা কে না জানে? ভারতবর্ষের মধ্যযুগের বৈষ্ণবধর্ম যে মুসলমানধর্মের এতটা গা-ঘেঁষা, তার কারণ পাঁচশো বৎসর ধ'রে হিন্দুধর্ম ও মুসলমানধর্ম পাশাপাশি বাস ক'রে আসছিল। একেশ্বরবাদ, ও মানুষমাত্রেই যে ভগবানের সন্তান, এ দুটিই হচ্ছে মুসলমানধর্মের বড়ো কথা। তাই এই নবহিন্দুধর্মে অহিন্দুরও প্রবেশের পূর্ণ অধিকার ছিল। তা যে ছিল, তার প্রমাণ চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে দেদার আছে। সুতরাং শীল মহাশয়ের আবিষ্কৃত আহম্মদ খাঁ নামক পাঠানও যে উক্ত ধর্মে দীক্ষিত হন, এ কথা অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই। তবে বিজ্‌লি খাঁ নামক যে একটি স্বতন্ত্র পাঠান রাজকুমার ছিলেন সে বিষয়েও সন্দেহ নেই, এবং খুব সম্ভবত তাঁর সঙ্গে চৈতন্যদেবের মথুরার সন্নিকটে দেখা হয়েছিল। *Tabakat-i-Akbari* নামক ফারসি গ্রন্থে তাঁর নামধাম এবং তাঁর বাপের নামও পাওয়া যায়। আকবর কর্তৃক কালিঞ্জর-দুর্গ আক্রমণসূত্রে গ্রন্থকার বলেন যে—

This is a strong fortress, and many former Sultans had been ambitious of taking it. Sher Khan Afghan (Sher Shah) besieged it for a year, but was killed in the attempt to take it, as has been narrated in the history of his reign. During the interregnum of the Afghans, Raja Ram Chunder had purchased the fort at a high price from Bijilli Khan, the adopted son (Pisan-i-khwanda) of Bihar Khan Afghan.[১]

এর থেকে জানা যায় যে, রাজকুমার বিজ্‌লি খাঁ কালিঞ্জরের নবাবের পোষ্যপুত্র; এবং তিনিই এ রাজ্য রাজা রামচন্দ্রকে বিক্রি ক'রে চলে গিয়েছিলেন, সম্ভবত বৃন্দাবনে। তবে তিনি যে কবে কালিঞ্জর-রাজ্য ত্যাগ করেন তার তারিখ আমরা জানি নে, সম্ভবত তাঁর পিতা বিহারি খাঁ আফগানের মৃত্যুর পর তিনি যখন স্বয়ং নবাব হন। শের শাহ্‌র মৃত্যু হয়েছিল ১৫৪৪ খৃস্টাব্দে, বিজ্‌লি খাঁ খুব সম্ভবত এর পরেই কালিঞ্জর হস্তান্তর করেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁর অল্প বয়েস, সুতরাং রাজা রামচন্দ্রকে তিনি যখন কালিঞ্জর-দুর্গ বিক্রি করেন, তখন তাঁর বয়েস আন্দাজ পঞ্চাশ। বিজ্‌লি খাঁ কালিঞ্জরের নবাব হওয়া সত্ত্বেও যে পরমভাগবত ব'লে গণ্য হয়েছিলেন, এ ব্যাপার অসম্ভব নয়! বৌদ্ধযুগের বড়ো বড়ো রাজামহারাজারাও পরমসৌগত ব'লে গণ্য হতেন। তা ছাড়া, এ নববৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য বিষয়সম্পত্তি ত্যাগ করবার প্রয়োজন ছিল না। ভোগে অনাসক্ত হলেই বৈষ্ণব হওয়া যেত। মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে এই কথা বলেই তাঁকে সংসারত্যাগের সংকল্প হতে বিরত করেন।

মহাপ্রভু নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু অপরকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে কখনো উৎসাহ দেন নি। এমন-কি, বালযোগী অবধূত নিত্যানন্দকে সন্ন্যাসীর ধর্ম ত্যাগ করে গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিলেন।

---

[১] Elliots' *History of India*, vol. I, p. 333.

এই-সব কারণে আমার বিশ্বাস যে চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত উক্ত ঘটনাটি অন্তত চৌদ্দ-আনা সত্য, অতএব ঐতিহাসিক। কারণ আমরা যাকে ঐতিহাসিক সত্য বলি, তার ভিতর থেকে অনেকখানি খাদ বাদ না দিলে তা বৈজ্ঞানিক সত্য হয় না। ঐতিহাসিক সত্য হচ্ছে অসত্য ও বৈজ্ঞানিক সত্যের মাঝামাঝি একরকম সত্যাসত্য মাত্র। আর-এক কথা। আমরা যে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের অনেক কথাই কবিকল্পিত মনে করি, তার কারণ সেকালের অনেক পুঁথি কাব্য হিসেবে পড়ি যদিচ কাব্যের কোনো লক্ষণই তাদের গায়ে নেই, এক পয়ারের বন্ধন ছাড়া। পরে সে পয়ারের বন্ধন যে কত ঢিলে আর তার শ্রী যে কত চমৎকার, তা চৈতন্য-চরিতামৃতের উদ্‌ধৃত শ্লোকগুলিতে সকলেই দেখতে পাবেন। তা ছাড়া ও-সব গ্রন্থে কবিকল্পিত, অর্থাৎ কবির কল্পনাপ্রসূত, ব'লে কোনো জিনিসই নেই। কবিকল্পনার তাঁরা ধার ধারতেন না। সুতরাং তাঁদের কথার যদি কোনো মূল্য থাকে, তা একমাত্র সত্য হিসাবে।

সুতরাং লিটারেচার ওরফে রসসাহিত্য যাঁদের মুখরোচক নয় এবং যাঁরা মাত্র সত্যানুসন্ধী, তাঁদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নির্ভয়ে চর্চা করতে অনুরোধ করি: তাঁরা ও-সাহিত্যের অন্তরে অনেক নীরস ঐতিহাসিক ও দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান নিশ্চয় পাবেন।

বৈশাখ ১৩৩৮

ভাষার কথা

কথার কথা

সম্প্রতি বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে আমাদের ক্ষুদ্র সাহিত্যসমাজে একটা বড়োরকম বিবাদের সূত্রপাত হয়েছে। আমি বৈয়াকরণ নই, হবারও কোনো ইচ্ছে নেই। আলেক্‌জান্দ্রিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরি মুসলমানরা ভস্মসাৎ করেছে বলে সাধারণত লোকে দুঃখ করে থাকে, কিন্তু প্রসিদ্ধ ফরাসি লেখক Montaigne ম'তেইন্‌এর মনোভাব এই যে, ও ছাই গেছে বাঁচা গেছে! কেননা সেখানে অভিধান ও ব্যাকরণের এক লক্ষ গ্রন্থ ছিল। 'বাবা! শুধু কথার উপর এত কথা!' আমিও ম'তেইন্‌এর মতে সায় দিই। যেহেতু আমি ব্যাকরণের কোনো ধার ধারি নে, সুতরাং কোনো ঋষিঋণমুক্ত হবার জন্য এ বিচারে আমার যোগ দেবার কোনো আবশ্যক ছিল না। কিন্তু তর্ক জিনিসটে আমাদের দেশে তরল পদার্থ, দেখতে-না-দেখতে বিষয় হতে বিষয়ান্তরে অবলীলাক্রমে গড়িয়ে যাওয়াটাই তার স্বভাব। তর্কটা শুরু হয়েছিল ব্যাকরণ নিয়ে, এখন মাঝামাঝি অবস্থায় অলংকারশাস্ত্রে এসে পেঁচেছে, শেষ হবে বোধ হয় বৈরাগ্যে। সে যাই হোক, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এই মত প্রচার করছেন যে, আমরা লেখায় যত অধিক সংস্কৃত শব্দ আমদানি করব, ততই আমাদের সাহিত্যের মঙ্গল। আমার ইচ্ছে বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষাতেই লেখা হয়। দুর্বলের স্বভাব, নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না। বাইরের একটা আশ্রয় আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। আমরা নিজের উন্নতির জন্যে পরের উপর নির্ভর করি। স্বদেশের উন্নতির জন্যে আমরা বিদেশীর মুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছি, এবং একই কারণে নিজ ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্যে অপর ভাষার সাহায্য ভিক্ষা করি। অপর জাতি অপর ভাষা যতই শ্রেষ্ঠ হোক-না কেন, তার অঞ্চল ধরে বেড়ানোটা কি মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়? আমি বলি আমরা নিজেকে একবার পরীক্ষা করে দেখি-না কেন। ফল কি হবে কেউ বলতে পারে না, কারণ, কোনো সন্দেহ নেই যে, সে পরীক্ষা আমরা পূর্বে কখনো করি নি। স্বাধীন হবার চেষ্টাতেও সুখ আছে। যাক ও-সব বাজে কথা। আমি বাংলা ভাষা ভালোবাসি, সংস্কৃতকে ভক্তি করি। কিন্তু এ শাস্ত্র মানি নে যে, যাকে শ্রদ্ধা করি তারই শ্রাদ্ধ করতে হবে। আমার মত ঠিক, কিংবা শাস্ত্রী মহাশয়ের মত ঠিক, সে বিচার আমি করতে বসি নি। শুধু তিনি যে যুক্তি দ্বারা নিজের মত সমর্থন করতে উদ্যত হয়েছেন, তাই আমি যাচিয়ে দেখতে চাই।

২

কেউ হয়তো প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন, বাংলা ভাষা কাকে বলে। বাঙালির মুখে এ প্রশ্ন শোভা পায় না। এ প্রশ্নের সহজ উত্তর কি এই নয় যে, যে ভাষা আমরা সকলে জানি শুনি বুঝি, যে ভাষায় আমরা ভাবনা-চিন্তা সুখদুঃখ বিনা

আয়াসে বিনা ক্লেশে বহুকাল হতে প্রকাশ করে আসছি, এবং সম্ভবত আরো বহুকাল পর্যন্ত প্রকাশ করব, সেই ভাষাই বাংলা ভাষা? বাংলা ভাষার অস্তিত্ব প্রকৃতিবাদ অভিধানের ভিতর নয়, বাঙালির মুখে। কিন্তু অনেকে, দেখতে পাই, এই অতি সহজ কথাটা স্বীকার করতে নিতান্ত কুণ্ঠিত। শুনতে পাই কোনো কোনো শাস্ত্রজ্ঞ মৌলবি বলে থাকেন যে, দিল্লির বাদশাহ যখন উর্দু ভাষা সৃষ্টি করতে বসলেন, তখন তাঁর অভিপ্রায় ছিল একেবারে খাঁটি ফারসি ভাষা তৈয়ার করা, কিন্তু বেচারা হিন্দুদের কান্নাকাটিতে কৃপাপরবশ হয়ে হিন্দিভাষার কতকগুলো কথা উর্দুতে ঢুকতে দিয়েছিলেন। আমাদের মধ্যেও হয়তো শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের বিশ্বাস যে, আদিশূরের আদিপুরুষ যখন গৌড়ভাষা সৃষ্টি করতে উদ্যত হলেন, তখন তাঁর সংকল্প ছিল যে, ভাষাটাকে বিলকুল সংস্কৃত ভাষা করে তোলেন, শুধু গৌড়বাসী-দের প্রতি পরম অনুকম্পাবশত তাদের ভাষার গুটিকতক কথা বাংলা ভাষায় ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। এখন যাঁরা সংস্কৃতবহুল ভাষা ব্যবহার করবার পক্ষপাতী, তাঁরা ঐ যে গোড়ায় গলদ হয়েছিল তাই শুধরে নেবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। আমাদের ভাষায় অনেক অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ আছে, সেইগুলিকেই ভাষার গোড়াপত্তন ধরে নিয়ে, তার উপর যত পার আরো সংস্কৃত শব্দ চাপাও—কালক্রমে বাংলায় ও সংস্কৃতে দ্বৈতভাব থাকবে না। আসলে জ্ঞানী লোকের কাছে এখনো নেই। মাতৃভাষার মায়ায় বদ্ধ বলে, আমরা সংস্কৃত-বাংলায় অদ্বৈতবাদী হয়ে উঠতে পারছি নে। বাংলায় ফারসি কথার সংখ্যাও বড়ো কম নয়, ভাগ্যক্রমে ফারসি-পড়া বাঙালির সংখ্যা বড়ো কম। নইলে সম্ভবত তাঁরা বলতেন, বাংলাকে ফারসিবহুল করে তোলো। মধ্যে থেকে আমাদের মা-সরস্বতী, কাশী যাই কি মক্কা যাই, এই ভেবে আকুল হতেন। এক-একবার মনে হয় ও উভয়সংকট ছিল ভালো, কারণ একেবারে পণ্ডিতমণ্ডলীর হাতে পড়ে মার আশু কাশীপ্রাপ্তি হবারই অধিক সম্ভাবনা।

৩

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রথম বক্তব্য এই যে, সাহিত্যের উৎপত্তি মানুষের অমর হবার ইচ্ছায়। যা-কিছু বর্তমান আছে, তার কুলজি লিখতে গেলেই গোড়ার দিকটে গোঁজামিলন দিয়ে সারতে হয়। বড়ো বড়ো দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, যথা শংকর স্পেন্সার প্রভৃতিও ঐ উপায় অবলম্বন করেছেন। সুতরাং কোনো জিনিসের উৎপত্তির মূল নির্ণয় করতে যাওয়াটা বৃথা পরিশ্রম। কিন্তু এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, আর যা হতেই হোক, অমর হবার ইচ্ছে থেকে সাহিত্যের উৎপত্তি হয় নি। প্রথমত, অমরত্বের ঝুঁকি আমরা সকলে সামলাতে পারি নে, কিন্তু কলম চালাবার জন্য আমাদের অনেকেরই আঙুল নিস্‌পিস্‌ করে। যদি ভালো-মন্দ-মাঝারি আমাদের প্রতি কথা প্রতি কাজ চির-স্থায়ী হবার তিলমাত্র সম্ভাবনা থাকত, তা হলে মনে করে দেখুন তো আমরা কজনে মুখ খুলতে কিংবা হাত তুলতে সাহসী হতুম? অমরত্বের বিভীষিকা চোখের উপর

থাকলে, আমরা যা perfect তা ব্যতীত কিছু বলতে কিংবা করতে রাজি হতুম না। আর আমরা সকলেই মনে মনে জানি যে, আমাদের অতি ভালো কাজ, অতি ভালো কথাও perfectionএর অনেক নীচে। আসল কথা, মৃত্যু আছে বলেই বেঁচে সুখ! পুণ্যক্ষয় হবার পর আবার মর্তলোকে ফিরে আসবার সম্ভাবনা আছে বলেই দেবতারা অমরপুরীতে স্ফূর্তিতে বাস করেন, তা না হলে স্বর্গও তাঁদের অসহ্য হত। সে যাই হোক, আমরা মানুষ, দেবতা নই; সুতরাং আমাদের মুখের কথা দৈববাণী হবে এ ইচ্ছা আমাদের মনে স্বাভাবিক নয়।

দ্বিতীয়ত, যদি কেউ শুধু অমর হবার জন্য লিখব, এই কঠিন পণ করে বসেন তা হলে সে ইচ্ছা সফল হবার আশা কত কম বুঝতে পারলে, তিনি যদি বুদ্ধিমান হন তা হলে লেখা হতে নিশ্চয়ই নিবৃত্ত হবেন। কারণ সকলেই জানি যে, হাজারে নশো নিরেনব্বই জনের সরস্বতী মৃতবৎসা। তা ছাড়া সাহিত্যজগতে মড়ক অষ্ট-প্রহর লেগে রয়েছে। লাখে এক বাঁচে, বাদবাকির প্রাণ দু-দণ্ডের জন্যও নয়। চরক পরামর্শ দিয়েছেন, যে দেশে মহামারীর প্রকোপ, সে দেশ ছেড়ে পলায়ন করাই কর্তব্য। অমর হবার ইচ্ছায় ও আশায় কে সে রাজ্যে প্রবেশ করতে চায়?

৪

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আরো বক্তব্য এই যে, জীয়ন্ত ভাষার ব্যাকরণ করতে নেই, তা হলেই নির্ঘাত মরণ। সংস্কৃত মৃতভাষা, কারণ ব্যাকরণের নাগপাশে বদ্ধ হয়ে সংস্কৃত প্রাণত্যাগ করেছে। আরো বক্তব্য এই যে, মুখের ভাষার ব্যাকরণ নেই, কিন্তু লিখিত ভাষার ব্যাকরণ নইলে চলে না। প্রমাণ— সংস্কৃত শুধু অমরত্ব লাভ করেছে, পালি প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষা একেবারে চিরকালের জন্য মরে গেছে; অর্থাৎ, এক কথায় বলতে গেলে, যে-কোনো ভাষারই হোক-না কেন, চিরকালের জন্য বাঁচতে হলে আগে মরা দরকার। তাই যদি হয়, তা হলে বাংলা যদি ব্যাকরণের দড়ি গলায় দিয়ে আত্ম-হত্যা করতে চায়, তাতে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আপত্তি কি? তাঁর মতানুসারে তো যমের দুয়োর দিয়ে অমরপুরীতে ঢুকতে হয়। তিনি আরো বলেন যে, পালি প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষায় হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে, কিন্তু প্রাকৃত সংস্কৃত নয় বলে পালি প্রভৃতি ভাষা লুপ্ত হয়ে গেছে। অতএব বাংলা যতটা সংস্কৃতের কাছা-কাছি নিয়ে আসতে পার, ততই তার মঙ্গল। যদি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত সত্য হয়, তা হলে সংস্কৃতবহুল বাংলায় লেখা কেন, একেবারে সংস্কৃত ভাষাতেই তো আমাদের লেখা কর্তব্য। কারণ, তা হলে অমর হবার বিষয় আর কোনো সন্দেহ থাকে না। কিন্তু একটা কথা আমি ভালো বুঝতে পারছি নে; পালি প্রভৃতি ভাষা মৃত সত্য, কিন্তু সংস্কৃতও কি মৃত নয়? ও দেবভাষা অমর হতে পারে, কিন্তু ইহলোকে নয়। এ সংসারে মৃত্যুর হাত কেউ এড়াতে পারে না। পালিও পারে নি, সংস্কৃতও পারে নি, আমাদের মাতৃভাষাও পারবে না। তবে যে-কদিন বেঁচে আছে, সে-কদিন সংস্কৃতের মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে বেড়াতে হবে— বাংলার উপর এ কঠিন পরিশ্রমের বিধান কেন? বাংলার প্রাণ একটুখানি, অতখানি চাপ সইবে না।

৫

এ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য যদি ভুল না বুঝে থাকি, তা হলে তাঁর মত সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় যে, বাংলাকে প্রায় সংস্কৃত করে আনলে, আসামি হিন্দুস্থানি প্রভৃতি বিদেশী লোকদের পক্ষে বঙ্গ ভাষা শিক্ষাটা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার হয়ে-উঠবে; দ্বিতীয়ত, অন্য ভাষায় যে সুবিধাটুকু নেই, বাংলার তা আছে— যে-কোনো সংস্কৃত কথা যেখানে হোক লেখায় বসিয়ে দিলে বাংলা ভাষার বাংলাত্ব নষ্ট হয় না— অর্থাৎ যাঁরা আমাদের ভাষা জানেন না তাঁরা যাতে সহজে বুঝতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সাধারণ বাঙালির পক্ষে আমাদের লিখিত ভাষা দুর্বোধ করে তুলতে হবে। কথাটা এতই অদ্ভুত যে, এর কি উত্তর দেব ভেবে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁর অপর মতটি ঠিক কি না দেখা যাক। আমাদের দেশে ছোটো ছেলেদের বিশ্বাস যে, বাংলা কথার পিছনে অনুস্বর জুড়ে দিলেই সংস্কৃত হয়; আর প্রাপ্তবয়স্ক লোক-দের মত যে, সংস্কৃত কথার অনুস্বর-বিসর্গ ছেঁটে দিলেই বাংলা হয়। দুটো বিশ্বাসই সমান সত্য। বাঁদরের লেজ কেটে দিলেই কি মানুষ হয়? শাস্ত্রী মহাশয় উদাহরণ স্বরূপে বলেছেন, হিন্দিতে 'ঘরমে যায়েগা' চলে, কিন্তু 'গৃহমে যায়েগা' চলে না— ওটা ভুল হিন্দি হয়। কিন্তু বাংলায় ঘরের বদলে গৃহ যেখানে-সেখানে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ সকল ভাষার একটা নিয়ম আছে, শুধু বাংলা ভাষার নেই। যার যা খুশি লিখতে পারি, ভাষা বাংলা হতেই বাধ্য। বাংলা ভাষার প্রধান গুণ যে, বাঙালি কথায় লেখায় যথেচ্ছাচারী হতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্বা-চিত কথা দিয়েই তাঁর ও-ভুল ভাঙিয়ে দেওয়া যায়; 'ঘরের ছেলে ঘরে যাও, ঘরের ভাত বেশি করে খেয়ো', এই বাক্যটি হতে কোথাও 'ঘর' তুলে দিয়ে 'গৃহ' স্থাপনা করে দেখুন তো কানেই বা কেমন শোনায়, আর মানেই বা কত পরিষ্কার হয়।

৬

আসল কথাটা কি এই নয় যে, লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলে কোনো প্রভেদ নেই। ভাষা দুয়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। এক দিকে স্বরের সাহায্যে, অপর দিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়। ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উলটোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে। কেউ কেউ বলেন যে, আমাদের ভাবের ঐশ্বর্য এতটা বেড়ে গেছে যে, বাপ-ঠাকুরদাদার ভাষার ভিতর তা আর ধরে রাখা যায় না। কথাটা ঠিক হতে পারে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তার বড়ো-একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না। কণাদের মতে 'অভাব' একটা পদার্থ। আমি হিন্দুসন্তান, কাজেই আমাকে বৈশেষিক দর্শন মানতে হয়; সেই কারণেই আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, প্রচলিত বাংলা সাহিত্যেও

অনেকটা পদার্থ আছে। ইংরেজি সাহিত্যের ভাব, সংস্কৃত ভাষার শব্দ, ও বাংলা ভাষার ব্যাকরণ—এই তিন চিজ মিলিয়ে যে খিচুড়ি তয়ের করি, তাকেই আমরা বাংলা সাহিত্য বলে থাকি। বলা বাহুল্য, ইংরেজি না জানলে তার ভাব বোঝা যায় না, আর সংস্কৃত না জানলে তার ভাষা বোঝা যায় না। আমার এক-এক সময়ে সন্দেহ হয় যে, হয়তো বিদেশের ভাব ও পুরাকালের ভাষা, এই দুয়ের আওতার ভিতর পড়ে বাংলা সাহিত্য ফুটে উঠতে পারছে না। এ কথা আমি অবশ্য মানি যে, আমাদের ভাষায় কতক পরিমাণে নতুন কথা আনবার দরকার আছে। যার জীবন আছে, তারই প্রতিদিন খোরাক জোগাতে হবে। আর আমাদের ভাষার দেহ-পুষ্টি করতে হলে প্রধানত অমরকোষ থেকেই নতুন কথা টেনে আনতে হবে। কিন্তু যিনি নূতন সংস্কৃত কথা ব্যবহার করবেন তাঁর এইটি মনে রাখা উচিত যে, তাঁর আবার নূতন করে প্রতি কথাটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে; তা যদি না পারেন তা হলে বঙ্গসরস্বতীর কানে শুধু পরের সোনা পরানো হবে। বিচার না করে একরাশ সংস্কৃত শব্দ জড়ো করলেই ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হবে না, সাহিত্যেরও গৌরব বাড়বে না, মনোভাবও পরিষ্কার করে ব্যক্ত করা হবে না। ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়। যে কথাটি নিতান্ত না হলে নয় সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এসো, যদি নিজের ভাষার ভিতর তাকে খাপ খাওয়াতে পার। কিন্তু তার বেশি ভিক্ষে ধার কিংবা চুরি করে এনো না। ভগবান পবননন্দন বিশল্যকরণী আনতে গিয়ে আস্ত গন্ধমাদন যে সমূলে উৎপাটন করে এনেছিলেন তাতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেন নি।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯

বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতী পত্রিকাতে প্রকাশিত বাল্যকথা, ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনএর মতে অপ্রকাশিত থাকাই উচিত ছিল। লেখক যে কথা বলেছেন এবং যে ধরণে বলেছেন, দুয়ের কোনোটিই সম্পাদক মহাশয়ের মতে 'সুযোগ্য লেখক এবং সুপ্রসিদ্ধ মাসিকের উপযোগী নয়'। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সম্বন্ধে ভালোমন্দ কোনো কথাই আমার মুখে শোভা পায় না। তার কারণ এ স্থলে উল্লেখ করবার কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা তা শুধু 'ঘরওয়ালা ধরণে'র নয়, একেবারে পুরোপুরি ঘরাও কথা। আমি যদি প্রকাশ্যে সে লেখার নিন্দা করি, তা হলে আমার কুটুম্বসমাজ সে কার্যের প্রশংসা করবে না; অপর পক্ষে যদি প্রশংসা করি, তা হলে সাহিত্যসমাজ নিশ্চয়ই তার নিন্দা করবে। তবে ঢাকা রিভিউএর সম্পাদক মহাশয় উক্ত লেখকের ভাষা সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেছেন, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

প্রথমত, সম্পাদক মহাশয় বলেছেন যে, সে 'রচনার নমুনা যেপ্রকারের ঘর-ওয়ালা ধরণের, ভাষাও তদ্রূপ'। ভাষা যদি বক্তব্য বিষয়ের অনুরূপ হয়, তা হলে অলংকারশাস্ত্রের মতে সেটা যে দোষ বলে গণ্য, এ জ্ঞান আমার পূর্বে ছিল না। আত্মজীবনী লেখবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ঘরের কথা পরকে বলা। ঘরাও ভাষাই ঘরাও কথার বিশেষ উপযোগী মনে করেই লেখক, লোকে যেভাবে গল্প বলে, সেই ভাবেই তাঁর 'বাল্যকথা' বলেছেন। স্বর্গীয় কালী সিংহ যে হুতোম প্যাঁচার নকশার ভাষায় তাঁর মহাভারত লেখেন নি, এবং মহাভারতের ভাষায় যে হুতোম প্যাঁচার নকশা লেখেন নি, তাতে তিনি কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেন নি। সে যাই হোক, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষ হয়ে কোনোরূপ ওকালতি করা আমার অভিপ্রায় নয়, কারণ এ বিষয়ে বাংলার সাহিত্য-আদালতে তাঁর কোনোরূপ জবাবদিহি করবার দরকারই নেই। আমি এবং ঢাকা রিভিউএর সম্পাদক যেকালে, পূর্ববঙ্গের নয় কিন্তু পূর্ব-জন্মের ভাষায় বাক্যালাপ করতুম, সেই দূর অতীত কালেই ঠাকুর মহাশয় 'সুযোগ্য লেখক' বলে বাংলাদেশে খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

যে ধরণের লেখা ঢাকা রিভিউএর নিতান্ত অপছন্দ, সেই ধরণের লেখারই আমি পক্ষপাতী। আমাদের বাঙালি জাতির একটা বদনাম আছে যে, আমাদের কাজে ও কথায় মিল নেই। এ অপবাদ কতদূর সত্য তা আমি বলতে পারি নে। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, আমাদের কথায় ও লেখায় যত অধিক অমিল হয়, তত আমরা সেটি অহংকারের এবং গৌরবের বিষয় বলে মনে করি। বাঙালি লেখকদের কৃপায় বাংলা ভাষায় চক্ষুকর্ণের বিবাদ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সেই বিবাদ ভঞ্জন করবার চেষ্টাটা আমি উচিত কার্য বলে মনে করি। সেই কারণেই এ দেশে বিদ্যাদিগ্‌গজের 'স্থূলহস্তাবলেপ' হতে মাতৃভাষাকে উদ্ধার করবার জন্য আমরা সাহিত্যকে সেই মুক্তপথ অবলম্বন করতে বলি, যে পথের দিকে আমাদের সিদ্ধাঙ্গনারা উৎসুক

নেত্রে চেয়ে আছেন। ঢাকা রিভিউএর সমালোচনা অবলম্বন করে আমার নিজের মত সমর্থন করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অভিযোগ

সম্পাদক মহাশয়ের কথা হচ্ছে এই—

মুদ্রিত সাহিত্যে আমরা 'করতুম' 'শোনাচ্ছিলুম' 'ডাকতুম' 'মেশবার' ('খেনু' 'গেনু'ই বা বাদ যায় কেন?) প্রভৃতি প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি। অন্য ভাষাভাষী বাঙালির অপরিজ্ঞাত ভাষা প্রয়োগে সাহিত্যিক্ সংকীর্ণতা প্রকাশ পায় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

উপরোক্ত পদটি যদি সাধুভাষার নমুনা হয়, এবং ঐরূপ লেখাতে যদি 'সাহিত্যিক্' উদারতা প্রকাশ পায়, তা হলে লেখায় সাধুতা এবং উদারতা আমরা যে কেন বর্জন করতে চাই, তা ভাষাজ্ঞ এবং রসজ্ঞ পাঠকেরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন। এরূপ ভাষা সাধুও নয়, শুদ্ধও নয়, শুধু 'যা-খুশি-তা' ভাষা। কোনো লেখকবিশেষের লেখা নিয়ে তার দোষ দেখিয়ে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার বিশ্বাস, ওরূপ করাতে সাহিত্যের কোনো লাভ নেই। মশা মেরে ম্যালেরিয়া দূর করবার চেষ্টা বৃথা, কারণ সে কাজের আর অন্ত নেই। সাহিত্যক্ষেত্রে কতকটা আলো এবং হাওয়া এনে দেওয়াই সে স্থানকে স্বাস্থ্যকর করবার প্রকৃষ্ট উপায়। তা সত্ত্বেও ঢাকা রিভিউ হতে সংগৃহীত উপরোক্ত পদটি অনায়াসলব্ধ পদ নিয়ে অযত্ন-সুলভ বাক্যরচনার এমন খাঁটি নমুনা যে, তার রচনাপদ্ধতির দোষ বাঙালি পাঠকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার লোভ আমি সংবরণ করতে পারছি নে। শুনতে পাই, কোনো-একটি ভদ্রলোক তিন অক্ষরের একটি পদ বানান করতে চারটি ভুল করেছিলেন। 'ঔষধ' এই পদটি তাঁর হাতে 'অউসদ' এই রূপ ধারণ করেছিল। সম্পাদক মহাশয়ও একটি বাক্য রচনায় অন্তত পাঁচ-ছটি ভুল করেছেন—

১. সাহিত্যের পূর্বে 'মুদ্রিত' এই বিশেষণটি জুড়ে দেবার সার্থকতা কি? অমুদ্রিত সাহিত্য জিনিসটি কি? ওর অর্থ কি সেই লেখা, যা এখন হস্তাক্ষরেই আবদ্ধ হয়ে আছে, এবং ছাপা হয় নি? তাই যদি হয়, তা হলে সম্পাদক মহাশয়ের বক্তব্য কি এই যে, ছাপা হবার পূর্বে লেখায় যে ভাষা চলে, ছাপা হবার পরে আর তা চলে না? আমাদের ধারণা, মুদ্রিত লেখামাত্রই এক সময়ে অমুদ্রিত অবস্থায় থাকে, এবং মুদ্রাযন্ত্রের ভিতর দিয়ে তা রূপান্তরিত হয়ে আসে না। বরং কোনো-রূপ রূপান্তরিত হলেই আমরা আপত্তি করে থাকি, এবং যে ব্যক্তির সাহায্যে তা হয়, তাকে আমরা মুদ্রাকরের শয়তান বলে অভিহিত করি। এইরূপ বিশেষণের প্রয়োগ শুধু অযথা নয়, একেবারেই অনর্থক।

২. 'ডাকতুম' 'করতুম' প্রভৃতির 'তুম' এই অন্তভাগ প্রাদেশিক শব্দ নয়, কিন্তু বিভক্তি। ঐ স্থলে 'শব্দ' এই বিশেষ্যটি ভুল অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ সম্পাদক মহাশয় বোধ হয় এ কথা বলতে চান না যে, 'ডাকা' 'করা' 'শোনা' প্রভৃতি ক্রিয়া শব্দের অর্থ কলিকাতা প্রদেশের লোক ছাড়া আর কেউ জানেন না। এ কথা নির্ভয়ে বলা চলে যে, 'ডাকা' 'করা' 'শোনা' প্রভৃতি শব্দ, 'অন্য ভাষাভাষী' বাঙালির

নিকট অপরিজ্ঞাত হলেও বঙ্গ-ভাষাভাষী বাঙালি মাত্রেরই নিকট বিশেষ সুপরিচিত। সম্পাদক মহাশয়ের আপত্তি যখন ঐ বিভক্তি সম্বন্ধে, তখন শব্দের পরিবর্তে 'বিভক্তি' এই শব্দটিই ব্যবহার করা উচিত ছিল।

৩. 'সাহিত্যিক্' এই বিশেষণটি বাংলা কিংবা সংস্কৃত কোনো ভাষাতেই পূর্বে ছিল না, এবং আমার বিশ্বাস, উক্ত দুই ভাষার কোনটির ব্যাকরণ অনুসারে 'সাহিত্য' এই বিশেষ্য শব্দটি 'সাহিত্যিক্'-রূপ বিশেষণে পরিণত হতে পারে না। বাংলার নব্য 'সাহিত্যিক্'দের বিশ্বাস যে, বিশেষ্যের উপর অত্যাচার করলেই তা বিশেষণ হয়ে ওঠে। এইরূপ বিশেষণের সৃষ্টি আমার মতে অদ্ভুত সৃষ্টি। এই পদ্ধতিতে সাহিত্য রচিত হয় না, literature শুধু literatural হয়ে ওঠে।

৪. 'ভাষাভাষী' এই সমাসটি এতই অপূর্ব যে, ও কথা শুনে হাসাহাসি করা ছাড়া আর কিছু করা চলে না।

৫. 'আমরা' শব্দটি পদের পূর্বভাগে না থেকে শেষভাগে আসা উচিত ছিল। তা না হলে পদের অন্বয় ঠিক হয় না। 'করতুম'এর পূর্বে নয়, 'ব্যবহার' এবং 'পক্ষপাতী' এই দুই শব্দের মধ্যে এর যথার্থ স্থান।

অযথা এবং অনর্থক বিশেষণের প্রয়োগ, ভুল অর্থে বিশেষ্যের প্রয়োগ, অদ্ভুত বিশেষণ এবং সমাসের সৃষ্টি, 'উলটোপালটা' রকম রচনার পদ্ধতি প্রভৃতি বর্জনীয় দোষ আজকালকার মুদ্রিত সাহিত্যের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে দেখা যায়। সাধুভাষার আবরণে যে-সকল দোষ, শুধু অন্যমনস্ক পাঠকদের নয়, অন্যমনস্ক লেখকদেরও চোখে পড়ে না।

মুদ্রিত সাহিত্য বলে কোনো জিনিস না থাকলেও মুদ্রিত ভাষা বলে যে একটা নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, তা অস্বীকার করবার জো নেই। লেখার ভাষা শুধু মুখের ভাষার প্রতিনিধি মাত্র। অনিত্য শব্দকে নিত্য করবার ইচ্ছে থেকেই অক্ষরের সৃষ্টি। অক্ষর-সৃষ্টির পূর্বযুগে মানুষের মনে করে রাখবার মতো বাক্যরাশি কণ্ঠস্থ করতে করতেই প্রাণ যেত। যে অক্ষর আমরা প্রথমে হাতে লিখি, তাই পরে ছাপানো হয়। সুতরাং ছাপার অক্ষরে উঠলেই যে কোনো কথার মর্যাদা বাড়ে, তা নয়। কিন্তু দেখতে পাই অনেকের বিশ্বাস তার উলটো। আজকাল ছাপার অক্ষরে যা বেরোয় তাই সাহিত্য বলে গণ্য হয়। এবং সেই একই কারণে মুদ্রিত ভাষা সাধু-ভাষা বলে সম্মান লাভ করে। গ্রামোফোনের উদরস্থ হয়ে সংগীতের মাহাত্ম্য শুধু এ দেশেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আসলে সে ভাষার ঠিক নাম হচ্ছে বাবু-বাংলা। যে গুণে ইংলিশ বাবু-ইংলিশ হয়ে ওঠে, সেই গুণেই বঙ্গ ভাষা বাবু-বাংলা হয়ে উঠেছে। সে ভাষা আলাপের ভাষা নয়, শুধু প্রলাপের ভাষা। লেখার যা সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান গুণ—প্রসাদগুণ—সে গুণে বাবু-বাংলা একেবারেই বঞ্চিত। বিদ্যের মতো, ভাষাও কেবলমাত্র পুঁথিগত হয়ে উঠলে তার উর্ধ্বগতি হয় কি না বলতে পারি নে, কিন্তু সদ্‌গতি যে হয় না সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আসলে এই মুদ্রিত ভাষার মৃত্যুর প্রায় সকল লক্ষণই স্পষ্ট। শুধু আমাদের মাতৃভাষার নাড়িজ্ঞান লুপ্ত হয়ে রয়েছে বলে আমরা নব্যবঙ্গ সাহিত্যের প্রাণ আছে কি নেই তার ঠাওর করে উঠতে পারি নে। মুখের ভাষা যে জীবন্ত ভাষা, এ বিষয়ে দু মত নেই।

একমাত্র সেই ভাষা অবলম্বন করেই আমরা সাহিত্যকে সজীব করে তুলতে পারব। যেমন একটি প্রদীপ থেকে অপর-একটি প্রদীপ ধরাতে হলে পরস্পরের স্পর্শ ব্যতিরেকে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, তেমনি লেখার ভাষাতেও প্রাণ সঞ্চার করতে হলে মুখের ভাষার সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; আমি সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের বিরোধী নই, শুধু ন্যূন অর্থে, অধিক অর্থে কিংবা অনর্থে বাক্য-প্রয়োগের বিরোধী। আয়ুর্বেদ-মতে ওরূপ বাক্যপ্রয়োগ একটা রোগবিশেষ, এবং চরকসংহিতায় ও-রোগের নাম বাক্যদোষ। পাছে কেউ মনে করেন যে, আমি এই কথাটা নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করছি, সেই কারণে এক শত বৎসর পূর্বে 'অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে' মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার যে উপদেশ লিপিবদ্ধ করে গেছেন, সেটি এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

শাস্ত্রে বাক্যকে গো শব্দে যে কহিয়াছেন তাহার কারণ এই ভাষা যদি সম্যক্‌রূপে প্রয়োগ করা যায় তবে স্বয়ং কামদুঘা ধেনু হন, যদি দুষ্টরূপে প্রয়োগ করা যায় তবে সেই দুষ্টভাষা সন্নিষ্ঠগোত্ব ধর্মকে স্বপ্রয়োগকর্তাকে অর্পণ করিয়া স্ববক্তাকে গোরূপে পণ্ডিতেরদের নিকটে বিখ্যাত করেন।... আর বাক্য কহা বড় কঠিন, সকলহইতে কহা যায় না কেননা কেহ বাক্যেতে হাতি পায়, কেহ বা বাক্যেতে হাতির পায়। অতএব বাক্যেতে অত্যল্প দোষও কোনপ্রকারে উপেক্ষণীয় নহে, কেননা যদ্যপি অতিবড় সুন্দরও শরীর হয় তথাপি যৎকিঞ্চিৎ এক শ্বিত্র রোগ দোষেতে নিন্দনীয় হয়।[১]

বিদ্যালংকার মহাশয়ের মতে 'বাক্য কহা বড় কঠিন'। কহার চাইতে লেখা যে অনেক বেশি কঠিন, এ সত্য বোধ হয় 'অভিনব যুবক' বঙ্গলেখক ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করবেন না। Art এবং artlessnessএর মধ্যে আসমান-জমীন ব্যবধান আছে, লিখিত এবং কথিত ভাষার মধ্যেও সেই ব্যবধান থাকা আবশ্যক। কিন্তু সে পার্থক্য ভাষাগত নয়, স্টাইলগত। লিখিত ভাষার কথাগুলি শুদ্ধ, সুনির্বাচিত এবং সুবিন্যস্ত হওয়া চাই, এবং রচনা সংক্ষিপ্ত ও সংহত হওয়া চাই। লেখার কথা ওলটানো চলে না, বদলানো চলে না, পুনরুক্তি চলে না, এবং এলোমেলো ভাবে সাজানো চলে না। ঢাকা রিভিউএর সম্পাদক মহাশয়ের মতে যে ভাষা প্রশস্ত, সে ভাষায় মুখের ভাষার যা-যা দোষ সে-সব পূর্ণমাত্রায় দেখা দেয়, কেবলমাত্র আলাপের ভাষার যে-সকল গুণ আছে— অর্থাৎ সরলতা, গতি ও প্রাণ— সেই গুণগুলিই তাতে নেই। কোনো দরিদ্র লোকের যদি কোনো ধনী লোকের সহিত দূরসম্পর্কও থাকে, তা হলে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে, সে গরিব বেচারা সেই দূরসম্পর্ককে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাতে পরিণত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টার ফল কিরূপ হয়ে থাকে তা তো সকলেরই নিকট প্রত্যক্ষ। আমরা পাঁচজনে মিলে আমাদের মাতৃভাষার বংশমর্যাদা বাড়াবার জন্যই সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করতে উৎসুক হয়েছি। তার ফলে শুধু আমাদের ভাষায় স্বীয় মর্যাদা রক্ষা হচ্ছে না। সাধু-ভাষার লেখকদের তাই, দেখতে পাওয়া যায় যে, পদে পদে বিপদ ঘটে থাকে। আমার বিশ্বাস যে, আমরা যদি সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ না হয়ে ঘরের ভাষার উপরই নির্ভর করি, তা হলে আমাদের লেখার চাল স্বচ্ছন্দ হবে, এবং আমাদের ঘরের লোকের

১ প্রবোধচন্দ্রিকা

সঙ্গে মনোভাবের আদান-প্রদানটাও সহজ হয়ে আসবে। যদি আমাদের বক্তব্য কথা কিছু থাকে, তা হলে নিজের ভাষাতে তা যত স্পষ্ট করে বলা যায়, কোনো কৃত্রিম ভাষাতে তত স্পষ্ট করে বলা যাবে না।

বাংলা ভাষার বিশেষত্ব

কেবলমাত্র পড়ে-পাওয়া-চোদ্দ-আনা-গোছ সংস্কৃত শব্দ বর্জন করলেই যে আমাদের মোক্ষলাভ হবে, তা নয়। আমরা লেখায় স্বদেশী ভাষাকে যেরূপ বয়কট করে আসছি, সেই বয়কটও আমাদের ছাড়তে হবে। বহুসংখ্যক বাংলা শব্দকে ইতর বলে সাহিত্য হতে বহিষ্করণের কোনোই বৈধ কারণ নেই। মৌখিক ভাষার মধ্যেই সাধু এবং ইতর, উভয়প্রকারেরই শব্দ আছে। যে শব্দ ইতর বলে আমরা মুখে আনতে সংকুচিত হই, তা আমরা কলমের মুখ দিয়েও বার করতে পারি নে। কিন্তু যে-সকল কথা আমরা ভদ্রসমাজে নিত্য ব্যবহার করি, যা, কোনো হিসেবেই ইতর বলে গণ্য নয়, সেই-সকল বাক্যকে সাহিত্য থেকে বহির্ভূত করে রাখায় ক্ষতি শুধু সাহিত্যের। কেন যে পদ-বিশেষ ইতরশ্রেণীভুক্ত হয়, সে আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে নেই। তবে এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ভদ্র এবং ইতরের প্রভেদ আমাদের সমাজে এবং সাহিত্যে যেরূপ প্রচলিত, পৃথিবীর অন্য কোনো সভ্যদেশে সেরূপ নয়। আমরা সমাজের যেমন অধিকাংশ লোককে শূদ্র করে রেখে দিয়েছি, ভাষা-রাজ্যেও আমরা সাধুতার দোহাই দিয়ে তারই অনুরূপ জাতিভেদ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছি, এবং অসংখ্য নির্দোষ বাংলা কথাকে শূদ্রশ্রেণীভুক্ত করে তাদের সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসতে দিতে আপত্তি করছি। সমাজে এবং সাহিত্যে আমরা একই সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিই। বাংলা কথা সাহিত্যে অস্পৃশ্য করে রাখাটা শুধু লেখাতে 'বামনাই' করা। আজকাল দেখতে পাই অনেকেরই চৈতন্য হয়েছে যে, আমাদেরই মতো রক্তমাংসে গঠিত মানুষকে সমাজে পতিত করে রাখবার একমাত্র ফল, সমাজকে দুর্বল এবং প্রাণহীন করা। আশা করি, শীঘ্রই আমাদের সাহিত্য-ব্রাহ্মণদের এ জ্ঞান জন্মাবে যে, অসংখ্য প্রাণবন্ত বাংলা শব্দকে পতিত করে রাখবার দরুন, আমাদের সাহিত্য দিন দিন শক্তিহীন এবং প্রাণহীন হয়ে পড়ছে। একালের ম্রিয়মাণ লেখার সঙ্গে তুলনা করে দেখলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আলালের ঘরের দুলাল এবং হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার ভাষাতে কত অধিক ওজঃ-ধাতু আছে। আমরা যে বাংলা শব্দমাত্রকেই জাতে তুলে নিতে চাচ্ছি, তাতে আমাদের 'সাহিত্যিক্ সংকীর্ণতা' প্রকাশ পায় না, যদি কিছু প্রকাশ পায় তো উদারতা।

আর-একটি কথা। অন্যান্য জীবের মতো ভাষারও একটা আকৃতি ও একটা গঠন আছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে, জীবে জীবে প্রভেদ ঐ গঠনের পার্থক্যেরই উপর নির্ভর করে, আকৃতির উপর নয়। পাখা থাকা সত্ত্বেও আরশোলা যে পোকা, পাখি নয়, এ জ্ঞান আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকেরও আছে। এমন-কি, কবিরাও বিহঙ্গকে পতঙ্গের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেন না। অন্যান্য জীবের মতো ভাষার বিশেষত্বও তার গঠন আশ্রয় করে থাকে, কিন্তু তা তার দেহাকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ভাষার দেহের পরিচয় অভিধানে, এবং তার গঠনের পরিচয়

ব্যাকরণে। সুতরাং বাংলায় এবং সংস্কৃতে আকৃতিগত মিল থাকলেও জাতিগত কোনোরূপ মিল নাই। প্রথমটি হচ্ছে analytic, দ্বিতীয়টি inflectional ভাষা। সুতরাং বাংলাকে সংস্কৃতের অনুরূপ করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে আমরা যে বঙ্গ ভাষার জাতি নষ্ট করি, শুধু তাই নয়, তার প্রাণ বধ করবার উপক্রম করি। এই কথাটি সপ্রমাণ করতে হলে এ বিষয়ে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখতে হয়, সুতরাং এ স্থলে আমি শুধু কথাটার উল্লেখ মাত্র করে ক্ষান্ত হলুম।

বিজ্ঞান ছেড়ে দিয়ে সহজ জ্ঞানেতেই জানা যায়, উক্ত দুই ভাষার চালের পার্থক্য ঢের। সংস্কৃতের হচ্ছে 'করিরাজবিনিন্দিত মন্দগতি', কিন্তু বাংলা, গুণী লেখকের হাতে পড়লে, দুলকি কদম ছারতক সব চালেই চলে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যৌবনকালে লিখিত এবং সদ্যপ্রকাশিত ছিন্নপত্র পড়লে সকলেই দেখতে পাবেন যে, সাহস ক'রে একবার রাশ আলগা দিতে পারলে নিপুণ এবং শক্তিমান্ লেখকের হাতে বাংলা গদ্য কি বিচিত্র ভঙ্গিতে ও কি বিদ্যুদ্‌বেগে চলতে পারে। আমরা 'সাহিত্যিক্' ভাবে কথা কই নে ব'লে আমাদের মুখের কথায় বাংলা ভাষার সেই সহজ ভঙ্গিটি রক্ষিত হয়। কিন্তু লিখতে বসলেই আমরা তার এমন-একটা কৃত্রিম গড়ন দেবার চেষ্টা পাই, যাতে তার চলৎশক্তি রহিত হয়ে আসে। ভাষার এই আড়ষ্ট ভাবটাই সাধুতার একটা লক্ষণ বলে পরিচিত। তাই বাংলা সাহিত্যে সাধারণ লেখকের গদ্য গদাই-লশকরি ভাবে চলে, এবং কুলেখকদের হাতের লেখা একটা জড়পদার্থের স্তূপমাত্র হয়ে থাকে। এই জড়তার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, লেখাতেও মৌখিক ভাষার সহজ ভঙ্গিটি রক্ষা করা। কিন্তু যেই আমরা সে কাজ করি অমনি আমাদের বিরুদ্ধে সাধুভাষার কলের জল ঘোলা করে দেবার এবং বাংলা সাহিত্যের বাড়া-ভাতে 'প্রাদেশিক শব্দে'র ছাই ঢেলে দেবার অভিযোগ উপস্থিত হয়।

ভাষামাত্রেরই তার আকৃতি ও গঠনের মতো একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, এবং প্রকৃতিস্থ থাকার উপরই তার শক্তি এবং সৌন্দর্য নির্ভর করে। বঙ্গ ভাষার সেই প্রকৃতির বিশেষ জ্ঞানের অভাববশতই আমরা সে ভাষাকে সংস্কৃত করতে গিয়ে বিকৃত করে ফেলি। তা ছাড়া প্রতি ভাষারই একটি স্বতন্ত্র সুর আছে। এমন অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে যা বাংলার সুরে মেলে না এবং শোনবামাত্র কানে খট্ করে লাগে। যার সুরজ্ঞান নেই তাকে কোনোরূপ তর্কবিতর্ক দ্বারা সে জ্ঞান দেওয়া যায় না। 'সাহিত্যিক্' এই শব্দটি ব্যাকরণসিদ্ধ হলেও যে বাঙালির কানে নিতান্ত বেসুরো লাগে, এ কথা যার ভাষার জ্ঞান আছে তাকে বোঝানো অনাবশ্যক, আর যার নেই তাকে বোঝানো অসম্ভব।

এই বিকৃত এবং অশ্রাব্য 'সাহিত্যিক্ ভাষার' বন্ধন থেকে সাহিত্যকে মুক্ত করবার প্রস্তাব করলেই যে সকলে মারমুখো হয়ে ওঠেন, তার একমাত্র কারণ এই যে, উক্ত ভাষা ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির স্বাভাবিক ঢিলেমি, মানসিক আলস্য এবং পল্লব-গ্রাহিতার অনুকূল। মুক্তির নাম শোনবামাত্রই আমাদের অভ্যস্ত মনোভাবসকল বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। রাজা রামমোহন রায়ের মতে সাধুসমাজের লোকেরা যে ভাষা কহেন এবং শুনেন' সেই ভাষাই সাধুভাষা। কিন্তু আজকালকার মতে, যে ভাষা

সাধুসমাজের লোকেরা কহেনও না শুনেনও না, কিন্তু লিখেন এবং পড়েন, সেই ভাষা সাধুভাষা। সুতরাং ভালো হোক মন্দ হোক, যে ভাষায় লেখাপড়া করা লোকের অভ্যাস হয়ে গেছে, সেই অভ্যাসবশতই সেই ভাষায় লেখাপড়া করা লোকের পক্ষে অতি সহজ। কিন্তু যা করা সোজা তাই যে করা উচিত, এরূপ আমার বিশ্বাস নয়। সাধু বাংলা পরিত্যাগ করে বাংলা ভাষায় লিখতে পরামর্শ দিয়ে আমি পরিশ্রমকাতর লেখকদের অভ্যস্ত আরামের ব্যাঘাত করতে উদ্যত হয়েছি, সুতরাং এ কার্যের জন্য আমি যে তাঁদের বিরাগভাজন হব তা বেশ জানি। 'নব্য সাহিত্যিক'দের বোলতার চাকে আমি যে ঢিল মারতে সাহস করেছি তার কারণ, আমি জানি তাদের আর যাই থাক্ হুল নেই। বড়োজোর আমাকে শুধু লেখকদের ভনভনানি সহ্য করতে হবে।

সে যাই হোক, ঢাকা রিভিউএর সম্পাদক যে আপত্তি উত্থাপন করেছেন, তার একটা বিচার হওয়া আবশ্যক। আমি ভাষাতত্ত্ববিদ্ নই, তবুও আমার মাতৃভাষার সঙ্গে যেটুকু পরিচয় আছে, তার থেকেই আমার এইটুকু জ্ঞান জন্মেছে যে, মুখের কথা লেখায় স্থান পেলে সাহিত্যের ভাষা প্রাদেশিক কিংবা গ্রাম্য হয়ে উঠবে না। বাংলা ভাষার কাঠামো বজায় না রাখতে পারলে আমাদের লেখার যে উন্নতি হবে না, এ কথা নিশ্চিত। কিন্তু সেই কাঠামো বজায় রাখতে গেলে ভাষারাজ্যে বঙ্গভঙ্গ হবার কোনো সম্ভাবনা আছে কি না, সে বিষয়ে একটু আলোচনা দরকার। আমি তর্কটা উত্থাপন করে দিচ্ছি, তার সিদ্ধান্তের ভার যাঁরা বঙ্গ ভাষার অস্থিবিদ্যায় পারদর্শী তাঁদের হস্তে ন্যস্ত থাকল।

ভাষায় প্রাদেশিকতা

প্রাদেশিক ভাষা, অর্থাৎ dialect, এই নাম শুনলেই আমাদের ভীত হবার কোনো কারণ নেই। সম্ভবত এক সংস্কৃত ব্যতীত গ্রীক ল্যাটিন প্রভৃতি মৃত ভাষাসকল এক সময়ে লোকের মুখের ভাষা ছিল। এবং সেই সেই ভাষার সাহিত্য সেই যুগের লেখকেরা 'যচ্ছ্রুতং তল্লিখিতং' এই উপায়েই গড়ে তুলেছেন। গ্রীক সাহিত্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে ইহজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য। কিন্তু এ অপূর্ব সাহিত্য কোনোরূপ সাধুভাষায় লেখা হয় নি, ডায়ালেক্টেই লেখা হয়েছে। গ্রীক সাহিত্য একটি নয়, তিনটি ডায়ালেক্টে লেখা। এইটেই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, মুখের ভাষায় বড়ো সাহিত্য গড়া চলে। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যও মৌখিক ভাষার অনুসারেই লেখা হয়ে থাকে, 'মুদ্রিত সাহিত্যে'র ভাষায় লেখা হয় না। পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নেই যেখানকার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের লোকেরা ঠিক সমভাবেই কথা বলে। ইংলণ্ড ফ্রান্স ইতালি প্রভৃতি দেশেও ডায়ালেক্টের প্রভেদ যথেষ্ট আছে। অথচ ইংরেজি সাহিত্যের ভাষা, ইংরেজ জাতির মুখের ভাষারই অনুরূপ। এর থেকেই বোঝা যায় যে, পাঁচটি ডায়ালেক্টের মধ্যে কেবল একটিমাত্র সাহিত্যের সিংহাসন অধিকার করে। এবং তার কারণ হচ্ছে সেই ডায়ালেক্টের সহজ শ্রেষ্ঠত্ব। ইতালির ভাষায় এর প্রমাণ অতি স্পষ্ট। ইতালির সাহিত্যের ভাষার দুটি নাম আছে ; এক lingua purgata অর্থাৎ শুদ্ধ ভাষা, আর-এক lingua

Toscana অর্থাৎ টস্কানি প্রদেশের ভাষা। টস্কানির কথিত ভাষাই সমগ্র ইতালির অধিবাসীরা সাধুভাষা বলে গ্রাহ্য করে নিয়েছে। আমাদের দেশে প্রচলিত নানারূপ বুলির মধ্যেও যে একটি বিশেষ প্রদেশের ভাষা সাহিত্যের ভাষা হবে তাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি। ফলে হয়েছেও তাই।

চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত লেখকেরা প্রায় একই ভাষায় লিখে গেছেন। অথচ সেকালের লেখকেরা একটি সাহিত্যপরিষদের প্রতিষ্ঠা করে পাঁচজনের ভোট নিয়ে সে ভাষা রচনা করেন নি, কোনো স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলী থেকেও তাঁরা সাধুভাষা শিক্ষা করেন নি, বাংলা বই পড়ে তাঁরা বই লেখেন নি। তাঁরা যে ভাষাতে বাক্যালাপ করতেন সেই ভাষাতেই বই লিখতেন, এবং তাঁদের কলমের সাহায্যেই আমাদের সাহিত্যের ভাষা আপনাআপনি গড়ে উঠেছে।

আমরা উত্তরবঙ্গের লোক, যে প্রাদেশিক ভাষাকে দক্ষিণদেশী ভাষা বলে থাকি, বঙ্গ ভাষার সেই ডায়ালেক্‌টই সাহিত্যের স্থান অধিকার করেছে। বাংলাদেশের মানচিত্রে দক্ষিণদেশের নির্ভুল চৌহদ্দি নির্ণয় করে দেওয়া আমার সাধ্য নয়। তবে মোটামুটি এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে, নদিয়া শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে, ভাগীরথীর উভয় কূলে এবং বর্তমান বর্ধমান ও বীরভূম জেলার পূর্ব ও দক্ষিণাংশে যে ডায়ালেক্‌ট প্রচলিত ছিল, তাই কতক পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সাধুভাষার রূপ ধারণ করেছে। এর একমাত্র কারণ, বাংলাদেশের অপরাপর ডায়ালেক্‌ট অপেক্ষা উক্ত ডায়ালেক্‌টের সহজ শ্রেষ্ঠত্ব।

উচ্চারণের কথা

ডায়ালেক্‌টের পরস্পরের মধ্যে ভেদ প্রধানত উচ্চারণ নিয়েই। যে ডায়ালেক্‌টে শব্দের উচ্চারণ পরিষ্কাররূপে হয়, সে ডায়ালেক্‌ট প্রথমত ঐ এক গুণেই অপর সকল ডায়ালেক্‌টএর অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ, এবং সেই কারণেই শ্রেষ্ঠ। ঢাকাই কথা এবং খাস-কলকাত্তাই কথা, অর্থাৎ সুতানুটির গ্রাম্যভাষা, দুয়েরই উচ্চারণ অনেকটা বিকৃত; সুতরাং ঢাকাই কিংবা খাস-কলকাত্তাই কথা পূর্বেও সাহিত্যে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করতে পারে নি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। পূর্ববঙ্গের মুখের কথা প্রায়ই বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ হীন, আবার শ্রীহট্ট অঞ্চলের ভাষা প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ হীন। যাদের মুখের 'ঘোড়া' ও 'গোরা' একাকার হয়ে যায়, তাদের চেয়ে যাদের মুখ হতে ঐ শব্দ নিজ নিজ আকারেই বার হয়, তাদের ভাষা যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে, এ আর কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। 'ড়ড়য়োরভেদ', চন্দ্রবিন্দুবর্জন, স স্থানে হ-এর ব্যবহার, প্রভৃতি উচ্চারণের দোষে পূর্ববঙ্গের ভাষা পূর্ণ। স্বরবর্ণের ব্যবহারও উক্ত প্রদেশে একটু উলটোপালটা রকমের হয়ে থাকে। যাঁরা 'করে'র পরিবর্তে 'করিয়া' লেখবার পক্ষপাতী, তাঁরা মুখে 'কইর‍্যা' বলেন। সুতরাং তাঁদের মুখের কথার অনুসারে যে লেখা চলে না তা অস্বীকার করবার জো নেই। অপর পক্ষে খাস-কলকাত্তাই বুলিও ভদ্রসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করতে পারে নি এবং পারবে না। ও ভাষার কতকটা ঠোঁটকাটা ভাব আছে। ট্যাকা, ক্যাঁঠাল, ক্যাঙালি, নুচি, আঁব, বে, দোর, সকালা, বিকালা, পিচাশ (পিশাচ অর্থে), প্রভৃতি বিকৃত-

উচ্চারিত শব্দও সাহিত্যে প্রমোশন পাবার উপযুক্ত নয়। পূর্ববঙ্গের লোকের মুখে স্বরবর্ণ ছাড়িয়ে যায়, কলকাতার লোকের মুখে স্বরবর্ণ জড়িয়ে যায়। এমন কোনোই প্রাদেশিক ভাষা নেই যাতে অন্তত কতকগুলি কথাতেও কিছু-না-কিছু উচ্চারণের দোষ নেই। কম-বেশি নিয়েই আসল কথা। টস্কান ডায়ালেক্‌ট সাধু ইতালীয় ভাষা বলে গ্রাহ্য হয়েছে, কিন্তু ফ্লোরেন্সে অদ্যাবধি ক-র স্থলে হ উচ্চারিত হয়, 'seconda' 'sehonda' আকারে দেখা দেয়। কিন্তু বহুগুণসন্নিপাতে একটি-আধটি দোষ উপেক্ষিত হয়ে থাকে। সকল দোষগুণ বিচার করে মোটের উপর দক্ষিণদেশী ভাষাই উচ্চারণ হিসেবে যে বঙ্গদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ ডায়ালেক্‌ট এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই।

প্রসিদ্ধ এবং অপ্রসিদ্ধার্থক শব্দ

দ্বিতীয় কথা এই যে, প্রতি ডায়ালেক্‌টেই এমন গুটিকতক কথা আছে যা অন্য প্রদেশের লোকদের নিকট অপরিচিত। যে ডায়ালেক্‌টে এই শ্রেণীর কথা কম, এবং বাঙালি মাত্রেরই নিকট পরিচিত শব্দের ভাগ বেশি, সেই ডায়ালেক্‌টই লিখিত ভাষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আমার বিশ্বাস, দক্ষিণদেশী ভাষায় ঐরূপ সর্বজনবিদিত কথাগুলিই সাধারণত মুখে মুখে প্রচলিত। উত্তরবঙ্গের ভাষার তুলনায় যে দক্ষিণ-বঙ্গের ভাষা বেশি প্রসিদ্ধার্থক, এ বিষয়ে আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি। উদাহরণ-স্বরূপ আমি দুই-চারটি শব্দের উল্লেখ করতে চাই। উত্তরবঙ্গে, অন্তত রাজশাহী এবং পাবনা অঞ্চলে, আমরা সকলেই 'পৈতা' 'চুপ করা' 'সকাল' 'শখ' 'কুল' 'পেয়ারা' 'তরকারী' প্রভৃতি শব্দ নিত্য ব্যবহার করি নে, কিন্তু তার অর্থ বুঝি; অপর পক্ষে 'নগুন' 'নক্‌করা' 'বিয়ান' 'হাউস' 'বোর' 'আম-সবুরি' 'আনাজ' প্রভৃতি আমাদের চলতি কথাগুলির অর্থ দক্ষিণদেশবাসীদের নিকট একেবারেই দুর্বোধ্য। এই কারণেও দক্ষিণদেশের মুখের কথা লিখিত ভাষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। খাস-কলকাত্তাই ভাষাতেও অপরের নিকট দুর্বোধ্য অনেক কথা আছে, এবং তা ছাড়া মুখে মুখে অনেক ইতর কথারও প্রচলন আছে, যা লেখা চলে না। ইতর কথার উদাহরণ দেওয়াটা সুরুচিসংগত নয় বলে আমি খাস-কলকাত্তাই ভাষার ইতরতার বিশেষ পরি-চয় এখানে দিতে পারলুম না। কলকাতার লোকের আটহাত আটপৌরে ধুতির মতো তাদের আটপৌরে ভাষাও বি-কচ্ছ, এবং সেই কারণেই তার সাহায্যে ভদ্রতা রক্ষা হয় না। স্ত্রীর প্রতি ম-কারাদি প্রয়োগ করা, যাদের জঙ্গল কেটে কলকাতায় বাস সেই-সকল ভদ্রলোকেরই মুখে সাজে, বাঙালি ভদ্রলোকের মুখে সাজে না। এই কারণেই বাঙালে ভাষা কিংবা কলকাত্তাই ভাষা, এ উভয়ের কোনোটিই অবিকল লেখার ভাষা হতে পারে না। আমি যে-প্রাদেশিক ভাষাকে দক্ষিণদেশী ভাষা বলি, সেই ভাষাই সম্পূর্ণরূপে সাহিত্যের পক্ষে উপযোগী।

বিভক্তির কথা

আমি পূর্বে বলেছি যে, ঐ দক্ষিণদেশী ভাষাই তার আকার এবং বিভক্তি নিয়ে এখন সাধুভাষা বলে পরিচিত। অথচ আমি তার বন্ধন থেকে সাহিত্যকে কতকটা

পরিমাণে মুক্ত করে এ যুগের মৌখিক ভাষার অনুরূপ করে নিয়ে আসবার পক্ষপাতী। এবং আমার মতে, খাস-কলকাত্তাই নয়, কিন্তু কলিকাতার ভদ্রসমাজের মুখের ভাষা অনুসরণ করেই আমাদের চলা কর্তব্য।

জীবনের ধর্মই হচ্ছে পরিবর্তন। জীবন্ত ভাষা চিরকাল এক রূপ ধারণ করে থাকে না, কালের সঙ্গে সঙ্গেই তার রূপান্তর হয়। চসারের ভাষায় আজকাল কোনো ইংরেজ লেখক কবিতা লেখেন না, শেক্সপীয়ারের ভাষাতেও লেখেন না। কালক্রমে মুখে মুখে ভাষার যে পরিবর্তন ঘটেছে তাই গ্রাহ্য করে নিয়ে তাঁরা সাহিত্যরচনা করেন। আমাদেরও তাই করা উচিত। ভাষার গঠনের বদলের জন্য বহু যুগ আবশ্যক, শব্দের আকৃতি ও রূপ নিত্যই বদলে আসছে। ভাষা একবার লিপিবন্ধ হলে অক্ষরে শব্দের রূপ অনেকটা ধরে রাখে, তার পরিবর্তনের পথে বাধা দেয়, কিন্তু একেবারে বন্ধ করতে পারে না। আর, যে-সকল শব্দ লেখায় ব্যবহৃত হয় না, তাদের চেহারা মুখে মুখে চটপট বদলে যায়। আজকাল আমরা নিত্য যে ভাষা ব্যবহার করি, তা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা হতে অনেক পৃথক্। প্রথমত, সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ আজকাল বাংলায় ব্যবহৃত হয় যা পূর্বে হত না; দ্বিতীয়ত, অনেক শব্দ যা পূর্বে ব্যবহার হত তা এখন ব্যবহার হয় না; তৃতীয়ত, যে কথার পূর্বে চলন ছিল তার আকার এবং বিভক্তি অনেকটা নতুন রূপ ধারণ করেছে। আমার মতে সাহিত্যের ভাষাকে সজীব করতে হলে তাকে এখনকার ভদ্রসমাজের প্রচলিত ভাষার অনুরূপ করা চাই। তার জন্য অনেক কথা যা পূর্বে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সংস্কৃতের অত্যাচারে যা আজকাল আমাদের সাহিত্যের বহির্ভূত হয়ে পড়েছে, তা আবার লেখায় ফিরিয়ে আনতে হবে। তার পর মুখে মুখে প্রচলিত শব্দের আকারের এবং বিভক্তির যে পরিবর্তন ঘটেছে, সেটা মেনে নিয়ে তাদের বর্তমান আকারে ব্যবহার করাই শ্রেয়। 'আসিতেছি' শব্দের এই রূপটি সাধু, এবং 'আসছি' এই রূপটি অসাধু বলে গণ্য। শেষোক্ত আকারে এই কথাটি ব্যবহার করতে গেলেই আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয় যে, আমরা বঙ্গ সাহিত্যের মহাভারত অশুদ্ধ করে দিলুম। একটু মনোযোগ করে দেখলেই দেখা যায় যে 'আসছি' 'আসিতেছি'র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আকার। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে যে 'আসিতেছি'র ব্যবহার আছে তার কারণ, তখন লোকের মুখে কথাটি ঐ আকারেই ব্যবহৃত হত। আজও উত্তর এবং পূর্ববঙ্গে মুখে মুখে ঐ আকারই প্রচলিত। সমগ্র বাংলাদেশ ভাষা সম্বন্ধে পূর্বে যেখানে ছিল, উত্তর এবং পূর্ববঙ্গ আজও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গ অনেক এগিয়ে এসেছে। 'আসিতেছি'তে 'আসিতে' এবং 'আছি' এই দুটি ক্রিয়া গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে, দুয়ে মিলে একটি ক্রিয়া হয়ে ওঠে নি। কিন্তু শব্দটির 'আসছি' এই আকারে 'আছি' এই ক্রিয়াটি লুপ্ত হয়ে 'ছি' এই বিভক্তিতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং 'আসছি'র অপেক্ষা 'আসিতেছি' কোনো হিসেবেই অধিক শুদ্ধ নয়, শুধু বেশি সেকেলে, বেশি ভারী এবং বেশি অচল আকার। সুতরাং 'আসিতেছি' পরিহার করে 'আসছি' ব্যবহার করতে আমরা যে পিছপাও হই নে, তার কারণ এ কার্য করাতে ভাষাজগতে পিছনো হয় না, বরং সর্বতোভাবে এগনোই হয়।

ঐ একই কারণে 'করিয়া' যে 'ক'রে' অপেক্ষা বেশি শুদ্ধ, তা নয়, শুধু বেশি

প্রাচীন। ও-দুয়ের একটিও সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভক্তি নয়, দু-ই খাঁটি বাংলা বিভক্তি। প্রভেদ এই মাত্র যে, পূর্বে মুখের ভাষায় 'করিয়া'র চলন ছিল, এখন ক'রে'র চলন হয়েছে। চণ্ডীদাস তাঁর সানুনাসিক বীরভূমী সুরে মুখে বলতেন 'করিঞা', তাই লিখেছেনও 'করিঞা'। কৃত্তিবাস ভারতচন্দ্র প্রভৃতি নদিয়া জেলার গ্রন্থকারেরা মুখে বলতেন 'কর্য্যা' 'ধর্য্যা', তাই তাঁরা লেখাতেও যেভাবে উচ্চারণ করতেন সেই উচ্চারণ অবিকল বজায় রাখবার জন্য 'ধরিয়া' 'করিয়া' আকারে লিখতেন। সম্ভবত কৃত্তিবাসের সময়ে অক্ষরে আকারে যুক্ত য-ফলা লেখবার সংকেত উদ্‌ভাবিত হয় নি বলেই সে যুগের লেখকেরা ঐ যুক্ত স্বরবর্ণের সন্ধিবিচ্ছেদ করে লিখেছেন। ভারতচন্দ্রের সময়ে সে সংকেত উদ্‌ভাবিত হয়েছিল, তাই তিনি যদিচ পূর্ববর্তী কবিদের লিখনপ্রণালী সাধারণত অনুসরণ করেছিলেন, তবুও নমুনা স্বরূপ কতক-গুলি কবিতাতে 'বাঁধ্যা' 'ছাঁদ্যা' আকারেরও ব্যবহার করেছেন। অদ্যাবধি উত্তরবঙ্গে আমরা দক্ষিণবঙ্গের সেই পূর্বপ্রচলিত উচ্চারণভঙ্গিই মুখে মুখে রক্ষা করে আসছি। 'ক'রে'র তুলনায় 'কর্য্যা' শুধু শ্রুতিকটু নয়, দৃষ্টিকটুও বটে, কেননা ঐ আকারে শব্দটি মুখ থেকে বার করতে হলে মুখের কিঞ্চিৎ অধিক ব্যাদান করা দরকার। অথচ লিপিবদ্ধ বাক্যের এমনি একটি মোহিনী শক্তি আছে যে, মুখরোচক না হলেও তা আমাদের শিরোধার্য হয়ে ওঠে। 'ইতাম' 'তেম' এবং 'তুম'-এর মধ্যেও ঐ একই রকমের প্রভেদ আছে। তবে 'উম'-রূপ বিভক্তিটি অদ্যাবধি কেবলমাত্র কলকাতা শহরে আবদ্ধ, সুতরাং সমগ্র বাংলাদেশে যে সেটি গ্রাহ্য হবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, বিশেষত যখন 'হালুম' 'হুলুম' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে অপর এক জীবের ভাষার সাদৃশ্য আছে। এই এক 'উম' বাদ দিয়ে কলকাতার বাদবাকি উচ্চারণের ভঙ্গিটি যে কথিত বঙ্গ ভাষার উপর আধিপত্য লাভ করবে তার আর সন্দেহ নেই। আসলে হচ্ছেও তাই। আজকাল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সকল প্রদেশেরই বাঙালি ভদ্রলোকের মুখের ভাষা প্রায় একই রকম হয়ে এসেছে। প্রভেদ যা আছে সে শুধু টানটুনের। লিখিত ভাষার রূপ যেমন কথিত ভাষার অনুকরণ করে, তেমনি শিক্ষিত লোকদের মুখের ভাষাও লিখিত ভাষার অনুসরণ করে। এই কারণেই দক্ষিণদেশী ভাষা, যা কালক্রমে সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেছে, নিজ প্রভাবে শিক্ষিত-সমাজেরও মুখের ভাষার ঐক্য সাধন করছে। আমি পূর্বেই বলেছি যে, আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে কলকাতার মৌখিক ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠবে। তার কারণ, কলকাতা রাজধানীতে বাংলাদেশের সকল প্রদেশের অসংখ্য শিক্ষিত ভদ্র-লোক বাস করেন। ঐ একটি মাত্র শহরে সমগ্র বাংলাদেশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এবং সকল প্রদেশের বাঙালি জাতির প্রতিনিধিরা একত্র হয়ে পরস্পরের কথার আদান-প্রদানে যে নব্যভাষা গড়ে তুলছেন, সে ভাষা সর্বাঙ্গীণ বঙ্গ ভাষা। সুতানুটি গ্রামের গ্রাম্যভাষা এখন কলকাতার অশিক্ষিত লোকদের মুখেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। আধুনিক কলকাতার ভাষা বাঙালি জাতির ভাষা, আর খাস-কলকাত্তাই বুলি শুধু শহুরে cockney ভাষা।

পৌষ ১৩১৯

সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা

সম্প্রতি 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' নামক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ আমার হস্তগত হয়েছে। লেখক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম.এ. আমার সতীর্থ। একই যুগে একই বিদ্যালয়ে, একই শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে পরস্পরের মনোভাবে মিল থাকা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। বোধ হয় সেই কারণে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গ ভাষা সম্বন্ধীয় আমার প্রবন্ধটির সঙ্গে উক্ত প্রবন্ধের যে শুধু নামের মিল আছে তা নয়, মতামতেরও অনেকটা মিল আছে। এমন-কি, স্থানে স্থানে আমরা উভয়ে একই যুক্তি প্রায় একই ভাষায় প্রকাশ করেছি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ললিতবাবুর প্রবন্ধ হতে একটি প্যারা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

যাঁহারা সাধুভাষার অতিমাত্র পক্ষপাতী, তাঁহারা যদি কখনো দায়ে ঠেকিয়া একটা চলিত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়েন, তবে সেটা উদ্ধরণচিহ্নের মধ্যে লেখেন; যেন শব্দটা অপাঙ্‌ক্তেয়, সাধুভাষার শব্দগুলি সংস্পর্শজনিত পাপে লিপ্ত না হয়, সেই জন্য এই সাবধানতা। ইহা কি জাতিভেদের দেশে অনাচরণীয় জাতিদিগের প্রতি সামাজিক ব্যবহারের অনুবৃত্তি?

বাংলা কথাকে সাহিত্যসমাজে জাতিচ্যুত করবার বিষয়ে আমার পূর্ব প্রবন্ধে যা বলেছি, তার সঙ্গে তুলনা করলে পাঠকমাত্রই দেখতে পাবেন যে, আমরা উভয়েই মাতৃভাষার উপর এরূপ অত্যাচারের বিরোধী। তবে ললিতবাবুর সঙ্গে আমার প্রধান তফাত এই যে, তিনি সাধুভাষার সপক্ষে এবং বিপক্ষে কি বলবার আছে, অথবা কি সচরাচর বলা হয়ে থাকে, সেই-সকল কথা একত্র করে গুছিয়ে, পাশাপাশি সাজিয়ে, পাঠকদের চোখের সমুখে ধরে দিয়েছেন; কিন্তু পূর্ব পক্ষের মতামত বিচার করে কোনোরূপ মীমাংসা করে দেন নি। আর আমি উত্তর পক্ষের মুখপাত্র স্বরূপে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি যে, একটু পরীক্ষা করলেই দেখতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব পক্ষের তর্কযুক্তির ষোলো-কড়াই কানা।

ললিতবাবু দেখাতে চান যে, সমস্যাটা কি। আমি দেখাতে চাই যে, মীমাংসাটা কি হওয়া উচিত। ললিতবাবু বলেছেন যে, তাঁর উদ্দেশ্য যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ-ভাবে বিষয়টির আলোচনা করা। তাই, যদিচ তাঁর মনের ঝোঁক আসলে বঙ্গ ভাষার দিকে, তবুও তিনি পদে পদে সে ঝোঁক সামলাতে চেষ্টা করেছেন। আমি অবশ্য সে ঝোঁকটি সামলানো মোটেই কর্তব্য বলে মনে করি নে। কোনো পক্ষের হয়ে ওকালতি করা দূরে থাক্‌, তিনি বিচারকের আসন অলংকৃত করতে অস্বীকৃত হয়েছেন। এমন-কি, এই উভয় পক্ষের মধ্যস্থ হয়ে একটা আপস-মীমাংসা করে দেওয়াটাও তিনি আবশ্যক মনে করেন নি।

অপর পক্ষে, আমি বঙ্গ সাহিত্যের পক্ষে যা শ্রেয় মনে করি, তার জন্য ওকালতি করাটা কর্তব্যের মধ্যে গণনা করি। সেই কারণে আমি আমার নিজের মত কেবলমাত্র প্রচার করেই ক্ষান্ত থাকি নে, সেই মতের অনুসারে বাংলা ভাষা লিখতেও চেষ্টা

করি। অপরকে কোনো জিনিসেরই এপিঠ-ওপিঠ দ্বপিঠ দেখিয়ে দেবার বিশেষ কোনো সার্থকতা নেই, যদি না আমরা বলে দিতে পারি যে, তার মধ্যে কোন্‌টি সোজা আর কোন্‌টি উলটো।

সব দিক রক্ষা করে চলবার উদ্দেশ্য এবং অর্থ হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা; আমরা সামাজিক জীবনে নিত্যই সে কাজ করে থাকি। কিন্তু কি জীবনে, কি সাহিত্যে, কোনো একটা বিশেষ মত কি ভাবকে প্রাধান্য দিতে না পারলে আমাদের যত্ন চেষ্টা এবং পরিশ্রম সবই নিরর্থক হয়ে যায়। মনোজগতেও যদি আমরা শ্বধ্ব ডাঙায় বাঘ আর জলে কুমির দেখি, তা হলে আমাদের পক্ষে তটস্থ হয়ে থাকা ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

সে যাই হোক, যখন লেখবার একটা বিশেষ রীতি সাহিত্যে চলন করা নিয়ে কথা, তখন আমাদের একটা কোনো দিক অবলম্বন করতেই হবে। কেননা একসঙ্গে দ্বদিকে চলা অসম্ভব। তা ছাড়া যখন দ্বটি পথের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক পথ, এ সমস্যা একবার উপস্থিত হয়েছে, তখন 'এ-পথও জানি ও-পথও জানি, কিন্তু কি করব মরে আছি', এ কথা বলাও আমাদের ম্বখে শোভা পায় না; কারণ, বাজে লোকে যাই মনে কর্বক-না কেন, সাহিত্যসেবী এবং অহিফেনসেবী একই শ্রেণীর জীব নয়।

ললিতবাব্বর মতে 'সাধ্বভাষা বনাম চলিত ভাষা, এই মামলার মীমাংসা করিতে হইলে আধা ডিক্রি আধা ডিস্‌মিস্‌ ছাড়া উপায় নাই।' এর উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, তরমিন ডিক্রি লাভে বাদীর খরচা পোষায় না। ওরকম জিত প্রকারান্তরে হার। এ ক্ষেত্রে আমরা যে বাদী, সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কারণ আমাদের নাবালক অবস্থায় সাধ্বভাষীদের দল সাহিত্যক্ষেত্র দখল করে বসে আছেন। আমরা শ্বধ্ব আমাদের অন্বয়াগত সম্পত্তি প্বনরব্ধারের চেষ্টা করছি।

প্রতিবাদীরা জানেন যে, possession is nine points of the law, স্বতরাং তাঁদের বিশ্বাস যে, আমাদের মাতৃভাষার দাবি তামাদি হয়ে গেছে, ও সম্বন্ধে তাঁদের আর উচ্চবাচ্য করবার দরকার নেই। এ বিষয়ে বাক্যব্যয় করা তাঁরা কথার অপব্যয় মনে করেন। এ অবস্থায় কোনো বিচারপতির নিকট প্বরা ডিক্রি পাবার আশা আমাদের নেই, স্বতরাং আমরা যদি আবার তা জবর-দখল করে নিতে পারি, তা হলেই বঙ্গ সাহিত্য আমাদের আয়ত্তের ভিতর আসবে, নচেৎ নয়।

এই সমস্যার একটি চ্বড়ান্ত মীমাংসার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে যে, প্বর্ব পক্ষের বক্তব্যটি যে কি, তা আমরা প্রায়ই শ্বনতে পাই নে। যদি কোনো একটি বিশেষ রীতি সমাজে কিংবা সাহিত্যে কিছ্বদিন ধরে চলে যায়, তা হলে সেটি নিজের ঝোঁকের বলেই, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে inertia, তারই বলে চলে। যা প্রচলিত তার জন্য কোনোর্বপ কৈফিয়ত দেওয়াটা কেউ আবশ্যক মনে করেন না। অধিকাংশ লোকের পক্ষে জিনিসটা চলছে, এইটেই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে তা চলা উচিত। তা ছাড়া

যাঁরা মাতৃভাষাকে ইতর ভাষা বলে গণ্য করেন তাঁরা হয়তো বঙ্গ ভাষায় সাহিত্য রচনা ব্যাপারটি 'নীচের উচ্চভাষণ'-স্বরূপ মনে করেন, এবং সুবুদ্ধিবশত ওরূপ দাম্ভিকতা হেসে উড়িয়ে দেওয়াটাই সংগত বিবেচনা করেন।

সাধারণত লোকের বিশ্বাস এই যে, প্রচলিত আচারব্যবহারকে মন দিয়ে যাচিয়ে নেওয়াতে বিপদ আছে, কেননা তাদের মতে, শুধু স্ত্রী-বুদ্ধি নয়, বুদ্ধি মাত্রই প্রলয়ংকরী। সমাজ সম্বন্ধে এ মতের কতকটা সার্থকতা থাকলেও সাহিত্য সম্বন্ধে মোটেই নেই; কারণ, যে লেখার ভিতর মানব-মনের পরিচয় পাওয়া না যায়, তা সাহিত্য নয়। সুতরাং ললিতবাবু পূর্ব পক্ষের মত লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করে বিষয়টি আলোচনার যোগ্য করে তুলেছেন। একটা ধরাছোঁয়ার মতো যুক্তি না পেলে তার খণ্ডন করা অসম্ভব। কেবলমাত্র ধোঁয়ার উপর তলোয়ার চালিয়ে কোনো ফল নেই। ললিতবাবু বহু অনুসন্ধান করে সাধুভাষার সপক্ষে দুটি যুক্তি আবিষ্কার করেছেন—

১. সাধুভাষা আর্টের অনুকূল।

২. চলিত ভাষার অপেক্ষা সাধুভাষা হিন্দুস্থানি মারাঠি গুজরাটি প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় লোকদের নিকট অধিক সহজবোধ্য।

আর্টের দোহাই দেওয়া যে কতদূর বাজে, এ প্রবন্ধে আমি সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতে চাই নে। এ দেশে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে, যুক্তি যখন কোনো দাঁড়াবার স্থান পায় না, তখন আর্ট প্রভৃতি বড়ো বড়ো কথার অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করে। যে বিষয়ে কারো কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই, সে বিষয়ে বক্তৃতা করা অনেকটা নিরাপদ, কেননা সে বক্তৃতা যে অন্তঃসারশূন্য, এ সত্যটি সহজে ধরা পড়ে না। তথাকথিত সাধুভাষা সম্বন্ধে আমার প্রধান আপত্তি এই যে, ওরূপ কৃত্রিম ভাষায় আর্টের কোনো স্থান নেই। এ বিষয়ে আমার যা বক্তব্য আছে তা আমি সময়ান্তরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বলব। এ স্থলে এইটুকু বলে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে, 'রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা'[১]—লেখায় সেই গুণটি আনবার জন্য যথেষ্ট গুণপনার দরকার। আর্টহীন লেখক নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে কৃতকার্য হন না।

দ্বিতীয় যুক্তিটি এতই অকিঞ্চিৎকর যে, সে সম্বন্ধে কোনোরূপ উত্তর করতেই প্রবৃত্তি হয় না। আমি আজ দশ-এগারো বৎসর পূর্বে, আমার লিখিত এবং ভারতী পত্রিকাতে প্রকাশিত 'কথার কথা' নামক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলুম, এখানে তাই উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। যুক্তিটি বিশেষ পুরনো, সুতরাং তার পুরনো উত্তরের পুনরাবৃত্তি অসংগত নয়—

এ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য যদি ভুল না বুঝে থাকি, তা হলে তাঁর মত সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় যে, বাংলাকে প্রায় সংস্কৃত করে আনলে, আসামি হিন্দুস্থানি প্রভৃতি বিদেশী লোকদের পক্ষে বঙ্গ ভাষা-শিক্ষাটা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়ত, অন্য ভাষায় যে সুবিধাটুকু নেই, বাংলার তা আছে—যে-কোনো সংস্কৃত কথা যেখানে হোক

[১] বঙ্কিমচন্দ্র। "বাঙ্গলা ভাষা", বিবিধ প্রবন্ধ

লেখায় বসিয়ে দিলে বাংলা ভাষার বাংলাত্ব নষ্ট হয় না অর্থাৎ যাঁরা আমাদের ভাষা জানেন না তাঁরা যাতে সহজে বুঝতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সাধারণ বাঙালির পক্ষে আমাদের লিখিত ভাষা দুর্বোধ করে তুলতে হবে। কথাটা এতই অদ্ভুত যে, এর কি উত্তর দেব ভেবে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁর অপর মতটি ঠিক কি না দেখা যাক। আমাদের দেশে ছোটো ছেলেদের বিশ্বাস যে, বাংলা কথার পিছনে অনুস্বর জুড়ে দিলেই সংস্কৃত হয়; আর প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মত যে, সংস্কৃত কথার অনুস্বর-বিসর্গ ছেঁটে দিলেই বাংলা হয়। দুটো বিশ্বাসই সমান সত্য। বাঁদরের লেজ কেটে দিলেই কি মানুষ হয়?

যদি কারো এরূপ ধারণা থাকে যে, উক্ত 'উপায়ে রাষ্ট্রীয় একতা সংস্থাপিত হইবার পথ প্রশস্ত হইবে, কালে ভারতের সর্বত্র এক ভাষা হইবে' তা হলে সে ধারণা নিতান্ত অমূলক। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সভ্যতা যে আকারই ধারণ করুক-না কেন, একাকার হয়ে যাবে না। যা পূর্বে কস্মিন্ কালেও হয় নি, তা পরে কস্মিন্ কালেও হবে না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি যে ভাষা ভাব আচার এবং আকার সম্বন্ধে নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে এক জাতি হয়ে উঠবে এ আশা করাও যা, আর কাঁঠালগাছ ক্রমে আমগাছ হয়ে উঠবে এ আশা করাও তাই। পুরাকালেও এ দেশের দার্শনিকেরা যে সমস্যার মীমাংসা করবার চেষ্টা করেছিলেন, এ যুগের দার্শনিকদেরও সেই একই সমস্যার মীমাংসা করতে হবে। সে সমস্যা হচ্ছে, বহুর মধ্যে এক দেখা। রাষ্ট্রীয় ঐক্যস্থাপনের একমাত্র উপায় হচ্ছে, ভারতবর্ষের নানা জাতির বিশেষত্ব রক্ষা করেও সকলকে এক যোগসূত্রে বন্ধন করা। রাষ্ট্রীয় ভাবনাও যখন অতি ফলাও হয়ে ওঠে, এবং দেশে-বিদেশে চারিয়ে যায়, তখন সে ভাবনা দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। বঙ্গ সাহিত্যের যত শ্রীবৃদ্ধি হবে, তত তার স্বাতন্ত্র্য আরো ফুটে উঠবে, লোপ পাবে না।

৩

ললিতবাবু পণ্ডিতি বাংলার উপর বিশেষ নারাজ। আমি অবশ্য সেরকম রচনা-পদ্ধতির পক্ষপাতী নই। তবে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লেখকদের সপক্ষে এই কথা বলবার আছে যে, তাঁরা সংস্কৃত শব্দ ভুল অর্থে ব্যবহার করেন নি। তাঁদের হাতে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ মিষ্টপ্রয়োগ না হলেও দুষ্টপ্রয়োগ নয়। প্রবোধচন্দ্রিকা কিংবা পুরুষ-পরীক্ষা পড়লে বাংলা আমরা শিখতে না পারি, কিন্তু সংস্কৃত ভুলে যাই নে। প্রবোধচন্দ্রিকার রচয়িতা স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের আমি বিশেষ পক্ষপাতী। কেননা তিনি সুপণ্ডিত এবং সুরসিক। একাধারে এই উভয় গুণ আজকালকার লেখকদের মধ্যে নিতান্ত দুর্লভ হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের গল্প বলবার ক্ষমতা অসাধারণ। অল্প কথায় একটি গল্প কি করে সর্বাঙ্গসুন্দর করে বলতে হয়, তার সন্ধান তিনি জানতেন। পুরুষপরীক্ষার ভাষা ললিতবাবু যে কি কারণে 'শব্দাড়ম্বরময় জড়িমা-জড়িত ভাষা' মনে করেন, তা আমি বুঝতে পারলুম না, কারণ সে ভাষা নদীর জলের ন্যায় স্বচ্ছ এবং স্রোতস্বতী। প্রবোধ-চন্দ্রিকার পূর্বভাগের ভাষা কঠিন হলেও শুষ্ক নয়। যিনি তাতে দাঁত বসাতে

পারবেন তিনিই তার রসাস্বাদ করতে পারবেন। আমাদের নব্যলেখকেরা যদি মনোযোগ দিয়ে প্রবোধচন্দ্রিকা পাঠ করেন, তা হলে রচনা সম্বন্ধে অনেক সদুপদেশ লাভ করতে পারবেন। যথা, 'ঘট'কে 'কম্বুগ্রীব বৃকোদর' বলে বর্ণনা করলে তা আর্ট হয় না, এবং নর ও বিষাণ এই দুটি বাক্যকে একত্র করলে 'নরবিষাণ' রূপ পদ রচিত হলেও তার অনুরূপ মানুষের মাথায় শিং বেরোয় না; যদি কারো মাথায় বেরোয় তো সে পদকর্তার।

রাজা রামমোহন রায় এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের লেখার দোষ ধরা সহজ কিন্তু আমরা যেন এ কথা ভুলে না যাই যে, এ'রাই হচ্ছে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম গদ্য-লেখক। বাংলার গদ্যের রচনাপদ্ধতি এ'দেরই উদ্‌ভাবন করতে হয়েছিল। তাঁদের মুশকিল হয়েছিল শব্দ নিয়ে নয়, অন্বয় নিয়ে। রাজা রামমোহন রায়, তাঁর রচনা পড়তে হলে পাঠককে কি উপায়ে তার অন্বয় করতে হবে, তার হিসেব বলে দিয়েছেন। রাজা রামমোহনের গদ্য যে আমাদের কাছে একটু অদ্ভুত লাগে, তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে, তাঁর বিচারপদ্ধতি ও তর্কের রীতি সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত-শাস্ত্রের ভাষ্যকারদের অনুরূপ। সে পদ্ধতিতে আমরা গদ্য লিখি নে, আমরা ইংরেজি গদ্যের সহজ এবং স্বচ্ছন্দ গতিই অনুকরণ করতে চেষ্টা করি। রামমোহন রায়ের গদ্যে বাগাড়ম্বর নেই, সমাসের নামগন্ধও নেই, এবং সে ভাষা সংস্কৃতবহুলও নয়।

তার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য যে আমরা standard prose হিসাবে দেখি, তার কারণ, তিনিই সর্বপ্রথম প্রাঞ্জল গদ্য রচনা করেন। সে ভাষার মর্যাদা তার সংস্কৃতবহুলতার উপর নয়, তার syntaxএর উপর নির্ভর করে। রাজা রামমোহন রায়ের ভাষার সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা তুলনা করে দেখলে পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন যে, অন্বয়ের গুণেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

এই-সব কারণেই পণ্ডিতি বাংলার সঙ্গে আমার কোনো ঝগড়া নেই। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বঙ্গ ভাষার কোনো ক্ষতি করেন নি, বরং অনেক উপকার করেছেন। বিশেষত সে ভাষা যখন কোনো নব্যলেখক অনুকরণ করেন না, তখন তার বিরুদ্ধে আমাদের খড়্গহস্ত হয়ে ওঠবার দরকার নেই। আসল সর্বনেশে ভাষা হচ্ছে 'চন্দ্রাহত সাহিত্যিক'রা ইংরেজি বাক্য এবং পদকে যেমন-তেমন ক'রে অনুবাদ ক'রে যে খিচুড়ি-ভাষার সৃষ্টি করছেন, সেই ভাষা। সে ভাষার হাত থেকে উদ্ধার না পেলে বঙ্গ সাহিত্য আঁতুড়েই মারা যাবে। এবং সেই কৃত্রিম ভাষার হাত এড়াতে হলে মৌখিক ভাষার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই। সুতরাং 'আলালি' ভাষাকে আমাদের শোধন করে নিতে হবে। বাবু-বাংলার কোনোরূপ সংস্কার করা অসম্ভব, কারণ সে ভাষা হচ্ছে পণ্ডিতি বাংলার বিকারমাত্র। দুধ একবার ছিঁড়ে গেলে তা আর কোনো কাজে লাগে না। ললিতবাবুর মতে পণ্ডিতি বাংলার 'কঠোর অস্থিপঞ্জর পাঠ্য-পুস্তক-নির্বাচন-সমিতির বায়ু-শূন্য টিনের কৌটায় রক্ষিত'। আমি বলি তা নয়। স্কুলপাঠ্য-পুস্তকরূপ টিনের কৌটায় যা রক্ষিত হয়ে থাকে, তা শুধু সাধুভাষারূপ নটানো গোরুর দুধ। সুতরাং সেই টিনের গোরুর

দুধ খেয়ে যারা বড়ো হয়, মাতৃদুগ্ধ যে তাদের মুখরোচক হয় না, তা আর আশ্চর্যের বিষয় নয়।

৪

আমাদের রচনায় কতদূর পর্যন্ত আরবি পারসি ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশী শব্দের ব্যবহার সংগত, সে বিষয়ে ললিতবাবু এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে—

এক সময়ে বাংলা ভাষায় আরবি পারসি শব্দের প্রবেশ ঘটিয়াছে, এবং আজকাল ইংরেজি শব্দের প্রবেশ ঘটিতেছে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। সকল ভাষাতেই যাহা ঘটিয়াছে বাংলা ভাষাতেও তাহাই ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে।

এক কথায়, প্রাকৃতিক নিয়মের বিপক্ষতাচরণ করায় কোনো লাভ নেই। যে-সকল বিদেশী শব্দ বেমালুম বঙ্গ ভাষার অন্তর্ভূত হয়ে গেছে, সে-সকল শব্দ অবশ্য কথার মতো লেখাতেও নিত্যব্যবহার্য হওয়া উচিত।

কোনো শব্দের উৎপত্তি বিচার করে যে লেখক সেটিকে জোর করে সাহিত্য হতে বহিষ্কৃত করে দেবেন তিনিই ঠকবেন, কারণ ও-উপায়ে শুধু অকারণে ভাষাকে সংকীর্ণ করে ফেলা হয়। আমি এ বিষয়ে ললিতবাবুর মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। কিন্তু একটি কথা আমাদের মনে রাখা কর্তব্য—বঙ্গ ভাষা বাঙালি হিন্দুর ভাষা; এ দেশে মুসলমান ধর্মের প্রাদুর্ভাবের বহুপূর্বে গৌড়ীয় ভাষা প্রায় বর্তমান আকারে গঠিত হয়ে উঠেছিল।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের মতে—

অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে গৌড়দেশীয় ভাষা উত্তমা, সর্বোত্তমা সংস্কৃত ভাষা বাহুল্য-হেতুক।

গৌড়ীয় প্রাকৃত অপর-সকল প্রাকৃত অপেক্ষা উত্তম কি অধম, সে বিচার আমি করতে চাই নে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বঙ্গ ভাষার সম্বন্ধ যে অতি ঘনিষ্ঠ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সংস্কৃত বৈয়াকরণিকদের মতে ভাষাশব্দ ত্রিবিধ—তজ্জ, তৎসম, দেশ্য। বঙ্গ ভাষায় তজ্জ এবং তৎসম শব্দের সংখ্যা অসংখ্য, দেশ্য শব্দের সংখ্যা অল্প, এবং বিদেশী শব্দের সংখ্যা অতি সামান্য।

এ বিষয়ে ফরাসি ভাষার সহিত বঙ্গ ভাষা একজাতীয় ভাষা। একজন ইংরেজি লেখক ফরাসি ভাষা সম্বন্ধে যা বলেছেন, সেই কথাগুলি আমি নীচে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তার থেকে পাঠকমাত্রই দেখতে পাবেন যে, ল্যাটিন ভাষার সহিত ফরাসি ভাষাব যেরূপ সম্বন্ধ, সংস্কৃত ভাষার সহিত বঙ্গ ভাষারও ঠিক সেই একইরূপ সম্বন্ধ—

With a very few exceptions, every word in the French vocabulary comes straight from Latin. The influence of pre-Roman Celts is almost imperceptible ; while the number of words introduced by the Frankish conquerors amounts to no more than a few hundreds.

উদ্ধৃত পদটিতে Frenchএর স্থানে বঙ্গ ভাষা, pre-Romanএর স্থানে বাংলার আদিম অনার্য জাতি, Latinএর স্থলে সংস্কৃত, এবং Frankishএর স্থলে মুসলমান এই কথা ক'টি বদলে নিলে, উক্ত বাক্য ক'টি বঙ্গ ভাষার সঠিক বর্ণনা হয়ে ওঠে।

ঐরূপ হওয়াতে, ফরাসি সাহিত্যের যা বিশেষ গুণ, বঙ্গ সাহিত্যেরও সেই গুণ থাকা সম্ভব এবং উচিত। সে গুণ পূর্বোক্ত লেখকের মতে হচ্ছে এই—

French literature is absolutely homogeneous. The genius of the French language, descended from its single stock has triumphed most— in simplicity, in unity, in clarity, and in restraint.

সুতরাং জোর করে যদি আমরা বাংলা ভাষায় এমন-সব আরবি কিংবা পারসি শব্দ ঢোকাতে চেষ্টা করি, যা ইতিপূর্বে আমাদের ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে যায় নি, তা হলে ঐরূপ উপায়ে আমরা বঙ্গ ভাষাকে শুধু বিকৃত করে ফেলব।

সম্প্রতি বাংলা ভাষার উপর ঐরূপ জবরদস্তি করবার প্রস্তাব হয়েছে ব'লে এ বিষয়ে আমি বাঙালিমাত্রকেই সতর্ক থাকতে অনুরোধ করি। আগন্তুক ঢাকা-ইউনিভার্সিটির রিপোর্টে দেখতে পাই, একটু ঢাকা-চাপা দিয়ে ঐ প্রস্তাবই করা হয়েছে। স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলীর উপর আর্য আক্রমণের বিষয়ে আমি অনেকরূপ ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছি; কিন্তু ঐ স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলীর উপর এই মুসলমান আক্রমণের প্রস্তাবটি আরো ভয়ংকর, কেননা বাংলা ভাষার তদ্ভব শব্দকে রূপান্তরিত করে তৎসম করলেও বাংলা ভাষার ধর্ম নষ্ট হয় না, কিন্তু অপরিচিত এবং অগ্রাহ্য বিদেশী শব্দকে আমাদের সাহিত্যে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়াতে তার বিশেষত্ব নষ্ট করে তাকে কদর্য এবং বিকৃত করে ফেলা হয়। এই উভয়সংকট হতে উদ্ধার পাবার একটি খুব সহজ উপায় আছে। বাংলা ভাষা হতে বাংলা শব্দসকল বহিষ্কৃত করে দিয়ে অর্ধেক সংস্কৃত এবং অর্ধেক আরবি-পারসি শব্দ দিয়ে ইস্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করলে, দু কূল রক্ষে হয়!

চৈত্র ১৩১৯

আমাদের ভাষাসংকট

শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন যে, আমার ভাষা সংকর; অর্থাৎ আমার বাংলার ভিতর থেকে ইংরেজি শব্দ স্ব-রূপে মাঝে মাঝে দেখা দেয়। এ অপবাদ সত্য। তবে বাংলার ভিতর ইংরেজি ঢুকলে ভাষা যদি সংকর হয়, তা হলে শুধু আমার নয়, দেশসুদ্ধ লোকের ভাষা সংকর হয়ে গেছে।

বাংলার ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথোপকথনের দিকে কান দিলেই টের পাবেন যে, তাদের মৌখিক ভাষার বিশেষ্য বিশেষণ সব বেশির ভাগ ইংরেজি; তার ক্রিয়াপদ ও সর্বনামই শুধু বাংলা। তার পর জনগণের মুখেও যে কত ইংরেজি কথা তদ্‌ভব আকারে নিত্য চলছে তা সে শ্রেণীর বাঙালির সঙ্গে কার্যগতিকে যাঁর নিত্য কথাবার্তা কইতে হয় তিনিই জানেন। রাজমিস্ত্রি-ছুতোরমিস্ত্রিদের অধিকাংশ যন্ত্রপাতির নামের যে বিলেতে জন্ম তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই; কেননা মিস্ত্রি কথাটাই বিলেতি। 'বিলেতি' শব্দের অর্থ বিদেশী; আমি তাই ও শব্দটা 'ইউরোপীয়' এই অর্থেই এ পত্রে ব্যবহার করছি, ইংরেজির প্রতিশব্দ হিসেবে নয়।

ইংরেজি কথা যেমন হালে আমাদের ভাষার ভিতর প্রবেশ করেছে, ইংরেজ রাজা হবার পূর্বে অপর নানাজাতীয় বিলেতি কথা তেমনি আমাদের পূর্বপুরুষদের ভাষার ভিতর অবলীলাক্রমে ঢুকে গেছে, আর বাংলা ভাষার অঙ্গে সে-সব এমনি বেমালুম ভাবে বসে গিয়েছে যে, সেগুলি যে আসলে বিলেতি তাও আমরা ভুলে গিয়েছি। পশ্চিম-ইউরোপের ভাষাগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, প্রথম Romance language, দ্বিতীয় Germanic। এখন দেখা যাক এ দুয়ের ভিতর কোন্‌ ভাষার কাছে আমাদের মুখের ভাষা বেশি ঋণী।

নবাবি আমলের কবি ভারতচন্দ্রের মুখে শুনতে পাই যে, তাঁর কালে বাংলায় এই-সব বিলেতি জাতি বাস করত—যথা ১. ফিরিঙ্গি, ২. ফরাসি, ৩. আলেমান ৪. ওলন্দাজ, ৫. দিনেমার, ৬. ইংরেজ। ফরাসি অবশ্য French, আলেমান German, ওলন্দাজ Dutch, দিনেমার Dane, আর ইংরেজ English, তা হলে ফিরিঙ্গি হচ্ছে নিশ্চয়ই পোর্তুগিজ; French ফিরিঙ্গি না হয়ে পোর্তুগিজ যে কেন তা হল, সে রহস্যের সন্ধান আমি জানি নে। শব্দের রূপান্তরের আইনকানুন আমি জানি নে।

ভারতচন্দ্রের সঙ্গে সব জাতের চাক্ষুষ পরিচয় ছিল; তিনি বহুকাল ফরাস-ডাঙায় বাস করেছিলেন, আর পোর্তুগিজদের আড্ডা ছিল হুগলি, ওলন্দাজদের চুঁচুড়া, দিনেমারদের শ্রীরামপুর, সব-শেষ ইংরেজদের কলকাতা। মধ্য থেকে আলেমান কোত্থেকে এসে জুটল আর তাদের বসতিই বা ছিল কোথায়, তা আমার অবিদিত। ফরাসডাঙায় যে জার্মানরা ছিল না, সেটা নিশ্চিত; আর কলকাতায় যে ছিল সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। তবে সেকালে কোন্‌ জাতের সঙ্গে অপরকার যে *entente cordiale* ছিল সে কথা আমি বলতে পারি নে; যেহেতু আমি

ঐতিহাসিক নই। আমার বিশ্বাস আলেমানরা তখন আসমানে বাস করত, অর্থাৎ তারা সর্বত্রই ছিল।

উল্লিখিত ছটি জাতের মধ্যে প্রথম দুটির ভাষা Romance, বাকি চারটির Germanic। এই Romance ভাষার দেদার কথা বাঙালির অজ্ঞাতসারে বাংলা ভাষার অন্তর্ভূত হয়ে গেছে। বহুকাল পূর্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বাংলার অঙ্গীভূত পোর্তুগিজ শব্দাবলীর একটি ফর্দ দেখে আমার চক্ষু স্থির হয়ে যায়, কেননা সে ফর্দ ছিল দশ পাতা লম্বা। তার পর আমাদের ভাষায় ফরাসি শব্দও বড়ো কম নেই। তাসখেলার 'জুয়ো' থেকে আরম্ভ করে প্রমারার 'দুস' 'ত্রেস' 'তেরান্তা' 'কোরেন্তা' 'মাছ' 'কাতুর' পর্যন্ত প্রায় সকল কথাই ফরাসি। ঐ সূত্রে দেখতে পাই জার্মানিক ভাষারও দু-চার কথা আমাদের ভাষায় ঢুকে গিয়েছে। শুনতে পাই 'হরতন' 'রুইতন' হচ্ছে খাস-ওলন্দাজি। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নবাবের আমলে দু হাতে বিলেতি কথা আত্মসাৎ করে বাংলা ভাষা তার দেহ পুষ্ট করেছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, বিদেশী শব্দকে স্বদেশী করা হচ্ছে আমাদের ভাষার চিরকেলে ধর্ম।

মুসলমান যুগে কত ফারসি ও আরবি শব্দ যে বাংলা হয়ে গেছে তা কি আর বলা প্রয়োজন? আমরা হচ্ছি কৃষিজীবী জাত, অথচ 'জমি' থেকে 'ফসল' পর্যন্ত কৃষি-সংক্রান্ত প্রায় সকল কথাই হয় ফারসি নয় আরবি। আর জমিদারি সংক্রান্ত সকল কথাই ঐ আরবি-ফারসির দান; ও-ভাষার ভিতর সংস্কৃতের লেশমাত্র নেই। আমাদের কর্মজীবনের যা ভিত্তি, অর্থাৎ দেশের মাটি, তারও নাম জমি। বাংলার মতো মিশ্রভাষা এক উর্দু বাদ দিলে ভারতবর্ষে বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই। তার পর আমাদের কর্মজীবনের যা চূড়া, অর্থাৎ আইন-আদালত, তার ভাষাও আগাগোড়া আরবি-ফারসি। আরজি থেকে রায় ফয়সালা পর্যন্ত মামলার আদ্যোপান্ত সকল কথাই বাংলা ভাষাকে মুসলমানের দান। ইংরেজরা আজকাল ডিক্রি দেন বটে কিন্তু তা 'জারি' করতে হলেই ইংরেজি ছেড়ে ফারসির শরণাপন্ন হতে হয়। এ কথা যে সত্য, তা যে-কোনো মোক্তারি সেরেস্তার আমলা হলপ করে বলবে।

৩

পরের ধনে পোদ্দারি করা হচ্ছে যখন বাংলা ভাষার চিরকেলে বদ অভ্যাস, তখন এ যুগে যে তা অসংখ্য ইংরেজি শব্দ শুধু মুখস্থ নয় উদরস্থও করবে সে তো ধরা কথা। এতে বাংলা তো তার স্বধর্মই পালন করে চলেছে। তবে আমাদের ভাষার পরকে আপন করার স্বভাবের বিরুদ্ধে আজ কেন আপত্তি উঠেছে? এর একটি কারণ, পূর্বে বাংলা ভাষা বিদেশী শব্দ বেমালুম আত্মসাৎ করেছে; অপর পক্ষে আজ তার এই চুরি-বিদ্যেটা এক ক্ষেত্রে সহজেই ধরা পড়ে। সেকালে বাংলা মুসলমানদের কাছ থেকে কর্মের ভাষা নিয়েছিল, পোর্তুগিজ-ফরাসিদের কাছ থেকে নিয়েছিল শুধু জিনিসের নাম, আর আজ আমরা ইংরেজি থেকে ও দুই জাতীয় কথা তো নিচ্ছিই, উপরন্তু তার জ্ঞানের ভাষাও আত্মসাৎ করছি। প্রথম দুটির ব্যবহার হচ্ছে লৌকিক

আর শেষটির সাহিত্যিক; লৌকিক কথার চুরিকে চুরি বলে ধরা যায় না, কেননা তার ভিতর অসংখ্য লোকের হাত আছে, ও হচ্ছে সামাজিক আত্মার কাজ, ওর জন্য ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করা চলে না। অপর পক্ষে সাহিত্যিক চৌর্য ব্যক্তিবিশেষের কাজ, অতএব সেটা ধরাও যায়, ও সে কথা-চোরকে শাসন করাও যায়।

কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখতে পাবেন যে, উক্ত লৌকিক ও সাহিত্যিক চুরি, উভয় ব্যাপারেরই মূলে আছে একই গরজ।

মুসলমানরা আমাদের দেশে যে-সব নতুন কছমের আদালত-কাছারি আইন-কানুন এনেছে তাদের সঙ্গে তাদের বিদেশী নামও এসেছে। এবং সেই আইন-আদালত যেমন সমাজের উপর চেপে বসেছে, তাদের নামও তেমনি ভাষার ভিতর ঢুকে বসেছে।

ফিরিঙ্গিরা যে-সব নতুন জিনিস এ দেশে নিয়ে এসেছে আর আমাদের ঘরে ঘরে যার স্থান হয়েছে, তাদের নামও আমাদের মুখে মুখে চলেছে। তাস হিন্দুরা খেলত না, তারা খেলত পাশা; মুসলমানরাও খেলত না, তারা খেলত হয় সতরঞ্চ নয় গঞ্জিফা। ফিরিঙ্গিরা যখন দেশে তাস আনলে তখন শুধু বিন্তি নয় প্রমারা খেলতেও আমরা শিখলুম, ফলে ফরাসি কথা জুয়ো বাংলা হয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে জুয়ো-খেলিয়ে বাঙালিরা ফরাসিতে যাকে বলে জুয়াড়ি তাই হয়ে উঠল।

এ যুগে ইংরেজেরা আমাদের অনেক জিনিস দিয়েছে, যা আমাদের ভাষায় স্বনামে ও আমাদের ঘরে স্বরূপে আছে ও থেকেও যাবে। একটা সর্বলোকবিদিত উদাহরণ দেওয়া যাক। বোতল গেলাস বাংলা ভাষা থেকে কখনো বেরিয়ে যাবে না, কেননা ও দুই চিজও বাংলাদেশ থেকেও কখনো বেরিয়ে যাবে না। বাংলা যদি একদম বেসুরা হয়ে যায়, তা হলেও বাঙালিরা ওষুধ খাবে, আর মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্য তেল মাখবে। অতএব আমাদের কাচের পাত্র চাই। তার পর ইংরেজ-প্রবর্তিত নূতন কর্মজীবনও তৎসম অবস্থায় না হোক তদ্‌ভব অবস্থায় থেকে যাবে। আর সে কারণ বাংলা ভাষায় সে জীবনের বিলেতি নাম সব, তৎসম-রূপে না হোক তদ্‌ভব-রূপে বজায় থাকবে।

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ইংরেজি জ্ঞানের ভাষাও কতক পরিমাণে বাংলা ভাষার অন্তরঙ্গ হয়ে থাকবে। ইংরেজি শিক্ষার প্রসাদে অনেক নূতন জ্ঞান, অনেক নূতন ভাব আমাদের মনের ভিতর ঢুকে গিয়েছে, তাই তাদের বিলেতি নামও আমাদের মুখে মুখে চলেছে। যেহেতু দেশের জনগণ ইংরেজি-শিক্ষিত নয়, সে কারণ ঐ-সব ইংরেজি কথা স্বল্পসংখ্যক লোকের মুখেই শোনা যায়; আর তাদের বিদেশী ধ্বনি আমাদের কানে সহজেই ধরা পড়ে। আর সেই কারণেই বাংলা ভাষা থেকে অনেকে চান 'আইডিয়া'কে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে।

বাঙালির মুখ থেকে বিলেতি কথা কেউ খসাতে পারবেন না, অতএব সে চেষ্টা কেউ করেনও না। আমরা চাই শুধু লিখিত ভাষায় বিদেশী শব্দ বয়কট করতে। কিন্তু আমাদের এই সাতশো বছরের বর্ণসংকর ভাষাকে যদি আবার আর্য করতে

হয়, তা হলে ভাষার আর্যসমাজীদের আগে সে ভাষাকে শুদ্ধ করতে হবে, তার পরে তার পৈতে দিতে হবে।

এ চেষ্টা বাংলায় ইতিপূর্বে একবার মহাবাক্যাড়ম্বরের সঙ্গে হয়ে গেছে। ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিত মহাশয়েরা যে গদ্য রচনা করে গিয়েছেন তাতে ফারসি-আরবির স্পর্শমাত্র নেই। তাঁদের ঐ তিরস্করণী বুদ্ধির প্রতাপে বাংলা ভাষা থেকে শুধু যে আরবি-ফারসি বেরিয়ে গেল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য তদ্ভব কথাও সাহিত্য হতে বহিষ্কৃত হল। কিছুকাল পূর্বে বাংলা সাহিত্যে কারো বিয়ে করবার সাধ্য ছিল না, সকলেই বিবাহ করতে বাধ্য হত। আর বিবাহ করেও কারো নিস্তার ছিল না, কেননা ও-সাহিত্যে স্ত্রীকে কেউ ভালোবাসতে পারত না, সকলকে তার সঙ্গে প্রণয় করতে হত। শুধু অসংখ্য কথা যে বেরিয়ে গেল তাই নয়, ভাষার কলকব্জাও সব বদলে গেল। দ্বারা সহিত কর্তৃক পরন্তু অপিচ যদ্যপিস্যাৎ প্রভৃতির সাহায্য ব্যতীত উক্ত সাধুভাষায় পদ আর বাক্য হতে পারত না। ফলে বাঙালির মুখে যা ছিল active, বাঙালির লেখায় তা passive হয়ে পড়ল। বাংলা ভাষার উপর এই আর্য অত্যাচার বাঙালি যে বেশিদিন সহ্য করতে পারে নি, তার সাক্ষাৎপ্রমাণ স্বরূপ ষাট বৎসর আগে বাঙালির ওড়ানো বিদ্রোহের দুটি লাল পতাকা আজও আমাদের সাহিত্যগগনে জ্বলজ্বল করছে। আলালের ঘরের দুলাল আর হুতোম প্যাঁচার নক্শা যে বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর এনেছিল তার সাক্ষী স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র।

পণ্ডিত মহাশয়েরা যখন বাংলা ভাষার যবন-দোষ ঘোচাতে পারেন নি তখন আমরাও তা পারব না, কেননা আমাদের আধুনিক সাহিত্যের সংস্কৃত বেশধারী বহু শব্দকে আঁচড়ালেই তার ভিতর থেকে আহেল বিলেতি ভাব বেরিয়ে পড়ে। 'আইডিয়া' বাদ দিয়ে বাংলা আজ আমরা কেউ লিখতে পারি নে। অতএব আমার নিবেদন এই যে, কোনো নতুন বিদেশী কথাকে বয়কট করা কিংবা পুরনো বিদেশী শব্দকে বাংলা ভাষা থেকে বহিষ্কৃত করবার চেষ্টা করা, শুধু বৃথা সময় নষ্ট করা। আমাদের ভাষায় অনেক নতুন কথা আপনা হতেই ঢুকবে, আর অনেক পুরনো কথা আপনা হতেই বেরিয়ে যাবে, আর তা হবে তাদের জাতিবর্ণনির্বিচারে।

এ পত্রের যবনিকা পতনের পূর্বে আর-একটি কথা বলব। এ সত্যটা এখন ধরা পড়েছে যে, বাংলা ভাষা বাঙালির ভাষা নয়। বংশে বাঙালি হচ্ছে মঙ্গল-দ্রাবিড়, আর তার ভাষা হচ্ছে সংস্কৃতের প্রপৌত্রী। 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি' বাংলার আদিম অধিবাসীরা তথা স্বভাষা ত্যাগ করে মাগধী প্রাকৃত গ্রহণ করেছিল। সেই দিন থেকে এ দেশের লোকের মনেরও পুনর্জন্ম হয়েছে, কেননা মন আর ভাষা একই জিনিস। আমরা যদি এখন বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় ফিরে যেতে চাই তা হলে আমাদের ফিরতে হবে আদি-দ্রাবিড় + আদি-মঙ্গল ভাষায়; কিন্তু সে ভাষাও হবে সংকর।

বাঙালি যে দেহে সংকর, মনে সংকর, ভাষায় সংকর—এর জন্যে দোষী আমরা নই, কেননা বাঙালি জাতি আমাদের সৃষ্টি করেছে, আমরা বাঙালি জাতিকে সৃষ্টি করি নি।

এই জাতিভেদের দেশে বাস ক'রে শুধু দেহে নয় মনেও ছুঁতমার্গী হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক; তবে এই মিশ্রণের জন্য দুঃখ করা বৃথা, কেননা ও-পাপ নিজের দেহ-মন থেকে দূর করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এ অবস্থায় বাইরের জিনিসকে আত্মসাৎ করা যে প্রাণের লক্ষণ, নব-আয়ুর্বেদের এই মতকে মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকাই ভালো। ২৪ জুন ১৯২২।

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৯

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের ঐক্য

শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় উপরোক্ত নামে পুস্তিকা-আকারে ইংরেজি ভাষায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। যাঁরা দিবারাত্র জাতীয় ঐক্যের স্বপ্ন দেখেন তাঁদের পক্ষে, অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ের যথেষ্ট মূল্য আছে।

স্বদেশ কিংবা স্বজাতির নাম উল্লেখ করবামাত্রই এক দলের লোক আমাদের মুখ-ছোপ দিয়ে বলেন, ও-সব কথা উচ্চারণ করবার তোমাদের অধিকার নেই, কেননা ভারতবর্ষ বলে কোনো-একটা বিশেষ দেশ নেই এবং ভারতবাসী বলে কোনো-একটা বিশেষ জাতি নেই। ভারতবর্ষের অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং পরস্পর-অসংযুক্ত নানা খণ্ড দেশ এবং ভারতবাসীর অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর-সম্পর্কহীন নানা ভিন্ন জাতি।

ভারতবর্ষ যে একটি প্রকাণ্ড মহাদেশ, এ সত্য আবিষ্কার করবার জন্য পায়ে হেঁটে তীর্থপর্যটন করবার দরকার নেই। একবার এ দেশের মানচিত্রখানির উপর চোখ বুলিয়ে গেলেই আমাদের শ্রান্তি বোধ হয়, এবং শরীর না হোক মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। এবং ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যে অগণ্য, আর এই কোটি কোটি লোক যে জাতি ধর্ম ও ভাষায় শত শত ভাগে বিভক্ত, এ সত্য আবিষ্কার করবার জন্যও সেন্সস্ রিপোর্ট পড়বার আবশ্যক নেই: চোখ-কান খোলা থাকলেই তা আমাদের কাছে নিত্যপ্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

আমাদের জীবনের যে ঐক্য নেই, এ কথাও যেমন সত্য— আমাদের মনে যে ঐক্যের আশা আছে, সে কথাও তেমনি সত্য। এক-ভারতবর্ষ হচ্ছে এ যুগের শিক্ষিত লোকের ইউটোপিয়া, সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে গন্ধর্বপুরী। সে পুরী আকাশে ঝোলে এবং সকলের নিকট তা প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু যিনি একবার সে পুরীর মর্মরপ্রাচীর মণিময়তোরণ রজতসৌধ ও কনকচূড়ার সাক্ষাৎলাভ করেছেন, তিনি আকাশরাজ্য হতে আর চোখ ফেরাতে পারেন না। এক কথায় তিনি ভারতবর্ষের একতার দিবাস্বপ্ন দেখতে বাধ্য। অনেকের মতে দিবাস্বপ্ন দেখাটা নিন্দনীয়, কেননা ও ব্যাপারে শুধু অলীকের সাধনা করা হয়। মানুষে কিন্তু বাস্তবজগতের অজ্ঞতাবশত নয়, তার প্রতি অসন্তোষবশতই, চোখ-চেয়ে স্বপ্ন দেখে; সে স্বপ্নের মূল মানবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। এবং ইতিহাস এ সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে, আজকের কল্পনারাজ্য কখনো কখনো কালকের বাস্তবজগতে পরিণত হয়, অর্থাৎ দিবাস্বপ্ন কখনো কখনো ফলে। সুতরাং ভারতবর্ষের ঐক্যসাধন জাতীয় জীবনের লক্ষ্য করে তোলা অনেকের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সকলের পক্ষেই আবশ্যক। সমগ্র সমাজের বিশেষ-একটা-কোনো লক্ষ্য না থাকায় দিন দিন আমাদের সামাজিক জীবন নির্জীব এবং ব্যক্তিগত জীবন সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। পূর্বে যে ঐক্যের কথা বলা গেল, তা অবশ্য আইডিয়াল ইউনিটি; এবং অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের মনে এক-

ভারতবর্ষ একটি বিরাট আইডিয়াল-রূপেই বিরাজ করছে। আমাদের বাঞ্ছিত ইউটোপিয়া ভবিষ্যতের অঙ্কস্থ রয়েছে।

কিন্তু এই আইডিয়ালকে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে নিত্যই আক্রমণ সহ্য করতে হয়। এক দিকে ইংরেজি সংবাদপত্র, অপর দিকে বাংলা সংবাদপত্র এই আইডিয়ালটিকে নিতান্ত উপহাসের পদার্থ মনে করেন; উভয়েই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেন। কাগজওয়ালাদের মতে এই মনোভাবটি বিদেশী-শিক্ষালব্ধ, এবং সেইজন্যই স্বদেশী-ভিত্তিহীন; কেননা ভারতবর্ষের অতীতের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। ইংরেজি সংবাদপত্রের মতে ভারতবর্ষের সভ্যতার মূল এক নয়, বহু: এবং যা গোড়া হতেই পৃথক্, তার আর কোনোরূপ মিলন সম্ভব নয়। কুকুর আর বেড়াল নিয়ে এক-সমাজ গড়ে তোলা যায় না; ও দুই শ্রেণীর জীব শুধু গৃহস্বামীর চাবুকের ভয়ে একসঙ্গে ঘর করতে পারে। অপর পক্ষে বাংলা সংবাদপত্রের মতে হিন্দুসমাজের বিশেষত্বই এই যে, তা বিভক্ত। এ সমাজ শতরঞ্জের ঘরের মতো ছক-কাটা। এবং কার কোন্ ছক, তাও অতি সুনির্দিষ্ট। এই সমাজের ঘরে কে সিধে চলবে, কে কোনাকুনি চলবে, কে এক পা চলবে, আর কে আড়াই পা চলবে, তারও বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। এর নাম হচ্ছে বর্ণাশ্রমধর্ম। নিজের নিজের গণ্ডির ভিতর অবস্থিতি করে নিজের নিজের চাল রক্ষা করাই হচ্ছে ভারতবাসীর সনাতন ধর্ম। সুতরাং যাঁরা সেই দাবার ঘরের রেখাগুলি মুছে দিয়ে সমগ্র সমাজকে একঘরে করতে চান, তাঁরা দেশের শত্রু। শিক্ষিত সম্প্রদায় যে ঐক্য চান তা ভারতবর্ষের ধাতে নেই. সুতরাং জাতির উন্নতির যে ব্যবস্থা তাঁরা করতে চান, তাতে শুধু সামাজিক অরাজকতার সৃষ্টি করা হবে। সমাজের সুনির্দিষ্ট গণ্ডিগুলি তুলে দিলে সমাজতরী কোনাকুনি চ'লে তীরে আটকে যাবে, এবং সমাজের ঘোড়া আড়াই পা'র পরিবর্তে চার পা তুলে ছুটবে। এ অবশ্য মহা বিপদের কথা। সুতরাং ভারতবর্ষের অতীতে এই ঐক্যের আইডিয়ালের ভিত্তি আছে কি না, সেটা খুঁজে দেখা দরকার। এই কারণেই সম্ভবত রাধাকুমুদবাবু দু হাজার বৎসরের ইতিহাস খুঁড়ে সেই ভিত বার করবার চেষ্টা করেছেন, যার উপরে সেই কাম্যবস্তুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। এ যে অতি-সাধু উদ্দেশ্য সে বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই।

২

রাধাকুমুদবাবু জাতীয় জীবনের ঐক্যের মূল যে প্রাচীন যুগের সামাজিক জীবনে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন, তার জন্য তিনি আমার নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ। অনেকে, দেখতে পাই, এই ঐক্যের সন্ধান, ঐতিহাসিক সত্যে নয়, দার্শনিক তথ্যে লাভ করেন্। এ শ্রেণীর লোকের মতে সমগ্র ভারতবর্ষ এক ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত; কেননা অদ্বৈতবাদে সকল অনৈক্য তিরস্কৃত হয়। কিন্তু যে সমস্যা নিয়ে আমরা নিজেদের বিব্রত করে তুলেছি, তার মীমাংসা বেদান্তদর্শনে করা হয় নি; বরং ঐ দর্শন থেকেই অনুমান করা অসংগত হবে না যে, প্রাচীন যুগে জাতীয় জীবনে কোনো ঐক্য ছিল না। মানবজীবনের সঙ্গে মানবমনের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। কাব্যের মতো দর্শনও

জীবনবৃক্ষের ফুল; তবে এ ফুল এত সূক্ষ্ম বৃন্তে ভর ক'রে এত উচ্চে ফুটে ওঠে যে, হঠাৎ দেখতে তা আকাশকুসুম বলে ভ্রম হয়। আমার বিশ্বাস, একটি ক্ষুদ্র দেশের এক রাজার শাসনাধীন জাতির মন একেশ্বরবাদের অনুকূল। ঐরূপ জাতির পক্ষে বিশ্বকে একটি দেশ হিসেবে এবং ভগবানকে তার অদ্বিতীয় শাসন- ও পালন-কর্তা হিসেবে দেখা স্বাভাবিক এবং সহজ। অপর পক্ষে যে মহাদেশ নানা রাজ্যে বিভক্ত এবং বহু রাজা-উপরাজার শাসনাধীন, সে দেশের লোকের পক্ষে আকাশদেশে বহু দেবতা এবং উপদেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করাও তেমনি স্বাভাবিক। সাধারণত মানুষে মর্তের ভিত্তির উপরেই স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করে। যে দেশের পূর্বপক্ষ একেশ্বরবাদী সে দেশের উত্তরপক্ষ নাস্তিক, এবং যে দেশের পূর্বপক্ষ বহুদেবতাবাদী সে দেশের উত্তরপক্ষ অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবাদী বহুর ভিতর এক দেখেন না, কিন্তু বহুকে মায়া বলে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। সুতরাং উত্তরমীমাংসার সার কথা— 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'— এই অর্ধ শ্লোকে যে বলা হয়েছে, তার আর সন্দেহ নেই। এই কারণেই বেদান্তদর্শন সাংখ্যদর্শনের প্রধান বিরোধী। অথচ এ কথা অস্বীকাব করবার জো নেই যে, সংখ্যা বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে শুধু শূন্য। সুতরাং মায়াবাদ যে ভাষান্তরে শূন্যবাদ এবং শংকর যে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ— এই প্রাচীন অভিযোগের মূলে কতকটা সত্য আছে। যে একাত্মজ্ঞান কর্মশূন্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত, সে জ্ঞানের চর্চায় আত্মার যতটা চর্চা করা হয়, বিশ্বমানবের সঙ্গে আত্মীয়তার চর্চা ততটা করা হয় না। আরণ্যক-ধর্ম যে সামাজিক, এ কথা শুধু ইংরেজি-শিক্ষিত নাগরিকেবাই বলতে পারেন। সমাজ ত্যাগ করাই যে সন্ন্যাসের প্রথম সাধনা, এ কথা বিস্মৃত হবার ভিতর যথেষ্ট আরাম আছে।

সোঽহং হচ্ছে ইনডিভিডুয়ালিজ্‌মের চরম উক্তি। সুতরাং বেদান্তমত আমাদের মনোজগৎকে যে পরিমাণে উদার ও মুক্ত করে দিয়েছে, আমাদের ব্যাবহারিক জীবনকে সেই পরিমাণে বদ্ধ ও সংকীর্ণ কবে ফেলেছে। বেদান্তের দর্পণে প্রাচীন যুগের সামাজিক মন প্রতিফলিত হয় নি, প্রতিহত হয়েছে। বেদান্তদর্শন সামাজিক জীবনের প্রকাশ নয়, প্রতিবাদ। অদ্বৈতবাদ হচ্ছে সংকীর্ণ কর্মের বিরুদ্ধে উদার মনের প্রতিবাদ, সীমার বিরুদ্ধে অসীমেব প্রতিবাদ, বিষয়জ্ঞানেব বিরুদ্ধে আত্মজ্ঞানের প্রতিবাদ। এক কথায় জড়ের বিরুদ্ধে আত্মার প্রতিবাদ। সমাজের দিক থেকে দেখলে জীবের এই স্বরাট্‌জ্ঞান শুধু বিবাট অহংকার মাত্র। সুতরাং যে সূত্রে একালের লোকেরা জাতিকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চান তা ব্রহ্মসূত্র নয়, কিন্তু তার অপেক্ষা ঢের স্থূল জীবনসূত্র।

কেন যে পুরাকালে অদ্বৈতবাদীরা কৌপীনকমণ্ডলু ধারণ করে বনে যেতেন, তার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি না করতে পারায় একালের অদ্বৈতবাদীরা চোগাচাপকান পরে আপিসে যান। উভয়ের ভিতর মিল এইটুকু যে, একজন হচ্ছেন উদাসী আর-একজন শুধু উদাসীন— পরের সম্বন্ধে।

রাধাকুমুদবাবুর প্রবন্ধের প্রধান মর্যাদা এই যে, তিনি ভারতের আত্মজ্ঞানের ভিত্তি অতীতের জীবনক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে কতদূর কৃত-কার্য হয়েছেন সেইটেই বিচার্য। ভবিষ্যতের শূন্যদেশে যা-খুশি-তাই স্থাপনা

করবার যে স্বাধীনতা মানুষের আছে, অতীত সম্বন্ধে তা নেই। ভবিষ্যতে সবই সম্ভব হতে পারে, কিন্তু অতীতে যা হয়ে গেছে তার আর একচুলও বদল হতে পারে না। কল্পনার প্রকৃত লীলাভূমি ভূত নয়, ভবিষ্যৎ। আকাশে আশার গোলাপ ফুল অথবা নৈরাশ্যের সরষের ফুল দেখবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে; কিন্তু অতীত ফুলের নয়, মূলের দেশ। যে মূল আমরা খুঁজে বার করতে চাই তা সেখানে পাই তো ভালোই; না পাই তো, না পাই।

জীবের অহংজ্ঞান যেমন একটি দেহ আশ্রয় করে থাকে জাতির অহংজ্ঞানও তেমনি একটি দেশ আশ্রয় করে থাকে। মানুষের যেমন দেহাত্মজ্ঞান তার সকল বিশিষ্টতার মূল, জাতির পক্ষেও তেমনি দেশাত্মজ্ঞান তার সকল বিশিষ্টতার মূল। ভারত-বাসীর মনে এই দেশাত্মজ্ঞান যে অতি প্রাচীনকালে জন্মলাভ করেছিল, রাধাকুমুদবাবু নানারূপ প্রমাণপ্রয়োগের বলে তাই প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন।

ভারতবর্ষ মহাদেশ হলেও যে একদেশ এবং ভারতবাসীদের যে সেটি স্বদেশ, এ সত্যটি অন্তত দু হাজার বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

উত্তরে অলঙ্ঘ্য পর্বতের প্রাকার, এবং পশ্চিম দক্ষিণ ও পূর্বে দুর্লঙ্ঘ্য সাগরের পরিখা যে ভারতবর্ষকে অন্যান্য সকল ভূভাগ হতে বিশেষরূপে পৃথক্‌ ও স্বতন্ত্র করে রেখেছে, এ হচ্ছে প্রত্যক্ষসত্য। তার পর, এ দেশ অসংখ্যযোজনবিস্তৃত হলেও সমতল; এত সমতল যে, সমগ্র ভারতবর্ষকে একক্ষেত্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিন্ধ্যাচল সম্ভবত এ মহাদেশকে দুটি চিরবিচ্ছিন্ন খণ্ডদেশে বিভক্ত করতে পারত, যদি অগস্ত্যের আদেশে সে চিরদিনের জন্য নতশির হয়ে থাকতে বাধ্য না হত। রাধাকুমুদবাবু দেখিয়েছেন যে, এই স্বদেশজ্ঞান ভারতবাসীর পক্ষে কেবলমাত্র শুষ্ক জ্ঞান নয়, কিন্তু তাদের আত্যন্তিক প্রীতি ও ভক্তির সঙ্গে জড়িত। ভারতবাসীর পক্ষে ভারতবর্ষ হচ্ছে পুণ্যভূমি। সে দেশের প্রতি ক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র, প্রতি নদী তীর্থ, প্রতি পর্বত দেবতাত্মা। কিন্তু এই ভক্তিভাব আর্য মনোভাব কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বেদ হতে পঞ্চনদের আবাহনস্বরূপ একটিমাত্র শ্লোক উদ্‌ধৃত করে রাধাকুমুদবাবু প্রমাণ করতে চান যে, ঋষিদের মনে এই একদেশীয়তার ভাব সর্বপ্রথমে উদয় হয়েছিল। কিন্তু সেই বৈদিক মনোভাব যে ক্রমে বৃদ্ধি এবং বিস্তার লাভ করে শেষে লৌকিক মনোভাবে পরিণত হয়েছিল, তার কোনো প্রমাণ নেই। আমার বিশ্বাস, বৈদিক ধর্ম নয়, লৌকিক ধর্মই ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি করে তুলেছে। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের ধর্ম হচ্ছে লৌকিক ধর্ম, বিদেশী বিজেতা আর্য-দের ধর্ম হচ্ছে বৈদিক ধর্ম। ভারতবর্ষের মাটি ও ভারতবর্ষের জলই হচ্ছে লৌকিক ধর্মের প্রধান উপাদান। সে ধর্ম আকাশ থেকে পড়ে নি, মাটি থেকে উঠেছে। ভারতবর্ষের জনগণ চিরদিন কৃষিজীবী। যে ত্রিকোণ পৃথিবী তাদের চিরদিন অন্নদান করে সেই হচ্ছে অন্নদা এবং যে জল তাদের শস্যক্ষেত্রে রসসঞ্চার করে সেই হচ্ছে প্রাণদা। তাই ভারতবর্ষের অসংখ্য লৌকিক দেবতা সেই অন্নদার বিকাশ।

সীতার মতো এ-সকল দেবতা হলমুখে ধরণী হতে উত্থিত হয়েছে। তাই এ দেশের প্রতিমা মাটির দেহ ধারণ করে এবং জলে তার বিসর্জন হয়। 'তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে' এ কথা মোটেই বৈদিক মনোভাবের পরিচায়ক নয়। কেননা, পঞ্চনদ-বাসী আর্যেরা মন্দিরও গড়াতেন না, প্রতিমাও পূজা করতেন না। এই দেশভক্তি পৌরাণিক সাহিত্যে অতি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তার কারণ, বৈদিক যুগ ও পৌরাণিক যুগের মধ্যে যে বৌদ্ধ যুগ ছিল সেই যুগেই এই স্বদেশজ্ঞান ও স্বদেশ-প্রীতি ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধধর্ম অবৈদিক ধর্ম, এবং সার্ব-জনীন বলে তা সার্বভৌম ধর্ম। অপর পক্ষে বৈদিক ধর্ম আর্যদের গৃহধর্ম, বড়োজোর কুলধর্ম। সমগ্র দেশকে একাত্ম করবার ক্ষমতা সে ধর্মের ছিল না। যেমন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে সুরেরা এক ঈশানকোণ ব্যতীত আর-সকল দিকেই পরাস্ত হয়েছিলেন, তেমনি সম্ভবত ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতারা দেশজ দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে এক গৃহকোণ ব্যতীত আর সর্বত্রই পরাস্ত হয়েছিলেন। অন্তত আকাশের দেবতারা যে মাটির দেবতাদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পৌরাণিক হিন্দুধর্ম। বৈদিক ও লৌকিক মনোভাবের মিশ্রণে এই নবধর্মভাবের জন্ম। আর্যেরা যে কস্মিন্‌কালেও সমগ্র ভারতবর্ষকে একদেশ বলে স্বীকার করতে চান নি, তার প্রমাণ স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-ধর্মের অধঃপতন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয়ের সময় মনুসংহিতা লিখিত হয়। এই সংহিতাকারের মতে ব্রহ্মাবর্ত-এবং আর্যাবর্ত-বহির্ভূত সমগ্র ভারতবর্ষ হচ্ছে ঘৃণ্য ম্লেচ্ছদেশ। মনুর টীকাকার মেধাতিথি বলেন যে, দেশের ম্লেচ্ছত্বদোষ কিংবা আর্যত্বগুণ নেই। যে দেশে বেদবিহিত ক্রিয়াকর্মনিরত আর্যেরা বাস করেন, সেই হচ্ছে আর্যভূমি, বাদবাকি সব ম্লেচ্ছদেশ। আর্যদের এই স্বজাতিজ্ঞান সমগ্র ভারত-বর্ষের স্বদেশজ্ঞানের প্রতিকূল ছিল। পঞ্চনদের পঞ্চনদীর উল্লেখ করে তর্পণের মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বৈদিক ঋষিরা যে গণ্ডূষ করতেন, সে কতকটা সেই ভাবে, যে ভাবে একালে বিলাতি আর্যেরা মহোৎসবের ভোজনান্তে The Land we live inএর নামোচ্চারণ করে সুরার আচমন করেন। প্রাচীন আর্যজাতির মনে দেশপ্রীতির চাইতে আত্মপ্রীতি ঢের বেশি প্রবল ছিল। দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা নয়, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষাই ছিল তাঁদের স্বধর্ম। রাধাকুমুদবাবু এমন-কোনো বিরুদ্ধপ্রমাণ দেখাতে পারেন নি, যাতে করে আমার এই ধারণা পরিবর্তিত হতে পারে।

৪

ইংরেজ যে সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষের মানচিত্র লালবর্ণে চিত্রিত করেছেন, তা নয়। আজ দু হাজার বৎসরেরও পূর্বে আশোকও একবার ঐ মানচিত্র গেরুয়ারঙে রঞ্জিত করেছিলেন। এ কথা শিক্ষিত লোকমাত্রেরই জানা না থাক্‌, শোনা আছে। যা সুপরিচিত তার আর নূতন করে আবিষ্কার করা চলে না, সুতরাং রাধাকুমুদবাবু প্রাচীন ভারতের একরাষ্ট্রীয়তার মূল বৈদিক সাহিত্যে অনুসন্ধান করেছেন, তাঁর পুস্তিকার মৌলিকতা এইখানেই। সুতরাং তিনি অনুসন্ধানের ফলে যে নূতন সত্য আবিষ্কার করেছেন, তা বিনাপরীক্ষায় গ্রাহ্য করা যায় না।

শাস্ত্রকারেরা বেদকে স্মৃতির মূল বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বেদ যে শূদ্ররীতি কিংবা বৌদ্ধনীতির মূল, এ কথা তাঁরা কখনো মুখে আনেন নি; বরং বৌদ্ধাচার্যেরা যখন বেদের কোনো উৎসন্ন শাখা থেকে বৌদ্ধধর্ম উদ্ভূত হয়েছে এই দাবি করতেন, তখন বৈদিক ব্রাহ্মণেরা কানে হাত দিতেন। অথচ এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, ইতিহাস যে প্রাচীন সাম্রাজ্যের পরিচয় দেয় তা বৌদ্ধযুগে ব্রাত্যদেশে শূদ্র-ভূপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মগধের নন্দবংশও শূদ্রবংশ, মৌর্যবংশও শূদ্র-বংশ ছিল। এবং অশোক সমগ্র ভারতবর্ষে শুধু রাজচক্র নয় ধর্মচক্রেরও স্থাপনা করে সসাগরা বসুন্ধরার সার্বভৌম চক্রবর্তীর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সুতরাং একরাষ্ট্রীয়তার মূল বৈদিক মনে পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে স্বতই সন্দেহ উপস্থিত হয়।

বৌদ্ধযুগের পূর্বে কোনো একরাটের পরিচয় ইতিহাস দেয় না। কিন্তু ইতিহাসের পশ্চাতে কিংবদন্তি আছে; সেই কিংবদন্তির সাহায্যে, দেশের বিশেষ-কোনো ঘটনা না হোক, জাতির বিশেষ মনোভাবের পরিচয় আমরা পেতে পারি। রাধাকুমুদবাবু ব্রাহ্মণ এবং শ্রৌত সূত্র প্রভৃতি নানা বৈদিক গ্রন্থ থেকে রাজনীতি সম্বন্ধে আর্যজাতির মনোভাব উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন।

রাধাকুমুদবাবুর দাখিলি বৈদিক দলিলগুলির কোনো তারিখ নেই, সুতরাং তার সবগুলি যে মাগধসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পূর্বে লিখিত হয়েছিল, তা বলা যায় না। অতএব কোনো বিশেষ ব্রাহ্মণগ্রন্থ বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভূত হলেও তার প্রতি বাক্য যে বৈদিক মনোভাবের পরিচয় দেয় এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না। ওরূপ দলিলের বলে তর্কিত বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা অসম্ভব, বিশেষত যখন তাঁর সংগৃহীত দলিল তাঁর মতের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয়। রাধাকুমুদবাবুর প্রধান দলিল হচ্ছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ঐ গ্রন্থেই তিনি সাম্রাজ্য শব্দের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, এবং সেই শব্দই হচ্ছে তাঁর মতের মূলভিত্তি। উক্ত ব্রাহ্মণের একখানি বাংলা অনুবাদ আছে; তারই সাহায্যে রাধাকুমুদবাবুর মত যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে। সম্রাট্ কাকে বলে, তার পরিচয় ঐ ব্রাহ্মণে এইরূপ আছে—

পূর্ব দিকে প্রাচ্যগণের যে-সকল রাজা আছেন তাঁহারা দেবগণের ঐ বিধান অনুসারে সাম্রাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হন, অভিষেকের পর তাঁহারা সম্রাট্ নামে অভিহিত হন।[১]

রাধাকুমুদবাবু বলেন যে, এ স্থলে মাগধসাম্রাজ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যদি তাঁর উক্ত অনুমান গ্রাহ্য হয় তা হলে প্রাচীন ভারতসাম্রাজ্যের বৈদিক ভিত্তি ঐ এক কথাতেই নষ্ট হয়ে যায়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নানারূপ রাজ্যের উল্লেখ আছে, যথা : রাজ্য, সাম্রাজ্য, ভৌজ্য, স্বারাজ্য, বৈরাজ্য, পারমেষ্ঠ্য রাজ্য, মাহারাজ্য ইত্যাদি। রাধাকুমুদবাবু প্রমাণ করতে চান যে, ঐ-সকল নাম উচ্চনীচহিসাবে একরাটের অধীন ভিন্ন ভিন্ন রাজপদ নির্দেশ করে। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণগ্রন্থেই প্রমাণ আছে যে, ঐ-সকল নাম হচ্ছে পৃথক্ পৃথক্ দেশের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের নাম। তার সকল দেশই পঞ্চনদের বহির্ভূত, কোনো

[১] ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩৮শ অধ্যায়

কোনো দেশ ভারতবর্ষেরও বহির্ভূত, এবং বিশেষ করে একটি দেশ পৃথিবীর বহির্ভূত। যথা—

পূর্ব দিকে প্রাচ্যগণের রাজা সম্রাট্, দক্ষিণ দিকে সত্বৎগণের রাজা ভোজী; পশ্চিম দিকে নীচ্য ও অপাচ্যদিগের রাজা স্বরাট্; উত্তর দিকে হিমবানের ওপারে যে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র জনপদ আছে, তাহারা দেবগণের ঐ বিধানানুসারে বৈরাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হয়, অভিষেকের পরে তাহারা বিরাট নামে অভিহিত হয়। মধ্যমদেশে সবশ উশীনরগণের ও কুরুপাঞ্চালগণের যে-সকল রাজা আছেন তাঁহারা রাজা নামে অভিহিত হন। এবং ঊর্ধ্বদেশে (অন্তরীক্ষে) ইন্দ্র পারমেষ্ঠ্য লাভ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত উদ্ধৃত বাক্যগুলি থেকে দেখা যায় যে, দেশভেদ অনুসারে সে যুগের রাজাদের নামভেদ হয়েছিল, পদমর্যাদা অনুসারে নয়। উক্ত ব্রাহ্মণে একরাট্ শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সে একরাট্, একসঙ্গে স্বরাট্ বিরাট্ সম্রাট্, সব রাট্ হতে পারতেন; অর্থাৎ তিনি স্বদেশ বিদেশ এবং আকাশদেশের রাজা হতে পারতেন! বলা বাহুল্য, এরূপ একরাটের নিকট ভারতবর্ষের একরাষ্ট্রীয়তার সন্ধান নিতে যাওয়া বৃথা।

আসল কথা এই যে, রাজনীতি অর্থে আমরা যা বুঝি ও চাণক্য যা বুঝতেন, ব্রাহ্মণগ্রন্থে তার নামগন্ধও নেই। বাজপেয় রাজসূয় অশ্বমেধ পুনরভিষেক ঐন্দ্র-মহাভিষেক—এ-সব হচ্ছে যজ্ঞ। এবং এ-সকল যজ্ঞের উদ্দেশ্য রাজ্যস্থাপনা নয়, পুরোহিতকে ভূরি দান করানো এবং ঐরূপ যজ্ঞ দ্বারা যজমানের অভ্যুদয় সাধিত হতে পারে, তাই প্রমাণ করা। রাধাকুমুদবাবু তাঁর পুস্তিকাতে পুরাকালে যাঁরা একরাট্-পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাঁদের নামের একটি লম্বা ফর্দ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হতে তুলেছিলেন। সম্ভবত তিনি উক্ত রাজাগণের সার্বভৌম সাম্রাজ্যলাভ ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মনে করেন, কিন্তু আমরা তা পারি নে। কারণ উক্ত ব্রাহ্মণের মতে ঐন্দ্রমহাভিষেকের বলেই প্রাচীন রাজারা ঐ ইন্দ্রবাঞ্ছিত পদ লাভ করেছিলেন। মন্ত্রবলে এবং যজ্ঞফলে তাদৃশ বিশ্বাস না থাকার দরুন আমরা উক্ত রাজযজমানদের ঐরূপ আত্যন্তিক অভ্যুদয় এবং রাজপুরোহিতদের তদনুরূপ দক্ষিণালাভের ইতিহাসে যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করতে পারি নে। রাধাকুমুদবাবু নামের ফর্দের পাশাপাশি যদি দানের ফর্দটি তুলে দিতেন, তা হলে পাঠকমাত্রেই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কথা কত-দূর প্রামাণিক তা সহজেই বুঝতে পারতেন। ঐন্দ্রমহাভিষেক উপলক্ষে দান করা হত—

বদ্ধ শতকোটি গাভীর মধ্যে প্রতিদিন মাধ্যন্দিন সবনে দুই দুই সহস্র। আটাশি হাজার পৃষ্ঠবাহনযোগ্য শ্বেত অশ্ব। এদেশ ওদেশ হইতে আনীত নিষ্ককণ্ঠী আঢ্য দুহিতার মধ্যে দশ সহস্র।

এরূপ দানের দাতা দুর্লভ হলেও গ্রহীতা আরো বেশি দুর্লভ। এত গোরু এত ঘোড়া এত বনিতা রাখি কোথায় আর খাওয়াই কি, এ প্রশ্ন বোধ হয় দরিদ্র ব্রাহ্মণের মনে উদিত হত। ব্রাহ্মণগ্রন্থ এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, সে যুগে এমন বহু ক্ষত্রিয় ছিলেন যাঁদের নিজেদের কোষবৃদ্ধি এবং অধিকারবৃদ্ধির প্রতি লোভ ছিল, এবং তাঁরা ব্রাহ্মণদের তন্তরমন্তরজাদুতে বিশ্বাস করতেন। ঐতরেয়

ব্রাহ্মণে যে সাম্রাজ্যের উল্লেখ আছে তা ক্ষত্রিয়ের বাহুবল বুদ্ধিবল ও চরিত্রবল দ্বারা নয়, ব্রাহ্মণের মন্ত্রবলের দ্বারা লাভ করবার বস্তু। কারণ শত্রুনাশের জন্য তাঁদের যুদ্ধ করা আবশ্যক হত না, ব্রহ্ম-পরিমর-কর্ম প্রভৃতি অভিচারের দ্বারাই সে কামনা সিদ্ধ হত। এই অতীত সাহিত্যের ভিত্তির উপর যদি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তা হলে আমাদের মনোজগতের গন্ধর্বপুরী চিরকাল আকাশেই ঝুলবে।

আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার নূতন মদ নিত্যই সংস্কৃত সাহিত্যের পুরোনো বোতলে ঢালছি। আমরা স্পেন্সরের বিলেতি মদ শংকরের বোতলে ঢালি Comte কঁতের ফরাসি মদ মনুর বোতলে ঢালি, এবং তাই যুগসঞ্চিত সোমরস বলে পান করে তৃপ্তিও লাভ করি মোহও প্রাপ্ত হই। কিন্তু এই ঢালাঢালি এবং ঢলাঢলিরও একটা সীমা আছে। বিস্‌মার্কের জর্মান মদ ব্রাহ্মণের যজ্ঞের চমসে ঢালতে গেলে আমরা সে সীমা পেরিয়ে যাই। ও-হাতায় এ-জিনিস কিছুতেই ধরবে না। ইংরেজি শিক্ষার প্রসাদে আমরা ব্রাহ্মণসাহিত্যের আধিদৈবিক ব্যাপার-সকলের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করতে পারি, এবং চাই কি তাতে কৃতকার্যও হতে পারি; কিন্তু শুধু ইংরেজি শিক্ষা নয় তদুপরি ইংরেজি ভাষার সাহায্যেও তার 'আধি-রাষ্ট্রিক' ব্যাখ্যা করতে পারি নে।

এতদিন প্রাচীন ভারতের নাম উল্লেখ করবামাত্রই বর্ণাশ্রমধর্ম, ধ্যান-ধারণা নিদিধ্যাসন— এই-সকল কথাই আমাদের স্মরণপথে উদিত হত, এবং বঙ্গ সাহিত্যে তারই গুণ-কীর্তন করে আমরা যশ ও খ্যাতি লাভ করতুম। ইম্‌পীরিয়ালিজ্‌ম্ নামক আহেল-বিলাতি পদার্থ পুরাকালে এদেশে ছিল, এরূপ কথা পূর্বে কেউ বললে তার উপর আমরা খড়্‌গহস্ত হয়ে উঠতুম, কেননা ওরূপ কথা আমাদের দেশভক্তিতে আঘাত করত। বৈরাগ্যের দেশ ঐহিক ঐশ্বর্যের স্পর্শে কলুষিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আজ যে নবদেশভক্তি ঐ ইম্‌পীরিয়ালিজ্‌মের উপর এত ঝুঁকেছে, তার একমাত্র কারণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আবিষ্কার। উক্ত গ্রন্থ থেকেই আমরা এই জ্ঞান লাভ করেছি যে, ইউরোপীয় রাজনীতির যা শেষ কথা ভারতবর্ষের রাজনীতির তাই প্রথম কথা। এই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করে আমাদের চোখ এতই ঝলসে গেছে যে, আমরা সকল তন্ত্রে সকল মন্ত্রে ঐ সাম্রাজ্যেরই প্রতিরূপ দেখছি। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের চোখ যখন আবার প্রকৃতিস্থ হবে তখন আমরা এই প্রাচীন ইম্‌পী-রিয়ালিজ্‌ম্‌কেও খুঁটিয়ে দেখতে পারব এবং কৌটিল্যকেও জেরা করতে শিখব। ইতিমধ্যে এই কথাটি আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, চন্দ্রগুপ্ত রাজনীতির ক্ষেত্রে যে মহাভারত রচনা করেছিলেন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র শুধু তারই ভাষ্য। যে মনো-ভাবের উপর সে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে মনোভাব বৈদিক নয়, সম্ভবত আর্যও নয়। মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় যে, উক্ত অর্থশাস্ত্রকারের মানসিক প্রকৃতি এবং ধর্মশাস্ত্রকারদের প্রকৃতি এক নয়।

সে পার্থক্য যে কোথায় ও কতখানি তা আমি একটিমাত্র উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়ে দেব।

সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম শব্দের অর্থ law, এবং শাস্ত্রকারদের মতে ল-এর মূল হচ্ছে বেদ স্মৃতি সদাচার ও আত্মতুষ্টি। রাজশাসন অর্থাৎ লেজিস্‌লেশন যে ধর্মের মূল হতে পারে, এ কথা ধর্মশাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নি। রাজা ধর্মের রক্ষক, স্রষ্টা নন। অপর পক্ষে কৌটিল্যের মতে রাজশাসন সকল ধর্মের উপরে। এ কথা বৈদিক ব্রাহ্মণ কখনোই মেনে নেন নি, কেননা তাঁদের মতে ধর্মের মূল হচ্ছে বেদ; অতএব ধর্ম অপৌরুষেয়। তার পরে আসে স্মৃতি, অর্থাৎ আর্যঋষিদের স্মৃতি; তার পর সদাচার, অর্থাৎ আর্যদের কুলাচার; তার পর আত্মতুষ্টি, অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের আত্মতুষ্টি। এক কথায় ধর্মশাস্ত্রের মতে 'পারম্পর্যক্রমাগত' আর্য-আচারই একমাত্র এবং সমগ্র ল। যাঁরা এরূপ মনোভাব পোষণ করতেন, তাঁরা চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং চাণক্য কর্তৃক ব্যাখ্যাত রাজনীতি কখনোই স্বচ্ছন্দমনে গ্রাহ্য করতেন না। সম্ভবত এই কারণেই চাণক্য নিজে ব্রাহ্মণ হলেও সংস্কৃত সাহিত্যে হিংসা প্রতিহিংসা ক্রোধ দ্বেষ ক্রূরতা ও কুটিলতার অবতার-স্বরূপ বর্ণিত হয়েছেন, এবং একই কারণে ব্রাহ্মণসমাজে তাঁর অনাদৃত গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম এবং সেইসঙ্গে মৌর্যসাম্রাজ্যের অধঃপতনের সকল কারণ আমরা অবগত নই। যখন সে ইতিহাস আবিষ্কৃত হবে, তখন সম্ভবত আমরা দেখতে পাব যে, এ ধ্বংসব্যাপারে বৈদিক ব্রাহ্মণের যথেষ্ট হাত ছিল।

এ কথা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ভারতবাসী আর্যদের কৃতিত্ব সাম্রাজ্যগঠনে নয়, সমাজগঠনে; এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় শিল্পে-বাণিজ্যে নয়, চিন্তার রাজ্যে। শাস্ত্রের ভাষায় বলতে হলে 'পৃথিবীর সর্বমানব'কে আর্য-আচার শিক্ষা দেওয়া এবং সেই আচারের সাহায্যে সমগ্র ভারতবাসীকে একসমাজভুক্ত করাই ছিল তাঁদের জীবনের ব্রত। তার ফলে, হিন্দুসমাজের যা-কিছু গঠন আছে তা আর্যদের গুণে, এবং যা-কিছু জড়তা আছে তাও তাঁদের দোষে। এই বিরাট সমাজের ভিতর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও প্রভুত্ব রক্ষা করবার জন্য তাঁরা যে দুর্গ গঠন করেছিলেন, তাই আজ আমাদের কারাগার হয়েছে। দর্শনে বিজ্ঞানে কাব্যে অলংকারে অভিধানে ব্যাকরণে তাঁদের অপূর্ব কীর্তি, যে ভাষার তুলনা জগতে নেই সেই সংস্কৃত ভাষায়, অক্ষয় হয়ে রয়েছে। এ দেশের প্রাচীন আর্যেরা যে সাম্রাজ্যের চাইতে সমাজকে, এবং সমাজের চাইতেও মানুষের আত্মাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, তার জন্য সমাজের লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই; কারণ বর্তমানে ইউরোপের মনেও এ ধারণা হয়েছে যে, political problemsএর অপেক্ষা social problemsএর মূল্য কিছু কম নয়। এবং শাসনযন্ত্রের চাইতে মানুষের মূল্য ঢের বেশি।

আষাঢ় ১৩২১

ভারতবর্ষ সভ্য কি না

সেকালে ভারতবর্ষ ছিল মীমাংসার যুগ, একালে হয়েছে সমস্যার। এ কথা যে সত্য, এতগুলো কমিশনই তার প্রমাণ। এই আজকের দিনে পাঁচ-পাঁচটা কমিশনের প্রসাদে পাঁচ-পাঁচটা সমস্যা রাজ-দরবারে টাঙানো রয়েছে; যথা: ১ চাকরির সমস্যা. ২ স্বরাজের সমস্যা, ৩ অরাজকতার সমস্যা, ৪ শিল্পের সমস্যা, ৫ শিক্ষার সমস্যা; তার উপর আবার এসে জুটেছে বিয়ের সমস্যা।

এর পর জন্ম মৃত্যু বাদে দুনিয়ার আর কোন্ সমস্যা বাকি রইল? ও-দুটির যে কোনো সমস্যা নেই, তার কারণ ও-দুটিই হচ্ছে রহস্য। তবে এ দেশে জন্মটা বড়ো রহস্য না মৃত্যুটা বড়ো, এ বিষয়ে একটা তর্ক অবশ্য উঠতে পারে। কিন্তু ওঠে না এইজন্য যে, তার মীমাংসাও স্পষ্ট। আমাদের পক্ষে ও-দুইই সমান।

এ যুগ সমস্যার যুগ, বিশেষ করে এই কারণে যে. এ যুগে অধিকারীভেদ নেই। জীবন, তা সে ব্যক্তিগতই হোক আর জাতিগতই হোক, চিরকালই একটা সমস্যা; কিন্তু সেকালে এ সমস্যা নিয়ে মাথা বকাত দু-চার জন; আর একালে কোনো বিষয়ে একটা সমস্যা উঠলে আমরা সকলে মিলে তার মীমাংসা করতে বাধ্য। যেকালে সকলের সকল বিষয়ে মত দেবার অধিকার আছে, সেকালে কোনো বিষয়েই কারো চুপ করে থাকবার অধিকার নেই। যদি বল, যার নিজের একটা মত গড়বার সামর্থ্য নেই, এক কথায় যার মত ব'লে কোনো পদার্থই নেই, সে সে-পদার্থ দান করে কি ক'রে। তার উত্তর, মনের ঘরে যার শূন্য আছে, সে শূন্যই দিতে পারে; শুধু যে দিতে পারে তাই নয়, দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য তার পক্ষে তা দেওয়া একান্ত কর্তব্য। একের পিছনে শূন্য বসালে তা যে দশগুণ বেড়ে যায়. এ কথা কে না জানে। সুতরাং যার হোক একটা মতের পিছনে আমরা যদি ক্রমান্বয়ে শূন্য বসিয়ে যাই, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তার দশগুণ করে মূল্য বেড়ে যাবে।

সত্য কথা বলতে গেলে, রাজনৈতিকপ্রমুখ বিষয়ে অধিকাংশ লোকের পক্ষে কোনোরূপ মত না থাকাটাই শ্রেয়ঃ। সকলেরই যদি একটা-না-একটা স্বমত থাকে, তা হলে নানা মতের সৃষ্টি হয়; অপর পক্ষে অধিকাংশ লোক মতশূন্য হলে যা সৃষ্টি হয়, তার নাম লোকমত। আর, এ কথা বলা বাহুল্য যে, একালে লোকমতই হচ্ছে একমাত্র কেজো মত, কেননা ও-মতের অভাবে হয় কোনো বিলই পাস হয় না, নয় সকল বিলই পাস হয়।

এর কারণও খুঁজে বার করতে হবে না। নানা মত পরস্পরের সঙ্গে কাটাকাটি গিয়ে বাকি থাকে শুধু শূন্য. আর শূন্যে শূন্যে যোগ দিলে দাঁড়ায় গিয়ে বিরাট একে। এই সত্যই যে সার সত্য, তার প্রমাণ দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক. দুরকম অদ্বৈতবাদের মধ্যে সমান পাওয়া যায়।

উপরে যে-সব সমস্যার ফর্দ দেওয়া গেছে, তার উপর সম্প্রতি আর-একটি সমস্যা এসে জুটেছে, যার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, তার কোনো মীমাংসা নেই অথচ অনেক তর্ক আছে।

সমস্যাটা হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষ সভ্য কি না। দেখতে পাচ্ছেন সমস্যাটা কত ঘোরতর, কত গুরুতর। এ সমস্যা অবশ্য রাজনৈতিকও নয়, সামাজিকও নয়, কিন্তু সকলপ্রকার রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা ওরই অন্তর্ভূত।

যদি জিজ্ঞাসা করেন, যার মীমাংসা নেই, এমন সমস্যা ওঠে কেন। তার উত্তর একজনে এর পূর্বমীমাংসা করে দিয়েছেন বলেই আর পাঁচজনে তার উত্তরমীমাংসা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। ফলে, ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে একটা বিষম তর্কে।

উইলিয়ম আর্চার নামক জনৈক ধনুর্ধর ইংরেজি লেখক এবং প্রবীণ ভাবুক, ভারতের নানা দেশ পর্যটন করে অবশেষে উপনীত হয়েছেন এই সিদ্ধান্তে যে, ভারতবাসীরা হচ্ছে অসভ্য জাতিদের মধ্যে সব-চাইতে সভ্য এবং সভ্য জাতিদের মধ্যে সব-চাইতে অসভ্য।

অমনি আমরা অস্থির হয়ে উঠেছি।

এ কথায় কিন্তু বিচলিত হবার কোনো কারণ আমি দেখতে পাই নে। উইলিয়ম আর্চারের মত যদি সত্য বলেই ধরে নেওয়া যায়, তাতেই বা ক্ষতি কি। আমরা যদি সভ্যতার মধ্যপথ অবলম্বন করে থাকি, তা হলে তো আমরা আরিস্টটলের মতে ঠিক পথই ধরেছি, বৌদ্ধ মতেও তাই। আর সেকেলে দর্শন যদি বাতিল হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে বলি হেগেলের মতেও দাঁড়ায় এই যে, সভ্যতা (thesis) + অসভ্যতা (antithesis) = সভ্যাসভ্যতা (synthesis) ; অর্থাৎ আমাদের সভ্যাসভ্যতাটা হচ্ছে synthetic civilization। অতএব সর্বশ্রেষ্ঠ। বেশি অসভ্য হওয়া যে ভালো নয়, সে তো পুরানো সত্য ; আর বেশি সভ্য হওয়াও যে মারাত্মক, এই নতুন সত্য তো ইউরোপে হাতে-হাতে প্রমাণ হয়ে গেল। এক দিকে সভ্যতা আর-এক দিকে অসভ্যতা, এই দুই চাপের ভিতর পড়াটা অবশ্য সুখের অবস্থা নয় ; কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থা যে সুখের অবস্থা, এমন কথা আর যেই বলুক, আমরা তো কখনো বলি নে।

আর-এক কথা, কি সভ্যতা কি অসভ্যতা এ দুয়ের কোনোটিরই ভিতর মানুষের শান্তি নেই— না দেহের না মনের। যারা নিজেদের অসভ্য বলে জানে, তারা সভ্য হবার জন্য লালায়িত হয় ; আর যারা নিজেদের সভ্য বলে জানে, তারা স্বাভাবিক হবার জন্য লালায়িত হয়। পুরাকালে ভারতবর্ষ যখন অতিসভ্য হল, তখন ভারতবাসী সভ্যতার শিকলি কেটে বনে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল ; এবং একই অবস্থায় একই কারণে গ্রীকরা হল ফিলজফর আর রোমানরা খৃস্টান। তার পর যখন নব রোমক-খৃস্টান-সভ্যতা পুরোপুরি গড়ে উঠল, তখন রুসো সকলকে পরামর্শ দিলেন আবার প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে— অমনি দেশসুদ্ধ লোক মেতে উঠল। অপর পক্ষে যাদের জ্ঞান তারা অসভ্য, তারা যে সভ্য হবার জন্য আঁকুপাঁকু

করে তার প্রমাণ কি আর উদাহরণের অপেক্ষা রাখে। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, শান্তি যদি কোথাও থাকে তো সভ্যতা আর অসভ্যতার মিলনক্ষেত্রে; কেননা ও-ক্ষেত্রে অসভ্যতা সভ্যতার এবং সভ্যতা অসভ্যতার তেজ বিলকুল ও বেমালুম মেরে দেয়। সুতরাং একাধারে সভ্য এবং অসভ্য হওয়াটাই বুদ্ধিমান জাতের কাজ; আর আমাদের মাথায় যে মগজ নেই, এমন কথা উইলিয়ম আর্চারও বলেন না।

আমার এ-সব কথা যতই যুক্তিযুক্ত হোক-না কেন, আমার মত কেউ গ্রাহ্য করবেন না। কেননা এক দল প্রমাণ করতে যেমন ব্যস্ত যে আমরা অতি-সভ্য, আর-এক দল প্রমাণ করতে তেমনি ব্যস্ত যে আমরা অতি-অসভ্য। সুতরাং এ দুই দলকে কেউ ঠেকাতে পারবে না; তাঁরা তর্ক করবেনই, শুধু উইলিয়ম আর্চারের সঙ্গে নয়, পরস্পরের সঙ্গেও।

এ উভয়কেই আমি বলি, স্থিরো ভব। আমরা যে অসভ্য, এ প্রমাণ করবারই বা সার্থকতা কি। আর আমরা যে সভ্য, এ প্রমাণ করবারই বা সার্থকতা কি। কেউ যদি প্রমাণ করে দেয় যে আমরা অসভ্য, তা হলেই কি আমাদের অস্তিত্ব লোপ পাবে, না, আমাদের জীবনের সকল সমস্যা উড়ে যাবে? তা অবশ্য কখনোই হবে না, উপরন্তু আর-একটা সমস্যা বাড়বে, সে হচ্ছে সভ্য হবার মহাসমস্যা।

অপর পক্ষে আমরা যদি প্রমাণ করে দিই যে আমরা সভ্য, তা হলেই কি আমাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, না, আমাদের জীবনের সকল সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাবে? তা অবশ্য কখনোই হবে না। কেননা নিজের সার্টিফিকেট নিজের কোনো কাজে লাগে না, ব্যক্তির পক্ষেও নয় জাতির পক্ষেও নয়। তা ছাড়া নিজের দরখাস্তের বলে, এ ক্ষেত্রে পরের কাছ থেকে ভালো সার্টিফিকেট আমরা কিছুতেই আদায় করতে পারব না। সভ্যতা সম্বন্ধে প্রতি জাত নিজেকে সোঽহং মনে করে, কিন্তু অপর কোনো জাতকে তত্ত্বমসি বলতে প্রস্তুত নয়। তবে প্রাচীন সভ্যতার সম্বন্ধে এ কথা অবশ্য খাটে না। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সুখ্যাতি যে ইউরোপের মুখে আর ধরে না, এ কথা কে না জানে। তার কারণ এই যে, যে সভ্যতা মরে ভূত হয়ে গেছে, উঁচুগলায় তার গুণগান করবার ভিতর কোনো বিপদ নেই; কেননা কোনো জ্যান্ত সভ্যতার উপর ও-সব মরা সভ্যতার কোনো দাবি নেই। প্রাচীন ও মৃত সভ্যতা কোনো বর্তমান সভ্যতার কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারে না, কিন্তু বর্তমান সভ্যতা তার কাছ থেকে ঢের আদায় করে, এবং তার নুন খায় বলেই তার গুণ গায়। ভারতবর্ষের সভ্যতা গ্রীস-রোমের সভ্যতার মতো প্রাচীন হলেও প্রশস্য নয়; কেননা তা মৃত নয়, জীবিত। এ সভ্যতার অমার্জনীয় অপরাধ এই যে, তা আজও বেঁচে আছে, এবং বহুকাল বেঁচে আছে বলে আরো বহুকাল বেঁচে থাকতে চায়; তাই তার দাবির আর অন্ত নেই। এ সভ্যতার সপক্ষে ইউরোপের সার্টিফিকেট বার করা অসম্ভব। আর যদিই বা করা যায়, তাতেই বা কি লাভ? আমাদের জাতীয় সমস্যার আশু মীমাংসা ততটা নির্ভর করবে না আমাদের প্রাচীন সভ্যতা কিংবা অসভ্যতার উপর যতটা নির্ভর করবে ইউরোপের বর্তমান সভ্যতা কিংবা অসভ্যতার উপর।

যদি কেউ বলেন যে, ইউরোপের খাতিরে নয়, সত্যের খাতিরে আমরা প্রমাণ

করতে চাই যে, ভারতবর্ষ সভ্য—তার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, ও চেষ্টায় উলটো উৎপত্তি হবারই সম্ভাবনা বেশি। মানুষ যেমন মুখের জোরে নিজেকে অপরের চাইতে বেশি ভদ্র প্রমাণ করতে গিয়ে শুধু অভদ্রতারই পরিচয় দেয়, জাতিও তেমনি নিজেকে অপরের চাইতে বেশি সভ্য প্রমাণ করতে গিয়ে শুধু অসভ্যতারই পরিচয় দেয়। এর প্রথম কারণ, সভ্যতা প্রমাণ করতে হয় হাতে-কলমে, কাগজে-কলমে নয়; কেননা ও-বস্তু আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয় যুক্তির বলে নয়, কর্মের ফলে। এর দ্বিতীয় কারণ, মানুষ সভ্য হলেও মানুষই থাকে; সভ্য মানবেরও সত্তার মূলে রয়েছে আদিম মানব। সুতরাং মানুষ যখন অবিশ্বাসী লোকের সুমুখে নিজেকে সভ্যমানব বলে খাড়া করতে যায়, তখন প্রায়ই দেখা যায় যে, ও-ক্ষেত্রে যাকে খাড়া করা হয় সে হচ্ছে আদিম মানব; কেননা এরকম কাজ মানুষে এক রাগের মাথায় ছাড়া আর-কোনো অবস্থায় করে না। প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা থাকলে মানুষে যে এ কাজ করে না, তার কারণ ও-কাজ করা হয় অনাবশ্যক, নয় নিরর্থক। সভ্যতা ব'লে যদি মানবসমাজে কোনো-এক বস্তু থাকে, তা হলে সভ্যসমাজ মাত্রেই তার সঙ্গে পরিচিত। যা প্রত্যক্ষ, তার অস্তিত্ব প্রমাণ অনাবশ্যক। আর অসভ্যের কাছে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে যাওয়া বিড়ম্বনা, কেননা কোনো প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা অসভ্যের কাছে সভ্যতাকে প্রত্যক্ষ করে তোলা যাবে না।

মতান্তরে সভ্যতা এক বস্তু নয়, কিন্তু দেশভেদে ও কালভেদে সভ্যতা হরেক রকমের হয়ে থাকে। সভ্যতার ভিতরও বিশিষ্টতা আছে, এবং সভ্যতায় আর সভ্যতায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্থক্য এত বেশি যে, তাদের মিলন কস্মিন্‌কালেও হবে না। এ মতের চরম বাণী হচ্ছে কিপ্‌লিঙের এই কথা—

The East is East and the West is West, and never the twain shall meet.

এ কথা দেশে-বিদেশে অনেকে বেদবাক্য বলে গ্রাহ্য করেছেন, কিন্তু আমার কাছে বরাবর তা নিরর্থক প্রলাপ বলেই মনে হয়েছে, কেননা ও-কথার অর্থ আমি কখনো বুঝতে পারি নি। সম্প্রতি বৃটিশ সভ্যতার একটি অগ্রগণ্য মুখপত্রে তার ব্যাখ্যা দেখে নিশ্চিন্ত হলুম। SPECTATOR লিখেছেন, কিপ্‌লিঙের ও-কথার সাদা অর্থ হচ্ছে।

Black is black and white is white.

এ ব্যাখ্যা যে অতি বিশদ, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু সেইসঙ্গে এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, স্পেক্টেটর বৃটিশ সভ্যতার পরিচয় দিতে গিয়ে শুধু বৃটিশ অসভ্যতারই পরিচয় দিয়েছেন। এর পর নিজের সভ্যতার বিশিষ্টতার ব্যাখ্যান করতে সকলেরই ভয় পাওয়া উচিত।

কোনো সভ্যতার বিশিষ্টতার প্রতি বিশেষ করে নজর দেওয়াতেও বিপদ আছে। ও অবস্থায় বিশিষ্টতাকেই সভ্যতা বলে মানুষের সহজে ভুল হয়। অপর সমাজের সঙ্গে নিজের সমাজ যে অংশে বিভিন্ন, সেই অংশকেই নিজের সভ্যতার প্রধান অঙ্গ বলে অহংকার করবার লোভ যায়। শুধু তাই নয়, তখন সেই অঙ্গকেই যেন-তেন-প্রকারেণ রক্ষা করবার জন্য মানুষ বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে; আর তার ফলে যদি

সমাজের সকল অংগ পংগু হয়ে যায়, তাতেও সমাজ তার নিজের গোঁ ছাড়ে না। উদাহরণ স্বরূপ, এই প্যাটেল-বিলের বিপক্ষ দলের কথাই ধরা যাক-না। এ'রা বলেন, জাতিভেদ-প্রথা যখন হিন্দুসমাজ ছাড়া অপর কোনো সভ্যসমাজে নেই, তখন হিন্দুসভ্যতার ভিত্তিই হচ্ছে জাতিভেদ-প্রথা। অতএব হিন্দুসভ্যতার বিশিষ্টতা, অর্থাৎ জাতিভেদ-প্রথা, বজায় রাখতেই হবে, তার জন্য যদি হিন্দুজাতি ধূলোশায়ী হয়, তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। এ কথা বলাও যা, আর স্পেক্টেটরের কথায় সায় দেওয়াও তাই। স্পেক্টেটরের এ মত শুধু একমাত্র বর্ণভেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ওরকম ঢেরা-সই দেওয়াতে বর্ণধর্মজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে কিন্তু বর্ণ-জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না, ধর্মজ্ঞানেরও নয়। জাতিভেদ-প্রথা হিন্দুসমাজের গোড়ার কথা হলেও হিন্দুসভ্যতার শেষ কথা নাও হতে পারে।

সভ্যতার অবশ্য নানা রূপ, বিশেষ্য ও বিশেষণ আছে; কিন্তু তার ক্রিয়া এক, এবং সে ক্রিয়া হচ্ছে মানবজীবনের মুখ্য ক্রিয়া, to be। এ কথায় অবশ্য তাঁরা আপত্তি করবেন, যাঁদের বিশ্বাস মানবপ্রকৃতির মূল ধাতু হচ্ছে to have। কিন্তু এ'রা ভুলে যান যে, জীবনে কিছু পেতে হলে তার আগে কিছু হতে হয়। এক সভ্যতার সংগে আর-এক সভ্যতার গড়নের পার্থক্য ঘটে শুধু বাহ্যবস্তুর আনুকূল্যে এবং প্রতিকূলতায়। এ পার্থক্য প্রাচীনকালে যেমন স্থূল ছিল, বর্তমানে তেমনি সূক্ষ্ম হয়ে আসছে; তার প্রথম কারণ, একালে এক জাতির সংগে আর-এক জাতির দেশের ও সেইসংগে দেহের এবং মনেরও ব্যবধান কমে আসছে। আর তার দ্বিতীয় কারণ এই যে, বর্তমানে মানুষ বস্তুজগতের ততটা অধীন নয়, বস্তুজগৎ মানুষের যতটা অধীন। জাতিতে জাতিতে মনের ও ব্যবহারের পার্থক্য কমে আসছে বলে এ ভয় পাবার দরকার নেই যে, মানবজীবন বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়বে। জাতিতে জাতিতে প্রভেদ যেমন কমে আসছে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ তেমনি বেড়ে চলেছে। এক কথায় বিশিষ্টতা এখন জাতিকে ত্যাগ করে ব্যক্তিকে আশ্রয় করেছে। আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতের মানবসভ্যতা এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গুণে অপূর্ব বৈচিত্র্য লাভ করবে এবং এই বিচিত্রতাই হবে তার বিশিষ্টতা। অন্তত আমাদের সভ্যতার জন্যে সে ভাবনা নেই। ভারতবর্ষ যদি একদেশ হিসেবে ধরা যায়, তা হলে সে দেশের সভ্যতা যুগপৎ হরবোলা ও বহুরূপী হতে বাধ্য।

ভবিষ্যতে যা হবার সম্ভাবনা তা নাও হতে পারে; কিন্তু অতীতে যা হয়ে গেছে তা যে হয়ে গেছে তার আর সন্দেহ নেই। এবং প্রতি প্রাচীন সভ্যতার যে একটা বিশেষ রূপ ও বিশেষ ধর্ম আছে, সে কথাও অস্বীকার করা অসম্ভব। অথচ এ-সকল সভ্যতার সামাজিক ব্যবহার এবং মনোভাবের মিলও বড়ো কম নয়। পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে গ্রীক রোমান এবং হিন্দু সভ্যতার ভিতর ঠিক ততখানি মিল আছে গ্রীক লাটিন ও সংস্কৃত ভাষার ভিতর যতখানি মিল আছে; এবং সে মিল প্রথমত কম নয়, দ্বিতীয়ত তা ধাতুগত। যদিচ আমি পণ্ডিত নই, তবুও এ মত গ্রাহ্য করতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই। তার কারণ, আমার বিশ্বাস, সকল সভ্যতারই ধাতু এক, প্রত্যয় শুধু আলাদা। সে যাই হোক, যে-ক'টি প্রাচীন সভ্যতার সংগে আমার পরিচয় আছে, সে সবগুলিই, আমার মনে হয়, একজাতীয়, অর্থাৎ আমার

কাছে তার প্রতিটি হচ্ছে এক-একখানি কাব্য। কাব্যে-কাব্যে যে প্রভেদ থাকে এদের পরস্পরের ভিতর সেই প্রভেদ মাত্র আছে। আমার মতে গ্রীক সভ্যতা হচ্ছে নাটক, রোমান সভ্যতা মহাকাব্য, ইহুদি সভ্যতা লিরিক এবং অর্বাচীন যুগের ইতালীয় সভ্যতা সনেট; আর ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা হচ্ছে রূপকথা। সভ্যতার সঙ্গে কাব্যের তুলনা দেওয়ায় যদি কেউ আপত্তি করেন, তা হলে বলি, ও-তুলনা একটা খামখেয়ালির ব্যাপার নয়। আমরা প্রাচীন সভ্যতার যে-সব মূর্তি গড়ি—হয় পূজো করবার জন্য, নয় মনের ঘর সাজাবার জন্য—অতীত শুধু তার উপাদান জোগায়, তাও আবার অতি স্বল্পমাত্রায়; সেই উপাদানকে আমাদের কল্পনাশক্তি গড়ন ও রূপ দেয়, এবং সেই রূপকে আমরা আমাদের হৃদয়রাগে রঞ্জিত করি। কাব্যরচনার পদ্ধতিও ঐ।

সত্য কথা এই যে, সভ্যতা হচ্ছে একটা আর্ট এবং সম্ভবত সব-চাইতে বড়ো আর্ট। কেননা এ হচ্ছে জীবনকে স্বরূপ করে তোলবার আর্ট, আর বাদ-বাকি যত-কিছু শিল্পকলা আছে, সে সবই এই মহা আর্ট হতে উদ্ভূত এবং তার কর্তৃকই পরিপুষ্ট।

এ কথা অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা এবং দার্শনিকেরা মানবেন না; কেননা বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস, সভ্যতা জন্মে মাটির গুণে; আর দার্শনিকের বিশ্বাস, ও-বস্তু পড়ে আকাশ থেকে। এঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কাব্যের জন্মদাতা যেমন কবি, সভ্যতার জন্মদাতাও তেমনি মানুষ। এ বস্তুর তত্ত্ব বিজ্ঞান-দর্শন কখনো আবিষ্কার করতে পারবে না, কেননা ও হচ্ছে জীবনের একটি postulate, জ্ঞানের axiom নয়। অর্থাৎ মানুষের মন ছাড়া সভ্যতার অস্তিত্ব আর কোথাও নেই।

সে যাই হোক, এ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সভ্যতার বিশিষ্টতা প্রমাণ করবার কোনোই প্রয়োজন নেই। উইলিয়ম আর্চার প্রভৃতি সে বিশিষ্টতা সম্পূর্ণ মানেন; আমাদের উপর তাঁদের রাগ এই যে, আমরা আমাদের প্রাচীনতা ত্যাগ করে নবীন হবার চেষ্টা করছি। ফলে আমাদের সমাজ এখন হয়েছে প্রবীণ-নবীন ওরফে সভ্যাসভ্য। East এবং West যে ভারতবর্ষে meet করেছে, এই হচ্ছে আমাদের অপরাধ; কেননা এই মিলনের ফলে কতকগুলি দুরন্ত সমস্যা জন্মলাভ করেছে। কিন্তু তার জন্য দায়ী কি আমরা?

পূর্বাপর সভ্যতার এই মিলন ও মিশ্রণ যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার নয়, তার প্রমাণ ইউরোপের বর্তমান সভ্যতাও তো প্রবীণ-নবীন, ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী যার নাম দিয়েছেন antico-modern। বর্তমান ইউরোপীয়েরা যে-অংশে ও যে-পরিমাণে জ্ঞানে গ্রীক কর্মে রোমান ও ভক্তিতে ইহুদি, সেই অংশে ও সেই পরিমাণে তারা সভ্য, এবং বাদবাকি অংশে তারা হচ্ছে শুধু সাদা মানুষ।

যদি বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা অ্যান্টিকো-মডার্ন হতে পারে, তো ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সভ্যতা কেন যে অ্যান্টিকো-মডার্ন হতে পারবে না, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। তবে এ ক্ষেত্রে ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের একটু প্রভেদ আছে। ইউরোপ তার নবীন সভ্যতার গায়ে প্রাচীন সভ্যতার কলম বসিয়েছে, অপর পক্ষে ভারতবর্ষ তার প্রাচীন সভ্যতার গায়ে নবীন সভ্যতার কলম বসাচ্ছে। ফল কোন্‌টায় ভালো ফলবে,

সে কথা বলতে পারে শুধু বৃক্ষায়ুর্বেদীরা। তবে সহজ বুদ্ধিতে তো মনে হয় যে, নূতনের ঘাড়ে পুরাতনকে ভর করতে দেওয়ার চাইতে নূতনকে পুরাতনের কোলে স্থান দেওয়াই বেশি স্বাভাবিক।

সুতরাং আমরা সভ্য কি অসভ্য, সে বিষয়ে আমাদের মাথা বকাবার দরকার নেই, কেননা এখন আমাদের মীমাংসা করতে হবে অন্য সমস্যার। প্রথমে যে-ক'টি সমস্যার উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে যে তিনটি বিল-আকার ধারণ করেছে তাদের সম্বন্ধেও বেশি কিছু ভাববার নেই, কেননা এ কথা নিশ্চিত যে, রাউলাট-বিল পাস হবে প্যাটেল-বিল হবে না, এবং রিফর্ম্-বিল পাস হবে ও হবে না। যে দুটি বাকি থাকল, শিক্ষা ও শিল্প, সে দুটিই হচ্ছে এ যুগের আসল সমস্যা; কারণ এ দুটির মীমাংসার ভার অনেকটা আমাদের হাতে, এবং এ দুটির আমরা যদি সুমীমাংসা করতে পারি তা হলে আমরা সভ্য কি না, সে প্রশ্ন আর উঠবে না।

ফাল্গুন ১৩২৫

ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফি

একটি পারিবারিক সমিতিতে পঠিত

হে সমিতির কুমার ও কুমারী-গণ, তোমাদের সমিতির কর্ণধার ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফির সঙ্গে তোমাদের দু কথায় পরিচয় করিয়ে দেবার ভার আমার উপর ন্যস্ত করেছেন। জিয়োগ্রাফি বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত, সাহিত্যের নয়; আর এ কথা সবাই জানে যে, আমি সাহিত্যিক হলেও হতে পারি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক নই। তবে যে আমি এ অনুরোধ রক্ষা করবার জন্য উদ্যত হয়েছি, তার কারণ অনধিকারচর্চা করবার কু অভ্যাস ও দুঃসাহস দুই আমার আছে।

কিন্তু প্রথমেই এক মুশকিলে পড়েছি। সকল বিজ্ঞানের মতো জিয়োগ্রাফিরও একটা বিশেষ পরিভাষা আছে। সে পরিভাষা মূলত ইংরেজি। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় যে পরিভাষা আছে, তা হয় সংস্কৃত নয় ইংরেজির অনুবাদ। সে-সব সংস্কৃত কথার অর্থ বুঝতে হলে তাদের আবার মনে মনে ইংরেজি ভাষায় উলটে অনুবাদ করে নিতে হয়। একটি উদাহরণ দিই। অন্তরীপ ও cape, এ দুটি কথাই বাঙালির কাছে সমান অপরিচিত। এ দুয়ের মধ্যে সম্ভবত কেপ্ শব্দটিই তোমরা স্কুল-ঘরে বেশি বার শুনেছ, অতএব তোমাদের কাছে বেশি পরিচিত। অপর পক্ষে উত্তমাশা অন্তরীপ বললে আমরা ভাবতে বসে যাই, জিনিসটা কি। আর ততক্ষণ চিন্তার দায় থেকে অব্যাহতি পাই নে, যতক্ষণ না কেউ বলে দেয় যে, ও হচ্ছে কেপ্ অব গুড হোপ-এর বাংলা নাম। আর শৃঙ্গ-অন্তরীপ (কেপ্ হর্ন) শুনলে তো আমরা অগাধ জলে পড়ি। আর সে জলে পড়লে আর উদ্ধার নেই, কারণ সে জল বরফ জল।

আমাদের পরিভাষার দশা যখন এরূপ মারাত্মক, তখন আমি যতদূর সম্ভব পরিভাষা পরিত্যাগ করে আমার কথা ভাষায় বলতে চেষ্টা করব। যেখানে অগত্যা পরিভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হব, সেখানে ইংরেজি শব্দই ব্যবহার করব। এ প্রস্তাব শুনে আমার হাতে বাংলা ভাষার জাত মারা যাবে ভেবে তোমরা ভীত হোয়ো না। ইংরেজি বিজ্ঞানের পরিভাষাও ইংরেজি নয়, গ্রীক। আর গ্রীক সভ্যতার বয়েস আড়াই হাজার বৎসর। সুতরাং তার স্পর্শে আমাদের ভাষার আভিজাত্য একেবারে নষ্ট হবে না। ভারতবর্ষের সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক সভ্যতার আর-কোনো বিষয়ে মিল না থাকুক, বয়েসে মিল আছে।

ভূমণ্ডল

প্রথমেই আমি তোমাদের কাছে পৃথিবী নামক গোলকটির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব। এ গোলকটি ক্ষিতি আর অপ্—মাটি আর জল—এই দুই ভূতে গড়া! আর এ গোলকের বহিঃপৃষ্ঠের চার ভাগের তিন ভাগ হচ্ছে জল, আর এক ভাগ স্থল।

আমরা অবশ্য পৃথিবী বলতে প্রধানত মাটিই বুঝি। তার প্রমাণ আমরা একে ভূমণ্ডল বলি। এর কারণ আমরা ভূচর জীব, অর্থাৎ মাটির উপর বাস করি। জলচর জীবদের যদি শুধু জল-পিপাসা নয়, সেইসঙ্গে জ্ঞান-পিপাসা থাকত ও সেইসঙ্গে তাদের জ্ঞান তরল ভাষায় ব্যক্ত করবার ক্ষমতা থাকত, তা হলে তারা জিয়োগ্রাফি না রচনা করে রচনা করত হাইড্রোগ্রাফি। আর তারা কবিতা লিখত 'আমার জন্মজলের' উপর। আর আমরা যাকে বলি মধুর রস, তার নাম তারা দিত লবণ রস। এর থেকেই দেখতে পাচ্ছ যে, আমাদের কল্পনা আশা আকাঙ্ক্ষা কতটা মাটিগত, অর্থাৎ আমরা মনে-প্রাণে কতটা জিয়োগ্রাফির অধীন।

পৃথিবীর ভাগ

এখন শোনো, মাটি কিন্তু একলপ্ত ভাবে নেই, খণ্ড খণ্ড ভাবে আছে। প্রাচীন শাস্ত্রকাররা বলেন যে, মেদিনী সপ্তদ্বীপ আকারে ব্যক্ত হয়েছে।

এই দ্বীপ শব্দটার অর্থ তোমরা সবাই জান। যার চারি দিকে জল আর মাঝখানে স্থল, তাকেই আমরা বলি দ্বীপ। এ হিসাবে আজকের দিনে পৃথিবীতে সাতটি নয়, অসংখ্য দ্বীপ আছে। সমুদ্রের মধ্যে থেকে অসংখ্য ছোটোবড়ো দ্বীপ মাথা তুলে রয়েছে।

সুতরাং এ স্থলে সপ্তদ্বীপ অর্থে সাতটি মহাদ্বীপ বুঝতে হবে। এই মহাদ্বীপকে আমরা একালে মহাদেশ বলি। আজকের দিনে আমরা পৃথিবীকে চারটি মহাদেশে ভাগ করি, যথা : ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকা; অস্ট্রেলিয়াকে আমরা আজও মহাদ্বীপ বলেই জানি, মহাদেশ বলে মানি নে।

মহাদেশ বলতে যদি মহাদ্বীপ বোঝায়, তা হলে পৃথিবীতে চারটি নয় তিনটি মাত্র মহাদ্বীপ আছে : প্রথম ইউরেশিয়া, দ্বিতীয় আফ্রিকা, তৃতীয় আমেরিকা। প্লোবের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পাবে যে, গোটা ইউরোপ ও গোটা এশিয়ার ভিতর কোথাও জলের ব্যবধান নেই। এ দুই দেশের জমি একলপ্ত। আর এই আদি মহাদেশটি হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ। এর উত্তরে আর্কটিক সী, দক্ষিণে ইন্ডিয়ান ওশন, পশ্চিমে অ্যাটলান্টিক ও পূর্বে প্যাসিফিক ওশন; আর আফ্রিকার উত্তরে ও পশ্চিমে অ্যাটলান্টিক এবং দক্ষিণে ও পূর্বে ইন্ডিয়ান ওশন। আর আমেরিকার পশ্চিমে প্যাসিফিক, পূর্বে অ্যাটলাণ্টিক, উত্তরে উত্তর-আর্কটিক ও দক্ষিণে দক্ষিণ-আর্কটিক সাগর। ইউরেশিয়ার সঙ্গে অপর দুটি মহাদেশের গড়নেরও একটা স্পষ্ট প্রভেদ আছে। ইউরেশিয়ার বিস্তার পুব হতে পশ্চিমে, অপর দুটির উত্তর হতে দক্ষিণে। অর্থাৎ ইউরেশিয়া লম্বার চাইতে চওড়ায় বেশি: আফ্রিকা ও আমেরিকা চওড়ার চাইতে লম্বায় বেশি। এই আকারভেদ এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের অনেক প্রভেদ ঘটিয়েছে।

তোমরা সবাই জান যে ইউরেশিয়া ও আফ্রিকাকে আমরা প্রাচীন পৃথিবী বলি ও আমেরিকাকে নবীন। এর প্রধান কারণ প্রাচীন পৃথিবীর লোক পাঁচশো বৎসর পূর্বে আমেরিকার অস্তিত্বের কথা জানত না। অতএব, এ নাম শুধু লৌকিক, বৈজ্ঞানিক হিসেবে ঠিক নয়। তা ছাড়া, অনেক বিষয়ে এই নতুন পৃথিবী প্রাচীন

পৃথিবীর ঠিক উলটো। বিলাতে (গ্রীনউইচ) যখন দিনদুপুর, আমেরিকায় (নিউ অর্লিন্স্) তখন রাতদুপুর। কেন এরকম হয়, সে কথা আর আজ বলব না; কারণ তা বোঝাতে হলে আমাকে মাটি থেকে আকাশে উঠতে হবে। এ ব্যাপারের ব্যাখ্যার ভিতর শুধু পৃথিবী নয়, সূর্যচন্দ্রকেও টেনে আনতে হবে। কেননা জিয়োগ্রাফি কতক হিসেবে অ্যাস্ট্রনমির অন্তর্ভূত। আর অ্যাস্ট্রনমি তোমরাও জান না, আমিও জানি নে।

উত্তরখণ্ড দক্ষিণখণ্ড

আর-একটি কথা শোনো। আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে এই বিশ্ব আদিতে ছিল ব্রহ্মাণ্ড নামে একটি অণ্ড। পরে ভগবান সেই অণ্ডকে দ্বিখণ্ড ক'রে তার ঊর্ধ্বখণ্ড দিয়ে স্বর্গ ও অধঃখণ্ড দিয়ে পৃথিবী রচনা করেন, আর এ দুয়ের মধ্যে আকাশ সৃষ্টি করেন। কিন্তু একালে আমরা পৃথিবীকে আধখানা ডিমের সঙ্গে তুলনা করি নে; আমরা বলি পৃথিবীর চেহারা ঠিক একটি কমলালেবুর মতো।

সেই কমলালেবুটিকে যদি ঠিক মাঝখানে কাট, তা হলে এই কাটা জায়গাটার নাম হবে ইকোয়েটর; তার উপরের আধখানার নাম হবে উত্তর হেমিস্ফিয়ার, আর নীচের অংশটির নাম হবে দক্ষিণ হেমিস্ফিয়ার। পৃথিবীর এই দুই খণ্ডের চরিত্র কোনো কোনো বিষয়ে ঠিক পরস্পরের বিপরীত। যথা উত্তরাখণ্ডে যখন গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণাখণ্ডে তখন শীতকাল। তার পর এই দুই খণ্ডের গড়নেও ঢের প্রভেদ আছে। দক্ষিণাখণ্ডে যতখানি মাটি আছে, উত্তরাখণ্ডে প্রায় তার দ্বিগুণ আছে। এর থেকে অনুমান করতে পার যে, উত্তরাখণ্ডের জলবায়ুর সঙ্গে দক্ষিণাখণ্ডের জলবায়ুর বিশেষ প্রভেদ আছে। আর জলবায়ুর প্রভেদ থেকেই ভৌগোলিক হিসেবে এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের প্রভেদ হয়। তোমরা সবাই জান যে, জল ও বায়ু স্থির পদার্থ নয়—ও দুইই চঞ্চল, ও দুয়েরই স্রোত আছে। অপ্ ও মরুতের স্রোতের মূল কারণ হচ্ছে সূর্যের তেজ; কিন্তু ক্ষিতি এই দুই স্রোতকে বাধা দিয়ে তাদের গতি ফিরিয়ে দিতে পারে। সুতরাং পৃথিবীর যে খণ্ডে বেশি পরিমাণ মাটি আছে, সে খণ্ডের জলবায়ুর গতি, যে খণ্ডে জল বেশি, সে দেশ হতে বিভিন্ন।

ইউরেশিয়া

এখন ইউরেশিয়ার বিশেষত্ব এই যে, এ মহাদেশটি সম্পূর্ণ পৃথিবীর উত্তরখণ্ডের অন্তর্ভূত। অপর পক্ষে আমেরিকা ও আফ্রিকার কতক অংশ উত্তরখণ্ডে ও কতক অংশ দক্ষিণখণ্ডে অবস্থিত। এর ফলে আমরা যাকে সভ্যতা বলি, সে বস্তু ক্ষিত্যপতেজমরুদ্ব্যোমের কৃপায় ইউরেশিয়াতেই জন্মলাভ করেছে। আমেরিকা ও আফ্রিকা সভ্যতার জন্মভূমি নয়। ও দুই মহাদেশে যে সভ্যতার আমরা সাক্ষাৎ পাই, সে সভ্যতা ইউরেশিয়া হতে আমদানি। সমগ্র আমেরিকা ও আফ্রিকার উত্তর-দক্ষিণ ভাগ তো ইউরোপের উপনিবেশ। আর পুরাকালে আফ্রিকার যে অংশে সভ্যতা প্রথম দেখা দেয়, সেই ইজিপ্ট উত্তরাখণ্ডের অন্তর্ভূত ও এশিয়ার সংলগ্ন।

সুতরাং এ অনুমান করা অসংগত হবে না যে, সে সভ্যতার জন্মভূমি হচ্ছে এশিয়া, আর সেকালে ইজিপ্ট ছিল এশিয়ার একটি উপনিবেশ।

এর থেকে তোমরা বুঝতে পারবে যে, কোনো দেশের ইতিহাস বুঝতে হলে সে দেশের জিয়োগ্রাফিও আমাদের জানা চাই। এ যুগের মানুষ জিয়োগ্রাফির তাদৃশ অধীন না হলেও আদিতে যে বিশেষ অধীন ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের ইতিহাস জানতে আমরা সবাই উৎসুক। সে ইতিহাস ভারতবর্ষের জমির উপরেই গড়ে উঠেছে, সেইজন্যই সেই জমির সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে আমি উদ্যত হয়েছি। এখন এই-ক'টি কথা তোমরা মনে রেখো যে, এ পৃথিবী সৌরমণ্ডলের অন্তর্ভূত ও তার সঙ্গে নানারূপ যোগসূত্রে আবদ্ধ। তার পর এই পৃথিবীর উত্তরাখণ্ডে ইউরেশিয়া অবস্থিত। আর এই মহাদেশের যে অংশকে আমরা এশিয়া বলি, ভারতবর্ষ তারই একটি ভূভাগ। আর এই ভূভাগের রূপগুণ বর্ণনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রথমে সৌরমণ্ডল থেকে পৃথিবীকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তার পর পৃথিবী থেকে তার উত্তরাখণ্ডকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তার পর তার উত্তরাখণ্ড থেকে ইউরেশিয়াকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তার পর ইউরেশিয়া থেকে এশিয়াকে পৃথক্ করে নিয়ে, তার পর এশিয়া থেকে অপরাপর দেশকে বাদ দিলে তবে আমরা ভারতবর্ষ পাই। এ দেশ অপরাপর দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন না হলেও বিভিন্ন। সুতরাং একে একটি স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে ধরে নিয়ে তার বর্ণনা করা যায়। আমি পূর্বে বলেছি যে, বিদেশের সামান্য জ্ঞান না থাকলে স্বদেশেরও বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যায় না। এ কথা সত্য। কিন্তু অপর পক্ষে এ কথাও সমান সত্য যে, স্বদেশের বিশেষ জ্ঞান না থাকলে বিদেশের সামান্য জ্ঞান লাভ করা কঠিন। ও ক্ষেত্রে আমরা নাম শিখি, কিন্তু দেশ চিনতে শিখি নে। এই কারণে আজকাল এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক বলেন যে, প্রথমে বাড়ির জিয়োগ্রাফি শিখে, তার পর দেশের জিয়োগ্রাফি শেখাই কর্তব্য। কারণ ছোটোর জ্ঞান থেকেই মানুষকে বড়োর জ্ঞানে অগ্রসর হতে হয়, ঘর থেকেই বাইরে যেতে হয়। আমি যে এ প্রবন্ধে তার উলটো পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, বড়ো থেকে ছোটোতে, বাইরে থেকে ঘরে আসছি, তার প্রথম কারণ আমি বৈজ্ঞানিক নই—সাহিত্যিক; আর তার দ্বিতীয় কারণ, আমি তোমাদের মনে এই সত্যটি বসিয়ে দিতে চাই যে, ভারতবর্ষ একটা সৃষ্টিছাড়া দেশ নয়।

এশিয়া

এশিয়া ব'লে ইউরোপ থেকে কোনো পৃথক্ মহাদেশ নেই, এ কথা তোমাদের পূর্বেই বলেছি। কিন্তু বহুকাল থেকে মানুষ এই এক মহাদেশকে দুই মহাদেশ বলে আসছে। ভৌগোলিক হিসাবে না হোক, লৌকিক মতে এশিয়া একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ বলে যখন গ্রাহ্য, তখন এ ভূভাগকে একটি পৃথক্ মহাদেশ বলে মেনে নেওয়া যাক।

ভারতবর্ষ এই মহাদেশের অন্তর্ভূত, অতএব এশিয়ার চেহারাটা একনজর দেখে নেওয়া যাক।

এ যুগের জাপানের একজন বড়ো কলাবিদ্ ও সাহিত্যিক কাকুজো ওকাকুরা, তাঁর *The Ideals of the East* নামক গ্রন্থের আদিতেই বলেছেন যে, Asia is one। এ কথাটা Eastএর ideal হতে পারে, কিন্তু বস্তুগত্যা সত্য নয়।

ভৌগোলিক হিসেবে এশিয়া চারটি উপ-মহাদেশে (সাব-কণ্টিনেণ্ট) বিভক্ত। কি হিসেবে এশিয়াকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়, তা এখন শোনো।

মনুভাষ্যকার মেধাতিথি বলেছেন যে—

জগৎ সরিৎ সমুদ্রা শৈলাদ্যাত্মকম্

অর্থাৎ এ জগৎ নদী সমুদ্র ও পাহাড় দিয়ে গড়া। জগৎ সম্বন্ধে এ কথাটা যে কতদূর সত্য, তা বলতে পারি নে—তবে একেবারে যে বাজে নয়, তার প্রমাণ চন্দ্র উপগ্রহে পাহাড় আছে, মার্স গ্রহে নদী আছে এবং সম্ভবত অপর কোনো গ্রহে সমুদ্রও থাকতে পারে। সে যাই হোক, পৃথিবী সম্বন্ধে মেধাতিথির উক্তি যে সম্পূর্ণ সত্য সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আর, এই তিন বস্তুই পৃথিবীকে নানাদেশে বিভক্ত করে রেখেছে।

সমুদ্রের ব্যবধানেই যে মহাদেশ হয়, তার কারণ সমুদ্র আগে ছিল অলঙ্ঘ্য আর এখন হয়েছে দুর্লঙ্ঘ্য। শৈলমালা সমুদ্রের চাইতে কিছু কম অলঙ্ঘ্য বা দুর্লঙ্ঘ্য নয়। সুতরাং পর্বতের ব্যবধানও এক ভূভাগকে অপর ভূভাগ থেকে পৃথক্ করে রাখে।

কালিদাস বলেছেন যে—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।

ভারতবর্ষের উত্তরে স্থিত যে পর্বতশ্রেণীর স্বদেশী অংশকে আমরা হিমালয় বলি, তা অবশ্য এশিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন করছে না। কিন্তু হিমালয় বলতে আমরা যদি সেই শৈলমালা বুঝি, যে পর্বতশ্রেণী সমগ্র এশিয়ার মেরুদণ্ড, আর যাকে এ যুগের ভৌগোলিকরা সেণ্ট্রাল মাউন্টেন্স্ আখ্যা দিয়েছেন—তা হলে আমরা কালিদাসের উক্তি সত্য বলে স্বীকার করতে বাধ্য। এ নগাধিরাজ সত্য-সত্যই এশিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম তোয়নিধিতে অবগাহন করে অবস্থিতি করছে। পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর ও পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এ পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত। আর পৃথিবী বলতে যদি আমরা শুধু প্রাচীন পৃথিবী বুঝি, তা হলে তো কালিদাসের উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়। কারণ এশিয়ার এই সেন্ট্রাল মাউন্টেন্স্ হচ্ছে প্রাচীন পৃথিবীর মিড্-ওঅর্ল্ড্ মাউন্টেন্স্এরই অংশ। তার পর এ সমগ্র পর্বতশ্রেণীকে হিমালয় বলা যেতে পারে; কেননা এ পর্বতের অধিকাংশই চিরহিমের আলয়।

এই হিমালয়, ভাষান্তরে সেন্ট্রাল মাউন্টেন্স্এর মতো বিরাট প্রাচীর পৃথিবীর আর কোনো মহাদেশকে দু ভাগে বিভক্ত করে নি। এ প্রাচীরের উত্তরদেশকে এশিয়ার উত্তরাপথ এবং দক্ষিণদেশকে দক্ষিণাপথ বলা যেতে পারে। এই প্রাচীর যে কত উঁচু তা তো তোমরা সবাই জান। এই ভারতবর্ষের উত্তরেই এর পাঁচটি শৃঙ্গ আছে, যার প্রতিটির উচ্চতা হচ্ছে পঁচিশ হাজার ফুটের চাইতেও বেশি।

কাশ্মীরে নাংঘা পর্বত উঁচুতে ২৬,৬২১ ফুট, তিব্বতে নন্দাদেবী ২৫,৬৪৫, নেপালে ধবলাগিরি ২৬,৭৯৯ ফুট, এভারেস্ট ২৯,০০২, কিন্‌চিন্‌জঙ্ঘা ২৮,১৪৬। এখন এ পর্বত প্রস্থে কত বড়ো তা শোনো।—

ভারতবর্ষের পশ্চিমে যে দেশ আছে, সে দেশকে আমরা ইরান বলি; আর উত্তরপশ্চিমে যে দেশ আছে, তাকে তুরান বলি। ইরান ও তুরানে এই পর্বত কোথাও চারশো মাইল, কোথাও আটশো মাইল চওড়া। এ মহাপর্বতের অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। তাদের মিলনভূমি হচ্ছে পামির অধিত্যকা। এ অধিত্যকাও প্রায় চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচু। এই পামিরের উত্তরে এ পর্বতের প্রস্থ হচ্ছে বারো-শো মাইল, এবং এর সঙ্গে এ পর্বতের নিম্নাংশ অর্থাৎ উপত্যকাগুলি যদি যোগ দেওয়া যায়, তা হলে এ ব্যবধানের প্রস্থ হয় দু হাজার মাইল—অর্থাৎ হিমালয় হতে কন্যাকুমারিকা যতদূর ততদূর। এর থেকে দেখতে পাচ্ছ যে, এশিয়ার উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথকে এক দেশ বলা কতদূর সংগত।

এই কারণে এশিয়ার উত্তরাখণ্ডকে একটি উপমহাদেশ বলা হয় আর তার দক্ষিণাপথের পশ্চিম ভাগকে দ্বিতীয়, পূর্ব ভাগকে তৃতীয়, তার মধ্য ভাগকে চতুর্থ উপমহাদেশ বলা যায়।

এই মধ্যদেশই ভারতবর্ষ। ভূমধ্য পর্বত থেকে এই চারটি উপমহাদেশ ঢাল হয়ে সমুদ্রের দিকে নেমে এসেছে। ফলে উত্তর ভাগের সকল নদী উত্তরবাহিনী, ও তারা সব গিয়ে পড়ে আর্কটিক সমুদ্রে; পশ্চিম ভাগের জল গড়িয়ে পড়ে ভূমধ্য-সাগরে, পূর্ব ভাগের জল প্রশান্ত-মহাসাগরে ও মধ্যদেশের জল ভারত-মহাসাগরে। মধ্য এশিয়া পর্বতময়। আর এ পর্বত অর্ধেক এশিয়া জুড়ে বসে আছে। আর তার চার পাশের চার ভাগের প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উত্তরদেশ অর্থাৎ সাইবিরিয়া সমতল ভূমি কিন্তু জলবায়ুর গুণে মানুষের বাসের পক্ষে অনুকূল নয়। পশ্চিম একে পাহাড়ে, উপরন্তু নির্জলা দেশ। সে দেশের জমিতে ফসল একরকম হয় না বললেই চলে। ইরান-তুরানের অধিকাংশ লোক গৃহস্থ নয়, তারা অন্নের সন্ধানে তাঁবু ঘাড়ে করে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। বাকি দুটি ভূভাগ, ভারতবর্ষ ও চীনদেশ, মানুষের বাসের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। এ দুটি দেশ মুখ্যত সমতল ভূমি, আর সে ভূমি কর্ষণ ক'রে অন্নবস্ত্র দুই লাভ করা যায়; অতএব এ দুই দেশের লোকই গৃহস্থ হয়েছে। আর শাস্ত্রে বলে, মানুষের সকল আশ্রম গার্হস্থ্য-আশ্রমেরই বিকল্প মাত্র।

এশিয়াকে ত্যাগ করবার পূর্বে সে মহাদেশ সম্বন্ধে আর-একটি কথা বলছি, যা শুনে তোমরা একটু চমকে যাবে। এ মহাদেশের ম্যাপে একটি দেশ ভুলক্রমে ঢুকে পড়েছে, যেটি ভৌগোলিক হিসেবে এশিয়ার নয়, আফ্রিকার অঙ্গ। সে দেশের নাম আরবদেশ। এই আরবদেশ প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিরই একটি অংশ। তোমরা বোধ হয় জান যে, মরুভূমির একটি ধর্ম হচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশকে আক্রমণ করা। হাওয়ায় তার তপ্ত বালি উড়ে এসে পার্শ্ববর্তী দেশকে চাপা দেয়। তার স্পর্শে গাছপালা-তৃণপুষ্প সবই মারা যায়। মরুভূমির শুধু বালুকা নয়, তার বায়ুও সমান মারাত্মক। যে দেশের উপর দিয়ে সে বাতাস বয়ে যায়, সে দেশের

রস-কষ একেবারে শুকিয়ে যায়। সাহারার এই নিজস্ব বাতাসের নাম ট্রেড
। একবার প্লোবের দিকে তাকিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে যে, এই ট্রেড
চলার পথটি হচ্ছে আগাগোড়া পোড়ামাটি।

সাহারা মরুভূমি আরবদেশের ভিতর দিয়ে এসে প্রথমে পারস্যের দক্ষিণ ভাগকে, তার পর আরো এগিয়ে ভারতবর্ষের সিন্ধুদেশকে আক্রমণ করে। ফলে, আরব থেকে সিন্ধুদেশ পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগকে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। এ আক্রমণে বাধা দিয়েছে রাজপুতানা। রাজপুতানার চিরগৌরব এই যে, এই রাজপুতানাই হিন্দুস্থানকে এই ক্রমবর্ধমান আফ্রিকার মরুভূমির কবল থেকে রক্ষা করেছে।

এই আরবদেশ যে ভুলক্রমে এশিয়ার ম্যাপে ঢুকে গেছে, তার কারণ কেবলমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী মানচিত্রকাররা লোহিত-সমুদ্রকে আফ্রিকা ও এশিয়ার মধ্যে পরিখা বলে ধরে নিয়েছিলেন। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায়, এ সমুদ্রও আসলে মরুভূমি। এর উপরে যেটুকু জল আছে, তা ভারত-মহাসাগরের দান।

ভারতবর্ষকে যদি এশিয়াখণ্ডের একটি উপমহাদেশ না বলে একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ বলা যায়, তা হলেও কথাটা অসংগত হয় না।

ভারতবর্ষ মাপে ১৫,০০,০০০ বর্গমাইল। এক চীন ব্যতীত এত বড়ো দেশ এশিয়ায় আর কোথাও নেই। এশিয়ার রুশিয়া ম্যাপে দেখতে প্রকাণ্ড দেশ; কিন্তু এর দক্ষিণাংশে এত বড়ো বড়ো হ্রদ মরুভূমি তৃণকান্তার ও পর্বত আছে যে, সে অংশটিকে একটি দেশ বলা যায় না। কারণ সে ভূভাগ মানুষের বাসের অযোগ্য। আর এর উত্তরাংশের জমি সমতল হলেও আজও জমাট মাটি হয়ে ওঠে নি। এ দেশে গাছপালা অতি বিরল, যে দুটি-চারটি আছে তারা সব বামন। এরকম দেশ যে কৃষিকার্যের জন্য অনুপযোগী, সে কথা বলাই বাহুল্য। ফলে সাইবিরিয়া একরকম জনশূন্য বললেই হয়।

ভারতবর্ষ যে আকারে বিপুল, শুধু তাই নয়। এ দেশ এশিয়ার অপরাপর দেশ থেকে একরকম সম্পূর্ণ বিভিন্ন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এর উত্তরে হিমালয়ের গগনস্পর্শী প্রাচীর; আর তিন দিকে ভারত-মহাসাগরের অতলস্পর্শী পরিখা। তোমরা ভেব না যে আমি ভুল করছি। আরব-সাগর বঙ্গ-উপসাগর প্রভৃতি নাম আমিও জানি; কিন্তু ও-সব সাগর-উপসাগর ভারত-মহাসাগরেরই অংশ মাত্র। ভারতবর্ষ তার উত্তরপশ্চিম ও উত্তরপূর্ব কোণে শুধু অপর দেশের সঙ্গে সংলগ্ন। তার উত্তরপশ্চিমে আফগানিস্থান, এবং উত্তরপূর্বে ব্রহ্মদেশ। কিন্তু এ দুই দিকেই আবার অতি দুর্গম পর্বতের ব্যবধান আছে। যে পর্বতশ্রেণী আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানকে হিন্দুস্থান থেকে পৃথক্ করে রেখেছে, সে পর্বতশ্রেণীর অবশ্য দুটি দুয়োর আছে—খাইবার পাস ও বোলান পাস—যার ভিতর দিয়ে এ দুই দেশে মানুষে যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মদেশে যাবার পথ আজও বঙ্গোপসাগরের জলপথ।

দেখতে পাচ্ছ স্বয়ং প্রকৃতিই ভারতবর্ষকে একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ করে গড়েছেন। এখন দেখা যাক, এই সমগ্র দেশটার আকার কিরকম। আমাদের পূর্বপুরুষেরা

সমগ্র পৃথিবীকে ত্রিকোণ বলতেন। সম্ভবত পৃথিবী বলতে তাঁরা ভারতবর্ষ বুঝতেন। কেননা ভারতবর্ষ সত্যসত্যই ত্রিকোণ।

মানুষে যতক্ষণ জ্যামিতির কোনো মূর্তির সঙ্গে কোনো দেশকে মেলাতে না পারে, ততক্ষণ তার মনস্তুষ্টি হয় না; যদিও জ্যামিতির কোনো আকারের সঙ্গে কোনো দেশই হুবহু মিলে যায় না। পৃথিবীকে আমরা বলি গোলাকার। কথাটা মোটামুটি সত্য। কিন্তু জ্যামিতির বৃত্তের উত্তরদক্ষিণ চাপা নয়। ইউ তৃতীয় অধ্যায়ে কমলালেবুর কোনো স্থান নেই। এই কথাটা মনে রাখলে, ভারতবর্ষকে যে একটি সমভুজ ত্রিকোণ দেশ বলা হয়েছে, সে উক্তিকে গ্রাহ্য করে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

পৃথিবীতে এমন কোনোই দেশ নেই, যা সম্পূর্ণ একাকার। ভারতবর্ষও একাকার নয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষকেও নানা খণ্ডে বিভক্ত করা যায়। এখানে একটি কথা বলে রাখি। রাজ্যের ভাগের সঙ্গে ভৌগোলিক ভাগের বিশেষ কোনো সম্বন্ধ নেই। অর্ধেক পৃথিবী আজ ব্রিটিশরাজের অধীন; কিন্তু তাই বলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্যানেডা অস্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষকে পাগল ছাড়া আর-কেউ এক দেশ বলবে না। আমি যে ভাগের কথা বলছি, সে ভৌগোলিক ভাগ।

আমাদের শাস্ত্রে ভারতবর্ষকে নানা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। পুরাণকারদের মতে ভারতবর্ষ নবখণ্ড। বরাহমিহির প্রভৃতি গণিতশাস্ত্রীরা পৌরাণিকদের সঙ্গে একমত, যদিচ এ দুয়ের বর্ণিত নবখণ্ডের মিল নেই। মহাভারতের মতে এ দেশ চার খণ্ডে বিভক্ত। চারিটি equilateral triangleএর সমষ্টি হচ্ছে ভারতবর্ষ নামক বড়ো equilateral triangle। জ্যামিতির হিসেব থেকে যদিও এ বর্ণনা সত্যের কাছ ঘেঁষে যায়, কিন্তু ভৌগোলিক হিসেব থেকে অনেক দূরে থাকে। সে যাই হোক, সংস্কৃত সাহিত্যে আর-একরকম ভাগের উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষ মোটামুটি দু ভাগে বিভক্ত। একটি ভাগের নাম উত্তরাপথ, অপরটির দক্ষিণাপথ। এই লৌকিক ভাগটিই প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক। উত্তরাপথ ভৌগোলিক হিসেবে দক্ষিণাপথ থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন।

হিমালয় যেমন সমস্ত এশিয়ার মেরুদণ্ড, বিন্ধ্যপর্বত তেমনি ভারতবর্ষের মেরুদণ্ড। এ স্থলে আমি সাতপুরা ও আরাবলি পর্বতকে বিন্ধ্য নামে অভিহিত করছি। উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যের দেশকে উত্তরাপথ বলা যায়, আর দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত থেকে ভারত-মহাসাগরের মধ্যবর্তী দেশকে দক্ষিণাপথ বলা যায়। কিন্তু তোমরা ম্যাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পাবে, আরাবলি পর্বতের পশ্চিমে ও রাজমহলের পূর্বেও অনেকখানি জমি পড়ে রয়েছে। এই পশ্চিম অংশের নাম পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ, আর পূর্ব অংশের নাম বঙ্গদেশ ও আসাম। এ দুটিকেও উত্তরাপথের অন্তর্ভূত করে নিতে হবে।

উত্তরাপথ

প্রথম জিনিস যা চোখে পড়ে সে হচ্ছে এই যে, এই বিস্তৃত ভূভাগের ভিতর কোনো-রূপ পাহাড়পর্বত নেই, সমস্ত উত্তরাপথ সমতলভূমি। এর ভিতর এক জায়গায়

শুধু একটু অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি আছে। পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের মিলনস্থল হচ্ছে সেই উচ্চভাগ। উত্তরাপথের এই জায়গাটার গড়ন কাছিমের পিঠের মতো। ফলে এ স্থানের পশ্চিমের যত নদী সব পশ্চিমবাহিনী ও পূর্বের যত নদী সব পূর্ব-বাহিনী।

এই পশ্চিম ভাগের নদী পাঁচটির নাম ঝিলম চেনাব রাবি বিয়াস ও সৎলেজ। এ পাঁচটিরও জন্মভূমি হচ্ছে হিমালয়, আর এ পাঁচটিই পথিমধ্যে এ-ওর সঙ্গে মিলিত হয়ে শেষটা ভারতবর্ষের সবচাইতে পশ্চিমের নদী সিন্ধুনদের সঙ্গে মিশে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। তোমরা বোধ হয় জান যে, পাহাড় থেকে নদী যে মাটি কেটে নিয়ে আসে, সেই মাটি দিয়েই সমতলভূমি তৈরি হয়। এই পঞ্চনদের কৃপায় পঞ্চনদ-দেশ ওরফে পাঞ্জাব তৈরি হয়েছে। আর এই দেশটাকে ইন্ডাস ভ্যালি বলা হয়। কারণ সিন্ধুই হচ্ছে এই পঞ্চনদের ভিতর মহানদ।

উত্তরাপথের পূর্ব ভাগের প্রধান নদীগুলির নাম যমুনা গঙ্গা গোমতী গোগ্‌রা গণ্ডক ও কুশি। এ-সকল নদীরই উৎপত্তি হিমালয়ে, আর এদের মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে গঙ্গা। অপর পাঁচটি একে একে গঙ্গায় মিশে গিয়েছে। সিন্ধুনদের সঙ্গে গঙ্গার একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। সিন্ধুনদ তার আগাগোড়া জল হিমালয়ের কাছ থেকে পায়। গঙ্গা কিন্তু কিছু জল বিন্ধ্যপর্বতের কাছ থেকেও পায়। চম্বাল ও শোণ এই দুই নদীরই জন্মভূমি হচ্ছে বিন্ধ্যপর্বত। আর এই দুই নদীই উত্তর-বাহিনী হয়ে এসে গঙ্গায় পড়েছে। সংস্কৃত ভাষায় জলের আর-এক নাম জীবন। গঙ্গাই হচ্ছে উত্তরাপথের জীবন। ও দেশের বুকের ভিতর দিয়ে গঙ্গা যদি রক্তের মতো বয়ে না যেত, তা হলে উত্তরাপথের প্রাণবিয়োগ হত। এই গাঙ্গেয় দেশই হচ্ছে প্রকৃত হিন্দুস্থান।

আরাবলি পর্বতের পশ্চিমে ও দক্ষিণে হচ্ছে মরুভূমি। সিন্ধুনদ দক্ষিণাংশে এই মরুভূমির ভিতর দিয়ে বয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। এই সিন্ধুনদীর দু পাশের দেশের নাম সিন্ধুদেশ।

বিন্ধ্যপর্বতের একরকম গা ঘেঁষে পূর্বে অনেক দূর এসে গঙ্গা রাজমহলের কাছে পর্বতের বাধা হতে অব্যাহতি লাভ করে দক্ষিণবাহিনী হয়ে সমুদ্রের অভিমুখে যাত্রা করেছেন। তার পর দক্ষিণে অনেক দূর এসে গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হয়েছেন। এই ব্রহ্মপুত্রেরও জন্মস্থান হিমালয়। ব্রহ্মপুত্র লখনউয়ের উত্তরে হিমালয় থেকে বেরিয়ে পূর্বমুখে বহুদূর পর্যন্ত হিমালয়ের ভিতর দিয়েই প্রবাহিত হয়ে ভুটানের পূর্বে এসে দক্ষিণবাহিনী হয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিশে গেছেন। তার পর এই মিলিত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র আরো দক্ষিণে এসে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে সমুদ্রে এসে পড়লেন। মেঘনার জন্মভূমি হচ্ছে গারো-লুসাই পর্বত। এই তিন নদীতে মিলে বাংলাদেশ গড়েছে।

উত্তরাপথের পশ্চিমদেশ সিন্ধুদেশ যেমন শুখনো, তার পূর্বদেশ বাংলা তেমনি ভিজে। সিন্ধুদেশের সক্কর নামক স্থানের মতো গরম জায়গা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। তার পাশে রোড়ী নামক স্থানে গত বারো বৎসরে মোটে ছ পশলা বৃষ্টি হয়েছে। অপর পক্ষে বাংলার মতো ভিজে দেশও ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নেই।

দক্ষিণাপথ

এখন দক্ষিণাপথে যাওয়া যাক।

এ ভূভাগ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এটি উত্তরাপথ থেকে একরকম বিচ্ছিন্ন।

অগস্ত্যমুনি বিন্ধ্যপর্বতের মাথা নিচু করে দিয়েছিলেন, কিন্তু সে মাথাকে ভূলুণ্ঠিত করতে পারেন নি। ফলে এই দুই ভাগের ভিতর যাতায়াতের সুগম পথ নেই। উত্তরাপথ থেকে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে এমন কোনো নদী নেই, সুতরাং এ দুই দেশের ভিতর জলপথ নেই। গঙ্গানদী বিন্ধ্যপর্বতকে প্রদক্ষিণ করে ও সিন্ধুনদ সে পর্বতকে বাঁয়ে ফেলে রেখে তার পর সমুদ্রে এসে পড়েছে।

তার পর এ দুয়ের ভিতর কোনো স্থলপথও নেই। এক রেলের গাড়ি ছাড়া আর কোনোরকম গাড়ি—গোরুর ঘোড়ার কি উটের—বিন্ধ্যপর্বতের এক পাশ থেকে অপর পাশে যেতে পারে না।

মানুষে পায়ে হেঁটে যখন হিমালয় পার হয়ে যায়, তখন বিন্ধ্যপর্বত অবশ্য তার চলাচলের পথ বন্ধ করতে পারে নি। মানুষের অগম্য স্থান ভূ-ভারতে নেই, কিন্তু দুর্গম স্থান আছে। এই বিন্ধ্য অতিক্রম করবার পথ সেকালে অত্যন্ত দুর্গম ছিল। রামচন্দ্র পায়ে হেঁটে বিন্ধ্যপর্বত পার হয়ে দক্ষিণাপথে গিয়েছিলেন, কিন্তু ফিরতি বেলায় তিনি বিমানে চড়ে লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করাই বেশি আরাম-জনক অতএব সুযুক্তির কাজ মনে করেছিলেন।

সেকালে বিন্ধ্যপর্বত প্রদক্ষিণ করে আসবারও বিশেষ অসুবিধা ছিল। আরাবলি পর্বতের পশ্চিম দিয়ে আসতে হলে মরুভূমি অতিক্রম করে আসতে হত। অপর পক্ষে রাজমহলের পূর্ব দিয়ে বাংলায় এসে সমুদ্রের ধার দিয়ে মাদ্রাজ পৌঁছতে অনেক দিন নয়, অনেক বছর লাগত। এক, রাজা ও সন্ন্যাসী ছাড়া ওরকম দেশ-ভ্রমণ বোধ হয় সেকালে অপর কেউ করত না। সমগ্র ভারতবর্ষকে এ ভাবে প্রদক্ষিণ করতেন রাজা দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হয়ে, আর সন্ন্যাসী তীর্থভ্রমণে।

এই বিন্ধ্যপর্বতের ভিতর একটি ফাঁক আছে—খাণ্ডোয়া নামক স্থানে। এলাহাবাদ থেকে বম্বে যাবার রেলপথ এই খাণ্ডোয়ার ফাঁক দিয়েই যায়। এবং সেকালে এই দুয়োর দিয়েই বোধ হয় উত্তরাপথের লোক দক্ষিণাপথে প্রবেশ করত। ভারতবর্ষের মধ্যে দক্ষিণাপথ হচ্ছে একটি বড়ো কৌটোর মধ্যে আর-একটি ছোটো কৌটো।

দক্ষিণাপথ উত্তরাপথ থেকে শুধু বিচ্ছিন্ন নয়, বিভিন্ন—আকৃতিতেও, প্রকৃতিতেও।

উত্তরাপথকে একটি চতুর্ভুজ হিসেবে ধরা যায়, কিন্তু দক্ষিণাপথ হচ্ছে একটি স্পষ্ট ত্রিভুজ। একটি উলটো পিরামিড, যার base হচ্ছে বিন্ধ্য, আর apex কুমারিকা অন্তরীপ। এর উভয় পাশই পাহাড় দিয়ে বাঁধানো। পশ্চিম দিকের পর্বতের নাম পশ্চিমঘাট, পূর্ব দিকের পূর্বঘাট। এই দুই পর্বত এসে মিলিত হয়েছে, কুমারিকা অন্তরীপের একটু উত্তরে। এর দক্ষিণে যে জায়গাটুকু আছে, তার পূর্বে আর পাহাড় নেই, কিন্তু পশ্চিমে আছে কার্‌ডামম হিল্‌স্‌।

উত্তরাপথ হচ্ছে সমতলভূমি, কিন্তু দক্ষিণাপথ মালভূমি। অর্থাৎ ইরান দেশের মতো এ দেশও হচ্ছে পর্বতের উপত্যকা; শুধু ইরানের উপত্যকা হচ্ছে প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু, ও দক্ষিণাপথের হাজার ফিট। সুতরাং এ পিরামিডকে পাথরে-গড়া বলা যেতে পারে। এ ভূভাগে সমতলভূমি আছে শুধু পশ্চিমঘাটের পশ্চিমে ও সমুদ্রের উপকূলে, যে দেশকে আমরা মালাবার দেশ বলি; ও পূর্বসমুদ্রের উপকূলে, যে দেশকে আমরা করমণ্ডল বলি। দক্ষিণাপথের অন্তরেও কিছু কিছু সমতলভূমি আছে, তার পরিচয় পরে দেব।

এই মালাবার দেশটি অতি সংকীর্ণ, করমণ্ডল অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। যদি একটি বিমানে চড়ে দূর থেকে দেখা যায় তো দেখা যাবে যে, দক্ষিণাপথের পশ্চিম পাড় বেজায় মাথা উঁচু করে রয়েছে, পশ্চিমঘাট যেন সমুদ্র থেকে ঝাঁপিয়ে উঠেছে আর করমণ্ডল একেবারে সমুদ্রের সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছে। এ অংশের তালীবন যেন সমুদ্র থেকেই উদ্‌ভূত হয়েছে। কালিদাস যে বলেছেন—

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশেঃ ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

সে বেলা হচ্ছে করমণ্ডল কোস্‌ট্‌।

দক্ষিণাপথের উত্তরে দুটি অপূর্ব নদী আছে, নর্মদা ও তাপ্তি। নর্মদা বিন্ধ্য-পর্বতের উপত্যকার ভিতর দিয়ে, ও তাপ্তি সাতপুরা-পর্বতের দক্ষিণ পাদদেশ ঘেঁষে পশ্চিমবাহিনী হয়ে গাল্‌ফ্‌ অব্‌ ক্যাম্বেতে পড়ছে।

এ দুই নদী মানুষের বিশেষ কোনো কাজে লাগে না। এ নদী দুটি মানুষের যাতায়াতের জলপথ নয়। তার পর এদের পলিতে কোনো সমতল দেশ গড়ে ওঠে নি। এরা দুটিতে মিলে সাগরসংগমের মুখে খালি একটুখানি মাটি তৈরি করেছে।

এ দেশের দক্ষিণের নদী-ক'টি সবই পূর্ববাহিনী। প্রথম গোদাবরী, দ্বিতীয় কৃষ্ণা, তৃতীয় কাবেরী। এই তিনটি নদীরই জন্মভূমি হচ্ছে পশ্চিমঘাট, আর এ তিনটিই এসে পড়ছে বঙ্গ-উপসাগরে।

এই তিনটি নদীর উভয় কূলে অল্পস্বল্প সমভূমি আছে, যেখানে ফসল জন্মায়। এই তিনটি নদীর হাতে করমণ্ডল দেশ গড়ে উঠেছে। দক্ষিণাপথের ভিতর থেকে মালাবার ও কোংকন যাবার কোনো পথ থাকত না, যদি না পশ্চিমঘাটের ভিতর তিনটি ফাঁক থাকত—উত্তরে থালঘাট ও বোরঘাট, দক্ষিণে পালঘাট। এইখানেই কোইম্বা-টোর নামক শহর। এই কোইম্বাটোরের দুয়োরই দক্ষিণাপথের অন্তরের সংগে তার পশ্চিম উপকূলের যোগরক্ষা করেছে। দক্ষিণাপথ ও বাংলার ভিতর আর দুটি দেশ আছে—উত্তরে সেণ্ট্রাল প্রভিন্‌সেস্‌ ও দক্ষিণে উড়িষ্যা।

সেণ্ট্রাল প্রভিন্‌সেস্‌ পাহাড় ও জঙ্গলে ভরা। উড়িষ্যার অনেকটাই সমভূমি। মহানদী এই সমভূমি গড়েছে। এ দুটি দেশ সম্ভবত কখনোই দক্ষিণাভুক্ত হয় নি বলে একে উত্তরাপথের ভিতর টেনে আনা যায়। আজকাল আমরা যাকে বম্বে প্রেসিডেন্সি ও ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সি বলি, সে দুই এই দক্ষিণাপথেরই অন্তর্ভূত। শুধু সিন্ধুদেশটি বম্বের গভর্নরের অধীন হলেও দক্ষিণাপথের অন্তর্ভূত নয়।

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয়ের উপরে চারিটি দেশ আছে, যেগুলি ভারতবর্ষের

অন্তর্ভূত। পশ্চিমে কাশ্মীর, তার পূর্বে নেপাল, তার পূর্বে সিকিম ও পূর্বপ্রান্তে ভুটান।

কাশ্মীরের লোকের ভাষা সংস্কৃতের অপভ্রংশ, নেপালের গুর্খাদেরও তাই; অপর পক্ষে সিকিম-ভুটানের ভাষা চীনবংশীয়। এই নেপালেই পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে আগত আর্যজাতি এবং পূর্ব ও উত্তর থেকে আগত চীনজাতি মিলেমিশে এক-জাতি হয়ে গিয়েছে। এ দেশে শুধু দুই জাতির নয়, দুই সভ্যতারও মিলন ঘটেছে। তাই নেপালে বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম পাশাপাশি বাস করছে। কাশ্মীরে অবশ্য হিন্দুধর্ম ও মুসলমানধর্ম পাশাপাশি বাস করছে, কিন্তু এই দুই ধর্ম পরস্পরের অস্পৃশ্য। ফলে উভয় ধর্মই নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ রক্ষা করে চলেছে। অপর পক্ষে নেপালের বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের বিকার অথবা নেপালের হিন্দুধর্মকে বৌদ্ধ-ধর্মের বিকার বললেও অত্যুক্তি হয় না। সিকিম-ভুটানের সংস্রব আসলে বাংলাদেশের সঙ্গে। শুনতে পাই, বাংলার লোকের দেহে চীনের রক্ত আছে। সেইসঙ্গে বাঙালির মনেও কিঞ্চিৎ চৈনিক ধর্ম আছে কি না বলতে পারি নে।

দেশের পণ্ডিতলোক-সব আজকাল বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম দেশে মহা খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ করেছেন। বেদ উদ্ধারের পর আমাদের পণ্ডিতরা যদি তন্ত্রের সন্ধানে বেরোন, তা হলে, আমাব বিশ্বাস, তাঁদের উত্তরপশ্চিম দেশকে গজভুক্ত কপিত্থবৎ ত্যাগ করে ভারতবর্ষের উত্তরপূর্বে আসতে হবে। তখন রিসার্চ ওঅর্ক-এর পীঠস্থান হবে প্রথমে ভুটান, পরে সিকিম। তন্ত্রশাস্ত্রের পুঁথি খুললেই পাতায় পাতায় মহাচীনের সাক্ষাৎলাভ ঘটে। সে যাই হোক, ভারতবর্ষের পশ্চিমে ইরান ও উত্তরে তুরানের মতো তার পূর্বে মহাচীনকেও পুরাতত্ত্ববিৎ ভাষাতত্ত্ববিৎ ও নৃতত্ত্ববিৎরা উপেক্ষা করতে পারেন না। সম্প্রতি অবগত হয়েছি যে, পণ্ডিতরা আজকাল Tarim দেশ নিয়েই উঠে-পড়ে লেগেছেন। Tarim অবশ্য চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত তুর্কস্থানে। সুতরাং আশা করা যায় যে, তাঁরা খোটান থেকে ভুটানে অচিরে নেবে পড়বেন।

ভারতবর্ষের প্রকৃতি

এতক্ষণে তোমরা ভারতবর্ষ নামক মহাদেশ, আর তার অন্তর্ভূত খণ্ড দেশগুলির আকৃতির মোটামুটি পরিচয় পেলে। এখন, তার প্রকৃতির পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া যাক।

প্রথমত ভারতবর্ষ হচ্ছে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। তবে উত্তরাপথেব সঙ্গে দক্ষিণা-পথের এ বিষয়েও একটু প্রভেদ আছে। তোমরা বোধ হয় গ্লোবে লক্ষ্য করেছ যে পিপের গায়ে লোহার পৎরার বাঁধনের মতো কতকগুলি কালো কালো রেখা এই গোলকটির দেহ বেষ্টন করে আছে। এই রেখাগুলির ভিতর দুটি রেখায় একটু বিশেষত্ব আছে। সে দুটি একটানা নয়, কাটা কাটা। এ উভয়ের মধ্যে ইকোয়েটরএর উত্তরে যে রেখাটি আছে, সেটির নাম ট্রপিক অব ক্যান্সার; আর ইকোয়েটরএর দক্ষিণে যেটি আছে, তার নাম ট্রপিক অব ক্যাপ্রিকর্ন।

সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর কি যোগাযোগ আছে, তাই দেখাবার জন্য এ দুটি রেখা

আঁকা হয়েছে। এই রেখাঙ্কিত জায়গাতেই সূর্যের কিরণ পৃথিবীর উপর ঠিক খাড়া হয়ে পড়ে, অপর সব স্থানে তেরচা ভাবে। এই ট্রপিক অব ক্যানসারের উত্তরদেশ শীতের দেশ, আর ট্রপিক অব ক্যাপ্রিকর্নের দক্ষিণদেশও শীতের দেশ।

আর এই রেখাদ্বয়ের মধ্যের দেশ সব দারুণ গরম দেশ। ভারতবর্ষের উত্তরাপথ, প্রায় সমস্তটাই ট্রপিক অব ক্যানসারের উত্তরে, ও দক্ষিণাপথ আগাগোড়া তার দক্ষিণে। ফলে দক্ষিণাপথে শীতঋতু বলে কোনো ঋতু নেই। জনৈক ইংরেজ বলেছেন যে, দক্ষিণাপথ হচ্ছে Nine months hot and three months hotter। কথাটা কিপ্‌লিঙের মুখ থেকে বেরোলেও মিথ্যে নয়। উত্তরাপথে কিন্তু শীতগ্রীষ্ম দুই বেশি। দক্ষিণাপথে গ্রীষ্মকালে গরম যে উত্তরাপথের মতো অসহ্য হয় না, তার কারণ দক্ষিণাপথ উত্তরাপথের চাইতে প্রথমত উঁচু, দ্বিতীয়ত তার তিন দিক সমুদ্রে ঘেরা।

মাটি

তার পর ভারতবর্ষের এ দুই ভূভাগের মাটিও এক জাতের নয়, এবং তাদের গুণাগুণও পৃথক্। মানুষের পৃথিবীর সঙ্গে কারবার প্রধানত মাটি নিয়ে। গাছপালা তৃণ শস্য সব মাটিতেই জন্মায়। এবং অনেক পণ্ডিতের মতে সব জীবজন্তুর ন্যায় মানুষের আদিমাতা হচ্ছে ভূমি। এ মতে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা কোন্ জমিতে কে জন্মেছে তার থেকেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্ব নির্ণয় করেন।

এ সত্ত্বেও আমাদের জানা উচিত যে, মাটি হচ্ছে পৃথিবীর চামড়া মাত্র। ও চামড়ার নীচে পাথর আছে, যে পাথর থেকে কিছুই জন্মায় না।—জীবজন্তুও নয়, গাছপালাও নয়। মা-বসুন্ধরা আসলে পাষাণী।

এই মাটিও পাথরের বিকার মাত্র। অর্থাৎ পাথরকে ভেঙে মাটি তৈরি করতে হয়। পাথরকে চূর্ণ করা হচ্ছে জল আর বাতাসের কাজ।

নদনদী পাহাড় থেকে বেরোয়, পাহাড় ভেঙে। আর তারা যে চূর্ণপাষাণ বয়ে নিয়ে আসে, তাই দিয়ে যে মাটি গড়ে, সেই মাটিকে আমরা পলিমাটি বলি। সেই মাটিই প্রধানত গাছপালার জন্মভূমি। আর সমগ্র উত্তরাপথ প্রায় এই মাটিতেই তৈরি।

আমরা ভারতবর্ষকে উপদ্বীপ, পেনিনসুলা বলি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের ত্রিকোণ দক্ষিণাংশই একটি উপদ্বীপ। এ অংশ অতি পুরাকালে একটি দ্বীপ মাত্র ছিল। হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যের দেশ তখন জলমগ্ন ছিল। তার পর সেই জলমগ্ন দেশ যখন হিমালয়ের নদনদীর কৃপায় উত্তরাপথ হয়ে উঠল, তখন তার দক্ষিণ দ্বীপ উত্তরাপথের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ নামক মহাদেশ সৃষ্টি করল। দক্ষিণাপথ উত্তরাপথের চাইতে ঢের প্রাচীন দেশ। তোমরা যখন জিয়োলজি পড়বে, তখন এ দেশের বয়সের গাছপাথরের অথবা গাছপাথরের বয়সের হিসেব পাবে।

দক্ষিণাপথের বেশির ভাগ মাটি নদনদীর দান নয়। আগ্নেয়গিরি হতে যে গলা পাথরের (লাভা) উদ্‌গম হয়েছে, তাই চূর্ণ হয়ে হয়েছে দক্ষিণাপথের মাটি। উত্তরাপথ বরুণদেবতার সৃষ্টি, দক্ষিণাপথ অগ্নিদেবতার। এ দুই মাটি এক জাতেরও নয়, এ দুয়ের ধর্মও এক নয়।

এ দুই দেশের জলবায়ুও বিভিন্ন। মেঘ আসে সমুদ্র থেকে, আর পবনদেবই মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে আসেন। সুতরাং কোন্ দেশে কত বৃষ্টি হয় তা নির্ভর করে কোন্ দেশে কোন্ দিক থেকে কি বাতাস বয়, তার উপর। তোমাদের পূর্বে বলেছি যে, সিন্ধুদেশ হচ্ছে অনাবৃষ্টির ও আসাম অতিবৃষ্টির দেশ। এর মধ্যবর্তী দেশ অল্পবৃষ্টির দেশ। অপর পক্ষে দাক্ষিণাপথের পশ্চিম উপকূল অতিবৃষ্টির দেশ, ও তার পূর্ব অংশই অনাবৃষ্টির দেশ।

যে বায়ুকে আমরা মন্সুন নামে আখ্যাত করি, তার চলবার পথ হচ্ছে ভারতবর্ষের দক্ষিণপশ্চিম কোণ থেকে উত্তরপূর্ব কোণে। এ বাতাস মালাবার দেশকে জলে ভাসিয়ে দেয়। আবার বাংলায় ঢোকার পর এর গতি হয় দক্ষিণপূর্ব থেকে উত্তরপশ্চিমে। এই বাতাস বাংলা ও আসামের গায়ে প্রচুর জল ঢেলে দিয়ে তার পর উত্তরাপথের অন্তরে গিয়ে প্রবেশ করে। গ্রীষ্মঋতুর অবসানেই এ দেশে বর্ষাঋতু দেখা দেয়। মন্সুন কিন্তু পঞ্চনদ পর্যন্ত ঠেলে উঠতে পারে না। এজন্য বাংলায় যখন বৃষ্টি হয়, পাঞ্জাব তখন শুখনো। পাঞ্জাবে শীতকালই বর্ষাকাল।

ভারতবর্ষের লোক শতকরা নব্বই জন হচ্ছে কৃষিজীবী। এই কারণে ভারতবর্ষ নাগরিক দেশ নয়, গ্রাম্য দেশ। এ দেশে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গ্রাম আছে, আর পঁচাত্তরটিও নগর নেই। নগরেও একরকম সভ্যতার সৃষ্টি হয়, যেমন হয়েছিল পুরাকালে গ্রীসের আথেন্স ও ইতালির রোম নগরীতে। আর সেই সভ্যতাই কতক অংশে বর্তমান ইউরোপের মনের উপর প্রভুত্ব করছে। এই শহুরে মনোভাব থেকে নিষ্কৃতি না পেলে মানুষের মন ভারতবর্ষ ও চীনদেশের সভ্যতার প্রতি অনুকূল হয় না। এই কারণেই ইউরোপের সাধারণ লোক ও বর্তমান ভারতবর্ষের অসাধারণ লোকে— অর্থাৎ যারা শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে বিলেতের সাধারণ লোকের শামিল হয়ে গিয়েছে, তারা— ভারতবর্ষের সভ্যতাকে অসভ্যতা মনে করে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতা জন্মলাভ করেছে শহরে ও সেইখানেই লালিত-পালিত হয়েছে; অপর পক্ষে ভারতবর্ষের সভ্যতা জন্মগ্রহণ করেছে বনে, অর্থাৎ ঋষির আশ্রমে, ও সেইখানেই লালিত-পালিত হয়েছে।

এ দেশ যদি ঋষিক্ষেত্র হয়, তার কারণ এ দেশ মূলে কৃষিক্ষেত্র। বন গ্রামেরই অপর পৃষ্ঠা। আশ্রম মাটির নয়, মনেরই কৃষিক্ষেত্র।

আজকাল অনেক ইংরেজিশিক্ষিত সদাশয় লোক ভিলেজ অরগ্যানিজেশন করবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু মানুষ কৃষিকর্মের জন্য যুগ যুগ ধরে যে অরগ্যানিজেশন করেছে, তারই নাম কি ভিলেজ নয়? ভিলেজ জিনিসটে শুধু অরগ্যানাইজড্ নয়, কালবশে প্রতি গ্রাম এক-একটি অরগ্যানিজ্ম্ হয়ে উঠেছে। অরগ্যানিজ্ম্‌কে অরগ্যানাইজ্ করবার প্রবৃত্তিটি যেমন উচ্চ, তেমনি নিরর্থক। অরগ্যানিজ্ম্‌ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়; যদি আমাদের দেশের গ্রামসমূহ তাই হয়ে থাকে, তা হলে তাদের ব্যাধিমুক্ত করবার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু চিকিৎসার নাম অরগ্যানিজেশন নয়; অরগ্যানাইজ্ মানুষে করে শুধু কলকারখানা। যে ভূভাগকে ভগবান চাষের দেশ করে গড়েছেন, তাকে আমরা পাঁচজনে কলকারখানার দেশ তৈরি করতে পারব না, তা চাষার মুখের গ্রাস কেড়ে টাটা কোম্পানির লোহার কলের পেটে

যতই ভরাই নে কেন। ভারতবর্ষ কখনো বিলেত হবে না। মনে ভেবো না যে আমি ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে শুরু করেছি। পুরাণকাররা বলেছেন যে, ভারতবর্ষ হচ্ছে আসলে কর্মভূমি, আর এ দেশ সেই কর্মের ভূমি যে কর্ম দেবদানবরা করতে পারেন না। এ কর্ম হচ্ছে কৃষিকর্ম। আর এইটিই হচ্ছে, ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফির গোড়ার কথা আর অন্তরের কথা। আর এই ভিত্তির উপরেই ভারতবাসীর মনপ্রাণ গড়ে উঠেছে। এ সত্য উপেক্ষা করলে সেকালের ধর্মশাস্ত্রেও অধিকার জন্মাবে না, একালের অর্থশাস্ত্রেও অধিকার জন্মাবে না। আর তখন তোমরা ধর্ম বলতে বুঝবে অর্থ, আর অর্থ বলতে বুঝবে ধর্ম; যেমন আজকালকার পলিটিশিয়ানরা বোঝেন।

উদ্ভিদ্

মানুষের জীবন উদ্ভিদের জীবনের অধীন। উদ্ভিদের কাছ থেকে যে আমরা শুধু অন্ন পাই তাই নয়, বস্ত্রও পাই। ভারতবর্ষের বৃক্ষলতা তৃণশস্য আমাদের এই দুই জিনিসই জোগায়। উত্তরাপথ প্রধানত আমাদের দেয় অন্ন, আর দক্ষিণাপথ বস্ত্র।

উত্তরাপথের পশ্চিমাংশ রুটির দেশ, পূর্বাংশ ভাতের দেশ। প্রথমত ধান জন্মায় অতিবৃষ্টির দেশে, ও গম জন্মায় অল্পবৃষ্টি এমন-কি, অনাবৃষ্টির দেশে। তার পর ধানের জন্য চাই নরম মাটি, ও গমের জন্য শক্ত মাটি। বাংলার মাটিও নরম আর এখানে বৃষ্টিও হয় বেশি, তাই বাংলা হচ্ছে আসলে ধানের দেশ। পাঞ্জাবে বৃষ্টি কম ও মাটি শক্ত, তাই পাঞ্জাবের প্রধান ফসল হচ্ছে গম। সিন্ধুদেশেও আজকাল দেদার গম জন্মাচ্ছে। অনেক উদ্ভিদের মাথায়ও জল ঢালতে হয়, গোড়ায়ও জল দিতে হয়। বৃষ্টির জলে স্নান না করতে পেলে ধান বাঁচে না। কিন্তু খেজুর গাছের মাথায় এক ফোঁটাও জল দিতে হয় না। গোড়ায় রস পেলে ও গাছ তেড়ে বেড়ে ওঠে। এ কারণ সাহারা মরুভূমি ও আরবদেশই আসলে খেজুরের দেশ। ও দুই মরুভূমির ভিতর যেখানে একটু জল আছে, সেইখানেই চমৎকার খেজুর জন্মায়। জানোয়ারের ভিতর যেমন উট, গাছের ভিতর তেমনি খেজুর—মরুভূমিরই জীব। গমের মাথায়ও বারিবর্ষণ করবার দরকার নেই। মরুভূমির ভিতর নালা কেটে যদি জল নিয়ে যাওয়া যায়, তা হলেই সেখানে গম জন্মায় ও প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। শস্যের যে শুধু পিপাসা আছে তাই নয়, খিদেও আছে। মাটির ভিতর যে রাসায়নিক পদার্থ ওরফে সার থাকে, তাই হচ্ছে শস্যের প্রধান খাদ্য। যে দেশে বেশি বৃষ্টি হয়, সে দেশের মাটি থেকে অনেক সময়ে এই সার ধুয়ে যায়। মরুভূমির অন্তরে কিন্তু এ সার সঞ্চিত থাকে। সেখানে অভাব শুধু জলের। তাই মরুভূমির অন্তরে জল ঢোকাতে পারলেই যে-সব শস্যের শুধু গোড়ায় জল চাই সে-সব শস্য প্রভূত পরিমাণে জন্মায়। সিন্ধুনদ থেকে খাল কেটে জল নিয়ে গিয়ে সিন্ধুদেশকে এখন শস্যশ্যামলা করে তোলা হয়েছে।

দক্ষিণাপথের ভিতরকার মাটি আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্‌গত পাথর-ভাঙা মাটি। এ মাটিতে খাবার জিনিস তেমন জন্মায় না। আর দক্ষিণাপথের অপর মাটিও অতি নিরেস মাটি, তাতে ধান জন্মায় না, গমও জন্মায় না; জন্মায় শুধু বাজরি আর জোয়ারি, আর তারই রুটি খেয়েই এ দেশের লোক জীবনধারণ করে। এ দু ভাগের

দুটি অংশ কিন্তু খুব উর্বর, পশ্চিমে মালাবার ও পূর্বে করমণ্ডল উপকূল। মালাবার নারিকেল গাছের দেশ, আর করমণ্ডল তাল গাছের। তা ছাড়া এই দেশে শস্যও প্রচুর জন্মায়। তবুও দাক্ষিণাপথ নিজের দেশেরই খোরাক জুগিয়ে উঠতে পারে না; দেশে-বিদেশে অন্ন বিতরণ করা তো তার পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু এই দাক্ষিণাপথের আর-একটি সম্পদ আছে। আগ্নেয়গিরির পাথর-ভাঙা মাটিকে ব্ল্যাক কট্‌ন্‌ সয়েল বলা হয়, কারণ ও-মাটির রঙ কালো ও তাতে কাপাস জন্মায়। এ দেশে এত কাপাস জন্মায় যে দাক্ষিণাপথ শুধু সমগ্র ভারতবর্ষকে নয়, দেশ-বিদেশকে তুলো জোগায়। বাংলা যেমন ধানের দেশ, পাঞ্জাব যেমন গমের দেশ, দাক্ষিণাপথ তেমনি মুখ্যত তুলোর দেশ। এ দেশ শুধু কাপাসের দেশ নয়, শিমুলেরও দেশ। অস্তি গোদাবরীতীরে বিশাল শাল্মলীতরু—এ কথাটা শুধু গল্পের কথা নয়। দাক্ষিণাপথের তুল্য বিশাল শাল্মলীতরু পৃথিবীর অন্য দেশে বিরল।

এই থেকে দেখতে পাচ্ছ যে ভারতবর্ষ, কি অন্ন কি বস্ত্র, কিছুরই জন্য অপর কোনো দেশের মুখাপেক্ষী নয়। আজকাল কেউ কেউ বাংলাদেশে কাপাসের চাষ করতে চান। এ চেষ্টা দাক্ষিণাপথে ধানের চাষ চালাবার অনুরূপ। এ ইচ্ছা অবশ্য অতি সদিচ্ছা, কিন্তু এ ইচ্ছা জিয়োগ্রাফির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সমগ্র ভারতবর্ষকে ঢেলে সাজাবার মহৎ বাধা হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রকৃতি।

ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফির পরিচয় দিতে ঃ

আমি আমার বরাদ্দ এক ঘণ্টার ভিতর সে দেশের আকৃতি ও প্রকৃতির মোটামুটি পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। তাতে তোমাদের তরুণ জ্ঞানপিপাসা কতদূর মিটেছে বলতে পারি নে। যদি না মিটে থাকে তো আমার বক্তব্য এই যে—যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।

এখন এই কথাটি তোমাদের বলতে চাই যে, এই সমগ্র দেশটি একদেশ। পৃথিবীতে আর যে-সব দেশ একদেশ বলে গণ্য, সে-সব ছোটো ছোটো দেশ। এক মহাচীন ব্যতীত অপর কোথাও এত বড়ো দেশ একদেশ বলে গণ্য হয় নি।

প্রথমত, এদেশের চতুঃসীমা এ দেশকে যেমন পরিচ্ছিন্ন করেছে, অন্য কোনো দেশকে তেমন করে নি। চীনদেশে এর তুল্য স্বাভাবিক সীমানা নেই, তাই চীনেরা তাদের দেশ প্রাচীর দিয়ে ঘিরতে চেষ্টা করেছিল, পাশাপাশি অন্যান্য দেশ থেকে স্বদেশকে পৃথক্‌ করবার জন্য। এ চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হয়েছে।

হিমালয়ই হচ্ছে ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফির সবচেয়ে বড়ো জিনিস। পৃথিবীর আর-কোনো দেশের অত বড়ো প্রাচীর নেই। তার পর ঐ হিমালয়ই সত্যসত্য ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা ও জলবায়ুর নিয়ন্তা। হিমালয়ের জলই হচ্ছে উত্তরাপথের প্রাণ। আর হিমালয়ই সমগ্র ভারতবর্ষের বায়ুর চলাচল নিয়ন্ত্রিত করে। এর ফলে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ এমন উর্বর, এমন মানুষের বাসোপযোগী দেশ হয়েছে। তার পর ভারতবর্ষের অন্তরে কোনো সমুদ্র কিংবা হ্রদ নেই, আর তার

মধ্যস্থ একমাত্র পর্বতশ্রেণী বিন্ধ্যশ্রেণী এত উচ্চ নয় যে, ভারতবর্ষের উত্তর-দক্ষিণকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারে। তার পর এই একদেশ এত বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, এক হিসেবে একে পৃথিবীর সংক্ষিপ্তসার বলা যেতে পারে।

ভারতবর্ষ মহাদেশটি অতি সুরক্ষিত দেশ। প্রকৃতি নিজ হাতেই এ দুর্গের পর্বতের প্রাকার ও সাগরের পরিখা গড়ে দিয়েছেন। তবে এ দেশ এশিয়ার অপরাপর দেশ হতে বিচ্ছিন্ন হলেও তাদের সঙ্গে একেবারে যোগাযোগশূন্য নয়। পূর্বেই বলেছি যে, উত্তরাপথের পশ্চিমে দুটি প্রবেশদ্বার আছে— উত্তরে খাইবার পাস ও দক্ষিণে বোলান পাস। অতীতে এই দুই রন্ধ্র দিয়ে ইরানি তুরানি শক হূন যবন বাহ্লিক মোগল পাঠান প্রভৃতি জাতিরা এ দেশে প্রবেশ করেছে, কিন্তু সহজে নয়। খাইবার পাস দিয়ে ঢুকলে পাঞ্জাবের পঞ্চনদ পার হয়ে এসে গঙ্গাযমুনার দেশে পৌঁছতে হত, আর বোলান পাস দিয়ে এলে বিদেশীদের বুকে মরুভূমি ঠেকত।

ভারতবর্ষের অন্তরে প্রবেশ করবার আসল দ্বার হচ্ছে দিল্লি নামক শহর। কারণ সেখানে মরুভূমি ও আরাবলি পর্বত শেষ হয়ে শস্যশ্যামল সমভূমি আরম্ভ হয়েছে। সেই মিলনস্থানেই মোগল-পাঠানরা দিল্লি নগর প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর্যদের ইন্দ্রপ্রস্থ নগরও এইখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর, দিল্লির উপকণ্ঠেই ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান রণক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র থানেশ্বর পাণিপথ এ-সবই প্রায় এক জায়গায়। পুরাকালে দিল্লির গেট না ভেঙে কোনো বিদেশী জাতি ভারতবর্ষের ভিতর প্রবেশ করতে পারে নি। ফলে যে-সকল জাত ও-দ্বার খুলতে পারে নি তারা হয় দেশে ফিরে গিয়েছে, নয় সিন্ধু ও পঞ্চনদ-দেশ অধিকার করে বসেছে।

ভারতবর্ষের সমুদ্রকূলেও দু-চারটি ছাড়া আর প্রবেশদ্বার ছিল না, আর সে-ক'টি বন্দর দক্ষিণাপথের পশ্চিম উপকূলে; উত্তরে ভৃগুকচ্ছ ও সুরপারগ এবং দক্ষিণে কালিকট ও কোচিন।

এই-ক'টি দ্বার দিয়েই ইউরোপীয় জাতিরা জাহাজে করে সমুদ্র পার হয়ে এ দেশে প্রবেশ করেছে। পোর্তুগিজ ওলন্দাজ ইংরেজ ও ফরাসিরা এই পথ দিয়েই ভারতবর্ষে ঢুকেছে। ভারতবর্ষে প্রবেশ করবার স্থলপথ এখন বন্ধ। খাইবার পাস এবং বোলান পাস এই দুই দুয়োরই এখন দুর্গ দিয়ে সুরক্ষিত; কিন্তু জলপথ এখন পশ্চিম দক্ষিণ ও পূর্ব তিন দিকে খোলা। এখন ভারতবর্ষের সঙ্গে এশিয়ার যোগ ছিন্ন হয়েছে, তার পরিবর্তে নূতন যোগ স্থাপিত হয়েছে ইউরোপের সঙ্গে; সে যোগ অবশ্য দৈহিক নয়, মানসিক।

এই এক ঘণ্টা ধরে তোমাদের কাছে ভারতবর্ষের যে মোটামুটি বর্ণনা করলুম, সে বর্ণনার ভিতর থেকে তার একটা অঙ্গ বাদ পড়ে গেল। দেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সুতরাং ভারতবাসীদের কথা বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফির বর্ণনা পূর্ণাঙ্গ হয় না। তবে-যে ভারতবর্ষের নানা দেশের নানা জাতীয় লোকের রূপগুণের পরিচয় দিতে চেষ্টামাত্র করি নি, তার কারণ সে পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। অ্যানথ্রপলজি নামক বিজ্ঞান আমি জানি নে, আর সে বিজ্ঞানেরও এ বিষয়ে বিশেষ কোনো জ্ঞান নেই। অ্যানথ্রপলজি এ বিষয়ে সত্য খুঁজছে, কিন্তু আজও তার সাক্ষাৎ পায় নি। আজ এক অ্যানথ্রপলজিস্ট যা বলেন,

কাল অপর অ্যানথ্রপলজিস্ট তার খণ্ডন করেন। সুতরাং ও-শাস্ত্রের মনগড়া কথা সব তোমাদের শুনিয়ে কোনো লাভ নেই; বরং সে-সব কথা শোনায় তোমাদের ক্ষতি আছে। বিজ্ঞানের নাম শুনলেই আমরা অজ্ঞান হই। অর্থাৎ ঐ নামে যে-সব কথা চলে, সে-সব কথাকে এ যুগে বেদবাক্য বলে মেনে নিই। আমাদের মতো বয়স্ক লোক-দেরই যখন মনের চরিত্র এহেন, তখন তোমাদের পক্ষে এ-সব অনিশ্চিত বিজ্ঞানের সুনিশ্চিত কথা শোনায় ভয়ের কারণ আছে। তোমাদের মন স্বভাবতই বিশ্বাস-প্রবণ। বিজ্ঞানের কথা ছেড়ে দাও, খবরের কাগজের কথাতেও তোমরা বিশ্বাস কর। বুজরুক শব্দটার মানে শুনতে পাই জ্ঞানী। বুজরুক নামক জ্ঞান নিয়েই কাগজ-ওয়ালাদের কারবার। আর নিত্য দেখতে পাই যে, সেই-সব বুজরুকি কথা তোমাদের নরম মনে এমনই বসে যায় যে, সে কালির ছাপ অনেকের মনে চিরজীবন থেকে যায়। সুতরাং ভারতবর্ষের নৃতত্ত্ব অথবা জাতিতত্ত্ব নিয়ে তোমাদের সুস্থ মনকে ব্যস্ত করবার কোনো প্রয়োজন নেই।

ভারতবর্ষের সকল লোক যে এক জাতির লোক নয়, এ সত্য তো সকলের কাছেই প্রত্যক্ষ। এ দেশে বিভিন্ন প্রদেশের লোকের রূপের ও বর্ণের ভিতর কতটা স্পষ্ট প্রভেদ আছে তা সকলেরই চোখে পড়ে। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তাদের প্রকৃতিও বিভিন্ন। আমি পূর্বে তোমাদের বলেছি যে, পৃথিবীর জিয়ো-গ্রাফিকাল ভাগ ও পলিটিকাল ভাগ এক নয়। এ দেশের লোক পলিটিকাল হিসেবে এক জাত হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসেবে এক জাত নয়। জিয়োগ্রাফির ভাগের হিসেবে তাদের জাতেরও স্পষ্ট ভাগ আছে। পলিটিক্সের হিসেবে কাশ্মীরি পণ্ডিত অবশ্য তামিল নাইডুর সহোদর, কিন্তু জিয়োগ্রাফির হিসেবে এঁরা পরস্পরকে কিছুতেই দেশকা ভাই বলতে পারেন না। আজ আমি তোমাদের কাছে যতদূর সংক্ষেপে পারি ভারতবর্ষের বর্তমান জিয়োগ্রাফির বর্ণনা করলুম; বারান্তরে তোমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন জিয়োগ্রাফি ও প্রাচীন ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফির কথা শোনাব। পুরাকালেও স্বদেশের জিয়োগ্রাফি জানবার কৌতূহল লোকের ছিল, এবং এ বিষয়ে যেটুকু জ্ঞান তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন তা তাঁরা লিখে রেখে গিয়েছেন; আর তার থেকেই জানা যায় যে, কালক্রমে ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফিরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটেছে।

তোমাদের ভরসা দিচ্ছি যে, সে বর্ণনা এ বর্ণনার চেয়ে ঢের ছোটো হবে, আর আশা করি ঢের বেশি সরস হবে। যে-সব দেশের, যে-সব শহরের, যে-সব পাহাড়ের, যে-সব নদীর নাম আমরা রামায়ণ-মহাভারতে পড়ি, তারা কোথায় ছিল আর তাদের ভিতর কোন্‌টি, স্বনামে না হোক, স্বরূপে বিরাজ করছে, সে-সব কথা শুনতে তোমাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। সেকালের ভারতের পরিচয় দিতে আমাকে কষ্ট করতে হবে, কিন্তু শুনতে তোমাদের কোনো কষ্ট হবে না।

মাঘ ১৩৩২

অনু-হিন্দুস্থান

কোনো পারিবারিক সমিতিতে পঠিত

হে সমিতির কুমারগণ, আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস যে হিন্দুস্থানের বাইরে হিন্দুর আর স্থান নেই। এ বিশ্বাস সর্বসাধারণ। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই ধারণা যে, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতি আছে শুধু জিয়োগ্রাফিতে—যাকে বলে ভারতবর্ষ তারই চতুঃসীমার মধ্যে।

আমরা সকলেই দেখতে পাই, ভারতবর্ষের পশ্চিমে রয়েছে মুসলমান, উত্তরেও তাই, পূর্বে বৌদ্ধ, আর দক্ষিণে সমুদ্র। আর সমুদ্রের ওপারে যদি কোনো দেশ থাকে তো সে দেশে হিন্দুজাত কখনো যায় নি; আর যদি কখনো গিয়ে থাকে তো তখনই তাদের হিন্দুত্ব মারা গিয়েছে। কেননা একালে হিন্দুজাতির সমুদ্রযাত্রার অর্থ তার গঙ্গাযাত্রা।

এ ধারণা শিক্ষিতলোকসামান্য হলেও, অশিক্ষিত ধারণা। ইংরেজি শিক্ষার চশমা পরলে আমাদের বর্তমান জাতীয় দৈন্য ও হীনতা সম্বন্ধে আমাদের চোখ যেমন ফোটে, আমাদের জাতীয় পূর্বগৌরব ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে আমরা তেমনি অন্ধ হই। আমাদের নূতন শিক্ষা এসেছে পশ্চিম থেকে। এর ফলে আমরা পূর্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—পূর্বকাল সম্বন্ধেও, পূর্বদিক সম্বন্ধেও। ভারতবর্ষের পূর্বকালের হিস্টরির সঙ্গে আমাদের যদি কিছুমাত্র পরিচয় থাকত তা হলে আমরা জানতুম যে, ভারতবর্ষের পূর্বের অনেক দেশেও অনেককাল ধরে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতি রাজত্ব করেছে। আজকাল অনেকে যাকে ভারতবর্ষের অতীত বলে চালিয়ে দিতে চান, তা কোনো দেশেরই অতীত নয়, ভারতবর্ষের তো নয়ই। বেশির ভাগ লোকের মতে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ যেমন ইউরোপের বর্তমান, জনকতক লোকের মতে ভারতবর্ষের অতীতও তেমনি ইউরোপের বর্তমান। আমাদের কল্পনার দৌড়ও বিলেত পর্যন্ত।

আমাদের শাস্ত্রকাররা বলেন লোকের নাম থেকে দেশের নাম হয়, দেশের নাম থেকে লোকের নাম হয় না। যথা, আর্যরা বাস করতেন বলেই আধখানা ভারতবর্ষের নাম হয়েছিল আর্যাবর্ত; আর আর্যরা যদি অপর কোনো দেশে গিয়ে বাস করেন, তা হলে সে দেশের নামও হবে আর্যাবর্ত। এই হিসেবে ভারতবর্ষ ও চীনের ভিতর যে-সব দেশ আছে, সে-সব ভূভাগকে উপ-হিন্দুস্থান বলা অন্যায় নয়। যাক সে-সব পুরোনো কথা। তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে যে, আজও এশিয়ার এক কোণে এমন একটি দেশ আছে, যেখানকার ষোলো-আনা অধিবাসী আজও হিন্দু। সেই দেশটির সঙ্গে তোমাদের চেনাপরিচয় করিয়ে দিতে চাই। সে পরিচয় করিয়ে দিতে বেশিক্ষণ লাগবে না। মাপে ও ম্যাপে ভারতবর্ষ যেমন বড়ো, সে দেশটি তেমনি ছোটো। ভারতবর্ষের তুলনায় সেটি তালের তুলনায় তিল যদ্রূপ, তদ্রূপ। এমন-কি, মান-

চিত্রেও সে দেশটি হঠাৎ কারো চোখে পড়ে না; অনেক খুঁজেপেতে সেটিকে বার করতে হয়। সেকালের উপ-হিন্দুস্থানের দক্ষিণে ম্যাপের গায়ে যে কতকগুলো কালির ছিটেফোঁটা দেখা যায়, তারই এক বিন্দু হচ্ছে এই বর্তমান অনু-হিন্দুস্থান।

ও দেশের হিস্টরি তোমরা না জান, তার নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এর নাম বলিদ্বীপ এবং এটি হচ্ছে যবদ্বীপ থেকে ভাঙা এক টুকরো খণ্ডদ্বীপ। ম্যাপে দেখতে পাওয়া যায় যে, জাভা সমুদ্রের মধ্যে পশ্চিমে মাথা করে পূর্বে পা ছড়িয়ে অনন্তশয্যায় শুয়ে রয়েছে; আর তার পায়ের গোড়ায় পুঁটুলি পাকিয়ে জড়োসড়ো হয়ে রয়েছে— বলি। এ দুটি দ্বীপকে যদি খাড়া করে তোলা যায়— অর্থাৎ তাদের মাথা যদি পশ্চিম থেকে উত্তরে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, আর পা পূর্ব থেকে দক্ষিণে— তা হলে ভারতবর্ষের নীচে লংকা যেমন দেখায়, জাভার নীচে বলিও তেমনি দেখাবে। এ কথাটা এখানে বলে রাখছি এইজন্যে যে, সিংহলের পূর্ব-ইতিহাস যেমন ভারত-বর্ষের পূর্ব-ইতিহাসের একটা ছেঁড়াপাতা মাত্র, বলির ইতিহাসও তেমনি জাভার ইতিহাসের একটি ছিন্নপত্র।

জাভা ও বলির মধ্যে যে সমুদ্রের ব্যবধান আছে, সে অতি সামান্য। সে শাখা-সমুদ্রটুকু মাইল দেড়েকের বেশি চওড়া নয়, অর্থাৎ চাঁদপুরের নীচে মেঘনার তুল্য। বলিদ্বীপ কতটা লম্বা আর কতটা চওড়া তা শুনলে তোমরা হাসবে। বলি দৈর্ঘ্যে ৯৩ মাইল ও প্রস্থে মোটে ৫০ মাইল; তাও আবার সমস্তটা সমতলভূমি নয়। এই ছোট্ট দেশের মধ্যে বহুসংখ্যক হ্রদ আছে, আর সে-সব হ্রদ এত গভীর যে, তাদের অতলস্পর্শী বললেও অত্যুক্তি হয় না। তার উপর একটি একটানা পর্বতশ্রেণীর দ্বারা দেশটি দু ভাগে বিভক্ত। দেশ ছোটো, কিন্তু তার পর্বত যেমন লম্বা তেমনি উঁচু; অর্থাৎ ও হচ্ছে একরকম বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি। সে পর্বতের উচ্চতা কোথায়ও সাড়ে তিন হাজার ফুটের কম নয়, কোথাও-বা তা দশ হাজার ফুট পর্যন্ত মাথা তুলেছে। এ পর্বত বলিদেশকে উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথে ভাগ করেছে— ভারতবর্ষের নকলে।

তোমরা হয়তো মনে ভাববে যে এই দেশেরই ইংরেজি নাম হচ্ছে লিলিপুট, কিন্তু তা নয়। গালিভার লিলিপুট-দেশের লোকের যে বর্ণনা করেছেন, তার সঙ্গে বলির অধিবাসীর চেহারার কোনো মিল নেই। এরা আকারে জাভার লোকের চেয়ে ঢের বেশি দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ। দেশ ছোটো হলে সেখানকার মানুষ যে বড়ো হয়, তা অন্যত্রও দেখা যায়। ইউরোপের ভিতর ইংলণ্ড সবচেয়ে ছোটো দেশ; কিন্তু এ দেশের মতো বড়োলোক ও-ভূভাগে অন্য কুত্রাপি মেলে না। অপর পক্ষে, অতি ক্ষুদ্র লোকের সাক্ষাৎ শুধু মহাদেশেই মেলে। বামনের জাত শুধু আফ্রিকাতেই আছে। গালিভার বলিদ্বীপে না গেলেও সিন্ধুবাদ যে সে দেশে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ, যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক তার স্কন্ধে ভর করেছিলেন, তিনি ছিলেন বলীয়ান্।

বলির লোক শুধু বলিষ্ঠ নয়, অত্যন্ত কর্মিষ্ঠ। চাষবাসে তারা অতিশয় দক্ষ। তারা হল-চালনা ছাড়া হাতের আরো অনেক কাজ করে। তারা চমৎকার কাপড় বোনে ও চমৎকার অস্ত্র বানায়। তাদের তুল্য তাঁতি ও কামার জাভায় পাওয়া যায় না। অন্ন বস্ত্র ও অস্ত্রের সংস্থান যে দেশে আছে, সে দেশে একালের আদর্শ

সভ্যতার কোন্ উপকরণ নেই? আর শৌখিন অশনবসনের ব্যবস্থাতেও বলি বঞ্চিত নয়। সে দেশে কফি জন্মায় আর তামাক জন্মায়। আর এ দুই তারা পান করে; একটা তাতিয়ে জল করে, আর-একটা পুড়িয়ে ধোঁয়া করে—যেমন আমরা করি। বলির লোক রেশমের কাপড়ও বোনে আর তা রঙাবার জন্য নীলের চাষও করে। সোনা দিয়ে তারা গহনা গড়ায় ও জরি বানায়। গহনা গড়তে ও জরির কাজ করতে তারা অদ্বিতীয় ওস্তাদ।

বলির ভাষা জাভার ভাষারই অনুরূপ। তবে ইতালির ভাষার সঙ্গে ফরাসি ভাষার যে প্রভেদ, যবীয় ভাষার সঙ্গে বলীয় ভাষার সেই প্রভেদ। এ দেশের সাহিত্যের ভাষার নাম 'কবি', 'সাধু' নয়। পাঁচশো বৎসর পূর্বে জাভার সাহিত্য কবি-ভাষাতেই লেখা হত। এ ভাষার অনেক শব্দ সংস্কৃত। এ যুগে জাভার লোক তাদের সাহিত্যের ভাষা বড়ো-একটা বুঝতে পারে না—কিন্তু বলির লোকের কাছে কবি মৃত নয়। চারশো বৎসর আগে জাভার লোক সব মুসলমান হয়ে যায়। সম্ভবত সেইজন্য তারা তাদের পূর্ব কবি-ভাষা ভুলে গিয়েছে; আর বলির লোক আজও হিন্দু রয়েছে বলে কবির পঠনপাঠন সে দেশে আজও চলছে।

জাভার যথার্থ নাম যে যবদ্বীপ, তা তোমরা সবাই জান। সংস্কৃত যব শব্দের অন্তস্থ য আরবদেশের মুসলমানদের মুখে বর্গীয় জ-এ ও ব ভ-এ পরিণত হয়ে তদুপরি অকার আকার হয়ে জাভা রূপ ধারণ করেছে।

এই সংস্কৃত নাম থেকেই আন্দাজ করা যায় যে, পুরাকালে ও-দ্বীপের নামকরণ করেছিল হিন্দুরা। এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার, কবে হিন্দুরা এ দ্বীপ আবিষ্কার করে। এর উত্তর দেওয়া অসম্ভব। তবে যেকালে এ দেশে রামায়ণ লেখা হয়, সেকালে যবদ্বীপ যে হিন্দুদের কাছে উক্ত নামেই পরিচিত ছিল তার প্রমাণ রামায়ণেই আছে। আর সে বড়ো কম দিনের কথা নয়। তোমরা সবাই জান যে, রামায়ণ রাম জন্মাবার ষাট হাজার বৎসর আগে লেখা হয়েছিল; আর রাম জন্মেছিলেন ত্রেতা যুগে।

শ্রীমৎ হনুমানকে যখন দেশদেশান্তরে সীতাকে অন্বেষণ করতে আদেশ দেওয়া হয়, তখন তাকে বলা হয়—

> গিরিভির্যে চ গম্যন্তে প্লবনেন প্লবেন চ।
> রত্নবন্তং যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতম্ ॥
> সুবর্ণরূপ্যকং চৈব সুবর্ণাকরমণ্ডিতম্।
> যবদ্বীপমতিক্রম্য শিশিরো নাম পর্বতঃ।
> দিবং স্পৃশতি শৃঙ্গেন দেবদানবসেবিতঃ।

এ যবদ্বীপ যে বর্তমান জাভা, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা সেখানে যেতে হত প্লবনেন প্লবেন চ—অর্থাৎ হয় লাফিয়ে, নয় সাঁতরে, নয় ভেলায় চড়ে। কিষ্কিন্ধ্যা থেকে লঙ্কায় এক লম্ফে যাওয়া সোজা, কারণ এক লম্ফে তা যাওয়া যায়। কিন্তু মাদ্রাজ থেকে বলি যেতে হলে অসম্ভব হাই জাম্প ও লং জাম্প একসঙ্গে দুই চাই। আর বঙ্গ-উপসাগর তো ইংলিশ চ্যানেল নয় যে, সাঁতরে পার হওয়া যায়। সুতরাং ও দেশে ভেলায় চড়েই যেতে হত। যবদ্বীপ রত্নবন্ত ও সোনারুপোর দেশ

আর সোনার খনিতে মণ্ডিত। কোনো কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন, এ দেশ জাভা নয়, সুমাত্রা। কেননা সোনার খনি জাভায় নেই ও কোনো কালে ছিল না— ছিল ও আছে শুধু সুমাত্রায়। অপর আর-এক দল বলেন যে, যবদ্বীপ জাভাই, সুমাত্রা নয়। কিন্তু আসল কথা এই যে, সেকালে হিন্দুদের কাছে জাভা ও সুমাত্রা উভয় দ্বীপই যবদ্বীপ বলে পরিচিত ছিল। সুমাত্রা পরে স্বর্ণদ্বীপ সুবর্ণদ্বীপ প্রভৃতি নাম ধারণ করে। সুমাত্রা নাম পুরোনো নয়। স্বর্ণদ্বীপে সমুদ্র বলে একটি নগর ছিল। সেই সমুদ্রই আরবি জবানে রূপান্তরিত হয়ে সুমাত্রা হয়েছে, এবং এই নতুন নামেই ও-দ্বীপ ইউরোপীয়দের কাছে পরিচিত, আর একালের জিয়োগ্রাফিতে প্রসিদ্ধ।

ইউরোপীয় পণ্ডিতরা বলেন যে, প্রাচীন হিন্দুদের ভূগোলের জ্ঞানের দৌড় ঐ যবদ্বীপ পর্যন্ত ছিল। তার পূর্বে যে আর-কোনো দেশ আছে, তা তাঁরা জানতেন না। তাই তাঁরা যবদ্বীপ অতিক্রম করে যে শিশির-পর্বতের উল্লেখ করেছেন, সে পর্বত তাঁদের ষোলো-আনা মনগড়া। আমি প্রথমত ইউরোপীয় নই, দ্বিতীয়ত পণ্ডিত নই; সুতরাং তাঁদের কথা আমি নতমস্তকে মেনে নিতে বাধ্য নই।

যবদ্বীপ অতিক্রম করে যে দ্বীপটি পাওয়া যায়, তার নাম বলিদ্বীপ; এবং তার অন্তরে যে পর্বত আছে, সে পর্বতকে শিশির বলা ছেরেফ কবিকল্পনা নয়। কেননা যার এক-একটি শৃঙ্গ দশ হাজার ফুটের চেয়েও উঁচু, সে পর্বতকে কিছুতেই গ্রীষ্ম-পর্বত বলা যায় না, যদি কিছু বলতে হয় তো শিশির বলাই সংগত। শুনতে পাই উক্ত দ্বীপপুঞ্জ চিরবসন্তের দেশ। সুতরাং সে দেশের পাহাড়ে শীত হবারই কথা। আর সে পর্বত দেবদানব-সেবিত বলবার অর্থ সেখানে মানুষের বসতি নেই। হনুমানকে সীতার খোঁজে আরো অনেক স্থানে যেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু সে-সব দেশ যে রূপকথার দেশ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যে দেশে মানুষের কান হাতির কানের মতো বড়ো, ও যে দেশে মানুষের কান উটের কানের মতো ছোটো, আর যে দেশে মানুষের পা দুটো নয়, একটা মাত্র, অথচ সেই এক পায়ে তারা খুব ফুর্তি করে চলে, সে-সব দেশেও হনুমানকে ভ্রাম্যমাণ হবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ-সব দেশের কোনো নাম বলা হয় নি। এর থেকেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, যে-সব দেশের নাম হিন্দুরা জানত না, সেই-সব দেশ সম্বন্ধে তাদের কল্পনা খেলত। যে দেশের নাম তারা জানত, সে দেশের রূপও তারা চিনত।

সে যাই হোক, বলিদ্বীপেরও নাম যখন সংস্কৃত, তখন সে নামকরণ যে হিন্দুরাই করেছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আর খৃস্টজন্মের পূর্বেও যে হিন্দুরা বলিদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, তারও কিছুকিঞ্চিৎ প্রমাণ আছে।

এই দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ-স্থাপন হিন্দুজাতির ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। সে ইতিহাস আমি আজ তোমাদের শোনাব না; কারণ সে মস্ত লম্বা ইতিহাস। হিন্দুজাতির মহা গৌরবের কথা এই যে, হিন্দুরা এই দ্বীপবাসী অসভ্য জাতদের সভ্য করে তুলেছিলেন। এ দেশের লোক পূর্বে যে কিরকম ঘোর অসভ্য ও ভীষণপ্রকৃতির লোক ছিল, তা রামায়ণে দ্বীপবাসীদের বর্ণনা থেকেই অনুমান করা যায়। তারা ছিল 'আমমীনাশনাঃ' অর্থাৎ তারা কাঁচা মাছ খেত।

তাতে কিছু যায় আসে না; কেননা সুসভ্য জাপানিরা আজও তাই খায়। বাল্মীকি শুনেছিলেন যে, তারা 'অন্তর্জলচরা ঘোরা নরব্যাঘ্রাঃ'। নরশার্দূল অবশ্য আমরা বীরপুরুষদেরই বলি, কিন্তু নরব্যাঘ্র বলতে বীরপুরুষ বোঝায় না, বোঝায় সেই জাতীয় পুরুষদের, যারা 'অক্ষয়া বলবন্ত পুরুষা পুরুষাদকা'— ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যানিবলস্। এই হেমাঙ্গ কিরাতের দল ছিল সব ক্যালিবনের দাদা ক্যানিবল।

শ্রীবিজয়রাজ্যের অর্থাৎ সুমাত্রার ইতিহাস-লেখক জনৈক ফরাসি পণ্ডিত বলেছেন যে—

আমরা পুরোনো দলিলপত্র থেকে প্রমাণ পেয়েছি যে, ভারত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ পুরাকালে এক নব সভ্যতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। যেমন কাম্বোজের (ক্যাম্বোডিয়া) ও চম্পার (আনাম-কোচিনচায়না) তেমনি এ দেশেরও Alma Mater ভারতবর্ষ বহুকাল পূর্বে তার দেবতা, তার শিল্পকলা, তার ভাষা, তার সাহিত্য, সংক্ষেপে তার সভ্যতার সকল মহামূল্য উপকরণ এই দ্বীপবাসীদের সানন্দে দান করেছিল, এবং সহস্র বৎসরের অধিককাল ধরে এই দ্বীপবাসীরা সমগ্র হিন্দু-সভ্যতা ভক্তিভরে শিক্ষা ও আয়ত্ত করে তাদের হিন্দু-গুরুদের গৌরবান্বিত করেছিল।

একটি সভ্য জাতি একটি অসভ্য জাতিকে নিজের ধর্ম আর্ট ও সাহিত্যের চেয়ে বড়ো আর কোন্ মহামূল্য বস্তু দান করতে পারে।

প্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক ই-চিং খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ থেকে স্বদেশে ফেরবার পথে সুমাত্রার অন্তর্গত শ্রীবিজয়রাজ্যে কিছুকাল বাস করেন। তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখে গিয়েছেন যে—

শ্রীবিজয়ের বৌদ্ধ-পণ্ডিতরা ভারতবর্ষের মধ্যদেশের পণ্ডিতদের মত সমগ্র সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চা করেন, ও তাঁদের ক্রিয়া-কলাপ আচার-বিচার মধ্যদেশের ক্রিয়া-কলাপ আচার-বিচারের সম্পূর্ণ অনুরূপ। সুতরাং ভবিষ্যতে চীন-পরিব্রাজকরা যেন প্রথমে শ্রীবিজয়ে এসে সংস্কৃত শিক্ষা করেন পরে ভারতবর্ষে যান।

আমরা যেমন আগে গোলদিঘির পণ্ডিতদের কাছে ইংরেজি শিক্ষা করে পরে বিলেত যাই।

ই-চিংয়ের পরামর্শ অনুসারে তাঁর পরবর্তী বহু চীনদেশীয় পরিব্রাজক সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষা করবার জন্য যবদ্বীপ ও শ্রীবিজয়ে গিয়েছিলেন। এখানে একটি কথা বলে রাখি। যবদ্বীপে প্রথমত হিন্দুধর্ম প্রচলিত ছিল, পরে সে দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচারিত হয়। কিন্তু যবদ্বীপে এ দুই ধর্ম পৃথক্ ছিল না, দুয়ে মিলে একই ধর্ম হয়। বুদ্ধ সে দেশে শিববুদ্ধ নামেই পরিচিত। এ দেশে বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার হিসেবেই গণ্য; কিন্তু সে দেশে শিবে ও বুদ্ধে সমান হয়ে গিয়েছিল। সেকালে হিন্দুরা যে অপর দেশের লোককে সভ্য করেছিল, এ কথা বিশ্বাস করা দূরে থাক্, এ যুগের আমরা তা কল্পনাও করতে পারি নে; কারণ এখন অপর দেশের লোক আমাদের সভ্য করছে, আর তাদের সভ্যতা আমরা সকল তন মন ধন দিয়ে মুখস্থ করতে এতই ব্যস্ত যে, ভারতবর্ষ যে এককালে সভ্য ছিল সে কথা আমাদের মনে স্থান পায় না, পায় শুধু মুখে।

সুতরাং ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের লোক যবদ্বীপে গিয়ে বসতি করে, এ প্রশ্ন তোমাদের মনে উদয় হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে প্রমাণের চেয়ে অনুমানের উপর বেশি নির্ভর করতে হয়; অর্থাৎ অন্ধকারে ঢিল মারতে হয়। ঐতিহাসিকরা সে ঢিল দেদার মেরেছেন, কিন্তু তার একটাও যে ঠিক লোকের গায়ে গিয়ে পড়েছে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

তবে এটুকু ভরসা করে বলা যায় যে, তারা আর যে জাতই হোক, মাদ্রাজি নয়। যে উত্তরাপথের লোক দাক্ষিণাপথকে সভ্য করেছে, খুব সম্ভবত তারাই ঐ দ্বীপ-বাসীদেরও সভ্য করেছে। যবদ্বীপে যে মহাভারতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তা উত্তরাপথে যে মহাভারত প্রচলিত ছিল, তারই অনুবাদ।

কোথায় ভারতবর্ষের উত্তরাপথ আর কোথায় মহাসাগর, সুতরাং তাঁরা কোন্ বন্দর থেকে মহাসমুদ্রে অবতরণ করলেন? খুব সম্ভবত তাঁরা মসলিপত্তনে গিয়ে জাহাজে চড়েছিলেন। আর গুজরাটের Broach নগর থেকে মসলিপত্তন পর্যন্ত যে একটি স্থলপথ ছিল, তারও প্রমাণ আছে। সুতরাং এরূপ অনুমান করা অসংগত নয় যে, আর্যাবর্তের আর্যরাই এই সভ্যতা-প্রচারকার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। মনু বলেছেন যে, আর্যদের আচারই একমাত্র সাধু আচার, অতএব তা 'শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ'। এ কথার ভিতর মস্ত একটা গর্ব আছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি আছে উদারতা আর মহত্ত্ব। দক্ষিণাপথের তামিলরাও সুমাত্রা জয় করতে গিয়েছিল, কিন্তু সে বহুকাল পরে—খৃস্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে। তাদের উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল শ্রীবিজয়রাজ্য বিজয় করে তাকে শ্রীভ্রষ্ট করা। বালিদ্বীপের কথা বলতে গিয়ে যবদ্বীপের বিষয় দু কথা বললুম এইজন্য যে, সেকালের যবদ্বীপের হিন্দু-ধর্ম একালে বালিদ্বীপে মজুত রয়েছে।

রামায়ণের যুগে যবদ্বীপ সপ্তরাজ্যে উপশোভিত ছিল; কিন্তু খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সে দেশে তিনটি মাত্র রাজ্য ছিল। খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে যবদ্বীপের হিন্দুরাজ্যের যখন ধ্বংস হয় ও সে দেশের লোকে মুসলমানধর্ম অবলম্বন করে, তখন এক দল লোক স্বধর্ম রক্ষা করবার জন্য যবদ্বীপ থেকে পালিয়ে বালিদ্বীপে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদেরই বংশধরেরা এখন বালির অধিবাসী। আর এই ক্ষুদ্র দ্বীপবাসীরাই আজ পর্যন্ত তাদের স্বধর্ম ও স্বরাজ্য দুই রক্ষা করে আসছে। হিন্দু হলেই পরাধীন হতে হবে, বিধির যে এমন-কোনো নিয়ম নেই, তার তিলমাত্র প্রমাণ ঐ দেশেই আছে। বালিদ্বীপ স্বাধীন, কিন্তু যে হিসাবে জাপান স্বাধীন সে হিসাবে নয়; যে হিসাবে নেপাল স্বাধীন সেই হিসাবে, এবং একই কারণে। হিন্দুস্থানের ইতিহাসের ধারা এই যে, সে দেশ প্রথমে মুসলমানের অধীন হয়, ও পরে খৃস্টানের। নেপাল ও বালি আগে মুসলমানের অধীন হয় নি, কাজেই তা আজ খৃস্টানের অধীন হয় নি।

বালিদ্বীপ একরত্তি দেশ হলেও কোনো একটি রাজার রাজ্য নয়, এই একশো মাইল লম্বা ও পঞ্চাশ মাইল চওড়া দেশ অষ্ট রাজ্যে উপশোভিত। আর এই আটটি ভাগের আটটি পৃথক্ রাজা আছে। এর থেকেই বুঝতে পারছ, এ দেশে যা আছে তা পুরোমাত্রায় হিন্দুরাজ্য। ভারতবর্ষও হিন্দুযুগে হাজার পৃথক্ রাজ্যে বিভক্ত

ছিল। এ দেশে যে দু জন একচ্ছত্র রাজত্ব করে গিয়েছেন, তাঁরা হিন্দু নন। অশোক ছিলেন বৌদ্ধ, আর আকবর মোগল। এক রাজ্যের প্রজা না হলে এক দেশের লোক যে এক নেশন হতে পারে না, এ হচ্ছে ইউরোপের হাল মত। হিন্দুরা প্রাচীন যুগে যদি এক নেশন হয়ে থাকে তো সে এক ধর্মের বন্ধনে। অষ্ট রাজ্যে বিভক্ত হলেও বলির অধিবাসীরা এক নেশন—এক ধর্মাবলম্বী বলে। ইউরোপে একালে নেশন গড়ে রাজায়; আর এ দেশে সেকালে গড়ত দেবতায়। পশ্চিমের সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে রাজনীতি, আর পূর্বের সবচেয়ে বড়ো কথা ছিল ধর্মনীতি।

যেমন রাজ্যের ব্যবস্থায়, তেমনি সমাজেও তাঁরা পুরো হিন্দু। তারা এক জাতি হলেও পাঁচ জাতে বিভক্ত। এ পাঁচ জাত হচ্ছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও চণ্ডাল। এ পাঁচ জাত পরস্পর বিবাহাদি করে না। পূর্বে অসবর্ণ বিবাহের শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। গীতায় ভয় দেখিয়েছে যে, এ করলে ও হবে, ও হলে তা হবে, আর তা হলেই হবে বর্ণসংকর, তার পরেই প্রলয়। বলির হিন্দুসমাজ বোধ হয় গীতার মতেই চলে। আর প্রাণদণ্ডটাও বোধ হয় দেওয়া হত গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় অনুসারে। যদি কোনো ঘাতক কারো প্রাণ বধ করতে ইতস্তত করত তা হলে তাকে সম্ভবত বলা হত—

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ।

আমরা সকলেই যখন ব্রহ্ম তখন কে কাকে মারে, আর কেই-বা মরে। কিন্তু এতটা নির্জলা হিঁদুয়ানি এ যুগে চলে না। কারণ এ যুগের লোকের যখন-তখন মরতে ঘোর আপত্তি আছে, কিন্তু যাকে-তাকে বিয়ে করতে আপত্তি নেই। তাই এখন নিয়ম হয়েছে যে, অসবর্ণ বিবাহ করলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যার বর্ণ নিম্ন, অপর পক্ষও সেই বর্ণভুক্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ জাতিভেদের কাঠামো বজায় থাকবে, কিন্তু লোকের এক বর্ণ ত্যাগ করে আর-এক বর্ণে ভর্তি হবার স্বাধীনতাও থাকবে। স্কুলের ছেলেরা যেমন পড়া মুখস্থ না দিতে পারলে উপরের ক্লাস থেকে নীচের ক্লাসে নেমে যায়, বলির লোকেরাও তেমনি অসবর্ণ বিবাহের ফলে উলটো প্রমোশন পায়।

কিছুদিন পূর্বে বলিদ্বীপে সতীদাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন সে প্রথা উঠে গিয়েছে। এখন সতী যায় শুধু রাজার ঝি-বৌরা। এর কারণ বোধ হয় রাজারা অবলাদের আঁচল না ধরে স্বর্গেও যেতে পারে না। সে যাই হোক, এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বেণ্টিঙ্ক সাহেব এ দেশে না এলেও এতদিনে হিন্দুসমাজে সতীদাহ প্রথা উঠে যেত, ছেরেপ কালের গুণে।

বিবাহের পর আসে অবশ্য আহারের কথা। বলীয়ানরা কি খায় তা জানি নে, কিন্তু তারা গো-মাংস ভক্ষণ করে না, এমন-কি, বলিদ্বীপে গোহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তারা কিন্তু শুয়োর নিত্য খায়, তবে তাতে তাদের হিন্দুত্ব নষ্ট হয় না। সে দেশে সকল বরাহই বন্যবরাহ, কারণ দেশটাই হচ্ছে বুনো দেশ।

তাদের ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় দু কথায় দিই। ভারতবর্ষের সব দেবতা বলিদ্বীপে গিয়ে জুটেছেন। এমন-কি, কার্তিক সমুদ্রলঙ্ঘন করেছেন ময়ূরে চড়ে, আর গণেশ ইঁদুরে চড়ে। ইঁদুর যে পিঁপড়ের মতো চমৎকার সাঁতার কাটতে পারে, তা

বোধ হয় তোমরা সবাই জান, কারণ ছেলেরা চিরকালই মেয়েদের কাছে শুনে আসছে যে, পিঁপড়ে খেলে সাঁতার শেখা যায়।

কিন্তু সেখানকার মহাদেব হচ্ছেন কাল, আর মহাদেবী দুর্গা। বলিদ্বীপের দুর্গাপুজো নৈমিত্তিক নয়, নিত্য। বলিদ্বীপের অধিবাসীরা বৌদ্ধও নয়, বৈষ্ণবও নয়। ও-সব ধর্ম গ্রহণ করলে তাদের প্রধান ব্যাবসা—অস্ত্রের ব্যাবসা—যে মারা যায়। আর বাকি থাকে শুধু বস্ত্রের ব্যাবসা। একমাত্র বস্ত্রের সাহায্যে স্বরাজ হয়তো লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু রক্ষা করা যায় না।

বলিদ্বীপের অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার, দেবদেবতার সংক্ষেপে যে পরিচয় দিলুম, তার থেকেই বুঝতে পারছ তারা যে হিন্দু, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। এমন-কি, যে-সব ইউরোপীয়ের সে দেশের সঙ্গে পরিচয় আছে, তাঁরা বলেন যে তাদের যদি কেউ অহিন্দু বলে, তা হলে তারা অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে।

বলিদ্বীপে যখন ব্রাহ্মণ আছে, তখন সে দেশে নিশ্চয় পণ্ডিতও আছে। এই পণ্ডিতদের নাম পেদণ্ড। বলির পণ্ডিতরা সংস্কৃত পণ্ডিতের অপভ্রংশ না হয়ে কি করে যে ইংরেজি pedantএর অপভ্রংশ হল, সে রহস্য আমি উদ্‌ঘাটিত করতে পারি নে। তবে নামে বড়ো কিছু আসে যায় না। আমাদের দেশের পাণ্ডা, বিলেতের পেডাণ্ট ও বলির পেদণ্ড, সবাই একজাত; তিনজনই সমান মূর্খ। কৃত্তিবাসের রামায়ণে হনুমানকে বলা হয়েছে যে—

সর্বশাস্ত্র পড়ে বেটা হলি হতমূর্খ।

ইউরোপের পণ্ডিতেরা সর্বশাস্ত্র পড়ে পেডাণ্ট হয়, বলিদ্বীপের পণ্ডিতরা কোনো শাস্ত্র না পড়েই পেদণ্ড হয়; পূর্ব পশ্চিমের ভিতর এই যা প্রভেদ। আমরা পূর্ব, সুতরাং 'অন্ত' হবার চাইতে 'অণ্ড' হবার দিকেই আমাদের ঝোঁক বেশি।

এই কারণে আমার বলিদ্বীপে যাবার ভয়ংকর লোভ হয়, উক্ত দ্বীপে পেদণ্ডদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করবার জন্য। এ দেশের পেদণ্ডদের কাছে শাস্ত্রালোচনা ঢের শুনেছি, কিন্তু বলিদ্বীপের পেদণ্ডদের কাছে অনেক নূতন কথা শুনতে পাব বলে আশা আছে। সম্ভবত সে সবই পুরোনো কথা, কিন্তু এত পুরোনো যে, আমার কাছে তা সম্পূর্ণ নূতন বলে মনে হবে।

দুঃখের বিষয়, বলিদ্বীপে যাবার বল এ বয়েসে আমার আর নেই। কারণ সে দেশে যেতে হয় প্লবেন প্লবনেন চ। আশা করি, তোমরা যখন মানুষ হবে, তখন তোমরা কেউ কেউ ও-দেশে একবার হাওয়া বদলাতে যাবে, বিদেশে হিন্দু-সভ্যতার নয়, হিন্দু-অসভ্যতার নিদর্শন দেখতে। আমরা বিলেতি পলিটিকাল সভ্যতা যেরূপ তেড়ে মুখস্থ করছি, তাতে আশা করতে পারি যে তোমরা যখন বড়ো হবে, তখন এ দেশের শিক্ষিত লোক এই স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, হিন্দু-সভ্যতা অতি মারাত্মক অসভ্যতা। আর পূর্বে যে তা সংক্রামক ছিল, তার পরিচয় ঐ-সব দেশেই পাবে। ভবিষ্যতে তোমাদের হিন্দুধর্মের প্রতি যদি কিছুমাত্র মায়া নাও থাকে, তবু এথনলজির উপর মায়া তো বাড়বে। আর বলিদ্বীপের পেদণ্ডদের কাছে ও-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে মোটা অনেক তত্ত্ব উদ্ধার করতে পারবে। পৃথিবীতে অসভ্য লোক না থাকলে এথনলজি অ্যানথ্রপলজি প্রভৃতি বিজ্ঞানের জন্ম হত না; যেমন পৃথিবীতে রোগ না

থাকলে চিকিৎসাবিজ্ঞান জন্মাত না। সুতরাং আশা করি, আর কোনো কারণে না হোক, বিজ্ঞানের খাতিরেও বলীয়ানরা আর কিছুদিন তাদের অসভ্যতা রক্ষা করে বেঁচে থাকবে। তবে তাদের পাশে রয়েছে ওলন্দাজরা। তারা ইতিমধ্যে তাদের সভ্য না করে তোলে। আর ওলন্দাজি সভ্যতা আত্মসাৎ করতে পারলেই তারা আমাদেরই মতো সভ্য হয়ে উঠবে। ইংরেজি সভ্যতার সঙ্গে ওলন্দাজি সভ্যতার শুধু সেইটুকু প্রভেদ, হুইস্কি ও জিনএর ভিতর যে প্রভেদ। আসলে ও-দুই এক। ও-দুয়ের নেশাই সমান ধরে। আর তার ফলে কারো দুর্বল দেহকে সবল করে না, শুধু সকলের সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে।

সে যাই হোক, এই ক্ষুদ্র দ্বীপ সম্বন্ধে তোমাদের কাছে এতক্ষণ ধরে যে বক্তৃতা করলুম, তার উদ্দেশ্য তোমাদের দ্বীপান্তর-গমনের প্রবৃত্তি উদ্রেক করা নয়, আমাদের পূর্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে তোমাদের কৌতূহল উদ্রেক করা। নিজের দেশের অতীত সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়ায় কোনো লাভ নেই, কারণ যার অতীত অন্ধকার তার ভবিষ্যতও তাই—অর্থাৎ সেই জাতের, যার অতীত বলে একটা কাল ছিল।

বৈশাখ ১৩৩৪

স মা জ

তেল নুন লকড়ি

যেমন আমরা অতীতে বিদেশীয়তা স্বদেশীরকমে অভ্যাস করেছি, তেমনি আমাদের ভবিষ্যতে স্বদেশীয়তা বিদেশী নিয়মে চর্চা করতে হবে। আমরা সাহেব হয়েছিলুম বাঙালি ভাবে। সে ব্যাপারটার মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক ঢিলেমি এবং এলোমেলো ভাবেরই শুধু পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা দল বেঁধে বিধিব্যবস্থাপূর্বক সাহেব হই নি। প্রতিজনেই নিজের খুশি কিংবা সুবিধা-অনুসারে নিজের চরিত্র এবং ক্ষমতার উপযোগী হঠাৎ-সাহেব হয়ে উঠেছি। ইঙ্গবঙ্গ-সমাজে আমরা সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান। স্বদেশী আচার-ব্যবহার ছাড়বার সময় আমরা পুরুষেরা পহিলা সমিতি করি নি, এখন ফিরে ধরবার ইচ্ছেয় আমরা মহিলা-সমিতি পর্যন্ত গঠন করেছি। এই যথেষ্ট প্রমাণ যে, আমাদের নতুন ভাব কার্যে পরিণত করতে হলে ভাবনা-চিন্তা চাই; কি রাখব, কি ছাড়ব, তার বিচার চাই; পাঁচজনে একত্র হয়ে কি করতে পারব এবং কি করা উচিত, তার একটা মীমাংসা করা চাই; এক কথায়, ইংরেজ যে উপায়ে কৃতকার্য হয়েছে সেই উপায়—একটা পদ্ধতি—অবলম্বন করা চাই। সমাজ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবার ভিতর নিয়ম নেই। ঝোঁকের মাথায় রোখের সহিত কাজ করতে গেলে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হওয়াই দরকার। কিন্তু সমাজে থাকতে কিংবা ফিরতে হলে সকলেরই মানসিক গতি একই কেন্দ্রের অভিমুখী হওয়া চাই, এক নিয়মে অনেককে ধরা দেওয়া চাই। আমাদের বিদেশীয়তার ভিতর হিসাব ছিল না, স্বদেশীয়তার ভিতর হিসাব চাই। যে পরিবর্তনের জন্য আমরা উৎসুক হয়েছি, তার বিষয় হচ্ছে প্রধানত বাহ্যবস্তু। কিন্তু সেই পরিবর্তন সুসাধ্য করতে হলে মনকে অনেকটা খাটাতে হবে। সমাজে থাকতে হলে বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ কোনো চর্চা করবার দরকার নেই, প্রচলিত নিয়মের নির্বিচারে দাসত্ব স্বীকার করলেই হল; ছাড়তে হলেও দরকার নেই—নির্বিচারে নিয়ম লঙ্ঘন করলেই হল। কিন্তু ফিরতে হলে মানুষ হওয়া চাই; কারণ যে ফেরে, সে নিজের জ্ঞান এবং বুদ্ধির দ্বারা কর্তব্য স্থির করে নিয়ে স্বেচ্ছায় ফেরে। আমরা বাঙালি-সাহেবই হই, আর খাঁটি বাঙালিই হই, আমরা সকলেই এক পথের পথিক হয়েছিলুম; কেউ-বা বিপথে বেশি দূর এগিয়েছি, কেউ-বা কিছু পিছিয়ে আছি। আমাদের সমাজস্থ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অনেকেই বর্ণচোরা বাঙালি-সাহেব। আমাদের হিন্দুসমাজে শৃঙ্খলা অতীতে গঠিত হয়েছিল, আজকালকার দিনে নতুন অবস্থায় কতকাংশে তা সকলেরই পক্ষে শৃঙ্খল মনে হয়। আমরা জনকতক শুধু উচ্ছৃঙ্খল হয়েছি, বাদ-বাকি সকলে সমাজকে বিশৃঙ্খল করে ফেলেছেন। সুতরাং সকলে মিলেই স্বদেশীয় আচার-ব্যবহারে ফিরে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়েছি। সকলেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, সুতরাং যে পরিমাণে সাধ্য এবং উচিত সেই পরিমাণে ফিরব, তার বেশি নয়। জাতীয় জীবনের বিশেষ কোনো লক্ষ্য ছিল না বলে এতদিন আমরা গা ঢেলে দিয়ে স্রোতে ভাসছিলুম, তার ভিতর কোনো আয়াস, কোনো চেষ্টা ছিল না; এখন গম্যস্থানের একটা ঠিকানা

পাওয়া গেছে, সুতরাং সাঁতার কাটতে হবে— শুধু এলোমেলোভাবে, অতিবেগে হাত-পা ছুঁড়লে চলবে না; তাতে পাঁচজনে হাসবে, দশজনে 'বাহবা কি বাহবা, কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ' বলবে, কিন্তু আমরা লাভের মধ্যে শীঘ্রই এলিয়ে পড়ব এবং নাকানি-চোবানি খাব।

পূর্বেই বলেছি যে, আমরা বাঙালিমাত্রেই ঐ একই বিলেতি ক্ষুরে মাথা মুড়িয়েছি। শুধু কারো মাথায় কাকপক্ষ অবশিষ্ট, কারো মাথায়-বা শুধু টিকি; যাঁর যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তিনি সেইটেই স্বদেশীয়তার ধ্বজাস্বরূপ আস্ফালন করেন। এ ব্যাপারে আমাদের ইঙ্গবঙ্গ-দলের মন ভারি করবার কোনো কারণ নেই। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের জাতি যদি কোনো স্থায়ী সুফল লাভ করে থাকে তো সে মনে, আর যা যা ক্ষণস্থায়ী কুফল লাভ করেছে, সে বাহ্য আচার-ব্যবহারে। মোটামুটি ধরতে গেলে এ ব্যাপারের লাভলোকসানের হিসাবটা ঐরূপ দাঁড়ায়। সেই আচার-ব্যবহারের বিজাতীয়তা আমাদের মধ্যে যেমন স্পষ্ট এবং জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে, এমন আর অন্য কোনো শ্রেণীর লোকের মধ্যে হয় নি। সকলেই অল্পবিস্তর বিলেতি মধু পান করেছেন, কিন্তু পুরো নেশা শুধু আমাদেরই ধরেছে। বিদেশী বস্তুর বড়ো বস্তা আমরা মাথায় বহন করছি, অপরে পুঁটলি-পাঁটলা নিয়ে চলেছে। আমরা যদি আমাদের মাথার সে ভার নামাতে পারি, তা হলে অপরের পক্ষে তাদের মাথার সে ভার ঝেড়ে ফেলা কঠিন হবে না। এই স্বদেশীয়তার কথা শুধু দেশের কথা নয়, এ ঘরেরও কথা। বাঙালি যখন নিজের সমাজ ছাড়ে, তখন সেইসঙ্গে নিজের স্বভাব ছাড়ে না। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে; অর্থাৎ সেখানেও অপরের পায়ের চাপ না পেলে তার দিন চলে না। আমাদেরও স্বভাব তাই। নিজের সমাজের চাপ থেকে বেরিয়ে এসে বিদেশী সমাজের পায়ের চাপ আমরা পিঠে তুলে নিই। বাঙালিজাতকে পিটে গড়া হয় নি। আমরা ঢালাই হতে ভালোবাসি। এক ছাঁচ থেকে বেরোলে আমরা অন্য ছাঁচে না পড়লে ঠাণ্ডা হই নে। অনুকরণ আমাদের স্বাভাবিক। এবং অনুকরণে যেহেতু শুধু উপকরণ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু কিছুই আত্মসাৎ করা যায় না, সেই কারণে আমরা বিলেতি সভ্যতার উপকরণে আমাদের দৈনিক জীবন নিতান্ত ভারাক্রান্ত করে তুলেছি। আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো অস্থি-মজ্জায় অনুভব করেছেন যে, বিলেতি সভ্যতার কুলি-গিরির মজুরি পোষায় না। কিন্তু দু-একজন ছাড়া মুখ ফুটে সে কথা বলতে বড়ো কেউ সাহসী হন নি। দেশীয় সমাজের রীতিনীতির অধীনতার মধ্যে, কার্যের না হোক, চিন্তার স্বাধীনতা আছে। যার মন আছে, তার সামাজিক আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার এবং মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার আছে; কিন্তু বিলাতের অনুকরণে যে বাঙালি ঘর বাঁধে, তার একূল-ওকূল দুকূল যায়। আমাদের মধ্যে যার মন যত ঢিলে, তার সাহেবিয়ানার আঁটাআঁটি তত বেশি। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণ কোথায় যে বুঝতে পারে না, সে তার সর্বাঙ্গে হাতড়ে বেড়ায়। আমরা অনেকে একটা খোরপোশের বন্দোবস্ত করতে বিলেত যাই, সুতরাং বিলেতি সভ্যতার যে শুধু খাওয়া-পরার অংশটা আয়ত্ত করতে চেষ্টা করব, এর আর আশ্চর্য কি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যে আরামের লোভে আমরা সর্বস্ব

খোয়াতে বসি, সেই আরামই আমাদের জোটে না; দেশীয় সমাজের চালচলন শৈশব হতে অভ্যস্ত বলে সেদিকে মন দিতে হয় না, ঠিক ঠিক জিনিসটে অবলীলাক্রমে করে যাই; কিন্তু বিদেশী চালচলন সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই একটা বয়সে কেঁচেগণ্ডূষ করতে হয়। একটু বয়েস হলে একটি বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা যেমন কষ্টসাধ্য, একটি বিদেশী সমাজের হাজারো-এক খুঁটিনাটি আচার-ব্যবহার আয়ত্ত করাও তেমনি কঠিন। বিলেতি সভ্যতার সুমুখে বাঙালি-সাহেবের আঁচল টানতে টানতে প্রাণ যায়। খানায়-পোশাকে যাঁরা সভ্যতা খোঁজেন, তাঁদের খানার-পোশাকের কায়দা-কানুন কন্ত করতে নাস্তনাবুদ খানেখারাপ হতে হয়। যাঁরা মাছিমারা নকল করতে চান, তাঁদের নিত্য দেখতে পাই, অক্ষরের পর অক্ষর ধরে বিদেশী হালচাল অভ্যেস করতে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হচ্ছে। অন্যকে বানান করে পড়তে শুনলে মায়াও করে, বিরক্তিও ধরে। সাধারণ ইঙ্গবঙ্গের প্রতিও আমাদের ঐ মনোভাব। কারো কারো বা বিলেতি সভ্যতার বর্ণপরিচয় হয়েছে, কিন্তু অর্থবোধ হয় নি। এতদ্দেশীয় মুসলমান মহিলার কোরানপাঠের মতো তাঁদের সভ্যতাচর্চার পরিশ্রমটা বৃথা যায়।

সংস্কারবশত হিন্দুসমাজের প্রতি যাঁদের প্রাণের টান আছে, অথচ শিক্ষাবশত যাঁরা সংস্কারমাত্রেরই অধীন নন, যাঁদের ধারণা যে ইউরোপের শিষ্য হওয়া এবং দাস হওয়ার ভিতর আকাশপাতাল প্রভেদ, যাঁরা বিলেতি আচার-ব্যবহার কতকপরিমাণে অবলম্বন করেন—হয় বুদ্ধির দ্বারা পরীক্ষা ক'রে, নয় জীবনে পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে—এক কথায় যাঁরা শ্যাম এবং কুল, দুইই রাখবার চেষ্টা করেন, তাঁরা আহেল বিলেতি ইঙ্গবঙ্গদের মতে কেন্দ্রভ্রষ্ট। বাদ-বাকি যাঁরা নিজের নিজের ব্যাবসা ব্যতীত অপর কোনো বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র মনোপ্রয়োগ করাটা বুদ্ধিবৃত্তির বাজে-খরচ মনে করেন, তাঁরাই বুদ্ধিমান। কেন্দ্রভ্রষ্ট?—কোথাকার, কোন্ সমাজের, কোন্ কেন্দ্র-ভ্রষ্ট? এ প্রশ্ন করলে সকল বুদ্ধিমানই নিরুত্তর। পড়ানো-কাকাতুয়ার কপ্‌চানো বুলির মতো যদি তাঁদের কথা নিরর্থক না হয়, যদি তাঁদের বক্তব্যের ভিতর মনের কার্য কিছু প্রচ্ছন্ন থাকে তো সে মনোভাব এই—তাঁরা প্রত্যেকেই এক-একটি কেন্দ্র, তাঁদের কাছ থেকে যে যতটা তফাত, সে ততটা কেন্দ্রচ্যুত, ততটা উন্মার্গগামী। বিলেতফেরত-পাড়ায় প্রতি গৃহ একটি সৌরজগৎ; হয় কর্তা নয় গৃহিণী সেই জগতের কেন্দ্র; পরিবারের আর-সকলে গ্রহ-উপগ্রহের মতো তারই চারি পাশে পাক খায়, এখানে-সেখানে দু-একটি ধূমকেতুও দেখা দেয়। আমাদের কারো গৃহ, হিন্দুগৃহের একটি পরিবর্তিত যুগপৎ পরিবর্ধিত ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র; কারো-বা গৃহ বিলেতি গৃহের একটি নিকৃষ্ট ফোটোগ্রাফ মাত্র। আমরা কেউ-বা বিদেশীয়তার দু-চার সিঁড়ি ভেঙেছি, কেউ-বা একলম্ফে বিলেতি সভ্যতার মন্দিরের চূড়ার উপরিস্থিত ত্রিশূলের উপর গিয়ে চড়ে বসেছি।

সাহেবিয়ানার প্রচণ্ড নেশায় বঙ্গসন্তানকে যে কতদূর বে-এক্তিয়ার করে ফেলতে পারে, তার প্রমাণ ধর্মতলার রঙ্গমন্দিরে ধর্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠার্থে করুণ যাচঞালব্ধ বিদেশীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তাব্লো Tableaux হিবর্ভা Vivants অভিধেয় বিচিত্র চিত্র-অভিনয়। নেশা ধরা পড়ে দুই জিনিসে—অঙ্গবিক্ষেপে এবং বাক্যবিপর্যয়ে।

এ ব্যাপারে দুই লক্ষণেরই সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। ঐ দৃশ্য-কাব্যের পিছনে একটি দর্শন আছে, একটি কবিত্ব আছে; সেই কবিত্বপূর্ণ দর্শন কিংবা দার্শনিক কবিত্বের প্রকাশ নিউ ইন্ডিয়া সংবাদপত্রে। উক্ত ব্যাপারের সপক্ষে নিউ ইন্ডিয়ার মতামত, ইন্ডিয়া না হোক নিউ বটে। জস্টিস অনুকূল মুখার্জির জীবনীর ভাষা যেমন নতুন, এর ভাবও তেমনি নতুন; এবং উভয় রচনাই এক উপায়ে সিদ্ধ হয়েছে। ইংরেজি ফরাসি ল্যাটিন গ্রীক এবং ইটালিয়ান নানা ছোটো-বড়ো বাছা-বাছা বাক্য ও পদের অসংগত সমাবেশে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনীলেখকের রচনা ভাষার রাজ্যে যেমন এক অপূর্ব কীর্তি, জীবতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব ইতিহাস পুরাণ ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের ছোটো-বড়ো নানা বাছা-বাছা শব্দ এবং বাক্যের অসংগত সমাবেশে সম্পাদক মহাশয়ের রচনা চিন্তার রাজ্যে তেমনি এক অপূর্বকীর্তি। লেখক কিছুই বাদ দেন নি—চিত্রকলাও নয়, নৃত্যকলাও নয়। কলাবিদ্যার কতকটা জ্ঞান অনেকটা চর্চার উপর নির্ভর করে, কিন্তু অসমসাহসী লেখকের পক্ষে ঠিক তার উলটো। দাম্ভিকতার বলে অজ্ঞতা বিজ্ঞতার সিংহাসনে অধিরোহণ করতে পারে। কলাবিদ্যার শুধু শেষাংশ দেখাবার চেষ্টা করে অনেকে, তাঁরা যে শুধু তার প্রথমাংশ জানেন, এই প্রমাণ করেন। এ বিশ্ব ভগবানের লীলাখেলা হতে পারে, কিন্তু সমাজের সৃষ্টি স্থিতি এবং উন্নতি মানুষের লীলাখেলার ফল নয়। এই প্রবন্ধে উক্ত ব্যাপারের অবতারণা করবার একটু বিশেষ সার্থকতা আছে। আমাদের নকল সভ্যতা এর ঊর্ধ্বে আর উঠতে পারে না। আমাদের দোলের ঐ শেষসীমা, পেন্ডুলম্‌কে ঐখান হতেই ফিরতে হবে, এবং কার্যত ফিরতে আরম্ভ করেছে। ঘরে বিদেশী অনাচারের ঠেলা এবং বাইরে বিদেশী অত্যাচারের চাপ, এই দুয়ের ভিতর পড়ে যাঁরা কিঞ্চিৎ বেদনা অনুভব করছিলেন, তাঁদের অনেকেরই আজ চৈতন্য হয়েছে। ঐ ঘটনায় আমাদের মধ্যে অনেক অন্যমনস্ক লোকেরও মনে পড়ে গেছে যে, আমাদের একটা সমাজ ব'লে কোনো জিনিস নেই। আমরা ঝরাপাতার দল, হাওয়ায় আমাদের কখনো-বা একত্র জড় করে, কখনো-বা ছড়িয়ে দেয়। গাছের অসংখ্য পাতা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হলেও তাদের সকলের ভিতর নাড়ির এবং রক্তের বন্ধন আছে; তাদের একের প্রাণের মূলও যেখানে, অপরের প্রাণের মূলও সেখানে—দেশের মাটিতে। কিন্তু আজ আমাদের অনেকেরই চোখ ফুটেছে। আমরা নিজের নিজের সংকীর্ণ সমাজ ত্যাগ করলেও হিন্দুসমাজ আমাদের ত্যাগ করে নি। আমরা নিজেরা শুধু সেই বৃহৎ সমাজের মধ্যে আর-একটি সংকীর্ণ সমাজ গড়তে চেষ্টা করেছিলুম, সৌভাগ্যক্রমে তাতে কৃতকার্য হই নি। আজকাল ভারতবাসীর দেহে নতুন প্রাণ এসেছে; হিন্দুসমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজে পরিণত হচ্ছে, জাতের ভাব দূর হয়ে জাতীয় ভাব উপস্থিত হয়েছে, আমরা পরস্পরের পার্থক্য ভুলে গিয়ে স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর পার্থক্য অনুভব করতে আরম্ভ করেছি। এ অবস্থায় আমাদের স্বদেশীয়তায় ফেরার অর্থ আমরা যে বরাবর স্বদেশ ও স্বজাতির অন্তর্ভূত হয়েই আছি, সেই বিষয়ে স্পষ্টজ্ঞান জন্মানো। আমরা যে-সমাজে ফিরছি, সে-সমাজ পূর্বে ছিল না, আজও পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত হয় নি, ভবিষ্যতে তার রূপ যে কি হবে, তাও আমরা আজ ঠিক ধরতে পারি নে। তার স্বরূপ জানবারও কোনো

আবশ্যক নেই; শুধু এই জানি যে, আমাদের জাতির মূলশক্তি উদ্‌বোধিত হয়েছে। সেই শক্তি আমাদের সকলেরই প্রাণে জাগরূক হয়ে উঠেছে, যে শক্তির কার্য হচ্ছে আমাদের সমগ্র জাতির অপরূপ শ্রী এবং উন্নতি সাধন করা। জড়পদার্থ নিয়ে একটা কিছু গড়তে হলে আগে হতেই একটা প্ল্যান এবং এস্‌টিমেট করতে হয়; কিন্তু প্রাণ নিজের আকৃতি নিজে গড়ে নেয়, বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপও ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আসে। প্রকৃতি যে ফুল ফোটাবে, মানুষ তার সাহায্য করতে পারে কিংবা বাধা দিতে পারে, কিন্তু তাতে স্বকপোলকল্পিত বর্ণ গন্ধ আকার এনে দিতে পারে না। কাগজের ফুল রচনায় আমাদের যে স্বাধীনতা আছে, গাছের ফুল ভালো করে ফোটানোতে সে স্বাধীনতা নেই। আমাদের স্বদেশী সমাজের অক্ষয়-বটে নতুন পাতা দেখা দিয়েছে, আমাদের কর্তব্য এখন তার গোড়ায় প্রচুর সার এবং জল জোগানো, আর চার পাশের জঞ্জাল ও জঙ্গল দূর করা। আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক-সকল স্বদেশী সমাজ অবলম্বন করেও আমাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করব, কিন্তু সে তার শাখাপ্রশাখা হয়ে, পরগাছা হয়ে নয়। সুতরাং আমরা স্বদেশে যাতে বিদেশী না হই, সে বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। আমাদের তন মন ধন দেশের পায়ে বিকতে হবে, বিদেশের পায়ে নয়। আমাদের এই ধারণাটুকু জন্মানো উচিত যে, আমাদের কেউ নিজের শক্তি বিক্ষিপ্ত করে ফেলবার অধিকারী নন; সকলের শক্তি একত্র করে, সংহত করে, স্বদেশের স্বজাতির উন্নতির কার্যে প্রয়োগ করতে হবে। অল্প হোক, বিস্তর হোক, আমাদের প্রত্যেকের আত্মশক্তি যাতে ব্যর্থ না হয়, যাতে তা সামাজিক গতির সহায়ভূত হয়, তার জন্য প্রথমত দিক্‌নির্ণয় করা দরকার। তার পর, কোথায় কি উপায়ে নিজশক্তি প্রয়োগ করতে পারি, তার হিসাব জানতে হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার বক্তব্য দেখতে পাচ্ছি ক্রমে ফলাও এবং গুরুতর হয়ে আসছে। এই স্থানেই সুতরাং আমাকে মনের রাশ টেনে ধরতে হবে। এ প্রবন্ধে আমার কতকগুলো সাদাসিধে ছোটোখাটো দৈনিক আচার-ব্যবহারের আলোচনা করবার অভিপ্রায় আছে। কিন্তু হঠাৎ দেখছি ধান ভানতে শিবের গীত শুরু করে দিয়েছি। এখন ভূমিকা ছেড়ে জমিতে নামাই আমার পক্ষে কর্তব্য। আর-একটি কথা বলেই আমি প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করব। সে কথাটি হচ্ছে এই, ভারতবর্ষের লুপ্ত সভ্যতা উদ্ধার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; আজকের দিনে নিজের দেশে আপনার ভিতর যে নতুন সভ্যতার বীজের সন্ধান পেয়েছি, তাকেই পত্র-পুষ্প-ফল-মণ্ডিত মহাবৃক্ষে পরিণত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। স্ব-দেশের জ্ঞান লাভ করতে গিয়ে স্ব-কালের জ্ঞান যেন না হারাই। আমাদের নূতন সভ্যতা যে রূপই ধারণ করুক-না কেন, মাটির গুণে তাকে স্বদেশী হতেই হবে। জীবনীশক্তির স্ফূর্তি পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই হয়। বীজ থেকে বৃক্ষ একটা ধারাবাহিক পরিবর্তনের সমষ্টি মাত্র। আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ, ভূত সমাজও হবে না, অদ্ভুত সমাজও হবে না। ইংরেজিয়ানার মোহে আমরা অদ্ভুতত্বের চর্চা করছিলুম, কিন্তু ভূতে না পেলে যে অদ্ভুতত্ব বর্জন করা যায় না, এমন নয়। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের জাতির ভিতর প্রাণ আছে। বর্তমান অশান্তি শুধু নতুন জীবনের চাঞ্চল্য, মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্ব বিকারের ছটফটানি নয়। যে সমাজে প্রাণ আছে,

সে সমাজে প্রাণের যে প্রধান লক্ষণ—বাইরের অবস্থার উপযোগী আত্মপরিবর্তন—সে লক্ষণ প্রচুর পরিমাণে দেখা যাবে। এ জগৎ গম্ ধাতু হতে উৎপন্ন, এমন গুণী আমরা কেউ নই যে জগতের ধাত বদলে দিতে পারি। স্বদেশীভাবের মূল হতে অনেক আশার ফুল ফুটবে, কিন্তু ফল ধরবে না। দেশের মাটি ভালোবাসি বলে যে, মাটি নিতে হবে, মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে, শেষটা মাটি হতে হবে, এ ভুল যেন কেউ না করেন। আমরা আজ যখন জীবনের পথে অগ্রসর হতে চলেছি, তখন এইটে মনে রাখতে হবে যে, দেশের মাটি আমাদের পদক্ষেপের পক্ষে ভগবান্‌দত্ত অটল নির্ভর। অতীতের যে আগুন নিবেছে, যার এখন ভস্মমাত্র অবশিষ্ট আছে তাতে অতি ভক্তিভরে বাতাস দিলেও শুধু ছাই উড়িয়ে সমাজের চোখে ফেলব; কিন্তু আমাদের জাতির প্রাণে যেখানে আজও আগুন আছে, সেখানেই ফুঁ দিতে হবে, পাখা করতে হবে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন, কোথায় শুধু ছাই আর কোথায় ছাই-ঢাকা আগুন আছে কি করে জানব? তার উত্তর, যদি স্পর্শ করে আগুন না চিনতে পার তো পাঁজি-পুঁথির সাহায্যে তা পারবে না। অতঃপর ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমাদের এগোতে হবে। বড়োগোছের একটা লাফ মারবার পূর্বে মানুষ কিঞ্চিৎ পিছু হটে পাল্লা নেয়; আমাদের সমাজ এখন পাল্লা নিচ্ছে। সরীসৃপের মতো সমাজও ক্রমাগত দেহকে আকুঞ্চন-প্রসারণ করে অগ্রসর হয়। কি উপায়ে কতদূর পর্যন্ত আমাদের সামাজিক দেহের আজ আকুঞ্চন করা কর্তব্য, সেই সম্বন্ধে গোটাকতক কথা বলতে উদ্যত হয়েছি।

বিবাহিত জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে পাঞ্জাবি ভাষায় একটি প্রবাদ আছে—

ভুল গেয়া রাগরঙ্গ, ভুল গেয়া ইয়কড়ি,
ইয়াদ রহা আজ খালি তেল নুন লকড়ি।

ইংলন্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ আজকাল কতকটা ঐ ভাবের দাঁড়িয়েছে। আমরা শিক্ষিত ভারতবাসীরা এতদিন প্রভুর চিত্ত আকর্ষণ করবার জন্য কতই-না হাবভাব লীলাখেলার চর্চা করেছি। ওনার মনোমত কেশবিন্যাস বেশবিন্যাস বাগ্‌-বিন্যাসের চাতুরী অভ্যাস করেছি। আত্মহারা হয়ে ইউরোপের আত্মীয় হতে যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নি। এত করেও যখন মন পেলুম না, তখন মান-অভিমানের পালা শুরু করলুম। ফল তাতে উলটো হল—দাম্পত্য প্রণয়ের দাবি করাতে দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আজ তেল নুন লকড়ির কথাই আমাদের মনে প্রাধান্য লাভ করেছে। মানবজাতিকে আমরা যে যেই ভাবে দেখি-না কেন, মানবজীবনে সকলেই তেল নুন লকড়ির গুরুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য। দেহকে আত্মার কারাগারই মনে করি, আর আত্মার মন্দিরই মনে করি, এ পৃথিবীতে দেহমনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের ভিত্তির উপর ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবন গড়তে হবে। ইহলোকের সত্তাকে মিথ্যা জ্ঞান করলে শুধু পরলোকপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। হিন্দু-শাস্ত্রের মতে অন্ন প্রাণ। সুতরাং অন্নচিন্তাই প্রাণীমাত্রেরই আদিম চিন্তা। এই

অন্নচিন্তা হতে উম্ধার না পেলে অন্য চিন্তা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তেল নুন লকড়ির অধীনতাপাশ মোচন না করতে পারলে মনের এবং আত্মার পুরো স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। মেটিরিয়াল প্রস্‌পারিটি সভ্যতার চরম লক্ষ্য নয়, কিন্তু একটি বিশিষ্ট উপায়। তেল নুন লকড়ির অধীনতা হতে মুক্ত হবার একমাত্র উপায়—তেল নুন লকড়ির সংস্থান করা। আমাদের আজ হঠাৎ চৈতন্য হয়েছে যে, ভারত-বাসীর সে সংস্থান নেই। আমরা শুকিয়ে যাচ্ছি, কেননা দেশের রস বিদেশে টেনে নিচ্ছে। নিজ দেশের রস নিজ দেহের রক্তে কিরূপে পরিণত করতে পারি, সেই আমাদের প্রধান সমস্যা। আমরা যদি ভুলে গিয়ে না থাকি, তা হলে আমাদের 'রাগরঙ্গ ইয়ৰ্কাড়ি' ভুলে যেতে হবে, আর আমাদের মনে যদি না থাকে, তা হলে মনে রাখতে হবে শুধু 'তেল নুন লকড়ি'। রাস্কিন সমস্ত জীবন ধরে ইংলণ্ডকে এই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, ইকনমিক্‌স্—এই গ্রীক শব্দের আদিম অর্থ হাউস-হোল্ড ম্যানেজমেণ্ট, অর্থাৎ গেরস্থালি। প্রতি গৃহে যদি লক্ষ্মী না থাকেন, তা হলে সমগ্রজাতি লক্ষ্মীছাড়া হবে। ঘর যদি অগোছাল রাখ, তা হলে হাটে-বাজারে যতই কেনা-বেচা কর-না কেন, তাতে নিজে কিংবা জাতি যথার্থ শ্রী এবং সুখ লাভে সমর্থ হবে না। এ মতের মধ্যে এইটুকু খাঁটি সত্য নিহিত আছে যে, দশে মিলে জাতীয় সমৃদ্ধিলাভের যে সমবেত চেষ্টা করি, তার সুফল আমরা ঘরে ঘরে স্বেচ্ছাচারিতায় নিষ্ফল করে দিতে পারি। আমরা যদি সকলে একত্র হয়ে বাইরে এক দিকে টানি, আর প্রতি লোক ঘরে এসে তার উলটো টান টানি—তা হলে ঘর বার দুই নষ্ট হবে। আমি রাস্কিনের শিষ্যস্বরূপে এই কথা প্রচার করতে উদ্যত হয়েছি যে, সুগৃহিণীর প্রথম এবং প্রধান কাজ গৃহের সম্মার্জনা করা।

আমরা যে গৃহে বাস করি, সে যে কোন্‌ দেশীয় বলা কঠিন। বাংলার বাইরে, কি স্বদেশে কি বিদেশে, কোথাও তার জুড়ি দেখতে পাই নে। গৃহ যেমন সমাজের মূল, তেমনি আবার শহরেরও বুনিয়াদ। গৃহ হতে পল্লি, পল্লি হতে নগর, নগর হতে শহর—ক্রমবিকাশের এই নিয়ম। রোম প্যারিস প্রভৃতি বনেদি শহরের আর্কি-টেক্‌চরেতেই তার ইতিহাস লিপিবন্ধ। ঐ আর্কিটেক্‌চরের প্রসাদেই নাগরিকগণ বর্তমানে অতীতের সঙ্গে ঘর করে, অতীতের সুখ দুঃখ আশা ভরসা সফলতা ও বিফলতা, গৌরব ও লজ্জা অলক্ষিতে তাদের মন অধিকার করে নেয়; প্রত্যেকেই নিজের আত্মার ভিতর বৃহত্তর জাতীয় আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করে। তাদের পক্ষে স্বজাতীয়তায় ও স্বদেশীয়তার কাছে নিজেদের ধরা দেওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক; তা হতে মুক্তি পাওয়াই আয়াসসাধ্য। আমাদের ভিতর মহদন্তঃকরণ ব্যক্তিরা যেমন অহংজ্ঞান খর্ব ক'রে স্বজাতির পায়ে আত্মসমর্পণ করাটা জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেন, তেমনি ইউরোপের মহদন্তঃকরণ ব্যক্তিরাও স্বজাতিজ্ঞান খর্ব ক'রে মানব-জাতির পায়ে আত্মসমর্পণ করাটা জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেন। আমাদের সাধনার বিষয় হচ্ছে ন্যাশনালিজ্‌ম্‌, তাদের উচ্চ সাধনার বিষয় হচ্ছে ইন্‌টার-

ন্যাশনালিজ্‌ম্‌। সে যাই হোক, কলিকাতার মতো ভুঁইফোঁড় শহরে শ্রীহীন অর্থ-হীন কিম্ভূতকিমাকার ভুঁইফোঁড় গৃহে বাস ক'রে আমাদের পক্ষে স্বদেশী ভাব রক্ষা করাটা সহজ নয়। চকমেলানো বাড়ি হালফ্যাশানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। একটি লম্বা গোছের ঘর, তার এপাশে দুটি, ওপাশে দুটি—এই পাঁচ কামরা নিয়ে আমাদের গৃহ। মধ্যের ঘরটি হচ্ছে বাইরের ঘর, এবং উভয় পার্শ্বের বাহির্দিকের ঘর-কটি হচ্ছে অন্দর। বাসস্থানের এই উলটোপালটা ভাবের সঙ্গে আমাদের সামাজিক জীবনের বরাবর যোগ রয়ে গেছে। আমাদের গ্রীষ্মের দেশে ঘরে হাওয়াও চাই ছায়াও চাই, একসঙ্গে দুই পাওয়া অসম্ভব ব'লে এ দেশের গৃহ দু ভাগে বিভক্ত হওয়া দরকার। এক অংশ বায়ুর পক্ষে যথেষ্ট খোলা, অপর অংশ সূর্যের পক্ষে যথেষ্ট রুদ্ধ। পৃথিবীর সর্বত্রই পঞ্চভূত মিলে মানুষের গৃহনির্মাণের হিসাব বাত্‌লে দেয়। প্রকৃতিই এ দেশের গৃহ সদর এবং অন্দরে ভাগ করতে শিখিয়ে-ছিলেন। এবং আমাদের সমাজের গঠনও গৃহের গঠনের অনেকটা অনুসরণ করেছে। এই কারণে গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই অবরোধ একটি সামাজিক প্রথা। আমার বিশ্বাস, এই কড়া রোদ এবং চড়া আলোর দেশে অসূর্যম্পশ্যা হবার লোভেই রমণীজাতি স্বেচ্ছায় অন্তঃপুরবাসিনী হয়েছেন। যেখানে গৃহে স্ত্রীপুরুষের স্বতন্ত্র রাজ্যের সীমা নির্দিষ্ট নেই, সেখানে সমাজেও স্ত্রীপুরুষের সাম্য অর্থে ঐক্য—এই ভুল বিশ্বাস জন্মলাভ করে। ইংরেজিয়ানার প্রসাদে আমাদের বাসগৃহের সদর অন্দর ভেস্তে যাবার প্রধান ফল এই যে, আমাদের স্ত্রীপুরুষ উভয়েই গৃহে অনেকটা সংকুচিত ভাবে বাস করে। আমাদের ড্রয়িংরুম পাড়াপড়শীর বৈঠকখানা হতে পারে না, এবং বাড়ির কোনো অংশই মেয়েদের দুর্গ নয়। এ দেশটি যে বিদেশ, সেটা সর্বদা মনে জাগরূক রাখবার জন্য ইংরেজ দেশীয় সমাজ হতে আলগোছ হয়ে থাকেন, নইলে ভয় পাছে জাতিরক্ষা না হয়। আমরা তাঁদের অনুকরণে বাসা বাঁধলে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও স্ব-সমাজ হতে দূর হয়ে পড়ি। মোটামুটি আমার বক্তব্য কথা এই, মানুষ-মাত্রেরই দেশের সঙ্গে প্রধান যোগ গৃহ দিয়ে; স্বদেশীয়তার গোড়াপত্তন ঐখানেই, গৃহ্যসূত্র হতেই মানবধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তি। গৃহের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে গৃহীর রূপান্তরও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও আমি কাউকে বাড়িবদলানোর পরামর্শ দিয়ে লোকসমাজে নিজেকে বিষয়বুদ্ধিহীন বলে প্রমাণ করতে রাজি নই। এ বিষয়ে আমার ভবিষ্যতের আশার একমাত্র ভরসা—একটা বড়োগোছের ভূমিকম্প।

গৃহে প্রবেশ করেই এক অপূর্ব দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে। আমরা দেখতে পাই যে, বিদেশী বস্তু আমাদের গৃহ আক্রমণ করেছে, এবং তার অন্তরতম প্রদেশ পর্যন্ত অধিকার করে বসে আছে। সাহেবিয়ানার খাতিরে আমাদের গৃহসজ্জা অসম্ভবরকম জটিল হয়ে পড়েছে। আসবাবের ভিড় ঠেলে ঘরে ঢোকাই মুশকিল, চলে-ফিরে বেড়াবার স্বাধীনতা তো একেবারেই নেই। এই জটিলতার মধ্যে সকলকেই কুটিল গতি অবলম্বন করতে হয়। প্রথমেই মনে হয় যে, এ ঘর বাসের জন্য নয়, ব্যবহারের জন্য নয়—সাজাবার জন্য, দেখাবার জন্য, গৃহস্বামীর ধন এবং শিক্ষার পরিচয় দেবার একটা প্রদর্শনী মাত্র, লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলনের অপ্রশস্ত ক্ষেত্র। আমাদের নূতন ধরনের গৃহসজ্জার বর্ণনা করবার কোনো দরকার নেই, কারণ তা

সকলেরই নিকট সুপরিচিত। চেয়ার টেবিল কৌচ টিপয় পিয়ানো আয়না, ছিটের পরদা, ব্রাসেল্‌সের কারপেট, চীনের পুতুল, ওলিয়োগ্রাফের ছবি—এই আমাদের নূতন সভ্যতার উপকরণ এবং নিদর্শন। গৃহস্থের অবস্থা অনুসারে এই-সকল উপকরণ হয় লাজারস এবং অস্‌ল্যর, নয় বৌবাজারের বিক্রিওয়ালার দোকান হতে সংগ্রহ করা হয়। যিনি ধনী, তাঁর গৃহ হঠাৎ দেখতে দোকান বলে ভুল হয়। আর যিনি লক্ষ্মীর কৃপায় বঞ্চিত, তাঁর গৃহ হঠাৎ দেখতে যুদ্ধক্ষেত্রের হাঁসপাতাল বলে ভ্রম হয়; আসবাবপত্র সব যেন লড়াই থেকে ফিরে এসে, হয় মেরামত, নয় দেহত্যাগের জন্য অপেক্ষা করছে। কোনো চৌকির হাত নেই, কোনো টিপয়ের পা নেই, কোনো টেবিলের পক্ষাঘাত হয়েছে; পরদার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেছে, কৌচের নাড়িভুঁড়ি নির্গত হয়ে পড়েছে, চীনের পুতুলের ধড় আছে কিন্তু মুণ্ডু নেই, পারিস পালেস্তারার ভিনাসের নাসিকা লুপ্ত, ওলিয়োগ্রাফ-সুন্দরীর মুখে মেচেতা পড়েছে, আয়নার গা দিয়ে পারা ফুটে বেরিয়েছে, পিয়ানো দন্তহীন এবং হারমোনিয়ম শ্বাস-রোগগ্রস্ত। এ অবস্থাতেও আমরা এই-সকল অব্যবহার্য কদর্য আবর্জনা দূর ক'রে তার পরিবর্তে ফরাশ বিছিয়ে বসি না কেন?—কারণ ইংরেজের কাছে আমরা শিখেছি যে দৈন্য পাপ নয়, কিন্তু স্বদেশীয়তা অসভ্যতা।

আমাদের এই নবসভ্যতার আজবঘরে স্বর্গীয় পিতামহগণ যদি দৈবাৎ এসে উপস্থিত হন, তা হলে নিঃসন্দেহ সব দেখেশুনে তাঁদের চক্ষুস্থির হয়ে যাবে। অবাক হয়ে তাঁরা ঊর্ধ্বনেত্রে চেয়ে থাকবেন, নির্বাক হয়ে আমরাও অধোবদনে বসে থাকব। উভয় পক্ষে কোনো বোঝা-পড়া হওয়া অসম্ভব। অপরিচিত অশন-বসন আসন-ভূষণের ভিতরে কিরূপে জাতি রক্ষা হয়, তা তাঁরা বুঝতে পারবেন না; কৈফিয়ত চাইলে আমাদের মধ্যে যাঁর কিছু বলবার আছে তিনি সম্ভবত এই উত্তর দেবেন যে, 'জাতি শব্দের অর্থ আপনাদের নিকট সংকীর্ণ ছিল, আমাদের নিকট তা প্রশস্ততর হয়েছে; রক্ষা অর্থে আপনারা বুঝতেন শুধু স্থিতি, আমরা বুঝি উন্নতি; আপনাদের গুরু ছিল মনু, আমাদের গুরু হার্বার্ট স্পেন্‌সার; আমাদের নূতন চাল আপনাদের হিসাবে জাতিরক্ষার প্রতিকূল, কিন্তু আমাদের হিসাবে অনুকূল।' এ কথা যদি সত্য, যদি বিজ্ঞানসম্মত হয়, তা হলে আমার আপত্তির কোনো কারণ নেই; কেননা যে প্রথা অবলম্বন করলে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের, এমন-কি, হিন্দুমুসলমানের মধ্যে আচার-ব্যবহারের চিরবিরোধ থেকে যাবে, আমার পক্ষে সে প্রথার পক্ষপাতী হওয়া অসম্ভব। যে সামাজিক শাসন জাতীয় জীবনের প্রসারতা লাভের বিরোধী, আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু আমাদের সমাজকে যে ইউরোপের পশ্চাদ্ধাবন করতেই হবে তার কোনো প্রমাণ নেই। গতিমাত্রেরই একটি স্বতন্ত্র প্রস্থানভূমি আছে, একটি দিক নির্দিষ্ট আছে, যা তার পূর্বাবস্থার দ্বারা নিয়মিত। উন্নতির অর্থ আকাশে ওড়া নয়। কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করি সেটা যেমন আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, তেমনি কোন্ সমাজে জন্মগ্রহণ করি সেও আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। পরিবর্তন যেমন কালসাপেক্ষ, পরিবর্ধন তেমনি দেশ ও পাত্র-সাপেক্ষ। আমাদের প্রত্যেকেরই দেহ ও মনের মূলে পূর্বপুরুষরা বিরাজ করছেন, এবং আমাদের জাতীয় সভ্যতা অর্থাৎ সামাজিকতার মূলে পূর্বপুরুষদের সমাজ বিরাজ করছে। বংশপরম্পরা

হেরিডিটি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো উন্নতি অসম্ভব। যে গৃহে পূর্বপুরুষদের স্থান হয় না, সে গৃহে ভোগবিলাসের চরিতার্থতা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু মানব-জীবনের সার্থকতা লাভ হয় না। স্মৃতি যেমন প্রতি মানবের অহংজ্ঞানের মূল—পূর্বাপরের যোগসূত্র-স্বরূপ স্মৃতির অস্তিত্ব না থাকলে, আত্মোন্নতি দূরে থাকুক, কেহই আত্মার সন্ধানও পেতেন না—তেমনি অতীতের স্মৃতি জাতীয় অহংজ্ঞানেরও মূল। অতীতের জ্ঞানশূন্য হয়ে কোনো জাতি জাতীয় আত্মার সন্ধান পায় না, জাতীয় আত্মোন্নতি দূরে থাকুক। সামাজিক জীবের পক্ষে অতীতের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে পিতা-পিতামহ ইত্যাদি, এবং ক্ষেত্র হচ্ছে বাস্তু। সেই বাস্তুজ্ঞানরহিত হলে আমাদের বস্তুজ্ঞানশূন্য হওয়া সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তর্ক তুলে ইঙ্গবঙ্গ-নামক খেটে-খাওয়াদলের লোককে বিরক্ত করবার কোনো সার্থকতা নেই। এ'রা বিজ্ঞানের দোহাই দেন আলোচনা বন্ধ করবার জন্য, আরম্ভ করবার জন্য নয়। হার্বার্ট স্পেন্সার এ'দের গুরু, কিন্তু শিক্ষাগুরু নন, দীক্ষাগুরু। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের কাছে এ'রা কিছুই শিক্ষালাভ করেন নি, শুধু দুটি-একটি বীজমন্ত্র গ্রহণ করেছেন, যথা সভ্যতা উন্নতি ইত্যাদি। অন্যান্য তান্ত্রিকদের মতো এই তান্ত্রিকদেরও নিকটে বীজমন্ত্র যত দুর্বোধ, সম্ভবত যত অর্থশূন্য, তত তার মাহাত্ম্য। ইউরোপীয় সভ্যতা এ'রা জ্ঞানের দ্বারা পেতে চান না, ভক্তির দ্বারা পেতে চান। দাস্যভাব-সখ্যভাবের চর্চাই এ'রা মুক্তির একমাত্র উপায় স্থির করেছেন। আমরা এ'দের যে অবস্থাটাকে দুর্দশা বলে মনে করি, সেটি শুধু ইউরোপভক্তির দশা মাত্র।

যাঁরা তর্ক করতে প্রস্তুত, তাঁরা তর্কে হার মানতেও প্রস্তুত; কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। অধিকাংশ ইঙ্গবঙ্গের মনোভাব এই যে, নগদ দামে নাহয় ধার ক'রে দুখানা কৌচ মেজ কিনব, এর মধ্যে আবার দর্শন-বিজ্ঞান কোথায়? নিজের কি আবশ্যক এবং নিজের কি মনোমত, সেটা ঠিক করতে সমাজতত্ত্ব আলোচনা করবার দরকার নেই। সুতরাং সাহেবিয়ানার সপক্ষে এ'রা হয় সুবিধা, নাহয় সুরুচির দোহাই দেন। যখন বিউটির দোহাই চলে না, তখন ইউটিলিটির দোহাই দেন; যখন ইউটিলিটির দোহাই চলে না, তখন বিউটির দোহাই দেন। যখন এ শ্রেণীর লোকেরা বিজাতীয় আচার-ব্যবহারের ইউটিলিটির ব্যাখ্যান শুরু করেন, তখন মনে হয় এ'রা জন্ স্টুয়ার্ট মিলের কৃষ্ণপক্ষীয় সন্তান; আর যখন এ'রা বিলাতি ছিট, বিলাতি কারপেটের বিউটির ব্যাখ্যান শুরু করেন তখন মনে হয় অস্কার ওয়াইল্ডের মাসতুতো ভাই। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ এ'দের জিজ্ঞাসা করে যে, জেল কিংবা পাগলাগারদের অধিবাসী না হয়েও চুলের অবস্থা ওরকম কেন, এ'রা হেসে উত্তর করবেন 'আমরা কবি নই, কাজের লোক'। এ'দের বিশ্বাস দো-আঁস্লা কুকুরের ল্যাজের মতো ইঙ্গবঙ্গের চুল যত গোড়াঘেঁষে কাটা যায়, তার তেজ তত বৃদ্ধি হয়, তত রোখ বাড়ে। এবং এই বিশ্বাস Mill মিলের মতানুযায়ী। এ'দের রুচি সম্বন্ধেও এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। সুতরাং ইংরেজি আসবাবের আবশ্যকতা এবং সৌন্দর্য সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা আবশ্যক।

বিদেশী রকমে ঘর সাজানোতে যে আমাদের কি পর্যন্ত অর্থের শ্রাদ্ধ হয়, তা

তো সকলেই জানেন। অধিকাংশ ইঙ্গবঙ্গের পক্ষে ঠাট বজায় রাখতেই প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হতে হয়। ধার-করা সভ্যতা রক্ষা করতে শুধু ধার বাড়ে। আমাদের এই দারিদ্র্যপীড়িত দেশে অনাবশ্যক বহুব্যয়সাধ্য আচার-ব্যবহারের অভ্যাস করা আহাম্মকি তো বটেই, সম্ভবত অন্যায়ও; ক্ষমতার বহির্ভূত চাল বাড়ানো, গৃহ হতে লক্ষ্মীকে বিদায় করবার প্রশস্ত উপায়। তা ছাড়া বিদেশীর অনুকরণে বিদেশী বস্তুতে যদি গৃহ পূর্ণ করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, দেশের ধনে যদি বিদেশীর পকেট পূর্ণ করতে হয়, তা হলে হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন ভদ্রসন্তানের পক্ষে সে অনুকরণ সর্বতোভাবে বর্জনীয়। ইউরোপে সাধারণ লোকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, খাওয়া-পরার মাত্রা যত বাড়ানো যায়, জাতীয় উন্নতির পথ ততটা পরিষ্কার হয়। যদি আমার এত না হলে দিন চলে না এমন হয়, তা হলে তত সংগ্রহ করবার জন্য পরিশ্রম স্বীকার করতে হবে; এবং যে জাতি যত অধিক শ্রম স্বীকার করতে বাধ্য, সে জাতি তত উন্নত, তত সৌভাগ্যবান্। কিন্তু ফলে কি দেখতে পাওয়া যায়? ইউরোপবাসীরা এই বাহুল্যচর্চার দ্বারা জীবন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করে ফেলেছে বলে কর্মক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এশিয়াবাসীদের নিকট সর্বত্রই হার মানছে। এই কারণেই দক্ষিণ-আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা প্রভৃতি দেশে চীনে জাপানী হিন্দুস্থানী শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে নানা গর্হিত বিধিব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এশিয়াবাসীরা খাওয়া-পরাটা দেহধারণের জন্য আবশ্যক মনে করে, মনের সুখের জন্য নয়; সেইজন্য তারা পরিশ্রমের অনুরূপ পুরস্কার লাভ করলেই সন্তুষ্ট থাকে। এই সন্তোষ আমাদের জাতিরক্ষার, জাতীয় উন্নতির প্রধান সহায়। আমরা যদি আমাদের পরিশ্রমের ফলের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ লাভ করতুম, আমরা যদি বঞ্চিত প্রতারিত না হতুম, তা হলে দেশে অন্নের জন্য এত হাহাকার উঠত না। আমাদের এ দোষে কেউ দোষী করবেন না যে, আমরা যথেষ্ট পরিশ্রম করি নে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের পরিশ্রমের ফল অপরে ভোগ করে। আমাদের দেশে আজকাল শিক্ষিত লোকের, বিশেষত ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়ের মনোভাব এই যে, স্ট্যাণ্ডার্ড অব লাইফ বাড়ানো সভ্যতার একটি অঙ্গ। এ সর্বনেশে ধারণা তাঁদের মন থেকে যত শীঘ্র দূর হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। উপরোক্ত যুক্তি ছাড়া জীবনযাত্রার উপযোগী ইউরোপীয় সরঞ্জামের সপক্ষে আর কোনো যুক্তি শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না। তবে অনেকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বলে থাকেন, 'আমার খুশি।' আমাদের দেশের রাজা সমাজের অধিনায়ক নন। বিদেশী বিধর্মী রাজা এ দেশে কখনো সামাজিক দলপতি হতে পারেন না, সুতরাং আমাদের সমাজে এখন অরাজকতা প্রবেশ করেছে। যে সমাজে শাস্ত্র আছে কিন্তু শাসন মানাবার কোনো উপায় নেই, সেখানে শাসন না মেনে যে কাজে কোনো বাইরের শাস্তি নেই সে কার্যে যথেচ্ছাচারী হয়ে এঁরা যে নিজেদের বিশেষরূপে নির্ভীক স্বাধীনচেতা এবং পুরুষশার্দুল বলে প্রমাণ করেন, তার আর সন্দেহ কি। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, এঁদের খুশি প্রভুদের খুশির সঙ্গে অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। সে তো হবারই কথা। এঁরাও সভ্য, তাঁরাও সভ্য, সুতরাং পরস্পরের মিল—সে শুধু সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি। যদি কেউ আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে, চেয়ার টেবিল কৌচ মেজ

ইত্যাদি দেহ আত্মা কিংবা মনের উন্নতির কিরূপে এবং কতদূর সাহায্য করে, তা হলে আমি তাঁর কাছে চিরবাধিত থাকব, কারণ সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, চৌকি কৌচ অনেকটা আরামের জিনিস এবং আমরা অনেকেই অভ্যস্ত আরামভোগে বঞ্চিত হতে নিতান্ত কুণ্ঠিত। আমাদের সকলেরই পৃষ্ঠদণ্ড কিঞ্চিৎ কমজোর এবং ঈষৎ বক্র, সুতরাং আমরা পৃষ্ঠের একটা আশ্রয়ের জন্য সকলেই আকাঙ্ক্ষী। এবং আরাম-চৌকি এখন আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। যোগশাস্ত্রে বলে, সকলপ্রকার আত্মোন্নতির মূলে সরল পৃষ্ঠদণ্ড বর্তমান। সুতরাং যোগের প্রথম সাধনা হচ্ছে আসন অভ্যাস করা, পৃষ্ঠদণ্ড ঋজু করা। দাসজাতির দেহভঙ্গি স্ত্রীলোকের মতো, সম্মুখ দিকে ঈষৎ আনমিত—অতিপ্রবৃদ্ধ যৌবনভারে নয়, অতি অভ্যস্ত সেলাম এবং নমস্কার-চর্চা বশত। আমাদের জাতীয় কুলকুণ্ডলিনী যদি জাগ্রত করতে হয় তা হলে আমাদের পিঠের দাঁড়া খাড়া করতে হবে, অনেক অভ্যস্ত আরাম ত্যাগ করতে হবে। সুতরাং একমাত্র দৈহিক আরামের খাতিরে বিদেশী আসবাবের প্রচার এবং অবলম্বন সমর্থন করা যায় না। সকলেই জানেন যে, জাপান ইউরোপের কাছে যা শিখেছে আমরা তা শিখি নি; কিন্তু খুব কম লোকেই জানেন যে, ইউরোপের কাছে আমরা যা শিখেছি জাপান তা শেখে নি। ফলে ইউরোপের সঙ্গে কারবারে জাপান নিজের শক্তি সঞ্চয় করেছে, ইউরোপের সঙ্গে কারবারে আমরা শুধু শক্তির অপচয় করেছি। এই কারণেই আমাদের জাপানের কাছে এই শিক্ষা-লাভ করতে হবে যে, ইউরোপীয় সভ্যতার কি আমাদের গ্রহণ করা উচিত এবং কি আমাদের বর্জন করা উচিত। এই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করাটাই আমাদের সর্বপ্রধান দরকার, এবং জাপান ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ আমাদের গুরু হতে পারে না, কারণ জাপান শুধু এ কঠিন সমস্যার মীমাংসা করেছে। খাওয়া-পরা-থাকা-শোওয়া সম্বন্ধে জাপান স্বদেশের সনাতন প্রথা ত্যাগ করে নি। বিলেতি আসবাব জাপানের ঘরে স্থান পায় নি। আজও সমগ্র জাপান মাদুরের উপর বীরাসনে আসীন।[১]

বিলেতি জিনিসের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিচার শেষ করে, এখন তার সৌন্দর্য সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা আবশ্যক। আমাদের দেশে যে ছেলের কিছু হবার নয় তাকে আর্টস্কুলে পাঠানো হয়; এবং ঐ একই কারণে যুক্তি যখন অন্য কোনো দাঁড়াবার

[১] জাপানের অভ্যুদয়ের কারণ যাঁরা জানতে চান তাঁদের আমি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থগুলি পড়তে অনুরোধ করি: K. Okakuraর *Ideals of the East* এবং *The Awakening of Japan*; Y. Okakuraর *Spirit of Japan*; Nitobeর *Bushido*; Lafcadio Hearnএর *Kokora* প্রমুখ গ্রন্থাবলী। যদি কারো এত বই পড়বার সময় এবং সুবিধা না থাকে এবং ফরাসি ভাষা জানা থাকে, তা হলে তাঁকে আমি Felicien Challayeর *Au Japan* নামক গ্রন্থ পড়তে অনুরোধ করি। লেখক দুটি পঞ্চাশ পাতায় আসল কথা অতি পরিষ্কার করে বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করেছেন।

স্থান না পায় তখন তা আর্টের নিকট গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় 'আমি বিশ্বাস করি' এ কথার উপর যেমন আর কোনো কথা চলে না, আর্ট সম্বন্ধে আলোচনায় 'আমার চোখে সুন্দর লাগে' এ কথার উপরও তেমনি আর কোনো কথা চলে না। সৌন্দর্য অনুভূতির বিষয়, জ্ঞানের বিষয় নয়। ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে তার প্রমাণ দেওয়া যায় না। অতএব যিনি আর্ট জিনিসটা অপরকে যত কম বোঝাতে পারেন, নিজে তিনি তত বেশি বোঝেন। ধর্ম সম্বন্ধে বিশ্বাস অন্ধ হলেও সম্ভবত লোক ধর্মজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু রূপ সম্বন্ধে অন্ধ হয়ে লোকে সৌন্দর্যজ্ঞ হতে পারে না। কারণ সৌন্দর্য স্বপ্রকাশ। সৌন্দর্যের পরিচয় এবং অস্তিত্ব উভয়ই কেবলমাত্র প্রকাশের উপর নির্ভর করে। সেই পদার্থকে আমরা সুন্দর বলি, যার স্বরূপ পূর্ণব্যক্ত হয়েছে। রূপ হচ্ছে বিশ্বের ভাষা এবং সৌন্দর্য সৃষ্টির শেষ কথা। প্রকৃতিও বৃথায় কিছু করেন না, মানুষেও বিনা উদ্দেশ্যে কোনো পদার্থে হাত দেয় না। যা মানবজীবনের পক্ষে আবশ্যকীয়, মানুষে তাই হাতে গড়ে; সেই গঠনকার্যের সার্থকতা এবং কৃতার্থতার নামই আর্ট। নিরর্থক দ্রব্য সুন্দর হয় না। আবশ্যকতার বিরহে সৌন্দর্য শুকিয়ে মারা যায়। সুতরাং যে জাতির পক্ষে যে-সকল জিনিস জীবনযাত্রার জন্যে আবশ্যকীয় নয়, সে জাতির পক্ষে সে-সকল জিনিসের সৌন্দর্য উপলব্ধি করা কঠিন। আর্ট একটি সৃষ্টিপ্রকরণ, একটি ক্রিয়া মাত্র, সুতরাং আর্টের প্রাণ কর্তার হাতে এবং মনে, ভোক্তার চোখে এবং কানে নয়। আর্টের সন্ধান তার স্রষ্টার কাছে মেলে, দর্শক কিংবা শ্রোতার কাছে নয়। সৌন্দর্য সৃষ্টি করবার ভিতর যেটুকু আনন্দ প্রাণ ও ক্ষমতা আছে, সেইটুকু অনুভব করার নাম সৌন্দর্য ভোগ করা। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে যে আর্টিস্টের সঙ্গে আমাদের চরিত্রের, ধর্ম এবং জ্ঞানের, রীতি এবং নীতির মিল আছে, আমরা অনেক পরিমাণে যার সুখদুঃখের ভাগী, যার সঙ্গে আমরা একই বাহ্যপ্রকৃতির ভিতর একই সমাজের অন্তর্ভূত হয়ে বাস করি, তার আর্টই আমাদের পক্ষে যথার্থ আর্ট। বিদেশী এবং বিজাতীয় আর্টের আদর কেবল কাল্পনিক মাত্র। এই কারণেই আমাদের অনেকেরই পক্ষে বিদেশী আর্টের চর্চাটা লাঞ্ছনা মাত্র হয়ে পড়ে। আমরা প্রথমে বিদেশনী দোকানদারের দ্বারা প্রবঞ্চিত হই, পরে নিজেদের মনকে প্রবঞ্চিত করি। আমাদের কাছে রূপের পরিচয় রূপিয়া দিয়ে। আমরা ছবি চিনি নে, তবু কিনি নাম দেখে এবং দাম দেখে। ইউরোপে যারা শিব গড়তে বাঁদর গড়ে, তাদেরই হস্তরচিত বিগ্রহ আমরা সংগ্রহ করে সুখী না হই, খুশি থাকি। আর্ট সম্বন্ধে ইউরোপের গোলামচোর হওয়ার লজ্জা পাওয়া দূরে যাক, আমাদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

আমার মতের বিরুদ্ধে সহজেই এই আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, আমরা যদি ইউরোপীয় আর্টের মর্যাদা না বুঝতে পারি, তা হলে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মর্যাদা বোঝা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং ইউরোপীয় সাহিত্য-বিজ্ঞান-চর্চাও আমাদের ত্যাগ করা কর্তব্য। এ আপত্তির উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, বিভিন্ন দেশের লোকের ভিতর পার্থক্য যতই থাকুক, মানুষে মানুষে প্রবৃত্তির বাসনার মনোভাবের মিলও যথেষ্ট আছে। সাহিত্যের বিষয় হচ্ছে প্রধানত মানব-

প্রকৃতি; সুতরাং উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য দেশকাল-অতিরিক্ত মানবহৃদয়ের চিরন্তন অথচ চিরনবীন ভাবসকল নিয়ে কারবার করে। এই হেতু সকল দেশের উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যে বিশ্বমানবের সমান অধিকার আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যে যে অংশটুকু আর্ট, সে অংশ আমরা ঠিক ধরতে পারি নে। বিদেশী লেখকের লেখনীর পরিচয় আমরা অনেকেই পাই না। সে যাই হোক, সাহিত্যে এবং আর্টে, কাব্যে এবং কলার প্রধান পার্থক্য এই যে, কাব্যের উপকরণ অন্তর্জগৎ হতে আসে, কলার উপকরণ বাহ্যজগৎ হতে আসে। মনোজগতে দেশভেদ নেই, এশিয়া ইউরোপ নেই, এক কথায়, মনোজগতের ভূগোল নেই। কিন্তু বাহ্যজগতে ঠিক তার উলটো। এক দেশের ভৌতিক গঠন অপর দেশ হতে বিভিন্ন। দেশভেদে বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-রসের জাতিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। সেইজন্যই কাব্য অপেক্ষা কলার ক্ষেত্র সংকীর্ণ। এই উপকরণের বিশেষত্ব হতে প্রতি দেশের শিল্পকলার বিশেষত্ব জন্মলাভ করে। আর্ট সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয়তা অসম্ভব; সুতরাং এ ক্ষেত্রে স্বদেশের অধীনতাপাশ মোচন করবার জো নেই। বিজ্ঞানের বিষয়ও বস্তুজগৎ; কিন্তু বিজ্ঞান বিশ্বজনীন, কেননা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বস্তুজগতের বিশেষত্ব বাদ দিয়ে তার সামান্য ক্রিয়াগুলির সন্ধান নেওয়া। আর্টের সম্পর্ক বস্তুজগতের শুধু বিশেষ্য ও বিশেষণের সঙ্গে। বিজ্ঞানের অভিপ্রায় বিশ্বকে এক করে আনা, আর্টের কার্য নিত্য বৈচিত্র্য সাধন। বিজ্ঞানের লক্ষ্য মূলের দিকে, আর্টের লক্ষ্য ফুলের দিকে। বিজ্ঞানের দেশ নেই, আর্টের আছে। এই-সকল কারণে নিউটন এবং ডারউইন আমাদের জ্ঞাতি, শেক্স্পীয়ার এবং মিলটন আমাদের কুটুম্ব, কিন্তু রাফায়েল এবং বীঠোফেন আমাদের পর। এইজন্যই জাপান ইউরোপের বিজ্ঞান আয়ত্ত করেছে, কিন্তু নিজের আর্ট ছাড়ে নি। আমাদের মধ্যে যদি কেহ ইউরোপের উচ্চাঙ্গের আর্টের যথার্থ মর্মগ্রহণ করতে পারেন, তিনি অবশ্য ভক্তির পাত্র। পৃথিবীর যে দেশের যা-কিছু শ্রেষ্ঠকীর্তি আছে, তার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করা মানবের মুক্তির একটি প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু যখন প্রায়ই দেখতে পাই যে, যিনি স্বরগ্রামের 'গা' থেকে 'পা'র প্রভেদ ধরতে পারেন না, তিনিই বীঠোফেনের প্রধান সমজদার; এবং যিনি রঙটা নীল কিংবা সবুজ বিশেষ ঠাওর করেও বলতে অপারগ, তিনিই টিশিয়ানের চিত্রে মুগ্ধ, তখন স্বজাতির ভবিষ্যতের বিষয় একটু হতাশ হয়ে পড়তে হয়। সে যাই হোক, উপস্থিত প্রবন্ধে যে-সকল বস্তুর আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি—যথা ছিটের পরদা, ব্রাস্‌ল্‌সের কারপেট, চীনের পুতুল, কাচের ফুলদানি, কি স্বদেশী কি বিদেশী সকল-প্রকার আর্টের অভাবেই তাদের বিশেষত্ব। বিলাতের সচরাচর গৃহ-ব্যবহার্য বস্তুগুলি প্রায়ই কদাকার এবং কুৎসিত। এর দুটি কারণ আছে। পূর্বেই বলেছি, বিজ্ঞানের ন্যায় আর্টেরও বিষয় বাহ্যজগৎ। যা ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তা বিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে না, আর্টেরও বিষয় হতে পারে না। ইন্দ্রিয় যে উপকরণ সংগ্রহ করে, মন তাই নিয়ে কারিগরি করে। এই বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-ময় জগতে যে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ে মন সুখলাভ করে শুধু তাই আর্টের উপকরণ। বস্তুর সেই সুখদায়ক গুণের নাম এস্‌থেটিকাল কোয়ালিটি, অর্থাৎ 'রূপ'; এবং মনের সেই সুখলাভ করবার ক্ষমতার নাম এস্‌থেটিক ফ্যাকাল্‌টি, অর্থাৎ 'রূপজ্ঞান'। ইংরেজ বিশেষ

খোসাপুরু জাত। ভগবান্ ইংরেজকে নিতান্ত স্থূলভাবে গড়েছেন; তার দেহ স্থূল, প্রকৃতি স্থূল, ইন্দ্রিয়ও তাদৃশ সূক্ষ্ম নয়। বস্তুমাত্রেই ইংরেজের হাতে ধরা পড়ে, কিন্তু রূপমাত্রেই ইংরেজের চোখে কিংবা কানে ধরা পড়ে না। সচরাচর শিক্ষিত ইংরেজের চেয়ে আমাদের দেশের সচরাচর রঙগরেজের চোখ রঙ সম্বন্ধে অনেক বেশি পরিমার্জিত। এই কারণেই বিলাতের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যজাতসকল নয়নের তৃপ্তিকর নয়। এই গোড়ায়গলদ থাকবার দরুন, ইংরেজের হাতগড়া জিনিস প্রায়ই আর্টিস্টিক হয় না। ইউরোপের অন্যান্য জাতিসকল এ বিষয়ে ইংরেজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হলেও অপর আর-একটি কারণে ইউরোপের আর্টের আজকাল হীনাবস্থা। ইউরোপে এখন বিজ্ঞানের যুগ। পূর্বেই বলেছি, বিজ্ঞান বিশ্বকে একভাবে দেখে, আর্ট আর-একভাবে দেখে। বিজ্ঞানের চেষ্টা সোনামুঠোকে ধুলোমুঠো করা, আর্টের চেষ্টা ধুলোমুঠোকে সোনামুঠো করা। বিজ্ঞান আজকাল ইউরোপীয় মানবের মনের উপর অযথা প্রতিপত্তিলাভ করেছে, কেননা বিজ্ঞান এখন মানুষের হাতে আলাদিনের প্রদীপ। সে প্রদীপের সাহায্যে যে শুধু অসীম ঐশ্বর্য লাভ করা যায় তাই নয়, আলোকও লাভ করা যায়। সে আলোকে শুধু প্রকাশ করে বিশ্বের কায়া, বাদবাকি সব ছায়ায় পড়ে যায়, যথা—মন প্রাণ ইত্যাদি। সেই বিজ্ঞানের আলোককে আমরা যদি একমাত্র আলোক বলে ভ্রম করি, তা হলে মানবজীবনের প্রকৃত অর্থ, চরম লক্ষ্য এবং অচ্যুত আনন্দ হতে আমরা বিচ্যুত হয়ে পড়ি। বিশ্বকে শুধু জড়ভাবে দেখলে মনেরও জড়তা এসে পড়ে। কেবলমাত্র পরমাণুর স্পন্দনে হৃদয় স্পন্দিত হয় না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ধর্মের সখী হয়েই কলাবিদ্যা পৃথিবীতে দেখা দেয়। সে সখ্যবন্ধন ছিন্ন করে আর্টকে জীবন্ত রাখা কঠিন। বৈজ্ঞানিক জীবতত্ত্বের মতে মানবের আদিম চেষ্টা নিজের এবং জাতীয় জীবন রক্ষা করা। নিজে বেঁচে থাকা এবং সন্তান উৎপাদন করা, এই দুটি জীবজগতের মূল নিয়ম। এই দুটি আদিম দৈহিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন যদি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে, তা হলে 'আবশ্যকতা'র অর্থ অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। যা দেহের জন্য আবশ্যক তাই যথার্থ আবশ্যকীয় বলে গণ্য হয়, আর যা মনের জন্য আত্মার জন্য আবশ্যক, তা আবশ্যকীয় বলে মনে হয় না। ইউরোপে ইউটিলিটির এই সংকীর্ণ অর্থ গ্রাহ্য হবার দরুন ইউটিলিটি এবং বিউটির বিচ্ছেদ জন্মেছে। ইউরোপের আবশ্যকীয় জিনিস কদর্য এবং সুন্দর জিনিস অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই কারণে আর্ট এখন ইউরোপে ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুলছে। আহার বিহার এখন ইউরোপের প্রধান কাজ হয়ে ওঠার দরুন, যে আর্টিস্ট আর্টকে জীবনের ভিতর নিয়ে আসতে চান তিনি আর্টকে পূর্বোক্ত প্রবৃত্তিদ্বয়ের দাসী করে তোলেন। এই কারণেই ইউরোপে এখন নগ্ন স্ত্রীমূর্তির এত ছড়াছড়ি। শতকরা একজনে যদি ঐরূপ মূর্তিতে সৌন্দর্য খোঁজেন, অবশিষ্ট নিরানব্বই জনে তার নগ্নতা দেখেই খুশি থাকেন। এ অবস্থায় আর্ট যে শুধু ভোগবিলাসের অঙ্গ হয়ে উঠবে, তার আর আশ্চর্য কি। ইউরোপের পক্ষে কি ভালো কি মন্দ, তা ইউরোপ স্থির করবে। কিন্তু এ কথা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য যে, আমাদের জাতির পক্ষে বিলাসের প্রবৃত্তি আর বাড়ানো ইচ্ছনীয় নয়। ইউরোপের যথার্থ আর্ট আমাদের অধিকাংশ

লোকের পক্ষে আয়ত্ত করা অসম্ভব, কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার ভোগের অংশটা আমরা সহজেই অভ্যাস করতে পারি। আমার প্রথম কথাও যা, শেষ কথাও তাই। আর্টকে ভোক্তার দিক থেকে দেখা দূরবিনের উলটো দিক থেকে দেখার তুল্য, দ্রষ্টব্য পদার্থ আরো দূরে চলে যায়। কর্তার দিক থেকে দেখাটাই ঠিক দেখা। আমরা নিজে যা রচনা করেছি, তারই মর্ম তারই মর্যাদা আমরা প্রকৃষ্টরূপে বুঝতে পারি। আমাদের স্বদেশের কীর্তি থেকেই আমাদের স্বজাতির কৃতিত্বের পরিচয় পাই। আমরা জাতীয় আত্মসম্মানের চর্চা করব বলে চিৎকার করছি, কিন্তু জাতীয় কৃতিত্বের যদি স্থান না থাকে, তবে জাতীয় আত্মসম্মান কিসের উপর দাঁড় করাব, বোঝা কঠিন। জাতীয় আর্ট যে শ্রেণীরই হোক, তার চর্চায় আমাদের জাতীয় কর্তৃত্ব-বুদ্ধি বিকশিত হয়ে উঠবে। এই পরম লাভ। সুলভ এবং সহজপ্রাপ্য বিলাতি জিনিসের পক্ষে আবশ্যকতার দোহাই চলতে পারে, কিন্তু আর্টের দোহাই একেবারেই চলে না। বিলাতি-ছিটগ্রস্ত না হলে বিলাতি-ছিটভক্ত হওয়া যায় না। আর যিনি আদর ক'রে দুয়ারে বিলাতি পর্দা ঝোলান তাঁর পর্দানশিন হওয়া উচিত।

সভ্যজাতির পক্ষে দেশের কথা অনেকটা বেশের কথা। পরিচ্ছদের ঐক্য সামাজিক ঐক্যের লক্ষণও বটে, কারণও বটে। আমরা প্রতিবাসীকে প্রতিবেশী বলেই জানি। হিন্দুরা সমাজের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্র ত্যাগ করেন। সন্ন্যাসের প্রথম দীক্ষা ডোর-কৌপীন ধারণ। আমাদেরও বিদেশীয়তার প্রথম সংস্কার কোট-পেন্টলুন ধারণ। বিলেতের বেশ যে ভারতবাসীর পক্ষে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, সে কথা বলাই বাহুল্য। কথাটা এতই সাদা যে, যিনি তা বুঝতে পারেন না, তাঁর ঔষধ মধ্যমনারায়ণ তৈল, যুক্তি নয়। দেহকে কষ্ট দিলেই যদি মনের উৎকর্ষ লাভ করা যেত, তা হলেও নয় এই বোতাম-বক্‌লসের অধীনতা এবং বন্ধন একরকম কায়ক্লেশে সহ্য করা যেত। কিন্তু সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করবার মাহাত্ম্য প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ। যিনিই 'কলার' ব্যবহার করেছেন, তিনিই কোনো-না-কোনো সময়ে রাগে দুঃখে এবং ক্ষোভে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে—

ভূষণ ব'লে কিনব না আর
পরের ঘরে গলার ফাঁসি।

ইউরোপ যে আমাদের বুকে পাষাণ চাপিয়ে দিয়েছে এবং হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ি পরিয়েছে, তার নিদর্শনস্বরূপ আমরা কামিজের প্লেট ও কাফ এবং বুটজুতা ধারণ করি। আমাদের স্বদেশী বেশের প্রধান দোষ যে, তা যন্ত্রণাদায়ক নয়। বিলাতি সম্প্রদায়ের অনেকেরই বিশ্বাস যে, অহর্নিশি গলদঘর্ম হওয়াতেই সভ্যমানব-জীবনের চরম সার্থকতা। সহজ বুদ্ধিতে যা দোষ বলে মনে হয়, বিলাতি সভ্যতার প্রতি অতিভক্তিপরায়ণ লোকের নিকট সেইটিই গুণ। ইংরেজি পোশাক যে নয়নের সুখ-কর নয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু ভক্তদের মতে সেই সৌন্দর্যের অভাবেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। ঐ প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, ও বেশ পুরুষোচিত বেশ। আমাদের

পৌরুষের একান্ত অভাববশত পুরুষ সাজবার ইচ্ছাটা অত্যন্ত বলবতী। কাজেই আমরা ইংরেজের অনুকরণে অন্য-সব রঙ ত্যাগ ক'রে কাপড়ে ছাইপাঁশ মাটির রঙ চাপিয়েছি। আমাদের ধারণা, সবচেয়ে সভ্য এবং সবচেয়ে পুরুষালি রঙ হচ্ছে কালো রঙ। সুতরাং আমাদের নূতন সভ্যতা শুভ্রবসন ত্যাগ করে কৃষ্ণচ্ছদ অবলম্বন করেছে। শ্বেতবর্ণ আলোকের রঙ, সকল বর্ণের সমাবেশে তার উৎপত্তি; আর কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারের রঙ, সকল বর্ণের অভাবে তার উৎপত্তি। আমরা করজোড়ে ইউরোপীয় সভ্যতার কাছে প্রার্থনা করেছি যে 'আমাদিগকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যাও' এবং আমাদের সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার খিদমতগারির পুরস্কারস্বরূপ হ্যাট-নামক কিম্ভূতকিমাকার এক চিজ শিরোপা লাভ করেছি, তাই আমরা আনন্দে শিরোধার্য করে নিয়েছি। কিন্তু ইংরেজি পোশাক আমাদের পক্ষে শুধু যে অসুখকর এবং দৃষ্টিকটু তা নয়। বেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকের মনের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। পুরোহিতের বেশ ধারণ করলে মানুষকে হয় ভণ্ড নয় ধার্মিক হতে হয়। সাহেবি কাপড়ের সঙ্গে মনেও সাহেবিয়ানার ছোপ ধরে। হ্যাট-কোট ধারণ করলেই বঙ্গসন্তান ইংরেজি এবং হিন্দি এই দুই ভাষার উপর অধিকার লাভ করবার পূর্বেই অত্যাচার করতে শুরু করেন। গলায় 'টাই' বাঁধলেই যে সকলকেই ইউরোপীয় সভ্যতার নিকট গললগ্নীকৃতবাস হতে হবে, এ কথা আমি মানি নে। যে মনে দাস, সে উত্তরীয়কেও গলবস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে থাকে। তবে 'টাই' যে মনকে সাহেবিয়ানার অনুকূল করে নিয়ে আসে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইউরোপের মোহ কাটাতে হলে ইউরোপীয় বসন বয়কট করাই শ্রেয়। ইউরোপবাসীর বেশে এবং এশিয়াবাসীর বেশে একটা মূলগত প্রভেদ আছে। ইউরোপের বেশের উদ্দেশ্য দেহকে বাঁধা, আমাদের উদ্দেশ্য দেহকে ঢাকা। আমাদের চেষ্টা দেহকে লুকানো, ওদের চেষ্টা দেহকে ফলানো। আমাদের অভিপ্রায় লজ্জা নিবারণ করা, ওদের অভিপ্রায় শীত নিবারণ করা; তাই আমরা যেখানে ঢিলে দিই, ওরা সেখানে কষে। ইংরেজরা মধ্যে মধ্যে রমণীর বেশকে কবিতার সঙ্গে তুলনা করেন। ইংরেজরমণীর বেশের ভিতর একটা ছন্দ আছে, তার গতি বিলাসিনীদের দেহভঙ্গি অনুসরণ করে; সে ছন্দের ঝোঁক উন্নত-অবনত অংশের উপরই পড়ে। লজ্জা আমাদের দেশে নারীর হৃদয় অবলম্বন করে থাকে, ওদের দেশে চরণে শরণ গ্রহণ করে। আমাদের মহাসৌভাগ্য এই যে, ভারতরমণী স্বদেশী লজ্জা পরিহার করে বিদেশী সজ্জা গ্রহণ করেন নি। স্ত্রীজাতি সর্বত্রই স্থিতিশীল, আমরা পুরুষরা গতিশীল বলেই দুর্গতি বিশেষরূপে আমাদেরই হয়েছে। যদি ইংরেজি বেশ উপযোগিতা সৌন্দর্য ইত্যাদি সকল বিষয়েই স্বদেশী বেশের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হত, তা হলেও বিদেশী বেশ অবলম্বন অনুমোদন করা যেত না। ইংরেজি বেশের আর-একটি বিশেষ দোষ এই যে, ও পদার্থে দেহ মণ্ডিত করবামাত্রই অধিকাংশ লোকের মস্তিষ্কের গোলযোগ উপস্থিত হয়। অতিশয় বুদ্ধিমান লোকেও বেশের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে অতিশয় নির্বোধের মতো তর্ক করেন। এ বিষয়ে যে-সকল যুক্তি সচরাচর শোনা যায়, সে-সকল এতই অকিঞ্চিৎকর যে বিচারযোগ্য নয়। যাঁরা বেশ পরিবর্তন করেন তাঁরা তর্কের দ্বারা যুক্তির দ্বারা নিজেরাই সাফাই হতে

চান, অপরকে ভজাতে চান না। তাঁদের অভিপ্রায়, ফাঁকি দিয়ে নিজেরা সভ্য হওয়া, স্বজাতিকে সভ্য করা নয়। তাঁদের বিশ্বাস, এ সমাজের এ জাতির কিছু হবার নয়, সুতরাং সমাজ ছাড়াই তাঁদের মতে একমাত্র মুক্তির উপায়। এ মনোভাব যে স্বদেশীয়তার কতদূর অনুকূল, তা সকলেই বুঝতে পারেন। কেবলমাত্র সমাজত্যাগে কি করে মুক্তিলাভ হতে পারে? এ প্রশ্ন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, তার উত্তর হচ্ছে, এ'রা যে চিরকালই স্বদেশী সমাজের অন্তস্থ বর্ণ হয়ে থাকবেন এরূপ এ'দের অভিপ্রায় নয়; এ'দের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ইংরেজি সমাজে লীন হয়ে যাওয়া। এ'দের আশা ছিল যে, ক্রমে গঙ্গাযমুনার মতো সাদায়-কালোয় একদিন মিশে যাবে। কিন্তু আজ বোধ হয় এ'দের সকলেই বুঝতে পেরেছেন যে, সে আশা মিছে। আমরা সকলেই এ সত্যটি আবিষ্কার করেছি যে, প্রয়াগ পৌঁছবার পূর্বেই আমাদের কাশী-প্রাপ্তি হবে।

আহার সম্বন্ধে বেশি কিছু বলবার দরকার নেই। অপরের বেশ যত সহজে অবলম্বন করা যায়, অপরের খাদ্য তত শীঘ্র জীর্ণ করা যায় না। বিদেশীয় সভ্যতা আমাদের পিঠে যত সয়, পেটে তত সয় না। আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশে আহার্যদ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করবার কোনোই দরকার নেই। তবে যদি কেহ এমন থাকেন যে, বিদেশী মাছ-তরকারি না খেলে তাঁর প্রাণ বাঁচে না, তা হলে তাঁর প্রাণ বাঁচাবার কোনো দরকার নেই; আর যদি বেঁচে থাকাটা নিতান্ত দরকার মনে করেন, তা হলে স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশে গিয়ে বাস করাটাই তাঁর পক্ষে শ্রেয়।

আহার সম্বন্ধে বিধিনিষেধ-সংবলিত পঞ্জিকাশাস্ত্রকে গঞ্জিকাশাস্ত্র বলে গণ্য করে অমান্য করলেই যে তৎপরিবর্তে কেল্‌নারের ক্যাটালগের চর্চা করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। বিদেশীয়তা প্রধানত আহারের পদ্ধতিতেই আমরা অবলম্বন করেছি। বিলাতি বসন প'রে স্বদেশী আসনে বসা এবং স্বদেশী বাসনে খাওয়া চলে না।

ঐ পোশাকের টানেই চেয়ার আসে, সেইসঙ্গে টেবিল আসে, এবং সেইসঙ্গে চীনের কিংবা টিনের বাসন নিয়ে আসে। এর পর আর হাতে খাওয়া চলে না; কারণ হাতে খেলে হাত মুখ দুইই প্রক্ষালন করতে হয়, কিন্তু ছুরিকাঁটা ব্যবহার করলে শুধু আঙুলের ডগা ধুলেও চলে, না ধুলেও চলে। এক কথায় বলতে গেলে, খানায় পোশাকে 'অঙ্গ-অঙ্গী'র সম্বন্ধ বিরাজ করে। আহারের বিষয় উত্থাপন করে পানের বিষয় নীরব থাকলে অনেকে মনে করতে পারেন যে, প্রবন্ধটি অঙ্গহীন হয়ে রইল; অতএব এ সম্বন্ধেও দু-এক কথা বলা আবশ্যক। পানের বিষয় হচ্ছে—হয় ধূম নাহয় তেজ মরুৎ এবং সলিলের সন্নিপাতে যে পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাই। গাঁজা গুলী এবং চরসের পরিবর্তে ভদ্রসমাজে যদি তামাকের প্রচলন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে তো সে দুঃখের বিষয় নয়। সুরাপান বেদবিহিত এবং আয়ুর্বেদনিষিদ্ধ। 'প্রবৃত্তিরেষা

নরাণাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা' এ মনুর বচন। এবং শাস্ত্রমতে যেখানে স্মৃতিতে এবং শ্রুতিতে বিরোধ দেখা যায়, সে স্থলে শ্রুতি মান্য। রসিকতা ছেড়ে দিলেও সুরাপানের দোষগুণ বিচার করা এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। পানদোষ নীতির কথা, রীতির কথা নয়। সুরাপান একটি ব্যসন, ফ্যাশন নয়। পানাসক্ত লোক পানের প্রতিই আসক্ত, ইংরেজিয়ানার প্রতি নয়। মোহ এবং মদ দুটি স্বতন্ত্র রিপু। আমার উদ্দেশ্য ইউরোপের মোহ নষ্ট করা, তার বেশি কিছু নয়। মানব-জাতিকে সুশীল সচ্চরিত্র করবার ভার সমাজনীতি এবং ধর্মপ্রচারকদের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

আমার শেষ বক্তব্য এই, কেহ যেন মনে না করেন যে, কোনো সম্প্রদায়-বিশেষের নিন্দা করবার জন্যই আমি এ-সকল কথার অবতারণা করেছি। যে-সকল ইউরোপীয় হাল-চাল আমি এ দেশের পক্ষে অনাবশ্যক এবং অবাঞ্ছনীয় মনে করি, সে-সকল কম-বেশি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রবেশলাভ করেছে। আমি নিজে উপরোক্ত সকল দোষে দোষী। আমার সকল সমালোচনাই আমার নিজের গায়ে লাগে। দৈনিক জীবনে আমরা সকলেই অভ্যস্ত, আচার-ব্যবহারের অধীন। ভুল করেছি—এই জ্ঞান জন্মানো মাত্র সেই ভুল তৎক্ষণাৎ সংশোধন করা যায় না। কিন্তু মনের স্বাধীনতা একবার লাভ করতে পারলে ব্যবহারের অনুরূপ পরিবর্তন শুধু সময়সাপেক্ষ।

ফাল্গুন ১৩১২

তরজমা

আমরা ইংরেজ জাতিকে কতকটা জানি, এবং আমাদের বিশ্বাস যে, প্রাচীন হিন্দু জাতিকে তার চাইতেও বেশি জানি; আমরা চিনি নে শুধু নিজেদের।

আমরা নিজেদের চেনবার কোনো চেষ্টাও করি নে, কারণ আমাদের বিশ্বাস যে, সে জানার কোনো ফল নেই; তা ছাড়া নিজেদের ভিতর জানবার মতো কোনো পদার্থ আছে কি না, সে বিষয়েও অনেকের সন্দেহ আছে।

বাঙালির নিজস্ব বলে মনে কিংবা চরিত্রে যদি কোনো পদার্থ থাকে, তাকে আমরা ডরাই; তাই চোখের আড়াল করে রাখতে চাই। আমাদের ধারণা যে, বাঙালি তার বাঙালিত্ব না হারালে আর মানুষ হয় না। অবশ্য অপরের কাছে তিরস্কৃত হলে আমরা রাগ করে ঘরের ভাত (যদি থাকে তো) বেশি করে খাই; কিন্তু উপেক্ষিত হলেই আমরা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হই। মান এবং অভিমান এক জিনিস নয়। প্রথমটির অভাব হতেই দ্বিতীয়টি জন্মলাভ করে।

আমরা যে নিজেদের মান্য করি নে তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, আমরা উন্নতি অর্থে বুঝি—হয় বর্তমান ইউরোপের দিকে এগনো, নয় অতীত ভারতবর্ষের দিকে পিছনো। আমরা নিজের পথ জানি নে বলে আজও মনঃস্থির করে উঠতে পারি নি যে, পূর্ব এবং পশ্চিম এই দুটির মধ্যে কোন্ দিক অবলম্বন করলে আমরা ঠিক গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌঁছব। কাজেই আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার দিকে তিন পা এগিয়ে আবার ভারতবর্ষের দিকে দু পা পিছিয়ে আসি, আবার অগ্রসর হই, আবার পিছু হটি। এই কুর্নিশ করাটাই আমাদের নবসভ্যতার ধর্ম ও কর্ম।

উক্ত ক্রিয়াটি আমাদের পক্ষে বিশেষ গৌরবসূচক না হলেও মেনে নিতে হবে। যা মনে সত্য বলে জানি, সে সম্বন্ধে মনকে চোখ ঠেরে কোনো লাভ নেই। আমরা দোটানার ভিতর পড়েছি—এই সত্যটি সহজে স্বীকার করে নিলে আমাদের উন্নতির পথ পরিষ্কার হয়ে আসবে। যা আজ উভয়সংকট বলে মনে হচ্ছে, তাই আমাদের উন্নতির স্রোতকে একটি নির্দিষ্ট পথে বদ্ধ রাখবার উভয়কূল বলে বুঝতে পারব। আমরা যদি চলতে চাই তো আমাদের একূল-ওকূল দু কূল রক্ষা করেই চলতে হবে।

আমরা স্পষ্ট জানি আর না-জানি, আমরা এই উভয়কূল অবলম্বন করেই চলবার চেষ্টা করছি। সকল দেশেরই সকল যুগের একটি বিশেষ ধর্ম আছে। সেই যুগ-ধর্ম অনুসারে চলতে পারলেই মানুষ সার্থকতা লাভ করে। আমাদের এ যুগ সত্য-যুগও নয় কলিযুগ নয়—শুধু তরজমার যুগ। আমরা শুধু কথায় নয়, কাজেও একেলে বিদেশী এবং সেকেলে স্বদেশী সভ্যতার অনুবাদ করেই দিন কাটাই: আমাদের মুখের প্রতিবাদও ঐ একই লক্ষণাক্রান্ত। আমরা সংস্কৃতের অনুবাদ করে নূতনের প্রতিবাদ করি, এবং ইংরেজির অনুবাদ করে পুরাতনের প্রতিবাদ করি। আমাদের রাজনীতি সমাজনীতি ধর্ম শিক্ষা সাহিত্য—সকল ক্ষেত্রেই তরজমা করা

ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই। সুতরাং আমাদের বর্তমান যুগটি তরজমার যুগ বলে গ্রাহ্য করে নিয়ে ঐ অনুবাদ-কার্যটি ষোলো-আনা ভালোরকম করার উপর আমাদের পুরুষার্থ এবং কৃতিত্ব নির্ভর করছে।

পরের জিনিসকে আপনার করে নেবার নামই তরজমা। সুতরাং ও-কার্য করাতে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই, এবং নিজেদের দৈন্যের পরিচয় দেওয়া হয় মনে করেও লজ্জিত হবার কারণ নেই। কেননা, নিজের ঐশ্বর্য না থাকলে লোকে যেমন দান করতে পারে না, তেমনি নেবার যথেষ্ট ক্ষমতা না থাকলে লোকে গ্রহণও করতে পারে না। স্মৃতির মতে, দাতা এবং গ্রহীতার পরস্পর যোগ না হলে দান-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। মৃত ব্যক্তি দাতাও হতে পারে না, গ্রহীতাও হতে পারে না; কারণ দান এবং গ্রহণ উভয়ই জীবনের ধর্ম। বুদ্ধদেব যিশুখৃষ্ট মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষদের নিকট কোটি-কোটি মানব ধর্মের জন্য ঋণী। কিন্তু তাঁদের দত্ত অমূল্য রত্ন তাঁদের হাত থেকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা কেবল-মাত্র তাঁদের সমকালবর্তী জনকতক মহাপুরুষেরই ছিল। এবং শিষ্যপরম্পরায় তাঁদের মত আজ লক্ষ লক্ষ লোকের ঘরের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। পৃথিবীতে গুরু হওয়া বেশি শক্ত কিংবা শিষ্য হওয়া বেশি শক্ত, বলা কঠিন। যাঁদের বেদান্তশাস্ত্রের সঙ্গে স্বল্পমাত্রও পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে, পুরাকালে গুরুরা কাউকে ব্রহ্ম-বিদ্যা দান করবার পূর্বে শিষ্যের সে বিদ্যা গ্রহণ করবার উপযোগিতা সম্বন্ধে কিরূপ কঠিন পরীক্ষা করতেন। উপনিষদ্‌কে গুহ্যশাস্ত্র করে রাখবার উদ্দেশ্যই এই যে, যাদের শিষ্য হবার সামর্থ্য নেই, এমন লোকেরা ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে বিদ্যে ফলাতে না পারে। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, শক্তিমান গুরু হবার একমাত্র উপায় পূর্বে ভক্তি-মান শিষ্য হওয়া। বর্তমান যুগে আমরা ভক্তি-পদার্থটি ভুলে গেছি, আমাদের মনে আছে শুধু অভক্তি ও অতিভক্তি। এ দুয়ের একটিও সাধুতার লক্ষণ নয়, তাই ইংরেজি-শিক্ষিত লোকের পক্ষে অপর কাউকে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব।

আমরা কথায় বলি, জ্ঞানলাভ করি; কিন্তু আসলে জ্ঞান উত্তরাধিকারীস্বত্বে কিংবা প্রসাদস্বরূপে লাভ করবার পদার্থ নয়। আমরা সজ্ঞানে জন্মলাভ করি নে, কেবল জ্ঞান অর্জন করবার ক্ষমতামাত্র নিয়ে ভূমিষ্ঠ হই। জানা-ব্যাপারটি মানসিক চেষ্টার অধীন, জ্ঞান একটি মানসিক ক্রিয়া মাত্র; এবং সে ক্রিয়া ইচ্ছাশক্তির একটি বিশেষ বিকাশ। মন-পদার্থটি একটি বেওয়ারিশ স্লেট নয়, যার উপর বাহ্যজগৎ-রূপ পেন্সিল শুধু হিজিবিজি কেটে যায়; অথবা ফোটোগ্রাফিক প্লেটও নয়, যা কোনোরূপ অন্তর্গূঢ় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বাহ্যজগতের ছায়া ধরে রাখে। যে প্রক্রিয়ার বলে আমরা জ্ঞাতব্য বিষয়কে নিজের ইচ্ছা এবং ক্ষমতা-অনুসারে নিজের অন্তর্ভূত করে নিতে পারি, তারই নাম জ্ঞান। আমরা মনে মনে যা তরজমা করে নিতে পারি, তাই আমরা যথার্থ জানি; যা পারি নে, তার শুধু নামমাত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। ঐ তরজমা করার শক্তির উপরই মানুষের মনুষ্যত্ব নির্ভর করে। সুতরাং একাগ্রভাবে তরজমা-কার্যে ব্রতী হওয়াতে আমাদের পুরুষকার বৃদ্ধি পাবে বৈ ক্ষীণ হবে না।

আমি পূর্বে বলেছি যে, আমরা সকলে মিলে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই, হয়

ইউরোপীয় নয় আর্য সভ্যতার তরজমা করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু ফলে আমরা তরজমা না করে শুধু নকলই করছি। নকল করার মধ্যে কোনোরূপ গৌরব বা মনুষ্যত্ব নেই। মানসিক শক্তির অভাববশতই মানুষে যখন কোনো জিনিস রূপান্তরিত ক'রে নিজের জীবনের উপযোগী করে নিতে পারে না, অথচ লোভবশত লাভ করতে চায়, তখন তার নকল করে। নকলে বাইরের পদার্থ বাইরেই থাকে, আমাদের অন্তর্ভূত হয় না; তার দ্বারা আমাদের মনের এবং চরিত্রের কান্তি পুষ্ট হয় না, ফলে মানসিক শক্তির যথেষ্ট চর্চার অভাববশত দিন দিন সে শক্তি হ্রাস হতে থাকে। ইউরোপীয় সভ্যতা আমরা নিজেদের চারি পাশে জড়ো করেও সেটিকে অন্তরঙ্গ করতে পারি নি; তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, আমরা মাঝে মাঝে সেটিকে ঝেড়ে ফেলবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করি। মানুষে যা আত্মসাৎ করতে পারে না তাই ভস্মসাৎ করতে চায়। আমরা মুখে যাই বলি-নে কেন, কাজে পূর্ব-সভ্যতা নয়, পশ্চিম-সভ্যতারই নকল করি; তার কারণ ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের চোখের সুমুখে সশরীরে বর্তমান, অপর পক্ষে আর্যসভ্যতার প্রেতাত্মামাত্র অবশিষ্ট। প্রেতাত্মাকে আয়ত্ত করতে হলে বহু সাধনার আবশ্যক। তা ছাড়া প্রেতাত্মা নিয়ে যাঁরা কারবার করেন তাঁরা সকলেই জানেন যে, দেহমুক্ত আত্মার সম্পর্কে আসতে হলে অপর-একটি দেহতে তাকে আশ্রয় দেওয়া চাই; একটি প্রাণীর মধ্যস্থতা ব্যতীত প্রেতাত্মা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। আমাদের সমাজের প্রাচীন দেহ আছে বটে, কিন্তু প্রাণ নেই। শব প্রেতাত্মা কর্তৃক আবিষ্ট হলে মানুষ হয় না, বেতাল হয়। বেতালসিদ্ধ হবার দুরাশা খুব কম লোকেই রাখে; কাজেই শুধু মন নয়, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য যে ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের প্রত্যক্ষ রয়েছে, সাধারণত লোকে তারই অনুকরণ করে। অনুকরণ ত্যাগ করে যদি আমরা এই নবসভ্যতার অনুবাদ করতে পারি, তা হলেই সে সভ্যতা নিজস্ব হয়ে উঠবে, এবং ঐ ক্রিয়ার সহায্যেই আমরা নিজেদের প্রাণের পরিচয় পাব, এবং বাঙালির বাঙালিত্ব ফুটিয়ে তুলব।

তরজমার আবশ্যকত্ব স্থাপনা করে এখন কি উপায়ে আমরা সে বিষয়ে কৃতকার্য হব সে সম্বন্ধে আমার দু-চারটি কথা বলবার আছে।

সাধারণত লোকের বিশ্বাস যে, কথার চাইতে কাজ শ্রেষ্ঠ। এ বিশ্বাস বৈষয়িক হিসাবে সত্য এবং আধ্যাত্মিক হিসাবে মিথ্যা। মানুষমাত্রেই নৈসর্গিক প্রবৃত্তির বলে সংসারযাত্রার উপযোগী সকল কার্য করতে পারে; কিন্তু তার অতিরিক্ত কর্ম—যার ফল একে নয় দশে লাভ করে, তা—করবার জন্য মনোবল আবশ্যক। সমাজে সাহিত্যে যা-কিছু মহৎকার্য অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার মূলে মন-পদার্থটি বিদ্যমান। যা মনে ধরা পড়ে তাই প্রথমে কথায় প্রকাশ পায়, সেই কথা অবশেষে কার্যরূপে পরিণত হয়; কথার সূক্ষ্মশরীর কার্যরূপ স্থূলদেহ ধারণ করে। আগে দেহটি গড়ে নিয়ে পরে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টাটি একেবারেই বৃথা। কিন্তু আমরা রাজনীতি সমাজনীতি ধর্ম সাহিত্য সকল ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণের সন্ধান না করে শুধু তার দেহটি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করায় নিত্যই ইতোনষ্টস্ততো-ভ্রষ্ট হচ্ছি। প্রাণ নিজের দেহ নিজের রূপ নিজেই গড়ে নেয়। নিজের অন্তর্নিহিত

প্রাণশক্তির বলেই বীজ ক্রমে বৃক্ষ-রূপ ধারণ করে। সুতরাং আমরা যদি ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারি, তা হলেই আমাদের সমাজ নবকলেবর ধারণ করবে। এই নবসভ্যতাকে মনে সম্পূর্ণরূপ পরিপাক করতে পারলেই আমাদের কান্তি পুষ্ট হবে। কিন্তু যতদিন সে সভ্যতা আমাদের মুখস্থ থাকবে কিন্তু উদরস্থ হবে না, ততদিন তার কোনো অংশই আমরা জীর্ণ করতে পারব না। আমরা যে, ইউরোপীয় সভ্যতা কথাতেও তরজমা করতে পারি নি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আমাদের নূতন শিক্ষালব্ধ মনোভাবসকল শিক্ষিত লোকদেরই রসনা আশ্রয় করে রয়েছে, সমগ্র জাতির মনে স্থান পায় নি। আমরা ইংরেজি ভাব ভাষায় তরজমা করতে পারি নে বলেই আমাদের কথা দেশের লোকে বোঝে না, বোঝে শুধু ইংরেজি-শিক্ষিত লোকে। এ দেশের জনসাধারণের নেবার ক্ষমতা কিছু কম নয় কিন্তু আমাদের কাছ থেকে তারা যে কিছু পায় না, তার একমাত্র কারণ আমাদের অন্যকে দেবার মতো কিছু নেই; আমাদের নিজস্ব বলে কোনো পদার্থ নেই, আমরা পরের সোনা কানে দিয়ে অহংকারে মাটিতে পা দিই নে। অপর পক্ষে আমাদের পূর্বপুরুষদের দেবার মতো ধন ছিল, তাই তাঁদের মনোভাব নিয়ে আজও সমগ্র জাতি ধনী হয়ে আছে। ঋষিবাক্যসকল লোকমুখে এমনি সুন্দর ভাবে তরজমা হয়ে গেছে যে, তা আর তরজমা বলে কেউ বুঝতে পারেন না। এ দেশের অশিক্ষিত লোকের রচিত বাউলের গান কাউকে আর উপনিষদের ভাষায় অনুবাদ করে বোঝাতে হয় না, অথচ একই মনোভাব ভাষান্তরে বাউলের গানে এবং উপনিষদে দেখা দেয়। আত্মা যেমন এক দেহ ত্যাগ করে অপর দেহ গ্রহণ করলে পূর্বদেহের স্মৃতিমাত্রও রক্ষা করে না, মনোভাবও যদি তেমনি এক ভাষার দেহ ত্যাগ করে অপর-একটি ভাষার দেহ অবলম্বন করে, তা হলেই সেটি যথার্থ অনূদিত হয়।

উপযুক্ত তরজমার গুণেই বৈদান্তিক মনোভাবসকল হিন্দুসন্তানমাত্রেরই মনে অল্পবিস্তর জড়িয়ে আছে। এ দেশে এমন লোক বোধ হয় নেই, যার মনটিকে নিংড়ে নিলে অন্তত এক ফোঁটাও গৈরিক রঙ না পাওয়া যায়। আর্যসভ্যতার প্রেতাত্মা উদ্ধার করবার চেষ্টাটা একেবারেই অনর্থক, কারণ তার আত্মাটি আমাদের দেহাভ্যন্তরে সুষুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, যদি আবশ্যক হয় তো সেটিকে সহজেই জাগিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ঠিক কথাটি বলতে পারলে অপরের মনের দ্বার আরব্য-উপন্যাসের দস্যুদের ধনভাণ্ডারের দ্বারের মতো আপনি খুলে যায়। আমরা, ইংরেজি-শিক্ষিত লোকেরা, জনসাধারণের মনের দ্বার খোলবার সংকেত জানি নে, কারণ আমরা তা জানবার চেষ্টাও করি নে। যে-সকল কথা আমাদের মুখের উপর আল্‌গা হয়ে রয়েছে কিন্তু মনে প্রবেশ করে নি, সেগুলি আমাদের মুখ থেকে খসে পড়লেই যে অপরের অন্তরে প্রবেশ লাভ করবে, এ আশা বৃথা।

আমরা যে আমাদের শিক্ষালব্ধ ভাবগুলি তরজমা করতে অকৃতকার্য হয়েছি, তার প্রমাণ তো সাহিত্যে এবং রাজনীতিতে দু বেলাই পাওয়া যায়। যেমন সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত সংস্কৃত'ছায়া'র সাহায্য ব্যতীত বুঝতে পারা যায় না, তেমনি আমাদের নবসাহিত্যের কৃত্রিম প্রাকৃত ইংরেজি-ছায়ার সাহায্য ব্যতীত বোঝা যায় না। সমাজে না হোক, সাহিত্যে 'চুরি বিদ্যে বড়ো বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা'; কিন্তু আমাদের নব-

সাহিত্যের বস্তু যে চোরাই-মাল, তা ইংরেজি সাহিত্যের পাঠকমাত্রেরই কাছে ধরা পড়ে। আমরা ইংরেজি সাহিত্যের সোনারুপো যা চুরি করি, তা গলিয়ে নিতেও শিখি নি। এই তো গেল সাহিত্যের কথা। রাজনীতি-বিষয়ে আমাদের সকল ব্যাপার যে আগাগোড়াই নকল, এ বিষয়ে বোধ হয় আর দু-মত নেই, সুতরাং সে সম্বন্ধে বেশিকিছু বলা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের মনে মনে বিশ্বাস যে, ধর্ম এবং দর্শন এই দুটি জিনিস আমাদের একচেটে; এবং অন্য-কোনো বিষয়ে না হোক, এই দুই বিষয়ে আমাদের সহজ কৃতিত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। ইংরেজি-শিক্ষিত ভারতবাসীদের এ বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ অমূলক, তার প্রমাণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে যে, ঐ শ্রেণীর লোকের হাতে মনুর ধর্ম রিলিজিঅন হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ ভুল তরজমার বলে ব্যবহারশাস্ত্র আধ্যাত্মিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ধর্মশাস্ত্র এবং মোক্ষশাস্ত্রের ভেদজ্ঞান আমাদের লুপ্ত হয়েছে। ধর্মের অর্থ ধরে রাখা এবং মোক্ষের অর্থ ছেড়ে দেওয়া, সুতরাং এ দুয়ের কাজ যে এক নয়, তা শুধু ইংরেজিনবিশ আর্য-সন্তানরাই বুঝতে পারেন না।

গীতা আমাদের হাতে পড়বামাত্র তার হরিভক্তি উড়ে যায়। সেই কারণে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'গীতায় ঈশ্বরবাদ'এর প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নব্য পণ্ডিতসমাজে শুধু বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি করেছিলেন। তার পর গীতার কর্ম ইংরেজি work রূপ ধারণ ক'রে আমাদের কাছে গ্রাহ্য হয়েছে; অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের কর্ম কাণ্ডহীন হয়েই আমাদের কাছে উচ্চ বলে গণ্য হয়েছে। এই ভুল তরজমার প্রসাদেই যে কর্মের উদ্দেশ্য পরের হিত এবং নিজের আত্মার উন্নতি সাধন, পরলোকের অভ্যুদয়ও নয়, সেই কর্ম আজকাল ইহলোকের অভ্যুদয়ের জন্য ধর্ম বলে গ্রাহ্য হয়েছে। যে কাজ মানুষে পেটের দায়ে নিত্য করে থাকে, তা করা কর্তব্য; এইটুকু শেখাবার জন্য ভগবানের যে ভোগায়তন দেহ ধারণ ক'রে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার আবশ্যকতা ছিল না, এ সোজা কথাটাও আমরা বুঝতে পারি নে। ফলে, আমাদের-কৃত গীতার অনুবাদ বক্তৃতাতেই চলে, জীবনে কোনো কাজে লাগে না।

এক দিকে আমরা এ দেশের প্রাচীন মতগুলিকে যেমন ইংরেজি পোশাক পরিয়ে তার চেহারা বিলকুল বদলে দিই, তেমনি অপর দিকে ইউরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞানকেও আমরা সংস্কৃত ভাষার ছদ্মবেশ পরিয়ে লোকসমাজে বার করি।

নিত্যই দেখতে পাই যে, খাঁটি জর্মান মাল স্বদেশী বলে পাঁচজনে সাহিত্যের বাজারে কাটাতে চেষ্টা করছে। হেগেলের দর্শন শংকরের নামে বেনামি করে অনেকে কতক পরিমাণে অজ্ঞ লোকদের কাছে চালিয়েও দিয়েছেন। আমাদের মুক্তির জন্য হেগেলেরও আবশ্যক আছে, শংকরেরও আবশ্যক আছে; কিন্তু তাই বলে হেগেলের মস্তক মুণ্ডন করে তাঁকে আমাদের স্বহস্তরচিত শতগ্রন্থিময় কন্থা পরিয়ে শংকর বলে সাহিত্যসমাজে পরিচিত করে দেওয়াতে কোনো লাভ নেই। হেগেলকে ফকির না করে যদি শংকরকে গৃহস্থ করতে পারি, তাতে আমাদের উপকার বেশি।

বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ঐরূপ ভুল তরজমা অনেক অনর্থ ঘটিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইভলিউশনের কথাটা ধরা যাক। ইভলিউশনের দোহাই না দিয়ে আমরা আজকাল কথাই কইতে পারি নে। আমরা উন্নতিশীল হই আর স্থিতিশীলই হই, আমাদের

সকলপ্রকার শ্রীলই ঐ ইভলিউশন আশ্রয় করে রয়েছে। সুতরাং ইভলিউশনের যদি আমরা ভুল অর্থ বুঝি, তা হলে আমাদের সকল কার্যই যে আরম্ভে পর্যবসিত হবে সে তো ধরা কথা। বাংলায় আমরা ইভলিউশন 'ক্রমবিকাশবাদ' 'ক্রমোন্নতিবাদ' ইত্যাদি শব্দে তরজমা করে থাকি। ঐরূপ তরজমার ফলে আমাদের মনে এই ধারণা জন্মে গেছে যে, মাসিক পত্রের গল্পের মতো জগৎ-পদার্থটি ক্রমশপ্রকাশ্য। সৃষ্টির বইখানি আদ্যোপান্ত লেখা হয়ে গেছে, শুধু প্রকৃতির ছাপাখানা থেকে অল্প অল্প করে বেরোচ্ছে, এবং যে অংশটুকু বেরিয়েছে তার থেকেই তার রচনাপ্রণালীর ধরন আমরা জানতে পেরেছি। সে প্রণালী হচ্ছে ক্রমোন্নতি, অর্থাৎ যত দিন যাবে তত সমস্ত জগতের এবং তার অন্তর্ভূত জীবজগতের এবং তার অন্তর্ভূত মানবসমাজের এবং তার অন্তর্ভূত প্রতি মানবের উন্নতি অনিবার্য। প্রকৃতির ধর্মই হচ্ছে আমাদের উন্নতি সাধন করা। সুতরাং আমাদের তার জন্য নিজের কোনো চেষ্টার আবশ্যক নেই। আমরা শুয়েই থাকি আর ঘুমিয়ে থাকি, জাগতিক নিয়মের বলে আমাদের উন্নতি হবেই। এই কারণেই এই ক্রমোন্নতিবাদ-আকারে ইভলিউশন আমাদের স্বাভাবিক জড়তা এবং নিশ্চেষ্টতার অনুকূল মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া এই 'ক্রম' শব্দটি আমাদের মনের উপর এমনি আধিপত্য স্থাপন করেছে যে, সেটিকে অতিক্রম করা পাপের মধ্যে গণ্য হয়ে পড়েছে। তাই আমরা নানা কাজের উপ-ক্রমণিকা করেই সন্তুষ্ট থাকি, কোনো বিষয়েরই উপসংহার করাটা কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করি নে; প্রস্তাবনাতেই আমাদের জীবন-নাটকের অভিনয় শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আসলে ইভলিউশন ক্রমবিকাশও নয় ক্রমোন্নতিও নয়। কোনো পদার্থকে প্রকাশ করবার শক্তি জড়প্রকৃতির নেই, এবং তার প্রধান কাজই হচ্ছে সকল উন্নতির পথে বাধা দেওয়া। ইভলিউশন জড়জগতের নিয়ম নয়, জীবজগতের ধর্ম। ইভলিউ-শনের মধ্যে শুধু ইচ্ছাশক্তিরই বিকাশ পরিস্ফুট। ইভলিউশন অর্থে দৈব নয়, পুরুষকার। তাই ইভলিউশনের জ্ঞান মানুষকে অলস হতে শিক্ষা দেয় না, সচেষ্ট হতে শিক্ষা দেয়। আমরা ভুল তরজমা করে ইভলিউশনকে আমাদের চরিত্র-হীনতার সহায় করে এনেছি।

ইউরোপীয় সভ্যতার হয় আমরা তরজমা করতে কৃতকার্য হচ্ছি নে, নয় ভুল তরজমা করছি, তাই আমাদের সামাজিক জীবনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং অপচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ আমাদের বিশ্বাস যে আমরা দু পাতা ইংরেজি পড়ে নব্যব্রাহ্মণসম্প্রদায় হয়ে উঠেছি। তাই আমরা নিজেদের শিক্ষার দৌড় কত সে বিষয়ে লক্ষ না করে জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। এ সত্য আমরা ভুলে যাই যে, ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান থেকে যদি আমরা নতুন প্রাণ লাভ করে থাকতুম তা হলে জনসাধারণের মধ্যে আমরা নবপ্রাণের সঞ্চারও করতে পারতুম। আমরা অধ্যয়ন করে যা লাভ করেছি তা অধ্যাপনার দ্বারা দেশসুদ্ধ লোককে দিতে পারতুম। আমরা আমাদের cultureকে nationalize করতে পারি নি বলেই গবর্নমেন্টকে পরামর্শ দিচ্ছি যে আইনের দ্বারা বাধ্য করে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া হোক। মান্যবর শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে যে হুজুগটির মুখপাত্র হয়েছেন, তার মূলে ইউরোপের নকল ছাড়া আর কোনো

মনোভাব নেই। তাই গবর্নমেন্টকে ভজাবার জন্য দিবারাত্রি খালি বিলেতি নজিরই দেখানো হচ্ছে। শিক্ষা শব্দের অর্থ শুধু লিখতে ও পড়তে শেখা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গবর্নমেন্টই স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে আমাদের লিখতে পড়তে শিখিয়েছেন। সুতরাং গবর্নমেন্টকে গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন করে রাজ্যিসুদ্ধ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেই হবে, এই হচ্ছে আমাদের হাল রাজনৈতিক আবদার। যতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের নব শিক্ষা মজ্জাগত করতে না পারব ততদিন জনসাধারণকে পড়তে শিখিয়ে তাদের যে কি বিশেষ উপকার করা হবে তা ঠিক বোঝা যায় না। আমরা আজ পর্যন্ত ছোটোছেলেদের উপযুক্ত একখানিও পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে পারি নি। পড়তে শিখলে এবং পড়বার অবসর থাকলে এবং বই কেনবার সংগতি থাকলে প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত চাষার ছেলেরা সেই রামায়ণ-মহাভারতই পড়বে— আমাদের নবশিক্ষার ভাগ তারা কিছু পাবে না। রামায়ণ-মহাভারতের কথা যে বইয়ে পড়ার চাইতে মুখে শোনা অনেক বেশি শিক্ষাপ্রদ, তা নব্যশিক্ষিত ভারতবাসী ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করবেন না। মুখের বাক্যে প্রাণ আছে, লেখার ধ্বনিহীন বাক্য আধমরা। সে যাই হোক, আমাদের দেশের লৌকিক শিক্ষার জ্ঞান যদি আমাদের থাকত এবং সেই শিক্ষার প্রতি অযথা অবজ্ঞা যদি আমাদের মনে না স্থান পেত, তা হলে না-ভেবেচিন্তে লোকশিক্ষার দোহাই দিয়ে সেই চিরাগত লৌকিক শিক্ষা নষ্ট করতে আমরা উদ্যত হতুম না। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা লোকাচার, লৌকিক ধর্ম, লৌকিক ন্যায় এবং লৌকিক বিদ্যাকে কিরূপ মান্য করতেন। কেবলমাত্র বর্ণপরিচয় হলেই লোকে শিক্ষিত হয় না; কিন্তু ঐ পরিচয় লাভ করতে গিয়ে যে বর্ণধর্ম হারানো অসম্ভব নয়, তা সকলেই জানেন। মাসিক পাঁচটাকা বেতনের গুরু-নামক গোরুর দ্বারা তাড়িত হওয়া অপেক্ষা চাষার ছেলের পক্ষে গোরু তাড়ানো শ্রেয়। 'ক' অক্ষর যে কোনো লোকের পক্ষেই গোমাংস হওয়া উচিত নয়, এ কথা আমরা সকলেই মানি। কিন্তু 'ক' অক্ষর যে আমাদের রক্তমাংস হওয়া উচিত, এ ধারণা সকলের নেই। কেবল স্বাক্ষর করতে শেখার চাইতে নিরক্ষর থাকাও ভালো, কারণ পৃথিবীতে আঙুলের ছাপ রেখে যাওয়াতেই মানবজীবনের সার্থকতা। আমাদের আহার পরিচ্ছদ গৃহ মন্দির, সব জিনিসেই আমাদের নিরক্ষর লোকদের আঙুলের ছাপ রয়েছে। শুধু আমরা শিক্ষিতসম্প্রদায়ই ভারতমাতাকে পরিষ্কার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যাচ্ছি। পতিতের উদ্ধারকার্যটি খুব ভালো; ওর একমাত্র দোষ এই যে, যাঁরা পরকে উদ্ধার করবার জন্য ব্যস্ত তাঁরা নিজেদের উদ্ধার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমরা যতদিন শুধু ইংরেজির নীচে স্বাক্ষর দিয়েই ক্ষান্ত থাকব কিন্তু সাহিত্যে আমাদের আঙুলের ছাপ ফুটবে না, ততদিন আমরা নিজেরাই যথার্থ শিক্ষিত হব না, পরকে শিক্ষা দেওয়া তো দূরের কথা। আমি জানি যে, আমাদের জাতিকে খাড়া করবার জন্য অসংখ্য সংস্কারের দরকার আছে। কিন্তু আর যে-কোনো সংস্করণের আবশ্যক থাক্ না কেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাজার হাজার বটতলার সংস্করণের আবশ্যক নেই।

মাঘ ১৩১৯

বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ

বর্তমান যুদ্ধের কার্যকারণ সম্বন্ধে ইউরোপে যদি কোনো বাজে কথা কিংবা অসংগত কথা বলা হয় তাতে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই, কেননা মানুষে যখন যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, মনে যখন রাগ ও দ্বেষই প্রাধান্য লাভ করে তখন তার পক্ষে বাক্যের সংযম কতক পরিমাণে হারানো স্বাভাবিক।

ঘরে ডাকাত পড়লে তার সংগে মিষ্ট এবং শিষ্ট আলাপ করা সম্ভবত দেবতার পক্ষে স্বাভাবিক, মানুষের পক্ষে নয়; এবং ইউরোপের লোক দেবতা নয়, মানুষ।

কিন্তু এই যুদ্ধ ব্যাপারটি আমাদের পক্ষে নিরপেক্ষভাবে বিচার করবার বিশেষ কোনো বাধা নেই। আমরা ও-জালে জড়িয়ে পড়ি নি; এখন পর্যন্ত আমাদের সংগে এ ব্যাপারের যা-কিছু যোগ আছে সে শুধু তারের—নাড়ির নয়।

ইউরোপে সুরাসুর মিলে যে ভবসমুদ্র মন্থন করেছেন তার ফলে অমৃতই উঠুক আর হলাহলই উঠুক, তার ভাগ আমরাও পাব; কিন্তু সে ভবিষ্যতে। সে বস্তু পান করবার পূর্বেই আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম হবার কোনো কারণ নেই। বরং এই অবসরে আমরা যদি ব্যাপারটি ঠিক ভাবে দেখতে ও বুঝতে শিখি তা হলে এর ভবিষ্যৎ ফলাফলের জন্য আমরা অনেকটা প্রস্তুত থাকব।

এই সমরানলে যে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে সে কথা সত্য। কিন্তু 'বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা'র অর্থ যে কি, সে বিষয়ে দেখতে পাই অনেকের তেমন স্পষ্ট ধারণা নেই। এমন-কি, কেউ কেউ এই উপলক্ষে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না।

আমার মতে ইউরোপের প্রতি অবজ্ঞার কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। এ অবশ্য রুচির কথা; সুতরাং এ ক্ষেত্রে মতভেদের যথেষ্ট অবসর আছে। মনোভাব প্রকাশ না করলেই যে, সে ভাব মন থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায় তা অবশ্য নয়। অথচ এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য যে, আমরা মুখে কি বলি, তার চাইতে আমরা মনে কি ভাবি তার মূল্য আমাদের কাছে ঢের বেশি; কেননা সত্যের জ্ঞান না হলে মানুষে সত্য কথা বলতে পারে না।

প্রথমত কি স্বদেশী, কি বিদেশী, কি নবীন, কি প্রাচীন কোনো সভ্যতাকেই এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

একটি বিপুল মানবসমাজের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে ওরকম এক-তরফা ডিক্রি দেওয়ার নাম বিচার নয়। বহু মানবে বহু দিন ধরে কায়মনোবাক্যে যে সভ্যতা গড়ে তুলেছে তার ভিতর যে মনুষ্যত্ব নেই, এ কথা বলতে শুধু তিনিই অধিকারী যিনি মানুষ নন। অপর পক্ষে 'চরম-সভ্যতা' বলে কোনো পদার্থ মানুষে আজ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারে নি এবং কখনো পারবে না। কেননা, পৃথিবী যেদিন স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠবে সেদিন মানুষের দেহমনের আর কোনো কার্য থাকবে না, কাজেই মানুষ তখন চিরনিদ্রা উপভোগ করতে বাধ্য হবে। অন্তত পৃথিবীতে এমন কোনো সভ্যতা

আজ পর্যন্ত হয় নি যা একেবারে নির্গুণ কিংবা একেবারে নির্দোষ। কোনো একটি বিশেষ সভ্যতার বিচার করবার জন্য তার দোষগুণের পরিচয় নেওয়া আবশ্যক, মনকে খাটানো দরকার। যখন আমরা আলস্যে অভিভূত হয়ে হাই তুলি তখনই আমরা তুড়ি দিই, সুতরাং আমরা যখন তুড়ি দিয়ে কোনো জিনিস উড়িয়ে দিতে চাই তখন আমরা মানসিক আলস্য ব্যতীত অন্য কোনো গুণের পরিচয় দিই না। এ সত্য অবশ্য চিরপরিচিত; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পৃথিবীতে যা চিরপরিচিত তাই চির-উপেক্ষিত।

ইউরোপের বর্তমান সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, যে মনোভাবের উপর সে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত এই মহাসমর হচ্ছে তার স্বাভাবিক পরিণতি; কেননা এ যুগে ইউরোপ ধর্মপ্রাণ নয়, কর্মপ্রাণ। সে দেশে আজ আত্মার অপেক্ষা বিষয়ের, মনের অপেক্ষা ধনের মাহাত্ম্য ঢের বেশি। শিল্প-বাণিজ্যের পরিমাণ-অনুসারেই এ যুগে ইউরোপের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপ করা হয় এবং সে দেশের লোকের বিশ্বাস যে, মানবের ভ্রাতৃভাব নয় ভ্রাতৃবিরোধই হচ্ছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভ্যুদয়ের একমাত্র উপায়। অতএব এই যুদ্ধ হচ্ছে ইউরোপের আজ একশো বৎসরের কর্মফল।

এ অভিযোগের মূলে যে কতকটা সত্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু কতটা, তাই হচ্ছে বিচার্য।

আমরা মানবসভ্যতাকে সচরাচর দুই ভাগে বিভক্ত করি; প্রাচীন ও নবীন। কিন্তু পৃথিবীতে এমন-কোনো বর্তমান সভ্যতা নেই যা অনেক অংশে প্রাচীন নয়। যেমন আমাদের বর্তমান সভ্যতা কিংবা অসভ্যতা এক অংশে প্রাচীন হিন্দু এবং আর-এক অংশে নব্য ইউরোপীয়, তেমনি ইউরোপের বর্তমান সভ্যতা আট-আনা নতুন হলেও আট-আনা পুরনো। সুতরাং এই যুদ্ধের জন্য ইউরোপের নবমনোভাবকে সম্পূর্ণ দায়ী করা যেতে পারে না, বরং তার পূর্বসংস্কারকেই এর জন্য দোষী করা অসংগত হবে না।

মানুষে-মানুষে কাটাকাটি-মারামারি করা যদি অসভ্যতার লক্ষণ হয় তা হলে বলতে হবে ইউরোপের বর্তমান যুগের অপেক্ষা মধ্যযুগ ঢের বেশি অসভ্য ছিল। সে যুগে যুদ্ধপার্বন বারো মাসে তেরো বার হত এবং সে কালের মতে ও-কার্যটি নিত্যকর্মের মধ্যে গণ্য ছিল। মধ্যযুগকে ইউরোপীয়েরা কৃষ্ণযুগ বলেন, কিন্তু আসলে সেটি রক্তযুগ। আমরা আমাদের বর্তমান মনোভাববশতই যুদ্ধকার্যটি হেয় মনে করি, প্রাচীন মনোভাব থাকলে শ্রেয় মনে করতুম। ইউরোপের নবযুগ অবশ্য এক হিসাবে যন্ত্রযুগ, কিন্তু তাই বলে মধ্যযুগ যে মন্ত্রযুগ ছিল, তা নয়। যে হিসাবে মধ্যযুগ ধর্মপ্রাণ ছিল সে হিসাবে নবযুগ ধর্মপ্রাণ নয়। সে হিসাবটি যে কি, তা একটু পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক।

বৌদ্ধধর্মের মতো খৃস্টধর্মেরও ত্রিরত্ন আছে—সে হচ্ছে খৃস্ট ধর্ম ও সংঘ; এবং খৃস্টিয়ান মাত্রেই নামমাত্র এই তিনের শরণ গ্রহণ করেন। কিন্তু যুগভেদে এই তিনের মধ্যে এক-একটি রত্ন সর্বাপেক্ষা মহামূল্য হয়ে ওঠে।

প্রথম যুগে (Primitive Christianity) খৃস্টিয়ানের পক্ষে খৃস্টই ছিল শরণ্য। মধ্যযুগে খৃস্টের স্থান খৃস্টসংঘ অধিকার করেন এবং ইউরোপের মনোরাজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করেন; সে সংঘ সে আধিপত্যের ভাগ খৃস্টকেও দেন নি, ধর্মকেও দেন নি। প্রায় একহাজার বৎসর ধরে খৃস্টসংঘ মানবের বুদ্ধি ও আত্মাকে সমান অভিভূত করে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, সাংসারিক হিসাবেও এই সংঘ ইউরোপের রাজরাজেশ্বর হয়ে উঠেছিলেন। এই সংঘ মানুষের তন মন ধনের উপর এই অসীম প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ধর্মের নামে কত যে অধর্মযুদ্ধের প্রবর্তন করেছেন তার প্রমাণ মধ্যযুগের ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়।

এই সংঘের ধর্ম ও খৃস্টধর্ম এক বস্তু নয়। সুতরাং এই সংঘের দাসত্ব হতে মুক্তিলাভ করে ইউরোপের যে ধর্মজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে এ কথা বলা চলে না। বরং পূর্বের অপেক্ষা বর্তমানে ইউরোপীয়দের যে ধর্মবুদ্ধি (conscience) অধিক জাগ্রত হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ ইউরোপের সকল আইনকানুনে সকল সমাজব্যবস্থায় পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের অন্ধ কারাগার আপনি ভেঙে পড়ে নি; মানবমনের একটির পর আর-একটি তিনটি প্রবল ধাক্কায় তার পাষাণপ্রাচীর বিদীর্ণ হয়েছে; সে তিন হচ্ছে ইতালির রেনেসাঁস্, জর্মানির রিফর্মেশন এবং ফ্রান্সের রেভলিউশন।

গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সভ্যতার স্পর্শে ইতালি যেদিন নবজীবন লাভ করলে সেইদিন ইউরোপে নবসভ্যতার সূত্রপাত হল। এই প্রাচীন সাহিত্যের আবিষ্কারের সঙ্গে মানুষ নিজের শক্তি ও বাহিরের সৌন্দর্য আবিষ্কার করলে। মানুষ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের চোখ দিয়ে দেখতে এবং নিজের বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে শিখলে। মানুষের পক্ষে তার এই নব-আবিষ্কৃত অন্তর্নিহিত শক্তির চর্চাই তার প্রধান কর্তব্য হয়ে উঠল। যে প্রকৃতিকে ইউরোপীয়েরা হাজার বৎসর ধরে বিমাতা মনে করে আসছিল, তাকে তারা সেবাদাসীতে পরিণত করতে ব্যগ্র হয়ে উঠল। এই নবজীবন শিল্পে বিজ্ঞানে কাব্যে ইতিহাসে বিকশিত হয়ে উঠল। এক কথায় নবজীবন লাভ করে মানুষের চোখ-কান ফুটল এবং হাত-পায়ের খিল খুলে গেল।

এর পরবর্তী যুগে জর্মানি বাইবেলের আবিষ্কারের সঙ্গে নিজের আত্মারও আবিষ্কার করলে; মানুষে এই সত্যের পরিচয় পেলে যে, ধর্মের মূল তার নিজের অন্তরে, ধর্মযাজকের মুখে নয়। খৃস্টের ধর্মের পরিচয় লাভ করে মানুষে খৃস্ট-সংঘের সংস্কারের জন্য উৎসুক হয়ে উঠল। জর্মানির এই নবসংস্কারের গুণে ইউরোপের মানবশক্তি আবার অন্তর্মুখী হল। মানুষ আত্মদর্শনের জন্য লালায়িত হয়ে উঠল।

এই রেনেসাঁসের ফলে ইউরোপে মানুষের কর্মবুদ্ধি এবং এই রিফর্মেশনের ফলে তার ধর্মবুদ্ধি মুক্তিলাভ করলে; কিন্তু তার সামাজিক জীবনের বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটল না।

তার পর ফ্রান্সের বিপ্লবের ফলে ইউরোপীয় মানব মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করে জীবনেও স্বাধীনতা লাভ করলে। সুতরাং ইউরোপের নব-যুগের সভ্যতায় মানুষ তার মনুষ্যত্ব ফিরে পেলে, হারাল না। যে মনোভাবের উপর

এ সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত তা শান্তির পক্ষে অনুকূল বই প্রতিকূল নয়। সামাজিক স্বাধীনতা যে সামাজিক মৈত্রীর প্রতিবন্ধক নয়, তার প্রমাণ এই যুদ্ধেই পাওয়া যায়। আজ দেখা যাচ্ছে যে, ইউরোপের এক-একটি জাতি যেন এক-একটি ব্যক্তিস্বরূপ হয়ে উঠেছে; মধ্যযুগে এরূপ একজাতীয়তার ভাব মানুষের কল্পনারও অতীত ছিল।

আমি পূর্বে বলেছি যে, কোনো যুগের কোনো সভ্যতা একেবারে নির্দোষ কিংবা একেবারে নির্গুণ নয়। ইউরোপের মধ্যযুগের সপক্ষে যে কিছু বলবার নেই, তা নয়। অন্ধকারেরও একটা অটল সৌন্দর্য আছে এবং তার অন্তরেও গুপ্তশক্তি নিহিত থাকে। যে ফুল দিনে ফোটে, রাত্রে তার জন্ম হয়—এ কথা আমরা সকলেই জানি। সুতরাং নবযুগে যে-সকল মনোভাব প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে তার অনেক-গুলির বীজ মধ্যযুগে বপন করা হয়েছিল। কিন্তু নবযুগের আলোক না পেলে সে-সকল বীজ বড়োজোর অঙ্কুরিত হত, তার বেশি নয়।

ইউরোপের নবসভ্যতার আলোক সূর্যের আলো নয় যে, তা কেউ নেবাতে পারে না। এ আলো প্রদীপের আলো, আকাশ থেকে পড়ে নি, মানুষে নিজহাতে রচনা করেছে; সুতরাং ইউরোপের নিশাচররা এ আলো নেবাবার বহু চেষ্টা করেছে। মধ্যযুগের সঙ্গে পদে-পদে লড়াই করে নবযুগকে অগ্রসর হতে হয়েছে। রিফর্-মেশনকে আত্মরক্ষার জন্য প্রায় দেড়শো বছর অবিরাম যুদ্ধ করতে হয়েছে। ফরাসি-বিপ্লব আত্মরক্ষার জন্য যে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়, তা ইউরোপময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। 'স্বাধীনতা সাম্য ও মৈত্রী'র মন্ত্রে দীক্ষিত নেপোলিয়ন সমগ্র ইউরোপকে প্রায় নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। স্বাধীনতার অবতার পরের স্বাধীনতা অপহরণ করা, মৈত্রীর অবতার পরের শত্রুতা করা এবং সাম্যের অবতার যে ইউরোপের একেশ্বর হওয়া তাঁর জীবনের ব্রত করে তুলেছিলেন, এ কথা মনে করলে মানবসভ্যতা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু আমরা আজ একশো বছর পরে নেপোলিয়নের এই বিরাট দস্যুতার বিচার করে দেখতে পাই যে, তার সুফল হয়েছে এই যে, ফরাসি রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমগ্র ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; আর তার কুফল হয়েছে এই যে, সেইসঙ্গে নেপোলিয়নের মিলিটারিজ্‌ম্‌ও সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অতীতের সঙ্গে বর্তমানের প্রবল সংঘর্ষে যে অমৃত ও হলাহল উত্থিত হয়েছে, ইউরোপের সকল জাতির দেহ ও মনে তার অল্পবিস্তর প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

বর্তমান যুগের সর্বপ্রধান সমস্যাই এই যে, কি উপায়ে সভ্যসমাজের দেহ এই বিষমুক্ত করা যেতে পারে।

এ সমস্যা অতি গুরুতর সমস্যা। কেননা, এক পক্ষে যেমন ইউরোপের সভ্যজাতিদের মনে যুদ্ধ করবার প্রবৃত্তি কমে এসেছে, অপর পক্ষে তাদের জীবনে পরস্পর যুদ্ধ

করবার নূতন কারণেরও সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণে ইউরোপের মুখে শান্তিবচন এবং হাতে অস্ত্র।

সকলেই জানেন যে, শিল্প ও বাণিজ্যই হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান আশ্রয়স্থল। শিল্পবাণিজ্যের সাহায্যে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করার অর্থ হচ্ছে নিজের পরিশ্রমে জীবিকা অর্জন করা; আর যুদ্ধের দ্বারা অন্নবস্ত্র সংগ্রহ করার অর্থ হচ্ছে পরের পরিশ্রমের ফল উপভোগ করা। এ দুটি মনোভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। এই কারণেই সকল দেশে সকল যুগেই দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে অবজ্ঞা করে এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়কে ভয় করে। যে জাতির অধিকাংশ লোক শিল্পবাণিজ্যে ব্যাপৃত, সে জাতির যুদ্ধে প্রবৃত্ত না থাকাই স্বাভাবিক।

তার পর, শিল্পবাণিজ্যের পক্ষে যুদ্ধের ন্যায় ক্ষতিকর ব্যাপার আর নেই। যুদ্ধ যে মানুষের সকল কাজকর্ম সকল বেচাকেনা একদিনেই বন্ধ করে দেয়, তার প্রমাণ তো আজ হাতে-হাতেই পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং, যুদ্ধ জিনিসটি ইউরোপীয়দের স্বার্থের বিরোধী। আর-এক কথা, হার্বার্ট স্পেন্সর প্রমুখ দার্শনিকেরা আশা করেছিলেন যে, বর্তমান ইউরোপের বৈশ্যসভ্যতা পৃথিবীতে চিরশান্তি স্থাপন করবে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, বাণিজ্যের যোগসূত্র পৃথিবীর সকল জাতির সখ্যসূত্রে পরিণত হবে। এই অন্নবস্ত্রের অবাধ আদানপ্রদানের ফলে প্রতি জাতির কাছেই বসুধা কুটুম্ব হয়ে উঠবে। এই কারণে এই শ্রেণীর দার্শনিকদের মতে ক্ষত্রিয়যুগের অপেক্ষা বৈশ্যযুগের সভ্যতা মানব-ইতিহাসের উন্নত স্তরের সভ্যতা। হার্বার্ট স্পেন্সরের এই আশা যে কবিকল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়, তার প্রমাণ আজ পাওয়া যাচ্ছে। আজ দেখা যাচ্ছে যে, আগে যেমন রাজ্য নিয়ে রাজায়-রাজায় লড়াই করত, আজ তেমনি বাণিজ্য নিয়ে জাতিতে-জাতিতে লড়াই করছে এবং এ লড়াই অতি ভীষণ এবং অতি নিষ্ঠুর। কারণ আগে মানুষ হাতে যুদ্ধ করত, এখন কলে যুদ্ধ করে। এই কারণেই বর্তমান যুদ্ধ নিতান্ত অমানুষী ব্যাপার, কেননা বাহুবলের ভিতর মনুষ্যত্ব আছে কিন্তু যন্ত্রবলের ভিতর নেই। কিন্তু এ সত্ত্বেও এ কথা সত্য যে, বৈশ্যসভ্যতা যুদ্ধের অনুকূল নয়, কেননা যুদ্ধ বৈশ্যধর্মের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স যে আত্মরক্ষা ব্যতীত অপর কোনো কারণে যুদ্ধ করাটা অকর্তব্য মনে করে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনো বৈধ কারণ নেই। ইউরোপের নবযুগের নবসভ্যতার যথার্থ উত্তরাধিকারী হচ্ছে এই দুটি দেশ। ইংরেজ ও ফরাসি উভয়েই ক্ষত্রিয়যুগ উত্তীর্ণ হয়ে বৈশ্যযুগে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সুতরাং এঁদের দেহে রণসজ্জা থাকলেও মনে খাঁটি মিলিটারিজ্‌ম্‌ নেই। অপর পক্ষে জর্মানি হচ্ছে যুদ্ধপ্রাণ; মিলিটারিজ্‌ম্‌ জর্মানির যুগপৎ ধর্ম ও কর্ম। বর্তমান জর্মানির এরূপ মনোভাবের জন্য দায়ী জর্মানির পূর্বইতিহাস।

প্রায় আটশত বৎসর ধরে ইউরোপে জর্মানজাতির কোনোরূপ প্রভুত্ব ছিল না,

তার কারণ জর্মানরা এই দীর্ঘকালের ভিতর একটি জর্মানরাজ্য কিংবা একটি জর্মানজাতি গড়ে তুলতে পারে নি। যে কালে ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ স্বাতন্ত্র্য এবং স্বরাজ্য লাভ করেছিল, সে কালে জর্মানি শত শত পরস্পরবিরোধী খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। এ কতকটা জর্মানির কপালের দোষে, কতকটা তার বুদ্ধির দোষে। জর্মানি সমগ্র ইউরোপের সম্রাট্ হবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করত ব'লে স্বদেশেও একরাট্ হতে পারে নি।

কোনো কোনো বৌদ্ধদেশে দুটি করে রাজা থাকেন; একজন প্রকৃতিপুঞ্জের আত্মার প্রভু, আর-এক জন দেহের। মধ্যযুগের প্রথম ভাগে সমগ্র ইউরোপীয় মানবকে এইরূপ দুই ছত্রের অধীন করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। পোপ ইউরোপের ধর্মরাজের পদ এবং জর্মানরাজ দেবরাজের পদ অধিকার করে বসেছিলেন। ইউরোপ একটি মহাদেশ এবং ইউরোপীয়েরা নানা বিভিন্ন জাতীয়, সুতরাং ঐহিক কিংবা পারত্রিক কোনো বিষয়ে একজাতি হওয়া যে তাদের পক্ষে অসম্ভব, এ কথা পোপও স্বীকার করেন নি, জর্মান-সম্রাট্ও স্বীকার করেন নি।। জর্মানজাতি যে ইউরোপের অন্যান্য জাতি হতে মনে ও চরিত্রে পৃথক্, এ সত্য উপেক্ষা করবার ফলে জর্মানি ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ল। স্বদেশ এবং স্বজাতির উপর কোনোরূপ একাধিপত্য না থাকলেও জর্মান-সম্রাট্ তাঁর সম্রাট্-পদবী এবং সাম্রাজ্যের আশা ত্যাগ করতে পারলেন না, এবং স্বজাতিকে নিয়ে একটি স্বরাজ্য গঠন করবার চেষ্টামাত্রও করলেন না। এই কারণে জর্মানজাতির পূর্বে কোনোরূপ রাষ্ট্রশক্তি ছিল না। অথচ জর্মানজাতির ভিতর কি দেহের কি বুদ্ধির কি চরিত্রের কোনোরূপ বলের যে অভাব ছিল না—জর্মান কাব্যে দর্শনে শিল্পে সংগীতে ধর্মে ও কর্মে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে জর্মানির মহাপুরুষেরা লৌকিকরাজ্যের আশা ত্যাগ করে চিন্তারাজ্য অধিকার করাই নিজেদের কর্তব্য বলে মেনে নিলেন। সম্ভবত জর্মান-জাতির ইতিহাস অদ্যাবধি ঐ একই পথ অনুসরণ করে চলত, যদি নেপোলিয়ন জর্মানজাতিকে আকাশ থেকে টেনে মাটিতে ফেলে পদদলিত না করতেন। ১৮০৬ খৃস্টাব্দে জেনার যুদ্ধে পরাজিত এবং লাঞ্ছিত হবার পর জর্মান মাত্রেরই এ জ্ঞান জন্মাল যে, জর্মানির খণ্ডরাজ্য-সকলকে একত্র করে একটি যুক্তরাজ্যে পরিণত না করতে পারলে জর্মানজাতির পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

অসংখ্য দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক অধ্যাপক প্রভৃতি চিরজীবন প্রাণপণে চেষ্টা করেও এ ব্রত উদ্যাপন করতে পারেন নি; কিন্তু আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বিস্মার্ক দুটি যুদ্ধের সাহায্যে জর্মানজাতির প্রাণের আশা ফলে পরিণত করেছিলেন। বিস্মার্ক অস্ট্রিয়াকে পরাভূত করে উত্তর-জর্মানির এবং ফ্রান্সকে পরাভূত করে দক্ষিণ-জর্মানির যোগসাধন করেন। বিস্মার্ক বলতেন যে, রক্ত ও লোহের রসান দিয়ে তিনি ভাঙা জর্মানিকে জোড়া দিয়েছেন। সুতরাং যুদ্ধের দ্বারা যে রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে, যুদ্ধের দ্বারাই তার রক্ষা এবং যুদ্ধের দ্বারাই তার উন্নতি সাধন করতে হবে—এই হচ্ছে নবজর্মানির দৃঢ়ধারণা।

যুদ্ধকার্য অপ্রিয় হলেও আত্মরক্ষার্থ যে তা করা কর্তব্য এ বিষয়ে ইংরেজ ফরাসি প্রভৃতি ইউরোপের অগ্রগণ্য জাতির মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। জর্মানদের

সঙ্গে আর-সকলের প্রভেদ এইখানে যে, জর্মানির কর্তৃপক্ষদের মতে জাতীয় উন্নতির পথ পরিষ্কার করবারও একমাত্র উপায় হচ্ছে তরবারি।

জর্মানির যোদ্ধাদলের মুখপাত্র জেনারেল বেয়ারনহার্ডি অতি স্পষ্টাক্ষরে দুনিয়ার লোককে জর্মান রাষ্ট্রনীতির মূলকথা জানিয়ে দিয়েছেন। সে কথা এই—

জর্মানজাতি গত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের মধ্যে শিল্পবাণিজ্যে যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তার থেকেই প্রমাণ হয় যে, কি বাহুবলে, কি বুদ্ধিবলে সে জাতির সমকক্ষ দ্বিতীয় জাতি পৃথিবীতে নেই। জর্মানির শ্রীবৃদ্ধি তার বাণিজ্যবিস্তারের উপর নির্ভর করে। যদিচ ভবের হাটে কেনাবেচার জন্য জর্মানজাতিই হচ্ছে জ্যেষ্ঠ অধিকারী তবুও এ ক্ষেত্রে সকলের শেষে উপস্থিত হওয়ার দরুন সে আজ সর্বকনিষ্ঠ, কেননা পৃথিবীর সকল হাটবাজার আজ অপরের সম্পত্তি। পরের হাটে কেনাবেচা করার অর্থ পরভাগ্যোপজীবী হওয়া; সুতরাং এ পৃথিবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য জর্মানি অপরের সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নিতে বাধ্য। যুদ্ধ ব্যতীত অপর কোনো উপায়ে জর্মানির পক্ষে তার জাতীয় স্বার্থসাধন করা অসম্ভব। অতএব মিলিটারিজম্‌ হচ্ছে নবজর্মানির একমাত্র ধর্ম।

জেনারেল বেয়ারনহার্ডি যে স্পষ্টবাদী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দস্যুতাকে ধর্ম বলে প্রচার করতে লোকে সহজেই কুণ্ঠিত হয়। ওরূপ মনোভাব প্রকাশ করতে হলে অপর দেশের লোকে অনেক বড়ো বড়ো নীতির কথায় তাকে চাপা দেয়।

কিন্তু জর্মান-রাজমন্ত্রী কিংবা জর্মান-রাজসেনাপতির পক্ষে এ বিষয়ে কোনো-রূপ কপটতা করবার প্রয়োজন নেই। জর্মানির রাজগুরুপুরোহিতেরা যে নবশাস্ত্র রচনা করেছেন, জর্মানির রাজ-পুরুষদের রাজনীতি সেই শাস্ত্রসংগত।

জর্মান বৈজ্ঞানিকদের মতে ডারউইনের আবিষ্কৃত ইভলিউশনের নির্গলিতার্থ হচ্ছে—জোর যার মুলুক তার। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করলে মানুষে শুধু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীবনটা যখন একটা মারামারি-কাটাকাটি ব্যাপার, তখন যে মারতে প্রস্তুত নয় তাকে মরতে প্রস্তুত হতে হবে—এই হচ্ছে বিধির নিয়ম। ইভলিউশনের এই ব্যাখ্যা, নীট্‌শে-নামক একটি প্রতিভাশালী লেখক সমগ্র জর্মানজাতিকে গ্রাহ্য করিয়েছেন। নীট্‌শের মতে দয়া মমতা পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি মনোভাব মানসিক রোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়, কেননা এ-সকল মনোভাবের প্রশ্রয় দেওয়াতে মানুষের প্রকৃতি দুর্বল হয়ে পড়ে; এবং দুর্বলতাই হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র পাপ এবং সবলতাই একমাত্র পুণ্য; শক্তিই হচ্ছে একাধারে সত্য শিব ও সুন্দর। ইউরোপীয় মানব যে এই সহজ সত্য ভুলে গেছল তার কারণ ইউরোপ খৃস্টধর্ম-নামক রোগে জর্জরিত। খৃস্টধর্ম যে এশিয়ায় জন্মলাভ করেছে তার কারণ, এশিয়াবাসীরা দাসের জাতি, সুতরাং তাদের সকল ধর্মকর্ম দাসমনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই এশিয়ার ক্যান্‌সার ইউরোপের দেহ হতে সমূলে উৎপাটিত করতে হলে অস্ত্রচিকিৎসা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ইউরোপের নবযুগের সাম্য মৈত্রী প্রভৃতি মনোভাব ঐ প্রাচীন রোগের নূতন উপসর্গ মাত্র। সুতরাং ফরাসি ইংরেজ প্রভৃতি যে-সকল জাতির দেহে এই-সকল রোগের লক্ষণ দেখা যায়, তাদের উচ্ছেদ করা জর্মান ক্ষাত্রিয়দের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। নীট্‌শের এই মত জর্মান-

জাতির মনে যে বসে গেছে, তার কারণ নীট্‌শে কালি-কলমে লেখেন নি, তার প্রতি অক্ষর বাটালি দিয়ে খোদা।

জর্মান-পণ্ডিতদের মত, কেবলমাত্র জাতীয় স্বার্থের জন্য নয়, লোকহিতের জন্যও, জর্মানির পক্ষে দিগ্বিজয় করা আবশ্যক। জেনারেল বেয়ারনহার্ডি বলেন—

জর্মান লেবার এবং জর্মান আইডিয়লিজ্‌মের প্রচার ব্যতীত মানবজাতির উদ্ধার হবে না। সুতরাং যেমন তরবারির সাহায্যে পৃথিবীসুদ্ধ লোককে জর্মান মাল গ্রাহ্য করাতে হবে, তেমনি ঐ একই উপায়ে জর্মান-তত্ত্বকথাও গ্রাহ্য করাতে হবে। এই হচ্ছে জর্মানির বিধিনির্দিষ্ট কর্ম।

এ স্থলে জর্মান-আইডিয়ালিজ্‌মের অর্থ কাণ্ট প্রভৃতির দর্শন নয়; কেননা, বেয়ারনহার্ডি কাণ্ট প্রমুখ দার্শনিকদের অতি অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। বেয়ারনহার্ডির মতে এই-সকল বাহ্যজ্ঞানশূন্য বিষয়বুদ্ধিহীন দার্শনিকদের অমার্জনীয় অপরাধ এই যে, তাঁরা বিশ্বমানবের কাছে শান্তির বারতা ঘোষণা করেছিলেন। জর্মানি আজ তাই তার নব-আইডিয়ালিজ্‌ম্‌ প্রচার করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। আধ্যাত্মিক জগতের নব্যপন্থীদের সার কথা এই যে, বৈশ্যসভ্যতায় মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে। বৈশ্যযুগে মানুষ আরামপ্রিয় ও ভোগবিলাসী হয়ে পড়ে। মানুষ বিষয়প্রাণ হলে তার মনের শক্তি ও আত্মার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা যে আত্মার অপেক্ষা দেহকে প্রাধান্য দেয় তার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, মানবজীবনকে যতদূর সম্ভব নিরাপদ করে তোলাই এ সভ্যতার লক্ষ্য। ভয় না থাকলে ভক্তি থাকে না, অথচ বর্তমান সভ্যতা জনসাধারণকে রাজভয় দস্যুভয় ও মৃত্যুভয় এই ত্রিবিধ ভয় থেকে মুক্ত করেছে। অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা অবশ্য জীবনধারণের জন্য আবশ্যক, কিন্তু অর্থকেই জীবনের সার পদার্থ করে তুললে মানুষ অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। সুতরাং মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষা করবার জন্য সামাজিক জীবন আবার বিপদসংকুল করে তোলা দরকার। এ যুগে এক যুদ্ধ ব্যতীত অপর কোনো উপায়ে সে উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। অতএব ইউরোপীয় সমাজকে পুনর্বার ক্ষত্রিয় শাসনাধীন করা আবশ্যক; কেননা বৈশ্যবুদ্ধি যুদ্ধের প্রতিকূল। এবং ইউরোপের রাজনীতি ক্ষাত্রধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষমতা একমাত্র জর্মানির আছে; কেননা জর্মানির বৈশ্যশূদ্রের আজও কোনোরূপ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নেই। সুতরাং অর্থরাজ্যের উচ্ছেদ করে পৃথিবীতে ধর্মরাজ্যের সংস্থাপন করবার ভার জর্মানির হাতে পড়েছে। এই কারণে যুদ্ধ করা জর্মানির পক্ষে সর্বপ্রথম কর্তব্য। জর্মানির নব-মিলিটারিজ্‌মের প্ররোচনাই এই যুদ্ধের সাক্ষাৎকারণ।

এই বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক মিলিটারিজ্‌ম্‌ ইউরোপের বর্তমান সভ্যতার অনুবাদ নয়, প্রতিবাদ মাত্র। জর্মানির পরশ্রীকাতরতাই এর যথার্থ মূল, এবং এ মূল জর্মানির প্রাচীন ইতিহাস থেকে রস সঞ্চয় করেছে। জর্মানির বর্তমান উচ্চ আশার ভাষা নতুন হলেও তার ভাব পুরাতন। মধ্যযুগে জর্মানি একবার ইউরোপের সার্বভৌম চক্রবর্তীত্ব-পদ লাভ করবার চেষ্টা করে অকৃতকার্য হয়েছিল; আশা করি এবারেও হবে। জর্মানজাতির যথেষ্ট বাহুবল বুদ্ধিবল ও চরিত্রবল আছে, কিন্তু বিস্‌মার্কের হাতে-গড়া জর্মান-সাম্রাজ্যের অন্তরে নৈতিক বল নেই; সুতরাং

জর্মানির দিগ্বিজয়ের আশা দুরাশা মাত্র। এ যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক, ইউরোপের বর্তমান সভ্যতাকে এর জন্য দায়ী করা যেতে পারে না; কারণ মিলিটারিজ্‌ম্‌ সে সভ্যতার গৃহশত্রু।

ইউরোপের সকল জাতির দেহেই এই মিলিটারিজ্‌ম্‌ অল্পবিস্তর স্থান লাভ করেছে; একমাত্র জর্মানি তা পূর্ণমাত্রায় অঙ্গীকার করেছে। যা অপর সকল জাতির অন্তরে বাষ্পাকারে বিরাজ করছে জর্মানিতে তা জমে বরফ হয়ে গেছে। সুতরাং এই সমরানলে বরফের এই কাঠিন্যের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে। যদি এই অগ্নিতে মিলিটারিজ্‌ম্‌ ভস্মসাৎ হয় তা হলে যে কেবল অপরজাতি-সকলের মঙ্গল হবে শুধু তাই নয়, জর্মানিও পরিবর্ধিত না হোক, সংশোধিত হবে। যে জাতি মানবাত্মার সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, যে দেশে কাণ্ট হেগেল গ্যোটে শিলার বীঠোভেন মোজার্ট জন্মলাভ করেছে, সে জাতির কাছে ইউরোপীয় সভ্যতা চিরঋণী। এই মিলিটারিজ্‌মের মোহমুক্ত হলে সে জাতি আবার মানবসভ্যতার প্রবল সহায় হবে।

মিলিটারিজ্‌ম্‌ হেয় বলে বর্তমান বৈশ্যসভ্যতাই যে শ্রেয় এ কথা আমি বলতে পারি নে। কোনো সভ্যতাই নিরাবিল ও নিষ্কলুষ নয়, বৈশ্যসভ্যতাও নয়। তবে কোনো বর্তমান সভ্যতার দোষগুণ বিচার করতে হলে তার অতীতের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি রাখা চাই, তার ভবিষ্যতের প্রতিও তদ্রূপ দৃষ্টি রাখা চাই। বর্তমান যে, অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলমাত্র এ কথা ভোলা উচিত নয়। বর্তমানের যে-সকল দোষ স্পষ্ট লক্ষিত হচ্ছে ভবিষ্যতে তার নিরাকরণ হবার আশা আছে কি না, এ সভ্যতা স্বীয় শক্তিতে স্বীয় রোগমুক্ত হতে পারবে কি না, এই হচ্ছে আসল জিজ্ঞাস্য। আমার বিশ্বাস, বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার সে শক্তি আছে। সে যাই হোক, বৈশ্যসভ্যতার রোগ সারাবার বৈধ উপায় হচ্ছে মন্ত্রৌষধির প্রয়োগ— জর্মানির অস্ত্রচিকিৎসা নয়।

অগ্রহায়ণ ১৩২১

নূতন ও পুরাতন

আমাদের সমাজে নূতন-পুরাতনের বিরোধটা সম্প্রতি যে বিশেষ টন্‌টনে হয়ে উঠেছে, এরূপ ধারণা আমার নয়। আমার বিশ্বাস, জীবনে আমরা সকলেই এক-পথের পথিক, এবং সে পথ হচ্ছে নতুন পথ। আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ এই যে, কেউ-বা পুরাতনের কাছ থেকে বেশি সরে এসেছি, কেউ-বা কম। আমাদের মধ্যে আসল বিরোধ হচ্ছে মত নিয়ে। মনোজগতে আমরা নানা পন্থী। আমাদের মুখের কথায় ও কাজে যে সব সময়ে মিল থাকে, তাও নয়।

এমন-কি, অনেক সময়ে দেখা যায় যে যাদের সামাজিক ব্যবহারে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, তাদের মধ্যেও সামাজিক মতামতে সম্পূর্ণ অনৈক্য থাকে, অন্তত মুখে। সুতরাং নূতন-পুরাতনে যদি কোথায়ও বিবাদ থাকে তো সে সাহিত্যে, সমাজে নয়।

এ বাদানুবাদ ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে, তাই শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এই পরস্পর-বিরোধী মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য করে দিতে উদ্যত হয়েছেন।[১] তিনি নূতন ও পুরাতনের মধ্যে একটি মধ্যপথ আবিষ্কার করেছেন, যেটি অবলম্বন করলে নূতন ও পুরাতন হাত-ধরাধরি করে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারবে—যে পথে দাঁড়ালে নূতন ও পুরাতন পরস্পরের পাণিগ্রহণ করতে বাধ্য হবে এবং উভয়ে মনের মিলে সুখে থাকবে; সে পথের পরিচয় নেওয়াটা অবশ্য নিতান্ত আবশ্যক। যারা এ পথও জানে, ও পথও জানে কিন্তু দুঃখের বিষয় মরে আছে, তারা হয়তো একটা নিষ্কণ্টক মধ্যপথ পেলে বেঁচে উঠবে।

ঘটকালি করতে হলে ইনিয়ে-বিনিয়ে-বানিয়ে নানা কথা বলাই হচ্ছে মামুলি দস্তুর। সুতরাং নূতনের সঙ্গে পুরাতনের সম্বন্ধ করতে গিয়ে বিপিনবাবুও নানা কথার অবতারণা করতে বাধ্য হয়েছেন। তার অনেক ছোটোখাটো কথা সত্য, আর কতক বড়ো বড়ো কথা নতুন। তবে তাঁর কথার ভিতর যা সত্য তা নতুন নয়, আর যা নতুন তা সত্য কি না তা পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক।

বিপিনবাবু প্রথমে আমাদের সমাজে নূতন ও পুরাতনের বিরোধের কারণ নির্ণয় করে পরে তার সমন্বয়ের উপায়-নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে আমরা—

ইংরাজি শিখিয়া, য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনার বাহিরটা দেখিয়া...ঘর ছাড়িয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়াছিলাম।

এই ছোটাটাই হচ্ছে নূতন এবং পুরাতনের সঙ্গে বিচ্ছেদের এইখানেই সূত্র-পাত। আবার আমরা ঘরে ফিরে এসেছি। অতএব এখন মিলনের কাল উপস্থিত হয়েছে। গত-শতাব্দীতে দেশসুদ্ধ লোকের মন যে এক-লম্ফে সমুদ্র লঙ্ঘন করে

---

১ "নূতনে পুরাতনে", 'নারায়ণ', অগ্রহায়ণ ১৩২১।

বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল এবং এ শতাব্দীতে সে মন যে আবার উলটো লাফে দেশে ফিরে এসেছে, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমাদের মনের দিক থেকে দেখতে গেলে ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীতে যে বিশেষ কোনো প্রভেদ আছে তা নয়, যদি থাকে তো সে উনিশ-বিশ। আজকালকার দিনে ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব ঢের বেশি লোকের মনে ঢের বেশি পরিমাণে স্থান লাভ করেছে। বরং এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বহু ইউরোপীয় মনোভাব দেশের মনে এত বসে গেছে যে, সে ভাব দেশী কি বিদেশী তাও আমরা ঠাওর করতে পারি নে। উদাহরণস্বরূপে দেখানো যেতে পারে যে, একটি বিশেষজাতীয় মনোভাব, যার ক থেকে ক্ষ পর্যন্ত প্রতি অক্ষর বিদেশী, তাকে আমরা বলি স্বদেশী।

ইউরোপীয় সভ্যতার বাইরের দিকটা দেখে অবশ্য জনকতক সেদিকে ছুটেছিলেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অতি সামান্য এবং তাঁদের ঘরে ফিরে না আসাতে দেশের কোনো ক্ষতি নেই, বরং তাঁদের ফেরাতে বিপদ আছে। বিপিনবাবু বলেন—

একদিন আমরা বেড়া ভাঙিয়া ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছিলাম, আজ বাড়ি খাইয়া, ফিরিয়া আসিয়াছি। সত্য কথাটা তাহা নয়।

কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমাদের মধ্যে যারা ইউরোপের সভ্যতার বাহ্য-চাকচিক্যে অন্ধ হয়ে বেড়া ভেঙে ছুটেছিল তারাই আবার বাড়ি খেয়ে বাড়ি ফিরেছে। পাঁচনই তাদের পক্ষে জ্ঞানাঞ্জনশলাকার কাজ করেছে। কেননা, ও-জাতির অন্ধতা সারাবার শাস্ত্রসংগত বিধান এই—'নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণং ছিত্ত্বা' দেগে দেওয়া।

বিপিনবাবু বলেন—

কেহ কেহ মনে করেন, একদিন যেমন আমরা স্বদেশের যাহা-কিছু তাহাকেই হীনচক্ষে দেখিতাম, আজ বুঝি সেইরূপ বিচারবিবেচনা-বিরহিত হইয়াই, স্বদেশের যাহা-কিছু তাহাকেই ভাল বলিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি।

বিপিনবাবুর মতে এরূপ মনে করা ভুল। কিন্তু এরূপ শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজে যে মোটেই বিরল নয়, সে কথা নারায়ণ পত্রে[১] ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল স্পষ্টাক্ষরে লিখে দিয়েছেন। তাঁর মতে—

য়ুরোপের জনসাধারণে যেমন আপনাদের অসাধারণ অভ্যুদয় দেখিয়া, য়ুরোপের বাহিরে যে প্রকৃত মানুষ বা শ্রেষ্ঠতর সভ্যতা আছে বা ছিল বলিয়া ভাবিতে পারে না; আমাদের এই অভ্যুদয় নাই বলিয়াই যেন আরও বেশী করিয়া কিয়ৎপরিমাণে এই প্রত্যক্ষ হীনতার অপমান ও বেদনার উপশম করিবার জন্যই, সেইরূপ আমরাও নিজেদের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার অত্যধিক গৌরব করিয়া, জগতের অপরাপর সভ্যতা ও সাধনাকে হীনতর বলিয়া ভাবিয়া থাকি।

ডাক্তার শীল বলেন—

[এরূপ বিচার] স্বজাতিপক্ষপাতিত্ব-দোষে দুষ্ট, [অতএব] সত্যভ্রষ্ট।

আমাদের পক্ষে এরূপ মনোভাবের প্রশ্রয় দেওয়াতে যে সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করা হয়, সে বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নেই। কেননা, ইউরোপের জনসাধারণের জাতীয় অহংকার জাতীয় অভ্যুদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত; আমাদের জাতীয় অহংকার

[১] "হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব", অগ্রহায়ণ ১৩২১।

জাতীয় হীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত; ইউরোপের অহংকার তার কৃতিত্বের সহায়, আমাদের অহংকার আমাদের অকর্মণ্যতার পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং এ শ্রেণীর লোকের দ্বারা নূতন ও পুরাতনের বিরোধের যে সমন্বয় হবে, এরূপ আশা করা বৃথা। যাঁরা মদ ছেড়ে আফিং ধরেন তাঁরা যদি কোনো-কিছুর সমন্বয় করতে পারেন তো সে হচ্ছে এই দুই নেশার। মদ আর আফিং এই দুটি জুড়িতে চালাতে পারে সমাজে এমন লোকের অভাব নেই।

আসল কথা, নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হাজারে নশো নিরানব্বই জন কস্মিন্‌কালে প্রাচীন সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন নি। অদ্যাবধি তাঁরা কেবলমাত্র অশনে বসনে ব্যসনে ও ফ্যাশনে সামাজিক নিয়ম অতিক্রম করে আসছেন; কেননা, এ-সকল নিয়ম লঙ্ঘন করবার দরুন তাঁদের কোনোরূপ সামাজিক শাস্তিভোগ করতে হয় না। পুরাতন সমাজধর্মের অবিরোধে নূতনকামের সেবা করাতে সমাজ কোনোরূপ বাধা দেয় না, কাজেই শিক্ষিত লোকেরা ঘরে ঘরে নিজের চরকায় বিলেতি তেল দেওয়াটাই তাঁদের জীবনের ব্রত করে তুলেছেন। এ শ্রেণীর লোকেরা দায়ে পড়ে সমাজের যে-সকল পুরোনো নিয়ম মেনে চলেন, অপরের গায়ে পড়ে তারই নতুন ব্যাখ্যা দেন। এঁরা নূতন-পুরাতনের বিরোধভঞ্জন করেন নি; যদি কোনো-কিছুর সমন্বয় করে থাকেন তো সে হচ্ছে সামাজিক সুবিধার সঙ্গে ব্যক্তিগত আরামের সমন্বয়।

পুরাতনের সঙ্গে নূতনের বিরোধের সৃষ্টি সেই দু-দশ জনে করেছেন, যাঁরা সমাজের মরচে-ধরা চরকায় কোনোরূপ তৈল প্রদান করবার চেষ্টা করেছেন—সে তেল দেশীই হোক, আর বিদেশীই হোক। এর প্রমাণ রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ স্বামী, কেশবচন্দ্র সেন ইত্যাদি। এর প্রথম তিনজন সমাজের দেহে যে স্নেহ প্রয়োগ করেছিলেন, সেটি খাঁটি দেশী এবং সংস্কৃত। অথচ এঁরা সকলেই সমাজদ্রোহী বলে গণ্য।

সমাজসংস্কার, অর্থাৎ পুরাতনকে নূতন করে তোলবার চেষ্টাতেই এ দেশে নূতন-পুরাতনে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে।

বিপিনবাবুর মুখের কথায় যদি এই বিরোধের সমন্বয় হয়ে যায়, তা হলে আমরা সকলেই আশীর্বাদ করব, যে তাঁর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

দুটি পরস্পরবিরোধী পক্ষের মধ্যস্থতা করতে হলে নিরপেক্ষ হওয়া দরকার, অথচ একপক্ষ-না-একপক্ষের প্রতি টান থাকা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। বিপিন-বাবুও এই সহজ মানবধর্ম অতিক্রম করতে পারেন নি। তাঁর নানান উলটাপালটা কথার ভিতর থেকে তাঁর নূতনের বিরুদ্ধে নূতন ঝাঁজ ও পুরাতনের প্রতি নূতন ঝোঁক ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁর একটি কথার উল্লেখ করছি।

সকলেই জানেন যে, পুরাতন সংস্কারের নাম শুনতে পারে না; কারণ সুস্তকে

জাগ্রত করবার জন্য নূতনকে পুরাতনের গায়ে হাত দিতে হয়—তাও আবার মোলায়েমভাবে নয়, কড়াভাবে। বিপিনবাবু তাই সংস্কারকের উপর গায়ের ঝাল ঝেড়ে নিজেকে ধরা দিয়েছেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে, পালমহাশয়, যারা সমাজকে বদল করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে, আর যারা সমাজ অটল করতে চায় তাদের পক্ষে।

বিপিনবাবু বলেন—

দুনিয়াটা সংস্কারকের সৃষ্টিও নয়, আর সংস্কারকের হাত পাকাইবার জন্য সৃষ্টও হয় নাই।

দুনিয়াটা যে কি কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে তা আমরা জানি নে, তার কারণ সৃষ্টিকর্তা আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ও-কাজ করেন নি। তবে তিনি যে পাল-মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে সৃষ্টি করেছেন, এমনও তো মনে হয় না। কারণ, দুনিয়া আর যে জন্যই সৃষ্ট হোক, বক্তৃতাকারের গলা-সাধবার জন্য হয় নি। সৃষ্টির পূর্বের খবর আমরাও জানি নে, বিপিনবাবুও জানেন না; কিন্তু জগতের সঙ্গে মানুষের কি সম্পর্ক তা আমরা সকলেই অল্পবিস্তর জানি। ম্লেচ্ছ ভাষায় যাকে দুনিয়া বলে, হিন্দুদর্শনের ভাষায় তার নাম 'ইদং'। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল নারায়ণ পত্রে সেই ইদংএর নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়েছেন—

ইদংকে যে জানে, যে ইদংএর জ্ঞাতা ও ভোক্তা, আপনার কর্ম্মের দ্বারা যে ইদংকে পরিচালিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে বলিয়া, যাহাকে এই ইদংএর সম্পর্কে কর্ত্তাও বলা যায়—সেই মানুষ অহং পদবাচ্য।

অর্থাৎ মানুষ দুনিয়ার জ্ঞাতা ও কর্তা। শুধু তাই নয়, মানুষ ইদংএর কর্তা বলেই তার জ্ঞাতা। মনোবিজ্ঞানের মূল সত্য এই যে, বহির্জগতের সঙ্গে মানুষের যদি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কারবার না থাকত তা হলে তার কোনোরূপ জ্ঞান আমাদের মনে জন্মাত না। মানুষের সঙ্গে দুনিয়ার মূলসম্পর্ক ক্রিয়াকর্ম নিয়ে। আমাদের ক্রিয়ার বিষয় না হলে দুনিয়া আমাদের জ্ঞানের বিষয়ও হত না, অর্থাৎ তার কোনো অস্তিত্ব থাকত না। এবং সে ক্রিয়াফল হচ্ছে ইদংএর 'পরিচালন ও পরিবর্তন', আজকালকার ভাষায় যাকে বলে সংস্কার। সৃষ্টির গূঢ়তত্ত্ব না জানলেও মানুষে এ কথা জানে যে, তার জীবনের নিত্য কাজ হচ্ছে সৃষ্টপদার্থের সংস্কার করা। মানুষ যখন লাঙলের সাহায্যে ঘাস তুলে ফেলে ধান বোনে তখন সে পৃথিবীর সংস্কার করে। মানুষের জীবনে এক কৃষি ব্যতীত অপর কোনো কাজ নেই। এই দুনিয়ার জমিতে সোনা ফলাবার চেষ্টাতেই মানুষ তার মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়। ঋষির কাজও কৃষিকাজ, শুধু সে কৃষির ক্ষেত্র ইদং নয় অহং। সুতরাং সংস্কারক-দের উপর বক্র দৃষ্টিপাত করে বিপিনবাবু দৃষ্টির পরিচয় দেন নি, পরিচয় দিয়েছেন শুধু বক্রতার।

শাস্ত্রে বলে যে, ক্রিয়াফল চারপ্রকার—উৎপত্তি প্রাপ্তি বিকার ও সংস্কার। কি ধর্ম কি সমাজ কি রাজ্য, যার সংস্কারে হাত দেন তারই বিকার ঘটান, এমন লোকের অভাব যে বাংলায় নেই, সম্প্রতি তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। একই উপাদান নিয়ে কেউ গড়েন শিব, কেউ-বা বাঁদর। এ অবশ্য মহা আক্ষেপের বিষয়; কিন্তু

তার থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, দেশসুদ্ধ লোকের মাটির সুমুখে হাতজোড় করে বসে থাকতে হবে।

৪

বিপিনবাবুর মতে নূতনে-পুরাতনে মিলনের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে নূতন; কারণ নূতনই হচ্ছে মূল বিবাদী। সুতরাং নূতনকে বাগ মানাতে হলে তাকে কিঞ্চিৎ আক্কেল দেওয়া দরকার।

নূতন তার গোঁ ছাড়তে চায় না, কেননা সে চায় উন্নতি। কিন্তু সে ভুলে যায় যে, জাগতিক নিয়মানুসারে উন্নতির পথ সিধে নয়, প্যাঁচালো। উন্নতি যে পদে-পদে অবনতিসাপেক্ষ তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে। বিপিনবাবু এই বৈজ্ঞানিক সত্যটির বক্ষ্যমাণ রূপ ব্যাখ্যা করেছেন—

তালগাছের মতন মানুষের মন বা মানবসমাজ একটা সরলরেখার ন্যায় উর্ধ্বদিকে উন্নতির পথে চলে না। ...কিন্তু ঐ তালগাছে কোন সতেজ ব্রততী যেমন তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া উপরের দিকে উঠে, সেইরূপই মানুষের মন ও মানবের সমাজ ক্রমোন্নতির পথে চলিয়া থাকে। একটা লম্বা সরল খুঁটীর গায়ে নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত একগাছা দড়ি জড়াইতে হইলে যেমন তাহাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিতে হয়, মানুষের মনের ও মানব-সমাজের ক্রমবিকাশের পন্থাও কতকটা তারই মতন। এই গতির ঝোঁকটা সর্ব্বদাই উন্নতির দিকে থাকিলেও, প্রতি স্তরেই, উপরে উঠিবার জন্যই, একটু করিয়া নীচেও নামিয়া আসিতে হয়। ইংরাজিতে এরূপ তির্য্যকগতির একটা বিশিষ্ট নাম আছে, ইহাকে স্পাইর‍্যাল মোষণ (spiral motion) বলে। সমাজবিকাশের ক্রমও এইরূপ স্পাইর‍্যাল, একান্ত সরল নহে। ...আপনার গতি-বেগের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়া এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যাইতে হইলেই ঐ উর্ধ্বমুখী তির্য্যকগতির পথ অনুসরণ করিতে হয়।

বিপিনবাবুর আবিষ্কৃত এই উন্নতিতত্ত্ব যে নূতন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু সত্য কি না তাই হচ্ছে বিচার্য।

বিপিনবাবু বলেন যে, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান সত্যজ্ঞান নয়, ভ্রম। এ কথা সর্ববাদী-সম্মত। কিন্তু রজ্জুতে লতাজ্ঞান যে সত্যজ্ঞান, এরূপ বিশ্বাস করবার কারণ কি। রজ্জু জড়পদার্থ, এবং সতেজ ব্রততী সজীব পদার্থ। দড়ি বেচারার আপনার 'গতিবেগ' বলে কোনোরূপ গুণ কি দোষ নেই। ও-বস্তুকে ইচ্ছে করলে নীচে থেকে জড়িয়ে উপরে তুলতে পার, উপর থেকে জড়িয়ে নীচে নামাতে পার, লম্বা করে ফেলতে পার, তাল-পাকিয়ে রাখতে পার। রজ্জু উন্নতি অবনতি তির্যকগতি কি সরলগতি—কোনোরূপ গতির ধার ধারে না। বিপিনবাবু এ ক্ষেত্রে রজ্জুর যে ব্যবহার করেছেন তা জ্ঞানের গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

তার পর বিপিনবাবু এ সত্যই-বা কোন্ বিজ্ঞান থেকে উদ্ধার করলেন যে, মানুষের মন ও মানবসমাজ উদ্ভিদ্‌জাতীয়? সাইকলজি এবং সোশিয়লজি যে বটানির অন্তর্ভূত, এ কথা তো কোনো কেতাবে-কোরানে লেখে না। তর্কের খাতিরে এই অদ্ভুত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব মেনে নিলেও সকল সন্দেহের নিরাকরণ হয় না। মনে স্বতই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, মানুষের মন ও মানবসমাজ উদ্ভিদ্ হলেও ঐ দুই

পদার্থ যে লতাজাতীয়, এবং বৃক্ষজাতীয় নয়, তারই-বা প্রমাণ কোথায়। গাছের মতো সোজাভাবে সরলরেখায় মাথাঝাড়া দিয়ে ওঠা যে মানবধর্ম নয়, কোন্ যুক্তি কোন্ প্রমাণের বলে বিপিনবাবু এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তা আমাদের জানানো উচিত ছিল; কেননা পালমহাশয়ের আপ্তবাক্ আমরা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে গ্রাহ্য করতে বাধ্য নই। উক্তি যে যুক্তি নয়, এ জ্ঞান বিপিনবাবুর থাকা উচিত। উত্তরে হয়তো তিনি বলবেন যে, ঊর্ধ্বগতিমাত্রেই তির্যকগতি—এই হচ্ছে জাগতিক নিয়ম। ঊর্ধ্বগতিমাত্রকেই যে স্ক্রুর আকার ধারণ করতে হবে, জড়জগতের এমন-কোনো বিধিনির্দিষ্ট নিয়ম আছে কি না জানি নে। যদি থাকে তো মানুষের মতিগতি যে সেই একই নিয়মের অধীন এ কথা তিনিই বলতে পারেন, যিনি জীবে জড় ভ্রম করেন।

আপনার গতিবেগের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়া এক স্তর হইতে অন্য স্তর যাইতে হইলেই ঐ ঊর্ধ্বমুখী তির্যকগতির পথ অনুসরণ করিতে হয়।

বিপিনবাবুর এই মত যে সম্পূর্ণ ভুল তা তাঁর প্রদর্শিত উদাহরণ থেকেই প্রমাণ করা যায়। 'তালগাছ যে সরলরেখার ন্যায় ঊর্ধ্বদিকে উঠে'—তার থেকে এই প্রমাণ হয় যে, যে নিজের জোরে ওঠে সে সিধেভাবেই ওঠে; আর যে পরকে আশ্রয় করে ওঠে সেই পেঁচিয়ে ওঠে, যথা, তরুর আশ্রিত লতা।

দশ ছত্র রচনার ভিতর ডাইনামিক্স্ বটানি সোশিয়লজি সাইকলজি প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের নানা সূত্রের এহেন জড়াপট্কি বাধানো যে সম্ভব, এ জ্ঞান আমার ছিল না। সম্ভবত পালমহাশয় যে 'নূতন দৃষ্টি' নিয়ে ঘরে ফিরেছেন, সেই দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে যে, স্বর্গের সিঁড়ি গোল সিঁড়ি। যদি তাই হয়, তা হলে এ কথাও মানতে হবে যে, পাতালের সিঁড়িও গোল; কারণ ওঠা-নামার জাগতিক নিয়ম অবশ্যই এক। সুতরাং ঘুরপাক খাওয়ার অর্থ ওঠাও হতে পারে, নামাও হতে পারে। এ অবস্থায় উন্নতিশীলের দল যদি কুটিল পথে না চলে সরল পথে চলতে চান, তা হলে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না।

বিপিনবাবু যে তাঁর প্রবন্ধের বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে নানারূপ পরস্পর-বিরোধী বাক্য একত্র করতে কুণ্ঠিত হন নি তার কারণ তিনি ইউরোপীয় দর্শন হতে এমন-এক সত্য উদ্ধার করেছেন, যার সাহায্যে সকল বিরোধের সমন্বয় হয়। হেগেলের থিসিস্ অ্যান্টিথিসিস্ এবং সিন্থেসিস্ এই ত্রিপদের ভিতর যখন ত্রিলোক ধরা পড়ে, তখন তার অন্তর্ভূত সকল লোক যে ধরা পড়বে তার আর আশ্চর্য কি। হেগেলের মতে লজিকের নিয়ম এই যে, 'ভাব' (being) এবং 'অভাব' (non-being) এই দুটি পরস্পরবিরোধী—এবং এই দুয়ের সমন্বয়ে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে 'স্বভাব' (becoming)। মানুষের মনের সকল ক্রিয়া এই নিয়মের অধীন, সুতরাং সৃষ্টিপ্রকরণও এই একই নিয়মের অধীন, কেননা এ জগৎ চৈতন্যের লীলা। অর্থাৎ তাঁর লজিক এবং ভগবানের লজিক যে একই বস্তু, সে বিষয়ে হেগেলের মনে কোনোরূপ দ্বিধা ছিল

না। তার কারণ হেগেলের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ভগবানের শুধু অবতার নন—স্বয়ং ভগবান। হেগেলের এই ঘরের খবর তাঁর সপ্রতিভ শিষ্য কবি হেনরি হাইনের (Henri Heine) গুরুমারাবিদ্যের গুণে ফাঁস হয়ে গেছে। বিপিনবাবুরও বোধ হয় বিশ্বাস যে, হেগেলের কথা হচ্ছে দর্শনের শেষকথা। সে যাই হোক, হেগেলের এই পশ্চিম-মীমাংসার বলে বিপিনবাবু নূতন ও পুরাতনের সমন্বয় করতে চান। তিনি অবশ্য শুধু সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন, তার প্রয়োগ করতে হবে আমাদের।

৬

হেগেলের মত একে নতুন তার উপর বিদেশী; সুতরাং পাছে তা গ্রাহ্য করতে আমরা ইতস্তত করি এই আশংকায় তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, হেগেলও যা, বেদান্তও তাই, সাংখ্যও তাই।

সমন্বয় অর্থে বিপিনবাবু কি বোঝেন, তার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়েছেন। তাঁর মতে—

> সমন্বয় মাত্রেই যে-বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে যায়, তার বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই দাবী-দাওয়া কিছু কাটিয়া ছাটিয়া, একটা মধ্যপথ ধরিয়া তাহার ন্যায্য মীমাংসা করিয়া দেয়।

অর্থাৎ থিসিস্‌কে কিছু ছাড়তে এবং অ্যান্টিথিসিস্‌কে কিছু ছাড়তে হবে, তবে সিন্‌থেসিস্‌ ডিক্রি পাবে। তাঁর দর্শনের এ ব্যাখ্যা শুনে সম্ভবত হেগেলের চক্ষুস্থির হয়ে যেত; কেননা তাঁর সিন্‌থেসিস্‌ কোনোরূপ রফাছাড়ের ফল নয়। তাতে থিসিস্‌ এবং অ্যান্টিথিসিস্‌ দুটিই পুরামাত্রায় বিদ্যমান; কেবল দুয়ে মিলিত হয়ে একটি নূতন মূর্তি ধারণ করে। সিন্‌থেসিসের বিশ্লেষণ করেই থিসিস্‌ এবং অ্যান্টিথিসিস্‌ পাওয়া যায়। এর আধখানা এবং ওর আধখানা জোড়া দিয়ে অর্ধনারীশ্বর গড়া হেগেলের পদ্ধতি নয়।

তার পর মীমাংসা অর্থে যদি রফাছাড়ের নিষ্পত্তি হয় তা হলে বলতেই হবে যে, বিপিনবাবুর মীমাংসার সঙ্গে ব্যাস-জৈমিনির মীমাংসার কোনোই সম্পর্ক নেই। বেদান্তের মীমাংসা আর যাই হোক, আপস-মীমাংসা নয়। বেদান্তদর্শন নিজের দাবির এক-পয়সাও ছাড়ে নি, কোনো বিরোধী মতের দাবির এক-পয়সাও মানে নি। উত্তর-মীমাংসাতে অবশ্য সমন্বয়ের কথা আছে, কিন্তু সে সমন্বয়ের অর্থ যে কি, তা শংকর অতি পরিষ্কার ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন—

> এ সূত্র বেদান্তবাক্যরূপ কুসুম গাঁথিবার সূত্র, অনুমান বা যুক্তি গাঁথিবার নহে ইহাতে নানাস্থানস্থ বেদান্তবাক্য-সকল আহৃত হইয়া মীমাংসিত হইবে।

এবং শংকরের মতে মীমাংসার অর্থ 'অবিরোধী তর্কের সহিত বেদান্ত বাক্য-সমূহের বিচার'। এ বিচারের উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, বেদান্ত-বাক্যসমূহ পরস্পরবিরোধী নয়। হেগেলের পশ্চিম-মীমাংসার সহিত ব্যাসের উত্তর-মীমাংসার কোনো মিল নেই; না মতে, না পদ্ধতিতে। ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় পরব্রহ্ম, হেগেলের প্রতিপাদ্য বিষয় অপরব্রহ্ম। নিরুক্তের মতে ভাববিকার ছয়প্রকার, যথাঃ

সৃষ্টি স্থিতি হ্রাস বৃদ্ধি বিপর্যয় ও লয়। শংকর হ্রাস বৃদ্ধি ও বিপর্যয়কে গণনার মধ্যে আনেন নি, কেননা তাঁর মতে এ তিনটি হচ্ছে স্থিতিকালের ভাববিকার। অপর পক্ষে এই তিনটি ভাবই হচ্ছে হেগেলের অবলম্বন, কেননা তাঁর অ্যাব্‌সলিউট্ হচ্ছে ইটর্নল্ বিকামিং। সুতরাং হেগেলের ব্রহ্ম শুধু অপরব্রহ্ম নন, তিনি ঐতিহাসিক ব্রহ্ম—অর্থাৎ ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্রমবিকাশ হচ্ছে। হেগেলের মতে তাঁর সমসাময়িক ব্রহ্ম প্রুশিয়া-রাজ্যে বিগ্রহবান্ হয়েছিলেন। শংকর যে-জ্ঞানের উল্লেখ করেছেন, সে-জ্ঞান মানসিক ক্রিয়া নয়; অপর পক্ষে হেগেলের জ্ঞান ক্রিয়ারই যুগপৎ কর্তা ও কর্ম।

বেদান্তের মতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার উপায় যুক্তি নয়; অপর পক্ষে হেগেলের মতে যুক্তির উপরেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব নির্ভর করে। থিসিস্ এবং অ্যান্টিথিসিসের সুতোয় সুতোয় গেরো দিয়েই এক-একটি ব্রহ্মমুহূর্ত পাওয়া যায়। বেদান্তের ব্রহ্ম স্থির-বর্তমান, হেগেলের ব্রহ্ম চির-বর্ধমান—অর্থাৎ একটি স্ট্যাটিক্ অপরটি ডাইনামিক্। আসল কথা এই যে, বেদান্ত যদি থিসিস্ হয়, তা হলে হেগেল তার অ্যান্টিথিসিস্—এ দুই মতের অভেদ জ্ঞান শুধু অজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব।

বিপিনবাবুর হাতে পড়ে শুধু বাদরায়ণ নয়, কপিলও হেগেলে লীন হয়ে গেছেন।

বিপিনবাবু আবিষ্কার করেছেন যে, যার নাম থিসিস্ অ্যান্টিথিসিস্ এবং সিন্‌থেসিস্, তারই নাম তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব। কেননা তাঁর মতে থিসিসের বাংলা হচ্ছে স্থিতি, অ্যান্টিথিসিসের বাংলা বিরোধ, এবং সিন্‌থেসিসের বাংলা সমন্বয়। এ অনুবাদ অবশ্য গায়ের জোরে করা। কেননা, থিসিস্ যদি স্থিতি হয় তা হলে অ্যান্টিথিসিস্ অ-স্থিতি (গতি) এবং সিন্‌থেসিস্ সংস্থিতি। সে যাই হোক, সাংখ্যের ত্রিগুণের সঙ্গে অবশ্য হেগেলের ত্রিসূত্রের কোনো মিল নেই; কেননা সাংখ্যের মতে এই ত্রিগুণের সমন্বয়ে জগতের লয় হয়, সৃষ্টি হয় না। সত্ত্ব রজঃ তমের মিলন নয়, বিচ্ছেদই হচ্ছে সৃষ্টির কারণ; অপর পক্ষে হেগেলের মতে থিসিস্ এবং অ্যান্টিথিসিসের মিলনের ফলে জগৎ সৃষ্ট হয়। বিপিনবাবুর ন্যায় পূর্ব পশ্চিম সকল দর্শনের সমন্বয়কারের কাছে অবশ্য এ-সকল পার্থক্য তুচ্ছ এবং অকিঞ্চিৎকর; অতএব সর্বথা উপেক্ষণীয়।

তমঃ ও রজের মিলনে যে বস্তু জন্মলাভ করে, তা হেগেলের সিন্‌থেসিস্ হতে পারে, কিন্তু তা সাংখ্যের সত্ত্ব নয়। এ কথা দুটি-একটি উদাহরণের সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে। আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের মন ও মানব-সমাজের উন্নতির পদ্ধতি। বিপিনবাবুর উদ্‌ভাবিত কপিল-হেগেল-দর্শন-অনুসারে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায়—

তামসিক মন=সুপ্ত রাজসিক মন=জাগ্রত

সাত্ত্বিক মন=ঝিমন্ত

তামসিক সমাজ=মৃত রাজসিক সমাজ=জীবিত

সাত্ত্বিক সমাজ=জীবন্মৃত

অর্থাৎ সমন্বয়ের ফলে রজোগুণের উন্নতি নয়, অবনতি হয়। সত্ত্বগুণ যে তমোগুণ এবং রজোগুণের মাঝামাঝি একটি পদার্থ এ কথা সাংখ্যাচার্যেরা অবগত নন, কেননা তাঁরা হেগেল পড়েন নি। উক্ত দর্শনের মতে সত্ত্বগুণ রজোগুণের অতিরিক্ত, অন্তর্ভূত নয়। সাত্ত্বিক ভাব যে বিরোধের ভাব নয়, তার কারণ রজোগুণ যখন তমোগুণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয় তখনই তা সত্ত্বগুণে পরিণত হয়। হেগেলের মত অবশ্য সাংখ্যমতের সম্পূর্ণ বিপরীত। সাংখ্যকে উলটে ফেললে যা হয়, তারই নাম হেগেল-দর্শন। সাংখ্যমতে সূক্ষ্ম অনুলোমক্রমে স্থূল হয়, হেগেল-মতে ঐ একই পদ্ধতিতে স্থূল সূক্ষ্ম হয়। সাংখ্যের প্রকৃতি হেগেলের পুরুষ। সাংখ্যের মতে সৃষ্টিতে প্রকৃতি বিকারগ্রস্ত হন, হেগেলের মতে পুরুষ সাকার হন।

বিপিনবাবু দেশী-বিলাতি-দর্শনের সমন্বয় করে যে মীমাংসা করেছেন সে হচ্ছে অপূর্ব মীমাংসা; কেননা, কি স্বদেশে, কি বিদেশে, ইতিপূর্বে এরূপ অদ্ভুত মীমাংসা আর কেউ করেন নি।

নূতন-পুরাতনের সমন্বয়ের এই যদি নমুনা হয় তা হলে নূতন ও পুরাতন উভয়েই সমন্বয়কারকে বলবে—'ছেড়ে দে বাবা, লড়ে বাঁচি'।

বিপিনবাবু যাকে সমন্বয় বলেন, বাংলা ভাষায় তার নাম খিচুড়ি।

সমাজদেবতার নিকটে পালমহাশয় যে খিচুড়িভোগ নিবেদন করে দিয়েছেন, যিনি তার প্রসাদ পাবেন তাঁর যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

আসল কথা এই যে, দর্শনবিজ্ঞানের মোটা কথার আশ্রয় নেওয়ার অর্থ হচ্ছে কোনো বিশেষ সমস্যার মীমাংসা করা নয়, তার কাছ থেকে পলায়ন করা। দর্শন কি বিজ্ঞান যে আজ পর্যন্ত এমন-কোনো সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেন নি যার সাহায্যে কোনো বিশেষ বিষয়ের বিশেষ মীমাংসা করা যায়, তার কারণ সকল বিশেষ বস্তুর বিশেষত্ব বাদ দিয়েই সর্বসাধারণে গিয়ে পৌঁছনো যায়। বিশ্বকে নিঃস্ব করেই দার্শনিকেরা বিশ্বতত্ত্ব লাভ করেন। সোনা ফেলে আঁচলে গিঁট দেওয়াই দার্শনিকদের চিরকেলে অভ্যাস। এ উপায়ে সম্ভবত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান লাভ হয় না। সমাজের উন্নতি দেশকালপাত্র-সাপেক্ষ, সুতরাং দেশ-কালের অতীত কিংবা সর্বদেশে সর্বকালে সমান বলবৎ কোনো সত্যের দ্বারা সে উন্নতি সাধন করবার চেষ্টা বৃথা। ফিজিক্স কিংবা মেটাফিজিক্সএর তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব নয়, এবং এ দুই তত্ত্ব যে পৃথক্ জাতীয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিপিনবাবুর আবিষ্কৃত ঊর্ধ্বগতির দৃষ্টান্ত থেকেই দেখানো যেতে পারে। এমন-কোনো জাগতিক নিয়ম নেই যে, মানুষের চেষ্টা ব্যতিরেকেও তার উন্নতি হবে। হ্রাস বৃদ্ধি ও বিপর্যয়, এ তিনই জীবনের ধর্ম; সুতরাং সমাজের উন্নতি ও অবনতি মানুষের দ্বারাই সাধিত হয়। মানবের ইচ্ছাশক্তিই মানবের উন্নতির মূল কারণ। তা ছাড়া মানবের উন্নতি যে ক্রমোন্নতি হতে বাধ্য, এমন-কোনো নিয়মের পরিচয় ইতিহাস দেয় না। বরং ইতিহাস এই সত্যের পরিচয় দেয় যে, বিপর্যয়ের ফলেই মানব অনেক সময়ে মহা উন্নতি লাভ করেছে। যে-সব মহাপুরুষকে আমরা ঈশ্বরের অবতার বলে মনে করি, যথা বুদ্ধদেব যিশুখৃস্ট মহম্মদ চৈতন্য প্রভৃতি এঁরা মানুষের মনকে বিপর্যস্ত করেই মানবসমাজকে উন্নত করেছেন; এঁরা স্পাইরাল্ মোশন্এর ধার ধারতেন না,

কিংবা স্থিতি ও গতির মধ্যে দ্তীগিরি করে তাদের মিলন ঘটানো নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করেন নি।

মান্ষের মনকে যদি গেরোবাজের মতো আকাশে ডিগবাজি খেতে খেতে উঠতে হত, এবং মানবসমাজকে যদি লোটনের মতো মাটিতে ল্টতে ল্টতে এগোতে হত, তা হলে এ দ্য়ের বেশিক্ষণ সে কাজ করতে হত না, দ্ দণ্ডেই তাদের ঘাড় লটকে পড়ত। স্তরাং কি মন কি সমাজ, কোনোটিকেই পাকচক্রের ভিতর ফেলবার আবশ্যকতা নেই। বিপিনবাব্র বক্তব্য যদি এই হয় যে, প্থিবীতে অবাধগতি বলে কোনো জিনিস নেই, তা হলে আমরা বলি—এ সত্য শিশ্তেও জানে যে পদে পদে বাধা অতিক্রম করেই অগ্রসর হতে হয়। তাই বলে স্থিতি-গতির সমন্বয় করে চলার অর্থ যে শ্ধ্ হামাগ্ড়ি দেওয়া, এ কথা শিশ্তেও মানে না। অধোগতি অপেক্ষা উন্নতির পথে যে অধিকতর বাধা অতিক্রম করতে হয়, এ তো সর্বলোকবিদিত। কিন্তু এর থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, স্থিতির বির্দ্ধে গতি নামক 'বিরোধটি জাগিয়ে' রাখা ম্র্খতা এবং সেটিকে ঘ্ম পাড়িয়ে দেওয়াটাই জ্ঞানীর কর্তব্য। জড়ের সঙ্গে যোঝাযুঝি করেই জীবন স্ফ্র্তিলাভ করে। স্তরাং প্রাতন যে-পরিমাণে জড়, সেই পরিমাণে নবজীবনকে তার সঙ্গে লড়তে হবে। যে সমাজের যত অধিক জীবনীশক্তি আছে, সে সমাজে স্থিতিতে ও গতিতে জড়ে ও জীবে তত বেশি বিরোধের পরিচয় পাওয়া যাবে। ন্তন-প্রাতনের এই বিরোধের ফলে যা ভেঙে পড়ে তার চাইতে যা গড়ে ওঠে, সমাজের পক্ষে তার ম্ল্য ঢের বেশি। কোনো ন্তনের বরের ঘরের পিসি ও প্রাতনের কনের ঘরের মাসির মধ্যস্থতায় এ দুই পক্ষের ভিতর যে চিরশান্তি স্থাপিত হবে, এ আশা দ্রাশা মাত্র।

আমি প্র্বে বলেছি যে, ন্তন-প্রাতনে যদি কোথায়ও বিবাদ থাকে তো সে সাহিত্যে, সমাজে নয়। আমার বিশ্বাস যদি অন্যর্প হত, তা হলে আমি বিপিন-বাব্র কথার প্রতিবাদ করতুম না। তার কারণ, প্রথমত আমি সমাজসংস্কার-ব্যাপারে অব্যবসায়ী। অতএব এ ব্যাপারে কোন্ ক্ষেত্রে আক্রমণ করতে হয় এবং কোন্ ক্ষেত্রে প্ষ্ঠভঙ্গ দিতে হয় এবং কোন্টি বিগ্রহের এবং কোন্টি সন্ধির য্গ তা আমার জানা নেই। দ্বিতীয়ত, বিপিনবাব্র উদ্ভাবিত পদ্ধতি অন্সারে ন্তন-প্রাতনের জমাখরচ করলে সামাজিক হিসাবে পাওয়া যায় শ্ধ্ শ্ন্য। স্তরাং কি ন্তন, কি প্রাতন, কোনো পক্ষই ও-উপায়ে কোনো সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করবার চেষ্টামাত্রও করবেন না। তৃতীয়ত, ডাক্তার শীলের মতে—

সহস্র বৎসরাবধি এই দেশ ঠিক সেই জায়গায়ই বসিয়া আছে; তার আর কোনও বিকাশ হয় নাই।

যে সমাজ হাজার বৎসর এক স্থানে এক ভাবে বসে আছে তার আসন টলাবার শক্তি আমাদের মতো সাহিত্যিকের শরীরে নেই। বিপিনবাব্র মতামত কর্মকাণ্ডের নয়, জ্ঞানকাণ্ডের বস্তু বলেই এ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছি। তাঁর বর্ণিত সমন্বয়ের কোনো সার্থকতা সমাজে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে নেই। সামাজিক ক্রিয়াকর্মে দ্ধের সঙ্গে জলের সমন্বয়-প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু তাই বলে সাহিত্যে জলোদ্ধের আমদানি আমরা বিনা আপত্তিতে গ্রাহ্য করতে পারি নে। কারণ ও-

বস্তু অন্তরাত্মার পক্ষে মুখরোচকও নয়, স্বাস্থ্যকরও নয়। অথচ সরস্বতীর মন্দিরে কিঞ্চিৎ দুধ আর কিঞ্চিৎ মদের সমন্বয় যে অমৃত বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে, তার প্রমাণ তো হাতে-হাতেই পাওয়া যাচ্ছে। সাহিত্যের এই পাঞ্চ্ পান করে আমাদের সমাজের আজ মাথা ঘুরছে। এই ঘুর্নির চোটে অনেকে চোখে এত ঝাপসা দেখেন যে, কোন্ বস্তু নূতন আর কোন্ বস্তু পুরাতন, কোন্‌টি স্বদেশী আর কোন্‌টি বিদেশী—তাও তাঁরা চিনতে পারেন না। এ অবস্থায় বাঙালির প্রথম দরকার সমাজে নূতন-পুরাতনের সমন্বয় নয়, মনে নূতন-পুরাতনের বিচ্ছেদ ঘটানো। আমাদের শিক্ষা যাকে এক সঙ্গে গুলে ঘুলিয়ে দিচ্ছে, আমাদের সাহিত্যের কাজ হওয়া উচিত তাই বিশ্লেষণ ক'রে পরিষ্কার করা।

পৌষ ১৩২১

রায়তের কথা

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় সুহৃদ্বরেষু, দেশের লোককে পলিটিকাল শিক্ষা দেবার সদুপায় কি?

বই পড়ানো যে নয়, সে'কথা বলাই বাহুল্য। তবে কি আমাদের পথে-ঘাটে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক দর্শন অথবা রাজনৈতিক বিজ্ঞানের লেকচার দিতে হবে? তাও অবশ্য নয়। কেননা ও-সব জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করা দরকার বি.এ. - এম.এ. পাস করবার জন্যে, এবং কলেজের প্রফেসারি করবার জন্যে। ও-জ্ঞান জীবনযাত্রার পাথেয় নয়, অন্তত চাষাভুষোর পক্ষে তো নয়ই। তাদের অবস্থানুযায়ী অধিকারের কথা চাপা দিয়ে তাদের কাছে rights of manএর ব্যাখ্যান করার অর্থ, গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া। বিশেষ অধিকারের মূল থেকেই যে সামান্য অধিকারের ফুল ফুটেছে, এ কথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কে না জানে। তা ছাড়া এ শাস্ত্রের বড়ো বড়ো কথা প্রচার করবার ভিতর বিপদও আছে। জনগণ হয় সে-সব বুঝবে না, নয় উলটো বুঝবে; আর তখন আমরা তাদের উপর হাত চালাতে প্রস্তুত হব।

এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে কিংকর্তব্য?—উত্তর খুব সোজা।

মানুষের বিশেষ অধিকার-সকল তার স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং তার স্বার্থ যে কোথায়, এবং কি উপায়ে সেই স্বার্থের রক্ষা ও বৃদ্ধি করা যেতে পারে, সেই জ্ঞান দান করতে পারলেই আমরা তাদের পলিটিকাল শিক্ষা দান করতে পারব। আপনার কড়াগণ্ডাটা বুঝে নেবার ক্ষমতাটাও মানুষের একটা শক্তি, আর শক্তিই হচ্ছে সকল উন্নতির মূল। কেবলমাত্র জনসাধারণের দিক থেকে নয়, সমগ্র জাতির দিক থেকে দেখলেও, যাতে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হয় সেই চেষ্টা করাটাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হবে। আদমসুমারিতে জনসাধারণই হচ্ছে অসংখ্য, আর অসাধারণ জন অর্থাৎ ভদ্রলোকের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। আর যে জাতির বেশির ভাগ লোক দুর্দশাপন্ন, সে জাতির কি শরীরে কি অন্তরে কোনো শক্তিও নেই, কোনো উন্নতির আশাও নেই।

সুতরাং রাজনৈতিক ভাবের বিলেতি আকাশ থেকে বাংলার মাটিতে নেমে এসে দেখা যাক, সে দেশের অবস্থাই-বা কি আর দেশবাসীদেরই-বা অবস্থা কি। অবস্থা বুঝলে ব্যবস্থা করবার সুবিধে হবে। তোমরা সকলে লাট-দরবারে ঢুকতে চাচ্ছ শুধু যে উচিত ব্যবস্থা করবার জন্যে, তা সে দরবারের নামেই প্রকাশ। কে না জানে সে সভার নাম ব্যবস্থাপক-সভা।

ছেলেবেলায় কথামালায় পড়েছিলুম যে, জনৈক বৃদ্ধ কৃষক তাঁর ছেলেদের ডেকে বলেন যে, তাঁর খেতে ধনরত্ন পোঁতা আছে। সেই ধনরত্নের লোভে তাঁর ছেলেরা সেই খেত আগাগোড়া খুঁড়ে ওলটপালট করলে; কিন্তু পোঁতা ধনের কোথাও সাক্ষাৎ পেলে না, তবে এই খোঁড়ার ফলে এই ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত ফসল জন্মাল।

আমাদের বাংলাদেশ হচ্ছে ঐরকমের একটি প্রকাণ্ড কৃষকের ক্ষেত্র; ওর বুকের

ভিতর কোনো গুপ্তধন পোঁতা নেই, ও-ক্ষেত্রে শুধু ফসল জন্মায়। বাংলাদেশ যে সোনার খনি নয়, তা বলে কোনো দুঃখ করবার দরকার নেই, কেননা আবাদ করতে জানলে এ জমিতে আমরা সোনা ফলাতে পারি। আর খনির সোনা দুদিনেই ফুরিয়ে যায়, কিন্তু আবাদের সোনা অফুরন্ত ও চিরদিন ফলে।

বাংলাদেশ যে শস্যক্ষেত্র, এই সত্যের উপর আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে হবে। বাংলার উন্নতি মানে কৃষির উন্নতি। এ উন্নতি অনেকে সাধন করতে চান ছেরেপ জমিতে সার দিয়ে। তাঁরা ভুলে যান যে কৃষকের শরীর-মন যদি অসার হয়, তা হলে জমিতে সার দিয়ে দেশের শ্রী কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না। আমাদের দেশে যা দেদার পতিত রয়েছে সে হচ্ছে মানবজমিন; আর আমরা যদি স্বদেশে সোনা ফলাতে চাই, তা হলে আমাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য হবে এই মানবজমিনের আবাদ করা। এবং তার জন্য দেশের জনসাধারণের মনে রস ও দেহে রক্ত, এ দুই জোগাবার জন্য আমাদের যা-কিছু বিদ্যাবুদ্ধি, যা-কিছু মনুষ্যত্ব আছে তার সাহায্য নিতে হবে। এখন আসল কথায় ফিরে আসা যাক। আগামী ইলেক্‌শনের জন্য সেই প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে, যার উদ্দেশ্য হবে বাংলার কৃষকের ওরফে বাঙালি জাতির, অবস্থার উন্নতি করা। একটা সমগ্র জাতির দুরবস্থা দূর করা যে কত কঠিন, এবং তা করবার সকল উপায় যে আমাদের হাতে নেই, এ কথা আমি সম্পূর্ণ জানি। আমি শুধু বলি যে, যেটুকু আমাদের সাধ্যের অতীত নয়, সেইটুকু করবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে, কেননা সে চেষ্টার ফল ভালো না হয়ে যায় না।

কৃষকের অবস্থা

ইলেক্‌শনের প্রোগ্রাম অবশ্য পলিটিশিয়ানদেরই তৈরি করতে হবে, কেননা দেশ-উদ্ধারের ভার তাঁরা স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন। অতএব কৃষকের অবস্থার যাতে উন্নতি হয়, সেই মর্মে প্রোগ্রাম তৈরি করা অবশ্য আমাদের পলিটি-শিয়ানদের পক্ষেই কর্তব্য। তাঁদের নিজের স্বার্থের দিক থেকে দেখলেও এ কর্তব্য তাঁরা অবহেলা করতে পারবেন না। গাঁয়ে যাঁকে মানে না, তাঁর পক্ষে দেশের মোড়লি করা আর চলবে না। তবে এ প্রোগ্রাম তাঁরা তৈরি করতে পারবেন কি না সন্দেহ।

আমি না হই, তুমি যখন আধ-আধ কথা কইতে, সেই কালে বঙ্কিমচন্দ্র অতি স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে—

জমিদারের ঐশ্বর্য সকলেই জানেন, কিন্তু যাঁহারা সংবাদপত্র লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া বঙ্গসমাজের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বেড়ান, তাঁহারা সকলে, কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন।

বঙ্কিমের যুগে পলিটিশিয়ানদের অজ্ঞতার যা পরিমাণ ছিল, ইতিমধ্যে তা যে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য, কেননা ইতিমধ্যে বাংলার ভদ্রলোকের দল জমি থেকে ঢের বেশি আলগা হয়ে পড়েছে। এখন এ সম্প্রদায় টিঁকে আছে চাকরি ওকালতি ও ডাক্তারির উপর। ডাক্তারি-কেরানিগিরির সঙ্গে জমিজমার কোনোই সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে শুধু ওকালতির সঙ্গে। আমাদের উকিল-

সম্প্রদায়ের সম্পদ অবশ্য জমিদার ও রায়তের বিপদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বেঙ্গল টেন্যান্সি জানা এক কথা, আর বেঙ্গল টেন্যান্ট্রি জানা আর-এক কথা। এর একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশেষজ্ঞ হয়ে আর-একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। আমার বিশ্বাস, বেশির ভাগ শহুরে উকিল মহোদয়েরা কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নন। আর যাঁরা জানেন তাঁরাও কৃষকের ব্যথার ব্যথী হতে পারেন, কিন্তু বিনে পয়সায় তার কথার কথক নন। বাংলার উকিল-রাজ হচ্ছেন জমিদারের মিত্র-রাজ। এ আঁতাৎ কর্দিয়ালএর ভিতর যথেষ্ট অর্থ আছে। এঁরা যে একমাত্র জমিদারের অন্নে প্রতিপালিত, তা অবশ্য নয়। জমিদার ও রায়ত উভয়েই এঁদের মক্কেল; এঁরা গাছেরও পাড়েন, তলারও কুড়োন। তবে তিল কুড়িয়ে তাল করার চাইতে গোটা তাল হাতে পাওয়া ঢের বেশি আরামের ও আহ্লাদের কথা। ফলে এঁদের লুব্ধদৃষ্টি উপরের দিকেই সহজে আকৃষ্ট হয়, তার পর আর নামে না। অথচ এই দলের লোকই হচ্ছেন আমাদের পলিটিক্সের ল্যাজা-মুড়ো দুইই। পলিটিশিয়ানরা প্রজার হয়ে কোনোরূপ দাবি করতে প্রস্তুত নন—আমার এ বিশ্বাস যদি অমূলক হয়, তা হলে তার জন্য প্রধানত পলিটিশিয়ানরাই দায়ী। মডারেট এক্সট্রিমিস্ট কোনো দল থেকেই অদ্যাবধি কোনো প্রোগ্রাম বার হয় নি, এবং তা বার করবার তাঁদের যে কোনোরূপ অভিপ্রায় আছে, তার কোনো আভাসও তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

শুনতে পাই যে, মডারেট দল জমিদারের সঙ্গে সন্ধি করবার চেষ্টায় ফিরছেন। তাঁদের নাকি বিশ্বাস যে, নায়েব-গোমস্তার সাহায্যে তাঁরা প্রজার ভোট আদায় করতে পারবেন, উপরন্তু জেলার হাকিম ও পুলিসের কো-অপারেশনের উপরও তাঁরা ভরসা রাখেন। এ কথা যদি সত্য হয় তা হলে তাঁদের অন্য প্রোগ্রামের কোনো প্রয়োজন নেই। 'জোর যার ভোট তার'—এই হচ্ছে তাঁদের প্রোগ্রাম।

এ বিষয়ে এক্সট্রিমিস্ট দলের মত জানবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে চেষ্টায় কোনোই ফল হয় নি। এ দলের দু-চারজন কর্তাব্যক্তির সঙ্গে আমার এ বিষয়ে যে কথাবার্তা হয়, তা প্রকাশ করবার অধিকার আমার নেই। মোটামুটি তাঁদের বক্তব্য এই যে, লাট-দরবারে তাঁরা ঢুকলে বাংলাদেশকে সেই দেশে পরিণত করবেন, যে দেশে আমাদের মেয়েরা খোকাবাবুর বিয়ে দিতে চায়, অর্থাৎ যে দেশে

লোকে গাই বলদে চষে,
দাঁতে হীরে ঘষে,
রুই মাছ পালঙের শাক ভারে ভারে আসে।

এ সংকল্প যে অতি সাধু সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই, কিন্তু সন্দেহ আছে তার সিদ্ধির উপায় নিয়ে। স্বদেশকে 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' করে তোলবার উপায় সম্বন্ধে এঁরা নীরব। এ ধরনের কথা আমাদের মুখেই শোভা পায়, কেননা ছেলে-ভুলোনো ছড়া ভালো করে বাঁধতে ও কাটতে আমরাই পারি। কবিত্ব কবিতাতেই করা কর্তব্য, ও-জিনিস গদ্যে খাপ খায় না। আর পলিটিক্সের ভুল্য বুনো গদ্য এক আইন ছাড়া আর কিছু নেই। সে যাই হোক, এঁদের সঙ্গে কথোপকথনের ফলে আমার মনে এই সন্দেহ জন্মেছে যে, কি উপায়ে কৃষকের অবস্থার উন্নতি করা

যায় সে বিষয়ে হয় তাঁদের কোনো মত নেই আর নাহয় তো সে মত এখন তাঁরা প্রকাশ করতে চান না। সম্ভবত তাঁরা তাঁদের প্রোগ্রাম প্রকাশ করতে ইতস্তত করছেন এই ভয়ে যে, পাছে অপরে তা চুরি করে। সাহিত্যে ও পলিটিক্সে চোরাই-মালের কারবার যেরকম বেড়ে গেছে, তাতে এ ভয় অকারণ নয়। তবে এ বিষয়ে কথা তুললে তাঁরা যেরকম অসোয়াস্তি বোধ করেন ও বিরক্তি প্রকাশ করেন, তাতে মনে হয় তাঁরা একটু উভয়সংকটে পড়েছেন। প্রজার উপকার করতে প্রস্তুত কিন্তু প্রজাকে কোনো অধিকার দিতে রাজি নন, এমন লোক সকল সমাজেই আছে। এই মনোভাবকেই-না ব্যুরোক্র্যাটিক মনোভাব বলে? তবে এ কথাও ভোলা উচিত নয় যে, আমাদের ন্যাশনালিস্টরা আপাতত বিদেশী বড়ো পলিটিক্স নিয়ে এতটা ব্যস্ত আছেন যে, স্বদেশী ছোটো পলিটিক্সে মন দেবার তাঁদের একদম ফুরসত নেই। বড়ো পলিটিক্সের কারবার অবশ্য রাজারাজড়া নিয়ে। মানুষে যখন রাজা-উজির মারতে বসে, তখন কি কত ধানে কত চাল হয় তার ভাবনা সে ভাবতে পারে?

রায়তের প্রোগ্রাম

দেশের পলিটিশিয়ানরা যখন এ বিষয়ে ঔদাসীন্য দেখাচ্ছেন, তখন যা-হোক একটা একমেটে প্রোগ্রাম তৈরি করবার চেষ্টা করা যাক। যদি কেউ বলেন—

> যার কর্ম তার সাজে
> অন্য লোকে লাঠি বাজে।

তার উত্তর, রায়তের ভাবনা ভাবা বাঙালি সাহিত্যিকের পক্ষে যে অনধিকারচর্চা নয়, এর ভালো ভালো নজির আছে। বাঙালির মধ্যে যে শ্রেণীর লোকেদের আমরা গুরু বলে মান্য করি, তাঁরা সকলেই প্রজার ব্যথার ব্যথী এবং সে ব্যথা তাঁরা কথায় প্রকাশ করেছেন। রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সবাই প্রজার হয়ে ওকালতি করেছেন। তাঁদের শিষ্যত্বই হচ্ছে এ বিষয়ে কথা কইবার আমার দ্বিতীয় দলিল।

তুমি আমি যখন বালক সেই কালে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার প্রজার অবস্থা বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, রায়তকে যে অবস্থায় আমরা রেখেছি, তার ফল ত্রিবিধ—দারিদ্র্য মূর্খতা দাসত্ব। তিনি আরো বলেন যে—

> ঐ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা যে কত সত্য তার প্রমাণ, আজকের দিনেও বাংলার রায়তের দল দরিদ্র মূর্খ ও দাস।

তারা যে মূর্খ, সে বিষয়ে তো আর কোনো মতভেদ নেই। তার পর তারা আইনত না হলেও বস্তুত যে দাস, ক্রীতদাস না হলেও যে গর্ভদাস, এ কথা অস্বীকার করা কঠিন। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজও তারা নিজের অধিকারের উপর দাঁড়াতে পারে না, প্রভুর অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অবশ্য ইংরেজের আইন তাদের অনেক অধিকার দিয়েছে, কিন্তু সে শুধু নামে। টেন্যান্সি

অ্যাক্ট আজকের দিনে জমিদারের হাতে সঙীন অস্ত্র। প্রজাকে হয়রান করতে চাও, নাজেহাল করতে চাও, জেরবার করতে চাও তো করো উচ্ছেদের মামলা, স্বত্বের মোকদ্দমা, জমাবৃদ্ধির নালিশ, ফসল-ক্রোকের দরখাস্ত, মায় ড্যামেজ বাকিখাজানার নালিশ; আর তার ভিটেমাটি উচ্ছন্নে দিতে চাও তো করো তার নামে বাকি-পড়া ও খাসদখলের নালিশ।

তবে যে প্রজা টিকে আছে তার কারণ, বেশির ভাগ জমিদার আইনের মার রায়তদের মারেন না, তা ছাড়া মুনসেফবাবুরা জমিদারের দাখিলী কাগজ, তা সে জমারই হোক সুমারেরই হোক, পারতপক্ষে প্রামাণিক বলে গ্রাহ্য করেন না। আর আমলা-ফয়লার এজাহার যে বিলকুল খেলাপ, এই হচ্ছে হাকিমের দৃঢ় ধারণা। এ'রা যে জমিদারের প্রতি সব সময় সুবিচার করেন তা নয়, তবে প্রজা যে বেঁচেবর্তে থাকে সে মুনসেফবাবু ও সেটেলমেন্ট আপিসের গুণে। সরকারের বেতনভোগী এই রাজকর্মচারীরাই হচ্ছেন বাংলার রায়তের যথার্থ রক্ষক, জমিদারের বিত্তভোগী রাজনীতিব্যবসায়ী উকিল-মোক্তারেরা নন। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, প্রজার দাসত্ব আজও ঘোচে নি।

আর তার দারিদ্র্য যে কি ভীষণ, তা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ব্যারিস্টার মহোদয়ের কথাতেই প্রকাশ। তিনি সেদিন বেঙ্গল ল্যান্ড্ হোলডার্স্‌দের তরফ থেকে গবর্নমেন্টকে যে পত্র লিখেছেন, তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

Bengal, if not the whole of India, Bengal probably more so than the rest of India, is an agricultural community— seventy-seven per cent of her population being agriculturists. It is an undeniable fact that seventy per cent of the peasantry out of the seventy-seven per cent of the whole population is so poor, that the income per capita is not more than a few rupees a year, and they go to bed every day without a square meal.— *Statesman*, 5th March, 1920.

অস্য বাংলা—

বাংলা, যদ্যপি সমগ্র ভারতবর্ষ না হয়, বাংলা সম্ভবত বাকি ভারতবর্ষের অধিক, হচ্ছে একটি কৃষিজীবী সম্প্রদায়, কারণ তার অধিবাসীর মধ্যে শতকরা সাতাত্তর জন কৃষক। এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, কৃষকদের মধ্যে শতকরা সত্তর জন, যে কৃষকেরা দেশের লোকের মধ্যে শতকরা সাতাত্তর, এতাদৃশ দরিদ্র যে মাথাপিছু বাৎসরিক আয় দু-চার টাকা মাত্র, এবং তারা নিত্য পেট ভরে না খেয়েই শুতে যায়।

চক্রবর্তী সাহেবের বক্তব্য আমি যতদূর সম্ভব কথায় কথায় অনুবাদ করেছি, তার উপর সাহিত্যিক হাত চালাই নি এই ভয়ে যে, পাছে কেউ বলে আমি তার গায়ে রঙ চড়িয়েছি। বাংলাদেশে শতকরা সত্তর জন লোক বারো মাস আধপেটা খেয়ে থাকে, স্বজাতির অবস্থা যে এতদূর সাংঘাতিক—এ জ্ঞান আমার ছিল না। দিনের পর দিন ও-অবস্থায় যারা শুতে যায়, তারা যে আবার বিছানা থেকে ওঠে এইটেই আশ্চর্যের বিষয়। তবে এ কথা আমরা মেনে নিতে বাধ্য, কেননা তাঁর সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, চক্রবর্তী সাহেবের কথনো ঠিকে ভুল হয় না।

বিশেষত তিনি যখন জমিদারের পক্ষ থেকে প্রজার এই ভীষণ দারিদ্র্য কবুল করেছেন তখন রায়তের পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদ করা আহাম্মকি। আর আজ আমি প্রজার হয়ে ওকালতি করতে দাঁড়িয়েছি।

প্রজার দুর্দশা সম্বন্ধে আর-একটি কথা উল্লেখ করতে বঙ্কিমচন্দ্র ভুলে গিয়েছিলেন, সে হচ্ছে তার স্বাস্থ্যের কথা। সম্ভবত সে যুগে ম্যালেরিয়া দেশকে তেমন আচ্ছন্ন করে ফেলে নি। আজকের দিনে জনসাধারণের শরীর-গতিক কিরকম, তার পরিচয় সরকারের তরফ থেকে বর্ধমানের মহারাজাই দিয়েছেন। তাঁর কথা তাঁর ভাষায় এ স্থলে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

Roughly speaking we may say that in each of these two years (1918-19) very nearly four per cent of the population has died, and unfortunately the births have not entirely replaced this loss. The more regrettable thing about this appalling mortality is the fact that a large proportion is due to causes that are entirely preventable —*Statesman,* 6th March, 1920.

অস্য বাংলা—

মোটামুটি বলতে গেলে, গত দুই বৎসরের প্রতি বৎসর বাংলাদেশের লোকের মধ্যে শতকরা চার জনের মৃত্যু হয়েছে, এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যত মৃত্যু হয়েছে তত জন্ম হয় নি। বিশেষ দুঃখের কথা এই যে, যে-সব কারণে লোকক্ষয় হচ্ছে তার অধিকাংশই নিবার্য।

এই তো গেল মৃত্যুর তালিকা; কিন্তু যারা বেঁচে থাকে, তার মধ্যেও অধিকাংশ লোক জ্বরজীর্ণ জীবন্মৃত। আর বলা বাহুল্য যে, এই রোগের অত্যাচার বিশেষ করে সহ্য করতে হয় আমাদের প্রজাসাধারণকে। দারিদ্র্যের সঙ্গে রোগের যোগাযোগটা যে অতি ঘনিষ্ঠ, সে কথা উল্লেখ করবার কি আর কোনো দরকার আছে? যারা বারোমাস একসন্ধে আধপেটা খেয়ে শুতে যায়, তারা যে রোগশয্যায় শয়ন করলে সেখান থেকে আর ওঠে না, সে বিষয়ে আর আশ্চর্য কি।

অতএব তোমাদের সেই প্রোগ্রাম খাড়া করতে হবে, যার বলে বাংলার রায়ত মূর্খতা দারিদ্র্য দাসত্ব ও রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে।

আমাদের সৌভাগ্য এই যে, বাংলার না হোক, বেহারের প্রজাবর্গ পলিটিশিয়ানদের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেরাই স্বপক্ষের একটি প্রোগ্রাম খাড়া করেছে। সেই প্রোগ্রাম যদি সংগত হয়, তা হলে তা আমাদের শিরোধার্য করে নিতে হবে। এখন আমি সেই প্রোগ্রামের বিচার করতে প্রবৃত্ত হলুম।

প্রোগ্রামের পরিচয়

কিছুদিন আগে ইংলিশম্যান কাগজে হঠাৎ চোখে পড়ল যে, বেহারের রায়তেরা মজঃফরপুরে এক প্রকাণ্ড সভা করে সকলে একমত হয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাব ক'টি পাস করেছে—

প্রথম। দেশময় কম্‌পালসরি প্রাইমারি এডুকেশন্‌ প্রচলিত হওয়া কর্তব্য।

দ্বিতীয়। প্রতি চার মাইল অন্তর একটি ক'রে দাতব্য ঔষধালয় থাকা চাই।

তৃতীয়। প্রজার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোতমাত্রেই সর্বত্র আইনত হস্তান্তরযোগ্য বলে গণ্য হওয়া কর্তব্য; অর্থাৎ, উক্ত শ্রেণীর জোত জমিদারের বিনা অনুমতিতেই প্রজার হস্তান্তর করবার অধিকার থাকবে।

চতুর্থ। নিজের দখলী জমির গাছ কাটবার অধিকার প্রজার থাকবে; অর্থাৎ প্রজা সে গাছের স্বত্বাধিকারী স্বরূপে স্বীকৃত হবে।

পঞ্চম। প্রজা জমিদারের বিনা অনুমতিতে নিজের দখলী জমিতে পুকুর কাটাতে পারবে, কুয়ো খুঁড়তে পারবে, কোঠাবাড়ি তৈরি করতে পারবে।

ষষ্ঠ। প্রজার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোতের জমাবৃদ্ধি করবার অধিকার জমিদারের অতঃপর আর থাকবে না; অর্থাৎ, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোতমাত্রই আইনত মৌরসী-মোকররী বলে গণ্য হবে।

প্রজাপক্ষের প্রথম দুটি দাবি যে ন্যায্য, সে বিষয়ে কোনোরূপ মতভেদ নেই। লোকশিক্ষার বিস্তারের জন্য আজ বছর দশেক ধরে সকল দলের পলিটিশিয়ানরা তো সমান চিৎকার করছেন। এবং গবর্নমেন্ট এ বিষয়ে আমাদের কথায় বিশেষ কর্ণপাত করেন না ব'লে আমরাও সরকার কর্তব্যের অবহেলা করেছেন ব'লে তাঁর প্রতি নিত্য দোষারোপ করি। তার পর, প্রজার রোগের প্রতিকার করাও যে গবর্নমেন্টের কর্তব্য, সে কথা গবর্নমেন্টও মানেন। মন্টেগু-চেম্স্ফোর্ড রিপোর্টে প্রকাশ যে, আর পাঁচরকম জিনিসের মধ্যে—the provision of schools and dispensaries within reasonable distance—these are the things that make all the difference to his life.

সুতরাং দেখা গেল যে, প্রজাপক্ষ ও সরকারপক্ষ এ বিষয়ে একমত। জমিদারপক্ষও এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদী নন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর পূর্বোক্ত পত্রে লিখেছেন যে, বাংলার ভবিষ্যৎ গবর্নমেন্টকে এই দুই কর্তব্য সর্বাগ্রে পালন করতে হবে—

1. Sanitation—involving, as it must, ways and means as to how she is to combat the scourges of malaria and cholera and other similar scourges.

অস্যার্থ—

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করতে হবে, অর্থাৎ, ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করতে হবে।

2. She will be further called upon to provide for the education of her children in the light of the recent University Commission Report.

অস্যার্থ—

নিজের সন্তানদের শিক্ষা দেবার দায় বাংলার ঘাড়ে পড়বে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী লোকশিক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে।

বলা বাহুল্য যে, মন্টেগু-চেম্স্ফোর্ড রিপোর্টে যা দু-কথায় বলা হয়েছে, জমিদারপক্ষ তাই একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেছেন। এ দু-মতের ভিতর কিন্তু

একটু গরমিল আছে। মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট চায় ডিসপেনসারি, আর জমিদারপক্ষ চান দেশের আবহাওয়ার পরিবর্তন। অবশ্য এ দুইই আমাদের চাই। তবে সর্বাগ্রে চাই রোগীকে রোগমুক্ত করবার ব্যবস্থা, সমগ্র দেশকে রোগমুক্ত করবার ব্যবস্থা পরে হবে; যদি আমরা হাত-হাত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করি, তা হলে স্যানিটেশনের দৌলতে দেশকে যেদিন স্বর্গ করে তুলব, সেদিন হয়তো দেখব যে, দেশে আর মানুষ নেই, সবারই ইতিমধ্যে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়েছে।

মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে যে, স্কুল ডিসপেনসারি প্রভৃতি প্রজার জীবনকে একদম বদলে দেয়, অর্থাৎ তার উন্নতিসাধন করে। শিক্ষা জিনিসটের প্রভাব শুধু জীবনের উপর নয়, মনের উপর আছে। আজকের দিনে দেশের প্রজাসাধারণের মনের অবস্থা কি?

রাশিয়ার বিষয় একজন জর্মান লেখকের বই সেদিন আমি পড়ছিলুম। রাশিয়ার একজন অগ্রগণ্য ব্যারিস্টার উক্ত জর্মান ভদ্রলোককে যা বলেছিলেন, তার গুটিকয়েক কথা এখানে অনুবাদ করে দিচ্ছি—

আমার দেশের লোক অবিচারে অভ্যস্ত। জনসাধারণের উপর অত্যাচার করা আর না-করা বড়োলোকের মরজির উপর নির্ভর করে। আমরা হাজার হাজার বৎসর ধরে এই ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছি, কাজেই আমরা সকল অন্যায় অত্যাহিত অদৃষ্টের নিয়তি বলে মেনে নিই। যে শিলাবৃষ্টি তাদের শস্য নষ্ট করে, এবং উপরওয়ালার যে অত্যাচারে তারা বঞ্চিত ও পীড়িত হয়, রাশিয়ার কৃষকদের কাছে এ-দুয়ের ভিতর কোনো তফাত নেই, দুইই এক-জাতীয় ঘটনা।[১]

আমি জিজ্ঞেস করি যে, আমাদের কৃষকদের মনোভাবের সঙ্গে রাশিয়ান কৃষক-দের মনোভাবের কোনো তফাত আছে কি? এরা উভয়েই কি একজাত নয়? একেই বলে 'দাস'মনোভাব। আর আমার মতে মনের দাসত্বই হচ্ছে সবচেয়ে সর্বনেশে দাসত্ব। শিক্ষার একটি প্রধান গুণ এই যে, তার প্রসাদে মানুষ মনেও মানুষ হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়। নিজের দাসত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হওয়াই মুক্তিলাভের প্রথম সোপান। অজ্ঞতার সঙ্গে মনের দাসত্বের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। মুক্তির পথ যে জ্ঞানমার্গ, এ সত্য বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয়েছিল, সুতরাং গ্রামে গ্রামে স্কুল বসালে, আশা করা যেতে পারে যে, আমাদের প্রজাসাধারণের মনের আবহাওয়া বদলে যাবে। শিক্ষা জিনিসটে আসলে মনের স্যানিটেশন বই আর কিছুই নয়। মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে রায়তের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

His mind has been made up for him by his landlord or his banker or his priest or his relatives or the nearest official.

অর্থাৎ—

রায়তের মন, হয় তার জমিদার নয় তার মহাজন, হয় তার পুরুত নয় তার আত্মীয়-স্ব, আর নাহয় তো হাতের গোড়ায় যে রাজপুরুষ থাকেন তিনি গড়ে তোলেন।

আশা করা যায় শিক্ষা পেলে রায়তদেরও নিজের মন বলে একটা জিনিস হবে।

[১] Hugo Ganz, *Le Debacle Russe.*

দেখা গেল যে, রায়তদের শিক্ষার দাবি ও স্বাস্থ্যের দাবি সকলেই মঞ্জুর করেন, কিন্তু তাদের স্বত্বের দাবির কথা কানে ঢোকবামাত্র চমকে ওঠেন—এমন লোকের এ দেশে অভাব নেই। শুধু তাই নয়, এঁদের মধ্যে অনেকে আবার প্রজার পক্ষ যাঁরা সমর্থন করতে উদ্যত হন তাঁদের বুদ্ধি ও চরিত্রের উপর নানারূপ দোষারোপ করতে ক্ষণমাত্র দ্বিধা করেন না। যে প্রজার অধিকারের কথা তোলে, কারো মতে সে বলশেভিক, কারো মতে সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শত্রু, আবার কারো মতে-বা সে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সম্প্রদায়ের মারামারি-কাটাকাটির পক্ষপাতী।

এঁরা যদি একটু ভেবে দেখেন তা হলেই দেখতে পাবেন যে, এ-সকল অপবাদ কতদূর অমূলক।

প্রথমত, বলশেভিক জন্তুটি যে কি, তা তাঁরাও জানেন না আমরাও জানি নে। জুজুর ভয় ভদ্রলোকের পক্ষে অপরকে দেখানোও যেমন অনুচিত, নিজে পাওয়াও তেমনি ছেলেমি।

দ্বিতীয়ত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলে দেবার প্রস্তাব করা আমাদের পক্ষে মূর্খতা হবে। কেননা উক্ত বন্দোবস্তে প্রজার কোনো ক্ষতি নেই, ক্ষতি হচ্ছে স্টেটের। সমস্ত বাংলা কাল সরকারের খাসমহল হলে প্রজার দেয় খাজানা কমাবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। সুতরাং প্রজার তরফ থেকে সে প্রার্থনা কেউ করবে না।

তৃতীয়ত, নতুন অধিকারের দাবি যে-কেউ করে, তার বিরুদ্ধে সকল দেশে চিরকালই ঐ ঘর-ভাঙানোর মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়। এ স্থলে কথাটা একটু ব্যক্তিগত হলেও আমি তা বলতে বাধ্য। বাংলার জমিদারসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোনোরূপ কুসংস্কার আমার নেই, এবং থাকতে পারে না। আমার মন স্বতই এঁদের প্রতি অনুকূল, কেননা আমার আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিকুটুম্ব সবাই জমিদার—কেউ বড়ো, কেউ ছোটো, কেউ মাঝারি। আমি জন্মাবধি এই জমিদারের আবহাওয়াতেই বাস করে আসছি। সুতরাং সে সম্প্রদায় আমার যতটা অন্তরঙ্গ, অপর কোনো সম্প্রদায় ততটা নয়। জমিদারের উপর বঙ্কিমচন্দ্র যে আক্রমণ করেছিলেন, সে আক্রমণ করতে আমি অপারগ, কেননা আমি জানি যে সে আক্রমণ অন্যায়। ভালোমন্দ লোক সকল সম্প্রদায়েই আছে; কিন্তু এ কথা জোর করে বলতে পারা যায় যে, সাধারণত জমিদারের দল অর্থলোভী নয়। জমিদার, আর যাই হোক, মহাজন নয়। আয় বাড়ানোর চাইতে ব্যয় বাড়ানোর দিকেই এ সম্প্রদায়ের ঝোঁক বেশি। তা ছাড়া, আমার বিশ্বাস যে, প্রজার স্বত্বের দাবি মঞ্জুর করতে জমিদারমাত্রেই নারাজ হবেন না। হয়তো দুদিন পরে দেখা যাবে যে, জমিদারেরাই প্রজার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

রায়তের প্রোগ্রামের বাকি ক'টি দাবি যদি গ্রাহ্য হয় তো আমার বিশ্বাস তার দারিদ্র্যের কিঞ্চিৎ উপশম হতে পারে। অতএব দাবিগুলির পর পর বিচার করা যাক।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোত হস্তান্তরযোগ্য কিংবা নয়, এ প্রশ্নের উত্তরে আইন এখন প্রথার দোহাই দেয়। আইনের কথা হচ্ছে যে, যে জেলায় উক্ত জোত হস্তান্তর করবার প্রথা আছে, সে জেলায় সে জোত জমিদারের বিনা অনুমতিতে রায়ত

হস্তান্তর করতে পারে; আর যে জেলায় সেরূপ প্রথা নেই, সে স্থলে তার দান-বিক্রয় জমিদার ইচ্ছে করলে গ্রাহ্য করতে পারেন, ইচ্ছে করলে অগ্রাহ্য করতে পারেন।

কিন্তু আসলে ঘটনা কি জান?—ও-জোত সমগ্র বাংলায় নিত্যনিয়মিত হস্তান্তরিত হচ্ছে এবং জমিদারও তা হাসিমুখে মেনে নিচ্ছেন, কেননা তাতে তাঁর লাভ আছে। তবে জমিদার যে প্রথার দোহাই দেন, সে শুধু দাখিলখারিজের একটা মোটারকম সেলামি আদায় করবার জন্য। কোথাও-বা জোতের খরিদা মূল্যের চৌথ আদায় করা হয়, কোথাও-বা জমার পাঁচ থেকে দশগুণ পণ। এ বিষয়ে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই, যাঁর যেরকম প্রবৃত্তি ও শক্তি তিনি এই সুযোগে প্রজাকে সেই অনুসারে দুইয়ে নেন। যে সম্প্রদায়ের সাতাত্তর জনের মধ্যে সত্তর জন বারোমাস একদিনও পেটভরে খেতে পায় না, তাদের এরূপ দোহন করা যে অত্যাচার, এ কথা যার শরীরে মানুষের রক্ত আছে সে কখনোই অস্বীকার করতে পারবে না। তা ছাড়া, এই দাখিলখারিজসূত্রে প্রজাকে যে কি পর্যন্ত হয়রান-পরিশান করা যায় ও করা হয়, তা জমিদারি সেরেস্তার সঙ্গে যাঁর কোনোরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধ আছে তিনিই জানেন। দাখিলখারিজের প্রার্থীদের জমিদারের কাছারিতে যাতায়াত করতে করতে পায়ের নাড়ি ছিঁড়ে যায়। জোতখরিদ্দারের পক্ষে জমিদারের সেরেস্তায় নামপত্তন করার চাইতে বিয়ে করা কম কথায় হয়, যদিচ বিয়ের জন্য লাখ কথা চাই। এ অবস্থায় বেচারার কাছ থেকে নায়েব গোমস্তা জমানবিশ সুমারনবিশ পাইক বরকন্দাজ যে পারে সেই মোচড় দিয়ে দু-পয়সা আদায় করে নেয়। সুতরাং তার এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবার প্রস্তাব করলে, আশা করি, বলশেভিজমের পরিচয় দেওয়া হয় না।

আমার এ কথা শুনে হঠাৎ-প্রজাহিতৈষীর দল কি জবাব দেবেন তা জানি। তাঁরা বলবেন যে, প্রজার ভালোর জন্যই তাকে জোত হস্তান্তর করবার অধিকারে বঞ্চিত করা কর্তব্য। নচেৎ বাংলার জমি দেনার দায়ে মহাজনের হাতে চলে যাবে, ও বাংলার কৃষক ভূমিশূন্য হয়ে পড়বে। এ আপত্তির বিচার বারান্তরে করব। এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, জোত যখন দুবেলা কেনা-বেচা হচ্ছে, তখন জমিদারের জরিমানার দায় থেকে প্রজাকে অব্যাহতি দেওয়া কর্তব্য। কৃষকের জোত অ-কৃষকে কিনতে পারবে কি না এ সমস্যার সঙ্গে জমিদারের লাভালাভের কোনোই সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে রাষ্ট্রের সঙ্গে।

তার পর, নিজের জোতের গাছ কাটবার অধিকার। যার নিজের বোনা শস্য কাটবার অধিকার আছে, তার নিজের পোঁতা গাছ কাটবার অধিকার যে কেন থাকবে না, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু এ কথা বলতে গেলেই আইনের তর্ক উঠবে। উকিলবাবুরা আমাদের ট্রান্সফার অব প্রপার্টি অ্যাক্ট পড়ে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির প্রভেদটা শিখে নিতে বলবেন। কিন্তু তার উত্তরে আমি বলব যে, বাংলার রায়তকে যদি মানুষ করতে চাও তো প্রপার্টি সম্বন্ধে অনেক পুঁথিগত বিদ্যে ভুলতে হবে। কায়ক্লেশে বেঁচে থাকবার জন্যেও প্রজার আমকাঁঠালের তক্তার প্রয়োজন আছে—শোবার তক্তাপোষের জন্যে, দুয়োরের কপাটের জন্যে, চালের খুঁটির জন্যে; আর যদি বল যে তাদের বেঁচে থাকবার কোনো অধিকার নেই, তা হলেও তাদের কাঠের দরকার

আছে—ম'লে পোড়াবার জন্যে। যেমন মুসলমান প্রজার সাড়ে তিন হাত জমিতে অধিকার আছে, তার গর্ভে অনন্তশয্যায় শয়ন করবার জন্যে। সুতরাং গাছ কাটাটা এমন-কিছু অপরাধ নয়, যার জন্যে তাকে দণ্ড দিতে হবে। তার দারিদ্র্যের কথাটা স্মরণ করলে এ জরিমানার দায় হতে তাকে মুক্তি দেওয়াটা কি অধর্ম?

তার পর আসে কুয়ো খোঁড়বার, কোঠাবাড়ি তৈরি করবার অধিকার। এ সম্বন্ধে আইনের কথা হচ্ছে একটা বেজায় রহস্য। আইনের বলে যাতে জোতের উন্নতি হয়, তা করবার অধিকার প্রজার আছে। এবং জোতের উন্নতি কাকে বলে, সে সম্বন্ধে অনেক আইনের তর্ক ও দেদার নজির আছে। বেঞ্চ এবং বার-এর এই-সব চুলচেরা তর্ক, সূক্ষ্ম বিচারের গুণে এ বিষয়ে আইন ক্রমে সরু হতে হতে শেষটা লূতাতন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, এ মামলায় প্রজার শুধু দোকর দণ্ড দিতে হয়, একবার উকিলের কাছে আর একবার জমিদারের কাছে। নিজের পয়সায় প্রজা কোঠাবাড়ি তৈরি করলে তার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের নালিশ চলে। বাস্তু পাকা করতে চেষ্টা করলে প্রজাকে যে ভিটে থেকে উচ্ছন্ন হতে হবে, এর চাইতে আর অদ্ভুত ব্যবস্থা কি হতে পারে? তবে ভরসার কথা এইটুকু যে, আদালতে-বোনা আইনের মাকড়সার জালে বাঁধা পড়ে কীট, মানুষ নয়। আর আমরা চাই বাংলার প্রজা অতঃপর আর কীট হয়ে থাকবে না, সব মানুষ হয়ে উঠবে।

প্রজার শেষ দাবি এই যে, তার জোত মৌরসী ও মোকররি হবে। অর্থাৎ অতঃপর জমাবৃদ্ধির অধিকার জমিদারের আর থাকবে না। আমার মতে রেকর্ড অব রাইট্‌স্‌ প্রজার জমি অনুসারে যে জমা ধার্য করে দেয়, সেই জমাই আইনত চিরস্থায়ী হওয়া কর্তব্য। অর্থাৎ, যতদিন স্টেটের সঙ্গে জমিদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাহাল থাকবে, ততদিন জমিদারের সঙ্গেও রায়তের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাহাল থাকবে। এ দাবি অপূর্বও নয় অদ্ভুতও নয়। ১৮৩২ খৃস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় বিলাতে পার্লামেণ্টারি কমিশনের সম্মুখে যখন সাক্ষ্য দেন, তখন তিনি প্রজার হিতকল্পে এই দাবি উপস্থিত করেছিলেন। বাংলাদেশের এই অদ্বিতীয় মহাপুরুষের বাক্য আমার শিরোধার্য, তাঁর সেই সাক্ষ্যের রিপোর্ট পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে যে, পলিটিক্স সম্বন্ধেও তাঁর দিব্যদৃষ্টি ছিল। তার পর আমার মতের সপক্ষে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের কথা আবার উদ্‌ধৃত করতে বাধ্য হলুম। তিনি গবর্নমেণ্টকে লিখেছেন—

It would be iniquitous to think of taxing a population so poor as this, and my Committee venture to enter an emphatic protest against any idea of further taxation.

অস্য বাংলা—

এরূপ দরিদ্র সম্প্রদায়ের উপর ট্যাক্স বসানোর চিন্তাও পাপকার্য হবে, এবং আমার কমিটি এ স্থলে আবার নূতন কোনো ট্যাক্স বসানোর বিরুদ্ধে তাদের ঘোর আপত্তি জোর-গলায় জানিয়ে রাখতে সাহসী হচ্ছে।

উপরোক্ত কথা ক'টির মধ্যে ট্যাক্স কথাটি বদলে তার জায়গায় খাজানা বসিয়ে দিলে আমার বক্তব্যের একটা জোরালো সংস্করণ পাবে। ট্যাক্স অবশ্য স্টেট আদায়

করে আর খাজানা জমিদার, অর্থাৎ, প্রথম ক্ষেত্রে সমগ্রজাতি আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ। সুতরাং যে টাকা জাতীয় কার্যে ব্যয় করবার জন্য জাতির পক্ষে আদায় করা পাপকার্য, সেই টাকা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিজের ব্যয়ের জন্য আদায় করা যে কি হিসেবে পুণ্যকার্য, তা বোঝবার মতো সূক্ষ্ম ধর্মজ্ঞান আমার নেই।

আমি জানি এর উত্তরে পার্লির্টিশিয়ানরা কি বলবেন। তাঁরা বলবেন যে, বর্তমান স্টেট তো জাতীয় নয়, ও হচ্ছে বিদেশী গবর্নমেণ্ট, অতএব এ ক্ষেত্রে স্টেটের স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ এক নয়। তথাস্তু। কিন্তু নূতন ট্যাক্সের বিরুদ্ধে চক্রবর্তী সাহেব প্রমুখ জমিদারবর্গের জোরগলায় ঘোর প্রতিবাদের কারণ দর্শানো হয়েছে— রায়তের দারিদ্র্য। রায়ত যদি নতুন ট্যাক্সের চাপ আর তিলমাত্রও সইতে না পারে, তা হলে জমাবৃদ্ধির চাপই যে সে কি করে সইতে পারবে, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। তবে আমি বুঝতে পারি নে ব'লে যে পার্লির্টিশিয়ানরা বুঝতে পারেন না তা অবশ্য হতেই পারে না। সুতরাং জমিদার কর্তৃক হতদরিদ্র প্রজার উপর জমাবৃদ্ধির চাপ দেবার কি-সব পেট্রিয়টিক এবং ন্যাশনলিস্ট ওরফে স্বদেশী ও স্বরাজি যুক্তি আছে, শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে রইলুম।

আপাতত দেখতে পাচ্ছি যে, যেখানে নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগে সেখানে প্রজার স্বার্থের কথা শুনলে আমাদের পার্লির্টিশিয়ানদের পেট্রিয়টিক জ্বর ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়। দেশের যাঁরা ভালো চান, তাঁদের পক্ষে রায়তদের উপরোক্ত দাবি ক'টি প্রসন্নমনে গ্রাহ্য করে নেওয়া কর্তব্য। প্রথমত, এ-ক'টি অধিকারে তারা অধিকারী হলে তাদের দারিদ্র্যের কিঞ্চিৎ লাঘব হবে; দ্বিতীয়ত, তারা তাদের দাসত্ব হতে মুক্তিলাভ করবে। একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার বলে তাদের 'দাস'বুদ্ধি দূর করা যাবে না, সেই শিক্ষার সঙ্গে চাই তাদের অবস্থারও উন্নতি ঘটানো।

পূর্বে যে রাশিয়ান ব্যারিস্টারের উক্তি উদ্ধৃত করে দিয়েছি, তিনিই তাঁর জর্মান অতিথিকে আর যে একটি কথা বলেছিলেন, সেটি এখানে তুলে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না। সে কথা এই—

আমাদের জনসাধারণের মধ্যে সবচেয়ে কিসের বিশেষ অভাব আছে জানেন?— স্বাধিকারের জ্ঞান। মনস্তত্ত্ববিদেরা জানেন যে, স্বত্বের জ্ঞান থেকেই মানুষের অধিকারের জ্ঞান জন্মায়। আপনি বোধ হয় জানেন না যে, এ দেশের কৃষকদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকের জমি তার নিজস্ব সম্পত্তি।

বাংলার প্রজা যদি জমি হস্তান্তর করবার, গাছ কাটবার, কোঠাবাড়ি করবার, কুয়ো খোঁড়বার অধিকার পায়, এবং সেইসঙ্গে তার জোত মৌরসী-মোকররি হয়, তা হলে সে ইংরেজিতে যাকে বলে peasant proprietor তাই হয়ে উঠবে। প্রজা জমির মালিক হয়ে উঠলে জাতির শক্তি ও দেশের ঐশ্বর্য যে কতদূর বেড়ে যায় তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ বর্তমান ফ্রান্স। আর প্রজাকে স্বত্বহীন ও দরিদ্র করে রাখলে তার ফল যে কি হয়, তারও জাজ্বল্যমান উদাহরণ বর্তমান রাশিয়া। যাঁরা বলশেভিজ্মের ভয়ে কাতর তাঁদের অনুরোধ করি যে, তাঁরা বাংলার রায়তকে বাংলার peasant proprietor করবার জন্য তৎপর হোন। যেরকম দিনকাল পড়েছে, তাতে করে মানুষকে আর দাস ও দরিদ্র করে রাখা চলবে না। প্রজাকে এ-সব অধিকার

আমরা যদি আজ দিতে প্রস্তুত না হই তো কাল তারা তা নিতে প্রস্তুত হবে! পৃথিবীর লোকের এখন মাথার ঠিক নেই, তার উপর তাদের ঐহিক সুখের পিপাসা অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে। আবালবৃদ্ধবনিতা আপামরসাধারণ সবাই আজ রাতারাতি বড়োমানুষ হতে চায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

প্রজার এক নম্বর ও দু নম্বর দাবি আমরা যে মুখে অত সহজে মেনে নিই তার কারণ, আমরা জানি কাজে তা পূরণ করতে হবে না; কেননা তা করা এত কঠিন যে, একরকম অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। দেশজোড়া রোগ ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে যে টাকার দরকার, সরকারের তহবিলে তার সিকির সিকিও নেই। এবং এই অতিরিক্ত টাকা যে কোথা থেকে আসবে, তার সন্ধান আমরা আজও পাই নি। আয়বৃদ্ধি না করে অবশ্য ব্যয়বৃদ্ধি করা চলে না, আর সরকারি তহবিলের আমদানির মুখ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চিরদিনের মতো বন্ধ করে রেখেছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, জনসাধারণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মামলাটা এখন মুলতুবি থাকবে। কতদিনের জন্য বলা কঠিন, কেননা আজকের দিনে ও-মামলার তারিখ ফেলতে কেউ রাজি হবেন না। ইতিমধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিধানের যে-সব অকিঞ্চিৎকর ও লোকদেখানো বন্দোবস্ত করা হবে, তাতে করে দেশের লোকের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের কোনোই সুসার হবে না—মধ্যে থেকে কতকগুলো টাকা শুধু জলে ফেলা হবে।

অপর পক্ষে প্রজার অপর দাবিগুলি আমাদের পার্লামেণ্ট বসবামাত্র আমরা একদিনে পূরণ করে দিতে পারি। টেন্যান্সি অ্যাক্টের গুটিকয়েক ধারা বদলালেই কার্য উদ্ধার হয়ে যায়। প্রথমত, এতে কোনো খরচা নেই, দ্বিতীয়ত, ব্যুরোক্রাসি এতে বাদ সাধবে না।

তবে বর্তমান টেন্যান্সি অ্যাক্টের উপর হস্তক্ষেপ করবার প্রস্তাব করলেই অমনি চারি দিক থেকে চিৎকার উঠবে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এমন কথাও শুনতে পাব যে, ও-কার্য করাও যা আর ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করাও তাই। জানই তো, আজকাল ধর্ম শব্দের মানে বদলে গেছে। আগে ধর্ম বলতে লোকে বুঝত সেই বস্তু, যার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক আছে, যার উপরে লোকের পারলৌকিক ভয়-ভরসা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজকাল ধর্মের মানে হয়েছে temporal, অর্থাৎ সাংসারিক ব্যাপার। এতে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই, কেননা যে-কালে পলিটিক্স হয়ে উঠেছে ধর্ম, সে-কালে ধর্ম অবশ্য পলিটিক্স হতে বাধ্য। অতএব এখানে বলা দরকার যে, প্রজার দাবি অনুযায়ী টেন্যান্সি অ্যাক্টের বদল করলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না। কি করা হবে জান?—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কানুনে সরকার প্রজাকে যে কথা দিয়েছিলেন এবং যে কথা আজ পর্যন্ত খেলাপই করা হয়েছে, শুধু সেই কথা রাখা হবে, এর বেশি কিছুই নয়।

আমার এ কথা যে সত্য, তা যিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্মবৃত্তান্ত জানেন তিনিই স্বীকার করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে ইতিবৃত্ত খুব কম

লোকেরই জানা আছে। আমাদের জাতীয়-স্মরণশক্তি এতই কম যে, যে জিনিস ইংরেজের আমলে জন্মগ্রহণ করেছে তাকে আমরা মান্ধাতার আমলের বলে মেনে নিই। অতএব এ স্থলে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিহাসটা বর্ণনা করা আবশ্যক মনে করি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশে ঘোর অরাজকতা ঘটেছিল। সেই অরাজকতার ফলে ইংরেজ এ দেশের রাজা হয়ে বসলেন, এবং সেই অরাজকতার হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে ইংরেজরাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি করলেন। এ আইন হচ্ছে আসলে একটি emergency legislation, যেমন গত-কল্যের ঘী অ্যাক্ট এবং আগামীকল্যের রেন্ট অ্যাক্ট; এরকম আইন অবশ্য মেয়াদিই (temporary) হয়ে থাকে; কিন্তু জমিদারের কপালজোরে এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হয়ে গেল। এরূপ হবার কারণ কতকটা দেশের অবস্থার গুণ, আর কতকটা ইংরেজের বুদ্ধির দোষ।

দেশ যে কতদূর অরাজক হয়ে উঠেছিল, তার সাক্ষী স্বয়ং ভারতচন্দ্র। মোগলে-মারহাট্টায় মিলে বাংলার অবস্থা যে কি করে তুলেছিল, তার বর্ণনা অন্নদামঙ্গলের গ্রন্থসূচনাতেই পাবে। সে বর্ণনার কতক অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

সুজা খাঁ নবাবসুত সরফরাজ খাঁ।
দেয়ান আলমচন্দ্র রায় রায়রাঁয়া॥
ছিল আলিবর্দি খাঁ নবাব পাটনায়।
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়॥
তদবধি আলিবর্দি হইলা নবাব।
মহাবদজঙ্গ দিলা পাতশা খেতাব॥. . .
কটকে হইল আলিবর্দির আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল॥. . .
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুটিয়া পুড়িয়া॥

এই তো গেল মোগলের ব্যবহার। তার পর শোনো মারহাট্টার কীর্তি—

স্বপ্ন দেখি বর্গি রাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত॥. . .
বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি॥
লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥
পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল॥

নবাব বর্গির ভয়ে কোঠে পালিয়ে রইলেন বটে, কিন্তু বেচারা বাঙালির উপর অত্যাচার তাঁর বাড়ল বৈ কমল না। আবার ভারতচন্দ্রের কথা শোনো—

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্মিক লোক ঠেকে গেল দায়॥
নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধশান্তমতি॥
মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায়॥
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ।
সাজোয়াল হইল সুজন সর্বভক্ষ॥
বর্গিতে লুঠিল কত কত বা সুজন।
নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন॥

উপরোক্ত বর্ণনা কাব্য নয়, খাঁটি ইতিহাস। আলিবর্দি খাঁ যে প্রজা-পীড়ন ক'রে টাকা আদায় করেছিলেন, সে বর্গির রাজাকে চৌথ দেবার জন্য। এক দিকে দিল্লির বাদশাকে, আর-এক দিকে বর্গির রাজাকে কর দিতে না পারলে তাঁর নবাবি থাকে না, কাজেই বাংলার প্রজাকে সর্বস্বান্ত করতে তিনি বাধ্য হলেন। এখানে একটি কথার মানে বলে দিই। সাজোয়াল শব্দের অর্থ সেই সরকারি কর্মচারী, যে সরকারের তরফ থেকে খাসে প্রজার কাছ থেকে খাজানা আদায় করে। এই সুজন সাজোয়ালটি যে কে তা জানি নে, কিন্তু সেকালে অমন সুজন দেদার মিলত। এবং এই-সব সুজনের হাত থেকে প্রজাকে রক্ষা করা জমিদারের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার অন্যতম কারণ।

ভারতচন্দ্রের কবিতার এতটা অংশ উদ্ধৃত করে দিতে এই কারণে বাধ্য হলুম যে, অন্নদামঙ্গল আজকাল কেউ পড়ে না, সকলে পড়ে মেঘনাদবধ। বাংলার চেয়ে লঙ্কা একালে আমাদের ঢের বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

১৭৫৬ খৃস্টাব্দে আলিবর্দি খাঁর মৃত্যু হয়। তখন বাংলার তক্তে বসলেন সিরাজউদ্দৌলা। এ'র শাসন যে দেশের লোকের কাছে কতদূর প্রিয় হয়েছিল, তার প্রমাণ বছর না পেরতেই বাংলায় ঘটল রাষ্ট্রবিপ্লব, যে ঘটনায় সিরাজউদ্দৌলা মাতামহের গদি ও পৈত্রিক প্রাণ, দুইই হারালেন। একে আমি রাষ্ট্রবিপ্লব বলছি, কেননা জন কোম্পানির সেকালের কর্তাব্যক্তিরা সকলেই এ ব্যাপারকে রেভলিউশন বলেই উল্লেখ করেছেন। পলাশীর যুদ্ধ জেতবার ফলে কোম্পানি বাহাদুর বাংলার রাজগদি পান নি, পেয়েছিলেন শুধু চব্বিশ-পরগনার জমিদারিস্বত্ব।

১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত মিরজাফরের আমল। এ তিন বৎসর গোলমালে কেটে গেল। ফলে বাংলার অরাজকতা দিনের পর দিন শুধু বেড়েই চলল।

তার পর নবাব হলেন মিরকাশিম। তাঁর নবাবির মেয়াদ ছিল পাঁচ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ধরে তিনি বাংলার প্রজার রক্তশোষণ করলেন। কি উপায়ে তা বলছি। রাজা টোডরমলের সময় বাংলার প্রজার আসল জমা স্থির হয়। এ জমাকে ল্যান্ড ট্যাক্স বলা যেতে পারে। এ জমাবৃদ্ধি কোনো নবাব করেন নি। আসল জমা স্থির রেখে নবাবের পর নবাব শুধু আবওয়াবের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়িয়ে চললেন। এই আবওয়াবকে cess বলা যেতে পারে। মিরকাশিমের হাতে এই আবওয়াব

কিরকম বিপুলায়তন হয়ে উঠেছিল, তার সাক্ষাৎ পাবে ফিফ্‌থ্‌ রিপোর্টএ। মিরকাশিমের আমলের একখানি দাখিলা দেখলে তোমার চক্ষুস্থির হয়ে যাবে।

তার পর ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে দিল্লির বাদশা কোম্পানি বাহাদুরকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করলেন। অর্থাৎ, সর্‌ফরাজ খাঁর আমলে আলমচন্দ্র রায় রায়রাঁয়ার যে পদ ছিল, ১৭৬৫ সালে কোম্পানি বাহাদুর সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তফাতের মধ্যে এই যে আলমচন্দ্র প্রভৃতি বাংলার নবাব কর্তৃক নিযুক্ত হতেন, আর কোম্পানি বাহাদুর দেওয়ান হলেন দিল্লির বাদশার সনন্দের বলে। ফলে কোম্পানি পেলেন বাংলার অর্ধেক রাজত্ব, আর বাকি অর্ধেক রইল নবাব নাজিমের হাতে। একালের ভাষায় বলতে হলে দিল্লির বাদশা ডায়ার্কির সৃষ্টি করলেন।

এ ক্ষেত্রে ফৌজদারি সংক্রান্ত সকল রাজকার্য নবাব নাজিমের হাতে রিজার্ভড সাবজেক্ট-স্বরূপ রয়ে গেল। আর কোম্পানির হাতে যে কি কি বিষয় ট্রান্সফার্ড হয়ে এল, তার সন্ধান নেওয়া দরকার; কেননা এই ট্রান্সফার-সূত্রেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জন্মলাভ করল। বলা বাহুল্য, নবাবের আমলে সবই ছিল অচিরস্থায়ী।

দিল্লির বাদশার ফারমানের বলে কোম্পানি বাংলার প্রজার কর আদায় করবার অধিকার পেলেন, কিন্তু এই কর আদায়ের ভার কোম্পানি নিজ হাতে নিলেন না—নবাবের নিয়োজিত নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর হাতেই রেখে দিলেন।

তার পর ১৭৬৯ খৃস্টাব্দের দুর্ভিক্ষে (বাংলায় যাকে আমরা বলি ছেয়াত্তরের মন্বন্তর) যখন বাংলায় এক-তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করলে, এবং দেশ যখন একটা মহাশ্মশানে পরিণত হল, তখন কোম্পানির বিলেতের ডিরেক্টরদের মাথার টনক নড়ল। তাঁরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে হেস্টিংস সাহেবকে বাংলার গবর্নরপদে নিযুক্ত করে এ দেশে পাঠিয়ে দিলেন—প্রধানত খাজানা আদায়ের একটা সুব্যবস্থা করবার জন্য। প্রচলিত ব্যবস্থা যে সুব্যবস্থা ছিল না, তার প্রমাণ এই দুর্ভিক্ষের বৎসর যত টাকা আদায় হয়, তার পূর্বে কোনো বৎসর তত টাকা হয় নি।

এই দুর্ভিক্ষে দেশের যে কি সর্বনাশ ঘটেছিল তার পরিচয় হাণ্টারের *Annals of Rural Bengal*এ পাবে। এর ভোগ বাঙালি জাতিকে আরো ত্রিশ বৎসর ভুগতে হয়েছিল। এই মন্বন্তরের ধাক্কা বাংলা অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর সামলে উঠতে পারে নি। এই কথাটা মনে রাখলে বুঝতে পারবে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কেন আমি এমার্জেন্সি লেজিস্‌লেশন্‌ বলেছি।

হেস্টিংস সাহেব কলকাতায় এসে বাংলার জমির পাঁচশালা বন্দোবস্ত করলেন। এ বন্দোবস্ত করা হল কিন্তু ডাকসুরত, ইজারাদারের সঙ্গে। জমিদার অ-জমিদার নির্বিচারে সর্বোচ্চ ডাককারীকেই জমির ইজারা দেওয়া হল। বলা বাহুল্য, এই-সব ইজারাদার বাংলার প্রজাকে লুটে নিলে। এই সূত্রে হেস্টিংস সাহেবের সঙ্গে তাঁর কাউন্সিলের ঝগড়া বাধল। কেননা ধরা পড়ে গেল যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ইজারাদারেরা স্বয়ং হেস্টিংস সাহেব এবং অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারীদের বেনামদার বৈ আর কেউ নয়। এই সুযোগে হেস্টিংস সাহেবের পরম শত্রু ফ্রান্সিস সাহেব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং কোম্পানির বিলেতি ডিরেক্টরদের সে

প্রস্তাবে সম্মত করেন। কিন্তু ডিরেক্টর মহোদয়দের এ বিষয়ে যা-হোক-একটা মন স্থির করতে আরো দশ বৎসর কেটে গেল। অতঃপর অনেক বলা-কওয়া অনেক লেখালেখির পর তাঁদের আদেশ-উপদেশমতই ১৭৮৯ খৃস্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত করা হল। এই বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গোড়াপত্তন। অর্থাৎ, যে বৎসর ফ্রান্সের প্রজার peasant proprietorshipএর সূত্রপাত হল, সেই বৎসরই বাংলার প্রজা জমির উপর তার সকল স্বত্ব হারাতে বসল।

এ ক্ষেত্রে চারিটি সমস্যা ওঠে—

১. বন্দোবস্ত কার সঙ্গে করা হবে—প্রজার সঙ্গে, না জমিদারের সঙ্গে?

২. জমিদার বলতে কি বোঝায়—ভূম্যধিকারী, না সরকারের ট্যাক্স-কলেক্টর?

৩. যদি জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়, তা হলে সে বন্দোবস্ত মেয়াদি না মৌরসী করা হবে?

৪. জমিদারকে যদি মৌরসীপাট্টা দেওয়া হয়, তা হলে তার দেয় মাল-খাজনা চিরদিনের মতো নির্ধারিত ও স্থায়ী করে দেওয়া হবে কি না?

এই সমস্যার মীমাংসা করা হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে; এবং তার কারণ এই যে, কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের মতে তা করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না, কেননা কোম্পানির গবর্নমেণ্ট হচ্ছে বিদেশী গবর্নমেণ্ট।

কি-সব তদন্তের পর, কি যুক্তি অনুসারে জমিদারের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা স্থির হল, তার আনুপূর্বিক বিবরণ ফিফ্‌থ্ রিপোর্টএ দেখতে পাবে। এ স্থলে আমি সকল যুক্তিতর্ক বাদ দিয়ে সার জন্ শোর প্রমুখ কোম্পানির প্রধান কর্মচারীরা যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তারই উল্লেখ করছি—

প্রথম। জমি রায়তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা অসম্ভব। এ দেশে জমি-জমার হিসেব এত জটিল যে, ইংরেজ কর্মচারীদের পক্ষে তা আয়ত্ত করা অসম্ভব—বিশেষত তাঁরা যখন বাংলা ভাষা জানেন না। এ ক্ষেত্রে হস্তবুদ তৈরি করবার, খাজানা আদায় করবার, বাকিবকেয়ার হিসাবকিতাব রাখবার ভার দেশী আমলাদেরই হাতে থাকবে। তারা যা খুশি তাই করবে, তহবিল তছরুপ করবে, রাজা প্রজা দুদলকেই ফাঁকি দেবে। এবং ইংরেজ কলেক্টররা তার কোনো প্রতিকার করতে পারবেন না। কারণ এই দেশী তহশিলদারদের কাছ থেকে হিসেব-নিকেশ বুঝে নেবার মতো শিক্ষা ও জ্ঞান ইংরেজ কলেক্টরের নেই। অতএব খাজানা যদি নিয়মমত ও নিয়মিত আদায় করতে হয়, তা হলে জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করাই শ্রেয়।

দ্বিতীয়। জমিদার ভূম্যধিকারী কিংবা ট্যাক্স-কলেক্টর, তা বলা অসম্ভব; কেননা ওনারশিপ বলতে ইংরেজ যা বোঝে, এ দেশের লোকে তা বোঝে না। আমরা সবাই জানি অস্টিন্‌এর ভাষায় স্বত্বের অর্থ হচ্ছে—

A right over a determinate thing indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition, and unlimited in point of duration.

জমির উপর যে তাদের উক্তরূপ স্বত্ব আছে, এ কথা সেকালে কোনো জমিদারও দাবি করেন নি। কেননা তাঁরা জানতেন যে, রায়তকে তাঁরা উচ্ছেদ করতে পারতেন

না, রায়তী জমি খাস করতে পারতেন না, এবং বাংলার নবাব ও দিল্লির বাদশা, এ'দের ভিতর যাঁর খুশি তিনিই যখন-তখন জমিদারের গালে চড় মেরে তাঁর জমিদারি কেড়ে নিতে পারতেন। যেমন জাফর খাঁ ওরফে মুরশিদকুলি খাঁ কিছুদিন পূর্বে বাংলার প্রাচীন ভূম্যধিকারীদের নির্বংশ করে নতুন জমিদারের দল সৃষ্টি করেছিলেন।

এ অবস্থায় কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা স্থির করলেন যে, জমিদারেরা যদি ভূম্যধিকারী নাও হয়, তো আইনত তাঁদের তা হতে হবে। তাঁদের ধারণা ছিল যে, সভ্যদেশে জমিদারের সঙ্গে প্রজার সেই সম্বন্ধ থাকা উচিত, সে যুগে ইংলিশ ল্যান্ডলর্ডদের সঙ্গে আইরিশ টেন্যান্টদের যে সম্বন্ধ ছিল। এ স্থলে সার জন শোর-এর মত উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি—

The most cursory observation shows the situation of things in this country to be *singularly confused.* The relation of a zemindar to government, and of a ryot to a zemindar, is neither that of a proprietor nor of a vassal ; but a compound of both. The former performs acts of authority, unconnected with proprietary right—the latter has rights without real property. Much time will, I fear, elapse before we can establish a system, perfectly consistent in all its parts, and before we can reduce the compound relation of a zemindar to government, and of a ryot be a zemindar to the simple principles of landlord and tenant.[১]

এই উদ্‌ধৃত বাক্য-ক'টির বাংলায় অনুবাদ করবার সাধ্য আমার নেই; কেননা কি বাংলা কি সংস্কৃত, এ দুই ভাষাতে এমন কোনো শব্দ নেই যা ইংরেজি real propertyর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের ভাষায় ও-শব্দ নেই, কেননা আমাদের দেশে ও-আপদ কস্মিন্‌কালেও ছিল না।

শোর সাহেবের কথাই প্রমাণ যে, এ দেশে জমিদারের সঙ্গে রায়তের সম্বন্ধ তার কাছে বড়োই গোলমেলে ঠেকেছিল। কাজেই যা গোল, তাকে তিনি চৌকোশ করবার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি অবশ্য এ পরিবর্তন রয়ে-বসে করতে চেয়েছিলেন: লর্ড কর্নওয়ালিসের কিন্তু আর তর সইল না। তিনি আইনের ঠুকঠাকের বদলে এক ঘায়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসলেন। ফলে বাংলার প্রজা বাংলার জমির উপর তার চিরকেলে স্বত্বস্বামিত্ব সব হারালে, আর রাতারাতি বাংলার জমির নির্ব্যূঢ় স্বত্বাধিকারী জমিদার নামক আর-এক শ্রেণীর লোক জন্মলাভ করলে।

যদি অত তাড়াহুড়ো করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করে বসতেন, তা হলে রায়তের peasant proprietorship নষ্ট হত না। কারণ রাজাপ্রজার যে সম্বন্ধ সেকালের ইংরেজদের বুদ্ধির অগম্য ছিল, কালক্রমে তার মর্ম তাঁরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। আজ প্রায় দেড়শো বৎসর ধরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অভ্যস্ত হয়ে আমাদেরও মনে এই ধারণা জন্মেছে যে. রায়তের আর যাই থাক্, জমির উপর কোনোরূপ মালিকীস্বত্ব নেই, এবং পূর্বেও ছিল না। লোকের এই ভুল ভাঙানো

১ Fifth Report, vol. ii.

দরকার। তাই এ স্থলে ভারতবর্ষের জমিজমার বিষয় একজন বিশেষজ্ঞ ইংরেজের কথা নিম্নে উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি—

It is well-known that in the only place where the 'Laws of Manu' allude to a right in land, the title is an individual one, and is attributed to the natural source—still so universally acknowledged throughout India—that a man was the first to remove the stumps and prepare the land for the plough. At the same time we see, from very early times, how the grain-produce of every allotment is not all taken by the owner of the land, but part of it is taken by the owner of the land, and part of it is by custom assigned to this or that recipient. It is not, observe, that the land allotment itself is not completely separated, but when the crop is reaped, the owner (as we may call him) at once recognised that, out of his grain-heap at the threshing-floor, not only the great Chief or Raja, and his immediate headman, but a variety of other villagers have customary rights to certain shares—if it is only sometimes a few double-handfuls or other small measure. All this seems to spring from the sense of co-operation (however indirect) in the work of settlement that made the holding possible. It seems to me quite clear that a sense of individual 'property' may arise coincidently with a sense of a certain right in others to have a share of the produce (on the ground of co-operation) and the two are not felt to conflict.[১]

কষ্ট করে এর বাংলা করবার কোনোই প্রয়োজন নেই। কেননা বিলেতি আইন চর্চা ক'রে যাঁদের মন ও মত সার জন শোর-এর অনুরূপ হয়ে উঠেছে, সে আইনের নজির যাঁদের নজরবন্দী করেছে, তাঁদের দৃষ্টির জন্যই ব্যাডেন পাওয়েল সাহেবের মন্তব্য এখানে উদ্‌ধৃত করা গেল। আশা করি এতে তাঁদের চোখ ফুটবে।

যে চষে, জমি তার। এবং সে জমির উৎপন্ন ফসলে প্রথম রাজার তার পর আর-পাঁচজনের, যথা, গ্রামের মণ্ডল ধোপা নাপিত কুমোর কামার প্রভৃতিরও ভাগ বসাবার অধিকার আছে। এই হচ্ছে ব্যাডেন পাওয়েল সাহেবের মোদ্দা কথা। আর এই ছিল ভারতবর্ষের সনাতন প্রথা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপর কারণ রাজনৈতিক। ইংরেজরাজ যখন বিদেশীরাজ, তখন দেশে এমন-একটি দলের সৃষ্টি করা আবশ্যক, যাদের স্বার্থ ইংরেজরাজের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। যেহেতু আপদোবিপদে এই দল ইংরেজরাজের পক্ষ অবলম্বন করবে।

তৃতীয়। জমিদারকে যখন জমির মালিক সাব্যস্ত করা হল, বলা বাহুল্য, তখন

[১] Baden Powel, *Village Community*, pp. 130-31.

সে মালিকীস্বত্ব চিরস্থায়ী বলে স্বীকৃত হল। যে স্বত্ব unlimited in point of duration নয়, সে স্বত্ব ইংরেজের মতে আইনত মালিকীস্বত্ব হতেই পারে না।

চতুর্থ। তার পর জমিদারের দেয় রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের মতো ধার্য করে দেবার প্রস্তাব ফ্রান্সিস সাহেব প্রথমে উত্থাপন করেন। তাঁর কথা এই যে, কোম্পানি বাহাদুর বাংলা থেকে যে রাজস্ব আদায় করবার অধিকারী, তা—not a tribute imposed on a conquered people, but its land revenue.

মনে রেখো যে, এ সময়ে জন কোম্পানি রাজা হিসেবে নয়, দিল্লির বাদশার দেওয়ান হিসেবেই ভূমিকর আদায় করবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ অবস্থায় আদায়ী সেরেস্তার ব্যয়সংকুলান করবার জন্য যে-পরিমাণ টাকা আদায় করা আবশ্যক, তার অতিরিক্ত টাকা আদায় করা ফ্রান্সিস সাহেবের মতে যুগপৎ অন্যায় ও অসংগত। তাঁর নিজের কথা এই—

The whole demand upon the country, to commence from April 1777, should be founded on an estimate of the permanent services, which the government must indispensably provide for ; with an allowance of a reasonable reserve for contingencies. . .I know not for what just or useful purpose any government can demand more from its subjects ; for unless expenses are collected for the express purpose of absorbing the surplus, it must be dead in the treasury, or be embezzled. Having ascertained the amount the government needed to raise by land revenue, the contribution of the districts should be settled accordingly and 'fixed for ever'.[১]

সংক্ষেপে ফ্রান্সিস সাহেবের মতে গবর্নমেণ্টের পক্ষে যত্র ব্যয় তত্র আয় হওয়া প্রয়োজন। অতএব দেশের শাসনসংরক্ষণ করবার জন্য, সম্ভাবিত ব্যয়-আয়ের একটা বজেট তৈরি করে আবহমানকালের জন্য সেই বজেটই কায়েম রাখা দরকার। এই মতানুসারে বাংলার রাজস্বও চিরস্থায়ী করা হল। উপরোক্ত সব কারণে ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হল। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা ঠিক। এ দেশের জলবায়ুর গুণে সব জিনিসই চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও প্রজাস্বত্ব

এখন দেখা যাক এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির উপর প্রজার স্বত্ব আরো পাকা হল কিংবা একদম কেঁচে গেল।

প্রজার যে ভিটে ও মাটি দুয়েরই উপর কিছু কিছু স্বত্ব ছিল, সে সত্য সার্ জন শোর প্রভৃতি সকলেই আবিষ্কার করেছিলেন। এবং সেই আবিষ্কারের ফলেই-না তাঁদের মনে অতটা ধোঁকা লেগেছিল। একই জমির উপর জমিদার ও রায়ত উভয়েরই যে একযোগে স্বত্বস্বামিত্ব কি করে থাকতে পারে, এ ব্যাপার তাঁদের

[১] Fifth Report, vol. i.

ধারণার বহির্ভূত ছিল। কেননা, কি রোমান ল, কি বিলাতের কমন ল, ও-দুয়ের কোনোটির সঙ্গেই এ ব্যাপার মেলে না। ফলে, যে সম্বন্ধ ছিল মিশ্র, তাকে তাঁরা করতে চাইলেন শুদ্ধ। ভারতবর্ষের মাটির এমনি গুণ যে, সে মাটি যে মাড়ায় সে-ই শুদ্ধবাতিকগ্রস্ত হয়ে ওঠে। ফলে এ দেশের প্রাকৃত প্রথা তাঁরা সংস্কৃত করতে প্রবৃত্ত হলেন।

প্রজা এখনো যেমন, তখনো তেমনি, প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল— খোদকস্ত আর পাইকস্ত। যে প্রজার বাস্তু ও ক্ষেত্র দুই এক গ্রামস্থ, তার নাম খোদকস্ত প্রজা; আর ভিন্ন গ্রামের লোক যে ক্ষেত্রে ঠিকে বন্দোবস্তে সুরত্ত জমি চাষ করে, তার নাম পাইকস্ত। বলা বাহুল্য যে, প্রজাস্বত্ব শুধু খোদকস্ত-প্রজারই ছিল, কেননা পাইকস্ত-প্রজার উপর জমিদারের যেমন কোনোরূপ স্বামিত্ব ছিল না, জমির উপর তারও তেমনি কোনোরূপ স্বত্ব ছিল না।

সেকালের প্রজাস্বত্বের মোটামুটি ফর্দ এই—

১. প্রজাকে উচ্ছেদ করবার অধিকার জমিদারের ছিল না, অর্থাৎ তার জোত ছিল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট।

২. সে জোত পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করবার অধিকার খোদকস্ত-রায়ত-মাত্রেরই ছিল। আর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করবার স্বত্ব যে মালিকীস্বত্ব, এ বিষয়ে প্রিভি কাউন্সিলের নজির আছে। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, জোত হস্তান্তর করবার অধিকার প্রজামাত্রেরই ছিল। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, সেকালে জমি হস্তান্তর করবার সুযোগ ও প্রয়োজন, এ দুয়েরই বিশেষ অভাব ছিল। প্রজার তুলনায় জমির পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, জমিদারেরা নামমাত্র নিরিখে পাইকস্ত-প্রজাকে দিয়ে জমি চাষ করাতেন।

৩. জমাবৃদ্ধি করবার অধিকার জমিদারের ছিল না। এর একটি প্রমাণ এই যে, বাংলার কোনো নবাবই আসল জমা কখনো বাড়ান নি। আসল জমা স্থির রেখে আবওয়াব বাড়ানোই ছিল তাঁদের মামুলি দস্তুর। রাজার প্রাপ্য ছিল প্রজার উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ মাত্র, সে অংশের হ্রাসবৃদ্ধি করবার অধিকার চিরাগত প্রথা অনুসারে রাজারও ছিল না।

খালি বাংলার প্রজা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রজা এই-সকল স্বত্বে স্বত্ববান্ ছিল। প্রমাণস্বরূপ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের 'পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি' নামক প্রবন্ধ থেকে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

মারাঠী পল্লীর চাষীদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়— মিরাসদার বা মিরাসী [খোদকস্ত] ও উপরি [পাইকস্ত]। মিরাসীরা গ্রামেরই লোক, গ্রামের জমি চাষ করিত। সে জমিতে তাহাদের একটি স্থায়ী স্বত্ব থাকিত। খাজানা বাকি না ফেলিলে কাহারও অধিকার ছিল না যে, তাহাদের জমি কাড়িয়া লয়। বাকি খাজানার দায়ে জমি হস্তান্তর হইলেও কিন্তু তাহাতে মিরাসীর স্বত্ব একেবারে লুপ্ত হইত না। ত্রিশ-চল্লিশ এমন-কি, ষাট বৎসর পরেও বাকি রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারিলেই, মিরাসী তাহার জমি ফিরিয়া পাইত।...মিরাসীরা গ্রামপ্রতিষ্ঠাতাদিগেরই বংশধর। মনুর বিধান অনুসারে তাহাদের পূর্বপুরুষেরাই গ্রাম্য জমির মালিকীস্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য সরকারের বার্ষিক

কর প্রত্যেক গ্রাম্যসমিতির প্রধান ও প্রথম দেয়। এই করের হার সরকারের কর্মচারীগণ 'পাটীলে'র [মণ্ডল] সঙ্গে একত্র হইয়া গ্রামের জমি ও চাষের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া স্থির করিতেন।[১]

এক কথায় সেকালে জমির অধিকারী ছিল প্রজা, আর তার উপস্বত্বের আংশিক অধিকারী ছিলেন রাজা। জমিদার এ রাজস্বেরই এক অংশ পেতেন, তিনি ছিলেন ইংরেজিতে যাকে বলে ট্যাক্স-কলেক্টর, অর্থাৎ জমিদার মাইনের বদলে আদায়ের উপর কমিশন পেতেন, আজও যেমন অনেক জমিদারিতে তহশিলদারেরা পেয়ে থাকে। তফাতের মধ্যে এইটুকু যে, একালে তহশিলদারেরা শতকরা পাঁচটাকা হারে কমিশন পায়, সেকালে জমিদারেরা দশটাকা হারে পেতেন।

জন কোম্পানি কিন্তু এ দেশের জমিদার-রায়তের মিশ্রসম্বন্ধকে শুদ্ধ করলেন, এই সম্বন্ধ উলটে ফেলে; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদে জমিদার হলেন বাংলার মাটির স্বত্বাধিকারী, আর প্রজা হল তার উপস্বত্বের আংশিক অধিকারী।

কিন্তু এ পরিবর্তন কোম্পানির বড়োকর্তারা স্বেচ্ছায় করলেও স্বচ্ছন্দচিত্তে করেন নি। এ ভয় তাঁদেরও হয়েছিল যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বলে জমিদার প্রজার ভক্ষক না হয়ে ওঠেন। অতএব সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের রক্ষার ব্যবস্থাও যে করা কর্তব্য, সে বিষয়ে তাঁরা প্রায় সকলেই একমত ছিলেন। এখানে আমি শুধু দুটি লোকের মত উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি, প্রথম ফ্রান্সিস সাহেবের, তার পর লর্ড কর্ন-ওয়ালিসের; কারণ এঁদের একজন হচ্ছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জনক, আর-একজন তার জননী—

Mr. Francis proposed that it should be made an indispensable condition with the zemindar, that in the course of a stated time, he shall grant new pottahs to his tenants, either on the same footing with his own quit rents, that is as long as the zemindar's quit rent remains the same, or for a term of years, as they may agree.

ফ্রান্সিস সাহেবের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে শোর সাহেবের মন্তব্য হচ্ছে এই—

The former is the custom of the country, this will become a new *assil jumma* for each ryot, and ought to be as sacred as the zemindar's quit rent.[২]

এখন লর্ড কর্নওয়ালিসের কথা শোনা যাক—

Unless we suppose the ryots to be absolute slaves of zemindars, every *begha* of land possessed by them must have been cultivated under an expressed or implied agreement, that a certain sum should be paid for each *begha* of produce and no more.[২]

[১] ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩২৬

[২] Fifth Report, vol. ii.

সুতরাং দেখা গেল যে, প্রজা আজ যে-সকল স্বত্বের দাবি করছে, সে-সকল স্বত্ব প্রজার যে মান্ধাতার আমল থেকে ছিল, এ সত্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্মদাতারাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এবং শুধু স্বীকার করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, প্রজার ঐ-সব মামুলি স্বত্ব যে তাঁরা আইনত রক্ষা করবেন, এ প্রতিজ্ঞাও তাঁরা উক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই লিপিবদ্ধ করেছেন—

It being the duty of the ruling power to protect all classes of people, and more particularly those who from their situation are most helpless, the Governor-General in Council will, whenever he may deem it proper, enact such regulations as he may think necessary for the protection and welfare of the dependant taluqdars, ryots and other cultivators of the soil.[১]

দুঃখের বিষয় এই যে, এ প্রতিজ্ঞা ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি মোটেই পালন করেন নি; যদিচ রাজা রামমোহন রায় ১৮৩২ খৃস্টাব্দে পার্লামেণ্টারি কমিটিকে কোম্পানি বাহাদুরের এই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

কোম্পানির আমল শেষ হয়ে যখন মহারানীর আমল শুরু হল, তখন উক্ত আইনের ৮ ধারার আশ্রয়ে ১৮৫৯ খৃস্টাব্দের দশ-আইন পাশ করা হল। এই হচ্ছে টেন্যান্সি অ্যাক্টের প্রথম সংস্করণ। এই আইন অবশ্য ক্রমে ক্রমে অনেক পরিমাণে সংস্কৃত ও পরিবর্ধিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও এ আইনের প্রসাদে যে শুধু মামলা বেড়েছে তার কারণ ইংরেজিতে যাকে বলে half measures, অর্থাৎ আধাখেঁচড়া ব্যবস্থা, যার ফলে শুধু নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি হয়।

আজকের দিনে প্রজার সকল দাবি আইনত গ্রাহ্য হলে প্রজা যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই; এবং জমিদারবর্গের নিকট আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন এ বিষয়ে প্রজার স্বার্থের হন্তারক না হন। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, আজকের দিনে কেউ তা বলতে পারে না। তবে এ কথা ভরসা করে বলা যায় যে, গত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় সকল সমাজের, কি আর্থিক কি রাজনৈতিক, সকল ব্যবস্থারই গোড়া আলগা হয়ে গেছে; সুতরাং আমরা যদি আগে থাকতেই সমাজের নতুন ঘর বাঁধতে শুরু না করি, তা হলে দুদিন বাদে হয়তো দেখতে পাব যে আমাদের মাথা লুকোবার আর স্থান নেই, আমরা সব রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। বহুকাল পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারদের সম্বোধন করে বলেছিলেন—

তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার কোন গুণে নহে; অন্য যে নীচকুলে জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষে নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না; মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই—তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, দোর্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ, এবং তাঁহার ভ্রাতা।[২]

[১] cl. I. s. 8, Reg. I of 1793.

[২] সাম্য। ১৮৭৯

তিনি আরো বলেন—

এক্ষণে এসকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্য এবং মূর্খের নিকট হাস্যের কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ বিধি পৃথিবীর সর্বত্র চলিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ বিধির কথা বলেছিলেন জান?—ইংরেজিতে যাকে বলে কম্যুনাল প্রপার্টি। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, ইতিমধ্যে আমরা যদি বাংলার প্রজাকে peasant proprietor না করে তুলি তা হলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যদ্‌বাণী সার্থক হতে আর বড়ো বেশিদিন লাগবে না। আশা করি এ প্রবন্ধ পড়ে কেউ মনে করবেন না যে, আমি সাম্প্রদায়িক বিবাদের সূত্রপাত করেছি। সাম্প্রদায়িক বিরোধ হতে বাঙালি সমাজকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে রায়তের সঙ্গে জমিদারের কো-অপারেশনএর প্রয়োজন আছে, বিশেষত যখন বাংলার বেশির ভাগ জমিদার হিন্দু, আর বেশির ভাগ রায়ত মুসলমান। এই হচ্ছে এ প্রবন্ধের সার কথা।

ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৬

বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌

জনৈক বন্ধুকে লিখিত

আজ বিজয়া। এই শুভদিনের শুভকামনা জানিয়ে এই পত্র আরম্ভ করছি। আজকের দিনে আত্মীয়স্বজনের বন্ধুবান্ধবের শুভকামনা করাটা আমাদের মধ্যে অবশ্য একটা সামাজিক প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন ইংলণ্ডে নূতন বৎসরের প্রথম দিনে পাঁচজনকে অন্তরের শুভকামনা জানানোটা হচ্ছে সে দেশের ভদ্রসমাজের একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়ম, তেমনি এ দেশেও পাঁচজনকে বিজয়ার হয় প্রণাম নয় আশীর্বাদ জানানো সর্বসাধারণের মধ্যে একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়ম।

তবে এ উভয় প্রথা মামুলি হলেও এ দুয়ের ভিতর একটু প্রভেদ আছে। বিজয়ার সঙ্গে আমাদের ধর্মের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, পয়লা জানুয়ারির সঙ্গে খৃস্টধর্মের কোনোরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধ আছে বলে তো জানি নে; যদি থাকে তো সে এত দূরসম্পর্ক যে, তা না থাকারই শামিল। ফলে এই বিজয়ার দিনে আমরা পরস্পরের যে শুভকামনা করি তার ভিতর শুধু ভদ্রতা নয়, আন্তরিকতাও থাকে।

আমি এ কথা স্বীকার করতে মোটেই কুণ্ঠিত নই যে, আমার পক্ষে এ দিন তিনশো পঁয়ষট্টির ভিতর একটা দিন নয়, কিন্তু তিনশো চৌষট্টি ছাড়া আর-একটা দিন; অর্থাৎ এ দিনে অকারণে মনের ভিতর আশা ও আনন্দ যেমন সজাগ হয়ে ওঠে, বৎসরের অপর কোনো দিনে সকারণেও ঠিক তেমনটি হয় না। এই একটি মাত্র দিনেই আমরা বাঙালিরা বিশেষ ক'রে নিজের অন্তরে একটা জাতীয় আনন্দের আস্বাদ পাই।

এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ভুলে যেয়ো না যে আমি একে বাঙালি, তার উপর আবার শাক্ত ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি। বালককাল হতে সাবালক হওয়া পর্যন্ত বছরের পর বছর দুর্গোৎসবই ছিল আমার কাছে বৎসরের সব-চাইতে বড়ো উৎসব। ধূপ দীপ শঙ্খ ঘণ্টা পুষ্প চন্দন অর্ঘ্য নৈবেদ্য এই-সকলের বর্ণ গন্ধ ও শব্দের সংস্রবে শৈশবে বাল্যে ও কৈশোরে আমার সকল ইন্দ্রিয় যুগপৎ তুষ্ট ও পুষ্ট হয়েছে। এর থেকে মনে ভেবো না যে দুর্গোৎসবের সঙ্গে আমার শুধু ইন্দ্রিয়েরই সম্পর্ক ছিল, মনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। প্রথমত, ইন্দ্রিয়ের রাজ্য কোথায় শেষ হয় আর মনের রাজ্য কোথায় আরম্ভ হয় তার পাকা সীমানা আজও কেউ নির্ধারণ ক'রে দিতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত, ভক্তি জিনিসটে হচ্ছে সংক্রামক, বিশেষত অর্বাচীনের মনের পক্ষে। সুতরাং তুমি ধরে নিতে পার যে, দুর্গাপ্রতিমার প্রতি আমার মনেরও ভক্তি ছিল। ভক্তি যে ছিল তার প্রমাণ আমি আরতির সময় মাটির প্রতিমার মুখে হাসি দেখেছি। হাসি কথাটা বোধ হয় ঠিক হল না, সেকালের প্রতিমার মুখের যে ভাব আমাদের চোখে পড়ত সে ভাব হচ্ছে প্রসন্ন-করুণ।

দেবগণ কর্তৃক দেবীর স্তবের একটি শ্লোক উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি—

কেনোপমা ভবতি তেঽস্য পরাক্রমস্য,
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্যাতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি॥

আমরা দেবীর দৃষ্টিতে যার সাক্ষাৎপরিচয় পেয়েছি সে 'সমরনিষ্ঠুরতা'র নয়, চিত্তকৃপার।

আমার এ কথা শুনে তুমি যা উত্তর দেবে তা জানি। তুমি বলবে, ও-সব হচ্ছে illusion আর delusion। অবশ্য তাই। কিন্তু এ সত্যটিও মনে রেখো যে illusion আর delusion থেকে আমরা কেউ মুক্ত নই। সারা জীবন এই দুটিকে নিয়েই আমরা ঘর করি, একরকম delusionএর হাত থেকে মুক্তিলাভ করে আর-এক-রকম delusionএর বশীভূত হই। এক ঠাকুরকে বিসর্জন দিয়ে আর-এক ঠাকুরের পুজো করতে শুরু করি। তা ছাড়া যে-সকল ভুলবিশ্বাস আমাদের মন থেকে চলে যায়, মনের উপর সে-সকল তাদের ছায়া আলো দুই রেখে যায়, স্মৃতি আজীবন তার জের টেনে চলে। আমরা যাকে মন বলি তার ভিতর কাটা-ছাঁটা হীরকখণ্ডের মতো নিরেট কঠিন জ্বলজ্বলে সত্য খুব অল্পই আছে, তার বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে বসে আছে যত অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট ভাব। আর আমাদের মতামত কার্যকলাপের উপর এই-সকল অস্পষ্ট মনোভাবের প্রভাব বড়ো কম নয় এবং সে প্রভাবকে দূর করা কঠিন, কারণ তা অলক্ষিত। আমার এ-সব কথা শুনে ভয় পেয়ো না যে আমি আবার কেঁচে পৌত্তলিক হতে যাচ্ছি। আমার চিরজীবনের শিক্ষা সে ফেরবার পথে কাঁটা দিয়েছে। ইতিমধ্যে আমার মন তিন বিদেশের—ইংলন্ড ফ্রান্স ও ইতালির—বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের হাতে ধোলাই হয়েছে। তা ছাড়া আমাদের মনের পক্ষে কালাপানি পার হবারও কোনোই দরকার নেই, স্বদেশের মনোজগতে কিঞ্চিৎ পিছু হটলেই এমন জায়গায় পৌঁছনো যায়, যেখানে যাবামাত্র আমাদের প্রতিমাভক্তি উড়ে যায়। 'ন প্রতিকে ন হিংস' এ সূত্র তো বেদান্তেই আছে। আর বলা বাহুল্য যে, এ যুগে আমরা সবাই বৈদান্তিক, অর্থাৎ আমরা ধর্ম মানি, কিন্তু কোনো ধর্মই মানি নে।

আমার মনের কথা তোমাকে এতটা খুলে বলবার উদ্দেশ্য এই সত্যটা স্পষ্ট করা যে, আমার পুঁথিপড়া মন সংস্কৃত-বিলেতি হলেও তার নীচে যে মন আছে তা মূলত বাঙালি। বাঙালি হিন্দুর মনের ধর্মের পরিচয় নিতে হলে বাঙালির চিরাগত ধর্মের পরিচয় নিতে হয়। তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, বাংলা ছাড়া ভারত-বর্ষের আর কোথাও দুর্গোৎসব জাতীয়-উৎসব নয়। এ বিষয়ে আমার শেষ কথা এই যে, আমাদের পারিবারিক ও সেইসঙ্গে আমাদের সামাজিক ধর্ম আমাদের মনের ঘরে যে রূপ রস গন্ধ ও তেজ সঞ্চিত রেখে গিয়েছে তার জন্য আমি মোটেই দুঃখিত নই। ষোড়শোপচারে এই মূর্তিপুজার প্রসাদেই বাঙালিজাতির মনের poetic এবং aesthetic অংশ গড়ে উঠেছে। কোনো ধর্মবিশ্বাস মানুষের মন থেকে চলে গেলেও তার রূপটুকু তার সৌরভটুকু সেখানে রেখে যায়। এটা কখনো লক্ষ্য করেছ যে, দর্শন-বিজ্ঞানের আক্রমণে ধর্ম কখনো মারা যায় না, হয় শুধু রূপান্তরিত? কোনো বিশেষ ধর্মমতকে যখন আর সত্য বলে বিশ্বাস করা চলে না, তখন বৈষয়িক লোকের

কাছে তা শিব ব'লে গ্রাহ্য হয়, আর অবৈষয়িক লোকের কাছে সুন্দর ব'লে। রবীন্দ্রনাথ পৌত্তলিক ধর্মের আবহাওয়ায় মানুষ হন নি, অথচ তাঁর কবিতা আদ্যোপান্ত ধূপবাসিত, দীপালোকিত, পুষ্পচন্দনে সুরভিত, শঙ্খঘণ্টায় মুখরিত। এই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, যার পারিবারিক ধর্ম যাই হোক-না কেন, বাঙালির জাতীয়-পূজার প্রভাব বাঙালির সৌন্দর্যজ্ঞানকে পরিচ্ছিন্ন করেছে, বাঙালির হৃদয়বৃত্তিকে পরিপুষ্ট করেছে।

তুমি মনে ভাবতে পার যে, আমি এ উৎসবের একটি কলঙ্কের কথা, বলিদানের কথা চেপে গিয়েছি। ধর্মের নামে পশুহত্যা আমরা ছাড়া ভারতবর্ষের অপর কোনো সভ্যজাতি করে না। আর এ হত্যা যে যেমন অনর্থক তেমনি বর্বর, আজকের দিনে কোনো শিক্ষিত বাঙালি তা স্বীকার করতে তিলমাত্র দ্বিধা করবেন না। নিরীহ ছাগশিশুকে হাড়কাঠে ফেলে বলি দিয়ে যাঁরা মনে করেন যে তাঁরা 'সমরনিষ্ঠুরতা'র অভিনয় করছেন, তাঁদের পৌরুষের বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছে যায়। তাঁদের বীরত্ব প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে পলিটিক্সের বাক্‌যুদ্ধ। হত্যাকে ধর্ম বলতে আমরা অবশ্য কেউ প্রস্তুত নই। তবে সত্যের খাতিরে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, যারা বৈদিক তান্ত্রিক সমাজে মানুষ হয়েছে সে-সকল বাঙালির পক্ষে জবাফুল চক্ষুশূল নয়, আর রক্তচন্দনের ফোঁটায় তাদের কপালও চড়চড় করে না। এ জ্ঞান তাদের আছে যে, মানুষের জীবনরাগিণীতে কড়ি ও কোমল দুইরকম সুরই সমান লাগে। এই রাজসিক পূজা আমাদের মনকে সকলপ্রকার রাজসিক ধর্মের প্রতি অনুকূল করেছে। তা সে ধর্ম সাহিত্যেরই হোক, আর সমাজেরই হোক। এই লম্বা বক্তৃতার উদ্দেশ্য তোমাকে বোঝানো যে, আমার ঐ বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ শূন্যগর্ভ নয় ; অস্পষ্ট আশার স্পর্শে তা মুকুলিত, অহৈতুকী আনন্দের বর্ণে তা রঞ্জিত।

এই সূত্রে এই সুযোগে আমি তোমার কাছে আমার সাহিত্যিক ঋণ পরিশোধ করতে চাই। তোমার কাছে আমার বকেয়া কৈফিয়তটি আজ সুদসুদ্ধ শুধে দেবার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছি। অমৃতশহর কন্‌গ্রেসের পিঠ-পিঠ তুমি আমাকে যে চিঠি লেখ, তার উত্তর আমি দিই নি ; কেননা উত্তর যে কি দেব তা তখন ভেবে পাই নি। তুমি আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আন যে, আমার অন্তরে যা আছে সে হচ্ছে বাঙালিপেট্রিয়টিজ্‌ম্‌। এ অভিযোগে আমি কবুল জবাব দিতে বাধ্য। বাঙালিপেট্রিয়টিজ্‌ম্‌কে মনে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়াটা বাঙালির পক্ষে যদি দোষের হয় তা হলে সে দোষে আমি চিরদিনই দোষী আছি। আমার গত আট বৎসরের লেখার ভিতর এ অপরাধের এত প্রমাণ আছে যে, সে-সকল একত্র সংগ্রহ করলে একখানি নাতিহ্রস্ব পুস্তিকা হয়ে ওঠে।

তবে জিজ্ঞাসা করি, একজন বাংলা-লেখকের কাছ থেকে তুমি আর কোন্‌ পেট্রিয়টিজ্‌মের প্রত্যাশা কর। আমি যে ইংরেজি লিখি নে তার থেকেই বোঝা

উচিত যে অ-বঙ্গ পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ আমার মনের উপর একাধিপত্য করে না। যে ভাষা ভারতবর্ষের কোনো দেশেরই ভাষা নয়, সেই ভাষাকে সমগ্র ভারতবর্ষের ভাষা গণ্য ক'রে সেই ভাষাতে পেট্রিয়টিক বক্তৃতা করতে হলে আমি সেই পেট্রিয়টিজ্‌মের বাহানা করতে বাধ্য হতুম যে, দেশপ্রীতি ভারতবর্ষের কোনো দেশের প্রতি ভালোবাসা নয়, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতি। মুখস্থ ভাষায় শুধু মুখস্থ ভাবই প্রকাশ করা যায়। তার প্রমাণ আমাদের কনফারেন্স কন্‌গ্রেসে নিত্যই পাওয়া যায়, দেশের যত মুখস্থবাগীশ ও-সকল সভার তাঁরাই হচ্ছেন যুগপৎ নায়ক ও গায়ক। সে যাই হোক, কোনোরূপ ভালোবাসার কৈফিয়ত চাওয়াও যেমন অন্যায় দেওয়াও তেমনি শক্ত, তা সে অনুরাগের পাত্র ব্যক্তিবিশেষই হোক, জাতিবিশেষই হোক। এ ক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে, আমরা যাকে স্বদেশপ্রীতি বলি আসলে তা স্বজাতিপ্রীতি। দেশকে ভালোবাসার অর্থ দেশবাসীকে ভালোবাসা—কেননা মানুষে শুধু মানুষকেই ভালোবাসে। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি মানুষকে নয় মাটিকে ভালোবাসেন, তা হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে তিনি মানুষ নন—জড়পদার্থ; কেননা জড়ের প্রতি জড়ের যে একটা নৈসর্গিক ও অন্ধ আকর্ষণ আছে, এ সত্য বিজ্ঞানে আবিষ্কার করেছে।

যাক ও-সব অবান্তর কথা। আসল কথা এই যে, স্বজাতিপ্রীতির কৈফিয়ত কারো কাছে চাওয়া অন্যায়, কারণ ও হচ্ছে মনের একটা দুর্বলতা। স্বজনবাৎসল্যরূপ ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য যখন অর্জুনেরও ছিল, তখন আমাদের মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তিদেরও যে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি। আর বাঙালি বাঙালি-মাত্রেরই স্বজন, তার কারণ ভাষার যোগ হচ্ছে মানস-কায়ে রক্তের যোগ। সুতরাং বাঙালিদের পরস্পরের প্রতি নাড়ির টান থাকাই স্বাভাবিক, না থাকাটাই অদ্ভুত।

তার পর এ প্রীতির পুরো কৈফিয়ত দেওয়া শক্ত, কেননা তার মূল আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ নয়। ছেলেবেলায় গুরুমহাশয়েরা আমাদের একটা ভারি শক্ত অঙ্ক কষতে দিতেন, যা আমরা সকলে কষে উঠতে পারতুম না। সে অঙ্ক হচ্ছে এই—

আছিল দেউল এক পর্বতপ্রমাণ
তেহাই সলিলে তার...

তার পর কি আছে ঠিক মনে পড়ছে না। কবিতা আমার কণ্ঠস্থ থাকে না। তবে এটুকু মনে আছে যে, সে মন্দিরের মাটির ভিতর কতটা পোঁতা আছে আঁক কষে তাই আমাদের বার করতে হত। এখন আমার কথা এই যে, মানুষের মন পর্বত-প্রমাণই হোক, আর বল্মীকপ্রমাণই হোক, তার সমস্তটা জেগে নেই। তার অনেকটা স্বজাতির মনের জমির নীচে পোঁতা আছে, আর অনেকটা নিজের অন্তরে তরল ভাবে ডুবে আছে; যেটুকু জেগে আছে সেইটুকু আমরা নিজে দেখতে পাই, অপরকেও দেখাতে পারি; কিন্তু সেই আংশিক মন দিয়ে আমাদের সমগ্র মনের পুরো পরিচয় আমরা দিতে পারি নে। সুতরাং আমাদের রাগদ্বেষের সঠিক কারণ আমরা সব সময়ে নিজেও জানি নে, অতএব পরকেও জানাতে পারি নে। এ ক্ষেত্রে নিজের কোট বজায় রাখবার জন্য মানুষে যে-সব তর্কযুক্তি দেখায় সে-সব ষোলো-আনা গ্রাহ্য নয়। কেননা যুক্তিতর্কের দোষ এই যে, তার দ্বারা আমরা অপরকে প্রবঞ্চিত করতে না চাইলেও অনেক সময় নিজেকে প্রবঞ্চিত করি। কে না জানে যে পৃথিবীতে

যে-সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বড়ো বড়ো কথার সৃষ্টি হয়েছে সে-সকল অধিকাংশ লোকের শুধু আত্মপ্রবঞ্চনার কাজেই লাগে। আমি একজন মহাধার্মিক, উপরন্তু মহাপেট্রিয়ট, এ কথা মনে ক'রে কে না আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

এতক্ষণে বুঝতে পারছ যে, আমি আমার বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ সমর্থন করে তোমার কাছে কোনো লিখিত জবাব কেন দাখিল করি নি। তা করলে নিজের না হোক, নিজের জাতের জাঁক আমাকে নিশ্চয়ই করতে হত।

কিন্তু সেদিন তোমার মুখে যা শুনলুম তাতে ক'রে আমার এই মৌনতার জন্য অনুতাপ করছি। সবুজ পত্রে তোমার অনুরোধ মতো আমার কৈফিয়ত-সহ তোমার পত্র প্রকাশ না করার দরুন সে পত্র তুমি হিন্দিতে অনুবাদ ক'রে মহাত্মা গান্ধীর কাগজে প্রকাশ করেছ। যদি জানতুম, 'রাজেন্দ্রসংগমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে' সেই ভাবে আমার কৈফিয়ত তোমার পত্রের অনুচর হয়ে মহাত্মা গান্ধীর কাগজে প্রবেশলাভ করবে, তা হলে আমার মরচে-পড়া ওকালতি বুদ্ধি মেজে-ঘষে তার সাহায্যে এমন-একটি বর্ণনাপত্র তৈরি করে দিতুম যাতে সত্যমিথ্যা একাকার হয়ে যেত, আর যা পড়ে পলিটিকাল-হাকিমের দল আমার বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি দিতে পারতেন না।

সংস্কৃতে বলে গতস্য শোচনা নাস্তি, কিন্তু ইংরেজিতে বলে it is never too late to mend। আমি ইংরেজি-শিক্ষিত, অতএব ঐ ইংরেজি বচন শিরোধার্য করে এ কৈফিয়ত লিখতে বসেছি এই আশায় যে, সেটি হিন্দিতে, অর্থাৎ আগামী স্বরাজের *lingua franca*য়, প্রমোশন পাবে।

আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, বাংলাদেশে বাঙালির ঘরে জন্মালেও আমি খাঁটি বাঙালি নই। একছত্র একদণ্ড ইংরেজ-শাসনের অধীনে বাস ক'রে, আর পাঁচ থেকে পঁচিশ বৎসর বয়েস পর্যন্ত ইংরেজি-শাসিত স্কুল-কলেজে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে আমি হয়ে উঠেছি একজন নিয়ো-ইন্ডিয়ান ওরফে নন্‌-ইন্ডিয়ান, অর্থাৎ কন্‌গ্রেস-ওয়ালারা যে জাত আমিও সেই জাত। পলিটিক্সের সুরা আমিও যথেষ্ট পান করেছি এবং তার নেশা আজও ছাড়াতে পারি নি, আর ভারতবর্ষের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান অদ্যাবধি আমি সেই নেশার ঝোঁকে না হোক সেই নেশার চোখেই দেখি। সুতরাং প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌মের সপক্ষে ভারতবর্ষীয় পলিটিক্সের দিক থেকে যদি কিছু বলবার থাকে তো তাই বলব। বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌মের মূলে আছে বাঙালি জাতির স্বীয় স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান। Self-determination of small nationsএর মতানুসারে বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌মের বিশেষ সার্থকতা আছে। প্রথমত আমরা একটি বিশেষ জাতি, তার পর আমরা একটি ক্ষুদ্র জাতি; সুতরাং আমাদের সেলফ্‌-ডিটারমিনেশন-বিরোধী হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্‌। আর গতযুদ্ধে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্‌ সর্বনেশে জিনিস, তা সে স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক। ইংরেজের সাম্রাজ্যের ভিতর বিদেশ আছে, জর্মানির ছিল শুধু

স্বদেশ। আর জর্মানির এই স্বদেশী ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্‌ জর্মান জাতির নৈতিক আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অধঃপাতের যে একমাত্র কারণ, তার খোলা-দলিল তো আজকের দিনে সকলের চোখের সুমুখেই পড়ে রয়েছে। বহুকে এক করবার চেষ্টা ভালো, কিন্তু একাকার করবার চেষ্টা মারাত্মক, কেননা তার উপায় হচ্ছে জবরদস্তি। যদি বল যে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না, তার উত্তর আমাদের সম্বন্ধে সেলফ্‌-ডিটারমিনেশন যদি না খাটে তো ইউরোপে মোটেই খাটে না। ইউরোপে কোনো জাতির সঙ্গে অপর কোনো জাতির সে প্রভেদ নেই, আমাদের এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির যে প্রভেদ আছে। বাংলার সঙ্গে মাদ্রাজের যে প্রভেদ ইংলণ্ডের সঙ্গে হল্যাণ্ডের সে প্রভেদ নেই, এমন-কি, ফ্রান্সের সঙ্গে জর্মানিরও সে প্রভেদ নেই। তবে যে প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌মের নাম শুনলে এক দলের পলিটিশিয়ান্‌রা আঁত্‌কে ওঠেন, তার কারণ তাঁদের বিশ্বাস ও-মনোভাব জাতীয় সংকীর্ণ স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়। নিজের সন্তানকে স্তন দিলে কোনো মায়ের উপর যদি এই অভিযোগ আনা হয় যে, সে মাতা অতি স্বার্থপর, যেহেতু তিনি পাড়াপড়শির ছেলেদের নিজের স্তন্যক্ষীরে বঞ্চিত করছেন, তা হলে সে অভিযোগের কি কোনো প্রতিবাদ করা আবশ্যক? মানুষের পক্ষে যা অস্বাভাবিক তাই করার ভিতর যে আসল মনুষ্যত্ব নিহিত, এ কথা বলে অতিমানুষে আর শোনে অমানুষে। ধরো, যদি কোনো জননী নিজেকে জগজ্জননী-জ্ঞানে পাড়াসুদ্ধ ছেলেমেয়েদের নিজের স্তনের দুধ জোগাতে ব্রতী হন, তা হলে কাউকে বঞ্চিত না করে সবাইকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিতে হলেও সে দুধে এত জল মেশাতে হবে যে তা পান ক'রে কারো পেট ভরবে না, সকলের পেট ভরবে শুধু যকৃতে। আমার বিশ্বাস, আমাদের পলিটিশিয়ান্‌রা অদ্যাবধি পেট্রিয়টিজ্‌মের উক্তরূপ জলো-দুধের কারবার করছেন, এবং আর সকলকেও তাই করতে পরামর্শ দিচ্ছেন।

৪

যদি জিজ্ঞাসা কর যে, এই সহজ সত্যটা লোকের চোখে পড়ে না কেন।— তার উত্তর, আমাদের অবস্থার গুণে। সমগ্র ভারতবর্ষ আজ বিদেশী রাজার অধীনে, সুতরাং ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশেরই আজ রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য নেই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে আজ প্রধান বন্ধন হচ্ছে পরাধীনতার বন্ধন, এবং এ অধীনতার পাশ হতে কোনো প্রদেশবিশেষ নিজ চেষ্টায় নিজ কর্মগুণে মুক্ত হতে পারবে না। এ অবস্থায় আমাদের সবারই পলিটিকাল-সমস্যা একই সমস্যা। সে সমস্যা হচ্ছে এই যে, অধীনতা কি করে স্বাধীনতায় পরিণত করা যায়। সুতরাং আজকের দিনে ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' এই উপদেশ কিংবা আদেশ দিতে আমরা বাধ্য। আমাদের সকলেরই তাই একই বাদ, সে হচ্ছে অধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আর আমাদের সকলেরই গম্যস্থান একই— স্বরাজ্যে।

প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌মের মূল্য যে কি, তা দেশের লোক স্বরাজ্যে পেঁছিবামাত্র টের পাবে। অধীনতার যোগসূত্র স্বাধীনতার স্পর্শে ছিঁড়ে যাবে। প্রভুত্বের চাপে

দাসের দল একাকার হয়ে যেতে পারে, কিন্তু স্বাধীন মানব তার স্বধর্মের চর্চা ক'রে তার স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলবে। তখন ভারতবর্ষের নানা জাতি একাকার হবার চেষ্টা করবে না, পরস্পরের ভিতর ঐক্যস্থাপন করবার চেষ্টা করবে। আজকের দিনের কন্‌গ্রেসী ঐক্যের সঙ্গে সে ঐক্যের আকাশপাতাল প্রভেদ হবে। বাইরের চাপে মিলিত হওয়া আর প্রীতির প্রভাবে মিলিত হওয়া একবস্তু নয়। এক জেলে পাঁচ-জন কয়েদির মিলন আর এক সমাজের পাঁচজন স্বাধীন লোকের মিলনের ভিতর যে প্রভেদ আছে, আজকের ভারতের নানা জাতির কন্‌গ্রেসী মিলনের সঙ্গে কালকের স্বরাজ্যবাসী জাতিদের মিলনের সেই প্রভেদ থাকবে। তখন প্রাদেশিক পেট্রিয়-টিজ্‌মের ভিত্তির উপরেই বাক্যগত নয়, বস্তুগত ভারতবর্ষীয় পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ গড়ে উঠবে।

ছেলেবেলায় হিতোপদেশে পড়েছি—

অস্তি গোদাবরীতীরে বিশাল-শাল্মলীতরুঃ। তত্র নানাদিগ্দেশাৎ আগত্য রাত্রৌ পক্ষিণো নিবসন্তি স্ম।

রাত্রিকালে নানা দিগ্দেশ হতে পাখিরা এসে গোদাবরীতীরে সেই শিমুল গাছে জড়ো হত কেন?—কিছুক্ষণ কচায়ন করে তার পর আরামে নিদ্রা দেবার জন্য। এ বিষয়ে সকল পক্ষীর স্বার্থ একই। কচায়ন শব্দের মানে বোধ হয় জান না। পক্ষীর ভাষায় ও-শব্দের অর্থ পক্ষীসভার রাজনৈতিক আলোচনা।

আমরাও ভারতবর্ষের এই রাত্রিকালে কন্‌গ্রেসে গিয়ে দিন-তিনেক ধরে কচায়ন করে তার পর নিদ্রা দিই, সেও ঐ একই কারণে। এ কচায়ন করা যে সম্ভব হয়, তার কারণ ইংরেজদত্ত শিক্ষার গুণে আমাদের সকলের মুখেই এক বুলি। এ বুলি যে শুধু আমাদের মুখের কথা, মনের কথা নয়, এ অপবাদ আমি দিচ্ছি নে। আমি শুধু এই সত্যটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কন্‌গ্রেসী পেট্রিয়টিজ্‌মের পিছনে যে মন আছে, সে হচ্ছে আমাদের সকল জাতের বিলেতি পুঁথিপড়া মন। সে মন আমাদের সবারই এক। কিন্তু তার নীচে যে মন আছে সে মন প্রতি জাতির নিজস্ব এবং পরস্পর পৃথক্‌। আর, আমাদের ভবিষ্যৎ সভ্যতা গড়ে উঠবে আমাদের মনের এই গভীর অন্তস্তল হতে। বিদেশী শিক্ষার ফলে এই সত্যটা ভুলে যাবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে বলে আজকের দিনে ভারতবর্ষের প্রতি জাতিকে বলা আবশ্যক Know thyself, এবং প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌মের সার্থকতাই এইখানে। স্বজাতীয় স্বার্থসাধনের জন্য আমাদের সকলেরই আজ প্রস্তুত হতে হবে।

আর বেশি এগোবার আগে একটা কথার অর্থ পরিষ্কার করা দরকার, সে কথাটা হচ্ছে স্বার্থ। ও-কথাটা উচ্চারণ করবামাত্র আমাদের চোখের সুমুখে ধনধান্যের সোনার ছবি এসে দাঁড়ায়। এ তো হবারই কথা। আমরা যখন প্রাণী, ও প্রাণের সর্বপ্রধান চেষ্টা যখন আত্মরক্ষা করা, তখন অন্ন আমাদের চাইই চাই।

আর পলিটিক্সের যত বড়ো বড়ো কথা আছে তার আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক খোলস

ছাড়িয়ে নিলে কি দেখা যায় না যে, তার ভিতরকার মোটা কথা হচ্ছে অন্ন? আজকের দিনে পৃথিবীতে পলিটিক্সের দুটি বড়ো কথা হচ্ছে ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ এবং বল্‌শেভিজ্‌ম্‌, বাদবাকি আর যতরকম ism আছে সে সবই হয় ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ নয় বলশেভিজ্‌ম্‌এর কোঠায় পড়ে। হাল পলিটিক্সের এই দুই ধর্ম এতই পরস্পর-বিরোধী যে, উভয়ের মধ্যে অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে আজ জীবনমরণের যুদ্ধ চলছে। অথচ এই উভয় পলিটিকাল ধর্মের ভিতর একই জিনিস আছে এবং সে জিনিস হচ্ছে অন্ন। তবে মানবজাতি যে দু ভাগ হয়ে পড়েছে সে ঐ অন্নের ভাগ নিয়ে। ক্যাপিটালিজ্‌মের মূল সূত্র হচ্ছে অল্প লোকের বহু অন্ন, আর বলশেভিজ্‌মের মূল সূত্র হচ্ছে বহুলোকের যথেষ্ট অন্ন। আমার বিশ্বাস এ দুয়ের কোনোটিই টিকবে না। কেননা, ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ ভুলে গিয়েছে যে রুটি সকলেরই চাই, আর বলশেভিজ্‌ম্‌ মনে রাখে নি man does not live by bread alone, অর্থাৎ মানুষের মন বলেও একটা জিনিস আছে, অতএব পেটের খোরাক ছাড়া মানুষের মনের খোরাকও চাই, নচেৎ মানুষ পশুর সঙ্গে নির্বিশেষ হয়ে পড়ে।

এ কথা যদি সত্য হয় তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে, স্বার্থের মোটা অর্থ হচ্ছে পেটের স্বার্থ, আর পলিটিক্স ও ইকনমিক্স প্রভৃতি মুখ্যত এই স্বার্থসিদ্ধির মন্ত্রতন্ত্র। মনের স্বার্থের সঙ্গে এ মন্ত্রতন্ত্রের সম্বন্ধ গৌণ। তবে যে পেটের কথাকে আমরা আত্মার কথা বলে ভুল করি, তার কারণ অন্নের সঙ্গে প্রাণের, প্রাণের সঙ্গে মনের, সংক্ষেপে উদরের সঙ্গে হৃদয়ের এবং হৃদয়ের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। মানুষের সুখ, মানুষের উন্নতি এই অন্ন ও মনের যোগাযোগেরই উপর নির্ভর করে। একমাত্র ভৌতিক ভাত খেয়ে মানুষ তার সৎ রক্ষা করতে পারলেও তার চিৎ ও আনন্দ রক্ষা করতে পারে না। অপর পক্ষে একমাত্র তড়িতানন্দ সেবন করে মানুষ তার আনন্দ রক্ষা করতে পারলেও তার চিৎ ও সৎ রক্ষা করতে পারে না। আর সচ্চিদানন্দ হওয়াই তো মানবজীবনের সার্থকতা। অতএব দাঁড়াল এই যে, মানুষের পক্ষে যেমন লাঙল চাই তেমনি লেখনীও চাই, যেমন হাতুড়ি চাই তেমনি তুলিও চাই; জাতীয় জীবনে যেমন পলিটিক্স ও ইকনমিক্স চাই তেমনি বিজ্ঞান ও আর্ট, কাব্য ও দর্শনও চাই।

সুতরাং একজাতের ন্যাশনালিজ্‌মের নাম শোনবামাত্র আমরা যখন সেটি অপরের ন্যাশনালিজ্‌মের বিরোধী মনে করে ভীত হয়ে উঠি, তখন বুঝতে হবে যে আমরা ন্যাশনালিজ্‌ম্‌ শব্দটা তার শুধু ঔদরিক অর্থে বুঝি, কেননা মানুষ মানুষের সঙ্গে শুধু অন্ন নিয়েই মারামারি-কাড়াকাড়ি করে, কিন্তু মানুষের মনোজগতের বস্তু হচ্ছে পরস্পরের আদান-প্রদানের বস্তু, এক কথায় বিশ্বমানবের সম্পত্তি কোনো জাতি-বিশেষের স্থাবর সম্পত্তি নয়। যখন কোনো ব্যক্তি অপর জাতের সঙ্গে মনের কারবার বন্ধ করবার প্রস্তাব করেন, তখন বুঝতে হবে যে তিনি হচ্ছেন ঘোর মেটিরিয়ালিস্ট, কেননা তাঁর বিশ্বাস যে mindও matterএর মতো দেশের গণ্ডিতে বন্ধ। এ কথাটা এখানে উল্লেখ করলুম এইজন্যে যে, এ দেশে নিত্যই দেখা যায় যে, আধ্যাত্মিকতার বেনামিতে জড়বাদ যেমন শতমুখে প্রচার হচ্ছে তেমনি দেশময় নির্বিচারে গ্রাহ্যও হচ্ছে। এইখানে একটা কথা বলে রাখি। ঔদরিক স্বার্থসাধন

করবার চেষ্টাটা মোটেই নিন্দনীয় নয়; ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও নয়, জাতিবিশেষের পক্ষেও নয়। সুতরাং পলিটিক্সের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে জাতীয় অন্নসমস্যার সমাধান করা। আর, বলা বাহুল্য, এ সমস্যার মীমাংসা জাতীয় অবস্থার জ্ঞান সাপেক্ষ। কথার রাজ্য থেকে কাজের রাজ্যে নেমে এলেই আমাদের বস্তুজগতের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে অনেকটা আবদ্ধ হয়ে পড়তে হয়। দেশ-শাসনের ভার যখন আমাদের হাতে আসবে তখনই দেখা যাবে যে, প্রতি প্রদেশ তার নিজের সামাজিক ঘরকন্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তখন যা আমাদের বিশেষ কাজে লাগবে সে হচ্ছে প্রাদেশিক-পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌। যে রুসোর পলিটিকাল মতামতের ঘষা-পয়সা নিয়ে আমাদের পেট্রিয়টিজ্‌মের আগাগোড়া কারবার তিনিই বলে গেছেন যে, কর্মক্ষেত্রে পেট্রিয়-টিজ্‌ম্‌কে অনেকটা সংকুচিত করে আনতে হয়।

সে যাই হোক, আমার বাঙালি-ন্যাশনালিজ্‌ম্‌ মুখ্যত মানসিক এবং গৌণত রাজনৈতিক। আমাদের মনের স্বরাজ্য লাভ করা ও রক্ষা করা এবং তার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করাই হচ্ছে আমার প্রধান ভাবনা। রাজনৈতিক স্বরাজ্য মনে স্বরাট্‌ হবার একটি উপায় মাত্র, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখন বাঙালির মনের বিশেষত্ব যে কোথায় তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাক। এ পরিচয় দেওয়াটা একেবারে অসম্ভব নয়, কেননা বাঙালির ন্যাশনাল সেলফ্‌-কন্‌শাসনেস কতকটা প্রবুদ্ধ হয়েছে। এই ন্যাশনাল সেলফ্‌-কন্‌শাসনেস কথাটা আমাদের স্বদেশী-যুগে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। সেকালে অবশ্য দেশের লোক এ কথাটা তার পলিটিকাল অর্থেই বুঝত। তখন আত্মজ্ঞান অর্থে আমরা বুঝতুম আমাদের পরাধীনতা সম্বন্ধে জাতীয় চৈতন্য ও বেদনা। বলা বাহুল্য, এই সংকীর্ণ অর্থে সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মজ্ঞান ও বাংলার আত্মজ্ঞান একই বস্তু। কিন্তু এ বোঝাটা ভুল বোঝা। কেননা, তা হলে স্বাধীন জাতের পক্ষে জাতীয় আত্মজ্ঞান বলে কোনো জিনিসই নেই। কিন্তু তা যে আছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, ঐ সমস্ত পদটি ইউরোপ থেকে এ দেশে আমদানি করা হয়েছে, ও-পদের বিলেতে জন্ম। কথাটা এতই বিলেতি যে, আমাদের কোনো ভাষায় ওটির সঠিক তরজমা করা চলে না।

মানুষ মাত্রেই মুখ্যত এক হলেও সকলের শরীরের চেহারাও যেমন এক নয়, সকলের মনের চেহারাও এক নয়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যেমন প্রকৃতির ও শক্তির প্রভেদ আছে, জাতির সঙ্গে জাতিরও তেমনি প্রকৃতির ও শক্তির প্রভেদ আছে। আর, ব্যক্তিই বল আর জাতিই বল, উভয়েরই উন্নতির মানে হচ্ছে এই স্বাতন্ত্র্যকে বিকশিত করে তোলা, কেননা সেই চেষ্টাতেই তার সুখ, সেই চেষ্টাতেই তার মুক্তি। যাতে করে এই স্বাতন্ত্র্য চেপে দেয় তাই হচ্ছে বন্ধন। জীবনের বন্ধনের চাইতে মনের বন্ধন কম মারাত্মক নয়। আর আমাদের মনের যে একটা বিশেষ ধাত আছে সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। একটা জানা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। জাতীয় মনের আসল প্রকাশ সাহিত্যে। বর্তমান ভারতবর্ষে বাংলা সাহিত্যের

তুল্য দ্বিতীয় সাহিত্য নেই। ভারতবর্ষের অপর কোনো জাতি দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের জন্মদান করতে পারে নি। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, মনোজগতে আমরা বাকি ভারতবর্ষের সঙ্গে একলোকে বাস করি নে। আমাদের অন্তরে জ্ঞানের ক্ষুধা আছে, কাব্যরসের পিপাসাও আছে। এর ফলে মনোজগতে আমাদের কাছে বসুধৈব কুটুম্বকম্, এবং সেই কারণে ইউরোপের সাহিত্যবিজ্ঞানের শিক্ষা আমরা যতটা আত্মসাৎ করেছি, ভারতবর্ষের অপর কোনো জাত তদনুরূপ পারে নি।

ইউরোপীয় শিক্ষা যে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের অল্পবিস্তর বদল করেছে এ কথা আমি মানি, কেননা না মেনে উপায় নেই। আমাদের পলিটিকাল মতামত যে ক থেকে ক্ষ পর্যন্ত আগাগোড়া বিলেতি জিনিস, এ তো সবাই জানে। দেশসুদ্ধ লোকের পলিটিকাল আত্মা যে ইউরোপের হাতে গড়ে উঠেছে এ কথা এক পেশাদার ন্যাশনালিস্ট ছাড়া আর কারো অস্বীকার করবার প্রয়োজন নেই।

তবে অপর ভারতবাসীর সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এই যে, আমরা ইউরোপের কাছে এক পলিটিক্স ছাড়া আরো কিছু বিদ্যা আদায় করেছি। ইউরোপের কাব্যবিজ্ঞানের প্রভাব আমাদের মনের উপর নিতান্ত কম নয়। ল্যাফ্‌কাডিয়ো হার্ন-এর বইয়ে পড়েছি যে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক জাপানিদের মনের কোনোখানে স্পর্শ করে না। অপর পক্ষে শেক্‌স্‌পীয়রের কাব্য আমাদের মনের সকল তারে ঘা দেয়। সে কাব্য আমাদের মর্ম স্পর্শ করে এবং সে স্পর্শে আমাদের অন্তরাত্মা পুলকিত হয়ে ওঠে।

শুধু কাব্য নয়, ইউরোপের বিজ্ঞানও আমাদের অতি প্রিয় সামগ্রী। এ বিশ্ব আমাদের কাছে শুধু জড়জগৎ নয়, ভাবের জগৎও বটে; ইন্দ্রিয়ের দর্শনের স্পর্শনের, মনের ধ্যানধারণার বস্তু। আমরা জানি রস খালি কথায় নেই, বিশ্বেও আছে; রূপ খালি আর্টে নেই, প্রকৃতিতেও আছে। এ বিশ্বের অসীমতা ও অসীম বৈচিত্র্য, তার অন্তর্নিহিত শক্তির ছন্দোবদ্ধ লীলা আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। এই বিশ্ব নামক মহাকাব্যের রসাস্বাদ করবার কৌতূহল আমাদের অনেকেরই মনে আছে। তাই-না বাঙালি যুবক আইনস্টাইনের নবাবিষ্কৃত আলোকতত্ত্বের পরিচয় নিতে এত ব্যাকুল, যদিচ তারা সবাই জানে এই নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব কর্মে ভাঙিয়ে নেবার আশু সম্ভাবনা নেই। আমাদের জাতীয় মন জ্ঞানমার্গের পথিক বলেই বাংলায় জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায়ের আবির্ভাব হয়েছে। মনোজগতের বস্তুর প্রতি আমাদের এই আন্তরিক অনুরাগ আছে বলেই বিজ্ঞানের মন্ত্রভাগ আয়ত্ত করবার দিকে বাঙালির এতটা ঝোঁক।

এ-সব কথা শুনে অনেকে হয়তো বলবেন যে, বাঙালির জ্ঞান জ্ঞানমাত্রই থেকে যায়, তা কোনো কাজে লাগে না। বিজ্ঞানের যন্ত্রভাগ যে বাঙালি ততটা করায়ত্ত করতে পারে নি, এ কথা সত্য। আমার বিশ্বাস, এ অক্ষমতার জন্য যত-না দায়ী আমাদের প্রকৃতি, তার চাইতে ঢের বেশি দায়ী আমাদের অবস্থা। কলকারখানা গড়বার শক্তির অভাব সম্ভবত বাঙালির নেই, অভাব আছে শুধু সুযোগের। সে যাই হোক, যা সত্য ও যা সুন্দর তার প্রতি বাঙালি মনের এই সহজ আনুকূল্যের প্রশ্রয় দিয়েই তার জাতীয়-জীবন সার্থক করে তোলা যেতে পারে। যেমন ব্যক্তি-

বিশেষের তেমনি জাতিবিশেষের প্রকৃতির উলটো টান টানতে গেলে তার জীবনকে ব্যর্থতার দিকে অগ্রসর করা হয়। আজ ইউরোপীয় শিক্ষা বয়কট করবার যে হুজুক উঠেছে তাতে যে বাঙালি সোৎসাহে যোগদান করতে পারছে না, তার কারণ যে-বাঙালির চিন্তা করবার অভ্যাস আছে সেই জানে যে উচ্চশিক্ষাই হচ্ছে আমাদের জাতীয় শক্তি উদ্‌বোধিত করবার সর্বপ্রধান উপায়। কোনো জাতির পক্ষে স্বধর্ম হারিয়ে স্বরাট্‌ হবার চেষ্টাটা বাতুলতা মাত্র। ভারতবাসী যখন স্বরাজ্য লাভ করবে তখন ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশই তার শিক্ষাদীক্ষার উপর অপর কোনো প্রদেশকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না। প্রতি স্ববশ সজ্ঞান জাতির একটা-না-একটা বিশেষ জাতীয়-আদর্শ থাকে, এবং সেই আদর্শ অনুসারেই সে জাতি তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে। যার নিজস্ব বলে কোনো জিনিস নেই, অথবা নিজস্ব যে রক্ষা করতে বিকশিত করতে না চায়, তার পক্ষে স্বাধীনতার কোনো প্রয়োজন নেই; শুধু তাই নয়, তার কাছে উক্ত শব্দের কোনো অর্থও নেই। স্বত্বসাব্যস্ত করবার জন্যই তো স্বাধীনতার আবশ্যক।

আমার শেষ কথা এই যে, আমাদের পুঁথিপড়া মনের সঙ্গেও বাকি ভারতবর্ষের পুঁথিপড়া মনের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। সুতরাং আমাদের পলিটিকাল মনও অন্য প্রদেশের পলিটিকাল মনের ঠিক অনুরূপ নয়। মনে রেখো, মানুষের পলিটিকাল মন তার সমগ্র মনের বহির্ভূতও নয়, তার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিতও নয়। অবশ্য এক-দলের কংগ্রেসওয়ালা আছেন যাঁরা এ কথা মানেন না; যদি মানতেন, তা হলে তাঁদের দলে টিকিওয়ালা-ডিমোক্রাট-রূপ অদ্ভুত জীবের এতটা প্রাধান্য হত না।

ডিমোক্রাটিক স্বরাজ্য লাভ করতে হলে আমাদের মনের যে বদল আবশ্যক, এ জ্ঞান আমাদের যুবকশ্রেণীর মনে যে প্রবেশ করেছে তার পরিচয় আমি পাঁচজনের সঙ্গে কথায় বার্তায় নিত্যই পাই। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করব না, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে দেশের অধিকাংশ লোককে দাস ও স্ত্রীলোককে দাসী করে রাখব, অথচ পৃথিবীর ডিমোক্রাটিক জাতিদের মতো রাজনৈতিক জগতে স্বরাট্‌ হব, এরূপ মনোভাব যে যুগপৎ লজ্জাকর ও হাস্যকর এ ধারণা এ যুগের বহু বাঙালির মনে জন্মেছে। তবে এ মনোভাব যে আমাদের দৈনিক সংবাদপত্রে ও বক্তৃতার রঙ্গমঞ্চে গর্জে ওঠে নি, তার কারণ নিজের বিরুদ্ধে হুজুক করা চলে না। যে ভাব মনে পোষণ করবার জন্য, যে কাজ করবার জন্য আমরা মনে মনে লজ্জিত হই, তা নিয়ে প্রকাশ্য ঢাক পেটানো অসম্ভব; আমরা ঢাক পেটাতে পারি শুধু আমাদের কাল্পনিক আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা নিয়ে। কতকটা শিক্ষার বলে, কতকটা পরীক্ষার ফলে, আমরা আমাদের প্রকৃতি ও শক্তি দুয়েরই কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করেছি। নিজের ত্রুটির জ্ঞানও আত্মজ্ঞানেরই একাংশ; এবং আত্মজ্ঞান আমাদের মনে জন্মেছে ব'লে তারই উপর আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে চাই। আমাদের অন্তরের বল আমরা পুষ্ট-পরিপুষ্ট করতে চাই, তাই আমরা শিক্ষার জাতিবিচার করে তাকে আচরণীয় কিংবা অনাচরণীয়ের কোঠায় ফেলতে চাই নে; আর আমাদের দুর্বলতা আমরা পরিহার করতে চাই বলে আমরা লোকের জাতিবিচার করে তাকে আচরণীয় কিংবা অনাচরণীয় করে রাখা পেট্রিয়টিক কাজ বলে মনে করি নে। কোনো জাতির

পক্ষে তার চিরাগত সংস্কার থেকে মুক্তিলাভ করে নবজীবন ও নবশক্তি লাভ করা সহজসাধ্য নয়; এবং সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করবার সাধনপদ্ধতির নাম রাজনৈতিক হুজুক নয়, কেননা ক্ষণিক উত্তেজনার পিঠ-পিঠ আসে স্থায়ী অবসাদ। জাতীয় ঐশ্বর্য অবশ্য জাতীয় কৃতিত্বের উপর গড়ে ওঠে, এবং সে কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় সাহিত্যে ও সমাজে, দর্শনে ও ধনে, বিজ্ঞানে ও আর্টে। মানুষের পক্ষে কিছু ত্যাগ করা, যথা উপাধি কিংবা ওকালতি, শুনতে মহা কঠিন; কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি কঠিন, কিছু করা অর্থাৎ কৃতী হওয়া। জীবনের কাছ থেকে পালানো সহজ, তার সঙ্গে লড়ে জয়ী হওয়াই কঠিন; কেননা এ লড়াই চিরজীবনব্যাপী, এক মুহূর্ত তার বিরাম নেই। দেখতে পাচ্ছ আমি রাজসিক মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছি। একে আমি বৈদিক-তান্ত্রিক-সমাজে জন্মগ্রহণ করেছি; তার উপর আবার ইউরোপের রাজসিক সভ্যতার আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি; সুতরাং আমার কাছ থেকে তুমি অন্য কোনো মনোভাবের পরিচয় পাবার আশা করতে পার না। রাজসিক মন সাত্ত্বিক মনের চাইতে নিকৃষ্ট কি না বলতে পারি নে, তবে তা যে তামসিক মনের চাইতে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। আর এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, দেশে আজকাল যে-সকল মনোভাব সাত্ত্বিক বলে চলছে, সে-সব পুরোমাত্রায় তামসিক। সে-সবের মূলে আছে অজ্ঞতা আর ঔদাসীন্য, এক কথায় মনের জড়তা।

আমি বিশ্বাস করতে ভালোবাসি যে, আমার মন এ যুগের বাংলার মন। যদি তাই হয় তো বাঙালির ন্যাশনালিজ্‌মের আদর্শ যে কি, তা অনুমান করা কঠিন নয়। সমগ্র ভারতবাসীকে ডোরকৌপীন পরানো আমাদের আদর্শ হতে পারে না। আজকের দিনে বাঙালির যদি কোনো আন্তরিক প্রার্থনা থাকে তো সে এই—

বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

কিন্তু এ প্রার্থনা কোনো বাইরের শক্তির কাছে নয়, নিজের অন্তরনিহিত শক্তির কাছে। কারণ এ সত্য আমরা আবিষ্কার করেছি যে, বিদ্যা যশ লক্ষ্মী রূপ জয়— এ-সকলই আত্মবলে অর্জন করতে হয়, প্রার্থনাবলে নয়। যদি কেউ বলেন যে, এ আইডিয়ালের মধ্যে তো সেল্‌ফ-স্যাক্রিফাইসএর কথা নেই? তার উত্তরে আমি বলি, সেল্‌ফ-স্যাক্রিফাইস কোনো জাতির আদর্শ হতে পারে না, জাতির পক্ষে একমাত্র আদর্শ হচ্ছে সেল্‌ফ-রিয়ালাইজেশন। আর তার একমাত্র উপায় হচ্ছে বহু লোকের পক্ষে সেল্‌ফ-রিয়ালাইজেশনের ব্রত অবলম্বন করা।

আমার শেষ কথা এই যে, যে দেশকে আমি অন্তরের সহিত ভালোবাসি, সে বর্তমান বাংলা নয়, অতীত বাংলাও নয়— ভবিষ্যৎ বাঙলা, অর্থাৎ যে বাংলা আমাদের হাতে ও মনে গড়ে উঠছে। সুতরাং আমার বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ বর্তমান ভারত-বর্ষীয়-পেট্রিয়টিজ্‌মের বিরোধী নয়। আর-এক কথা, যে-ন্যাশনালিজ্‌ম্‌ বিদ্বেষ-বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে-ন্যাশনালিজ্‌মের ফলে শুধু পরের নয় নিজেরও যে সর্বনাশ হয়, গত ইউরোপীয় যুদ্ধ এই সত্য যার চোখ আছে তারই চোখের সুমুখে ধরে দিয়েছে।

অগ্রহায়ণ ১৩২৭

পূর্ব ও পশ্চিম

জ্ঞান হয়ে অবধি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যে মস্ত একটা প্রভেদ আছে, এইরকম একটা কথা শুনে আসছি। কিন্তু সে প্রভেদটা যে কি ও কোথায়, তা এতদ্দেশীয় কোনো বক্তা কি লেখক আমাদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন নি। অন্তত আমার মন যে-সকল কথায় সম্পূর্ণ সায় দিতে পারে, এমন কথা আমি তো অদ্যাবধি কোনো স্বদেশী বক্তা কিংবা লেখকের মুখে শুনি নি।

পূর্ব-পশ্চিমের কথা উঠলেই সূর্যের উদয়-অস্তের কথাই প্রথমে মনে পড়ে। আর তার পিঠ-পিঠ নানারকম উপমা এসে আমাদের নয়ন-মন অধিকার করে বসে। যথা, সভ্যতার উদয় পূর্বে, অস্ত পশ্চিমে। আলো আগে পূবে ওঠে, তার পর পড়ে পশ্চিমে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে, জিয়োগ্রাফির পূর্ব অলক্ষিতে আমাদের মনে হিস্টরির পূর্ব হয়ে ওঠে, আর তখন আমরা দেশের ধর্ম কালের উপর আরোপ করি, আর কালের ধর্ম দেশের উপর। আর এর ধর্ম ওর ঘাড়ে চাপাবার ফলে আমাদের মন চিন্তারাজ্যে দিশেহারা হয়ে যায়।

সত্য কথা এই যে, যখন আমরা পূর্ব-পশ্চিমের কথা বলি তখন আমরা ইউরোপ ও এশিয়ারই ভেদাভেদের কথা ভাবি। বর্তমান ইউরোপের সঙ্গে বর্তমান এশিয়ার অবশ্য কতকগুলো স্পষ্ট প্রভেদ আছে। সাংসারিক হিসেবে ইউরোপ সমৃদ্ধ, এশিয়া দরিদ্র। দেহে-মনে যে-সকল গুণের সদ্ভাবে মানুষের পলিটিকাল ও ইকনমিক ঐশ্বর্য লাভ হয়, সে-সকল গুণ ইউরোপীয়দের দেহ-মনে যে-পরিমাণে আছে আমাদের দেহ-মনে সে পরিমাণে নেই; এটি তো প্রত্যক্ষ সত্য। এই মোটা সত্য থেকে একটি মোটা তথ্য জন্মলাভ করেছে। সে তথ্য এই যে, পূর্ব হচ্ছে স্পিরিচুয়াল এবং পশ্চিম মেটিরিয়ালিস্টিক।

স্পিরিচুয়ালিটি এবং মেটিরিয়ালিজ্‌ম্‌, দুটো কথাই আমরা বিলেত থেকে আমদানি করেছি। প্রমাণ, এ দুটি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নেই। স্পিরিচুয়ালিটির তরজমা আমরা সংস্কৃতের সাহায্যে কোনোরকমে করতে পারি, কিন্তু তাও ভুল অনুবাদ হবে। সংস্কৃত আধ্যাত্মিক শব্দ ইংরেজি স্পিরিচুয়ালিটির প্রতিশব্দ নয়। কিন্তু মেটিরিয়া-লিজ্‌মের তরজমা করতে মোটেই পারি নে। সাংসারিক অভ্যুদয় সাধনের প্রবৃত্তি মানুষমাত্রেরই অন্তরে আছে; সুতরাং সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার অক্ষমতার নাম স্পিরিচুয়ালিটি নয়, আর ক্ষমতার নাম মেটিরিয়ালিজ্‌ম্‌ নয়। কারণ মেটিরিয়ালিজ্‌ম্‌ নামক দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে কর্মকুশলতার কোনো যোগাযোগ নেই; এবং স্পিরি-চুয়ালিটি নামক দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে অকর্মণ্যতারও কোনো যোগাযোগ নেই।

বড়ো বড়ো কথাগুলোর অর্থ প্রায়ই অস্পষ্ট হয়ে থাকে। কারণ সে-সব কথা

নানা লোকে নানাভাবে হৃদয়ঙ্গম করে। কিন্তু সেই-সব বিভিন্ন মনোভাবের একই নাম থেকে যায়, এবং সে নাম বাদ দিয়ে কোনো বিষয়ের আলোচনা করাও অসম্ভব। অথচ এই দার্শনিক কথাবার্তা নিয়ে নিয়ত আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কেননা, সেই আলোচনাসূত্রেই সেই কথাগুলোর অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

সুতরাং ধরে নেওয়া যাক যে, আমরা স্পিরিচুয়াল এবং ইউরোপের লোক মেটিরিয়ালিস্টিক। এই ইউরোপীয় মেটিরিয়ালিজ্‌মের প্রভাব আমাদের মনের উপর কি সূত্রে কতদূর হয়েছে, এবং আমাদের স্পিরিচুয়ালিটির প্রভাব ইউরোপীয় মনের উপর কি ভাবে কতটা হয়েছে, আর সে প্রভাবের ফল বিশ্বমানবের পক্ষে আশঙ্কার কথা কিংবা আশার কথা— তাও বিবেচ্য।

ইউরোপ যে কর্মক্ষেত্র এবং এশিয়া যে ধর্মক্ষেত্র, এইরকম একটা ধারণা উক্ত দুই ভূভাগের লোকের মনে অনেক দিন থেকে দিব্যি বসে গিয়েছে; এবং সে কারণ ইউরোপের লোকেরা এই ভরসায় নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এশিয়াতে কর্ম নেই; আর আমরা এই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলুম যে, ইউরোপে ধর্ম নেই। দু পক্ষই এই ভেবে মনস্থির করেছিলেন যে, কর্মরাজ্যে এশিয়া ইউরোপের ঘাড়ে চড়তে পারবে না; আর ধর্মরাজ্যে ইউরোপও এশিয়ার ঘাড়ে চড়তে পারবে না। একটা স্পষ্ট ও সহজবোধ্য মত পেলেই মানুষে মনের আরামে থাকে। আর ইউরোপের লোক যে সব পুরুষ ও এশিয়ার লোক যে সব মেয়ে, এর চাইতে সহজ ভাগ আর কি হতে পারে?

ফলে এশিয়ার কাছ থেকে ইউরোপের কোনো ভয় ছিল না। গতযুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় বিধ্বস্ত হয়ে ইউরোপের মনে নানারকম ভয়ভাবনা জন্মেছে। নিজেদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে ইউরোপের লোকের মনে যে অগাধ বিশ্বাস ছিল সে বিশ্বাসের গোড়া আলগা হয়ে গিয়েছে। ফলে তারা নানা দিকে নানা রূপে বিভীষিকা দেখছে। ইউরোপের, বিশেষত ফরাসিদেশের, বর্তমান সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনিই জানেন যে, এশিয়া এখন সে দেশের সাহিত্যিক মনের অনেকটা অংশ অধিকার করেছে। যে-সকল ইউরোপীয়েরা এখন ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবেন তাঁরা এশিয়ার কথা বাদ দিয়ে ইউরোপের ভবিষ্যৎ গণনা করতে পারেন না। ফলে নিজের নিজের প্রকৃতি ও বুদ্ধি-অনুসারে কেউ-বা এশিয়ার সভ্যতা ইউরোপীয় সভ্যতার পরিপন্থী মনে করেন, কেউ-বা তাকে আবার তার সহায় মনে করেন।

এই উভয় শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে মতের অনৈক্য কোথায় এবং কি কারণে, তা ফরাসি-দেশের দুটি গণ্যমান্য সাহিত্যিকের লেখায় খুব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। আমি সংক্ষেপে উভয়ের বাদানুবাদের পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। কারণ এ দেশে যাঁরা

পূর্ব-পশ্চিমের ভেদাভেদ নিয়ে মাথা বকান, পশ্চিমের লোকেরা সে বিষয়ে কি ভাবছে তা জানবার জন্য আশা করি তাঁদের কৌতূহল আছে।

মাসি Massis বর্তমান ফ্রান্সের জনৈক ধনুর্ধর লেখক। তিনি প্রথমে ছিলেন রেনাঁ ও আনাতোল ফ্রাঁসএর মন্ত্রশিষ্য। পরে তিনি আরিস্টটল ও যিশুখৃস্টের হস্তে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাই তিনি এখন তাঁর পূর্ব শিক্ষাগুরু ও সতীর্থদের উপর নির্মমভাবে সমালোচনার বাণ নিক্ষেপ করছেন। তাঁর সমালোচনার বাণ উক্ত সাহিত্যিকদের বধ না করতে পারুক, কিছুকিঞ্চিৎ জখম যে করেছে, সে বিষয়ে ফ্রান্সের সাহিত্যসমাজে দ্বিমত নেই। মাসি প্রথমত অতি চটকদার লেখক, দ্বিতীয়ত অতি শক্তিমান লেখক; উপরন্তু খৃস্টান ধর্ম ও খৃস্টান দর্শনে তাঁর বিশ্বাস অটল। এই বিশ্বাসের বলেই তিনি সম্পূর্ণ নির্ভীক এবং মারাত্মক লেখক হয়ে উঠেছেন। তাই যাঁরা তাঁর মতাবলম্বী নন তাঁরাও স্বীকার করছেন যে, তাঁর মতামতের ভিতর অনেক নিগূঢ় সত্য আছে। তবে সকলেই বলেন তাঁর দোষ এই যে, অবিশ্বাসী সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর কোনোরূপ মায়ামমতা নেই। দ্বিতীয় কুমারিল ভট্টের মতো তিনিও ফরাসি সাহিত্যরাজ্যে নাস্তিকনিগ্রহ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। ইনি সম্প্রতি 'ইউরোপের আত্মরক্ষা' নামক একখানা বই লিখেছেন। উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন এদ্‌ম ঝালু Edmond Jaloux নামক জনৈক খ্যাতনামা সাহিত্যিক। সাহিত্যসমালোচনা যে কাকে বলে, ঝালুর সমালোচনাকে তার আদর্শ বলা যায়। উদার চরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্‌—এ কথা যে সাহিত্যরাজ্যেও খাটে, তার জীবন্ত প্রমাণ হচ্ছেন উক্ত সমালোচক।

মাসি মহোদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইউরোপ ধ্বংসপথের যাত্রী হয়েছে। তাই তিনি ইউরোপকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক হতে পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে আত্মরক্ষার অর্থ—আত্মার রক্ষা। তাঁর বিশ্বাস, পৃথিবীর প্রতি জাতেরই একটি বিশেষ নিজস্ব আত্মা আছে, আর স্বকীয় আত্মার সেই বিশিষ্টতা রক্ষা করারই নাম আত্মরক্ষা। কারণ কোনো জাতি যদি তার আত্মাকে সজীব ও সুস্থ রাখতে পারে তা হলে সে জাত জীবনেও সুস্থ ও সফল হতে বাধ্য।

তাঁর মতে ইউরোপীয় মন যুগযুগ ধরে গ্রীকসাহিত্য ও খৃস্টধর্মের প্রভাবে গড়ে উঠেছে। ইউরোপীয় মনের যা-কিছু শক্তি, যা-কিছু সৌন্দর্য, যা-কিছু মহত্ত্ব আছে, সে সবই ঐ দুই প্রভাবের ফল। ইউরোপের লোক প্রায় দু হাজার বৎসর ধরে এই শিক্ষা লাভ করেছে যে, এ বিশ্বের মূলে আছেন ভগবান, এবং তিনি হচ্ছেন মঙ্গলময় পুরুষ, ভাষান্তরে সগুণ ঈশ্বর। ইউরোপের লোক যে কর্মজগতে এত ঐশ্বর্য লাভ করেছে, তার কারণ সকল কর্ম ভগবানে সমর্পণ করাই ইউরোপের যথার্থ আদর্শ। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে, যুগযুগ ধরে ইউরোপের লোক শুধু ধর্মভাবে প্রণোদিত হয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে। অধিকাংশ মানুষ শুধু নৈসর্গিক

প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই কর্ম করে; ইউরোপের অধিকাংশ অধিবাসী তাই করেছে। কিন্তু আমাদের যে-সকল প্রবৃত্তি পশু-সামান্য, তারই চরিতার্থ করাটা আমরা পূর্বে কখনো সভ্য মনোভাব বলে গ্রাহ্য করি নি। যে মনোভাবকে পূর্বে ইউরোপের মনীষিবৃন্দ ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণস্বরূপ মনে করতেন, সে মনোভাব হচ্ছে: ভগবৎশক্তি এবং ভগবৎ-অনুগ্রহের উপর একান্ত নির্ভর ; এবং বহুকাল ধরে রোমান ক্যাথলিক চার্চ ইউরোপের মনকে এই সত্য ভুলতে দেয় নি তার কড়া শাসনের বলে।

ইউরোপের এই আদর্শের উপর প্রথম ধাক্কা লাগায় ইটালির রেনেসাঁস, তার পর জর্মানির রিফর্‌মেশন। রেনেসাঁস আত্মার চাইতে বুদ্ধির, অন্তরের চাইতে বাহ্যবস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করলে; আর রিফর্‌মেশন অথরিটির চাইতে লিবার্টির শ্রেষ্ঠত্বের বাণী প্রচার করলে। এর ফলে সাধারণ লোকে বুঝলে যে, অথরিটি না মানার নামই লিবার্টি। মানুষ নামক পশু অথরিটি মেনেই, নিজের বিদ্যাবুদ্ধির বহির্ভূত অনেক সত্য অর্থাৎ মনোভাবকে মেনে নিয়েই যে মানুষ হয়, এ কথা ইউরোপের অধিকাংশ লোক ভুলতে আরম্ভ করলে। আর সেই অবধি লিবার্টির অর্থ হল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার স্বাধীনতা। এই হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার অধোগতির প্রথম পদ।

এখন আবার এশিয়ার মনোভাব ইউরোপের মন অধিকার করছে, এবং সে মনোভাবের বশবর্তী হলে ইউরোপীয় সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। এশিয়ার মনোভাব অবশ্য মেটিরিয়ালিস্টিক নয়। মনোজগতে ইউরোপের উপর এশিয়ার আক্রমণ হচ্ছে ইউরোপীয় স্পিরিচুয়ালিটির উপর এশিয়াটিক স্পিরিচুয়ালিটির আক্রমণ। আসলে মেটিরিয়ালিজ্‌মের চাইতে এ ঢের প্রবল শত্রু। কারণ ইউরোপীয় মেটিরিয়ালিজ্‌মের শূন্যগর্ভতা প্রমাণ করা তেমন কঠিন নয়। রেনাঁ, আনাতোল ফ্রাঁস, জীদ্‌, রোম্যাঁ রলাঁ প্রভৃতির বাণী সবই অন্তঃসারহীন। কারণ এঁদের সকলেরই আত্মা ক্ষুদ্রাত্মা। কিন্তু এশিয়ার স্পিরিচুয়ালিটির অবতার হচ্ছেন চীনের লাও-ৎসে আর ভারতবর্ষের বুদ্ধ। এ দুজনেই মহাপুরুষ ও অসামান্য মহৎ অন্তঃকরণের ব্যক্তি। এঁদের কথাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা চলে না। কিন্তু তা হলেও এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, বুদ্ধ ও লাও-ৎসের মতের বশবর্তী হলে ইউরোপীয় মনোরাজ্যে অরাজকতা ঘটবে।

মাসির মতে বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্মমত যার মনে বসবে, সে ভালোমন্দ সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য, অবশ্য সে যদি লজিকাল হয়। আর কর্মযোগী হওয়াই ইউরোপের বড়ো আদর্শ। তা ছাড়া এশিয়ার দর্শনের সার কথা হচ্ছে অহং subject এবং ইদং objectএর অভেদজ্ঞান। অপর পক্ষে ইউরোপের মন এ দুয়ের একান্ত ভেদজ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

এখন জিজ্ঞাস্য যে, এই এশিয়াটিক মনোভাব ইউরোপীয় মনের অন্তরে কোন্ ছিদ্র দিয়ে কি সূত্রে প্রবেশ করছে।

মাসি বলেন, প্রথমত জর্মানির, দ্বিতীয়ত রাশিয়ার মারফত।

শনিমঙ্গলবারের মড়া দোসর খোঁজে। গতযুদ্ধের পর জর্মানি যখন আবিষ্কার করলে তার স্বার্থান্ধ সভ্যতা ম্রিয়মাণ হয়েছে, তখন সে বাদ-বাকি ইউরোপীয়দের ধ্বংসপথের যাত্রী করবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে পড়ল। জর্মানি কামানের গোলা দিয়ে যখন ইউরোপকে মারতে পারলে না, তখন সে সাহিত্যিক পয়জন্-গ্যাস্ দিয়ে ইউরোপীয়দের মোহাচ্ছন্ন করবার চেষ্টা শুরু করলে। আর আমাদের মন ও চরিত্র দুর্বল করবার তারা অব্যর্থ উপায় ঠাউরেছে, এশিয়ার ধর্মমত ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রচার করা। তারা সকলে আমাদের বোঝাচ্ছে যে, মুক্তির মানে নির্বাণ, আর নির্বাণ-প্রাপ্তিই ইউরোপীয়দের আদর্শ হওয়া উচিত। শ্পেঙ্‌ল্যার, কাইজর্‌লিঙ প্রভৃতি এ যুগের জর্মান দার্শনিকেরা মাসির মতে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

আর রুশ সাহিত্যেরও প্রধান কথা হচ্ছে যে, ইউরোপ এতদিন ধরে যে সভ্যতার সাধনা করে এসেছে, তার ষোলো-কড়াই কানা। ধর্ম রীতিনীতি প্রভৃতিকে জলাঞ্জলি দিলেই মানুষ দেবতা হয়ে উঠবে, এই হচ্ছে রুশ সাহিত্যের বাণী। আর রাশিয়ানরা যে এশিয়াটিক, তা সকলেই জানে। এ ছাড়া ফ্রান্সের বহুলোক আজ লাও-ৎসে ও বুদ্ধের ভক্ত হয়ে উঠেছে।

এখন এর উত্তরে ঝালু কি বলেন শোনা যাক। তিনি বলেন যে, মাসির রচনাচাতুর্য এতই অপূর্ব এবং তাঁর চিন্তা এতই সুশৃঙ্খলিত যে, তাঁর লেখা প্রথমেই মনকে অভিভূত করে, এবং তখন মনে হয় যে, তাঁর সকল কথাই তো সত্য। লেখক হিসাবে মাসির শক্তির মূলে আছে তাঁর ধর্মনীতি প্রভৃতি জিনিসে অটল বিশ্বাস। তাঁর মনে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। যার মনে কোনোরূপ দ্বিধা নেই, সে ব্যক্তির অদম্য শক্তির পরিচয় কর্মজগতেও যেমন পাওয়া যায় মনোজগতেও তেমনি। কিন্তু আমাদের মন যখন নানা বিষয়ে সন্দেহদোলায় দোলায়মান, তখন মাসির কথার মোহ কেটে গেলেই আমাদের মনে নানারূপ প্রশ্ন ওঠে। তিনি আমার মনে যে-সকল জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছেন, একে একে সেগুলি প্রকাশ করছি।

ইউরোপের বর্তমান মনোভাব দেখে মাসি যে ভয় পেয়েছেন, সে ভয় অকারণ নয়। বর্তমান ইউরোপের লোকের প্রকৃতি যে মনুষ্যত্বহীন হয়ে পড়ছে, এ বিষয়ে আমরা সকলে একমত। এমন-কি, ইউরোপের যে-দলের লোক সব-চাইতে জ্ঞানান্ধ, অর্থাৎ পার্লার্টিশিয়ানরা, গতযুদ্ধের ধাক্কা খেয়ে তাঁরাও চোখ মেলে দেখছেন যে, যাকে তাঁরা ইউরোপীয় সভ্যতা বলেন তার অন্তরে ঘুণ ধরেছে। কিন্তু আমাদের এই অধোগতির জন্য এশিয়া কি হিসেবে দায়ী তা ঠিক বোঝা গেল না।

এশিয়ার কথা মনে করতে মাসির মন কি জন্য আতঙ্কে ভরে ওঠে? তিনি কি ভয় পান—এশিয়া আমাদের বাহুবলে পঙ্গু করবে, না, মন্ত্রবলে নির্জীব করবে?

তাঁর ভয়টা পলিটিকাল না দার্শনিক?—মাসি হয়তো উত্তরে বলবেন যে, মানুষের দার্শনিক মনোভাবের সঙ্গে পলিটিকাল মনোভাবের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ।

দার্শনিক মনোভাবের সঙ্গে পলিটিকাল মনোভাবের যে একটা সুদূর ও অস্পষ্ট যোগাযোগ আছে এ কথা স্বীকার করলেও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, দার্শনিক মন ও পলিটিকাল মন সম্পূর্ণ বিভিন্ন। জ্ঞান ও কর্মের অভেদজ্ঞান আমার আজও হয় নি। সে যাই হোক, পলিটিকাল হিসাবে এশিয়া ইউরোপের স্কন্ধে ভর করবে কি না, সে বিষয়ে কোনোরূপ মত দিতে আমি সম্পূর্ণ অপারগ। কারণ, এত অসংখ্য ও অজ্ঞাত ঘটনার সমবায়ের উপর এই দুই ভূভাগের পলিটিকাল ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে যে, ভবিষ্যতে ইউরোপ যে এশিয়ার দাস হবে, এ ঘটনা ঘটা যেমন সম্ভব তেমনি অসম্ভব। আর যদিই-বা তাই হয়, তা হলেই যে সৃষ্টির ধ্বংস হবে তা তো মনে হয় না।

ও-সব ভাবনা ভাবতে গেলে মানুষের দার্শনিক মন ঘুলিয়ে যায়। সুতরাং ইউরোপের পলিটিকাল সমস্যার মীমাংসা পলিটিশিয়ানরা করুন; আমরা মাসি মহোদয় যে দার্শনিক বিপদের কথা বলেছেন, তারই বিচার করব।

জর্মানি ও রুশিয়ার এশিয়াটিক মনোভাবের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। মাসি হিন্দু-ধর্ম ও হিন্দুদর্শনের যে পরিচয় দিয়েছেন, সংক্ষেপে তারই বিচার করা যাক। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎপরিচয় আমারও নেই, মাসিরও নেই। আমরা উভয়েই গ্রীকদর্শন ও গ্রীকসাহিত্যেই শিক্ষিত হয়েছি। তবুও জিজ্ঞাসা করি, তিনি হিন্দু মনোভাব সম্বন্ধে তাঁর মতামত কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন। ঋগ্‌বেদ থেকে, না, গান্ধীর কাছ থেকে, না, রোম্যাঁ রলাঁর বই পড়ে? তিনি যাঁর কাছ থেকেই তা সংগ্রহ করুন, তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদর্শনের যে বর্ণনা করেছেন তা হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদর্শনের সংক্ষিপ্তসার তো নয়ই, এমন-কি. তা ক্যারিকেচর পর্যন্ত নয়। এমন কথা আমি বলতে সাহসী হয়েছি, কারণ বুদ্ধের বাণী আমার কানে লেগে আছে। আমি ফ্রান্সের সেই ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল দলের অন্যতম, যাদের অন্তরে বুদ্ধবচন বিশেষ করে ঘা দেয়। মাসি আরো বলেন, সংস্কৃত সাহিত্যের ভিতর সে রস নেই, যে রস বিশ্বমানবের মন সরস করতে পারে। আমরা দেশসুদ্ধ লোক যে হিন্দুসভ্যতা ও হিন্দুসাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন, তার জন্য দায়ী ইউরোপের ওরিয়েন্টালিস্টরা। এই ওরিয়েন্টালিস্টদের দল দার্শনিকও নয়, আর্টিস্টও নয়; তাঁরা প্রায় সকলেই ফিললজিস্ট মাত্র। কাজেই এই-সব পণ্ডিতের লেখা তাঁদের সমব্যবসায়ী পণ্ডিতের দলেরই পাঠ্য। আর এঁরা যখন ফিললজি ছেড়ে হিন্দুসভ্যতার ব্যাখ্যান শুরু করেন তখনই ধরা পড়ে যে, কোনো বড়ো জিনিস এঁদের ধারণার বহির্ভূত। উদাহরণস্বরূপ আমাদের একজন বড়ো ওরিয়েন্টালিস্ট, সিলভ্যাঁ লেভির কথা ধরা যাক। লেভি বলেছেন যে, হিন্দুদর্শন ও হিন্দুসাহিত্যের ভারতবর্ষের বাইরে কোনো সার্থকতা নেই। তার ভিতর এমন

কিছুই নেই যা সকল দেশের সর্বকালের মানুষের মনকে উন্নত করতে ও আনন্দ দান করতে পারে; যেমন পারে গ্রীকসাহিত্য। আমি জিজ্ঞাসা করি, এ-সব কথার কি কোনো অর্থ আছে? হোমারের ইলিয়ড যদি সকলের মনের জিনিস হয়, তবে বাল্মীকির রামায়ণই-বা তা হবে না কেন? রামায়ণ যে কাব্য হিসাবে সত্যসত্যই একটি মহাকাব্য, তা উক্ত কাব্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনি কখনোই অস্বীকার করতে পারবেন না; অবশ্য কাব্য কাকে বলে সে সম্বন্ধে যদি তাঁর কোনোরূপ ধারণা থাকে। আমরা যে ইলিয়ডের এতদূর ভক্ত, তার কারণ ছেলেবেলা থেকে আমরা তা পড়তে বাধ্য হয়েছি। হোমার পড়া আমাদের কলেজি শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। আর রামায়ণের উপর আমাদের যে কোনোরূপ ভক্তি নেই, তার কারণ রামায়ণ আমাদের কেউ পড়ায় নি, আমরাও অধিকাংশ লোক তা পড়ি নি। গ্রীক-সাহিত্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে, কেননা সে সাহিত্য আমরা জানি; আর ছেলেবেলা থেকে সে সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের গুরুরা আমাদের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মাসি যে সিলভ্যাঁ লেভির মতো ওরিয়েণ্টালিস্টদের কথায় আস্থা-স্থাপন করে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার বিচার করেছেন, তাতেই তিনি তার উপর অবিচার করতে বাধ্য হয়েছেন। গ্রীকমন উদার আর হিন্দুমন সংকীর্ণ, এমন কথা বলায় ইউরোপীয় মনের উদারতা নয়, সংকীর্ণতারই পরিচয় দেওয়া হয়।

১০

এখন হিন্দুদর্শনের কথা যাক। মাসির বিশ্বাস যে, ইদং এবং অহংএর অভেদ-জ্ঞানের নিরাকার ভিতের উপরেই হিন্দুসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। এত বড়ো একটা মেটাফিজিক্সের মতবাদ যে ভারতবর্ষে সর্বলোকসামান্য, এ কথা মানা কঠিন; কারণ অধিকাংশ লোক দ্বৈতবাদ কিংবা অদ্বৈতবাদের চূড়ান্ত মীমাংসা করে তার পর জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে আরম্ভ করে না। ধরে নেওয়া যেতে পারে, পৃথিবীর অপর দেশেও যেমন ভারতবর্ষেও তেমনি মেটাফিজিক্সের সমস্যা আছে শুধু মেটাফিজিশিয়ানদের কাছে। অন্যান্য দেশেরও যেমন, সে দেশেরও তেমনি সভ্যতা গড়ে উঠেছে বহুবিধ মানব-মনোভাবের উপর। যে ধর্মমতকে মাসি ইউরোপীয়দের একচেটে মনে করেন, আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষে তার সন্ধান মিলবে। এক দেশের লোক যে আগাগোড়া কর্মযোগী, আর অপর এক দেশের লোক যে আগাগোড়া জ্ঞানযোগী, এরকম রূপকথায় ছোটো ছেলেরাই শুধু বিশ্বাস করে। আর যদি তাই হয় তো ইউরোপের জন্য মাসি-র কোনো ভয় নেই। ইউরোপের সব লোক—মায় কুলিমজুর পলিটিশিয়ান কলওয়ালা, সবাই—যে জ্ঞানযোগী হয়ে উঠবে, তার কোনো সম্ভাবনা নেই। বর্তমান ইউরোপ যে তার পূর্ব স্পিরিচুয়াল সভ্যতা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে তার কারণ তারা সব অতিমাত্রায় মেটিরিয়ালিজ্‌মের ভক্ত হয়ে উঠেছে। সুতরাং তারা যে আবার হিন্দু স্পিরিচুয়ালিটির বশবর্তী হবে তার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই, সম্ভাবনা আছে শুধু আর-এক বিপদের। সে বিপদ এই যে, নবীন এশিয়ার লোক সব নকল ইউরোপীয়ান হয়ে উঠবে। আমাদের ব্যবহার দেখে ও

আমাদের দত্ত শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে তারাও সব পলিটিক্স ও ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজ্‌মের মহাভক্ত হয়ে উঠবে, আর তখন বুদ্ধদেবের বাণী এশিয়ার কোনো লোক আর প্রচারও করবে না, কেউ তার প্রতি কর্ণপাতও করবে না। ইউরোপই এখন এশিয়ার মনকে বিপর্যস্ত করছে, এশিয়া বেচারা ইউরোপের মন ঘুলিয়ে দিচ্ছে না।

১১

ইউরোপে বুদ্ধদেবের বাণী মর্মস্পর্শ করেছে শুধু জনকতক সাহিত্যিকের ও আর্টিস্টের। এ জাত ইউরোপের সর্বনাশ করবে না, কারণ তাদের এই জ্ঞানটুকু আছে যে, তারা ইউরোপের ভাগ্যনিয়ন্তা নয়। ইউরোপের এ যুগের ভাগ্যনিয়ন্তা হচ্ছে নব বুদ্ধিপৌরুষহীন পার্লিয়ামেন্টারিয়ান ও কলকারখানার মালিক; আর গুরু-পুরোহিত হচ্ছে সেই দলের লোকেরা যারা বিজ্ঞানদর্শনের বড়ো বড়ো কথার দোহাই দিয়ে মানুষের সর্বপ্রকার প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে। সুতরাং আমাদের মতো সাহিত্যিক ও আর্টিস্টদের মনোভাবের কোনো প্রভাব এ সমাজের উপর হবে না।

বর্তমান ইউরোপ যে নীচাশয়তার পঙ্কে নিমগ্ন হয়েছে, এ বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। এ পাঁক থেকে ইউরোপের মনকে কে টেনে তুলবে? মাসির বিশ্বাস রোমান ক্যাথলিক চার্চ। ইউরোপের মন কামনার বিষে জর্জরিত, সুতরাং তার মন থেকে কামিনী-কাঞ্চনের উন্মত্ত কামনা দূর করতে না পারলে তাকে আবার সুস্থসবল করতে পারা যাবে না। মাসির বিশ্বাস এ রোগের চিকিৎসক হচ্ছে চার্চ কারণ চার্চের মূলমন্ত্র হচ্ছে ত্যাগ (renunciation)। চার্চ যে আবহমান কাল ত্যাগের ধর্ম প্রচার করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা করেছে শুধু আংশিক ভাবে। চার্চের ত্যাগধর্মের ভিতর অনেকখানি বিষয়বুদ্ধির ভেজাল চিরকাল ছিল, আজও আছে। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র জাত শুধু পূর্ণত্যাগধর্মের মহিমা স্পষ্টাক্ষরে প্রচার করেছে। বুদ্ধ মানুষের শুধু ঐহিক নয়, পারলৌকিক অভ্যুদয়ের বাসনাকেও নির্মূল করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন; হিন্দুদার্শনিকরাও তাই করেছেন। বুদ্ধের বাণী যদি ইউরোপীয় সামাজিক লোকের মনে বসে, তা হলে তারা বৌদ্ধ হবে না, হবে শুধু মাসির আদর্শ খৃস্টান। ইউরোপের মনকে যদি বৌদ্ধধর্মের বরফ-জলে নাইয়ে তোলা যায় তা হলে সে মন আবার সুস্থ সবল ও সুন্দর হবে।

১২

আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে দুটি ফরাসি সাহিত্যিকের পূর্বপশ্চিম সম্বন্ধে মতামত লিপিবদ্ধ করলুম। পাঠকমাত্রেই দেখতে পাবেন যে, এঁরা কেউ নির্বোধ নন। শুধু মাসি হচ্ছেন বীরপ্রকৃতির লেখক, আর ব্যাল্‌দ্‌ শান্তপ্রকৃতির।

এখন আমার বক্তব্য এই যে, মাসির ভয় সম্পূর্ণ অমূলক, আর ব্যাল্‌দের ভয়ই সকারণ। বর্তমান ইউরোপের মনে প্রাচীন হিন্দুধর্মের ছোপ লাগবার কোনো

সম্ভাবনা নেই। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—এ কথা ইউরোপের কানে ঢুকবে না। বর্তমান ইউরোপের মেটিরিয়ালিজ্‌ম্‌ই নবীন এশিয়ার মনকে মুগ্ধ করতে পারে। কারণ এ মেটিরিয়ালিজ্‌ম্‌ দার্শনিক মেটিরিয়ালিজ্‌ম্‌ নয়, ব্যাবহারিক মেটিরিয়ালিজ্‌ম্‌। এ মেটিরিয়ালিজ্‌ম্‌ সাংখ্যদর্শনের 'প্রধানবাদ' নয়, চার্বাকদর্শনের প্রধান কথা; এবং চার্বাকের মতে

নীতিকামশাস্ত্রানুসারেণার্থকামাদেব পুরুষার্থৌ

এ নীতির মানে পলিটিক্স এবং ইকনমিক্স। আর এ মত যে সর্বলোকসামান্য, তা প্রাচীন হিন্দুরা জানতেন; এ মতকে তাঁরা 'লোকায়ত' বলেছেন।

আষাঢ় ১৩৩৪

ইউরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি[১]

ইউরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি, এ প্রশ্ন আজকাল ইউরোপীয়েরাও জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছেন। এ প্রশ্নের অর্থ এ নয় যে, সে সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইউরোপের কোনো জহরীর মনে কোনো রূপ দ্বিধা আছে। অবশ্য ইউরোপীয় বিশেষণটি বাদ দিয়ে সভ্যতা বস্তুটি যে কি, সে প্রশ্ন সে দেশের কোনো লোকের মনে উদয় হয় না। এর কারণ বোধ হয় এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, যার নাম ইউরোপীয় সভ্যতা, তার নামই সভ্যতা; আর যার নাম সভ্যতা, তার নামই ইউরোপীয় সভ্যতা। এ ধারণা যাদের মজ্জাগত, তাদের মধ্যে এ প্রশ্ন ওঠে কেন?

ইউরোপের গতযুদ্ধ সে দেশের লোকের আত্মপ্রসাদের সুখস্বপ্ন ভাঙিয়ে দিয়েছে। উক্ত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় হঠাৎ জেগে উঠে তারা এটা কি, ওটা কি, জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছে। ইউরোপের লোক পরস্পর মারামারি কাটাকাটি ক'রে মরণের মুখে অগ্রসর হয়েছিল; সে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠে এখন তাদের প্রধান ভাবনা হয়েছে, কি ক'রে তারা ভবিষ্যতে আত্মরক্ষা করবে। ফলে সকল জাতিকে একদল-বদ্ধ করবার চেষ্টা সে দেশের পলিটিশিয়ানরা করছেন। পরস্পরের স্বার্থের সংঘর্ষ দূর না করতে পারলে যে সকলের স্বার্থরক্ষা করা যাবে না, এ ধারণা অনেকের মনে জন্মেছে।

কিন্তু মনোরাজ্যে ঐক্যস্থাপন না করতে পারলে ইউরোপীয়ের জীবনে যে ঐক্য থাকবে না, ধরে-বেঁধে যে ফ্রান্সের সঙ্গে জর্মানির পিরীত করানো যাবে না, এই মোটা সত্যটি সে দেশের সূক্ষ্মদর্শী লোকদের চোখে পড়েছে। ফলে স্বদেশের ও স্বজাতির শুভকামী ও মহদাশয় ব্যক্তিরা ইউরোপের প্রতি তাঁদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত ক'রে আবিষ্কার করেছেন যে, ইউরোপীয়েরা আসলে সকলেই মনে ও চরিত্রে এক; যে-সব বিষয়ে তাদের প্রভেদ আছে সে-সব সভ্যতার অঙ্গও নয়, ফলও নয়। তাঁরা নিজে যা আবিষ্কার করেছেন সেই সত্যটি পাঁচজনকে দেখিয়ে দিলেই তাঁদের মতে ইউরোপের বাঘে-বক্‌রিতে এক ঘাটে জল খাবে। আর গতযুদ্ধের নানা কুফলের মধ্যে মহা সুফল ঘটেছে এই যে, ইউরোপীয় মনের মূলগত ঐক্যের প্রতি সকল জাতির চোখ এখন ফোট'-ফোট' করছে।

২

প্রথমেই এ বিষয়ে জনৈক জর্মান পণ্ডিতের মত শোনা যাক। ডক্টর হাস্‌ Haas ইউরোপের একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, এবং সেইসঙ্গে সহজ দার্শনিক। কারণ,

[১] *What is European Civilization,* **by Wilhelm Haas, Professor of the Technological College, Charlottenburg, and Lecturer of the Deutsche Hochschule** ***für*** **Politik.**

তিনি জাতিতে জর্মান। যে ভারতবর্ষে ভূমিষ্ঠ হয় সেই যেমন শংকরের অংশ-অবতার, তেমনি যে জর্মানিতে ভূমিষ্ঠ হয় সেও কাণ্টএর অংশ-অবতার। ভারত-বর্ষের লোকের পক্ষে আধ্যাত্মিক হওয়া যেমন সহজ, জর্মানদের পক্ষেও, ধরে নেওয়া যেতে পারে, দার্শনিক হওয়া তেমনি সহজ। একাধারে যিনি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, তাঁর কথা মন দিয়ে শোনা উচিত।

পুরাকালে ভারতবর্ষে বৈদান্তিকরা যখন বলেন যে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' তখন মীমাংসকেরা উত্তরে বলেন, এ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? ব্রহ্ম যদি থাকেন তো এত বড়ো সত্য সম্বন্ধে কার জ্ঞান নেই? দ্বিতীয়ত, এ জিজ্ঞাসার ফলই বা কি? মানুষের কর্মজীবনের উপর এ জ্ঞানের ফল কি?

এ যুগেও তেমনি ইউরোপের কর্মীর দল 'ইউরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি' এ প্রশ্ন শুনে এ কথা বলতে পারেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতা ব'লে যদি কোনো বস্তু থাকে তো সেই প্রকাণ্ড জলজ্যান্ত সত্যের প্রতি কে অন্ধ? আর তার গূঢ় মর্ম জেনেই-বা কার কি লাভ? এ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদের কর্মজীবনের কি ইতরবিশেষ করবে?

আর যদি জনসাধারণের কথা বল তো এ জ্ঞান লাভ করায় তাদের কি লাভ? তারা তো ইউরোপীয় সভ্যতার ফলভোগী মাত্র। হিন্দুস্থানীরা বলে 'আম খাও, পেঁড় মত খোঁজ'; উক্ত উপদেশ অনুসারে তাদের ইউরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ জানবার ও মূল অনুসন্ধান করবার কোনোই প্রয়োজন নেই। 'যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও' বলেই নিশ্চিন্ত থাকা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। অতএব জিজ্ঞাসা যে নিষ্ফল, এ আপত্তি চারি ধার থেকে উঠবে। এ আপত্তির খণ্ডন না ক'রে কোনো দার্শনিক অগ্রসর হতে পারেন না। সেকালে শংকরও পারেন নি, একালে হাস্‌ও পারেন নি।

৩

এখন এ জিজ্ঞাসার সার্থকতা কি, তা Deutsche Hochschule *für* Politikএর শিক্ষকের মুখে শোনা যাক। ইউরোপীয়েরা যে প্রকৃতপক্ষে একজাতি, এ বিষয়ে ইউরোপের সকল জাতির সজাগ হওয়া উচিত, নচেৎ ইউরোপীয় সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। তিনি বলেছেন যে, অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে—

Europe has reached a turning-point in its history and that it must collect its forces for a decisive struggle against Asia or other important enemies.

অর্থাৎ জ্ঞাতি-শত্রুতায় বলক্ষয় না ক'রে ইউরোপের বর্তমানে কর্তব্য হচ্ছে তার সম্মিলিত শক্তির দ্বারা বহিঃশত্রুকে পরাভূত করা; আর এই বহিঃশত্রু হচ্ছে এশিয়া। কারণ; other important enemies যে কারা, সে কথাটা উহ্য রয়ে গিয়েছে।

যেমন উক্ত জর্মান পণ্ডিতের মতে সমগ্র ইউরোপ একমন একপ্রাণ, তেমনি তাঁর বিশ্বাস সমগ্র এশিয়াবাসীরাও একমন ও একপ্রাণ; আর সে মনের একমাত্র প্রবৃত্তি

হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতাকে সমূলে বিনাশ করা। এ হচ্ছে ভূতপূর্ব জর্মান কাইজরের প্রসিদ্ধ আবিষ্কার। কারণ, এশিয়াবাসীরা যে ইউরোপের মারাত্মক শত্রু, তার কোনো বাহ্যপ্রমাণ নেই। ইউরোপীয় সভ্যতাকে যে-এশিয়া মারবে সে-এশিয়া বোধ হয় এখন গোকুলে বাড়ছে; কারণ, তার সন্ধান সকলে জানে না।

এ-সব কথা শুনে মনে হয়, এশিয়ার উপর ইউরোপের যে বর্তমান আধিপত্য আছে, ভবিষ্যতে তা নষ্ট হতে পারে। এই ভয়েই ইউরোপের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সম্প্রদায় আকুল হয়েছেন। এশিয়ার অভ্যুদয় হলেই যে ইউরোপ অধঃপাতে যাবে, এই বোধ হয় জর্মান দর্শনের স্থিরসিদ্ধান্ত। আমার ছেলে বাড়লেই যে তোমার ছেলে বামন হবে, এ সত্য কোন্ লজিকের হাতে ধরা পড়ে তা আমার অবিদিত। সম্ভবত বৈজ্ঞানিকরা যাকে কন্‌জার্ভেশন অব এনার্জি বলেন, তারই যোগ-বিয়োগের নিয়মানুসারে।

কিন্তু সে যাই হোক, পণ্ডিতমহাশয়ের বক্তব্য বোঝা যাচ্ছে। পৃথিবীর অপর ভূভাগের উপর যদি মালিকীস্বত্ব বজায় রাখতে হয় তো ইউরোপীয়দের দলবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, এবং এই কারণেই তাঁর মতে লীগ অব নেশন্‌স্, ডিসআর্মামেন্ট, ইকনমিক কনফারেন্সেস, ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কো-অপারেশন প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ইউরোপীয়েরা যে মনে এক, তা প্রমাণ না করতে পারলে তাদের জীবনে এক করা যাবে না। অতএব ইউরোপীয় মনের মূল ঐক্যের সন্ধান নিতে হবে।

৪

ইউরোপীয়দের বিশেষত্ব কোথায় তার সন্ধান নিতে হলে প্রথমেই জানা দরকার, ইউরোপ বলতে কি বোঝায়। তাই অধ্যাপক হাস্ প্রথমেই প্রশ্ন করেছেন, What is Europe।

তাঁর মতে ইউরোপের অর্থ একটি বিশেষ ভূভাগ নয়; কেননা পুরাকালে ভৌগোলিক হিসেবে ইউরোপের যে স্বাতন্ত্র্যই থাকুক-না কেন, বর্তমানে সে স্বাতন্ত্র্য নেই, অন্তত থাকবে না। কারণ—

Everything connected with space, position and distance is steadily dwindling in importance.

এ সত্যটি ইউরোপীয়দের স্মরণ করিয়ে দেবার আবশ্যক ছিল। কারণ, গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক দার্শনিকরা প্রমাণ করেছিলেন যে, ইউরোপীয়দের মাহাত্ম্যের মূলে আছে ইউরোপের মাটি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছেন যে, 'বিলেত-দেশটা মাটির'। ও-কথা শুনে আমরা হেসে কুটি-কুটি হয়েছিলুম, কিন্তু ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক দার্শনিকরা আমাদের বুঝিয়েছিলেন যে, বিলেত-দেশটা মাটির হলেও যে-সে মাটির নয়, একেবারে বিলেতি মাটির। অতএব তা নির্গুণ নয়, সগুণ। আমরাও দেখতে পাই যে, ন্যাংড়া-আমের আঁঠি বাংলায় পুঁতলে সে আঁঠির গাছে আম ফলে না, ফলে আমড়া। মাটির গুণের ভক্ত হবার জন্য বৈজ্ঞানিক হবার প্রয়োজন নেই, কবি হলেই আমরা ভক্তি-গদ্গদকণ্ঠে 'আমার দেশ' বলতে বলতে

দণ্ডপ্রাপ্ত হতে পারি। অনেক ছেলেমি কথা পাকামি করে বললেই যে তার নাম হয় বৈজ্ঞানিকদর্শন তার পরিচয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় শাস্ত্রে দেদার মেলে। সুতরাং ইউরোপের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়কে এ কথাটা বুঝিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে, একমাত্র মাটির উপর আস্থা রেখে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না।

অবশ্য অধ্যাপক হাস্ যে ঠিক কি বলেছেন, তা বোঝা যায় না। দেশকালের ব্যবধান অতিক্রম করবার কৌশল আজ মানুষের করায়ত্ত। তাই ব'লে নানাদেশের যে position বদলে গেছে, তা নয়—অবশ্য position ব'লে বস্তুর যদি কোনো অবস্থা থাকে। নব-অঙ্কের ঠেলায় here শুনছি now হয়ে গিয়েছে। সে যাই হোক, বিলেতও ভারতবর্ষ হয়ে যায় নি, ভারতবর্ষও বিলেত হয়ে যায় নি। এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের ফিজিকাল ব্যবধান কমে গিয়েছে বলেই তাদের ভিতর সাইকলজিকাল ব্যবধানটা ফুটিয়ে তোলাই বোধ হয় অধ্যাপকমহাশয়ের উদ্দেশ্য। কারণ, এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের decisive struggleএর জন্য স্বদেশের যুবকদের মন প্রস্তুত করাই তাঁর অভিপ্রায়।

৫

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা মানুষের গুণাগুণের মূল সন্ধান করেছিলেন, এবং তা পেয়েছিলেন মাটির অন্তরে। বলা বাহুল্য যে, এ প্রবন্ধে আমি বাংলা মাটি শব্দ সংস্কৃত পঞ্চভূত অর্থেই ব্যবহার করছি। আর বছর পঞ্চাশেক আগে আমি যখন স্কুলে পড়তুম, তখন সেকালের B.A. M.A.-রা ভক্তিভবে Buckle's *History of Civilization* পড়তেন; আর সেই পুস্তকেই, শুনতে পাই, সভ্যতার চরম আধিভৌতিক ব্যাখ্যা আছে।

তার পর পণ্ডিতরা আবিষ্কার করলেন, সে ব্যাখ্যা অচল। একমাত্র জিয়োগ্রাফিই যে সভ্যতা গড়ে, এ কথা সত্য নয়। কারণ, তা যদি হয় তা হলে রেড্-ইণ্ডিয়ান-দের সঙ্গে বর্তমান আমেরিকানদের সভ্যতার অর্থাৎ কৃতিত্বের আকাশপাতাল প্রভেদ হত না। এর থেকে দেখা যায় যে, মানবসভ্যতার অন্তরে soil নয়, race; ক্ষেত্র নয়, বীজই প্রবল। ক্ষেত্র ও বীজের বলাবলের বিচার মনুতেও আছে; অর্থাৎ এ সমস্যা বহু পুরাতন।

এই বস্তাপচা বিচার এথ্নলজি অ্যান্থ্রপলজি প্রভৃতি নাম ধারণ করে নব-বিজ্ঞানরূপে পরিচিত হল। এই নববৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করলেন যে, মানবজাতির মধ্যে এরিয়ান্ নামে এক দেবজাতি আছে। সেই জাতিই মানবসভ্যতা অতীতে গড়েছে, আর ভবিষ্যতেও গড়বে। কারণ, progress করা তাদের জাতিধর্ম। আর এই জাতি মাটি ফুঁড়ে উঠেছিল উত্তরজর্মানিতে। মানুষের মধ্যে ইউরোপীয়রা শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাদের ধমনীতে নীললোহিত আর্যশোণিত তেড়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এ বিষয়েও তাদের মনে এখন সন্দেহ জন্মেছে। তাই অধ্যাপক হাস্ বলেছেন—

It is true that Europe is on the whole inhabited by Aryan peoples, but the same Aryans have produced quite a different culture in India.

বোধ হয় এই কারণে যে, ভারতবর্ষের জলবায়ুর দোষে তাদের রক্তের নীল রঙ ঝলসে গিয়েছে ও লাল গোলাপি হয়েছে।

অতএব ইউরোপীয় সভ্যতার মূল ক্ষেত্রও নয়, বীজও নয়।

ইউরোপ বলতে লোকে যা বোঝে, তার মর্ম ইউরোপের মাটির অন্তরেও পাওয়া যাবে না, ইউরোপীয়দের দেহের অন্তরেও পাওয়া যাবে না। কারণ, মানব-সভ্যতার সৃষ্টি জিয়োগ্রাফি করে না, করে হিস্টরি; মানুষের দেহ করে না, করে তার মন। এই কারণে—

It is only as a spiritual and cultural entity that Europe can have a meaning for us.

এর পরই অধ্যাপকমহাশয় প্রশ্ন করেছেন—

Europe, its spirit, its civilization, is something unique.

এ হেন কথা কি সত্য?

তিনি বলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিকরা, যথা ভল্টেয়ার্ রুসো প্রভৃতি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীময় মানুষের একই চরিত্র, এবং পিকিং থেকে প্যারিস পর্যন্ত মানুষমাত্রই এক গোত্রজ। আর সে গোত্রের নাম মানবগোত্র। এ মত যাঁরা মেনে নিয়েছেন, তাঁদের মতে ইউরোপীয় সভ্যতার কোনো বিশেষত্ব নেই। কিন্তু আজকের দিনে—

Biology teaches us that every kind of living organism has a world of its own.

অর্থাৎ মানুষমাত্রেই এক জগতে বাস করে না, কেউ করে ব্রহ্মার সৃষ্ট পৃথিবীতে, কেউ-বা আবার বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট জগতে। অতএব মানুষে মানুষে কতক অংশে মিল থাকলেও অনেক অংশে প্রভেদ আছে। আর এই ভেদজ্ঞানটুকু উপেক্ষা ক'রে সাধারণ মানবচরিত্র সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, সে জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নয়। আর আমরা যাকে মানবসভ্যতা বলি, তা কোনো একটি বিশেষ জাতির মানসিক বিশিষ্টতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মানব বলে কোনো এক শ্রেণীর জন্তু নেই।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে what is the specifically European elementএরই অনুসন্ধান করতে হবে; এবং তার সন্ধান আমরা পাব, যদি আমরা ধরতে পারি—

What is common to their culture, despite all national differences, without its being a characteristic of mankind in general.

সংক্ষেপে, কোন্ গুণে সকল ইউরোপীয় এক, এবং অন্-ইউরোপীয়দের সঙ্গে পৃথক্, তাই হচ্ছে জিজ্ঞাস্য। এখন এ জিজ্ঞাসার মীমাংসা শোনা যাক।

৭

ইউরোপীয় সভ্যতার মূল যদি ইউরোপ নামক দেশের অন্তরেও না পাওয়া যায়, ইউরোপীয় মানবের দেহের অন্তরেও না পাওয়া যায়, তা হলে সে মূল কোথায় নিহিত? অধ্যাপকমহাশয় বলেন যে, এ সভ্যতা ইউরোপীয় spirit থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় যাকে স্পিরিট বলে, তার বাংলা কি সংস্কৃত প্রতিবাক্য আমি জানি নে। কারণ, আত্মা ও স্পিরিট পর্যায়শব্দ নয়। স্পিরিটকে আত্মা বলা বোধ হয় ঠিক নয়, অহং বলাই উচিত। কারণ, অহং জিনিসটে ভেদবুদ্ধির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এ প্রবন্ধে আমি ইউরোপীয়ান স্পিরিটকে ইউরোপীয় আত্মা বলব; কিন্তু সে আত্মাকে অহং অর্থেই বুঝতে হবে।

ইউরোপীয় আত্মার বিশিষ্টতা যে কি, তার পরিচয় নিতে হবে উক্ত আত্মার আত্মপ্রকাশ থেকে।

এখন এ সত্যটি যেমন প্রত্যক্ষ তেমনি স্পষ্ট যে, বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা হচ্ছে টেক্‌নিকাল্ সিভিলাইজেশন্ অর্থাৎ টেক্‌নিকাল্ সায়েন্স-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। এ হচ্ছে আসলে ব্যাবহারিক সভ্যতা। প্রকৃতির যে গতিগতি সায়েন্স আবিষ্কার করেছে, সেই গতিগতিকে মানুষের ঘরকন্নার কাজে নিয়োগ করা, এক কথায় প্রকৃতিকে মানুষের সেবাদাসীতে পরিণত করাই ইউরোপীয়দের চরম কৃতিত্ব।

কিন্তু কোনো নায়িকাকে বশ করা যে কেবল মাত্র কামনাসাপেক্ষ নয়, এ কথা সেকেলে তান্ত্রিকরাও জানতেন। বশীকরণের পিছনে মন্ত্র থাকা চাই। প্রকৃতির বশীকরণের মন্ত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছেন ইউরোপের বৈজ্ঞানিকরা। কিন্তু এ মন্ত্র লাভ করা সাধনাসাপেক্ষ। ইউরোপীয় আত্মা এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। বিজ্ঞানের কঠোর সাধনার ফলে ইউরোপীয়রা সমগ্র অনাত্ম জগতের উপর প্রভুত্ব লাভ করেছে। কিন্তু ইউরোপীয়রা প্রকৃতিকে দাসীগিরি করাবার জন্য বিজ্ঞানের সাধনা করে নি, করেছিল শুধু তাকে প্রকৃষ্টরূপে জানবার জন্য। এ শাস্ত্রের প্রথম সূত্র হচ্ছে—অথাতো প্রকৃতিজিজ্ঞাসা। জ্ঞানই তাদের মুখ্য বস্তু ছিল, কর্ম তার ফল মাত্র। বিজ্ঞানের আচার্যেরা কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, এবং তা ছিলেন বলেই এ বিদ্যা তাঁরা আয়ত্ত করতে পেরেছেন। কথা সত্য এবং আমার বিশ্বাস, অধ্যাপকমহাশয় যদি ফলনিরপেক্ষ হয়ে ইউরোপ-সভ্যতা বস্তু কি জিজ্ঞাসা করতেন, তা হলে তিনিও তার সন্ধান পেতেন।

৮

তিনি বলেন যে, এই সূত্রেই আমরা ইউরোপীয় আত্মার বিশেষত্বের সন্ধান পাই। ইউরোপীয় আত্মার ধর্মই এই যে—to organize everything with which it has to deal, to mould everything whether it be material or spiritual, in such a way that it constitutes a unity in multiplicity.

অর্থাৎ বহুকে এক ক'রে দেখবার এবং বহুকে এক সূত্রে গাঁথবার শক্তি। এক কথায়, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জগৎকে organize করবার প্রবৃত্তি ও শক্তিই হচ্ছে ইউরোপীয় আত্মার বিশেষত্ব। কেপ্‌ল্যার Kepler আবিষ্কার করেছিলেন যে—

Wherever there was matter, there was geometry.
তার পর গ্যালিলিয়ো আবিষ্কার করেন যে—

The book of nature is written in the language of mathematics.
এবং এ দুটি কথাই হচ্ছে বর্তমান বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। এবং এই মন্ত্রের সাধনা করেই ইউরোপ জড়প্রকৃতির উপর একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করেছে।

কিন্তু প্রকৃতিকে জানবার এবং বাগ মানাবার প্রবৃত্তি সার্থক হয়েছে এইজন্য যে, কি উপায়ে তাকে জানা যায়, সে পদ্ধতি গ্রীকরা উদ্ভাবন করে; তার পর কি উপায়ে মানুষের উপর প্রভুত্ব লাভ করা যায়, তার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে রোমানরা। তার পর মধ্যযুগে ইউরোপীয়েরা পরলোক জয় করবার জন্য যে আত্মশক্তি সঞ্চয় করে, সেই শক্তিই এ যুগে তারা ইহলোক জয় করবার কার্যে প্রয়োগ করেছে। অর্থাৎ গ্রীকদের জ্ঞান, রোমানদের কর্ম এবং মধ্যযুগের ভক্তি, এই তিনে মিলেমিশে বর্তমান technical civilizationএর সৃষ্টি করেছে। অতএব ইউরোপীয় সভ্যতাকে একটি ভগবদ্গীতা বলা যায়। কারণ, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয়ে এই মহাকাব্য রচিত হয়েছে; এবং বর্তমানে ইউরোপের পক্ককষায় মন থেকেই টেক্নিকাল সিভিলাইজেশন উদ্ভূত হয়েছে। এই হচ্ছে ইউরোপীয় আত্মার চরম পরিণতি। এই কথাটা বুঝতে পারলেই ইউরোপের জাতিসমূহ ভবিষ্যতে আর পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করবে না। একেই বলে জ্ঞানে মুক্তি। এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, তবে প্রলয়ের আশঙ্কার কারণ কি?

এখন এ বিষয়ে একটি ফরাসি লেখকের মতামত শোনা যাক। ল্যুসিআঁ রোমিয়ে Lucien Romier বিজ্ঞান কিংবা দর্শনের আচার্য নন, তিনি একজন প্রবন্ধলেখক সাহিত্যিক মাত্র; সুতরাং পূর্বোক্ত জর্মান অধ্যাপকের কথার অপেক্ষা ফরাসি সাহিত্যিকের কথা ঢের বেশি সহজবোধ্য। জড়ানো হাতের লেখার সঙ্গে ছাপার অক্ষরের যে প্রভেদ, জর্মান পাণ্ডিত্যের রচনার সঙ্গে ফরাসি সাহিত্যের রচনার সচরাচর সেই একই প্রভেদ দেখা যায়। সুতরাং ইউরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি, সে বিষয়ে ফরাসি মত সত্য হোক মিথ্যা হোক, জর্মান পণ্ডিতের মতের চাইতে অনেক সুবোধ; এবং সম্ভবত সুবোধ বলেই রোমিয়ে-র *Nation et Civilization* ইংলন্ডের যে সম্প্রদায় লেখাপড়ার কারবার করেন, সে সম্প্রদায়ের মনকে বেশি করে স্পর্শ করেছে।

রোমিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করেছেন, qu'est-ce quel' Europe ? অর্থাৎ ইউরোপ বস্তু কি? তিনি বলেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ, আজকের দিনে বিশ্বমানবের কাছে ইউরোপের নামডাক অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং ইউরোপ বলতে কি বোঝায়, তা বুঝতে হলে ইউরোপের জিয়োগ্রাফির এবং ইকনমিক অবস্থার জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, উপরন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান গুণগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

অবশ্য ইউরোপীয় সভ্যতার মর্ম উদ্‌ঘাটিত করতে হলে ইউরোপ নামক ভূভাগ ও তার অধিবাসীদের raceএর উপেক্ষা করা যায় না। কারণ, ইউরোপ নামক দেশটা যে তার অধিবাসীদের অনেক পরিমাণে গ'ড়ে তুলেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ধনী হবার, শক্তিমান হবার যতটা সুযোগ ইউরোপের অধিবাসীরা তাদের দেশের কাছ থেকে পেয়েছে, পৃথিবীর অন্য জাতিরা ততটা পায় নি; ইউরোপের সৌভাগ্য যে সে কতক অংশে প্রকৃতির অনুগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কথা অস্বীকার করা মূর্খতা।

১০

কিন্তু ইউরোপের মেটিরিয়াল সিভিলাইজেশন ইউরোপের যথার্থ সিভিলাইজেশন নয়। যাঁরা মনে করেন, ইউরোপের ঐশ্বর্যই তার সভ্যতার চরম ফল তাঁদের বলা দরকার যে, যদিও তাই হয় তা হলে ভবিষ্যতে তাঁদের ঐশ্বর্য দিন দিন বৃদ্ধি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। অতীতে যে-সব কারণে ও যে-সব উপকরণের সাহায্যে ইউরোপ তার বর্তমান ধনদৌলত লাভ করেছে, সে-সব কারণ যে ভবিষ্যতেও তার সহায় হবে, এরূপ আশা করা বৃথা।

একবার চোখ তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই তাদের নিজের নিজের দেশকে এক্‌স্‌প্লয়েট করতে শিখেছে, এবং করছে; এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে ইউরোপের মতো সমান কৃতকার্য হবে। অর্থাৎ মেটিরিয়াল সিভিলাইজেশনে ইউরোপ অপর সকল দেশের উপর চিরকাল টেক্কা দিতে পারবে না। যাকে বলে টেক্‌নিকাল বিদ্যা তা বিশ্বমানবের করায়ত্ত হয়েছে। সুতরাং টেক্‌নিকাল সিভিলাইজেশনই যদি ইউরোপীয়ান সিভিলাইজেশন হয়, তা হলে সে সিভিলাইজেশনের ইউরোপীয় নামের কোনো সার্থকতা থাকবে না।

সত্য কথা এই যে, ইউরোপকে সৃষ্টি করেছে প্রধানত হিস্টরি, জিয়োগ্রাফি নয়; অর্থাৎ ইউরোপীয় সভ্যতার সৃষ্টি ও স্থিতির মূল কারণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক নয়; আর তার ভিত্তি হচ্ছে একটি বিশেষ 'moral and intellectual tradition'। সেই ভিত্তির উপরই ইউরোপীয় সভ্যতার ইমারত গড়ে উঠেছে, এবং সেই ভিত আলগা হলেই ইউরোপীয় সভ্যতা ভেঙে পড়বে। এই ভিত্তির গোড়া আলগা হয়েছে বলেই ইউরোপ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয়েছিল। সুতরাং ইউরোপীয় সভ্যতা যাঁরা রক্ষা করতে চান তাঁদের জানা উচিত ইউরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি। কারণ ইউরোপে তথাকথিত মেটিরিয়াল সিভিলাইজেশন যাঁরা যথার্থ সিভিলাইজেশন ব'লে ভুল করেন তাঁরাই ইউরোপীয় সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বস্তুজগতের উপর প্রভুত্ব যথার্থ সভ্যতার ফল মাত্র, তার মূল নয়।

১১

গ্রীকসভ্যতা, রোমানসভ্যতা ও খৃস্টধর্ম—এই তিনে মিলে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে।

গ্রীক জাতি বর্তমান বিজ্ঞানের ভিত্তিপত্তন করে গিয়েছেন; রোমান জাতি

সমাজরক্ষার ও রাজ্যশাসনের নিয়ম বিধিবন্ধ করে গিয়েছেন। খৃস্টধর্ম প্রেয়র চাইতে শ্রেয়র মাহাত্ম্য যুগ যুগ ধরে প্রচার করেছে।

খৃস্টধর্মের আইডিয়ালিজ্‌ম্‌, গ্রীক রিয়ালিজ্‌ম্‌ ও রোমান লিগ্যালিজ্‌ম্‌-এর মিলনের ফলে ইউরোপীয় মানব তার গৌরব লাভ করেছে।

কিন্তু রেনেসাঁসের যুগ হতেই গ্রীক বিজ্ঞান, খৃস্ট নীতি ও রোমান রাজনীতি পরস্পর পৃথক্‌ হতে শুরু করে। ফলে ইউরোপীয় সভ্যতার ব্যালান্স ভঙ্গ হয়। ব্যালান্স যে ভঙ্গ হয়েছে, এ সত্য অনেক দিন আমাদের কাছে ধরা পড়ে নি। শেষটা পলিটিকাল মেটিরিয়ালিজ্‌ম্‌ যখন ইউরোপের লোকের মনকে গ্রাস করলে তখন গ্রীক বুদ্ধি এবং খৃস্ট ধর্মনীতি মানুষের মন থেকে খসে পড়ল। ফলে ইউরোপীয় সভ্যতার এখন এই দুর্দশা ঘটেছে। অর্থাৎ তার বাহ্য ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু ভিতরটা ফোঁপরা হয়ে গিয়েছে।

পৃথিবীর অপরাপর জাতির কাছে ইউরোপীয়েরা এখন আর একটা বড়ো সভ্যতার প্রতিনিধি বলে মান্য নয়। এ যুগে তারা চতুর বণিক অথবা নিপুণ শিল্পী বলেই গণ্য। তারা আজকের দিনে স্বার্থসাধন করতে অতিশয় পটু; কিন্তু এ নিপুণতা এ পটুতার অন্তরে কোনোরূপ বিশেষ সভ্য মনোভাব নেই। কারণ, এ জাতীয় কর্মকৌশল পৃথিবীর অপর সকল জাতিই আত্মসাৎ করতে পারে, সেই-সঙ্গে ইউরোপের ন্যাশনালিজ্‌ম্‌ ইন্‌ডাস্ট্রিয়ালিজ্‌মের ধর্মেও অনুপ্রাণিত হতে পারে। আর যখন পলিটিকাল ন্যাশনালিজ্‌ম্‌ এবং ইন্‌ডাস্ট্রিয়ালিজ্‌ম্‌এর মূল-মন্ত্র হচ্ছে অপর জাতির সঙ্গে বিরোধ, তখন যে-সব জাতিকে ইউরোপ এই নব মন্ত্রে দীক্ষিত করবে, এবং সে মন্ত্রের সাধনে সিদ্ধিলাভ করবার যন্ত্রপাতিও তাদের দেবে, সে-সব জাতি ইউরোপের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য নিশ্চয়ই প্রস্তুত হবে। এই হচ্ছে ইউরোপের তথাকথিত নবসভ্যতার কর্মফল।

১২

এখন দেখা গেল যে, জর্মান বৈজ্ঞানিক ও ফরাসি সাহিত্যিক উভয়েই মনে করেন যে, সম্মুখে মস্ত বিপদ আছে; অর্থাৎ ইউরোপীয় সভ্যতা এখন টলমল করছে। তার পর ইউরোপীয় সভ্যতা যে গ্রীক জ্ঞান, রোমান রাজনীতি ও খৃস্টধর্ম—এ তিনের সমবায়ে গড়ে উঠেছে, এ বিষয়েও উভয়েই একমত। শুধু বর্তমান সভ্যতার রূপগুণ সম্বন্ধে তাঁদের মতে মেলে না।

জর্মান অধ্যাপকের মতে টেক্‌নিকাল সিভিলাইজেশন হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার চরম পরিণতি; ফরাসি লেখকের মতে কিন্তু তা অবনতি। কারণ, সভ্যতার যা প্রাণ—অর্থাৎ intellectual and moral tradition—বর্তমান ইউরোপ তার থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। এখন ইউরোপে রোমান রাজনীতিই প্রভুত্ব করছে। বিশ্বমানবের উপর প্রভুত্ব করাই এ যুগে ইউরোপের একমাত্র মনোভাব। এ মনোভাব সভ্য মনোভাব নয়, এবং এই মনোভাবকে অতিক্রম করতে পারে নি বলেই রোমান সভ্যতা ধূলিসাৎ হয়েছে।

জাতিতে জাতিতে যে মনের ও চরিত্রের প্রভেদ আছে সে কথা ফরাসি লেখকও মানেন, এবং স্বধর্মপালন করেই জাতি যে সভ্য হয়ে উঠতে পারে, এই তাঁর দৃঢ় ধারণা; সুতরাং তিনিও ন্যাশনালিজ্‌মের মহাভক্ত। কিন্তু যে ন্যাশনালিজ্‌ম্ অপর ন্যাশনালিজ্‌মের হন্তারক সে ন্যাশনালিজ্‌ম্‌কে তিনি পলিটিকাল ন্যাশনালিজ্‌ম্ বলেন। কারণ, এ ন্যাশনালিজ্‌ম্ intellect ও morals-এর ধার ধারে না; অতএব হিংস্র হতে বাধ্য।

এখন ইউরোপীয় সভ্যতা কি করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে? ফরাসি লেখক বলেন যে, ইউরোপের মনে আবার কেউ যদি ধর্মজ্ঞান উদ্‌বুদ্ধ করতে পারে তা হলেই ইউরোপীয় সভ্যতা রক্ষা পায়। কিন্তু তা করবে কে?

জর্মান পণ্ডিতের মতে যদিও ইউরোপীয় সভ্যতা তার চরমপদ লাভ করেছে তবুও তার আরো উন্নতির অবসর আছে। এ বিষয়ে তাঁর শেষ কথা ক'টি উদ্‌ধৃত ক'রে দিচ্ছি—

If it is true that it has passed through all spheres of being and accomplished all tasks, it will begin the cycle a second time, and enriched by the experience and success of the first cycle, will be able to attain new heights. Perhaps the time is not far off when, following the example of the Greeks, it will once more find its chief aim in the shaping of man. Let us hope so. For it has become very necessary.

আমি জিজ্ঞাসা করি, মানুষ তৈরি করা কি সভ্যতার শেষ কথা না প্রথম কথা? আগে মানবসভ্যতা গ'ড়ে তার পর মানুষ গড়া, গাড়ির লেজে ঘোড়া জোতার মতো বৈজ্ঞানিক ব্যাপার নয় কি?

১৩

ইউরোপীয় সভ্যতা-যে কালে ভেঙে পড়বে এ ভয় আমরা পাই নে। কারণ, যে গুণে ইউরোপ সভ্য সে গুণের ধ্বংস নেই। জর্মান অধ্যাপক ও ফরাসি সাহিত্যিক উভয়ের মতেই পুরাকালের গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান, রোমের কল্পিত ধর্মশাস্ত্র ও মধ্যযুগের ধর্মমনোভাবই ইউরোপীয় সভ্যতার মালমসলা। এক কথায়, ইউরোপীয়দের মনই তাদের সভ্যতা গড়েছে।

গ্রীক সভ্যতা অনেক কাল হল ভেঙেচুরে গিয়েছে, কিন্তু গ্রীক দর্শন ও গ্রীক সাহিত্য আজও মানুষকে সভ্য করছে।

রোমের সাম্রাজ্য সেকালে ইউরোপের অসভ্য জাতিদের এক ধাক্কায় সমূলে বিনষ্ট হয়েছিল; কিন্তু আজও সমগ্র সভ্যজগৎ রোমের বিধিনিষেধ শাস্ত্র মেনেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে।

মধ্যযুগের ধর্মপ্রাণ সভ্যতার বিষয় আমরা বেশি কিছু জানি নে, সুতরাং জর্মান ও ফরাসি দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের কথা মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি

নেই। মধ্যযুগের সভ্যতা জ্ঞানকর্মহীন ছিল। একমাত্র ভক্তির উপর কোনো সভ্যতাই চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। ফলে, ইউরোপ যখন গ্রীক সাহিত্যের ও রোমান রাজনীতির সন্ধান পেলে তখন মধ্যযুগের সভ্যতার অবসান হল; যেমন এ যুগে আমরা ইউরোপের জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গের সন্ধান পেয়ে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের অবলম্বিত ভক্তিমার্গ ত্যাগ করেছি। তবে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে ইউরোপীয় মানবের ধর্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান মধ্যযুগের সৃষ্টি। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়। ইউরোপের নবধর্ম ডিমোক্রাসির মূল গ্রীকদর্শন নয়, নববিজ্ঞানও নয়। যে মনোভাবের উপর ডিমোক্রাসি প্রতিষ্ঠিত সে মনোভাবের স্রষ্টা হচ্ছেন যিশুখৃস্ট।

এর থেকে দেখা যায় যে, কোনো জাতিবিশেষ যে অংশে সভ্য সে অংশে অমর। শুধু তাই নয়, যেই সত্যের সন্ধান পাক-না কেন, সে সত্য সর্বসাধারণের সম্পত্তি। গ্রীক জাতি মারা গেল, কিন্তু তার দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যের উত্তরাধিকারী হল বিশ্ব-মানব। রোমান জাতি বিনষ্ট হল, কিন্তু তার সাহায্যে ইউরোপের তির্যক্-সামান্য অসভ্য জাতিরা মধ্যযুগের সভ্যতা গড়ে তুললে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সাহায্যে। মধ্যযুগের ব্রহ্মবিদ্যা (থিয়োলজি) গড়ে উঠেছে আরিস্টটলের দর্শনের ভিত্তির উপর; এবং তার খৃস্টসংঘ (চার্চ) গড়ে উঠেছে রোমান রাষ্ট্রসংঘের অনুকরণে।

১৪

সভ্যতা বলতে অধিকাংশ লোকে দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য ও আর্ট বোঝে না, বোঝে অর্থ ও স্বার্থ; এবং তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুলও নয়। অর্থ ও কাম, প্রবৃত্তিরেষা নরাণাম্। এবং যে সমাজে মানুষের এ দুটি প্রবৃত্তি চরিতার্থ না হয়, সে সমাজ কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না। যাকে আমরা মেটিরিয়াল সিভিলাইজেশন বলি সে বস্তু হচ্ছে সকল সভ্যতার যুগপৎ আধার ও ফল। না খেয়ে-প'রে মানুষ যে বাঁচতে পারে না, এ কথা কে না জানে? আমাদের পূর্বপুরুষরাও উপবাসী হয়ে হিন্দুসভ্যতা গড়তে পারেন নি। এ হিসাবে ইউরোপের বর্তমান মেটিরিয়াল সিভিলাইজেশন অবজ্ঞার বস্তু নয়।

সংস্কৃতে একটি বচন আছে, যা সর্বলোকবিদিত—

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।

এই অর্থগত সভ্যতা গড়বার বিদ্যা গ্রীসেরও জানা ছিল না, রোমেরও জানা ছিল না। এ উভয় জাতিই পরস্ব অপহরণ করেই নিজের স্বার্থ বজায় রাখতেন। গ্রীক-সভ্যতা দাঁড়িয়ে ছিল দাসের কর্মশক্তির উপর; আর রোমকসভ্যতা অপর দেশ লুঠতরাজের উপর। ফলে উভয় সভ্যতারই ভিত নেহাত কাঁচাই ছিল।

বর্তমান ইউরোপ যে বিদ্যার বলে মানুষে অর্থ সৃষ্টি করতে পারে, সে বিদ্যা অর্জন করেছে। এ হিসাবে সায়েন্সকেই ইউরোপীয় মনের চরম পরিণতি বলা অত্যুক্তি নয়।

কিন্তু গ্রীকদর্শন ও রোমান-আইন যেমন ও-দুই সভ্যতার একচেটে জিনিস

নয়—বিশ্বমানবের সম্পত্তি, তেমনি মডার্ন সায়েন্সও বর্তমান ইউরোপের একচেটে জিনিস নয়। এ বিদ্যা বিশ্বমানব শিখবে, এবং ফলিত বিজ্ঞানও বিশ্বমানবের করায়ত্ত হবে। ফলে, এ বিষয়েও ইউরোপের বর্তমান প্রাধান্য আর থাকবে না। ইউরোপীয় অর্থে এশিয়াও সভ্য হবে। এর জন্য ইউরোপের ভয় পাবার কোনো দরকার নেই। কোনো সভ্যসমাজকে অপর-কোনো সভ্যসমাজ বিনাশ করে নি। সভ্যতার প্রধান শত্রু যে অসভ্যতা, ইউরোপ ও এশিয়ার ইতিহাসের পাতায় পাতায় তা লেখা আছে।

এ তো গেল বহিঃশত্রুর কথা। এ ছাড়া ধ্বংসের মূল জাতির অন্তরেও থাকে। ইউরোপের মেটিরিয়াল সিভিলাইজেশনের মূলে যদি এই মনোভাব থাকে যে, ইউরোপীয়েরা পরের খাটনির ফল ভোগ করবে আর পরের দেশ লুঠে খাবে তা হলে অবশ্য গ্রীস-রোমের মতোই তার ধ্বংস অনিবার্য। এ অবস্থায়—

গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ

আদেশ মানলে তবেই তার ফাঁড়া কেটে যাবে।

কারণ, ধর্ম-আচরণের গুণ এই যে, তাতে লোকের অহংবুদ্ধি খর্ব করে। যে তিন পূর্বসভ্যতা ইউরোপের বর্তমান সভ্যতা গড়ে তুলেছে, সে তিনই ভেদবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে সে তিন কালচারই ইউরোপের অহংজ্ঞানকে পরিস্ফুট করেছে। এ বিষয়ে জনৈক আমেরিকান সাহিত্যিকের কথা নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, তার থেকে সকলেই দেখতে পাবেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতার স্পিরিট হচ্ছে অহংকার—

There is the pride of culture, like that of the ancient Greeks ; our word 'barbarian', from their term for all aliens, still expresses the feeling.

There is the pride of religion, remnant of the mediaeval perversion of Christianity, which transformed acceptance of the most inclusively loving and humble teacher earth has known, into a ground for arrogance. The tone in which 'pagan' and 'heathen' are often pronounced, tells the story.

There is the pride of political efficiency, inherited perhaps from Rome, causing us to despise those unpossessed of organized power.

Last to grow, perhaps, is the pride of scientific and mechanical achievement— that which impels a Westerner to identify sanitary plumbing and speedy communication with civilization.

এই মনের পাপই ইউরোপের প্রধান শত্রু; এবং হাস্ প্রমুখ পণ্ডিতেরা এ পাপের প্রশ্রয় আজও দিচ্ছেন।

আষাঢ় ১৩৩৭

বিচিত্র

আমরা ও তোমরা

তোমরা ও আমরা বিভিন্ন। কারণ তোমরা তোমরা, এবং আমরা আমরা। তা যদি না হত তা হলে ইউরোপ ও এশিয়া এ দুই, দুই হত না—এক হত। আমি ও তুমির প্রভেদ থাকত না। আমরা ও তোমরা উভয়ে মিলে, হয় শুধু আমরা হতুম, নাহয় শুধু তোমরা হতে।

২

আমরা পূর্ব, তোমরা পশ্চিম। আমরা আরম্ভ, তোমরা শেষ। আমাদের দেশ মানবসভ্যতার সূতিকাগৃহ, তোমাদের দেশ মানবসভ্যতার শ্মশান। আমরা ঊষা, তোমরা গোধূলি। আমাদের অন্ধকার হতে উদয়, তোমাদের অন্ধকারের ভিতর বিলয়।

৩

আমাদের রঙ কালো, তোমাদের রঙ সাদা। আমাদের বসন সাদা, তোমাদের বসন কালো। তোমরা শ্বেতাঙ্গ ঢেকে রাখ, আমরা কৃষ্ণদেহ খুলে রাখি। আমরা খাই সাদা জল, তোমরা খাও লাল পানি। আমাদের আকাশ আগুন, তোমাদের আকাশ ধোঁয়া। নীল তোমাদের স্ত্রীলোকের চোখে, সোনা তোমাদের স্ত্রীলোকের মাথায়: নীল আমাদের শূন্যে, সোনা আমাদের মাটির নীচে। তোমাদের ও আমাদের অনেক বর্ণভেদ। ভুলে যেন না যাই যে, তোমাদের দেশ ও আমাদের দেশের মধ্যে কালাপানির ব্যবধান। কালাপানি পার হলে আমাদের জাত যায়, না হলে তোমাদের জাত থাকে না।

৪

তোমরা দৈর্ঘ্য, আমরা প্রস্থ। আমরা নিশ্চল, তোমরা চঞ্চল। আমরা ওজনে ভারী, তোমরা দামে চড়া। অপরকে বশীভূত করবার তোমাদের মতে একমাত্র উপায় গায়ের জোর, আমাদের মতে একমাত্র উপায় মনের নরম ভাব। তোমাদের পুরুষের হাতে ইস্পাত, আমাদের মেয়েদের হাতে লোহা। আমরা বাচাল, তোমরা বধির। আমাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম—এত সূক্ষ্ম যে, আছে কি না বোঝা কঠিন; তোমাদের বুদ্ধি স্থূল—এত স্থূল যে, কতখানি আছে তা বোঝা কঠিন। আমাদের কাছে যা সত্য, তোমাদের কাছে তা কল্পনা; আর তোমাদের কাছে যা সত্য, আমাদের কাছে তা স্বপ্ন।

৫

তোমরা বিদেশে ছুটে বেড়াও, আমরা ঘরে শুয়ে থাকি। আমাদের সমাজ স্থাবর, তোমাদের সমাজ জঙ্গম। তোমাদের আদর্শ জানোয়ার, আমাদের আদর্শ উদ্ভিদ্।

তোমাদের নেশা মদ, আমাদের নেশা আফিং। তোমাদের সুখ ছটফটানিতে, আমাদের সুখ ঝিমুনিতে। সুখ তোমাদের ideal, দুঃখ আমাদের real। তোমরা চাও দুনিয়াকে জয় করবার বল, আমরা চাই দুনিয়াকে ফাঁকি দেবার ছল। তোমাদের লক্ষ্য আরাম, আমাদের লক্ষ্য বিরাম। তোমাদের নীতির শেষ কথা শ্রম, আমাদের আশ্রম।

তোমাদের মেয়ে প্রায়-পুরুষ, আমাদের পুরুষ প্রায়-মেয়ে। বুড়ো হলেও তোমাদের ছেলেমি যায় না, ছেলেবেলাও আমরা বুড়োমিতে পরিপূর্ণ। আমরা বিয়ে করি যৌবন না আসতে, তোমরা বিয়ে কর যৌবন গত হলে। তোমরা যখন সবে গৃহ-প্রবেশ কর, আমরা তখন বনে যাই।

৭

তোমাদের আগে ভালোবাসা পরে বিবাহ; আমাদের আগে বিবাহ পরে ভালোবাসা। আমাদের বিবাহ 'হয়', তোমরা বিবাহ 'কর'। আমাদের ভাষায় মুখ্য ধাতু 'ভূ', তোমাদের ভাষায় 'কৃ'। তোমাদের রমণীদের রূপের আদর আছে, আমাদের রমণীদের গুণের কদর নেই। তোমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অর্থশাস্ত্রে, আমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অলংকারশাস্ত্রে।

৮

অর্থাৎ এক কথায়, তোমরা যা চাও আমরা তা চাই নে, আমরা যা চাই তোমরা তা চাও না; তোমরা যা পাও আমরা তা পাই নে, আমরা যা পাই তোমরা তা পাও না। আমরা চাই এক, তোমরা চাও অনেক। আমরা একের বদলে পাই শূন্য, তোমরা অনেকের বদলে পাও একের পিঠে অনেক শূন্য।

তোমাদের দার্শনিক চায় যুক্তি, আমাদের দার্শনিক চায় মুক্তি। তোমরা চাও বাহির, আমরা চাই ভিতর। তোমাদের পুরুষের জীবন বাড়ির বাইরে, আমাদের পুরুষের মরণ বাড়ির ভিতর। আমাদের গান আমাদের বাজনা তোমাদের মতে শুধু বিলাপ, তোমাদের গান তোমাদের বাজনা আমাদের মতে শুধু প্রলাপ। তোমাদের বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সব জেনে কিছু না জানা, আমাদের জ্ঞানের উদ্দেশ্য কিছু না জেনে সব জানা। তোমাদের পরলোক স্বর্গ, আমাদের ইহলোক নরক। কাজেই পরলোক তোমাদের গম্য, ইহলোক আমাদের ত্যাজ্য। তোমাদের ধর্মমতে আত্মা অনাদি নয় কিন্তু অনন্ত, আমাদের ধর্মমতে আত্মা অনাদি কিন্তু অনন্ত নয়— তার শেষ নির্বাণ। পূর্বেই বলেছি, প্রাচী ও প্রতীচী পৃথক্। আমরাও ভালো, তোমরাও ভালো— শুধু তোমাদের ভালো আমাদের মন্দ ও আমাদের ভালো তোমাদের মন্দ। সুতরাং অতীতের আমরা ও বর্তমানের তোমরা, এই দুয়ে মিলে যে ভবিষ্যতের তারা হবে— তাও অসম্ভব।

শ্রাবণ ১৩০৯

খেয়ালখাতা

শ্রীমতী ভারতী-সম্পাদিকা নূতন বৎসরের প্রথম দিন হতে ভারতীর জন্য একটি খেয়ালখাতা খুলবেন। এই অভিপ্রায়ে যাঁরা লেখেন কিংবা লিখতে পারেন, কিংবা যাঁদের লেখা উচিত কিংবা লিখতে পারা উচিত—এমন অনেক লোকের কাছে দু-এক কলম লেখার নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। উপরোক্ত চারটি দলের মধ্যে আমি যে ঠিক কোথায় আছি, তা জানি নে। তবুও ভারতী-সম্পাদিকার সাদর নিমন্ত্রণ রক্ষা করা কর্তব্য বিবেচনায় দু-চার ছত্র রচনা করতে উদ্যত হয়েছি। ভারতী-সম্পাদিকা ভরসা দিয়েছেন যে, যা-খুশি লিখলেই হবে; কোনো বিশেষ বিষয়ের অবতারণা কিংবা আলোচনা করবার দরকার নেই। এ প্রস্তাবে অপরের কি হয় বলতে পারি নে, আমার তো ভরসার চাইতে ভয় বেশি হয়। আমাদের মন সহজে এবং শিক্ষার গুণে এতটা বৈষয়িক যে, বিষয়ের অবলম্বন ছেড়ে দিলে আমাদের মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়—বলবার কথা আর কিছু থাকে না। হাওয়ার উপর চলা যত সহজ, ফাঁকার উপর লেখাও তত সহজ। গণিতশাস্ত্রে যাই হোক, সাহিত্যে শূন্যের উপর শূন্য চাপিয়ে কোনো কথার গুণবৃদ্ধি করা যায় না। বিনিসুতার মালার ফরমাশ দেওয়া যত সহজ, গাঁথা তত সহজ নয়। ও-বিদ্যের সন্ধান শতেকে জনেক জানে। আসল কথা, আমরা সকলেই গভীর নিদ্রামগ্ন, শুধু কেউ কেউ স্বপ্ন দেখি। ভারতী-সম্পাদিকার ইচ্ছা, এই শেষোক্ত দলের একটু বকবার সুবিধে করে দেওয়া।

২

এ খেয়ালখাতা ভারতীর চাঁদার খাতা। স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে যিনি যা দেবেন, তা সাদরে গ্রহণ করা হবে। আধুলি সিকি দুআনি কিছুই ফেরত যাবে না, শুধু ঘষা পয়সা ও মেকি চলবে না। কথা যতই ছোটো হোক, খাঁটি হওয়া চাই—তার উপর চক্‌চকে হলে তো কথাই নেই। যে ভাব হাজার হাতে ফিরেছে, যার চেহারা বলে জিনিসটে লুপ্তপ্রায় হয়েছে, অতিপরিচিত বলে যা আর-কারো নজরে পড়ে না, সে ভাব এ খেয়ালখাতায় স্থান পাবে না। নিতান্ত পুরনো চিন্তা, পুরনো ভাবের প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে—আর্টিকেল লেখা। আমাদের কাজের কথায় যখন কোনো ফল ধরে না তখন বাজে-কথার ফুলের চাষ করলে হানি কি? যখন আমাদের ক্ষুধা-নিবৃত্তি করবার কোনো উপায় করতে পারছি নে, তখন দিন থাকতে শখ মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করাটা আবশ্যক। আর এ কথা বলা বাহুল্য, যেখানে কেনাবেচার কোনো সম্বন্ধ নেই—ব্যাপারটা হচ্ছে শুধু দান ও গ্রহণের, সে স্থলে কোনো ভদ্রসন্তান মসিজীবী হলেও যে কথা নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না কিংবা ঝুটো বলে জানেন, তা চালাতে চেষ্টা করবেন না। আমরা কার্যজগতে যখন সাচ্চা হতে পারি নে, তখন আশা করা যায় কল্পনাজগতে অলীকতার চর্চা করব না। এই কারণেই বলছি, ঘষা পয়সা ও মেকি চলবে না।

খেয়ালী লেখা বড়ো দুষ্প্রাপ্য জিনিস। কারণ সংসারে বদখেয়ালী লোকের কিছু কমতি নেই, কিন্তু খেয়ালী লোকের বড়োই অভাব। অধিকাংশ মানুষ যা করে তা আয়াসসাধ্য; সাধারণ লোকের পক্ষে একটুখানি ভাব অনেকখানি ভাবনার ফল। মানুষের পক্ষে চেষ্টা করাটাই স্বাভাবিক, সুতরাং সহজ। স্বতঃউচ্ছ্বসিত চিন্তা কিংবা ভাব শুধু দু-এক জনের নিজ প্রকৃতিগুণে হয়। যা আপনি হয় তা এতই শ্রেষ্ঠ ও এতই আশ্চর্যজনক যে, তার মূলে আমরা দৈবশক্তি আরোপ করি। এ জগৎসৃষ্টি ভগবানের লীলা বলেই এত প্রশস্ত, এবং আমাদের হাতে-গড়া জিনিস কষ্টসাধ্য বলেই এত সংকীর্ণ। তবে আমাদের সকলেরই মনে বিনা ইচ্ছাতেও যে নানাপ্রকার ভাবনাচিন্তার উদয় হয়, এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু সে ভাবনাচিন্তার কারণ স্পষ্ট এবং রূপ অস্পষ্ট। রোগ শোক দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা স্পষ্ট সাংসারিক কারণে আমাদের ভাবনা হয়; কিন্তু সে ভাবনা এতই এলোমেলো যে, অন্যে পারে কা কথা, আমরা নিজেরাই তার খেই খুঁজে পাই নে। যা নিজে ধরতে পারি নে তা অন্যের কাছে ধরে দেওয়া অসম্ভব; যে ভাব আমরা প্রকাশ করতে পারি নে, তাকে খেয়াল বলা যায় না। খেয়াল অনির্দিষ্ট কারণে মনের মধ্যে দিব্য একটি সুস্পষ্ট সুসম্বন্ধ চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়। খেয়াল রূপবিশিষ্ট, দুশ্চিন্তা তা নয়।

৪

খেয়াল অভ্যাস করবার পূর্বে খেয়ালের রূপনির্ণয় করাটা আবশ্যক, কারণ স্বরূপ জানলে অনধিকারীরা এ বিষয়ে বৃথা চর্চা করবেন না। আমাদের লিখিত-শাস্ত্রে খেয়ালের বড়ো উদাহরণ পাওয়া যায় না, সুতরাং সংগীতশাস্ত্র হতে এর আদর্শ নিতে হবে। এক কথায় বলতে গেলে, ধ্রুপদের অধীনতা হতে মুক্ত হবার বাসনাই খেয়ালের উৎপত্তির কারণ। ধ্রুপদের ধীর গম্ভীর শুদ্ধ শান্ত রূপ ছাড়াও পৃথিবীতে ভাবের অন্য অনেক রূপ আছে। বিলম্বিত লয়ের সাহায্যে মনের সকল স্ফূর্তি, সকল আক্ষেপ প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং ধ্রুপদের কড়া শাসনের মধ্যে যার স্থান নেই, যথা তান গিটকিরি ইত্যাদি, তাই নিয়েই খেয়ালের আসল কারবার। কিন্তু খেয়ালের স্বাধীন ভাব উচ্ছৃঙ্খল হলেও যথেচ্ছাচারী নয়। খেয়ালী যতই কার্দানি করুন-না কেন, তালচ্যুত কিংবা রাগভ্রষ্ট হবার অধিকার তাঁর নেই। জড় যেমন চৈতন্যের আধার, দেহ যেমন রূপের আশ্রয়ভূমি, রাগও তেমনি খেয়ালের অবলম্বন। বর্ণ ও অলংকার-বিন্যাসের উদ্দেশ্য রূপ ফুটিয়ে তোলা, লুকিয়ে ফেলা নয়। খেয়ালের চাল ধ্রুপদের মতো সরল নয় বলে মাতালের মতো আঁকা-বাঁকা নয়, নর্তকীর মতো বিচিত্র। খেয়াল ধ্রুপদের বন্ধন যতই ছাড়িয়ে যাক-না কেন, সুরের বন্ধন ছাড়ায় না; তার গতি সময়ে সময়ে অতিশয় দ্রুতলঘু হলেও ছন্দঃপতন হয় না। গানও যে নিয়মাধীন, লেখাও সেই নিয়মাধীন। যাঁর মন

সিধে পথ ভিন্ন চলতে জানে না, যাঁর কল্পনা আপনা হতেই খেলে না, যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে পারেন না, অথবা ছেড়ে দিলে আর নিজবশে রাখতে পারেন না—তাঁর খেয়াল-লেখার চেষ্টা না করাই ভালো। তাতে তাঁর শুধু গৌরবের লাঘব হবে। কৃশদেহ পুষ্ট করবার চেষ্টা অনেক সময় ব্যর্থ হলেও কখনোই ক্ষতিকর নয়, কিন্তু স্থূলদেহকে সূক্ষ্ম করবার চেষ্টায় প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। ইঙ্গিতজ্ঞ লোকমাত্রেই উপরোক্ত কথা-কটির সার্থকতা বুঝতে পারবেন।

৫

আমার কথার ভাবেই বুঝতে পারছেন যে, আমি খেয়াল বিষয়ে একটু হালকা অঙ্গের জিনিসের পক্ষপাতী। চুটকিও আমার অতি আদরের সামগ্রী—যদি সুর খাঁটি থাকে ও ঢঙ ওস্তাদী হয়। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের আজকাল প্রধান অভাব গুণপনাযুক্ত ছিবলেমি। এ সম্বন্ধে কৈফিয়তস্বরূপে দু-এক কথা বলা প্রয়োজন। কোনো ব্যক্তি কিংবা জাতি -বিশেষ যখন অবস্থা-বিপর্যয়ে সকল অধিকার হতে বিচ্যুত হয় তখন তার দুটি অধিকার অবশিষ্ট থাকে—কাঁদবার ও হাসবার। আমরা আমাদের সেই কাঁদবার অধিকার ষোলো-আনা বুঝে নিয়েছি এবং নিত্য কাজে লাগাচ্ছি। আমরা কাঁদতে পেলে যত খুশি থাকি, এমন আর কিছুতেই নয়। আমরা লেখায় কাঁদি, বক্তৃতায় কাঁদি। আমরা দেশে কেঁদেই সন্তুষ্ট থাকি নে, চাঁদা তুলে বিদেশে গিয়ে কাঁদি। আমাদের স্বজাতির মধ্যে যাঁরা স্থানে-অস্থানে, এমন-কি, অরণ্যে পর্যন্ত, রোদন করতে শিক্ষা দেন, তাঁরাই দেশের জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিমান ও প্রধান লোক বলে গণ্য এবং মান্য। যেখানে ফোঁস করা উচিত সেখানে ফোঁস-ফোঁস করলেই আমরা বলিহারি যাই। আমাদের এই কান্না দেখে কারো মন ভেজে না, অনেকের মন চটে। আমাদের নূতন সভ্যযুগের অপূর্ব সৃষ্টি ন্যাশনাল কন্‌গ্রেস অপর সদ্যোজাত শিশুর মতো ভূমিষ্ঠ হয়েই কান্না শুরু করে দিলে। আর যদিও তার সাবালক হবার বয়স উত্তীর্ণ হয়েছে তবুও বৎসরের তিনশো বাষট্টি দিন কুম্ভ-কর্ণের মতো নিদ্রা দিয়ে তার পর জেগে উঠেই তিন দিন ধরে কোঁকিয়ে কান্না সমান চলছে। যদি কেউ বলে, ছি, অত কাঁদ কেন, একটু কাজ কর না।—তা হলে তার উপর আবার চোখ রাঙিয়ে ওঠে। বয়সের গুণে শুধু ঐটুকু উন্নতি হয়েছে। মনের দুঃখের কান্নাও অতিরিক্ত হলে কারো মায়া হয় না। কিন্তু কান্না-ব্যাপারটাকে একটা কর্তব্যকর্ম করে তোলা শুধু আমাদের দেশেই সম্ভব হয়েছে। আমরা সমস্ত দিন গৃহকর্ম করে বিকেলে গা-ধুয়ে চুল-বেঁধে পা-ছড়িয়ে যখন পুরাতন মাতৃবিয়োগের জন্য নিয়মিত এক ঘণ্টা ধরে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে থাকি তখন পৃথিবীর পুরুষ-মানুষদের হাসিও পায়, রাগও ধরে। সকলেই জানেন যে, কান্না-ব্যাপারটারও নানা পদ্ধতি আছে, যথা রোলকান্না, মড়াকান্না, ফুঁপিয়ে কান্না, ফুলেফুলে কান্না ইত্যাদি; কিন্তু আমরা শুধু অভ্যাস করেছি নাকে-কান্না। এবং এ কথাও বোধ হয় সকলেই জানেন যে, সদারঙ্গ বলে গেছেন—খেয়ালে সব সুর লাগে, শুধু নাকী সুর লাগে না। এই-সব কারণেই আমার মতে এখন সাহিত্যের সুর বদলানো প্রয়োজন। করুণ-

রসে ভারতবর্ষ স্যাঁত্‌সেঁতে হয়ে উঠেছে; আমাদের সুখের জন্য না হোক, স্বাস্থ্যের জন্যও হাস্যরসের আলোক দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। যদি কেউ বলে, আমাদের এই দুর্দিনে হাসি কি শোভা পায়? তার উত্তর, ঘোর মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রিতেও কি বিদ্যুৎ দেখা দেয় না কিংবা শোভা পায় না? আমাদের এই অবিরতধারা অশ্রুবৃষ্টির মধ্যে কেহ-কেহ যদি বিদ্যুৎ সৃষ্টি করতে পারেন, তা হলে আমাদের ভাগ্যাকাশ পরিষ্কার হবার একটা সম্ভাবনা হয়।

বৈশাখ ১৩১২

মলাট-সমালোচনা

'সাহিত্য'-সম্পাদকমহাশয় সমীপেষু

'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি'-জিনিসটা এ দেশে একটা মস্ত ঠাট্টার সামগ্রী। কিন্তু বারো পাত বইয়ের তেরো পাত সমালোচনা দেখে কারোই হাসি পায় না। অথচ বীজ পরিমাণে এক হাত কমই হোক কি এক হাত বেশিই হোক, তার থেকে নতুন ফল জন্মায়; কিন্তু ঐরূপ সমালোচনায় সাহিত্যের কিংবা সমাজের কি ফললাভ হয়, বলা কঠিন। সেকালে যখন সূত্র-আকারে মূল গ্রন্থ রচনা করবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তখন ভাষ্যে-টীকায়-কারিকায় তার বিস্তৃত ব্যাখ্যার আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু একালে যখন, যে কথা দু কথায় বলা যায় তাই দুশো কথায় লেখা হয়, তখন সমালোচকদের ভাষ্যকার না হয়ে সূত্রকার হওয়াই সংগত। তাঁরা যদি কোনো নব্যগ্রন্থের খেই ধরিয়ে দেন তা হলেই আমরা পাঠকবর্গ যথেষ্ট মনে করি। কিন্তু ঐরূপ করতে গেলে তাঁদের ব্যাবসা মারা যায়। সুতরাং তাঁরা যে সমালোচনার রীতিপরিবর্তন করবেন এরূপ আশা করা নিষ্ফল।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যুক্তির প্রতিবাদ করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। আমার ঠিক মনে নেই যে, তিনি সাহিত্যেও অত্যুক্তি যে নিন্দনীয় এ কথাটা বলেছেন কি না। সে যাই হোক, রবীন্দ্রবাবুর সেই তীব্র প্রতিবাদে বিশেষ কোনো সুফল হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং দেখতে পাই যে, অত্যুক্তির মাত্রা ক্রমে সপ্তমে চড়ে গেছে। সমালোচক-দের অত্যুক্তিটা প্রায় প্রশংসা করবার সময়েই দেখা যায়। বোধ হয় তাঁদের বিশ্বাস যে, নিন্দা-জিনিসটা সোজা কথাতেই করা চলে কিন্তু প্রশংসাকে ডালপালা দিয়ে পত্রে-পুষ্পে সাজিয়ে বার করা উচিত। কেননা, নিন্দুকের চাইতে সমাজে চাটুকারের মর্যাদা অনেক বেশি। কিন্তু আসলে অতিনিন্দা এবং অতিপ্রশংসা উভয়ই সমান জঘন্য। কারণ, অত্যুক্তির 'অতি' শুধু সুরুচি এবং ভদ্রতা নয়, সত্যেরও সীমা অতিক্রম করে যায়। এক কথায়, অত্যুক্তি মিথ্যোক্তি। মিছা কথা মানুষে বিনা কারণে বলে না। হয় ভয়ে নাহয় কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্যই লোকে সত্যের অপলাপ করে। সম্ভবত অভ্যাসবশত মিথ্যাকে সত্যের অপেক্ষা অধিক-মাত্রায় কেউ-কেউ চর্চা করে। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলা চর্চা করলে ক্রমে তা উদ্দেশ্যবিহীন অভ্যাসে পরিণত হয়। বাংলা সাহিত্যে আজ-কাল যেরূপ নির্লজ্জ অতিপ্রশংসার বাড়াবাড়ি দেখতে পাওয়া যায় তাতে মনে হয় যে, তার মূলে উদ্দেশ্য এবং অভ্যাস দুই জিনিসই আছে। এক-একটি ক্ষুদ্র লেখকের ক্ষুদ্র পুস্তকের যে-সকল বিশেষণে স্তুতিবাদ করা হয়ে থাকে সেগুলি বোধ হয় শেক্‌স্‌পীয়র কিংবা কালিদাসের সম্বন্ধে প্রয়োগ করলেও একটু বেশি হয়ে পড়ে। সমালোচনা এখন বিজ্ঞাপনের মূর্তি ধারণ করেছে। তার থেকে বোঝা যায় যে, যাতে বাজারে বইয়ের ভালোরকম কাটতি হয় সেই উদ্দেশ্যে আজকাল সমালোচনা লেখা হয়ে থাকে। যে উপায়ে পেটেন্ট ঔষধ বিক্রি করা

হয় সেই উপায়েই সাহিত্যও বাজারে বিক্রি করা হয়। লেখক সমালোচক হয় একই ব্যক্তি, নয় পরস্পরে একই কারবারের অংশীদার। আমার মাল তুমি যাচাই করে পয়লা নম্বরের বলে দাও, তোমার মাল আমি যাচাই করে পয়লা নম্বরের বলে দেব—এইরকম একটা বন্দোবস্ত পেশাদার লেখকদের মধ্যে যে আছে এ কথা সহজেই মনে উদয় হয়। এই কারণেই পেটেন্ট ঔষধের মতোই একালের ছোটো-গল্প কিংবা ছোটোকবিতার বই মেধা হ্রী ধী শ্রী প্রভৃতির বর্ধক এবং নৈতিক বলকারক বলে উল্লিখিত হয়ে থাকে। কিন্তু এরূপ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে পাঠক নিত্যই প্রতারিত এবং প্রবঞ্চিত হয়। যা চ্যবনপ্রাশ বলে কিনে আনা হয় তা দেখা যায় প্রায়ই অকালকুষ্মাণ্ডখণ্ডমাত্র।

অতিবিজ্ঞাপিত জিনিসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অতি কম। কারণ, মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্বলতার উপর বিজ্ঞাপনের বল এবং মানবমনের সরল বিশ্বাসের উপর বিজ্ঞাপনের ছল প্রতিষ্ঠিত। যখন আমাদের একমাথা চুল থাকে তখন আমরা কেশবর্ধক তৈলের বড়ো-একটা সন্ধান রাখি নে। কিন্তু মাথায় যখন টাক চক্‌চক করে ওঠে তখনই আমরা কুন্তলবৃষ্যের শরণ গ্রহণ করে নিজেদের অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় পাই এবং দিই। কারণ, তাতে টাকের প্রসার ক্রমশই বৃদ্ধি পায় এবং সেইসঙ্গে টাকাও নষ্ট হয়। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য আমাদের মন ও নয়ন আকর্ষণ করা। বিজ্ঞাপন প্রতি ছত্রের শেষে প্রশ্ন করে—'মনোযোগ করেছেন তো?' আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করতে না পারলেও বিজ্ঞাপন চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের নয়ন আকর্ষণ করে থাকে। ও জিনিস চোখ এড়িয়ে যাবার জো নেই। কারণ, এ যুগে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রবন্ধের গা ঘেঁষে থাকে, মাসিকপত্রিকায় শিরোভূষণ হয়ে দেখা দেয়; এক কথায় সাহিত্যজগতে যেখানেই একটু ফাঁক দেখে সেইখানেই এসে জুড়ে বসে। ইংরেজি ভাষায় একটি প্রবচন আছে যে, প্রাচীরের কান আছে। এ দেশে সে বধির কি না জানি নে, কিন্তু বিজ্ঞাপনের দৌলতে মূক নয়। রাজপথের উভয় পার্শ্বের প্রাচীর মিথ্যা কথা তারস্বরে চিৎকার করে বলে। তাই আজকাল পৃথিবীতে চোখকান না বুজে চললে বিজ্ঞাপন কারো ইন্দ্রিয়ের অগোচর থাকে না। যদি চোখকান বুজে চল, তা হলেও বিজ্ঞাপনের হাত থেকে নিস্তার নেই। কারণ, পদব্রজেই চল আর গাড়িতেই যাও, রাস্তার লোকে তোমাকে বিজ্ঞাপন ছুঁড়ে মারে। এতে আশ্চর্য হবার কোনো কথা নেই; ছুঁড়ে মারাই বিজ্ঞাপনের ধর্ম। তার রঙ ছুঁড়ে মারে, তার ভাষা ছুঁড়ে মারে, তার ভাব ছুঁড়ে মারে। সুতরাং বিজ্ঞাপিত জিনিসের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা না থাকলেও তার মোড়কের সঙ্গে এবং মলাটের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় আছে। আমি বহু ঔষধের এবং বহু গ্রন্থের কেবল-মাত্র মুখ চিনি ও নাম জানি। যা জানি, তারই সমালোচনা করা সম্ভব। সুতরাং আমি মলাটের সমালোচনা করতে উদ্যত হয়েছি। অন্তত মুখপাতটুকু দোরস্ত করে দিতে পারলে আপাতত বঙ্গ সাহিত্যের মুখরক্ষা হয়।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, নব্যবঙ্গ সাহিত্যের কেবলমাত্র নাম-রূপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। প্রধানত সেই নাম-জিনিসটার সমালোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু রূপ-জিনিসটে একেবারে ছেঁটে দেওয়া চলে না বলে সে সম্বন্ধে

দুই-একটা কথা বলতে চাই। ডাক্তারখানার আলো যেমন লাল নীল সবুজ বেগুনে প্রভৃতি নানারূপ কাঁচের আবরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়, তেমনই পুস্তকের দোকানে একালের পুস্তক-পুস্তিকাগুলি নানারূপ বর্ণচ্ছটায় নিজেদের প্রকাশ করে। সুতরাং নব্যসাহিত্যের বর্ণপরিচয় যে আমার হয় নি, এ কথা বলতে পারি নে। কবিতা আজকাল গোধূলিতে গা-ঢাকা দিয়ে 'লজ্জানম্র নববধূসম' আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয় না; কিন্তু গালে আলতা মেখে রাজপথের সুমুখে বাতায়নে এসে দেখা দেয়। বর্ণেরও একটা আভিজাত্য আছে। তার সুসংযত ভাবের উপরেই তার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য নির্ভর করে। বাড়াবাড়ি জিনিসটা সব ক্ষেত্রেই ইতরতার পরিচায়ক। আমার মতে পূজার বাজারের নানারূপ রঙচঙে পোশাক পরে প্রাপ্ত-বয়স্ক সাহিত্যের সমাজে বার হওয়া উচিত নয়। তবে পূজার উপহার-স্বরূপে যদি তার চলন হয় তা হলে অবশ্য কিছু বলা চলে না। সাহিত্য যখন কুন্তলীন তাম্বূলীন এবং তরল আলতার সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হয় তখন পুরুষের পক্ষে পরুষ বাক্য ছাড়া তার সম্বন্ধে অন্য-কোনো ভাষা ব্যবহার করা চলে না। তবে এই কথা জিজ্ঞাসা করি যে, এতে যে আত্মমর্যাদার লাঘব হয় এ সহজ কথাটা কি গ্রন্থকারেরা বুঝতে পারেন না; কবি কি চান যে, তাঁর হৃদয়রক্ত তরল আলতার শামিল হয়; চিন্তাশীল লেখক কি এই কথা মনে করে সুখী হন যে, তাঁর মস্তিষ্ক লোকে সুবাসিত নারিকেলতৈল হিসাবে দেখবে; এবং বাণী কি রসনানিঃসৃত পানের পিকের সঙ্গে জড়িত হয়ে লজ্জা বোধ করেন না? আশা করি যে, বইয়ের মলাটের এই অতিরঞ্জিত রূপ শীঘ্রই সকলের পক্ষেই অরুচিকর হয়ে উঠবে। অ্যান্টিক কাগজে ছাপানো এবং চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে বাঁধানো পুস্তকে আমার কোনো আপত্তি নেই। দপ্তরিকে আসল গ্রন্থকার বলে ভুল না করলেই খুশি হই। আমরা যেন ভুলে না যাই যে, লেখকের কৃতিত্ব মলাটে শুধু ঢাকা পড়ে। জীর্ণ কাগজে, শীর্ণ অক্ষরে, ক্ষীণ কালিতে ছাপানো একখানি পদকল্পতরু যে শত শত তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে গ্রন্থের চাইতে শতগুণ আদরের সামগ্রী।

এখন সমালোচনা শুরু করে দেবার পূর্বেই কথাটার একটু আলোচনা করা দরকার। কারণ, ঐ শব্দটি আমরা ঠিক অর্থে ব্যবহার করি কি না সে বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে। প্রথমেই, 'সম্'-উপসর্গটির যে বিশেষ-কোনো সার্থকতা আছে এরূপ আমার বিশ্বাস নয়। শব্দ অতিকায় হলে যে তার গৌরববৃদ্ধি হয় এ কথা আমি মানি; কিন্তু, দেহভারের সঙ্গে সঙ্গে যে বাক্যের অর্থভার বেড়ে যায় তার কোনো বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ যুগের লেখকেরা মাতৃভাষায় লিখেই সন্তুষ্ট থাকেন না, কিন্তু সেইসঙ্গে মায়ের দেহপুষ্টি করাও তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করেন। কিন্তু সে পুষ্টিসাধনের জন্য বহুসংখ্যক অর্থপূর্ণ ছোটো-ছোটো কথা চাই যা সহজেই বঙ্গ ভাষার অঙ্গীভূত হতে পারে। স্বল্পসংখ্যক এবং কতকাংশে নিরর্থক বড়ো বড়ো কথার সাহায্যে সে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে না। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় অতি সামান্য; কিন্তু সেই স্বল্পপরিচয়েই আমার এইটুকু জ্ঞান জন্মেছে যে, সে ভাষার বাক্যাবলী আয়ত্ত করা নিতান্ত কঠিন। সংস্কৃতের উপর হস্তক্ষেপ করবা মাত্রই তা আমাদের হস্তগত হয় না। বরং

আমাদের অশিক্ষিত হাতে পড়ে প্রায়ই তার অর্থবিকৃতি ঘটে। সংস্কৃত সাহিত্যে গোঁজামিলন-দেওয়া জিনিসটা একেবারেই প্রচলিত ছিল না। কবি হোন্, দার্শনিক হোন্, আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রত্যেক কথাটি ওজন করে ব্যবহার করতেন। শব্দের কোনোরূপ অসংগত প্রয়োগ সেকালে অমার্জনীয় দোষ বলে গণ্য হত। কিন্তু একালে আমরা কথার সংখ্যা নিয়েই ব্যস্ত, তার ওজনের ধার বড়ো-একটা ধারি নে। নিজের ভাষাই যখন আমরা সূক্ষ্ম অর্থ বিচার করে ব্যবহার করি নে, তখন স্বল্প-পরিচিত এবং অনায়ত্ত সংস্কৃত শব্দের অর্থ বিচার করে ব্যবহার করতে গেলে সে ব্যবহার যে বন্ধ হবার উপক্রম হয়, তা আমি জানি। তবুও একেবারে বেপরোয়া-ভাবে সংস্কৃত শব্দের অতিরিক্ত-ব্যবহারের আমি পক্ষপাতী নই। তাতে মনোভাবও স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা যায় না, এবং ভাষাও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপে দেখানো যেতে পারে, এই 'সমালোচনা'-কথাটা আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি তার আসল অর্থ ঠিক তা নয়। আমরা কথায় বলি 'লেখাপড়া শিখি'; কিন্তু আসলে আমরা অধিকাংশ শিক্ষিত লোক শুধু পড়তেই শিখি, লিখতে শিখি নে। পাঠক-মাত্রেরই পাঠ্য কিংবা অপাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে মতামত গড়ে তোলবার ক্ষমতা থাক্ আর না থাক্, মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার আছে; বিশেষত সে কার্যের উদ্দেশ্য যখন আর-পাঁচজনকে বই পড়ানো, লেখানো নয়। সুতরাং সমালোচিতব্য বিষয়ের বাংলা সাহিত্যে অভাব থাকলেও সমালোচনার কোনো অভাব নেই। এই সমালোচনা-বন্যার ভিতর থেকে একখানিমাত্র বই উপরে ভেসে উঠেছে। সে হচ্ছে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আলোচনা'। তিনি যদি উক্ত নামের পরিবর্তে তার 'সমালোচনা' নাম দিতেন তা হলে, আমার বিশ্বাস, বৃথা বাগাড়ম্বরে 'আলোচনা'র ক্ষুদ্র দেহ আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে এত গুরুভার হয়ে উঠত যে, উক্ত শ্রেণীর আর-পাঁচখানা বইয়ের মতো এখানিও বিস্মৃতির অতল জলে ডুবে যেত। এই দুটি শব্দের মধ্যে যদি একটি রাখতেই হয় তা হলে 'সম্' বাদ দিয়ে 'আলোচনা' রক্ষা করাই শ্রেয়। যদিচ ও-কথাটিকে আমি ইংরেজি criticism শব্দের ঠিক প্রতিবাক্য বলে মনে করি নে। আলোচনা মানে 'আ' অর্থাৎ বিশেষরূপে 'লোচন' অর্থাৎ ঈক্ষণ। যে বিষয়ে সন্দেহ হয় তার সন্দেহভঞ্জন করবার জন্য বিশেষরূপে সেটিকে লক্ষ্য করে দেখবার নামই আলোচনা। তর্কবিতর্ক বাগ্‌বিতণ্ডা আন্দোলন-আলোড়ন প্রভৃতি অর্থেও ঐ কথাটি আজকালকার বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু ও-কথায় তার কোনো অর্থই বোঝায় না। 'আলোচনা' ইংরেজি scrutinize শব্দের যথার্থ প্রতি-বাক্য। ক্রিটিসিজ্‌ম্ শব্দের ঠিক প্রতিবাক্য বাংলা কিংবা সংস্কৃত ভাষায় না থাকলেও 'বিচার' শব্দটি অনেক পরিমাণে সেই অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু 'সমালোচনা'র পরিবর্তে 'বিচার' যে বাঙালি সমালোচকদের কাছে গ্রাহ্য হবে, এ আশা আমি রাখি নে। কারণ, এঁদের উদ্দেশ্য—বিচার করা নয়, প্রচার করা। তা ছাড়া যে কথাটা একবার সাহিত্যে চলে গেছে তাকে অচল করবার প্রস্তাব অনেকে হয়তো দুঃসাহসিকতার পরিচয় বলে মনে করবেন। তার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, পূর্বে যখন আমরা নির্বিচারে বহুসংখ্যক সংস্কৃত শব্দকে বঙ্গ সাহিত্যের কারাগারে প্রবেশ করিয়েছি, এখন আবার সুবিচার করে তার গুটিকতককে মুক্তি দেওয়াটা

বোধ হয় অন্যায় কার্য হবে না। আর-এক কথা। যদি ক্রিটিসিজ্‌ম্‌ অর্থেই আমরা আলোচনা শব্দ ব্যবহার করি, তা হলে স্ক্রুটিনাইজ্‌ অর্থে আমরা কি শব্দ ব্যবহার করব? সুতরাং যে উপায়ে আমরা মাতৃভাষার দেহপুষ্টি করতে চাই, তাতে ফলে শুধু তার অঙ্গহানি হয়। শব্দ সম্বন্ধে যদি আমরা একটু শুচিবাতিকগ্রস্ত হতে পারি তা হলে, আমার বিশ্বাস, বঙ্গ ভাষার নির্মলতা অনেক পরিমাণে রক্ষিত হতে পারে। অনাবশ্যকে যদি আমরা সংস্কৃত ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করতে সংকুচিত হই, তাতে সংস্কৃত ভাষার উপর অবজ্ঞা দেখানো হবে না বরং তার প্রতি যথার্থ ভক্তিই দেখানো হবে। শব্দগৌরবে সংস্কৃত ভাষা অতুলনীয়। কিন্তু তাই বলে তার ধ্বনিতে মুগ্ধ হয়ে আমরা যে শুধু তার সাহায্যে বাংলা সাহিত্যে ফাঁকা আওয়াজ করব, তাও ঠিক নয়। বাণী কেবলমাত্র ধ্বনি নয়। আমি বহুদিন থেকে এই মত প্রচার করে আসছি, কিন্তু আমার কথায় কেউ কর্ণপাত করেন না। সাহিত্যজগতে একশ্রেণীর জীব বিচরণ করে, যাদের প্রাণের চাইতে কান বড়ো। সংগীতচর্চার লোভ তারা কিছুতেই সংবরণ করতে পারে না, এবং সে ব্যাপার থেকে তাদের নিরস্ত করবার ক্ষমতাও কারো নেই। প্রতিবাদ করায় বিশেষ-কোনো ফল নেই জেনেও আমি প্রতিবাদ করি; কারণ, আজকালকার মতে, আপত্তি নিশ্চিত অগ্রাহ্য হবে জেনেও আপত্তি ক'রে আপত্তিকর জিনিসটে সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য বলে বিবেচিত হয়।

এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, কোনো বিশেষ লেখকের বা লেখার প্রতি কটাক্ষ করে আমি এ-সব কথা বলছি নে। বাংলা সাহিত্যের একটা প্রচলিত ধরন ফ্যাশন এবং ঢঙের সম্বন্ধেই আমার আপত্তি, এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই আমার উদ্দেশ্য। সমাজের কোনো চলতি স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে যে আমরা কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে পেঁছিতে পারি, এমন অন্যায় ভরসা আমি রাখি নে। সকল উন্নতির মূলে থামা জিনিসটে বিদ্যমান। এ পৃথিবীতে এমন-কোনো সিঁড়ি নেই যার ধাপে ধাপে পা ফেলে আমরা অবলীলাক্রমে স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হতে পারি। মনোজগতে প্রচলিত পথ ক্রমে সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতর হয়ে শেষে চোরা-গলিতে পরিণত হয়, এবং মানুষের গতি আটকে দেয়। বিজ্ঞানে যাকে ইভলিউশন বলে, এক কথায় তার পদ্ধতি এই যে, জীব একটা প্রচলিত পথে চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে ডাইনে কি বাঁয়ে একটা নূতন পথ আবিষ্কার করে এবং সাহস করে সেই পথে চলতে আরম্ভ করে। এই নূতন পথ বার করা এবং সেই পথ ধরে চলার উপরেই জীবের জীবন এবং মানুষের মনুষ্যত্ব নির্ভর করে। মুক্তির জন্যে, হয় দক্ষিণ নয় বাম মার্গ যে অবলম্বন করতেই হবে, এ কথা এ দেশে ঋষি-মুনিরা বহুকাল পূর্বে বলে গেছেন; অতএব একেলে বিজ্ঞান এবং সেকেলে দর্শন উভয়ই এই শিক্ষা দেয় যে, সিধে পথটাই মৃত্যুর পথ। সুতরাং বাংলা লেখার প্রচলিত পথটা ছাড়তে পরামর্শ দিয়ে আমি কাউকে বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করি নে। আমার বিশ্বাস যে, সংস্কৃত ছেড়ে যদি আমরা দেশী পথে চলতে শিখি তাতে বাংলা সাহিত্যের লাভ বৈ লোকসান নেই। ঐ পথটাই তো স্বাধীনতার পথ, এবং সেই কারণেই উন্নতির পথ—এই ধারণাটি মনে এসে যাওয়াতেও আমাদের

অনেক উপকার আছে। আমি জানি যে, সাহিত্যে কিংবা ধর্মে একটা নূতন পথ আবিষ্কার করবার ক্ষমতা কেবলমাত্র দু-চার-জন মহাজনেরই থাকে, বাদ-বাকি আমরা পাঁচজনে সেই মহাজন-প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে চলতে পারলেই আমাদের জীবন সার্থক হয়। গড্ডলিকাপ্রবাহ ন্যায়ের অবলম্বন করা জনসাধারণের পক্ষে স্বাভাবিকও বটে, কর্তব্যও বটে; কেননা, পৃথিবীর সকল ভেড়াই যদি মেড়া হয়ে ওঠে তো ঢুঁ-মারামারি করেই মেষবংশ নির্বংশ হবে। উক্ত কারণেই আমি লেখবার একটা প্রচলিত ধরনের বিরোধী হলেও প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের বিরোধী নই। আমরা কেউ ভাষা জিনিসটে তৈরি করি নে, সকলেই তৈরি ভাষা ব্যবহার করি। ভাষা জিনিসটে কোনো-একটি বিশেষ ব্যক্তির মনগড়া নয়, যুগযুগান্তর ধরে একটি জাতির হাতে-গড়া। কেবলমাত্র মনোমত কথা বেছে নেবার, এবং ব্যাকরণের নিয়ম-রক্ষা করে সেই বাছাই কথাগুলিকে নিজের পছন্দমত পাশাপাশি সাজিয়ে রাখবার স্বাধীনতাই আমাদের আছে। আমাদের মধ্যে যাঁরা জহুরী তাঁরা এই চলতি কথার মধ্যেই রত্ন আবিষ্কার করেন, এবং শিল্পগুণে গ্রথিত করে দিব্য হার রচনা করেন। নিজের রচনাশক্তির দারিদ্র্যের চেহারাই আমরা মাতৃভাষার মুখে দেখতে পাই, এবং রাগ করে সেই আয়নাখানিকে নষ্ট করতে উদ্যত হই ও পূর্বপুরুষদের সংস্কৃত দর্পণের সাহায্যে মুখরক্ষা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠি। একরকম কাঁচ আছে যাতে মুখ মস্ত দেখায়, কিন্তু সেইসঙ্গে চেহারা অপরিচিত বিকটাকার ধারণ করে। আমাদের নিজেকে বড়ো দেখাতে গিয়ে যে আমরা কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধারণ করি, তাতে আমাদের কোনো লজ্জাবোধ হয় না। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, প্রচলিত ভাষা কাকে বলে। তার উত্তরে আমি বলি, যে ভাষা আমাদের সুপরিচিত, সম্পূর্ণ আয়ত্ত, এবং যা আমরা নিত্য ব্যবহার করে থাকি। তা খাঁটি বাংলাও নয়, খাঁটি সংস্কৃতও নয়, কিংবা উভয়ে মিলিত কোনোরূপ খিচুড়িও নয়। যে সংস্কৃত শব্দ প্রকৃত কিংবা বিকৃত রূপে বাংলা কথার সঙ্গে মিলেমিশে রয়েছে, সে শব্দকে আমি বাংলা বলেই জানি এবং মানি। কিন্তু কেবলমাত্র নূতনত্বের লোভে নতুন করে যে-সকল সংস্কৃত শব্দকে কোনো লেখক জোর করে বাংলা ভাষার ভিতর প্রবেশ করিয়েছেন অথচ খাপ খাওয়াতে পারেন নি, সেই-সকল শব্দকে ছুঁতে আমি ভয় পাই। এবং যে-সকল সংস্কৃত শব্দ স্পষ্টত ভুল অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে সেই-সকল শব্দ যাতে ঠিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে বিষয়ে আমি লেখকদের সতর্ক হতে বলি। নইলে বঙ্গ ভাষার বনলতা যে সংস্কৃত ভাষার উদ্যানলতাকে তিরস্কৃত করবে, এমন দুরাশা আমার মনে স্থান পায় না। শব্দকল্পদ্রুম থেকে আপনা হতে খসে যা আমাদের কোলে এসে পড়েছে তা মুখে তুলে নেবার পক্ষে আমার কোনো আপত্তি নেই। তলার কুড়োও, কিন্তু সেইসঙ্গে গাছেরও পেড়ো না। তাতে যে পরিমাণ পরিশ্রম হবে, তার অনুরূপ ফললাভ হবে।

শুধু গাছ থেকে পাড়া নয়, একেবারে তার আগ্ডাল থেকে পাড়া গুটিকতক শব্দের পরিচয় আমি সম্প্রতি বইয়ের মলাটে পেয়েছি। এবং সে সম্বন্ধে আমার দু-একটি কথা বক্তব্য আছে। যাঁরা 'শব্দাধিক্যাৎ অর্থাধিক্যং' মীমাংসার এই নিয়ম মানেন না, বরং তার পরিবর্তে সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধে 'অধিকন্তু ন দোষায়'—এই-

উদ্‌ভট বচন অনুসারে কার্যানুবর্তী হয়ে থাকেন, তাঁরাও একটা গণ্ডির ভিতর থেকে বেরিয়ে যেতে সাহসী হন না। এমন সাহিত্যবীর বোধ হয় বাংলাদেশে খুব কম আছে; যারা বঙ্গরমণীর মাথায় ধম্মিল্ল চাপিয়ে দিতে সংকুচিত না হয়, যদিচ সে বেচারারা নীরবে পুরুষের সব অত্যাচারই সহ্য করে থাকে। বঙ্কিমী যুগে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার কিছু কম ছিল না। অথচ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও 'প্রাড়্‌বিবাক্' শব্দটি 'মলিম্‌লুচে'র ন্যায় কটু ভাষার হিসাবে গণ্য ক'রে চোর এবং বিচারপতিকে একই আসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন। 'প্রাড়্‌বিবাক্' বেচারা বাঙালি জাতির নিকট এতই অপরিচিত ছিল যে, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তার ঐরূপ লাঞ্ছনাতেও কেউ আপত্তি করেন নি। কিন্তু আজকাল ওর চাইতেও অপরিচিত শব্দও নতুন গ্রন্থের বক্ষে কৌস্তুভমণির মতো বিরাজ করতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি দু-একটির উল্লেখ করব।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল জাতকবি। তাঁর ভালো-মন্দ-মাঝারি সকল কবিতাতেই তাঁর কবির জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। বোধ হয় তাঁর রচিত এমন-একটি কবিতাও নেই যার অন্তত একটি চরণেও ধ্বজবজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন না লক্ষিত হয়। সত্যের অনুরোধে এ কথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, তাঁর নতুন পুস্তকের নামটিতে আমার একটু খটকা লেগেছিল। 'এষা' শব্দের সঙ্গে আমার ইতিপূর্বে কখনো দেখাসাক্ষাৎ হয় নি, এবং তাব নামও আমি পূর্বে কখনো শুনি নি। কাজেই আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল যে, হয়তো 'আয়েষা' নয়তো 'এশিয়া' কোনো-রূপ ছাপার ভুলে 'এষা'-রূপ ধারণ করেছে। আমার এরূপ সন্দেহ হবার কারণও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র যখন আয়েষাকে নিয়ে নভেল লিখেছেন তখন তাকে নিয়ে অক্ষয়কুমার যে কবিতা রচনা করবেন, এতে আর আশ্চর্য হবার কারণ কি থাকতে পারে। 'আবার বলি ওসমান! এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।'—এই পদটির উপর রমণীহৃদয়ের সপ্তকাণ্ড-রামায়ণ খাড়া করা কিছু কঠিন নয়। তার পর 'এশিয়া'—প্রাচীর এই নবজাগরণের দিনে তার প্রাচীন নিদ্রাভঙ্গ করবার জন্য যে কবি উৎসুক হয়ে উঠবেন, এও তো স্বাভাবিক। যার ঘুম সহজে ভাঙে না তার ঘুম ভাঙাবার দুটিমাত্র উপায় আছে—হয় টেনে-হিঁচড়ে, নয় ডেকে। এশিয়ার ভাগ্যে টানা-হ্যাঁচড়ানো-ব্যাপারটা তো পুরোদমে চলছে, কিন্তু তাতেও যখন তার চৈতন্য হল না তখন ডাকাডাকি ছাড়া আর কি উপায় আছে। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা এশিয়াকে কাব্যে দর্শনে নানারূপ ঘুমপাড়ানি-মাসিপিসির গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছেন। এখন আবার জাগাতে হলে এ যুগের কবিরা 'জাগর'-গান গেয়েই তাকে জাগাতে পারবেন। সে গান অনেক কবি সুরে-বেসুরে গাইতেও শুরু করে দিয়েছেন। সুতরাং আমার সহজেই মনে হয়েছিল যে, অক্ষয়কুমার বড়ালও সেই কার্যে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু এখন শুনছি যে, ও ছাপার ভুল নয়, আমারই ভুল। প্রাচীন গাথার ভাষায় নাকি 'এষা'র অর্থ অন্বেষণ। একালের লেখকেরা যদি শব্দের অন্বেষণে সংস্কৃতযুগ ডিঙিয়ে একেবারে প্রাচীন গাথা-যুগে গিয়ে উপস্থিত হন, তা হলে একেলে বঙ্গপাঠকদের উপর একটু অত্যাচার করা হয়; কারণ, সেই শব্দের অর্থ-অন্বেষণে পাঠক যে কোন্ দিকে যাবে তা স্থির

করতে পারে না। আজকালকার বাংলা বুঝতে অমরের সাহায্য আবশ্যক, তার পর যদি আবার যাস্ক চর্চা করতে হয় তা হলে বাংলা সাহিত্য পড়বার অবসর আমরা কখন পাব? যাস্কের সাহায্যেও যদি তার অর্থবোধ না হয় তা হলে বাংলা সাহিত্যের চর্চা যে আমরা ত্যাগ করব, তাতে আর সন্দেহ কি। অর্থবোধ হয় না বলে যখন আমরা আমাদের পরকালের সদ্‌গতির একমাত্র সহায় যে সন্ধ্যা তারই পাঠ বন্ধ করেছি, তখন ইহকালের ক্ষণিক সুখের লোভে যে আমরা গাথার শব্দে রচিত বাংলা সাহিত্য পড়ব, এ আশা করা যেতে পারে না। তা ছাড়া বৈদিক এবং অতিবৈদিক ভাষা থেকে যদি আমরা বাক্যসংগ্রহ করতে আরম্ভ করি তা হলে তান্ত্রিক ভাষাকেই বা ছাড়ব কেন? আমার লিখিত নতুন বইখানির নাম যদি আমি 'ফেৎকারিণী' 'ডামর' কিংবা 'উড্ডীশ' দিই তা হলে কি পাঠকসম্প্রদায় খুব খুশি হবেন?

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পুস্তিকাগুলির নামকরণ-বিষয়ে যে অপূর্বতা দেখিয়ে থাকেন তা আমাকে ভীত না করুক, বিস্মিত করে। আমি সাহিত্যের বাজারে মাল যাচাই করবার জন্য কষ্টিপাথর হাতে নিয়ে ব্যাবসা খুলে বসি নি। সুতরাং সুধীন্দ্রবাবুর রচনার দোষগুণ দেখানো আমার কর্তব্যের মধ্যে নয়। একমাত্র মলাটে তাঁর লেখা যেটুকু আত্মপরিচয় দেয়, সেইটুকু আমার বিচারাধীন। 'মঞ্জুষা' 'করণ্ডক' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে যে আমাদের একেবারে মুখ-দেখাদেখি নেই, এ কথা বলতে পারি নে। তা হলেও স্বীকার করতে হবে যে, অন্তত পাঠিকাদের নিকট ও-পদার্থগুলি যত সুপরিচিত, ও-নামগুলি তাদৃশ নয়। তা ছাড়া ঐরূপ নামের যে বিশেষ-কোনো সার্থকতা আছে, তাও আমার মনে হয় না। আমাদের কল্পনাজাত বস্তু আমরা প্যাটরায় পুরে সাধারণের কাছে দিই নে, বরং সত্য কথা বলতে গেলে মনের প্যাটরা থেকে সেগুলি বার করে জনসাধারণের চোখের সমুখে সাজিয়ে রাখি। করণ্ডকের কথা শুনলেই তাম্বুলের কথা মনে হয়। পানের খিলির সঙ্গে সুধীন্দ্র-বাবুর ছোটোগল্পগুলির কি সাদৃশ্য আছে, জানি নে। করুণরস এবং পানের রস এক জিনিস নয়। আর-একটি কথা। তাম্বুলের সঙ্গে সঙ্গে চর্বিতচর্বণের ভাবটা মানুষের মনে সহজেই আসে। সে যাই হোক, আমি লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি যে, সুধীন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত 'বৈতানিক' শব্দ আমি বৈতালিক শব্দের ছাপান্তর মনে করেছিলুম। হাজারে নশো নিরানব্বই জন বাঙালি পাঠক যে ও-শব্দের অর্থ জানেন না এ কথা বোধ হয় সুধীন্দ্রবাবু অস্বীকার করবেন না। আমার যতদূর মনে পড়ে তাতে কেবলমাত্র ভৃগুপ্রোক্ত মানবধর্মশাস্ত্রে এক স্থলে ঐ শব্দটির ব্যবহার দেখেছি। কিন্তু তার অর্থ জানা আবশ্যক মনে করি নি। এইরূপ নামে বইয়ের পরিচয় দেওয়া হয় না, বরং তার পরিচয় গোপন করাই হয়। বাংলা-সরস্বতীকে ছদ্মবেশ না পরালে যে তাঁকে সমাজে বার করা চলে না, এ কথা আমি মানি নে।

এই নামের উদাহরণ-ক'টি টেনে আনবার উদ্দেশ্য আমার সেই প্রথম কথার প্রমাণ দেওয়া। সে কথা এই যে, বঙ্গ সাহিত্যের ভিতর সমালোচনার মতো নামকরণেও বিজ্ঞাপনের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপনের আর-পাঁচটা দোষের ভিতর

একটা হচ্ছে তার ন্যাকামি। ন্যাকামির উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজে লোকপ্রিয় হওয়া, এবং তার লক্ষণ হচ্ছে ভাবে এবং ভাষায় মাধুর্যের ভান এবং ভঙ্গি। বঙ্গ সাহিত্যে ক্রমে যে তাই প্রশ্রয় পাচ্ছে, সেইটে দেখিয়ে দেবার জন্যে আমার এত কথা বলা। আমরা এতটাই কোমলের ভক্ত হয়ে পড়েছি যে, শুদ্ধ স্বরকেও কোমল করতে গিয়ে বিকৃত করতে আমরা তিলমাত্র দ্বিধা করি নে। কথায় বলে, 'যত চিনি দেবে ততই মিষ্টি হবে'। কিন্তু শর্করার ভাগ অতিরিক্ত হলে মিষ্টান্নও যখন অখাদ্য হয়ে ওঠে তখন ঐ পদ্ধতিতে রচিত সাহিত্যও যে অরুচিকর হয়ে উঠবে, তাতে আর সন্দেহ কি। লেখকেরা যদি ভাষাকে সুকুমার করবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তাকে সুস্থ এবং সবল করবার চেষ্টা করেন তা হলে বঙ্গ সাহিত্যে আবার প্রাণ দেখা দেবে। ভাষা যদি প্রসন্ন হয়, তা হলে তার কর্কশতাও সহ্য হয়। এ এতই সোজা কথা যে, এও যে আবার লোককে বোঝাতে হয়, এই মহা আপসোসের বিষয়। যখন বঙ্গ সাহিত্যে অন্ধকার আর 'বিরাজ' করবে না তখন এ বিষয়ে আর কারো 'মনোযোগ আকর্ষণ' করবার দরকারও হবে না।

অগ্রহায়ণ ১৩১৯

'যৌবনে দাও রাজটিকা'

গতমাসের সবুজ পত্রে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যৌবনকে রাজটিকা দেবার প্রস্তাব করেছেন। আমার কোনো টীকাকার বন্ধু এই প্রস্তাবের বক্ষ্যমাণ-রূপ ব্যাখ্যা করেছেন—

যৌবনকে টিকা দেওয়া অবশ্যকর্তব্য, তাহাকে বসন্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য। এস্থলে রাজটিকা অর্থ—রাজা অর্থাৎ যৌবনের শাসনকর্তা কর্তৃক তাহার উপকারার্থে দত্ত যে টিকা, সেই টিকা। উক্তপদ তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাসে সিদ্ধ হইয়াছে।

উল্লিখিত ভাষ্য আমি রহস্য বলে মনে করতুম যদি-না আমার জানা থাকত যে, এ দেশে জ্ঞানীব্যক্তিদিগের মতে মনের বসন্তঋতু ও প্রকৃতির যৌবনকাল—দুই অশায়েস্তা, অতএব শাসনযোগ্য। এ উভয়কে জুড়িতে জুতলে আর বাগ মানানো যায় না; অতএব এদের প্রথমে পৃথক্ ক'রে পরে পরাজিত করতে হয়।

বসন্তের স্পর্শে ধরণীর সর্বাংগ শিউরে ওঠে; অবশ্য তাই বলে পৃথিবী তার আলিংগন হতে মুক্তিলাভ করবার চেষ্টা করে না, এবং পোষ-মাসকেও বারোমাস পুষে রাখে না। শীতকে অতিক্রম করে বসন্তের কাছে আত্মসমর্পণ করায় প্রকৃতি যে অর্বাচীনতার পরিচয় দেয় না, তার পরিচয় ফলে।

প্রকৃতির যৌবন শাসনযোগ্য হলেও তাকে শাসন করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই; কেননা, প্রকৃতির ধর্ম মানবধর্মশাস্ত্রবহির্ভূত। সেই কারণে জ্ঞানী ব্যক্তিরা আমাদের প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ কবতে বারণ করেন, এবং নিত্যই আমাদের প্রকৃতির উলটো টান টানতে পরামর্শ দেন; এই কারণেই মানুষের যৌবনকে বসন্তের প্রভাব হতে দূরে রাখা আবশ্যক। অন্যথা, যৌবন ও বসন্ত এ দুয়ের আবির্ভাব যে একই দৈবীশক্তির লীলা—এইরূপ একটি বিশ্বাস আমাদের মনে স্থানলাভ করতে পারে।

এ দেশে লোকে যে যৌবনের কপালে রাজটিকার পরিবর্তে তার পৃষ্ঠে রাজদণ্ড প্রয়োগ করতে সদাই প্রস্তুত, সে বিষয়ে আর-কোনো সন্দেহ নেই। এর কারণ হচ্ছে যে, আমাদের বিশ্বাস মানবজীবনে যৌবন একটা মস্ত ফাঁড়া—কোনোরকমে সেটি কাটিয়ে উঠতে পারলেই বাঁচা যায়। এ অবস্থায় কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী সকলেই চান যে, একলম্ফে বাল্য হতে বার্ধক্যে উত্তীর্ণ হন। যৌবনের নামে আমরা ভয় পাই, কেননা তার অন্তরে শক্তি আছে। অপর পক্ষে বালকের মনে শক্তি নেই, বৃদ্ধের দেহে শক্তি নেই, বালকের জ্ঞান নেই, বৃদ্ধের প্রাণ নেই। তাই আমাদের নিয়ত চেষ্টা হচ্ছে দেহের জড়তার সংগে মনের জড়তার মিলন করা, অজ্ঞতার সংগে বিজ্ঞতার সন্ধিস্থাপন করা। তাই আমাদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইঁচড়ে পাকানো, আর আমাদের সমাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগ দিয়ে পাকানো।

আমাদের উপরোক্ত চেষ্টা যে ব্যর্থ হয় নি তার প্রমাণ আমাদের সামাজিক জীবন। আজকের দিনে এ দেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে এক দিকে বালক, অপর দিকে বৃদ্ধ; সাহিত্যক্ষেত্রে এক দিকে স্কুলবয়, অপর দিকে স্কুলমাস্টার; সমাজে এক দিকে বাল্যবিবাহ, অপর দিকে অকালমৃত্যু; ধর্মক্ষেত্রে এক দিকে শুধু ইতি ইতি, অপর

দিকে শুধু নেতি নেতি; অর্থাৎ এক দিকে লোষ্ট্রকাষ্ঠও দেবতা, অপর দিকে ঈশ্বরও ব্রহ্ম নন। অর্থাৎ আমাদের জীবনগ্রন্থে প্রথমে ভূমিকা আছে, শেষে উপসংহার আছে; ভিতরে কিছু নেই। এ বিশ্বের জীবনের আদি নেই, অন্ত নেই, শুধু মধ্য আছে; কিন্তু তারই অংশীভূত আমাদের জীবনের আদি আছে অন্ত আছে; শুধু মধ্য নেই।

বার্ধক্যকে বাল্যের পাশে এনে ফেললেও আমরা তার মিলনসাধন করতে পারি নি; কারণ ক্রিয়া বাদ দিয়ে দুটি পদকে জুড়ে এক করা যায় না। তা ছাড়া যা আছে তা নেই বললেও তার অস্তিত্ব লোপ হয়ে যায় না। এ বিশ্বকে মায়া বললেও তা অস্পৃশ্য হয়ে যায় না, এবং আত্মাকে ছায়া বললেও তা অদৃশ্য হয়ে যায় না। বরং কোনো-কোনো সত্যের দিকে পিঠ ফেরালে তা অনেক সময়ে আমাদের ঘাড়ে চড়ে বসে। যে যৌবনকে আমরা সমাজে স্থান দিই নি, তা এখন নানা বিকৃতরূপে নানা ব্যক্তির দেহ অবলম্বন করে রয়েছে। যাঁরা সমাজের সম্মুখে জীবনের শুধু নান্দী ও ভরতবচন পাঠ করেন, তাঁদের জীবনের অভিনয়টা যবনিকার অন্তরালেই হয়ে থাকে। রুদ্ধ ও বদ্ধ করে রাখলে পদার্থমাত্রই আলোর ও বায়ুর সম্পর্ক হারায়, এবং সেইজন্য তার গায়ে কলঙ্ক ধরাও অনিবার্য। গুপ্ত জিনিসের পক্ষে দুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

আমরা যে যৌবনকে গোপন করে রাখতে চাই, তার জন্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্য অনেক পরিমাণে দায়ী। কোনো বিখ্যাত ইংরেজ লেখক বলেন যে, literature হচ্ছে criticism of life; ইংরেজি সাহিত্য জীবনের সমালোচনা হতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য হচ্ছে যৌবনের আলোচনা।

সংস্কৃত সাহিত্যে যুবকযুবতী ব্যতীত আর কারো স্থান নেই। আমাদের কাব্যরাজ্য হচ্ছে সূর্যবংশের শেষ নৃপতি অগ্নিবর্ণের রাজ্য, এবং সে দেশ হচ্ছে অষ্টাদশবর্ষদেশীয়াদের স্বদেশ। যৌবনের যে ছবি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে ফুটে উঠেছে, সে হচ্ছে ভোগবিলাসের চিত্র। সংস্কৃত কাব্যজগৎ মাল্যচন্দনবনিতা দিয়ে গঠিত এবং সে জগতের বনিতাই হচ্ছে স্বর্গ, ও মাল্যচন্দন তার উপসর্গ। এ কাব্য-জগতের স্রষ্টা কিংবা দ্রষ্টা-কবিদের মতে প্রকৃতির কাজ হচ্ছে শুধু রমণীদেহের উপমা জোগানো, পুরুষের কাজ শুধু রমণীর মন জোগানো। হিন্দুযুগের শেষকবি জয়দেব নিজের কাব্যসম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে যে কথা বলেছেন, তাঁর পূর্ববর্তী কবিরাও ইঙ্গিতে সেই একই কথা বলেছেন। সে কথা এই যে, 'যদি বিলাস-কলায় কুতূহলী হও তো আমার কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ করো'। এক কথায় যে-যৌবন যযাতি নিজের পুত্রদের কাছে ভিক্ষা করেছিলেন, সংস্কৃত কবিরা সেই যৌবনেরই রূপ-গুণ বর্ণনা করেছেন।

এ কথা যে কত সত্য, তা একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করা যেতে পারে। কৌশাম্বির যুবরাজ উদয়ন এবং কপিলাবাস্তুর যুবরাজ সিদ্ধার্থ উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন। উভয়েই পরম রূপবান্ এবং দিব্য শক্তিশালী যুবাপুরুষ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এইটুকু যে, একজন হচ্ছেন ভোগের আর-একজন হচ্ছেন ত্যাগের পূর্ণ অবতার। ভগবান গৌতমবুদ্ধের জীবনের ব্রত ছিল মানবের মোহনাশ করে তাকে

সংসারের সকল শৃঙ্খলা হতে মুক্ত করা; আর বৎসরাজ উদয়নের জীবনের ব্রত ছিল ঘোষবতী বীণার সাহায্যে অরণ্যের গজকামিনী এবং অন্তঃপুরের গজগামিনীদের প্রথমে মুগ্ধ ক'রে পরে নিজের ভোগের জন্য তাদের অবরুদ্ধ করা। অথচ সংস্কৃত কাব্যে বুদ্ধচরিতের স্থান নেই, কিন্তু উদয়নকথায় তা পরিপূর্ণ।

সংস্কৃত ভাষায় যে বুদ্ধের জীবনচরিত লেখা হয় নি, তা নয়; তবে ললিত-বিস্তরকে আর-কেউ কাব্য বলে স্বীকার করবেন না, এবং অশ্বঘোষের নাম পর্যন্তও লুপ্ত হয়ে গেছে। অপর দিকে উদয়ন-বাসবদত্তার কথা অবলম্বন করে যাঁরা কাব্য-রচনা করেছেন, যথা ভাস গুণাঢ্য সুবন্ধু ও শ্রীহর্ষ ইত্যাদি, তাঁদের বাদ দিলে সংস্কৃত সাহিত্যের অর্ধেক বাদ পড়ে যায়। কালিদাস বলেছেন যে, কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়নকথা শুনতে ও বলতে ভালোবাসতেন; কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কেবল কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ঐ কথা-রসের রসিক। সংস্কৃত সাহিত্য এ সত্যের পরিচয় দেয় না যে বুদ্ধের উপদেশের বলে জাতীয় জীবনে যৌবন এনে দিয়েছিল, এবং উদয়নের দৃষ্টান্তের ফলে অনেকের যৌবনে অকালবার্ধক্য এনে দিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের অনুশীলনের ফলে রাজা অশোক লাভ করেছিলেন সাম্রাজ্য; আর উদয়নধর্মের অনুশীলন করে রাজা অগ্নিবর্ণ লাভ করেছিলেন রাজযক্ষ্মা। সংস্কৃত কবিরা এ সত্যটি উপেক্ষা করেছিলেন যে, ভোগের ন্যায় ত্যাগও যৌবনেরই ধর্ম। বার্ধক্য কিছু অর্জন করতে পারে না ব'লে কিছু বর্জনও করতে পারে না। বার্ধক্য কিছু কাড়তে পারে না ব'লে কিছু ছাড়তেও পারে না—দুটি কালো চোখের জন্যও নয়, বিশ কোটি কালো লোকের জন্যও নয়।

পাছে লোকে ভুল বোঝেন বলে এখানে আমি একটি কথা বলে রাখতে চাই। কেউ মনে করবেন না যে, আমি কাউকে সংস্কৃত কাব্য বয়কট করতে বলছি কিংবা নীতি এবং রুচির দোহাই দিয়ে সে কাব্যের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করবার পরামর্শ দিচ্ছি। আমার মতে যা সত্য তা গোপন করা সুনীতি নয় এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয়। সংস্কৃত কাব্যে যে যৌবনধর্মের বর্ণনা আছে তা যে সামান্য মানবধর্ম, এ হচ্ছে অতি স্পষ্ট সত্য; এবং মানবজীবনের উপর তার প্রভাব যে অতি প্রবল, তাও অস্বীকার করবার জো নেই।

তবে এই একদেশদর্শিতা ও অত্যুক্তি—ভাষায় যাকে বলে একরোখামি ও বাড়াবাড়ি, তাই—হচ্ছে সংস্কৃত কাব্যের প্রধান দোষ। যৌবনের স্থূল-শরীরকে অত আশকারা দিলে তা উত্তরোত্তর স্থূল হতে স্থূলতর হয়ে ওঠে, এবং সেইসঙ্গে তার সূক্ষ্ম শরীরটি সূক্ষ্ম হতে এত সূক্ষ্মতম হয়ে ওঠে যে, তা খুঁজে পাওয়াই ভার হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় কাব্যে রক্তমাংসের পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তার ভিতর আত্মার পরিচয় দিতে হলে সেই রক্তমাংসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই। দেহকে অতটা প্রাধান্য দিলে মন-পদার্থটি বিগড়ে যায়; তার ফলে দেহ ও মন পৃথক্ হয়ে যায় এবং উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তার পরিবর্তে জ্ঞাতিশত্রুতা জন্মায়। সম্ভবত বৌদ্ধধর্মের নিরামিষের প্রতিবাদস্বরূপ হিন্দু কবিরা তাঁদের কাব্যে এতটা আমিষের আমদানি

করেছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হোক প্রাচীন ভারতবর্ষের চিন্তার রাজ্যে দেহ-মনের পরস্পরের যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল, তার প্রমাণ—প্রাচীন সমাজের এক দিকে বিলাসী অপর দিকে সন্ন্যাসী, এক দিকে পত্তন অপর দিকে বন, এক দিকে রঙ্গালয় অপর দিকে হিমালয়; এক কথায় এক দিকে কামশাস্ত্র অপর দিকে মোক্ষশাস্ত্র। মাঝামাঝি আর-কিছু জীবনে থাকতে পারত, কিন্তু সাহিত্যে নেই। এবং এ দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের পরস্পর মিলনের যে কোনো পন্থা ছিল না, সে কথা ভর্তৃহরি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—

একা ভার্যা সুন্দরী বা দরী বা

এই হচ্ছে প্রাচীনযুগের শেষ কথা। যাঁরা দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষে যৌবনের নিন্দা করা যেমন স্বাভাবিক, যাঁরা সুন্দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষেও তেমনি স্বাভাবিক। যতির মুখের যৌবন-নিন্দা অপেক্ষা কবির মুখের যৌবন-নিন্দায়, আমার বিশ্বাস, অধিক ঝাঁজ আছে। তার কারণ, ত্যাগীর অপেক্ষা ভোগীরা অভ্যাসবশত কথায় ও কাজে বেশি অসংযত।

যাঁরা স্ত্রীজাতিকে কেবলমাত্র ভোগের সামগ্রী মনে করেন তাঁরাই যে স্ত্রী-নিন্দার ওস্তাদ, এর প্রমাণ জীবনে ও সাহিত্যে নিত্য পাওয়া যায়। স্ত্রী-নিন্দুকের রাজা হচ্ছেন রাজকবি ভর্তৃহরি ও রাজকবি সোলোমন। চরম ভোগবিলাসে পরম চরিতার্থতা লাভ করতে না পেরে এ'রা শেষবয়সে স্ত্রীজাতির উপর গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন। যাঁরা বনিতাকে মাল্যচন্দন হিসাবে ব্যবহার করেন তাঁরা শুকিয়ে গেলে সেই বনিতাকে মাল্যচন্দনের মতোই ভূতলে নিক্ষেপ করেন, এবং তাকে পদদলিত করতেও সংকুচিত হন না। প্রথমবয়সে মধুর রস অতিমাত্রায় চর্চা করলে শেষবয়সে জীবন তিতো হয়ে ওঠে। এ শ্রেণীর লোকের হাতে শৃঙ্গার-শতকের পরেই বৈরাগ্য-শতক রচিত হয়।

একই কারণে, যাঁরা যৌবনকে কেবলমাত্র ভোগের উপকরণ মনে করেন তাঁদের মুখে যৌবন-নিন্দা লেগে থাকবারই কথা। যাঁরা যৌবন-জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেন, তাঁরা ভাটার সময় পাঁকে পড়ে গত জোয়ারের প্রতি কটুকাটব্য প্রয়োগ করেন। যৌবনের উপর তাঁদের রাগ এই যে, তা পালিয়ে যায় এবং একবার চলে গেলে আর ফেরে না। যযাতি যদি পুরুর কাছে ভিক্ষা করে যৌবন ফিরে না পেতেন তা হলে তিনি যে কাব্য কিংবা ধর্মশাস্ত্র রচনা করতেন, তাতে যে কি সুতীব্র যৌবন-নিন্দা থাকত তা আমরা কল্পনাও করতে পারি নে। পুরু যে পিতৃভক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তার ভিতর পিতার প্রতি কতটা ভক্তি ছিল এবং তাতে পিতারই যে উপকার করা হয়েছিল তা বলতে পারি নে, কিন্তু তাতে দেশের মহা অপকার হয়েছে; কারণ নীতির একখানা বড়ো গ্রন্থ মারা গেছে।

যযাতি-কাঙ্ক্ষিত যৌবনের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তা অনিত্য। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, নগ্নক্ষপণক ও নাগরিক, সকলেই একমত।

'যৌবন ক্ষণস্থায়ী', এই আক্ষেপে এ দেশের কাব্য ও সংগীত পরিপূর্ণ—

ফাগুন গয়ী হয়, বহুরা ফিরি আয়ী হয়
গয়ে রে যোবন, ফিরি আওত নাহি

এই গান আজও হিন্দুস্থানের পথে-ঘাটে অতি করুণ সুরে গাওয়া হয়ে থাকে। যৌবন যে চিরদিন থাকে না, এ আপসোস রাখবার স্থান ভারতবর্ষে নেই।

যা অতি প্রিয় এবং অতি ক্ষণস্থায়ী, তার স্থায়িত্ব বাড়াবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। সম্ভবত নিজের অধিকার বিস্তার করবার উদ্দেশ্যেই এ দেশে যৌবন শৈশবের উপর আক্রমণ করেছিল। বাল্যবিবাহের মূলে হয়তো এই যৌবনের মেয়াদ বাড়াবার ইচ্ছাটাই বর্তমান। জীবনের গতিটি উলটো দিকে ফেরাবার ভিতরও একটা মহা আর্ট আছে। পৃথিবীর অপর-সব দেশে লোকে গাছকে কি করে বড়ো করতে হয় তারই সন্ধান জানে, কিন্তু গাছকে কি করে ছোটো করতে হয় সে কৌশল শুধু জাপানিরাই জানে। একটি বটগাছকে তারা চিরজীবন একটি টবের ভিতরে পুরে রেখে দিতে পারে। শুনতে পাই, এই-সব বামন-বট হচ্ছে অক্ষয়বট। জাপানিদের বিশ্বাস যে, গাছকে হ্রস্ব করলে তা আর বৃদ্ধ হয় না। সম্ভবত আমাদেরও মনুষ্যত্বের চর্চা সম্বন্ধে এই জাপানি আর্ট জানা আছে, এবং বাল্যবিবাহ হচ্ছে সেই আর্টের একটি প্রধান অঙ্গ। এবং উক্ত কারণেই, অপর-সকল প্রাচীন সমাজ উৎসন্নে গেলেও আমাদের সমাজ আজও টি'কে আছে। মনুষ্যত্ব খর্ব করে মানবসমাজকে টবে জিইয়ে রাখায় যে বিশেষ-কিছু অহংকার করবার আছে, তা আমার মনে হয় না। সে যাই হোক এ যুগে যখন কেউ যৌবনকে রাজটিকা দেবার প্রস্তাব করেন তখন তিনি সমাজের কথা ভাবেন, ব্যক্তিবিশেষের কথা নয়।

ব্যক্তিগত হিসেবে জীবন ও যৌবন অনিত্য হলেও মানবসমাজের হিসেবে ও-দুই পদার্থ নিত্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সামাজিক জীবনে যৌবনের প্রতিষ্ঠা করা মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত না হলেও না হতে পারে।

কি উপায়ে যৌবনকে সমাজের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা যেতে পারে তাই হচ্ছে বিবেচ্য ও বিচার্য।

এ বিচার করবার সময় এ কথাটি মনে রাখা আবশ্যক যে, মানবজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি— যৌবন।

যৌবনে মানুষের বাহ্যেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সব সজাগ ও সবল হয়ে ওঠে, এবং সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে মানুষে সেই প্রেরণা তার সকল অঙ্গে সকল মনে অনুভব করে।

দেহ ও মনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত হলেও দেহমনের পার্থক্যের উপরেই আমাদের চিন্তারাজ্য প্রতিষ্ঠিত। দেহের যৌবনের সঙ্গে মনের যৌবনের একটা যোগাযোগ থাকলেও দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন স্বতন্ত্র। এই মানসিক যৌবন লাভ করতে পারলেই আমরা তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারব। দেহ সংকীর্ণ ও পরিচ্ছিন্ন; মন উদার ও ব্যাপক। একের দেহের যৌবন অপরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবার জো নেই; কিন্তু একের মনের যৌবন লক্ষ লোকের মনে সংক্রমণ করে দেওয়া যেতে পারে।

পূর্বে বলেছি যে, দেহ ও মনের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। একমাত্র প্রাণশক্তিই জড় ও চৈতন্যের যোগ সাধন করে। যেখানে প্রাণ নেই সেখানে জড়ে ও চৈতন্যে মিলনও দেখা যায় না। প্রাণই আমাদের দেহ ও মনের মধ্যে মধ্যস্থতা করছে। প্রাণের

পায়ের নীচে হচ্ছে জড়জগৎ আর তার মাথার উপরে মনোজগৎ। প্রাণের ধর্ম যে জীবনপ্রবাহ রক্ষা করা, নবনব সৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি রক্ষা করা—এটি সর্বলোক-বিদিত। কিন্তু প্রাণের আর-একটি বিশেষ ধর্ম আছে, যা সকলের কাছে সমান প্রত্যক্ষ নয়। সেটি হচ্ছে এই যে, প্রাণ প্রতিমুহূর্তে রূপান্তরিত হয়। হিন্দু-দর্শনের মতে জীবের প্রাণময় কোষ, অন্নময় কোষ ও মনোময় কোষের মধ্যে অবস্থিত। প্রাণের গতি উভয়মুখী। প্রাণের পক্ষে মনোময় কোষে ওঠা এবং অন্নময় কোষে নামা দুই সম্ভব। প্রাণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়ে জড়জগতের অন্তর্ভূত হয়ে যায়; আর উন্নত হয়ে মনোজগতের অন্তর্ভূত হয়। মনকে প্রাণের পরিণতি এবং জড়কে প্রাণের বিকৃতি বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাণের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে; প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্তিতে বাধা দিলেই তা জড়তাপ্রাপ্ত হয়। প্রাণ নিজের অভিব্যক্তির নিয়ম নিজে গড়ে নেয়; বাইরের নিয়মে তাকে বদ্ধ করাতেই সে জড়জগতের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন প্রাণীজগতের রক্ষার জন্য নিত্যনূতন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই, তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্মজগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই। পুরাতনকে আঁকড়ে থাকাই বার্ধক্য অর্থাৎ জড়তা। মানসিক যৌবন লাভের জন্য প্রথম আবশ্যক—প্রাণশক্তি যে দৈবী শক্তি—এই বিশ্বাস।

এই মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। এবং কি উপায়ে তা সাধিত হতে পারে, তাই হচ্ছে আলোচ্য।

আমরা সমগ্র সমাজকে একটি ব্যক্তিহিসেবে দেখলেও আসলে মানবসমাজ হচ্ছে বহুব্যক্তির সমষ্টি। যে সমাজে বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে, সেই সমাজেরই যৌবন আছে। দেহের যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই মনের যৌবনের আবির্ভাব হয়। সেই মানসিক যৌবনকে স্থায়ী করতে হলে শৈশব নয়, বার্ধক্যের দেশ আক্রমণ এবং অধিকার করতে হয়। দেহের যৌবনের অন্তে বার্ধক্যের রাজ্যে যৌবনের অধিকার বিস্তার করবার শক্তি আমরা সমাজ হতেই সংগ্রহ করতে পারি। ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে গেলে আবার ফিরে আসে না; কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে। সমাজে নূতন প্রাণ, নূতন মন, নিত্য জন্মলাভ করছে। অর্থাৎ নূতন সুখদুঃখ, নূতন আশা, নূতন ভালোবাসা, নূতন কর্তব্য ও নূতন চিন্তা নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবনপ্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন, তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই। এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন।

এ যৌবনের কপালে রাজটিকা দিতে আপত্তি করবেন, এক জড়বাদী আর-এক মায়াবাদী; কারণ এঁরা উভয়েই একমন। এঁরা উভয়েই বিশ্ব হতে অস্থির প্রাণ-টুকু বার করে দিয়ে যে এক স্থিরতত্ত্ব লাভ করেন, তাকে জড়ই বল আর চৈতন্যই বল, সে বস্তু হচ্ছে এক, প্রভেদ যা তা নামে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

বর্ষার কথা

আমি যদি কবি হতুম, তা হলে আর যে বিষয়েই হোক, বর্ষার সম্বন্ধে কখনো কবিতা লিখতুম না। কেন? তার কারণগুলি ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করছি।

প্রথমত, কবিতা হচ্ছে আর্ট। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে আর্ট-জিনিসটি দেশকালের বহির্ভূত। এ মতের সার্থকতা তাঁরা উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করতে চান। হ্যামলেট, তাঁদের মতে, কালেতে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না, এবং তার জন্মস্থানেও তাকে আবদ্ধ করে রাখবার জো নেই। কিন্তু সংগীতের উদাহরণ থেকে দেখানো যেতে পারে যে, এ দেশে আর্ট কালের সম্পূর্ণ অধীন। প্রতি রাগরাগিণীর স্ফূর্তির ঋতু মাস দিন ক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। যাঁর সুরের দৌড় শুধু ঋষভ পর্যন্ত পৌঁছায় তিনিও জানেন যে, ভৈরবীর সময় হচ্ছে সকাল আর পূরবীর বিকাল। যেহেতু কবিতা গান থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, সে কারণ সাহিত্যে সময়োচিত কবিতা লেখবারও ব্যবস্থা আছে। মাসিকপত্রে পয়লা বৈশাখে নববর্ষের কবিতা, পয়লা আষাঢ়ে বর্ষার, পয়লা আশ্বিনে পুজার, আর পয়লা ফাল্গুনে প্রেমের কবিতা বেরোনো চাইই চাই। এই কারণে আমার পক্ষে বর্ষার কবিতা লেখা অসম্ভব। যে কবিতা আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে প্রকাশিত হবে, তা অন্তত জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি রচনা করতে হবে। আমার মনে কল্পনার এত বাষ্প নেই যা নিদাঘের মধ্যাহ্নকে মেঘাচ্ছন্ন করে তুলতে পারে। তা ছাড়া, যখন বাইরে অহরহ আগুন জ্বলছে তখন মনে বিরহের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে কালিদাসের যক্ষও সক্ষম হতেন কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আর বিরহ বাদ দিয়ে বর্ষার কাব্য লেখাও যা, হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটক লেখাও তাই।

দ্বিতীয়ত, বর্ষার কবিতা লিখতে আমার ভরসা হয় না এই কারণে যে, এক ভরসা ছাড়া বরষা আর-কোনো শব্দের সঙ্গে মেলে না। বাংলা কবিতায় মিল চাই, এ ধারণা আমার আজও যে আছে এ কথা আমি অস্বীকার করতে পারি নে। যখন ভাবের সঙ্গে ভাব না মিললে কবিতা হয় না, তখন কথার সঙ্গে কথা মিললে কেন যে তা কবিতা না হয়ে পদ্য হবে, তা আমি বুঝতে পারি নে। তা ছাড়া, বাস্তবজীবনে যখন আমাদের কোনো কথাই মেলে না, তখন অন্তত একটা জায়গা থাকা চাই যেখানে তা মিলবে, এবং সে দেশ হচ্ছে কল্পনার রাজ্য, অর্থাৎ কবিতার জন্মভূমি। আর-এক কথা, অমিত্রাক্ষরের কবিতা যদি শ্রাবণের নদীর মতো দুকূল ছাপিয়ে না বয়ে যায়, তা হলে তা নিতান্ত অচল হয়ে পড়ে। মিল অর্থাৎ অন্তঃ-অনুপ্রাস বাদ দিয়ে পদ্যকে হিল্লোলে ও কল্লোলে ভরপুর করে তুলতে হলে মধ্য-অনুপ্রাসের ঘনঘটা আবশ্যক। সে কবিতার সঙ্গে সততসঞ্চরমান নবজলধরপটলের সংযোগ করিয়ে দিতে হয়, এবং তার চলোর্মির গতি যাদঃপতিরোধ ব্যতীত অন্য কোনোরূপ রোধ মানে না। আমার সরস্বতী হচ্ছেন প্রাচীন সরস্বতী, শুষ্কা না হলেও ক্ষীণা; দামোদর নন যে, শব্দের বন্যায় বাংলার সকল ছাঁদবাঁধ ভেঙে বেরিয়ে

যাবেন। অতএব মিলের অভাববশতই আমাকে ক্ষান্ত থাকতে হচ্ছে। অবশ্য দরশ পরশ সরস হরষ প্রভৃতি শব্দকে আকার দিয়ে বরষার সঙ্গে মেলানো যায়। কিন্তু সে কাজ রবীন্দ্রনাথ আগেই করে বসে আছেন। আমি যদি ঐ-সকল শব্দকে সাকার করে ব্যবহার করি, তা হলে আমার চুরিবেদ্য ঐ আকারেই ধরা পড়ে যাবে।

ঐরূপ শব্দসমূহ আত্মসাৎ করা চৌর্যবৃত্তি কি না, সে বিষয়ে অবশ্য প্রচণ্ড মতভেদ আছে। নব্যকবিদের মতে মাতৃভাষা যখন কারো পৈতৃকসম্পত্তি নয়, তখন তা নিজের কার্যোপযোগী করে ব্যবহার করবার সকলেরই সমান অধিকার আছে। ঈষৎ বদল-সদল করেছেন বলে রবীন্দ্রনাথ ও-সব কথার আর-কিছু পেটেন্ট নেন নি যে, আমরা তা ব্যবহার করলে চোর-দায়ে ধরা পড়ব—বিশেষত যখন তাদের কোনো বদলি পাওয়া যায় না। যে কথা একবার ছাপা হয়ে গেছে, তাকে আর চাপা দিয়ে রাখবার জো নেই; সে যার-তার কবিতায় নিজেকে ব্যক্ত করবে। নব্যকবিদের আর-একটি কথা বলবার আছে, যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সে হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ যদি অনেক কথা আগে না ব্যবহার করে ফেলতেন তা হলে পরবর্তী কবিরা তা ব্যবহার করতেন। পরে জন্মগ্রহণ করার দরুন সে সুযোগ হারিয়েছি বলে আমাদের যে চুপ করে থাকতে হবে, সাহিত্যজগতের এমন-কোনো নিয়ম নেই। এ মত গ্রাহ্য করলেও বর্ষার বিষয়ে কবিতা লেখার আর-একটি বাধা আছে। কলম ধরলেই মনে হয় মেঘের সম্বন্ধে লিখব আর কি ছাই?

বর্ষার রূপগুণ সম্বন্ধে যা-কিছু বক্তব্য ছিল তা কালিদাস সবই বলে গেছেন, বাকি যা ছিল তা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। এ বিষয়ে একটি নূতন উপমা কিংবা নূতন অনুপ্রাস খুঁজে পাওয়া ভার। যদি পরিচিত সকল বসনভূষণ বাদ দিয়ে বর্ষার নগ্নমূর্তির বর্ণনা করতে উদ্যত হই, তা হলেও বড়ো সুবিধে করতে পারা যায় না। কারণ, বর্ষার রূপ কালো, রস জোলো, গন্ধ পঙ্কজের নয়—পঙ্কের, স্পর্শ ভিজে, এবং শব্দ বেজায়। সুতরাং যে বর্ষা আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, তার যথাযথ বর্ণনাতে বস্তুতন্ত্রতা থাকতে পারে কিন্তু কবিত্ব থাকবে কি না, তা বলা কঠিন।

কবিতার যা দরকার এবং যা নিয়ে কবিতার কারবার, সেই-সব আনুষঙ্গিক উপকরণও এ ঋতুতে বড়ো-একটা পাওয়া যায় না। এ ঋতু পাখি-ছুট্‌। বর্ষায় কোকিল মৌন, কেননা দর্দুর বক্তা; চকোর আকাশদেশত্যাগী, আর চাতক ঢের হয়েছে বলে ফটিকজল শব্দ আর মুখেও আনে না। যে-সকল চরণ ও চঞ্চুসার পাখি, যথা বক হাঁস সারস হাড়গিলে ইত্যাদি, এ ঋতুতে স্বেচ্ছামত জলে-স্থলে ও নভোমণ্ডলে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তাদের গঠন এতই অদ্ভুত এবং তাদের প্রকৃতি এতই তামসিক যে, অরা যে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুতন্ত্রতার খাতিরে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হতে রাজি আছি, কিন্তু বিশ্বামিত্রের জগৎ পর্যন্ত নয়। তার পর কাব্যের উপযোগী ফুল ফল লতা পাতা গাছ বর্ষায় এতই দুর্লভ যে, মহাকবি কালিদাসও ব্যাঙের ছাতার বর্ণনা করতে বাধ্য হয়েছেন। সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্যের মধ্যে এ দৈন্য ধরা পড়ে না, তাই কালিদাসের কবিতা বেঁচে গেছে। বর্ষার দুটি নিজস্ব ফুল হচ্ছে কদম আর কেয়া। অপূর্বতায়

পুষ্পজগতে এ দুটির আর তুলনা নেই। অপরাপর সকল ফুল অর্ধবিকশিত ও অর্ধনিমীলিত। রূপের যে অর্ধপ্রকাশ ও অর্ধগোপনেই তার মোহিনীশক্তি নিহিত, এ সত্য স্বর্গের অপ্সরারা জানতেন। মুনিঋষিদের তপোভঙ্গ করবার জন্য তাঁরা উক্ত উপায়ই অবলম্বন করতেন। কারণ ব্যক্ত-দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং অব্যক্ত-দ্বারা কল্পনাকে অভিভূত না করতে পারলে দেহ ও মনের সমষ্টিকে সম্পূর্ণ মোহিত করা যায় না। কদম কিন্তু একেবারেই খোলা, আর কেয়া একেবারেই বোজা। একের ব্যক্ত-রূপ নেই, অপরের গুপ্ত-গন্ধ নেই; অথচ উভয়েই কণ্টকিত। এ ফুল দিয়ে কবিতা সাজানো যায় না। এ দুটি ফুল বর্ষার ভূষণ নয়, অস্ত্র; গোলা এবং সাঁঙনের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য স্পষ্ট।

পূর্বে যা দেখানো গেল, সে-সব তো অঙ্গহীনতার পরিচয়। কিন্তু এ ঋতুর প্রধান দোষ হচ্ছে, আর-পাঁচটি ঋতুর সঙ্গে এর কোনো মিল নেই; আর-পাঁচটি ঋতুর সঙ্গে এ ঋতু খাপ খায় না। এ ঋতু বিজাতীয় এবং বিদেশী, অতএব অস্পৃশ্য। এই প্রক্ষিপ্ত ঋতু আকাশ থেকে পড়ে, দেশের মাটির ভিতর থেকে আবির্ভূত হয় না। বসন্তের নবীনতা সজীবতা ও সরসতার মূল হচ্ছে ধরণী। বসন্তের ঐশ্বর্য হচ্ছে দেশের ফুলে, দেশের কিশলয়ে। বসন্তের দক্ষিণপবনের জন্মস্থান যে ভারতবর্ষের মলয়পর্বত, তার পরিচয় তার স্পর্শেই পাওয়া যায়; সে পবন আমাদের দেহে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে দেয়। বসন্তের আলো, সূর্য ও চন্দ্রের আলো। ও দুটি দেবতা তো সম্পূর্ণ আমাদেরই আত্মীয়; কেননা, আমরা হয় সূর্যবংশীয় নয় চন্দ্রবংশীয়—এবং ভবলীলাসংবরণ করে আমরা হয় সূর্যলোকে নয় চন্দ্রলোকে ফিরে যাই। অপর পক্ষে, মেঘ যে কোন্ দেশ থেকে আসে তার কোনো ঠিকানা নেই। বর্ষা যে জল বর্ষণ করে, সে কালাপানির জল। বর্ষার হাওয়া এতই দুরন্ত এতই অশিষ্ট এতই প্রচণ্ড এবং এতই স্বাধীন যে, সে-যে কোনো অসভ্য দেশ থেকে আসে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার পর, বর্ষার নিজস্ব আলো হচ্ছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের আলো এতই হাস্যোজ্জ্বল এতই চঞ্চল এতই বক্র এবং এতই তীক্ষ্ণ যে, এই প্রশান্ত মহাদেশের এই প্রশান্ত মহাকাশে সে কখনোই জন্মলাভ করে নি। আর-এক কথা, বসন্ত হচ্ছে কলকণ্ঠ কোকিলের পঞ্চম সুরে মুখরিত। আর বর্ষার নিনাদ? তা শুনে শুধু যে কানে হাত দিতে হয় তা নয়, চোখও বুজতে হয়।

বর্ষার প্রকৃতি যে আমাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত, তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় ও-ঋতুর ব্যবহারে। এ-ঋতু শুধু বেখাপ্পা নয়, অতি বেয়াড়া। বসন্ত যখন আসে, সে এত অলক্ষিতভাবে আসে যে, পঞ্জিকার সাহায্য ব্যতীত কবে মাঘের শেষ হয় আর কবে ফাল্গুনের আরম্ভ হয়, তা কেউ বলতে পারেন না। বসন্ত, বঙ্কিমের রজনীর মতো, ধীরে ধীরে অতি ধীরে ফুলের ডালা হাতে করে দেশের হৃদয়মন্দিরে এসে প্রবেশ করে। তার চরণস্পর্শে ধরণীর মুখে, শব-সাধকের শবের ন্যায়, প্রথমে বর্ণ দেখা দেয়, তার পরে ভ্রূ কম্পিত হয়, তার পরে চক্ষু উন্মীলিত হয়, তার পর তার নিশ্বাস পড়ে, তার পর তার সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে ওঠে। এ-সকল জীবনের লক্ষণ, শুধু পর্যায়ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে অতি ধীরে প্রকটিত হয়। কিন্তু

বর্ষা ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে। আকাশে তার চুল ওড়ে, চোখে তার বিদ্যুৎ খেলে, মুখে তার প্রচণ্ড হুংকার; সে যেন একেবারে প্রমত্ত, উন্মত্ত। ইংরেজেরা বলেন, কে কার সঙ্গ রাখে, তার থেকে তার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বসন্তের সখা মদন। আর বর্ষার সখা?— পবননন্দন নন, কিন্তু তাঁর বাবা। ইনি একলম্ফে আমাদের অশোকবনে উত্তীর্ণ হয়ে ফুল ছেঁড়েন, ডাল ভাঙেন, গাছ ওপ্‌ড়ান; আমাদের সোনার লঙ্কা একদিনেই লণ্ডভণ্ড করে দেন, এবং যে সূর্য আমাদের ঘরে বাঁধা রয়েছে তাকে বগলদাবা করেন; আর চন্দ্রের দেহ ভয়ে সংকুচিত হয়ে তার কলঙ্কের ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে যায়। এক কথায়, বর্ষার ধর্ম হচ্ছে জল-স্থল-আকাশ সব বিপর্যস্ত করে ফেলা। এ ঋতু কেবল পৃথিবী নয়, দিবারাত্রেরও সাজানো তাস ভেস্তে দেয়। তা ছাড়া বর্ষা কখনো হাসেন কখনো কাঁদেন, ইনি ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট। এমন অব্যবস্থিতচিত্ত ঋতুকে ছন্দোবন্ধের ভিতর সুব্যবস্থিত করা আমার সাধ্যাতীত।

এ স্থলে এই আপত্তি উঠতে পারে যে, বর্ষার চরিত্র যদি এতই উদ্‌ভট হয়, তা হলে কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিরা কেন ও-ঋতুকে তাঁদের কাব্যে অতখানি স্থান দিয়েছেন। তার উত্তর হচ্ছে যে, সেকালের বর্ষা আর একালের বর্ষা এক জিনিস নয়; নাম ছাড়া এ উভয়ের ভিতর আর-কোনো মিল নেই। মেঘদূতের মেঘ শান্ত-দান্ত; সে বন্ধুর কথা শোনে এবং যে পথে যেতে বল সেই পথে যায়। সে যে কতদূর রসজ্ঞ, তা তার উজ্জয়িনীপ্রয়াণ থেকেই জানা যায়। সে রমণীর হৃদয়জ্ঞ, স্ত্রীজাতির নিকট কোন্ ক্ষেত্রে হুংকার করতে হয় এবং কোন্ ক্ষেত্রে অল্পভাষে জল্পনা করতে হয়, তা তার বিলক্ষণ জানা আছে। সে করুণ, সে কনকনিকষস্নিগ্ধ বিজুলির বাতি জেবলে সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে অভিসারিকাদের পথ দেখায়, কিন্তু তাদের গায়ে জলবর্ষণ করে না। সে সংগীতজ্ঞ, তার সখা অনিল যখন কীচক-রন্ধ্রে মুখ দিয়ে বংশীবাদন করেন তখন সে মৃদঙ্গের সংগত করে। এক কথায় ধীরোদাত্ত নায়কের সকল গুণই তাতে বর্তমান। সে মেঘ তো মেঘ নয়, পুষ্পকরথে আরূঢ় স্বয়ং বরুণদেব; সে রথ অলকার প্রাসাদের মতো ইন্দ্রচাপে সচিত্র, ললিতবনিতাসনাথ মুরজধ্বনিতে মুখরিত; সে মেঘ কখনো শিলাবৃষ্টি করে না, মধ্যে মধ্যে পুষ্পবৃষ্টি করে। এ হেন মেঘ যদি কবিতার বিষয় না হয়, তা হলে সে বিষয় আর কি হতে পারে?

কিন্তু যেহেতু আমাদের পরিচিত বর্ষা নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছৃংখল, সেই কারণেই তার বিষয় কবিত্ব করা সম্ভব হলেও অনুচিত। পৃথিবীতে মানুষের সব কাজের ভিতর একটা উদ্দেশ্য আছে। আমার বিশ্বাস, প্রকৃতির রূপবর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সৌন্দর্যের সাহায্যে মানবমনকে শিক্ষাদান করা। যদি তাই হয়, তা হলে কবিরা কি বর্ষার চরিত্রকে মানুষের মনের কাছে আদর্শস্বরূপ ধরে দিতে চান? আমাদের মতো শান্ত সমাহিত সুসভ্য জাতির পক্ষে, বর্ষা নয়, হেমন্ত হচ্ছে আদর্শ ঋতু। এ মত আমার নয়, শাস্ত্রের; নিম্নে উদ্‌ধৃত বাক্যগুলির দ্বারাই তা প্রমাণিত হবে—

ঋতুগণের মধ্যে হেমন্তই স্বাহাকার, কেননা হেমন্ত এই প্রজাসমূহকে নিজের বশীভূত

করিয়া রাখে, এবং সেইজন্য হেমন্তে ওষধিসমূহ ম্লান হয়, বনস্পতিসমূহের পত্রনিচয় নিপতিত হয়, পক্ষিসমূহ যেন অধিকতরভাবে স্থির হইয়া থাকে ও অধিকতর নীচে উড়িয়া বেড়ায়, এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের লোমসমূহ যেন (শীতপ্রভাবে) নিপতিত হইয়া যায়, কেননা, হেমন্ত এইসমস্ত প্রজাকে নিজের বশীভূত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তিনি যে (ভূমি) ভাগে থাকেন তাহাকেই শ্রী ও শ্রেষ্ঠ অন্নের জন্য নিজের করিয়া তোলেন।—শতপথ ব্রাহ্মণ

আমরা যে শ্রীভ্রষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ-অন্নহীন, তার কারণ আমরা হেমন্তকে এইরূপে জানি নে; এবং জানি নে যে, তার কারণ কবিরা হেমন্তের স্বরূপের বর্ণনা করেন না, বর্ণনা করেন শুধু বর্ষার; যে বর্ষা ওষধিসমূহকে ম্লান না ক'রে সবুজ ক'রে তোলে।

আষাঢ় ১৩২১

প্রত্নতত্ত্বের পারশ্য-উপন্যাস

ভারতবর্ষের যে কোনো ভবিষ্যৎ নেই, সে বিষয়ে বিদেশীর দল ও স্বদেশীর দল উভয়েই একমত। আমাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা ভবিষ্যৎ নিয়ে কারবার করেন : এক, যাঁরা রাজ্যের সংস্কার চান; আর-এক, যাঁরা সমাজের সংস্কার চান। বর্তমানকে ভবিষ্যতে পরিণত করতে হলে তার সংস্কার অর্থাৎ পরিবর্তন করা আবশ্যক। এই নিয়েই তো যত গোল। যা আছে তার বদল করা যে রাজ্য-শাসনের পক্ষে ক্ষতিকর, এই হচ্ছে রাজ্যশাসকদের মত; আর যা আছে তার বদল করা যে সমাজশাসনের পক্ষে ক্ষতিকর, এই হচ্ছে সমাজশাসিতদের মত। অতএব দেখা গেল যে, ভারতবর্ষের যে ভবিষ্যৎ নেই এবং থাকা উচিত নয়—এ সত্য ইংরেজি ও সংস্কৃত উভয় শাস্ত্রমতেই প্রতিপন্ন হচ্ছে।

২

ভবিষ্যৎ না থাক্, গতকল্য পর্যন্ত ভারতবর্ষের অতীত ব'লে একটা পদার্থ ছিল; শুধু ছিল বলে ছিল না—আমাদের দেহের উপর, আমাদের মনের উপর তা একদম চেপে বসে ছিল। কিন্তু আজ শুনছি, সে অতীত ভারতবর্ষের নয়, অপর দেশের। এ কথা শুনে আমরা সাহিত্যিকের দল বিশেষ ভীত হয়ে পড়েছি। কেননা, এতদিন আমরা এই অতীতের কালিতে কলম ডুবিয়ে বর্তমান সাহিত্য রচনা করছিলুম। এই অতীত নিয়ে, আমাদের ভিতর যাঁর অন্তরে বীররস আছে তিনি বাহ্বাস্ফোটন করতেন, যাঁর অন্তরে করুণরস আছে তিনি ক্রন্দন করতেন, যাঁর অন্তরে হাস্যরস আছে তিনি পরিহাস করতেন, যাঁর অন্তরে শান্তরস আছে তিনি বৈরাগ্য প্রচার করতেন, আর যাঁর অন্তরে বীভৎসরস আছে তিনি কেলেংকারি করতেন। কিন্তু অতঃপর এই যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে, ভারতবর্ষের অতীত আমাদের পৈতৃক ধন নয়, কিন্তু তা পরের—তা হলে সে ধন নিয়ে সাহিত্যের বাজারে আমাদের আর পোদ্দারি করা চলবে না। এক কথায়, ইতিহাসের পক্ষে যা পোষ-মাস, সাহিত্যের পক্ষে তা সর্বনাশ।

৩

আমাদের এতকালের অতীত যে রাতারাতি হস্তান্তরিত হয়ে গেল, সেও আমাদের অতিবুদ্ধির দোষে। এ অতীত যতদিন সাহিত্যের অধিকারে ছিল ততদিন কেউ তা আমাদের হাত ছাড়িয়ে নিতে পারে নি। কিন্তু সাহিত্যকে উচ্ছেদ ক'রে বিজ্ঞান অতীতকে দখল করতে যাওয়াতেই আমরা ঐ অমূল্য বস্তু হারাতে বসেছি। সকলেই জানেন যে, ভারতবর্ষের অতীত থাকলেও তার ইতিহাস ছিল না। কাজেই

এই অতীতের সাদা কাগজের উপর আমরা এতদিন স্বেচ্ছায় এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে আমাদের মনোমত ইতিহাস লিখে যাচ্ছিলুম। ইতিমধ্যে বাংলায় একদল বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ ক'রে সে ইতিহাসকে উপন্যাস বলে হেসে উড়িয়ে দিয়ে এমন ইতিহাস রচনা করতে কৃতসংকল্প হলেন, যার ভিতর রসের লেশমাত্র থাকবে না—থাকবে শুধু বস্তুতন্ত্রতা। এ'রা আহেলা বিলেতি শিক্ষার মোহে এ কথা ভুলে গেলেন যে, অতীতে হিন্দুর প্রতিভা, ইতিহাসে নয় পুরাণে, বিজ্ঞানে নয় দর্শনে, ফুটে উঠেছিল। অতীতের মর্মগ্রহণ না ক'রে তার চর্মগ্রহণ করতে যাওয়াতেই সে দেশ-ত্যাগী হতে বাধ্য হল। এতে তাঁদের কোনো ক্ষতি নেই, মধ্যে থেকে সাহিত্য শুধু দেউলে হয়ে গেল। বিজ্ঞানের প্রদীপ যে সাহিত্যের লালবাতি—এ কথা কে না জানে।

৪

আমরা সাহিত্যিকের দল অতীতকে আকাশ হিসেবে দেখতুম, অর্থাৎ আমাদের কাছে ও-বস্তু ছিল একটি অখন্ড মহাশূন্য। সুতরাং সেই আকাশে আমরা কল্পনার সাহায্যে এমন-সব গিরি-পুরী নির্মাণ ক'রে চলেছিলুম, যার ত্রিসীমানার ভিতর বিজ্ঞানের গোলাগুলি পেঁছয় না। বাংলার নবীন প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এ কার্যটি অকার্য বলেই স্থির হল; কেননা, বৈজ্ঞানিক-মতে ইতিহাস গড়বার জিনিসও নয়, পড়বার জিনিসও নয়—শুধু ঢোঁড়বার জিনিস। সুতরাং ও-জিনিসের অন্বেষণ পায়ের নীচে করতে হবে—মাথার উপরে নয়। যাঁরা আবিষ্কার করতে চান তাঁদের কর্মক্ষেত্র ভূলোক, দ্যুলোক নয়; কেননা, আকাশদেশ তো স্বতঃআবিষ্কৃত।

এই কারণে, সক্রেটিস যেমন দর্শনকে আকাশ থেকে নামিয়ে মাটির উপরে এনে ফেলেছিলেন, আমাদের বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকেরাও তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আকাশ থেকে পেড়ে মাটির নীচে পুঁতে ফেলেছেন।

৫

এ দলের মতে ভারতবর্ষের অতীত পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলেও পঞ্চভূতে মিশিয়ে যায় নি; কেননা, কাল অতীতের অগ্নিসৎকার করে না, শুধু তার গোর দেয়। এক কথায়, অতীতের আত্মা স্বর্গে গমন করলেও তার দেহ পাতালে প্রবেশ করে। তাই ভারতবর্ষ ইতিহাসের মহাশ্মশান নয়, মহাগোরস্থান। অতএব ভারতবর্ষের কবর খুঁড়ে তার ইতিহাস বার করতে হবে। এই জ্ঞান হওয়ামাত্র আমাদের দেশের যত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোকে কোদাল পাড়তে শুরু করলেন এই আশায় যে, এ দেশের উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে, যেখানেই কোদাল মারা যাবে, সেখানেই লুপ্তসভ্যতার গুপ্তধন বেরিয়ে পড়বে। আর সে ধনে আমরা এমনি ধনী হয়ে উঠব যে, মনোজগতে খোরপোশের জন্য আমাদের আর চাষ-আবাদ করতে হবে না।

এই খোঁড়াখুঁড়ির ফলে সোনা না হোক তামা বেরিয়েছে, হীরে না হোক

পাথর বেরিয়েছে। কিন্তু এ যে-সে তামা যে-সে পাথর নয়—সব হরফ-কাটা। এই-সব মুদ্রাঙ্কিত তাম্রফলকের বিশেষ-কিছু মূল্য নেই, তা পয়সারই মতো সস্তা। একালেও আমরা শিল কুটি, কিন্তু সেই কোটা-শিল পড়া যায় না; কেননা, তার অক্ষর সব রেখাক্ষর। কিন্তু অতীতের এই ক্ষোদিত পাষাণের কথা স্বতন্ত্র। বিদ্যা বলেছিলেন—

শিলা জলে ভেসে যায়, বানরে সংগীত গায়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়

কিন্তু আজকাল যদি কেউ বলেন যে—

কপি জলে ভেসে যায়, পাষাণে সংগীত হয়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়

তা হলে তিনি অবিদ্যারই পরিচয় দেবেন। কেননা, আজকাল পাষাণের সংগীতে দেশ মাতিয়ে তুলেছে। অতীত আজ তার পাষাণ-বদনে তারস্বরে আত্মপরিচয় দিচ্ছে। কাগজের কথায় আমরা আর কান দিই নে। রামায়ণ-মহাভারত এখন উপন্যাস হয়ে পড়েছে, এবং ইতিহাস এখন বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছে। তার কারণ, আমরা মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করেছি যে, যাকে আমরা হিন্দুসভ্যতা বলি সেটি একটি অর্বাচীন পদার্থ—বৌদ্ধসভ্যতার পাকা বুনিয়াদের উপরেই তা প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সর্বনিম্নস্তরে যা পাওয়া যায়, সে হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। ফলে, আমরা হিন্দু হলেও বৌদ্ধধর্ম নিয়েই গৌরব করছিলুম। তাই প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, পাটলিপুত্রই হচ্ছে আমাদের ইতিহাসের কেন্দ্রস্থল—একাধারে জন্মভূমি এবং পীঠস্থান।

৬

কথাসরিৎসাগরের প্রসাদে পাটলিপুত্রের জন্মকথা আমরা সকলেই জানতুম। এবং আমরা, কাব্যরসের রসিকেরা, সেই জন্মবৃত্তান্তই সাদরে গ্রাহ্য করে নিয়েছিলুম; কেননা, সে কথায় বস্তুতন্ত্রতা না থাকলেও রস আছে, তাও আবার একটি নয়, তিন তিনটি—মধুর বীর এবং অদ্ভুত রস। পুত্র কর্তৃক পাটলিহরণের বৃত্তান্ত, কৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণীহরণ এবং অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রাহরণের চাইতেও অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। কৃষ্ণ প্রভৃতি রথে চড়ে স্থলপথে পলায়ন করেছিলেন, কিন্তু পুত্র পাটলিকে ক্রোড়স্থ ক'রে মায়া-পাদুকায় ভর দিয়ে নভোমার্গে উড্ডীন হয়েছিলেন। কৃষ্ণার্জুন স্ব স্ব নগরীতে প্রস্থান করেছিলেন; পুত্র কিন্তু তাঁর মায়া-যষ্টির সাহায্যে যে-পুরী আকাশে নির্মাণ করেছিলেন, সেই পুরী ভূমিষ্ঠ হয়ে পাটলিপুত্র নাম ধারণ করে। বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু জাদুতে বিশ্বাস করেন না। সুতরাং বৈজ্ঞানিক মতে পাটলিপুত্রকে খনন করা অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়েছিল, এবং সে কর্তব্যও সম্প্রতি কার্যে পরিণত করা হয়েছে। খোঁড়া জিনিসটের ভিতর একটা বিপদ আছে, কেননা কোনো কোনো স্থলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয়। এ ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই।

ডক্টর স্পুনার নামক জনৈক প্রত্নতত্ত্বের কর্তা-ব্যক্তি এই ভূমধ্য-রাজধানী খনন করে আবিষ্কার করেছেন যে, এ দেশের মাটি খুঁড়লে দেখা যায় যে তার নীচে

ভারতবর্ষ নেই, আছে শুধু পারশ্য। Palimpsest নামক একপ্রকার প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়, যার উপরে এক ভাষায় লেখা থাকে আর নীচে আর-এক ভাষায়। বলা বাহুল্য, উপরে যা লেখা থাকে তা জাল, আর নীচে যা লেখা থাকে তাই আসল। ডক্টর স্পুনারের দিব্যদৃষ্টিতে এতকাল পরে ধরা পড়েছে যে, আমরা যাকে ভারত-বর্ষের ইতিহাস বলি, সে হচ্ছে একটি বিরাট Palimpsest ; তার উপরে পালি কিংবা সংস্কৃত ভাষায় যা লেখা আছে তা জাল, আর তার নীচে যা লেখা তাই আসল। সে লেখা অবশ্য ফারসি; কেননা, আমরা কেউ তা পড়তে পারি নে। ডক্টর স্পুনারের কথা বৈজ্ঞানিকেরা মেনে না নিন, মান্য করতে বাধ্য; কেননা, সেকালের কাব্যের জাদুঘর হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু একালের জাদুঘরের কাব্যকে তা করা চলে না।

ডক্টর স্পুনার তাঁর নবমত প্রতিষ্ঠা করবার জন্য নানা প্রমাণ, নানা অনুমান, নানা দর্শন, নানা নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন। এ-সকলের মূল্য যে কি, তা নির্ণয় করা আমার সাধ্যের অতীত। এই পর্যন্ত বলতে পারি যে, তিনি এমন-একটি যুক্তি বাদ দিয়েছেন, যার আর-কোনো খণ্ডন নেই। স্পুনার সাহেবের মতে যার নাম অসুর তারই নাম দানব, এবং যার নাম দানব তারই নাম শক, এবং যার নাম শক তারই নাম পার্শি। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে, এ দেশের মাটি খুঁড়লে পার্শি-শহর বেরিয়ে পড়তে বাধ্য। দানবপুরী যে পাতালে অর্থাৎ মাটির নীচে অবস্থিত, এ কথা তো হিন্দুর সর্বশাস্ত্রসম্মত।

৭

অতএব দাঁড়াল এই যে, আমাদের ভবিষ্যৎও নেই অতীতও নেই। এক বাকি থাকল বর্তমান। সুতরাং বঙ্গ সাহিত্যকে এখন থেকে এই বর্তমান নিয়েই কারবার করতে হবে। এ অবশ্য মহা মুশকিলের কথা। বই পড়ে বই লেখা এক, আর নিজে বিশ্বসংসার দেখেশুনে লেখা আর। এ কাজ করতে হলে চোখকান খুলে রাখতে হবে, মনকে খাটাতে হবে; এক কথায় সচেতন হতে হবে। তার পর এত কষ্ট স্বীকার ক'রে যে সাহিত্য গড়তে হবে, সে সাহিত্য সকলে সহজে গ্রাহ্য করবেন না। মানুষে বর্তমানকেই সবচাইতে অগ্রাহ্য করে। যাঁদের চোখকান বোজা আর মন পঙ্গু, তাঁরা এই নবসাহিত্যকে নবীন বলে নিন্দা করবেন। তবে এর মধ্যে আরামের কথা এই যে, বর্তমানের কোনো ইতিহাস নেই, সুতরাং এখন হতে বঙ্গ-সরস্বতীর ঘাড় থেকে ভূত নেমে যাবে।

আষাঢ় ১৩২৩

সুরের কথা

আপনারা দেশী-বিলেতি সংগীত নিয়ে যে বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছেন, সে গোল-যোগে আমি গলাযোগ করতে চাই।

এ বিষয়ে বক্তৃতা করতে পারেন এক তিনি যিনি সংগীতবিদ্যার পারদর্শী, আর-এক তিনি যিনি সংগীতশাস্ত্রের সারদর্শী; অর্থাৎ যিনি সংগীত সম্বন্ধে হয় সর্বজ্ঞ, নয় সর্বাজ্ঞ। আমি শেষোক্ত শ্রেণীর লোক, অতএব এ বিষয়ে আমার কথা বলবার অধিকার আছে।

আপনাদের সুরের আলোচনা থেকে আমি যা সারসংগ্রহ করেছি সংক্ষেপে তাই বিবৃত করতে চাই। বলা বাহুল্য, সংগীতের সুর ও সার পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। এর প্রথমটি হচ্ছে কানের বিষয়, আর দ্বিতীয়টি জ্ঞানের। আমরা কথায় বলি সুরসার, কিন্তু সে দ্বন্দ্বসমাস হিসেবে।

সব বিষয়েরই শেষ কথা তার প্রথম কথার উপরেই নির্ভর করে; যে বস্তুর আমরা আদি জানি নে, তার অন্ত পাওয়া ভার। অতএব কোনো সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করতে হলে তার আলোচনা ক খ থেকে শুরু করাই সনাতন পদ্ধতি; এবং এ ক্ষেত্রে আমি সেই সনাতন পদ্ধতিই অনুসরণ করব।

অবশ্য এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এমন লোক ঢের আছে যারা দিব্যি বাংলা বলতে পারে অথচ ক খ জানে না, আমাদের দেশের বেশির ভাগ স্ত্রী-পুরুষই তো ঐ দলের; অপর পক্ষে, এমন প্রাণীরও অভাব নেই যারা ক খ জানে অথচ বাংলা ভালো বলতে পারে না, যথা আমাদের ভদ্রশিশুর দল। অতএব এরূপ হওয়াও আশ্চর্য নয় যে, এমন গুণী ঢের আছে যারা দিব্যি গাইতে-বাজাতে পারে অথচ সংগীতশাস্ত্রের ক খ জানে না; অপর পক্ষে এমন জ্ঞানীও ঢের থাকতে পারে যারা সংগীতের শুধু ক খ নয় অনুস্বর বিসর্গ পর্যন্ত জানে, কিন্তু গানবাজনা জানে না।

তবে যারা গানবাজনা জানে, তারা গায় ও বাজায়; যারা জানে না, তারা ও-বস্তু নিয়ে তর্ক করে। কলধ্বনি না করতে পারি, কলরব করবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে। সুতরাং এই তর্কে যোগ দেওয়াটা আমার পক্ষে অনধিকার-চর্চা হবে না। অতএব আমাকে ক খ থেকেই শুরু করতে হবে, অ আ থেকে নয়। কেননা, আমি যা লিখতে বসেছি, সে হচ্ছে সংগীতের ব্যঞ্জনলিপি, স্বরলিপি নয়। আমার উদ্দেশ্য সংগীতের তত্ত্ব ব্যক্ত করা, তার স্বত্ব সাব্যস্ত করা নয়। আমি সংগীতের সারদর্শী, সুরস্পর্শী নই।

২

হিন্দুসংগীতের ক খ জিনিসটে কি?—বলছি।

আমাদের সকল শাস্ত্রের মূল যা আমাদের সংগীতেরও মূল তাই—অর্থাৎ শ্রুতি।

শুনতে পাই, এই শ্রুতি নিয়ে সংগীতাচার্যের দল বহুকাল ধরে বহু বিচার করে আসছেন, কিন্তু আজ-তক্ এমন-কোনো মীমাংসা করতে পারেন নি যাকে 'উত্তর' বলা যেতে পারে, অর্থাৎ যার আর উত্তর নেই।

কিন্তু যেহেতু আমি পণ্ডিত নই, সে কারণ আমি ও-বিষয়ের একটি সহজ মীমাংসা করেছি যা সহজ মানুষের কাছে সহজে গ্রাহ্য হতে পারে।

আমার মতে শ্রুতির অর্থ হচ্ছে সেই স্বর যা কানে শোনা যায় না, যেমন দর্শনের অর্থ হচ্ছে সেই সত্য যা চোখে দেখা যায় না। যেমন দর্শন দেখবার জন্য দিব্যচক্ষু চাই, তেমনি শ্রুতি শোনবার জন্য দিব্যকর্ণ চাই। বলা বাহুল্য, তোমার-আমার মতো সহজ মানুষদের দিব্যচক্ষুও নেই, দিব্যকর্ণও নেই; তবে আমাদের মধ্যে কারো কারো দিব্যি চোখও আছে, দিব্যি কানও আছে। ওতেই তো হয়েছে মুশকিল। চোখ ও কান সম্বন্ধে দিব্য এবং দিব্যি—এ দুটি বিশেষণ, কানে অনেকটা এক শোনালেও, মানেতে ঠিক উলটো।

সংগীতে যে সাতটি সাদা আর পাঁচটি কালো সুর আছে, এ সত্য পিয়ানো কিংবা হারমোনিয়ামের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সকলেই দেখতে পাবেন। এই পাঁচটি কালো সুরের মধ্যে যে, চারটি কোমল আর একটি তীব্র—তা আমরা সকলেই জানি এবং কেউ-কেউ তাদের চিনিও। কিন্তু চেনাশুনো জিনিসে পণ্ডিতের মনস্তুষ্টি হয় না। তাঁরা বলেন যে, এ দেশে ঐ পাঁচটি ছাড়া আরো কালো এবং এমন কালো সুর আছে, যেমন কালো বিলেতে নেই। শাস্ত্রমতে সে-সব হচ্ছে অতি-কোমল ও অতিতীব্র। ঐ নামই প্রমাণ যে, সে-সব অতীন্দ্রিয় সুর এবং তা শোনবার জন্যে দিব্যকর্ণ চাই—যা তোমার-আমার তো নেই, শাস্ত্রীমহাশয়দেরও আছে কি না সন্দেহ। আমার বিশ্বাস, তাঁদেরও নেই। শ্রুতি সেকালে থাকলেও একালে তা স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। স্মৃতিই যে শ্রুতিধরদের একমাত্র শক্তি, এ সত্য তো জগদ্‌বিখ্যাত। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, সংগীত সম্বন্ধে পরের মুখে ঝাল খাওয়া, অর্থাৎ পরের কানে মিষ্টি শোনা, যাঁদের অভ্যাস শুধু তাঁদের কাছেই শ্রুতি শ্রুতিমধুর। আমি স্থির করেছি যে, আমাদের পক্ষে ঐ বারোই ভালো। অবশ্য সাতপাঁচ ভেবেচিন্তে। ও দ্বাদশকে ছাড়াতে গেলে, অর্থাৎ ছাড়লে, আমাদের কানকে একাদশী করতে হবে।

৩

এ-সব তো গেল সংগীতের বর্ণপরিচয়ের কথা, শব্দবিজ্ঞানের নয়। শব্দেরও যে একটা বিজ্ঞান আছে, এ জ্ঞান সকলের নেই। সুতরাং সুরের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গ্রাহ্য না হলেও আলোচ্য।

শব্দজ্ঞানের মতে শ্রুতি অপৌরুষেয়; অর্থাৎ স্বরগ্রাম কোনো পুরুষ কর্তৃক রচিত হয় নি, প্রকৃতির বক্ষ থেকে উত্থিত হয়েছে। একটি একটানা তারের গায়ে ঘা মারলে প্রকৃতি অমনি সাত সুরে কেঁদে ওঠেন। এর থেকে বৈজ্ঞানিকেরা ধরে নিয়েছেন যে, প্রকৃতি তাঁর একতারায় যে সকাতর সার্গম আলাপ করেন মানুষে

শুধু তার নকল করে। কিন্তু সে নকলও মাছিমারা হয় না। মানুষের গলগ্রহ কিংবা যন্ত্রস্থ হয়ে প্রকৃতিদত্ত স্বরগ্রামের কোনো সুর একটু চড়ে, কোনো সুর একটু ঝুলে যায়। তা তো হবারই কথা। প্রকৃতির হৃদয়তন্ত্রী থেকে এক ঘায়ে যা বেরোয়, তা যে একঘেয়ে হবে—এ তো স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং মানুষে এই-সব প্রাকৃত সুরকে সংস্কৃত করে নিতে বাধ্য।

এ মত লোকে সহজে গ্রাহ্য করে; কেননা, প্রকৃতি যে একজন মহা ওস্তাদ এ সত্য লৌকিক ন্যায়েও সিদ্ধ হয়। প্রকৃতি অন্ধ, এবং অন্ধের সংগীতে ব্যুৎপত্তি যে সহজ এ সত্য তো লোকবিশ্রুত।

প্রকৃতির ভিতর যে শব্দ আছে—শব্দ নয়, গোলযোগ আছে—এ কথা সকলেই জানেন; কিন্তু তাঁর গলায় যে সুর আছে, এ কথা সকলে মানেন না। এই নিয়েই তো আর্ট ও বিজ্ঞানে বিরোধ।

আর্টিস্টরা বলেন, প্রকৃতি শুধু অন্ধ নন, উপরন্তু বধির। যাঁর কান নেই তাঁর কাছে গানও নেই। সাংখ্যদর্শনের মতে পুরুষ দ্রষ্টা এবং প্রকৃতি নর্তকী; কিন্তু প্রকৃতি যে গায়িকা এবং পুরুষ শ্রোতা, এ কথা কোনো দর্শনেই বলে না। আর্টিস্টদের মতে তৌর্যত্রিকের একটিমাত্র অঙ্গ—নৃত্যই প্রকৃতির অধিকারভুক্ত, অপর দুটি—গীতি বাদ্য—তা নয়।

এর উত্তরে বিজ্ঞান বলেন, এ বিশ্বের সকল রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের উপাদান এবং নিমিত্তকারণ হচ্ছে ঐ প্রকৃতির নৃত্য। কথাটা উড়িয়ে দেওয়া চলে না, অতএব পুড়িয়ে দেখা যাক ওর ভিতর কতটুকু খাঁটি মাল আছে।

শাস্ত্রে বলে, শব্দ আকাশের ধর্ম; বিজ্ঞান বলে, শব্দ আকাশের নয় বাতাসের ধর্ম; আকাশের নৃত্য অর্থাৎ সর্বাঙ্গের স্বচ্ছন্দ কম্পন থেকে যে আলোকের, এবং বাতাসের উক্তরূপ কম্পন থেকে যে ধ্বনির উৎপত্তি হয়েছে—তা বৈজ্ঞানিকেরা হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিতে পারেন। কিন্তু আর্ট বলে, আত্মার কম্পন থেকে সুরের উৎপত্তি, সুতরাং জড়প্রকৃতির গর্ভে তা জন্মলাভ করে নি। আত্মা কাঁপে আনন্দে, সৃষ্টির চরম আনন্দে; আর আকাশ-বাতাস কাঁপে বেদনায়, সৃষ্টির প্রসববেদনায়। সুতরাং আর্টিস্টদের মতে সুর শব্দের অনুবাদ নয়, প্রতিবাদ।

যেখানে আর্টে ও বিজ্ঞানে মতভেদ হয়, সেখানে আপস-মীমাংসার জন্য দর্শনকে সালিস মানা ছাড়া আর উপায় নেই। দার্শনিকেরা বলেন, শব্দ হতে সুরের কিংবা সুর হতে শব্দের উৎপত্তি—সে বিচার করা সময়ের অপব্যয় করা। এ স্থলে আসল জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, রাগ ভেঙে সুরের, না সুর জুড়ে রাগের সৃষ্টি হয়েছে—এক কথায়, সুর আগে না রাগ আগে। অবশ্য রাগের বাইরে সার্গমের কোনো অস্তিত্ব নেই, এবং সার্গমের বাইরে রাগের কোনো অস্তিত্ব নেই। সুতরাং সুর পূর্বরাগী কি অনুরাগী, এই হচ্ছে আসল সমস্যা। দার্শনিকেরা বলেন যে, এ প্রশ্নের উত্তর তাঁরাই দিতে পারেন যাঁরা বলতে পারেন বীজ আগে কি বৃক্ষ আগে; অর্থাৎ কেউ পারেন না।

আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, উক্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তের আর-কোনো খণ্ডন নেই। তবে বৃক্ষায়ুর্বেদীরা নিশ্চয়ই বলবেন যে, বৃক্ষ আগে কি বীজ আগে সে

রহস্যের ভেদ তাঁরা বাৎলাতে পারেন। কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। কেননা, ও-কথা শোনবামাত্র আর-এক দলের বৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ পরমাণুবাদীরা, জবাব দেবেন যে সংগীত আয়ুর্বেদের নয় বায়ুর্বেদের অন্তর্ভূত; অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাবে।

আসল কথা এই যে, আমি কর্তা তুমি ভোক্তা এ জ্ঞান যার নেই, তিনি আর্টিস্ট নন। সুতরাং সংগীত সম্বন্ধে প্রকৃতিকে সম্বোধন ক'রে—তুমি কর্তা আমি ভোক্তা—এ কথা কোনো আর্টিস্ট কখনো বলতে পারবেন না, এবং ও-কথা মুখে আনবার কোনো দরকারও নেই। প্রকৃতির হাতে-গড়া এই বিশ্বসংসার যে আগাগোড়া বেসুরো, তার অকাট্য প্রমাণ—আমরা পৃথিবীসুদ্ধ লোক পৃথিবী ছেড়ে সুরলোকে যাবার জন্য লালায়িত।

অতএব দাঁড়াল এই যে, সংগীতের উৎপত্তির আলোচনায় তার লয়ের সম্ভাবনাই বেড়ে যায়। তাই সহজ মানুষে চায় তার স্থিতি, ভিত্তি নয়।

অতঃপর দেশী বিলেতি সংগীতের ভেদাভেদ নির্ণয় করবার চেষ্টা করা যাক।

এ দুয়ের মধ্যে আর যা প্রভেদই থাক্, তা অবশ্য ক খ-গত নয়। যে বারো সুর এ দেশের সংগীতের মূলধন, সেই বারো সুরই যে সে দেশের সংগীতের মূলধন—এ কথা সর্ববাদীসম্মত। তবে আমরা বলি যে, সে মূলধন আমাদের হাতে সুদে বেড়ে গিয়েছে। আমাদের হাতে কোনো ধন যে সুদে বাড়ে, তার বড়ো-একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া আমি পূর্বে দেখিয়েছি যে, সুরের এই অতিসুদের লোভে আমরা সংগীতের মূলধন হারাতে বসেছি। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশি-কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

দেশীর সঙ্গে বিলেতি সংগীতের আসল প্রভেদটা ক খ নিয়ে নয়, কর খল নিয়ে। BLA=ব্লে-CLA=ক্লের সঙ্গে কর-খলের, কানের দিক থেকেই হোক আর মানের দিক থেকেই হোক, একটা-যে প্রকাণ্ড প্রভেদ আছে—এ হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড সত্য। এ প্রভেদ উপাদানের নয়, গড়নের। অতএব রাগ ও মেলডির ভিতর পার্থক্য হচ্ছে ব্যাকরণের, এবং একমাত্র ব্যাকরণেরই।

সুতরাং আমরা যদি বিলেতি ব্যাকরণ অনুসারে সুর সংযোগ করি তা হলে তা রাগ না হয়ে মেলডি হবে, তাতে অবশ্য রাগের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আমরা ইংরেজি ব্যাকরণ অনুসারে ইংরেজি ভাষা লিখলে সে লেখা ইংরেজিই হয়, এবং তাতে বাংলা সাহিত্যের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, যদিচ এ ক্ষেত্রে শুধু ব্যাকরণ নয় শব্দও বিদেশী। কিন্তু যেমন কতকটা ইংরেজি এবং কতকটা বাংলা ব্যাকরণ মিলিয়ে, এবং সেইসঙ্গে বাংলা শব্দের অনুবাদের গোঁজামিলন দিলে তা বাবু-ইংলিশ হয়, এবং উক্ত পদ্ধতি অনুসারে বাংলা লিখলে তা সাধু-ভাষা হয়—তেমনি ঐ দুই ব্যাকরণ মেলাতে বসলে সংগীতেও আমরা রাগ-মেলডির একটি খিচুড়ি পাকাব। সাহিত্যের খিচুড়িভোগে যখন আমার রুচি নেই, তখন সংগীতের ও-ভোগ যে আমি ভোগ করতে চাই নে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

৫

দেশী বিলেতি সংগীতের মধ্যে আর-একটা স্পষ্ট প্রভেদ আছে। বিলেতি সংগীতে হারমনি আছে, আমাদের নেই।

এই হারমনি-জিনিসটে স্বরের যুক্তাক্ষর বৈ আর-কিছুই নয়, অর্থাৎ ও-বস্তু হচ্ছে সংগীতের বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয়ভাগের অধিকারে। আমাদের সংগীত এখনো প্রথমভাগের দখলেই আছে। আমাদের পক্ষে সংগীতের দ্বিতীয়ভাগের চর্চা করা উচিত কি না, সে বিষয়ে কেউ মনস্থির করতে পারেন নি। অনেকে ভয় পান যে, দ্বিতীয়ভাগ ধরলে তাঁরা প্রথমভাগ ভুলে যাবেন। তা ভুলুন আর না-ভুলুন, তাঁরা যে প্রথমভাগকে আর আমল দেবেন না, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের সাহিত্য থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, একবার যুক্তাক্ষর শিখলে আমরা অযুক্তাক্ষরের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত মনে করি নে এবং অপর-কেউ করতে গেলে অমনি বলে উঠি, সাহিত্যের সর্বনাশ হল, ভাষাটা একদম অসাধু এবং অশুদ্ধ হয়ে গেল। তবে সংগীতে এ বিপদ ঘটবার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। সেদিন একজন ইংরেজ বলছিলেন যে, যে সংগীতে ছয়টি রাগ এবং প্রতি রাগের ছয়টি করে স্ত্রী আছে, সেখানে হারমনি কি করে থাকতে পারে। আমি বলি, ও তো ঠিকই কথা. বিশেষত স্বামী যখন মূর্তিমান রাগ আর স্ত্রীরা প্রত্যেকেই এক-একটি মূর্তিমতী রাগিণী। অবশ্য এরূপ হবার কারণ আমাদের সংগীতের কৌলীন্য। আমাদের রাগ-সকল যদি কুলীন না হত, তা হলেও আমরা হারমনির চর্চা করতে পারতুম না; কেননা, ও-বস্তু আমাদের ধাতে নেই। আমাদের সমাজের মতো আমাদের সংগীতেও জাতিভেদ আছে, আর তার কেউ আর-কারো সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারে না। মিশ্রিত হওয়া দূরে থাক্, আমরা পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করতে ভয় পাই; কেননা, জাতির ধর্মই হচ্ছে জাত বাঁচিয়ে মরা। আর মিলে-মিশে এক হয়ে যাবার নামই হচ্ছে হারমনি।

পৌষ ১৩২৩

রূপের কথা

এ দেশে সচরাচর লোকে যা লেখে ও ছাপায় তাই যদি তাদের মনের কথা হয় তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা মানবসভ্যতার চরমপদ লাভ করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই প্রকাণ্ড সত্যটা বিদেশীরা মোটেই দেখতে পায় না। এটা সত্যিই দুঃখের বিষয়। কেননা, সভ্যতারও একটা চেহারা আছে; এবং যে সমাজের সুচেহারা নেই তাকে সুসভ্য বলে মানা কঠিন। বিদেশী বলতে দু শ্রেণীর লোক বোঝায় : এক পরদেশী, আর-এক বিলেতি। আমরা যে বড়ো-একটা কারো চোখে পড়ি নে, সে বিষয়ে এই দুই দলের বিদেশীই একমত।

যাঁরা কালাপানি পার হয়ে আসেন তাঁরা বলেন যে, আমাদের দেশ দেখে তাঁদের চোখ জুড়োয়, কিন্তু আমাদের বেশ দেখে সে চোখ ক্ষুণ্ণ হয়। এর কারণ, আমাদের দেশের মোড়কে রঙ আছে, আমাদের দেহের মোড়কে নেই। প্রকৃতি বাংলাদেশকে যে কাপড় পরিয়েছেন তার রঙ সবুজ; আর বাঙালি নিজে যে কাপড় পরেছে তার রঙ আর যেখানেই পাওয়া যাক, ইন্দ্রধনুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা আপাদমস্তক রঙ-ছুট বলেই অপর-কারো নয়নাভিরাম নই। সুতরাং যারা আমাদের দেশ দেখতে আসে তারা আমাদের দেখে খুশি হয় না। যাঁর বোম্বাই শহরের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে তিনিই জানেন কলকাতার সঙ্গে সে শহরের প্রভেদটা কোথায় এবং কত জাজ্বল্যমান। সে দেশে জনসাধারণ পথেঘাটে সকালসন্ধে রঙের ঢেউ খেলিয়ে যায় এবং সে রঙের বৈচিত্র্যের ও সৌন্দর্যের আর অন্ত নেই। কিন্তু আমাদের গায়ে জড়িয়ে আছে চির-গোধূলি; তাই শুধু বিলেতি নয়, পরদেশী ভারতবাসীর চোখেও আমরা এতটা দৃষ্টিকটু। বাকি ভারতবর্ষ সাজসজ্জায় স্বদেশী, আমরা আধ-স্বদেশী হাফ-বিলেতি। আর বিলেতি মতে, হয় কালো নয় সাদা—নইলে সভ্যতার লজ্জা নিবারণ হয় না; রঙ চাই শুধু সঙ সাজবার জন্যে। আমাদের নবসভ্যতাও কার্যত এই মতে সায় দিয়েছে।

২

আপনারা বলতে পারেন যে, এ কথা যদি সত্যও হয় তাতে আমাদের কি যায়-আসে। বিদেশীর মনোরঞ্জন করবার জন্য আমরা তো আর জাতকে-জাত আমাদের পরন-পরিচ্ছদ আমাদের হাল-চাল সব বদলে ফেলতে পারি নে। জীবনযাত্রা-ব্যাপারটা তো আর অভিনয় নয় যে, দর্শকের মুখ চেয়ে সে-জীবন গড়তে হবে এবং তার উপর আবার রঙ ফলাতে হবে। এ কথা খুব ঠিক। জীবন আমরা কিসের জন্য ধারণ করি তা না জানলেও এটা জানি যে, পরের জন্য আমরা তা ধারণ করি নে—অপর দেশের অপর লোকের জন্য তো নয়ই। তবে বিদেশীর কথা উত্থাপন করবার সার্থকতা এই যে, জাতীয় জীবনের ত্রুটি বিদেশীর চোখে যেমন এক-নজরে ধরা

পড়ে, স্বদেশীর চোখে তা পড়ে না। কেননা, আজন্ম দেখে দেখে লোকের চোখে যা সয়ে গেছে, যারা প্রথম দেখে তাদের চোখে তা সয় না।

এই বিদেশীরাই আমাদের সজ্ঞান করে দিয়েছে যে, রূপ সম্বন্ধে আমরা চোখ থাকতেও কানা। আমাদের রূপজ্ঞান যে নেই, কিংবা যদি থাকে তো অতি কম, সে বিষয়ে বোধ হয় কোনো মতভেদ নেই। কেননা, এ জ্ঞানের অভাবটা আমরা জাতীয় মনের দৈন্য বলে মনে করি নে; বরং সত্যকথা বলতে গেলে, আমাদের বিশ্বাস যে, এই রূপান্ধতাটাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের মহত্ত্বের পরিচয় দেয়। রূপ তো একটা বাইরের জিনিস; শুধু তাই নয়, বাহ্যবস্তুরও বাইরের জিনিস; ও জিনিসকে যারা উপেক্ষা, এমন-কি, অবজ্ঞা, করতে না শিখেছে তারা আধ্যাত্মিকতার সন্ধান জানে না। আর আমরা আর-কিছু হই আর না-হই, বালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যে আধ্যাত্মিক। সে কথা যে অস্বীকার করবে সে নিশ্চয়ই স্বদেশ এবং স্বজাতি-দ্রোহী।

৩

রূপ জিনিসটাকে যাঁরা একটা পাপ মনে করেন তাঁদের মতে অবশ্য রূপের প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ পাপের প্রশ্রয় দেওয়া! কিন্তু দলে পাতলা হলেও পৃথিবীতে এমন-সব লোক আছে যারা রূপকে মান্য করে শ্রদ্ধা করে, এমন-কি, পূজা করতেও প্রস্তুত; অথচ নিজেদের মহাপাপী মনে করে না। এই রূপভক্তের দল অবশ্য স্বদেশীর কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য, অর্থাৎ প্রমাণপ্রয়োগসহকারে রূপের স্বত্বসাব্যস্ত করতে বাধ্য। আপসোসের কথা এই যে, যে সত্য সকলের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, সেই সত্য এ দেশে প্রমাণ করতে হয়—অর্থাৎ একটা সহজ কথা বলতে গেলে, আমাদের ন্যায়-অন্যায়ের তর্কস্রোতের উজান ঠেলে যেতে হয়।

যা সকলে জানে—আছে, তা নেই বলাতে অতিবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা এই 'অতি'র অতিভক্ত হওয়াতে আমাদের ইতির জ্ঞান নষ্ট হয়েছে।

বস্তুর রূপ বলে যে একটি ধর্ম আছে এ হচ্ছে, শোনা কথা নয়, দেখা জিনিস। যাঁর চোখ-নামক ইন্দ্রিয় আছে তিনিই কখনো-না-কখনো তার সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। এবং আমাদের সকলেরই চোখ আছে; সম্ভবত শুধু তাঁদের ছাড়া, যাঁরা সৌন্দর্যের নাম করলেই অতীন্দ্রিয়তার ব্যাখ্যান অর্থাৎ উপাখ্যান শুরু করেন। কিন্তু আমি এই রূপ জিনিসটিকে অতিবর্জিত ইন্দ্রিয়ের কোঠাতেই টিঁকিয়ে রাখতে চাই; কেননা অতীন্দ্রিয় জগতে রূপ নিশ্চয়ই অরূপ হয়ে যায়।

৪

রূপের বিষয় দার্শনিকেরা কি বলেন আর না-বলেন, তাতে কিছু যায়-আসে না; কেননা, যা দৃষ্টির আগোচর তাই দর্শনের বিষয়। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, বস্তুর রূপ বলে যে একটি গুণ আছে তা মানুষমাত্রেই জানে এবং

মানে। তবে সেই গুণের পক্ষপাতী হওয়াটা গুণের কি দোষের, এই নিয়েই যা মতভেদ।

রূপকে আমরা ভক্তি করি নে, সম্ভবত ভালোও বাসি নে। আপনারা সকলেই জানেন যে, হালে একটা মতের বহুলপ্রচার হয়েছে যার ভিতরকার কথা এই যে, জাতীয় আত্মমর্যাদা হচ্ছে পরশ্রীকাতরতারই সদর পিঠ। সম্ভবত এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলে শ্রীকাতরতাও যে ঐ জাতীয় আত্মমর্যাদার লক্ষণ—এ কথা স্বীকার করা যায় না; কেননা, বিশ্বমানবের সভ্যতার ইতিহাস এর বিরুদ্ধে চিরদিন সাক্ষি দিয়ে আসছে।

স্বদেশের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেই অপর সভ্যজাতির কাছে রূপের মর্যাদা যে কত বেশি তার প্রমাণ হাতে-হাতে পাওয়া যাবে। বর্তমান ইউরোপ সুন্দরকে সত্যের চাইতে নীচে আসন দেয় না, সে দেশে জ্ঞানীর চাইতে আর্টিস্টের মান্য কম নয়। তারা সভ্যসমাজের দেহটাকে—অর্থাৎ দেশের রাস্তাঘাট, বাড়ি-ঘরদোর, মন্দির-প্রাসাদ, মানুষের অশনবসন, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি—নিত্য নূতন করে সুন্দর করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে। সে চেষ্টার ফল সু কি কু হচ্ছে সে স্বতন্ত্র কথা। ইউরোপীয় সভ্যতার ভিতর অবশ্য একটা কুৎসিত দিক আছে, যার নাম কমার্শিয়ালিজ্‌ম্; কিন্তু এই দিকটে কদর্য বলেই তার সর্বনাশের দিক। কমার্শিয়া-লিজ্‌মের মূলে আছে লোভ। আর লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। আপনারা সকলেই জানেন যে, রূপের সঙ্গে মোহের সম্পর্ক থাকতে পারে, কিন্তু লোভের নেই।

ইউরোপ ছেড়ে এশিয়াতে এলে দেখতে পাই যে, চীন ও জাপান রূপের এতই ভক্ত যে, রূপের আরাধনাই সে দেশের প্রকৃত ধর্ম বললেও অত্যুক্তি হয় না। রূপের প্রতি এই পরাপ্রীতিবশত চীনজাপানের লোকের হাতে-গড়া এমন জিনিস নেই যার রূপ নেই—তা সে ঘটিই হোক আর বাটিই হোক। যাঁরা তাদের হাতের কাজ দেখেছেন তাঁরাই তাদের রূপসৃষ্টির কৌশল দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। মোঙ্গল-জাতিকে ভগবান রূপ দেন নি, সম্ভবত সেই কারণে সুন্দরকে তাদের নিজের হাতে গড়ে নিতে হয়েছে। এই তো গেল বিদেশের কথা।

৫

আবার শুধু স্বদেশের নয়, স্বকালের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলে আমরা ঐ একই সত্যের পরিচয় পাই। প্রাচীন গ্রীকো-ইতালীয় সভ্যতার ঐকান্তিক রূপচর্চার ইতিহাস তো জগদ্‌বিখ্যাত। প্রাচীন ভারতবর্ষও রূপ সম্বন্ধে অন্ধ ছিল না: কেননা, আমরা যাই বলি-নে কেন, সে সভ্যতাও মানবসভ্যতা—একটা সৃষ্টিছাড়া পদার্থ নয়। সে সভ্যতারও শুধু আত্মা নয়, দেহ ছিল; এবং সে দেহকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা সুঠাম ও সুন্দর করেই গড়তে চেষ্টা করেছিলেন। সে দেহ আমাদের চোখের সুমুখে নেই বলেই আমরা মনে করি যে, সেকালে যা ছিল তা হচ্ছে শুধু অশরীরী আত্মা। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁদের কতটা সৌন্দর্যজ্ঞান ছিল। আমরা যাকে সংস্কৃত কাব্য বলি, তাতে রূপবর্ণনা

ছাড়া আর বড়ো-কিছু নেই; আর সে রূপবর্ণনাও আসলে দেহের, বিশেষত রমণীদেহের, বর্ণনা; কেননা, সে কাব্যসাহিত্যে যে প্রকৃতিবর্ণনা আছে তাও বস্তুত রমণীর রূপবর্ণনা। প্রকৃতিকে তাঁরা সুন্দরী রমণী হিসেবেই দেখেছিলেন। তার যে অংশ নারী-অঙ্গের উপমেয় কি উপমান নয়, তার স্বরূপ হয় তাঁদের চোখে পড়ে নি, নয় তা তাঁরা রূপ বলে গ্রাহ্য করেন নি। সংস্কৃত সাহিত্যে হরেকরকমের ছবি আছে, কিন্তু ল্যান্ডস্কেপ্ নেই বললেই হয়; অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক প্রকৃতির অস্তিত্বের বিষয় তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ল্যান্ডস্কেপ্ প্রাচীন গ্রীস কিংবা রোমের হাত থেকেও বেরোয় নি। তার কারণ, সেকালে মানুষে মানুষ বাদ দিয়ে বিশ্বসংসার দেখতে শেখে নি। এর প্রমাণ শুধু আর্টে নয়, দর্শনে-বিজ্ঞানেও পাওয়া যায়। আমরা আমাদের নববিজ্ঞানের প্রসাদে মানুষকে এ বিশ্বের পরমাণুতে পরিণত করেছি, সম্ভবত সেই কারণে আমরা মানবদেহের সৌন্দর্য অবজ্ঞা করতে শিখেছি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিন্তু সে সৌন্দর্যকে একটি অমূল্য বস্তু বলে মনে করতেন; শুধু স্ত্রীলোকের নয়, পুরুষের রূপের উপরও তাঁদের ভক্তি ছিল। যাঁর অলোকসামান্য রূপ নেই, তাঁকে এ দেশে পুরা-কালে মহাপুরুষ বলে কেউ মেনে নেয় নি। শ্রীরামচন্দ্র বুদ্ধদেব শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারেরা সকলেই সৌন্দর্যের অবতার ছিলেন। রূপ-গুণের সন্ধিবিচ্ছেদ করা সেকালের শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল না। শুধু তাই নয়, আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কদাকারের উপর এতটাই ঘৃণা ছিল যে, পুরাকালের শূদ্রেরা যে দাসত্ব হতে মুক্তি পায় নি তার একটি প্রধান কারণ তারা ছিল কৃষ্ণবর্ণ এবং কুৎসিত— অন্তত আর্যদের চোখে। সেকালের দর্শনের ভিতর অরূপের জ্ঞানের কথা থাকলেও সেকালের ধর্ম রূপজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। পরব্রহ্ম নিরাকার হলেও ভগবান, মন্দিরে মন্দিরে মূর্তিমান। প্রাচীন মতে নির্গুণ-ব্রহ্ম অরূপ এবং সগুণ-ব্রহ্ম সরূপ।

৬

সভ্যতার সঙ্গে সৌন্দর্যের এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকবার কারণ, সভ্যসমাজ বলতে বোঝায় গঠিত-সমাজ। যে সমাজের গড়ন নেই তাকে আমরা সভ্যসমাজ বলি নে। এ কালের ভাষায় বলতে হলে সমাজ হচ্ছে একটি অর্গ্যানিজ্‌ম্; আর আপনারা সকলেই জানেন যে সকল অর্গ্যানিজ্‌ম্ একজাতীয় নয়, ও-বস্তুর ভিতর উঁচুনিচুর প্রভেদ বিস্তর। অর্গ্যানিক্-জগতে প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম্ হচ্ছে সবচাইতে নীচে এবং মানুষ সবচাইতে উপরে। এবং মানুষের সঙ্গে প্রোটোপ্ল্যাজ্‌মের প্রত্যক্ষ পার্থক্য হচ্ছে রূপে; অপর-কোনো প্রভেদ আছে কি না, সে হচ্ছে তর্কের বিষয়। মানুষে যে প্রোটোপ্ল্যাজ্‌মের চাইতে রূপবান, এ বিষয়ে, আশা করি, কোনো মতভেদ নেই। এই থেকে প্রমাণ হয় যে, যে সমাজের চেহারা যত সুন্দর সে সমাজ তত সভ্য। এরূপ হবার একটি স্পষ্ট কারণও আছে। এ জগতে রূপ হচ্ছে শক্তির চরম বিকাশ: সমাজ গড়বার জন্য মানুষের শক্তি চাই এবং সুন্দর করে গড়বার জন্য তার চাইতেও

বেশি শক্তি চাই। সুতরাং মানুষ যেমন বাড়বার মুখে ক্রমে অধিক সুশ্রী হয়ে ওঠে এবং মরবার মুখে ক্রমে অধিক কুশ্রী হয়—জাতের পক্ষেও সেই একই নিয়ম খাটে। কদর্যতা দুর্বলতার বাহ্যলক্ষণ, সৌন্দর্য শক্তির। এই ভারতবর্ষের অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায় যে, যখনই দেশে নবশক্তির আবির্ভাব হয়েছে তখনই মঠে-মন্দিরে-বেশে-ভূষায় মানুষের আশায়-ভাষায় নবসৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। ভারতবর্ষের আর্টের বৌদ্ধযুগ ও বৈষ্ণবযুগ এই সত্যেরই জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

আমাদের এই কোণঠাসা দেশে যেদিন চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয় সেইদিনই বাঙালি সৌন্দর্যের আবিষ্কার করে। এর পরিচয় বৈষ্ণবসাহিত্যে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সৌন্দর্যবুদ্ধি যে টিঁকল না, বাংলার ঘরে-বাইরে যে তা নানারূপে নানা আকারে ফুটল না—তার কারণ চৈতন্যদেব যা দান করতে এসেছিলেন তা ষোলো-আনা গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল না। যে কারণে বাংলার বৈষ্ণবধর্ম বাঙালি সমাজকে একাকার করবার চেষ্টায় বিফল হয়েছে, হয়তো সেই একই কারণে তা বাঙালি সভ্যতাকে সাকার করে তুলতে পারে নি। ভক্তির রস আমাদের বুকে ও মুখে গড়িয়েছে, আমাদের মনে ও হাতে তা জমে নি। ফলে, এক গান ছাড়া আর-কিছুকেই আমরা নবরূপ দিতে পারি নি।

৭

এ-সব কথা যদি সত্য হয় তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের রূপজ্ঞানের অভাবটা আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয় না। কিন্তু এ কথা মুখ ফুটে বললেই আমাদের দেশের অন্ধের দল লগুড় ধারণ করবেন। এর কারণ কি, তা বলছি।

সত্য ও সৌন্দর্য, এ দুটি জিনিসকে কেউ উপেক্ষা করতে পারেন না। হয় এদের ভক্তি করতে হবে, নয় অভক্তি করতে হবে। অর্থাৎ সত্যকে উপেক্ষা করলে মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হবে, আর সুন্দরকে অবজ্ঞা করলে কুৎসিতের প্রশ্রয় দিতেই হবে। এ পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—এক সু, আর-এক কু। 'সু'কে অর্জন না করলে 'কু'কে বর্জন করা কঠিন। আমাদের দশাও হয়েছে তাই। আমাদের সুন্দরের প্রতি যে অনুরাগ নেই, শুধু তাই নয়, ঘোরতর বিরাগ আছে।

আমরা দিনে-দুপুরে চিৎকার করে বলি যে, সাহিত্যে যে ফুলের কথা জ্যোৎস্নার কথা লেখে সে লেখক নিতান্তই অপদার্থ।

এঁদের কথা শুনলে মনে হয় যে, সব ফলই যদি ডুমুর হয়ে ওঠে, আর অমাবস্যা যদি বারোমেসে হয়, তা হলেই এ পৃথিবী ভূস্বর্গ হয়ে উঠবে; এবং সে স্বর্গে অবশ্য কোনো কবির স্থান হবে না। চন্দ্র যে সৌরমণ্ডলের মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত গোলক, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ও রিফ্লেক্টর ভগবান আকাশে ঝুলিয়ে দিয়েছেন; সুতরাং জ্যোৎস্না যে আছে, তার জন্য কবি দায়ী নন, দায়ী স্বয়ং ভগবান। কিন্তু এই জ্যোৎস্নাবিদ্বেষ থেকেই এঁদের প্রকৃত মনোভাব বোঝা যায়। এ রাগটা আসলে আলোর উপর রাগ। জ্ঞানের আলোক যখন আমাদের

চোখে পুরোপুরি সয় না, তখন রূপের আলোক যে মোটেই সইবে না তাতে আর বিচিত্র কি। জ্ঞানের আলো বস্তুজগৎকে প্রকাশ করে, সুতরাং এমন অনেক বস্তু প্রকাশ করে যা আমাদের পেটের ও প্রাণের খোরাক জোগাতে পারে; কিন্তু রূপের আলো শুধু নিজেকেই প্রকাশ করে, সুতরাং তা হচ্ছে শুধু আমাদের চোখের ও মনের খোরাক। বলা বাহুল্য, উদর ও প্রাণ প্রোটোপ্ল্যাজ্‌মেরও আছে, কিন্তু চোখ ও মন শুধু মানুষেরই আছে। সুতরাং যাঁরা জীবনের অর্থ বোঝেন একমাত্র বেঁচে থাকা এবং তজ্জন্য উদরপূর্তি করা তাঁদের কাছে জ্ঞানের আলো গ্রাহ্য হলেও রূপের আলো অবজ্ঞাত। এ দুয়ের ভিতর প্রভেদও বিস্তর। জ্ঞানের আলো সাদা ও একঘেয়ে, অর্থাৎ ও হচ্ছে আলোর মূল; অপর পক্ষে, রূপের আলো রঙিন ও বিচিত্র, অর্থাৎ আলোর ফুল। আদিম মানবের কাছে ফুলের কোনো আদর নেই, কেননা ও-বস্তু আমাদের কোনো আদিম ক্ষুধার নিবৃত্তি করে না; ফুল আর-যাই হোক, চর্ব্য-চোষ্য কিংবা লেহ্য-পেয় নয়।

এ-সব কথা শুনে আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা নিশ্চয়ই বলবেন যে, আমি যা বলছি সে-সব জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা নয়, সেরেফ কবিত্ব। বিজ্ঞানের কথা এই যে, যে আলোকে আমি সাদা বলছি, সেই হচ্ছে এ বিশ্বের একমাত্র অখণ্ড আলো; সেই-সমস্ত আলো রিফ্র্যাক্‌টেড অর্থাৎ ব্যস্ত হয়েই আমাদের চোখে বহুরূপী হয়ে দাঁড়ায়। তথাস্তু। এই রিফ্র্যাক্‌শনের একাধারে নিমিত্ত এবং উপাদান-কারণ হচ্ছে পঞ্চভূতের বহির্ভূত ইথার-নামক রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের অতিরিক্ত একটি পদার্থ। এবং এই হিল্লোলিত পদার্থের ধর্ম হচ্ছে এই জড়জগৎটাকে উৎফুল্ল করা, রূপান্বিত করা। রূপ যে আমাদের স্থূলশরীরের কাজে লাগে না তার কারণ বিশ্বের স্থূলশরীর থেকে তার উৎপত্তি হয় নি। আমাদের ভিতর যে সূক্ষ্মশরীর অর্থাৎ ইথার আছে, বাইরে রূপের স্পর্শে সেই সূক্ষ্মশরীর স্পন্দিত হয়, আনন্দিত হয়, পুলকিত হয়, প্রস্ফুটিত হয়। রূপজ্ঞানেই মানুষের জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ স্থূলশরীরের বন্ধন হতে মুক্তি। রূপজ্ঞান হারালে মানুষ আজীবন পঞ্চভূতেরই দাসত্ব করবে। রূপ-বিদ্বেষটা হচ্ছে আত্মার প্রতি দেহের বিদ্বেষ, আলোর বিরুদ্ধে অন্ধকারের বিদ্রোহ। রূপের গুণে অবিশ্বাস করাটা নাস্তিকতার প্রথম সূত্র।

ইন্দ্রিয়জ বলে বাইরেব রূপের দিকে পিঠ ফেরালে ভিতরের রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন; কেননা, ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে জড় ও চৈতন্যের একমাত্র বন্ধনসূত্র। এবং ঐ সূত্রেই রূপের জন্ম। অন্তরের রূপও যে আমাদের সকলের মনশ্চক্ষে ধরা পড়ে না, তার প্রমাণস্বরূপ একটা চলতি উদাহরণ নেওয়া যাক।

রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রতি অনেকের বিরক্তির কারণ এই যে, সে লেখার রূপ

আছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ইথার আছে, তাই সে মনের ভিতর দিয়ে যে ভাবের আলো রিফ্র্যাক্‌টেড হয়ে আসে তা ইন্দ্রধনুর বর্ণে রঞ্জিত ও ছন্দে মূর্ত হয়ে আসতে বাধ্য। স্থূলদর্শীর স্থূলদৃষ্টিতে তা হয় অসত্য নয় অশিব বলে ঠেকা কিছু আশ্চর্য নয়।

মানুষে তিনটি কথাকে বড়ো বলে স্বীকার করে, তার অর্থ তারা পুরো বুঝুক আর না-বুঝুক। সে তিনটি হচ্ছে সত্য শিব আর সুন্দর। যার রূপের প্রতি বিদ্বেষ আছে সে সুন্দরকে তাড়না করতে হলে হয় সত্যের নয় শিবের দোহাই দেয়; যদিচ সম্ভবত সে ব্যক্তি সত্য কিংবা শিবের কখনো একমনে সেবা করে নি। যদি কেউ বলেন যে, সুন্দরের সাধনা কর—অমনি দশজনে বলে ওঠেন, কি দুনীর্তির কথা! বিষয়বুদ্ধির মতে সৌন্দর্যপ্রিয়তা বিলাসিতা এবং রূপের চর্চা চরিত্রহীনতার পরিচয় দেয়। সুন্দরের উপর এ দেশে সত্যের অত্যাচার কম, কেননা এ দেশে সত্যের আরাধনা করবার লোকও কম। শিবই হচ্ছে এখন আমাদের একমাত্র, কেননা অমনি-পাওয়া, ধন। এ তিনটির প্রতিটি যে প্রতি-অপরটির শত্রু তার কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং এদের একের প্রতি অভক্তি অপরের প্রতি ভক্তির পরিচায়ক নয়। সে যাই হোক, শিবের দোহাই দিয়ে কেউ কখনো সত্যকে চেপে রাখতে পারে নি, আমার বিশ্বাস সুন্দরকেও পারবে না। যে জানে পৃথিবী সূর্যের চারি দিকে ঘুরছে, সে সে-সত্য স্বীকার করতে বাধ্য, এবং সামাজিক জীবনের উপর তার কি ফলাফল হবে সে কথা উপেক্ষা ক'রে সে-সত্য প্রচার করতেও বাধ্য। কেননা, সত্যসেবকদের একটা বিশ্বাস আছে যে, সত্যজ্ঞানের শেষফল ভালো বৈ মন্দ নয়। তেমনি যার রূপজ্ঞান আছে, সে সৌন্দর্যের চর্চা এবং সুন্দর বস্তুর সৃষ্টি করতে বাধ্য—তার আশু সামাজিক ফলাফল উপেক্ষা ক'রে, কেননা রূপের পূজারীদেরও বিশ্বাস যে, রূপজ্ঞানের শেষফল ভালো বৈ মন্দ নয়। তবে মানুষের এ জ্ঞানলাভ করতে দেরি লাগে।

শিবজ্ঞান আসে সবচাইতে আগে। কেননা, মোটামুটি ও-জ্ঞান না থাকলে সমাজের সৃষ্টিই হয় না, রক্ষা হওয়া তো দূরের কথা। ও-জ্ঞান বিষয়বুদ্ধির উত্তমাঙ্গ হলেও একটা অঙ্গমাত্র।

তার পর আসে সত্যের জ্ঞান। এ জ্ঞান শিবজ্ঞানের চাইতে ঢের সূক্ষ্মজ্ঞান এবং এ জ্ঞান আংশিক ভাবে বৈষয়িক, অতএব জীবনের সহায়; এবং আংশিক ভাবে তার বহির্ভূত, অতএব মনের সম্পদ।

সবশেষে আসে রূপজ্ঞান। কেননা, এ জ্ঞান অতিসূক্ষ্ম এবং সাংসারিক হিসেবে অকেজো। রূপজ্ঞানের প্রসাদে মানুষের মনের পরমায়ু বেড়ে যায়, দেহের নয়। সুনীতি সভ্যসমাজের গোড়ার কথা হলেও সুরুচি তার শেষকথা। শিব সমাজের ভিত্তি, আর সুন্দর তার অভ্রভেদী চূড়া।

অবশ্য হার্বার্ট স্পেনসার বলেছেন যে, মানুষের রূপজ্ঞান আসে আগে এবং সত্যজ্ঞান তার পরে। তার কারণ, যে জ্ঞান তাঁর জন্মায় নি, তিনি মনে করতেন সে জ্ঞান বাতিল্ হয়ে গিয়েছে। সত্যকথা এই যে, মানবসমাজের পক্ষে রূপজ্ঞান লাভ করাই সাধনাসাপেক্ষ—খোয়ানো সহজ। আমাদের পূর্বপুরুষদের সাধনার

সেই সঞ্চিত ধন আমরা অবহেলাক্রমে হারিয়ে বসেছি। বিলেতি সভ্যতার কেজো অংশের সংস্পর্শে আমাদের মনের ভিত টলুক আর না-টলুক, তার চূড়া ভেঙে পড়েছে।

এ বিষয়ে বৌদ্ধদর্শনের মত প্রণিধানযোগ্য। বৌদ্ধদার্শনিকেরা কল্পনা করেন যে, এ জগতে নানা লোক আছে। সব নীচে কামলোক, তার উপরে রূপলোক, তার উপরে ধ্যানলোক ইত্যাদি।

আমার ধারণা, আমরা সব জন্মত কামলোকের অধিবাসী; সুতরাং রূপলোকে যাওয়ার অর্থ আত্মার পক্ষে ওঠা, নামা নয়।

আর-এক কথা, রূপের চর্চার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, আমরা দরিদ্র জাতি; অতএব ও আমাদের সাধনার ধন নয়। এ ধারণার কারণ, ইউরোপের কমার্শিয়ালিজ্‌ম্‌ আমাদের মনের উপর এ যুগে রাজার মতো প্রভুত্ব করছে। সত্যকথা এই যে, জাতীয়-শ্রীহীনতার কারণ অর্থের অভাব নয়, মনের দারিদ্র্য। তার প্রমাণ, আমাদের হালফ্যাশনের বেশভূষা সাজসজ্জা আচার-অনুষ্ঠানের শ্রীহীনতা, সোনার-জলে ছাপানো বিয়ের কবিতার মতো আমাদের ধনীসমাজেই বিশেষ করে ফুটে উঠেছে। আসল কথা, আমাদের নবশিক্ষার বৈজ্ঞানিক আলোক আমাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করুক আর নাই-করুক, আমাদের রূপকানা করেছে। 'গুণ হয়ে দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়'— ভারতচন্দ্রের এ কথা সুন্দরের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে আমাদের সকলের পক্ষেই সমান খাটে। আর যদি এই কথাই সত্য হয় যে, আমরা সুন্দরভাবে বাঁচতে পারি নে তা হলে আমাদের সুন্দরভাবে মরাই শ্রেয়। তাতে পৃথিবীর কারো কোনো ক্ষতি হবে না, এমন-কি, আমাদেরও নয়।

ফাল্গুন ১৩২৩

আমাদের দেশে কিছুরই হঠাৎ বদল হয় না, ঋতুরও নয়। বর্ষা কেবল কখনো-কখনো বিনা-নোটিসে একেবারে হুড়্মুড়্ করে এসে গ্রীষ্মের রাজ্য জবরদখল করে নেয়। ও-ঋতুর চরিত্র কিন্তু আমাদের দেশের ধাতের সঙ্গে মেলে না। প্রাচীন কবিরা বলে গেছেন, বর্ষা আসে দিগ্‌বিজয়ী যোদ্ধার মতো—আকাশে জয়ঢাক বাজিয়ে, বিদ্যুতের নিশান উড়িয়ে, অজস্র বরুণাস্ত্র বর্ষণ ক'রে, এবং দেখতে-না-দেখতে আসমুদ্রহিমালয় সমগ্র দেশটার উপর একছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। এক বর্ষাকে বাদ দিলে বাকি পাঁচটা ঋতু যে ঠিক কবে আসে আর কবে যায়, তা এক জ্যোতিষী ছাড়া আর-কেউ বলতে পারেন না। আমাদের ছয় রাগের মধ্যে এক মেঘ ছাড়া আর-পাঁচটি যেমন এক সুর থেকে আর-একটিতে বেমালুম ভাবে গড়িয়ে যায় আমাদের স্বদেশী পঞ্চঋতুও তেমনি ভূমিষ্ঠ হয় গোপনে, ক্রমবিকশিত হয় অলক্ষিতে, ক্রমবিলীন হয় পরঋতুতে।

ইউরোপ কিন্তু ক্রমবিকাশের জগৎ নয়। সে দেশের প্রকৃতি লাফিয়ে চলে, এক ঋতু থেকে আর-এক ঋতুতে ঝাঁপিয়ে পড়ে; বছরে চার বার নবকলেবর ধারণ করে, নবমূর্তিতে দেখা দেয়। তাদের প্রতিটির রূপ যেমন স্বতন্ত্র তেমনি স্পষ্ট। যাঁর চোখ আছে তিনিই দেখতে পান যে, বিলেতের চারটি ঋতু চতুর্বর্ণ। মৃত্যুর স্পর্শে বহু যে এক হয়, আর প্রাণের স্পর্শে এক যে বহু হয়, এ সত্য সে দেশে প্রত্যক্ষ করা যায়। সেখানে শীতের রঙ তুষার-গৌর, সকল বর্ণের সমষ্টি; আর বসন্তের রঙ ইন্দ্রধনুর, সকল বর্ণের ব্যষ্টি। তার পর নিদাঘের রঙ ঘন-সবুজ, আর শরতের গাঢ়-বেগনি। বিলেতি ঋতুর চেহারা শুধু আলাদা নয়, তাদের আসা-যাওয়ার ভঙ্গিও বিভিন্ন।

সে দেশে বসন্ত শীতের শবশীতল কোল থেকে রাতারাতি গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে—মহাদেবের যোগভঙ্গ করবার জন্য মদনসখা বসন্ত যেভাবে একদিন অকস্মাৎ হিমাচলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কোনো-এক সুপ্রভাতে ঘুম ভেঙে চোখ মেলে হঠাৎ দেখা যায় যে, রাজ্যির গাছ মাথায় একরাশ ফুল প'রে দাঁড়িয়ে হাসছে; অথচ তাদের পরনে একটিও পাতা নেই। সে রাজ্যে বসন্তরাজ তাঁর আগমনবার্তা আকাশের নীল পত্রে সাতরঙা ফুলের হরফে এমন স্পষ্ট এমন উজ্জ্বল করে ছাপিয়ে দেন যে, সে বিজ্ঞাপন—মানুষের কথা ছেড়ে দিন—পশুপক্ষীরও চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।

ইউরোপের প্রকৃতির যেমন ক্রমবিকাশ নেই, তেমনি ক্রমবিলয়ও নেই; শরৎও সে দেশে কালক্রমে জরাজীর্ণ হয়ে অলক্ষিতে শিশিরের কোলে দেহত্যাগ করে না। সে দেশে শরৎ তার শেষ-উইল—পাণ্ডুলিপিতে নয়, রক্তাক্ষরে—লিখে রেখে যায়; কেননা, মৃত্যুর স্পর্শে তার, পিত্ত নয়, রক্ত প্রকুপিত হয়ে ওঠে। প্রদীপ যেমন নেভবার আগে জ্বলে ওঠে, শরতের তাম্রপত্রও তেমনি ঝরবার আগে অগ্নিবর্ণ হয়ে

ওঠে। তখন দেখতে মনে হয়, অস্পৃশ্য শত্রুর নির্মম আলিঙ্গন হতে আত্মরক্ষা করবার জন্য প্রকৃতিসুন্দরী যেন রাজপুত-রমণীর মতো স্বহস্তে চিতারচনা করে সোল্লাসে অগ্নিপ্রবেশ করছেন।

এ দেশে ঋতুর গমনাগমনটি অলক্ষিত হলেও তার পূর্ণাবতারটি ইতিপূর্বে আমাদের নয়নগোচর হত। কিন্তু আজ যে ফাল্গুন মাসের পনেরো তারিখ, এ সুখবর পাঁজি না দেখলে জানতে পেতুম না। চোখের সুমুখে যা দেখছি তা বসন্তের চেহারা নয়, একটা মিশ্রঋতুর— শীত ও বর্ষার— যুগলমূর্তি। আর এদের পরস্পরের মধ্যে পালায়-পালায় চলছে সন্ধি ও বিগ্রহ। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও শীত ও বর্ষার দাম্পত্যবন্ধন এ ভাবে চিরস্থায়ী হওয়াটা আমার মতে মোটেই ইচ্ছনীয় নয়। কেননা, এ হেন অসবর্ণ-বিবাহের ফলে শুধু সংকীর্ণবর্ণ দিবানিশার জন্ম হবে।

এই ব্যাপার দেখে আমার মনে ভয় হয় যে, হয়তো বসন্ত ঋতুর খাতা থেকে নাম কাটিয়ে চিরদিনের মতো এ দেশ থেকে সরে পড়ল। এ পৃথিবীটি অতিশয় প্রাচীন হয়ে পড়েছে; হয়তো সেই কারণে বসন্ত এটিকে ত্যাগ করে এই বিশ্বের এমন-কোনো নবীন পৃথিবীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন যেখানে ফুলের গন্ধে পত্রের বর্ণে পাখির গানে বায়ুর স্পর্শে আজও নরনারীর হৃদয় আনন্দে আকুল হয়ে ওঠে।

আমরা আমাদের জীবনটা এমন দৈনিক করে তুলেছি যে, ঋতুর কথা দূরে থাক, মাস-পক্ষের বিভাগটারও আমাদের কাছে কোনো প্রভেদ নেই। আমাদের কাছে শীতের দিনও কাজের দিন, বসন্তের দিনও তাই; এবং অমাবস্যাও ঘুমবার রাত, পূর্ণিমাও তাই। যে জাত মনের আপিস কামাই করতে জানে না, তার কাছে বসন্তের অস্তিত্বের কোনো অর্থ নেই, কোনো সার্থকতা নেই— বরং ও একটা অনর্থেরই মধ্যে; কেননা, ও-ঋতুর ধর্মই হচ্ছে মানুষের মন-ভোলানো, তার কাজ-ভোলানো। আর আমরা সব ভুলতে সব ছাড়তে রাজি আছি, এক কাজ ছাড়া; কেননা, অর্থ যদি কোথায়ও থাকে তো ঐ কাজেই আছে। বসন্তে প্রকৃতিসুন্দরী নেপথ্যবিধান করেন; সে সাজগোজ দেখবার যদি কোনো চোখ না থাকে তা হলে কার জন্যই-বা নবীন পাতার রঙিন শাড়ি পরা, কার জন্যই-বা ফুলের অলংকার ধারণ, আর কার জন্যই-বা তরুণ আলোর অরুণ হাসি হাসা? তার চাইতে চোখের জল ফেলা ভালো। অর্থাৎ এ অবস্থায় শীতের পাশে বর্ষাই মানায় ভালো। শুনতে পাই, কোনো ইউরোপীয় দার্শনিক আবিষ্কার করেছেন যে, মানবসভ্যতার তিনটি স্তর আছে। প্রথম আসে শ্রুতির যুগ, তার পর দর্শনের, তার পর বিজ্ঞানের। এ কথা যদি সত্য হয় তো আমরা বাঙালিরা, আর-যেখানেই থাকি, মধ্যযুগে নেই; আমাদের বর্তমান অবস্থা হয় সভ্যতার প্রথম-অবস্থা, নয় শেষ-অবস্থা। আমাদের এ যুগ যে দর্শনের যুগ নয় তার প্রমাণ, আমরা চোখে কিছুই দেখি নে; কিন্তু হয় সবই জানি, নয় সবই শুনি। এ অবস্থায় প্রকৃতি যে

আমাদের প্রতি অভিমান করে তাঁর বাসন্তী মূর্তি লুকিয়ে ফেলবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি।

আমি এইমাত্র বলেছি যে, এ যুগে আমরা হয় সব জানি, নয় সব শুনি। কিন্তু সত্যকথা এই যে, আমরা একালে যা-কিছু জানি সে-সব শুনেই জানি— অর্থাৎ দেখে কিংবা ঠেকে নয়; তার কারণ, আমাদের কোনো-কিছু দেখবার আকাঙ্ক্ষা নেই— আর সব-তাতেই ঠেকবার আশঙ্কা আছে।

এই বসন্তের কথাটাও আমাদের শোনা-কথা, ও একটা গুজবমাত্র। বসন্তের সাক্ষাৎ আমরা কাব্যের পাকাখাতার ভিতর পাই, গাছের কাঁচপাতার ভিতর নয়। আর বইয়ে যে বসন্তের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় তা কস্মিন্‌কালেও এ ভূভারতে ছিল কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার বৈধ কারণ আছে।

গীতগোবিন্দে জয়দেব বসন্তের যে রূপবর্ণনা করেছেন, সে রূপ বাংলার কেউ কখনো দেখে নি। প্রথমত, মলয়সমীরণ যদি সোজাপথে সিধে বয়, তা হলে বাংলাদেশের পায়ের নীচে দিয়ে চলে যাবে, তার গায়ে লাগবে না। আর যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নেওয়া যায় যে, সে বাতাস উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে, অর্থাৎ পথ ভুলে, বঙ্গভূমির গায়েই এসে ঢলে পড়ে, তা হলেও লবঙ্গলতাকে তা কখনোই পরিশীলিত করতে পারে না। তার কারণ, লবঙ্গ গাছে ফলে কি লতায় ঝোলে, তা আমাদের কারো জানা নেই। আর হোক-না সে লতা, তার এ দেশে দোদুল্যমান হবার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং ছিল না। সংস্কৃত আলংকারিকেরা 'কাবেরীতীরে কালাগুরুতরু'র উল্লেখে ঘোরতর আপত্তি করেছেন, কেননা ও-বাক্যটি, যতই শ্রুতিমধুর হোক-না কেন, প্রকৃত নয়। কাবেরীতীরে যে কালাগুরুতরু কালেভদ্রেও জন্মাতে পারে না, এ কথা জোর করে আমরা বলতে পারি নে; অপর পক্ষে, অজয়ের তীরে লবঙ্গলতার আবির্ভাব এবং প্রাদুর্ভাব যে একেবারেই অসম্ভব, সে কথা বঙ্গভূমির বীরভূমির সঙ্গে যাঁর চাক্ষুষ পরিচয় আছে তিনিই জানেন। ঐ এক উদাহরণ থেকেই অনুমান, এমন-কি, প্রমাণ পর্যন্ত করা যায় যে, জয়দেবের বসন্ত-বর্ণনা কাল্পনিক— অর্থাৎ সাদা ভাষায় যাকে বলে অলীক। যার প্রথম কথাই মিথ্যে, তার কোনো কথায় বিশ্বাস করা যায় না; অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই কবিবর্ণিত বসন্ত আগাগোড়া মনগড়া।

জয়দেব যখন নিজের চোখে দেখে বর্ণনা করেন নি, তখন তিনি অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের বই থেকে বসন্তের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন; এবং কবি-পরম্পরায় আমরাও তাই করে আসছি। সুতরাং এ সন্দেহ স্বতঃই মনে উদয় হয় যে, বসন্তঋতু একটা কবিপ্রসিদ্ধিমাত্র; ও-বস্তুর বাস্তবিক কোনো অস্তিত্ব নেই। রমণীর পদতাড়নার অপেক্ষা না রেখে অশোক যে ফুল ফোটায়, তার গায়ে যে আলতার রঙ দেখা দেয়, এবং ললনাদের মুখমদ্যাসিক্ত না হলেও বকুলফুলের মুখে যে মদের গন্ধ পাওয়া যায়— এ কথা আমরা সকলেই জানি। এ দুটি কবিপ্রসিদ্ধির

মূলে আছে মানুষের ঔচিত্য-জ্ঞান। প্রকৃতির যথার্থ কার্যকারণের সন্ধান পেলেই বৈজ্ঞানিক কৃতার্থ হন; কিন্তু কবি কল্পনা করেন তাই, যা হওয়া উচিত ছিল। কবির উক্তি হচ্ছে প্রকৃতির যুক্তির প্রতিবাদ। কবি চান সুন্দর, প্রকৃতি দেন তার বদলে সত্য। একজন ইংরেজ কবি বলেছেন যে, সত্য ও সুন্দর একই বস্তু; কিন্তু সে শুধু বৈজ্ঞানিকদের মুখ বন্ধ করবার জন্য। তাঁর মনের কথা এই যে, যা সত্য তা অবশ্য সুন্দর নয়, কিন্তু যা সুন্দর তা অবশ্যই সত্য—অর্থাৎ তার সত্য হওয়া উচিত ছিল। তাই আমার মনে হয় যে, পৃথিবীতে বসন্তঋতু থাকা উচিত—এই ধারণাবশত সেকালের কবিরা কল্পনাবলে উক্ত ঋতুর সৃষ্টি করেছেন। বসন্তের সকল উপাদানই তাঁরা মনঅংকে সংগ্রহ ক'রে প্রকৃতির গায়ে তা বসিয়ে দিয়েছেন।

৪

আমার এ অনুমানের স্পষ্ট প্রমাণ সংস্কৃতকাব্যে পাওয়া যায়, কেননা পুরাকালে কবিরা সকলেই স্পষ্টবাদী ছিলেন। সেকালে তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, সকল সত্যই বক্তব্য—সে সত্য মনেরই হোক, আর দেহেরই হোক। অবশ্য একালের রুচির সঙ্গে সেকালের রুচির কোনো মিল নেই; সেকালে সুরুচির পরিচয় ছিল কথা ভালো করে বলায়, একালে ও-গুণের পরিচয় চুপ করে থাকায়। নীরবতা যে কবির ধর্ম, এ জ্ঞান সেকালে জন্মে নি। সুতরাং দেখা যাক, তাদের কাব্য থেকে বসন্তের জন্মকথা উদ্ধার করা যায় কি না।

সংস্কৃতমতে বসন্ত মদনসখা। মনসিজের দর্শনলাভের জন্য মানুষকে প্রকৃতির দ্বারস্থ হতে হয় না। কেননা, মন যার জন্মস্থান তার সাক্ষাৎ মনেই মেলে।

ও-বস্তুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মনের দেশের অপূর্ব রূপান্তর ঘটে। তখন সে রাজ্যে ফুল ফোটে, পাখি ডাকে, আকাশ-বাতাস বর্ণে-গন্ধে ভরপুর হয়ে ওঠে। মানুষের স্বভাবই এই যে, সে বাইরের বস্তুকে অন্তরে আর অন্তরের বস্তুকে বাইরে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই ভিতর-বাইরের সমন্বয় করাটাই হচ্ছে আত্মার ধর্ম। সুতরাং মনসিজের প্রভাবে মানুষের মনে যে রূপরাজ্যের সৃষ্টি হয়, তারই প্রতিমূর্তিস্বরূপে বসন্তঋতু কল্পিত হয়েছে; আসলে ও-ঋতুর কোনো অস্তিত্ব নেই। এর একটি অকাট্য প্রমাণ আছে। যে শক্তির বলে মনোরাজ্যের এমন রূপান্তর ঘটে, সে হচ্ছে যৌবনের শক্তি। তাই আমরা বসন্তকে প্রকৃতির যৌবনকাল বলি, অথচ এ কথা আমরা কেউ ভাবি নে যে জন্মাবামাত্র যৌবন কারো দেহ আশ্রয় করে না; অথচ পয়লা ফাল্‌গুন যে বসন্তের জন্মতিথি, এ কথা আমরা সকলেই জানি। অতএব দাঁড়াল এই যে, বসন্ত প্রকৃতির রাজ্যে একটা আরোপিত ঋতু।

আমার এ-সব যুক্তি যদিও সুযুক্তি না হয়, তা হলেও আমাদের মেনে নিতে হবে যে বসন্ত মানুষের মনঃকল্পিত; নচেৎ আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, বসন্ত ও মনোজ উভয়ে সমধর্মী হলেও উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। বলা বাহুল্য, এ

কথা মানার অর্থ সংস্কৃতে যাকে বলে দ্বৈতবাদ এবং ইংরেজিতে প্যারালালিজ্‌ম্‌— সেই বাতিল দর্শনকে গ্রাহ্য করা। সে তো অসম্ভব। অবশ্য অনেকে বলতে পারেন যে, বসন্তের অস্তিত্বই প্রকৃত এবং তার প্রভাবেই মানুষের মনের যে বিকার উপস্থিত হয়, তারই নাম মনসিজ। এ তো পাকা জড়বাদ, অতএব বিনা বিচারে অগ্রাহ্য।

আমার শেষ কথা এই যে, এ পৃথিবীতে বসন্তের যখন কোনোকালে অস্তিত্ব ছিল না তখন সে অস্তিত্বের কোনোকালে লোপ হতে পারে না। আমরা ও-বস্তু যদি হারাই তবে সে আমাদের অমনোযোগের দরুন। যে জিনিস মানুষের মনগড়া, তা মানুষের মন দিয়েই খাড়া রাখতে হয়। পূর্ব-কবিরা কায়মনোবাক্যে যে রূপের ঋতু গড়ে তুলেছেন সেটিকে হেলায় হারানো বুদ্ধির কাজ নয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরা যখন বস্তুগত্যা প্রকৃতিকে মানুষের দাসী করেছেন তখন কবিদের কর্তব্য হচ্ছে কল্পনার সাহায্যে তাঁর দেবীত্ব রক্ষা করা। এবং এ উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে তাঁর মূর্তির পূজা করতে হবে; কেননা, পূজা না পেলে দেবদেবীরা যে অন্তর্ধান হন, এ সত্য তো ভুবনবিখ্যাত। দেবতা যে মন্ত্রাত্মক। আর এ পূজা যে অবশ্য-কর্তব্য তার কারণ, বসন্ত যদি অতঃপর আমাদের অন্তরে লাট খেয়ে যায় তা হলে সরস্বতীর সেবকেরা নিশ্চয়ই স্ফীত হয়ে উঠবে, তাতে করে বঙ্গ সাহিত্যের জীবন-সংশয় ঘটতে পারে। এ স্থলে সাহিত্যসমাজকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, একালে আমরা যাকে সরস্বতীপূজা বলি, আদিতে তা ছিল বসন্তোৎসব।

চৈত্র ১৩২৩

প্রাণের কথা

ভবানীপুর সাহিত্যসমিতিতে কথিত

এরকম সভার সভাপতির প্রধান কর্তব্য হচ্ছে প্রবন্ধপাঠকের গুণগান করা, কিন্তু সে কর্তব্য পালন করা আমার পক্ষে উচিত হবে কি না সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ ছিল। প্রবন্ধপাঠক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক আমার বন্ধু এবং সাহিত্যিক-বন্ধু। বন্ধুর মুখে বন্ধুর প্রশংসা একালে ভদ্রসমাজে অভদ্রতা বলেই গণ্য: ইংরেজিতে যাকে বলে মিউচুয়াল অ্যাডমিরেশন, সে ব্যাপারটি আমরা নিতান্ত হাস্যকর মনে করি; অথচ এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য যে, গুণানুরাগ উভয়পাক্ষিক না হলে কি প্রণয় কি বন্ধুত্ব কোনোটিই স্থায়ী হয় না। সে যাই হোক, বন্ধুস্তুতি সাহিত্যসমাজে যে নিষিদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং যেহেতু আমি বর্তমান সাহিত্যসমাজের নানারূপ নিয়মভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হয়ে আছি, সে কারণ আবার-একটা নূতন অপরাধে অভিযুক্ত হতে অপ্রবৃত্তি হওয়াটা আমার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক।

কিন্তু প্রবন্ধটি শুনে আমি প্রবন্ধলেখকের আর-কিছুর না হোক, সাহসের প্রশংসা না করে থাকতে পারছি নে। প্রবন্ধপাঠক মহাশয় যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তা যুগপৎ সৎসাহস ও দুঃসাহস। এ পৃথিবীতে মানুষের পক্ষে যা সব-চাইতে মূল্যবান অথচ দুর্বোধ্য— অর্থাৎ জীবন— ঘটকমহাশয় তারই উপর হস্তক্ষেপ করেছেন। এ অবশ্য দুঃসাহসের কাজ।

ঘটকমহাশয়ের প্রবন্ধের সার কথা এই যে, উপনিষদের সময় থেকে শুরু করে অদ্যাবধি নানা দেশের নানা দার্শনিক ও নানা বৈজ্ঞানিক জীবনসমস্যার আলোচনা করেছেন, কিন্তু কেউ তার চূড়ান্ত মীমাংসা করতে পারেন নি। আজ পর্যন্ত জীবনের এমন ভাষ্য কেউ করতে পারেন নি যার উপর আর টীকাটিপ্পনী চলে না।

আমার মনে হয় দর্শনবিজ্ঞানের এ নিষ্ফলতার কারণও স্পষ্ট। জীবন সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করবার পক্ষে প্রতি লোকের পক্ষে যে বাধা, সমগ্র মানবজাতির পক্ষেও সেই একই বাধা রয়েছে। জীবনসমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করবে মৃত্যু। মৃত্যুর অপর পারে আছে— হয় অনন্ত জীবন নয় অনন্ত মরণ, হয় অমরত্ব নয় নির্বাণ। এর কোনো অবস্থাতেই জীবনের আর কোনোই সমস্যা থাকবে না। যদি আমরা অমরত্ব লাভ করি তা হলে জীবন সম্বন্ধে আমাদের জানবার আর কিছু বাকি থাকবে না; অপর পক্ষে যদি নির্বাণ লাভ করি তো জানবার কেউ থাকবে না। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, সমগ্র মানবজাতি না মরা তক্ এ সমস্যার শেষ মীমাংসা করতে পারবে না। আর যদি কোনোদিন পারে তা হলে সেই দিনই মানবজাতির মৃত্যু হবে; কেননা তখন আমাদের আর কিছু জানবার কিংবা করবার জিনিস অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের পক্ষে সর্বজ্ঞ হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল নিষ্ক্রিয়

হওয়া, অর্থাৎ মৃত হওয়া; কেননা প্রাণ বিশেষ্যও নয়, বিশেষণও নয়—ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া মাত্র।

জীবনটা একটা রহস্য বলেই মানুষের বেঁচে সুখ। কিন্তু তাই বলে এ রহস্যের মর্ম উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা যে পাগলামি নয় তার প্রমাণ, মানুষ যুগে যুগে এ চেষ্টা করে এসেছে, এবং শতবার বিফল হয়েও অদ্যাবধি সে চেষ্টা থেকে বিরত হয় নি। পৃথিবীর মধ্যে যা সবচেয়ে বড়ো জিনিস তা জানবার ও বোঝবার প্রবৃত্তি মানুষের মন থেকে যে দিন চলে যাবে সে দিন মানুষ আবার পশুত্ব লাভ করবে। জীবনের যা-হয়-একটা অর্থ স্থির করে না নিলে মানুষে জীবনযাপন করতেই পারে না। এবং এ পদার্থের কে কি অর্থ করেন তার উপর তাঁর জীবনের মূল্য নির্ভর করে। এ কথা ব্যক্তির পক্ষেও যেমন সত্য জাতির পক্ষেও তেমনি সত্য। দর্শন-বিজ্ঞান জীবনের ঠিক অর্থ বার করতে পারুক আর না পারুক, এ সম্বন্ধে অনেক ভুল বিশ্বাস নষ্ট করতে পারে। এও বড়ো কম লাভের কথা নয়। সত্য না জানলেও মানুষের তেমন ক্ষতি নেই—মিথ্যাকে সত্য বলে ভুল করাই সকল সর্বনাশের মূল। সুতরাং প্রবন্ধলেখক এ আলোচনার পুনরুত্থাপন করে সৎসাহসেরই পরিচয় দিয়েছেন।

সতীশবাবু তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন—এ বিষয়ে যে নানা মুনির নানা মত আছে শুধু তাই নয়, একইরকমের মত নানা যুগে নানা আকারে দেখা দেয়। দর্শন-বিজ্ঞানের কাছে জীবনের সমস্যাটা কি, সেইটে বুঝলে সে সমস্যার মীমাংসাটাও যে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। জীবন পদার্থটিকে আমরা সকলেই চিনি, কেননা সেটিকে নিয়ে আমাদের নিত্য কারবার করতে হয়। কিন্তু তার আদি ও অন্ত আমাদের প্রত্যক্ষ নয়। সহজজ্ঞানের কাছে যা অপ্রত্যক্ষ, অনুমান-প্রমাণের দ্বারা তারই জ্ঞান লাভ করা হচ্ছে দর্শনবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। জীবনের আদি অন্ত আমরা জানি নে, এই কথাটাকে ঘুরিয়ে দুরকম ভাবে বলা যায়। এক, জীবনের আদিতে আছে জন্ম আর অন্তে মৃত্যু; আর-এক, জীবন অনাদি ও অনন্ত। জীবন সম্বন্ধে দার্শনিকতত্ত্ব হয় এর এক পক্ষ নয় আর-এক পক্ষ-ভুক্ত হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, এ দুয়ের কোনো মীমাংসাতেই আমাদের জ্ঞান কিছুমাত্র এগোয় না; অর্থাৎ এ দুই তত্ত্বের যেটাই গ্রাহ্য কর না, যা আমাদের জানা তা সমান জানাই থেকে যায়, আর যা অজানা তাও সমান অজানা থেকে যায়। সুতরাং এরকম মীমাংসাতে যাঁদের মনস্তুষ্টি হয় না তাঁরা প্রথমে জীবনের উৎপত্তি ও পরে তার পরিণতির সন্ধানে অগ্রসর হন। মোটামুটি ধরতে গেলে এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, প্রাণের উৎপত্তির সন্ধান করে বিজ্ঞান, আর পরিণতির সন্ধান করে দর্শন।

এ কথা আমরা সকলেই জানি যে, আমাদের দেহও আছে মনও আছে, আর এ দুয়ের যোগসূত্রের নাম প্রাণ। সুতরাং কেউ প্রমাণ করতে চান যে, প্রাণ দেহের

বিকার; আর কেউ-বা প্রমাণ করতে চান যে, প্রাণ আত্মার বিকার। অর্থাৎ কারো মতে প্রাণ মূলত আধিভৌতিক, কারো মতে আধ্যাত্মিক। সুতরাং সকল দেশে সকল যুগে জড়বাদ ও আত্মবাদ পাশাপাশি দেখা দেয়—কালের গুণে কখনো এ মত, কখনো ও মত প্রবল হয়ে ওঠে; সে মতের গুণে নয়, যুগের গুণে। আমার বিশ্বাস একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ মূলে একই মত। কেননা উভয় মতেই এমন-একটি নিত্য ও স্থির পদার্থের স্থাপনা করা হয়, যার আসলে কোনো স্থিরতা নেই।

অবশ্য এ দুই ছাড়া একটা তৃতীয় এবং মধ্য পন্থাও আছে, সে হচ্ছে প্রাণের স্বতন্ত্র সত্তা গ্রাহ্য করা। এই মাধ্যমিক মতের নাম ভাইটালিজ্‌ম্‌, এবং আমি নিজে এই মধ্যমতাবলম্বী। আমার বিশ্বাস, অপ্রাণ হতে প্রাণের উৎপত্তি প্রমাণ করবার সকল চেষ্টা বিফল হয়েছে। এর থেকে এ অনুমান করাও অসংগত হবে না যে, প্রাণ কখনো অপ্রাণে পরিণত হবে না। তার পর জড়, জীবন ও চৈতন্যের অন্তর্ভূত যদি এক-তত্ত্ব বার করতেই হয় তা হলে প্রাণকেই জগতের মূলে পদার্থ বলে গ্রাহ্য করে নিয়ে আমরা বলতে পারি—জড় হচ্ছে প্রাণের বিরাম ও চৈতন্য তার পরিণাম। অর্থাৎ জড় প্রাণের সুপ্ত অবস্থা, আর চৈতন্য তার জাগ্রত অবস্থা। এ পৃথিবীতে জড় জীব ও চৈতন্যের সমন্বয় একমাত্র মানুষেই হয়েছে। আমরা সকলেই জানি আমাদের দেহও আছে, প্রাণও আছে, মনও আছে । প্রাণকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের পক্ষে এক লম্ফে দেহ থেকে আত্মায় আরোহণ করা যেমন সম্ভব, দর্শনের পক্ষেও এক লম্ফে আত্মা থেকে দেহে অবরোহণ করাও তেমনি সম্ভব। জর্মান বৈজ্ঞানিক হেকেল এবং জর্মান দার্শনিক হেগেলের দর্শন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, জড়বাদী পরমাণুর অন্তরে গোপনে জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট করে দেন এবং জ্ঞানবাদী জ্ঞানের অন্তরে গোপনে গতি সঞ্চারিত করে দেন। তার পর বাজিকর যেমন খালি মুঠোর ভিতর থেকে টাকা বার করে, এঁরাও তেমনি জড় থেকে মন এবং মন থেকে জড় বার করেন। এ-সব দার্শনিক-হাতসাফাইয়ের কাজ। আমাদের চোখে যে এঁদের বুজরুকি এক নজরে ধরা পড়ে না তার কারণ, সাজানো কথার মন্ত্রশক্তির বলে এঁরা আমাদের নজরবন্দী করে রেখে দেন। তবে দেহমনের প্রত্যক্ষ যোগসূত্রটি ছিন্ন ক'রে মানুষে বুদ্ধিসূত্রে যে নূতন যোগ সাধন করে, তা টেঁকসই হয় না। দর্শনবিজ্ঞানের মনগড়া এই মধ্যপদলোপী সমাস চিরকালই দ্বন্দ্বসমাসে পরিণত হয়।

প্রাণের এই স্বাতন্ত্র্য অবশ্য সকলে স্বীকার করেন না। শুধু তাই নয়, ভাইটা-লিজ্‌ম্‌ কথাটাও অনেকের কাছে কর্ণশূল। এর কারণও স্পষ্ট। ভাইটাল ফোর্স নামক একটি স্বতন্ত্র শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ প্রাণের উৎপত্তির সন্ধান ত্যাগ করা। এ জগতের সকল পদার্থ সকল ব্যাপারই যখন জড়জগতের কতকগুলি ছোটোবড়ো নিয়মের অধীন, তখন একমাত্র প্রাণই যে স্বাধীন এ কথা

বিনা পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। আপাতদৃষ্টিতে যা বিভিন্ন মূলত তা যে অভিন্ন, এই সত্য প্রমাণ করাই বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রাণ যে জড়শক্তিরই একটি বিশেষ পরিণাম, এটা প্রমাণ না করতে পারলে বিজ্ঞানের অঙ্কে একটা মস্ত বড়ো ফাঁক থেকে যায়। গত শতাব্দীতে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক সমাজে এই ফাঁক বোজাবার বহু চেষ্টা হয়েছে; কিন্তু সুখের বিষয়ই বলুন আর দুঃখের বিষয়ই বলুন, সে চেষ্টা অদ্যাবধি সফল হয় নি। প্রাণ জড়-জগতে লীন হতে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাওয়ার অর্থ যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়া, এ কথা কে না জানে?

আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে, ইউরোপ যা প্রমাণ করতে পারে নি বাংলা তা করেছে; অর্থাৎ তাঁর মতে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, জড়ে ও জীবে কোনো প্রভেদ নেই। আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশের সর্বাগ্রগণ্য বিজ্ঞানাচার্য এ কথা কোথায়ও বলেন নি যে, জড়ে ও জীবে কোনো প্রভেদ নেই। আমার ধারণা, তিনি প্রাণের উৎপত্তি নয়, তার অভিব্যক্তি নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন। কথাটা আর-একটু পরিষ্কার করা যাক। মানুষমাত্রই জানে যে, যেমন মানুষের ও পশুর প্রাণ আছে তেমনি উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। এমন-কি, ছোটো ছেলেরাও জানে যে, গাছপালা জন্মায় ও মরে। সুতরাং মানুষ পশু ও উদ্ভিদ্ যে গুণে সমধর্মী সেই গুণের পরিচয় নেবার চেষ্টা বহুকাল থেকে চলে আসছে। ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল যে, অ্যাসিমিলেশন এবং রিপ্রো-ডাকশন—এই দুই গুণে তিন শ্রেণীর প্রাণীই সমধর্মী। অর্থাৎ এতদিন আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবৃত্তি ও শক্তিই ছিল প্রাণের লীস্ট কমন মাল্টিপ্ল্—একালের স্কুলের বাংলায় যাকে বলে লসাগু।

আচার্য জগদীশচন্দ্র দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এই দুই ছাড়া আরো অনেক বিষয়ে প্রাণীমাত্রেই সমধর্মী। তিনি যে সত্যের আবিষ্কার করেছেন সে হচ্ছে এই যে, প্রাণীমাত্রেই একই ব্যথার ব্যথী। উদ্ভিদের শিরায়-উপশিরায় বিদ্যুৎ সঞ্চার করে দিলে ও-বস্তু আমাদের মতোই সাড়া দেয়, অর্থাৎ তার দেহে স্বেদ কম্প মূর্ছা বেপথু প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ সব ফুটে ওঠে। এক কথায়, আচার্য বসু উদ্ভিদ্‌জগতেও হৃদয়ের আবিষ্কার করেছেন, পূর্বাচার্যেরা উদর ও মিথুনত্বেব সন্ধান নিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন। বসুমহাশয় প্রাণের লসাগু-তে সন্তুষ্ট না থেকে তার গসাগু অর্থাৎ গ্রেটেস্ট কমন মেজার্-এর আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছেন। যখন উদ্ভিদের হৃদয় আবিষ্কৃত হয়েছে তখন সম্ভবত কালে তার মস্তিষ্কও আবিষ্কৃত হবে। কিন্তু তাতে জড় ও জীবের ভেদ নষ্ট হবে না, কেননা জড়পদার্থের যখন উদরই নেই তখন তার অন্তরে হৃদয়-মস্তিষ্কাদি থাকবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। যে বস্তুর দেহে অন্নময় কোষ নেই, তার অন্তরে মনোময় কোষের দর্শনলাভ তাঁরাই করতে পারেন যাঁদের চোখে আকাশকুসুম ধরা পড়ে।

আমি বৈজ্ঞানিকও নই, দার্শনিকও নই; সুতরাং এতক্ষণ যে অনধিকারচর্চা করলুম, তার ভিতর চাই-কি কিছু সার নাও থাকতে পারে। কিন্তু জীবন জিনিসটে দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের একচেটে নয়, ও-বস্তু আমাদের দেহেও আছে। সুতরাং প্রাণের সমস্যার মীমাংসা আমাদেরও করতে হবে, আর-কিছুর জন্য না হোক, শুধু প্রাণধারণ করবার জন্য। আমাদের পক্ষে জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে প্রাণের মূল্য, সুতরাং আমাদের সমস্যা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকের সমস্যার ঠিক বিপরীত। প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীর অভেদজ্ঞান নয়, ভেদজ্ঞানের উপরেই আমাদের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত। কেননা, যে গুণে প্রাণীজগতে মানুষ অসামান্য সেই গুণেই সে মানুষ।

উদ্ভিদ্ ও পশুর সঙ্গে কোন্ কোন্ গুণে ও লক্ষণে আমরা সমধর্মী, সে জ্ঞানের সাহায্যে আমরা মানবজীবনের মূল্য নির্ধারণ করতে পারি নে, কোন্ কোন্ ধর্মে আমরা ও-দুই শ্রেণীর প্রাণী হতে বিভিন্ন, সেই বিশেষ জ্ঞানই আমাদের জীবনযাত্রার প্রধান সহায়; এবং এ জ্ঞান লাভ করবার জন্য আমাদের কোনোরূপ অনুমান-প্রমাণের দরকার নেই, প্রত্যক্ষই যথেষ্ট।

আমরা চোখ মেললেই দেখতে পাই যে, উদ্ভিদ্ মাটিতে শিকড় গেড়ে বসে আছে, তার চলৎশক্তি নেই। এক কথায় উদ্ভিদের প্রত্যক্ষ ধর্ম হচ্ছে স্থিতি।

তার পর দেখতে পাই, পশুরা সর্বত্র বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, অর্থাৎ তাদের প্রত্যক্ষ ধর্ম হচ্ছে গতি।

তার পর আসে মানুষ। যেহেতু আমরা পশু, সে-কারণ আমাদের গতি তো আছেই, তার উপর আমাদের ভিতর মন নামক একটি পদার্থ আছে, যা পশুর নেই। এক কথায় আমাদের প্রত্যক্ষ বিশেষ ধর্ম হচ্ছে মতি।

এ প্রভেদটার অন্তরে রয়েছে প্রাণের মুক্তির ধারাবাহিক ইতিহাস। উদ্ভিদের জীবন সবচাইতে গণ্ডীবদ্ধ, অর্থাৎ উদ্ভিদ্ হচ্ছে বদ্ধ জীব। পশু মাটির বন্ধন থেকে মুক্ত কিন্তু নৈসর্গিক স্বভাবের বন্ধনে আবদ্ধ, অর্থাৎ পশু বদ্ধমুক্ত জীব। আমরা দেহ ও মনে না মাটির না স্বভাবের বন্ধনে আবদ্ধ, অতএব এ পৃথিবীতে আমরাই একমাত্র মুক্ত জীব।

সুতরাং মনুষ্যত্ব রক্ষা করবার অর্থ হচ্ছে আমাদের দেহ ও মনের এই মুক্তভাব রক্ষা। আমাদের সকল চিন্তা সকল সাধনার ঐ একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। যে জীবন যত মুক্ত, সে জীবন তত মূল্যবান। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, মানুষের পক্ষে প্রাণীজগতে পশ্চাদ্‌পদ হওয়া সহজ। প্রাণের প্রতি মূর্ত অবস্থারই এমন-সব বিশেষ সুবিধা ও অসুবিধা আছে যা তার অপর মূর্ত অবস্থার নেই। উদ্ভিদ্ নিশ্চল, অতএব তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার একান্ত অধীন। প্রকৃতি যদি তাকে জল না জোগায় তো সে ঠায় দাঁড়িয়ে নির্জলা একাদশী করে শুকিয়ে মরতে বাধ্য। এই তার অসুবিধা। অপর পক্ষে তার সুবিধা এই যে, তাকে আহার সংগ্রহ করবার জন্য কোনোরূপ পরিশ্রম করতে হয় না, সে আলো বাতাস মাটি জল থেকে নিজের আহার অক্লেশে প্রস্তুত করে নিতে পারে। পশুর গতি

আছে, অতএব সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্পূর্ণ অধীন নয়, সে এক দেশ ছেড়ে আর-এক দেশে চলে যেতে পারে। এইটুকু তার সুবিধা। কিন্তু তার অসুবিধা এই যে, সে নিজগুণে জড়জগৎ থেকে নিজের খাবার তৈরি করে নিতে পারে না, তাকে তৈরি-খাবার অতিকষ্টে সংগ্রহ করে জীবনধারণ করতে হয়। পোষমানা জানোয়ারের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, সে উদ্ভিদেরই শামিল; কেননা সে শিকড়বন্ধ না হোক, শিকলবন্ধ।

মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীন হতে বাধ্য নয়; সে স্থানত্যাগ করতেও পারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার বদল করেও নিতে পারে। একালের ভাষায় যাকে 'বেষ্টনী' বলে মানুষের পক্ষে তা গণ্ডী নয়, মানুষের স্থিতিগতি তার স্বেচ্ছাধীন। এই তার সুবিধা। তার অসুবিধা এই যে, তাকে জীবনধারণ করবার জন্য শরীর ও মন দুই খাটাতে হয়। পশুকেও শরীর খাটাতে হয়, মন খাটাতে হয় না; উদ্ভিদ্‌কে শরীর মন দুয়ের কোনোটিই খাটাতে হয় না। অর্থাৎ উদ্ভিদের জীবন সবচাইতে আরামের। পশুর শরীরের আরাম না থাক্‌, মনের আরাম আছে। মানুষের শরীর-মন দুয়ের কোনোটিরই আরাম নেই। আমরা যদি মনের আরামের জন্য লালায়িত হই তা হলে আমরা পশুকে আদর্শ করে তুলব; আর যদি দেহমন দুয়ের আরামের জন্য লালায়িত হই তা হলে আমরা উদ্ভিদ্‌কে আদর্শ করে তুলব, এবং সেই আদর্শ অনুসারে নিজের জীবন গঠন করতে চেষ্টা করব। এ চেষ্টার ফলে আমরা শুধু মনুষ্যত্ব হারিয়ে বসব। 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভয়াবহঃ' এই সনাতন সত্যটি মানুষের সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য, নচেৎ মানবজীবন রক্ষা করা অসম্ভব। আর-একটি কথা, মানুষের পক্ষে জীবন রক্ষা করার অর্থ জীবনের উন্নতি করা। মানুষের ভিতরে-বাইরে যে গতিশক্তি আছে, তা মানুষের মতির দ্বারা নিয়মিত ও চালিত। এই মতিগতির শুভপরিণয়ের ফলে যা জন্মলাভ করে তারই নাম উন্নতি। আমাদের মনের অর্থাৎ বুদ্ধি ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনেই আমরা মানবজীবনের সার্থকতা লাভ করি। জীবনকে সম্পূর্ণ জাগ্রত করে তোলা ছাড়া আয়ুবৃদ্ধির অপর কোনো অর্থ নেই।

শ্রাবণ ১৩২৪

বর্ষা

এমন দিনে কি লিখতে মন যায়?

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি যে, যে দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সমগ্র আকাশ বর্ষায় ভরে গিয়েছে। মাথার উপর থেকে অবিরাম অবিরল অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টির ধারা পড়ছে। সে ধারা এত সূক্ষ্ম নয় যে চোখ এড়িয়ে যায়, অথচ এত স্থূলও নয় যে তা চোখ জুড়ে থাকে। আর কানে আসছে তার একটানা আওয়াজ; সে আওয়াজ কখনো মনে হয় নদীর কুলুধ্বনি, কখনো মনে হয় তা পাতার মর্মর। আসলে তা একসঙ্গে ও-দুইই; কেননা আজকের দিনে জলের স্বর ও বাতাসের স্বর দুই মিলে-মিশে এক সুর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন দিনে মানুষ যে অন্যমনস্ক হয় তার কারণ তার সকল মন তার চোখ আর কানে এসে ভর করে। আমাদের এই চোখ-পোড়ানো আলোর দেশে বর্ষার আকাশ আমাদের চোখে কি যে অপূর্ব স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখিয়ে দেয় তা বাঙালি মাত্রেই জানে। আজকের আকাশ দেখে মনে হয়, ছায়ার রঙের কোনো পাখির পালক দিয়ে বর্ষা তাকে আগাগোড়া মুড়িয়ে দিয়েছে, তাই তার স্পর্শ আমাদের চোখের কাছে এত নরম, এত মোলায়েম।

তার পর চেয়ে দেখি গাছপালা মাঠঘাট সবারই ভিতর যেন একটা নূতন প্রাণের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। সে প্রাণের আনন্দে নারকেল গাছগুলো সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে, আর তাদের মাথার ঝাঁকড়া চুল কখনো-বা এলিয়ে পড়ছে, কখনো-বা জড়িয়ে যাচ্ছে। আর পাতার চাপে যে-সব গাছের ডাল দেখা যায় না, সে-সব গাছের পাতার দল এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে, পরস্পর কোলাকুলি করছে; কখনো-বা বাতাসের স্পর্শে বেঁকে-চুরে এমন আকার ধারণ করছে যে দেখলে মনে হয় বৃক্ষলতা সব পত্রপুটে ফটিকজল পান করছে। আর এই খামখেয়ালি বাতাস নিজের খুশিমত একবার পাঁচ মিনিটের জন্য লতা-পাতাকে নাচিয়ে দিয়ে বৃষ্টির ধারাকে ছড়িয়ে দিয়ে আবার থেমে যাচ্ছে। তার পর আবার সে ফিরে এসে যা ক্ষণকালের জন্য স্থির ছিল তাকে আবার ছুঁয়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, সে যেন জানে যে তার স্পর্শে যা-কিছু জীবন্ত অথচ শান্ত সে সবই প্রথমে কেঁপে উঠবে, তার পর ব্যতিব্যস্ত হবে, তার পর মাথা নাড়বে, তার পর হাত-পা ছুঁড়বে; আর জলের গায়ে ফুটবে পুলক আর তার মুখে শীৎকার। বৃষ্টির সঙ্গে বৃক্ষপল্লবের সঙ্গে সমীরণের এই লুকোচুরির খেলা আমি চোখ ভরে দেখছি আর কান পেতে পেতে শুনছি। মনের ভিতর আমার এখন আর কোনো ভাবনাচিন্তা নেই, আছে শুধু এমন-একটা অনুভূতি যার কোনো স্পষ্ট রূপ নেই, কোনো নির্দিষ্ট নাম নেই।

মনের এমন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কি লেখা যায়? যদি যায় তো সে কবিতা, প্রবন্ধ নয়।

আনন্দে-বিষাদে মেশানো ঐ অনামিক অনুভূতির জমির উপর অনেক ছোটো-

খাটো ভাব মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠছে আবার মুহূর্তেই তা মিলিয়ে যাচ্ছে। এই বর্ষার দিনে কত গানের সুর আমার কানের কাছে গুনগুন করছে, কত কবিতার শ্লোক, কখনো পুরোপুরি কখনো আধখানা হয়ে, আমার মনের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকে আমি ইংরেজি ভুলে গিয়েছি। যে-সব কবিতা যে-সব গান আজ আমার মনে পড়ছে সে-সবই হয় সংস্কৃত, নয় বাংলা, নয় হিন্দি।

মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবশ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ

গীতগোবিন্দের এই প্রথম চরণ যে বাঙালি একবার শুনেছে চিরজীবন সে আর তা ভুলতে পারবে না। আকাশে ঘনঘটা হলেই তার কানে ও-চরণ আপনা হতেই বাজতে থাকবে। সেইসঙ্গে মনে পড়ে যাবে মনের কত পুরনো কথা, কত লুকানো ব্যথা। আমি ভাবছি মানুষ ভাষায় তার মনের কথা কত অল্প ব্যক্ত করে, আর কত বেশি অব্যক্ত রয়ে যায়। ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করবার জন্যই যাঁরা এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরাও, অর্থাৎ কবির দলও, আমার বিশ্বাস, তাঁদের মনকে অর্ধেক প্রকাশ করেছেন, অর্ধেক গোপন রেখেছেন। আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের একটি পুরনো গানের প্রথম ছত্রটি ঘুরে ফিরে ক্রমান্বয়ে আমার কানে আসছে— 'এমন দিনে তারে বলা যায়'। এমন দিনে যা বলা যায় তা হয়তো রবীন্দ্রনাথও আজ পর্যন্ত বলেন নি, শেক্‌স্‌পীয়রও বলেন নি। বলেন যে নি, সে ভালোই করেছেন। কবি যা ব্যক্ত করেন তার ভিতর যদি এই অব্যক্তের ইঙ্গিত না থাকে তা হলে তাঁর কবিতার ভিতর কোনো mystery থাকে না, আর যে কথার ভিতর mystery নেই, তা কবিতা নয়— পদ্য হতে পারে।

সে যাই হোক, আজ আমার কানে শুধু রবীন্দ্রনাথের গানের সুর লেগে নেই, সেইসঙ্গে তিনি বর্ষার যে অসংখ্য ছবি এঁকেছেন সেই-সব চিত্র বায়োস্কোপের ছবির মতো আমার চোখের সুমুখ দিয়ে একটির পর আর-একটি চলে যাচ্ছে। ভালো কথা— এটা কখনো ভেবে দেখেছেন যে, বাংলার বর্ষা রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন, ও-ঋতুর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের ভারতী ভরপুর, তার ভীমমূর্তি আর তার কান্তমূর্তি, দুইই তাঁর চোখে ধরা পড়েছে, দুইই তাঁর ভাষায় সমান সাকার হয়ে উঠেছে? নবাবি আমলের বাঙালি কবিরা এ ঋতুকে হয় উপেক্ষা করেছেন, নয় তাকে তেমন আমল দেন নি। চণ্ডীদাসের কবিতায় কি বর্ষার স্থান আছে? আমার তো তা মনে হয় না। হয়তো বীরভূমে সেকালে বৃষ্টি হত না, তাই তিনি ও-ঋতুর বর্ণনা করেন নি। বাকি বৈষ্ণব কবিরাও এ বিষয়ে একরূপ নীরব। অবশ্য ঝড়বৃষ্টি না হলে অভিসার করা চলে না, সুতরাং অভিসারের খাতিরে তাঁদের কাব্যেও মেঘ-বজ্রবিদ্যুতের একটু-আধটু চেহারা দেখাতে হয়েছে; অর্থাৎ ও-ক্ষেত্রে বর্ষা এসেছে নিতান্ত আনুষঙ্গিক ভাবে। অবশ্য এ বিষয়ে সেকালের একটা কবিতা আছে যা একাই একশো—

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥

সংগীত হিসেবে এ কবিতা গীতগোবিন্দের তুল্য। আর কাব্য হিসেবে তার অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

এখন আমার কথা এই যে, আজ আমার মনের ভিতর দিয়ে যে-সব কথা আনা-গোনা করছে সে-সব এতই বিচ্ছিন্ন এতই এলোমেলো যে, সে-সব যদি ভাষায় ধরে তার পর লেখায় পুরে দেওয়া যায় তা হলে আমার প্রবন্ধ এতই বিশৃঙ্খল হবে যে, পাঠক তার মধ্যে ভাবের গোলকধাঁধায় পড়ে যাবেন। বাইরের ল অ্যান্ড অর্ডারকে আমরা যতই বিদ্রূপ করি, ভাবের ল অ্যান্ড অর্ডারকে না মান্য করে আমরা সাহিত্য তো মাথায় থাক্, সংবাদপত্রও লিখতে পারি নে। আর যদি এমন পাঠকও থাকেন যিনি বাংলাদেশের ছেলেভুলানো ছড়া-পাঁচালির অনুরূপ অসম্বন্ধ গদ্যরচনা মনের সুখে পড়তে পারেন তা হলেও আমি আজ মন খুলে লিখতে প্রস্তুত নই। অনেক কথা যা আজ মনে পড়ছে তার যা-কিছু মূল্য আছে তা আমার কাছেই আছে, অপর কারো কাছে নেই। বহুকাল-মৃত বহুকাল-বিস্মৃত কোনো শুক্‌নো ফুলের পাপড়ি যদি হঠাৎ আবিষ্কার করা যায় তা হলে যে সেটিকে এককালে সজীব অবস্থায় সাদরে সঞ্চিত করে রেখেছিল, একমাত্র তারই কাছে সে শুষ্কপুষ্পের মূল্য আছে, অপরের কাছে তা বর্ণগন্ধহীন আবর্জনা মাত্র। মানুষের স্মৃতির ভিতরও এমন অনেক শুক্‌নো ফুল সঞ্চিত থাকে যা অপরের কাছে বা'র করা যায় না। কিন্তু এমন দিনে তা আবিষ্কার করা যায়।

আবার ঘোর করে এল, বাতি না জ্বালিয়ে লেখা চলে না; আর কালির অপব্যয় করা যত সহজ বাতির অপব্যয় করা তত সহজ নয়। অতএব এইখানেই এ লেখা শেষ করি।

আষাঢ় ১৩২৯

বর্ষার দিন

আজ ঘুম থেকে উঠে চোখ চেয়ে দেখি আকাশে আলো নেই। আকাশের চেহারা দেখে অর্ধসুপ্ত লোক ঠিক বুঝতে পারে না যে, সময়টা সকাল না সন্ধে। এ ভুল হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক, কারণ সকাল বিকাল দুই কালই হচ্ছে রাত্রি-দিনের সন্ধিস্থল। তার পর যখন দেখা যায় যে, উপর থেকে যা নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে তা সূর্যের মৃদু কিরণ নয় জলের সূক্ষ্ম ধারা, তখন জ্ঞান হয় যে এটা দিন বটে, কিন্তু বর্ষার দিন।

এমন দিনে কাব্য-ব্যসনী লোকদের মনে নানারকম পূর্বস্মৃতি জেগে ওঠে। বর্ষার যে রূপ ও যে গুণের কথা পূর্ব-কবিরা আমাদের জাতীয় স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে রেখে গিয়েছেন তা আবার মনশ্চক্ষে আবির্ভূত হয়।

অনেকে বলেন যে, কবির উক্তি আমাদের বস্তুজ্ঞানের বাধাস্বরূপ। যা চোখে দেখবার জিনিস, শোনা কথা নাকি সে জিনিসের ও চোখের ভিতর একটা পর্দা ফেলে দেয়। এ পৃথিবীতে সব জিনিসকেই নিজের চোখ দিয়ে দেখবার সংকল্পটা অতি সাধু। কিন্তু স্মৃতি যে প্রত্যক্ষের অন্তরায় এ কথাটা সত্য নয়। আমরা যা-কিছু প্রত্যক্ষ করি তার ভিতর অনেকখানি স্মৃতি আছে, এতখানি যে প্রত্যক্ষ করবার ভিতর চোখই কম ও মনই বেশি। এ কথা যাঁরা মানতে রাজি নন তাঁরা বের্গস'র *Matter and Memory* নামক গ্রন্থখানি পড়ে দেখলেই ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের সঙ্গে স্মৃতিগত বিষয়ের অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধটা স্পষ্ট দেখতে পাবেন। সে যাই হোক, কবির হয়ে শুধু এই কথাটা আমি বলতে চাই যে, কবির উক্তি আমাদের অনেকেরই বোজা চোখকে খুলে দেয়, কারো খোলা চোখকে বুজিয়ে দেয় না। কবিতা পড়তে পড়তে অনেকের অবশ্য চোখ ঢলে আসে, কিন্তু তার কারণ স্বতন্ত্র।

সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর কিছুমাত্র পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে ও-সাহিত্য বর্ষার কথায় মুখরিত। বর্ষা যে পূর্ব-কবিদের এতদূর প্রিয় ছিল তার কারণ সেকালেও বর্ষা দেখা দিত গ্রীষ্মের পিঠ পিঠ। ইংরেজ কবিরা যে শতমুখে বসন্তের গুণগান করেন তার কারণ সে দেশে বসন্ত আসে শীতের পিঠ পিঠ। ফলে সে দেশে শীতে ম্রিয়মাণ প্রকৃতি বসন্তে আবার নবজীবন লাভ করে। বিলেতি শীতের কঠোরতা যিনি রক্তমাংসে অনুভব করেছেন, যেমন আমি করেছি, তিনিই সে দেশে বসন্তঋতু-স্পর্শে প্রকৃতি কি আনন্দে বেঁচে ওঠে তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। সে দেশ ও ঋতু প্রকৃতির ফুলসজ্জা।

সংস্কৃত কবিরা যে দেশের লোক সে দেশে গ্রীষ্ম বিলেতি শীতের চাইতেও ভীষণ ও মারাত্মক। বাণভট্টের শ্রীহর্ষচরিতে গ্রীষ্মের একটি লম্বা বর্ণনা আছে।

সে বর্ণনা পড়লেও আমাদের গায়ে জ্বর আসে। এ বর্ণনা প্রকৃতির ঘরে আগুন লাগবার বর্ণনা। যে ঋতুতে বাতাস আসে আগুনের হলকার মতো, যে ঋতুতে আলোক অগ্নির রূপ ধারণ করে, যে ঋতুতে পত্র পুষ্প সব জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, আর বৃক্ষলতা সব কঙ্কালসার হয়ে ওঠে, সে ঋতুর অন্তে বর্ষার আগমন, প্রকৃতির ঘরে নবজীবনের আগমন। কালিদাস একটি শ্লোকে সেকালের কবিদের মনের আসল কথা বলে দিয়েছেন—

বহুগুণবমণীয়ঃ কামিনীচিত্তহাবী
তব্বুবিটপলতানাং বান্ধবো নির্বিকারঃ।
জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণভূতো
দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি॥

পৃথিবীতে যে বস্তুই 'প্রাণিনাং প্রাণভূতো' সেই বস্তুই শুধু কামিনী-চিত্তহারী নয় কবি-চিত্তহারীও। আর কালিদাস যে বলেছেন 'কামিনী-চিত্তহারী' তার অর্থ—যা সর্বমানবের চিত্তহারী তা স্ত্রীজাতিরও চিত্তহারী হবার কথা, কেননা স্ত্রীলোকও মানুষ। উপরন্তু স্ত্রীজাতির সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এত ঘনিষ্ঠ যে অনেকের ধারণা নারী ও প্রকৃতি একই বস্তু, ও-দুয়ের মধ্যে পুরুষ শুধু প্রক্ষিপ্ত।

আমাদের দেশে গ্রীষ্মের পরে বর্ষার আবির্ভাব প্রকৃতির একটা অপরূপ এবং অদ্ভুত বদল। গ্রীষ্ম অন্তত এ দেশে ধীরে ধীরে অলক্ষিতে বর্ষায় পরিণত হয় না। এ পরিবর্তন হ্রাসও নয় বৃদ্ধিও নয়, একেবারে বিপর্যয়। বর্ষা গ্রীষ্মের evolution নয়, আমূল revolution। সুতরাং বর্ষার আগমন কানারও চোখে পড়ে, কালারও কানে বাজে। কালিদাস বর্ষাঋতুর বর্ণনা এই বলে আরম্ভ করেছেন—

সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জর-
স্তড়িৎপতাকোঽশনিশব্দমর্দলঃ।
সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতি-
র্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে॥

বর্ষার এতাদৃশ রূপবর্ণনা ইউরোপীয় সাহিত্যে নেই। কারণ এ ঋতু ও-বেশে সে দেশে প্রবেশ করে না। ইংলন্ডে দেখেছি, সেখানে বৃষ্টি আছে কিন্তু বর্ষা নেই। বিলিতি প্রকৃতি সদাসর্বদা মুখ ভার ক'রে থাকেন এবং যখন তখন কাঁদতে শুরু করেন, আর সে কান্না হচ্ছে নাকে-কান্না, তা দেখে প্রকৃতির উপর মায়া হয় না, রাগ ধরে। সে দেশে বিদ্যুৎ রণপতাকা নয়—পিদিমের সলতে, তার মুখের আলো প্রকৃতির অট্টহাস্য নয়—রোগীর মুখের কষ্টহাসি। আর সে দেশের মেঘের ডাক অশনিশব্দমর্দল নয়, গাব-চটা বাঁয়ার বুকচাপা গ্যাঁঙরানি। এক কথায় বিলেতের বর্ষা থিয়েটারের বর্ষা। ও গোলাপপাশের বৃষ্টিতে কারো গা ভেজে না, ও টিনের বজ্রধ্বনিতে কারো কান কালা হয় না, ও মেকি বিদ্যুতের আলোতে কারো চোখ

কানা হয় না। বিলেতের বর্ষার ভিতর চমকও নেই চটকও নেই। ওরকম ঘ্যানঘেনে প্যানপেনে জিনিস কবির মনকে স্পর্শ করে না, তাই বিলেতি সাহিত্যে বর্ষার কোনো রূপবর্ণনা নেই। যার রূপ নেই তার রূপবর্ণনা কতকটা যার মাথা নেই তার মাথাব্যথার মতো। শেলির মন অবশ্য পর্বতশৃঙ্গে মেঘলোকে বিচরণ করত। কিন্তু সে মেঘ হচ্ছে কুয়াশা, তার কোনো পরিচ্ছিন্ন মূর্তি নেই। সুতরাং তাঁর আঁকা প্রকৃতির ছবি কোনো ফ্রেমে আঁটা যায় না, যেমন West Windকে বাঁশির ভিতর পোরা যায় না। ফ্রেম কথাটা শুনে সেই-সব লোক চমকে উঠবেন যাঁরা বলেন যে, অসীমকে নিয়েই কবির কারবার। অবশ্য তাই। জ্ঞানের অসীম সীমার বাইরে, কিন্তু আর্টের অসীম সীমার ভিতর।

৪

বর্ষা যে রাজার মতো হাতিতে চড়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে নিশান উড়িয়ে ধুমধড়াক্কা ক'রে আসে, এ ঘটনা এ দেশে চিরপুরাতন ও চিরনবীন। সুতরাং যুগ যুগ ধ'রে কবিরা বর্ষার এই দিগ্‌বিজয়ী রাজরূপ দেখে এসেছে এবং সে-রূপ ভাষায় অঙ্কিত করে অপরের চোখের সুমুখে ধরে দিয়েছে। আমাদের দেশে বর্ষার রূপের মতো আমাদের কাব্যসাহিত্যে তার বর্ণনাও চিরপুরাতন ও চিরনবীন। মানুষের পুনরুক্তি প্রকৃতির পুনরুক্তির অনুবাদ মাত্র।

কালিদাসের বহুপরবর্তী কবি বর্ষাঋতুর ঐ রাজরূপ দর্শন করেছেন, সুতরাং সেই রূপেরই বর্ণনা করেছেন। এমন-কি, হিন্দি কবিরা ও-ছবি তাদের গানে আজও ফুর্তি করে আঁকছে—

যোধন বেশে বাদর আওয়ল

এ পদটি মল্লার রাগের একটি প্রসিদ্ধ ধ্রুপদের প্রথম পদ। ও গান যখন প্রথম শুনি তখন আমার চোখের সুমুখে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠেছিল, কানের কাছে মৃদঙ্গের গুরুগম্ভীর অবিরল পরং বেজে উঠেছিল।

এ গান শুনে যদি কেউ বলেন যে, উক্ত হিন্দি গানের রচয়িতা কালিদাসের কবিতা চুরি করেছেন তা হলে বলতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন—

বাদল-মেঘে মাদল বাজে

সে কথাও অশনিশব্দমর্দলের বাংলা কথায় অনুবাদ। সাহিত্যে এরূপ চুরিধরা-বিদ্যে বাতুলতার না হোক বালিশতার পরিচায়ক। কারণ এ বিদ্যার বলে এও প্রমাণ করা যায় যে, কালিদাস তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের বর্ণনা বেমালুম আত্মসাৎ করেছিলেন। মৃচ্ছকটিক-প্রকরণে বিট বসন্তসেনাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—

পশ্য পশ্য। অয়মপরঃ—
পবনচপলবেগঃ স্থূলধারাশরৌঘঃ।
স্তনিতপটহনাদঃ স্পষ্টবিদ্যুৎপতাকঃ।
হরতি করসমূহং খে শশাঙ্কস্য মেঘো
নৃপ ইব পুরমধ্যে মন্দবীর্যস্য শত্রোঃ॥

উক্ত শ্লোকের ভিতর স্পষ্ট বিদ্যুৎপতাকা আছে, পটহনিনাদ আছে, রূপ আছে। অর্থাৎ কালিদাসের শ্লোকের মালমসলা সবই আছে। আর মৃচ্ছকটিক হচ্ছে দরিদ্র চারুদত্তের রাজসংস্করণ, কারণ তা হচ্ছে রাজা শূদ্রকের সংস্করণ। দরিদ্র চারুদত্ত ভাসের লেখা; আর ভাস যে কালিদাসের পূর্ববর্তী কবি তা স্বয়ং কালিদাস নিজমুখেই স্বীকার করেছেন। এর থেকে প্রমাণ হয় শুধু এই মাত্র যে, বর্ষার রূপ এ দেশে সনাতন, তাই তার বর্ণনাও সনাতন। আর শাস্ত্রে বলে, যা সনাতন তাই অপৌরুষেয়।

স্মৃতি প্রত্যক্ষের পরিপন্থী নয়, কিন্তু শ্রুতি অনেক ক্ষেত্রে দর্শনের প্রতিবন্ধক। অনেকের দেহে কান চোখের প্রতিযোগী। শাস্ত্রের ভাষায় বলতে হলে নাম রূপের প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা যদি কোনো বিষয়ের কথা শুনে নিশ্চিন্ত থাকি তা হলে সে বিষয়ের দিকে চোখ চেয়ে দেখবার আমাদের প্রবৃত্তি থাকে না। কথা যখন কিংবদন্তী হয়ে ওঠে তখন অনেকের কাছে তা বেদবাক্য হিসেবে গ্রাহ্য হয়। একটা সর্বলোকবিদিত উদাহরণ নেওয়া যাক।

বহুকাল থেকে শুনে এসেছি যে অনেকে বিশ্বাস করেন যে, পয়লা আষাঢ়ে বৃষ্টি নামতে বাধ্য, কেননা কালিদাস বলেছেন, 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' দেশের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।

কালিদাস শুধু বড়ো কবি নন, সেইসঙ্গে তিনি যে বড়ো জিয়োগ্রাফার এবং বড়ো অর্নিথলজিস্ট তা জানি, কিন্তু উপরন্তু তিনি যে একজন অভ্রান্ত মেটিয়রলজিস্ট তা বিশ্বাস করা কঠিন। মেঘদূতকে মেটিয়রলজিকাল অফিসের রিপোর্ট হিসেবে গ্রাহ্য করতে আমি কুণ্ঠিত। কারণ মেঘদূত আর যাই হোক মেঘলোক সম্বন্ধে ছেলেভুলানো সংবাদের প্রচারক নয়। মেঘকে দূত করতে হলে তাকে বর্ষাঋতুতেই যাত্রা করাতে হয়। আর কোন্ পথ দিয়ে উড়ে অলকায় যেতে হবে সে বিষয়েও কালিদাস উক্ত দূতকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ দিয়েছেন। কালিদাস খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন যে—

মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং
সন্দেশং মে তদনু জলদ শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্।

অর্থাৎ আগে পথের কথা শোনো, তার পর অলকায় গিয়ে কার কাছে কি বলতে হবে সে কথা পরে শুনো। এ কারণ পূর্বমেঘ আগাগোড়াই পথের কথা।

এ পথ ভারতবর্ষের উত্তরাপথ। বাংলা থেকে অন্তত দেড় হাজার মাইল দূরে। সুতরাং সে দেশে কখন বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়, তার থেকে বাংলায় কোন্ দিন বৃষ্টি নামবে তা বলা যায় না, অন্তত ন্যায়শাস্ত্রের এমন কোনো নিয়ম নেই যার বলে রামগিরি থেকে এক লম্ফে কলকাতায় অবতীর্ণ হওয়া যায়।

কিন্তু আসল কথা এই যে, কালিদাস এমন কথা বলেন নি যে পয়লা আষাঢ়ে বৃষ্টি নামে। তাঁর কথা এই যে—

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥

সমস্ত শ্লোকটা উদ্ধৃত করে দিলুম এইজন্যে যে সকলেই দেখতে পাবেন যে, এর ভিতর বৃষ্টির নামগন্ধও নেই। যক্ষ যা দেখেছিলেন তা হচ্ছে 'মেঘমাশ্লিষ্টসানুং' অর্থাৎ পাহাড়ের গায়ে লেপ্‌টে-লাগা মেঘ। এরকম মেঘ বাংলাদেশে কখনো চোখে পড়ে না, দেখা যায় শুধু পাহাড়ে পর্বতে। যক্ষ যে তা দেখেছিলেন তাও অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই, কেননা তিনি বাস করতেন তস্মিন্নদ্রৌ— সেই পাহাড়ে। সুতরাং বাংলাদেশে যাঁরা পয়লা আষাঢ়ে সেইরকম উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, যথা—

চাতকিনী কুতুকিনী ঘনদরশনে

তাঁরা সেই শ্রেণীর লোক যাঁরা কথার মোহে ইন্দ্রিয়ের মাথা খেয়ে বসে আছেন। শুনতে পাই বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছেন যে, কথার অর্থ ভুল বোঝা থেকেই mythএর জন্ম হয়। বৈজ্ঞানিকদের এ মতের সত্যতার প্রমাণ তো হাতে-হাতেই পাওয়া গেল।

আষাঢ় সম্বন্ধে বাংলাদেশে আর-একটি কিংবদন্তী আছে, যা আমার কাছে অদ্ভুত লাগে এবং চিরকাল লেগেছে। কথায় বলে 'আষাঢ়ে গল্প', কিন্তু গল্পের সঙ্গে আষাঢ়ের কি নৈসর্গিক যোগাযোগ আছে তা আমি ভেবে পাই নে।

আমার বিশ্বাস, গল্পের অনুকূল ঋতু হচ্ছে শীত, বর্ষা নয়। কেননা গল্প লোকে রাত্তিরেই বলে। তাই পৃথিবীর অফুরন্ত গল্পরাশি একাধিক সহস্র রজনীতেই বলা হয়েছিল। শীতকাল যে গল্প বলার ও গল্প শোনার উপযুক্ত সময় তার কারণ শীতকালে রাত বড়ো দিন ছোটো। অপর পক্ষে আষাঢ়ের দিন-রাতের হিসেব শীতের ঠিক উলটো; একালের দিন বড়ো, রাত ছোটো। দিনের আলোতে গল্পের আলাদিনের প্রদীপ জ্বালানো যায় না।

তবে যে লোকে মনে করে যে, আষাঢ়ের দিন গল্পের পক্ষে প্রশস্ত দিন, তার একমাত্র কারণ আষাঢ়ের দিন প্রশস্ত। কোনো বস্তুর পরিমাণ থেকে তার গুণ নির্ণয় করবার প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ, পরিমাণ জিনিসটে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর গুণ মনোগ্রাহ্য। আর সাধারণত আমাদের পক্ষে মনকে খাটানোর চাইতে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা ঢের সহজ। তবে একদল লোক, অর্থাৎ হেগেলের শিষ্যরা, আমার কথা শুনে হাসবেন। তাঁদের গুরু বলেছেন যে কোয়ান্টিটি বাড়লেই তা কোয়ালিটি হয়ে ওঠে। এই কারণেই সমাজ হচ্ছে গুণনিধি আর

ব্যক্তি নির্গুণ; আর সেই জাতিই অতিমানুষের জাত যে জাত অর্ধেক পৃথিবীর মাটির মালিক।

এ দার্শনিক মতের প্রতিবাদ করবার আমার সাহসও নেই ইচ্ছেও নেই। কেননা দেখতে পাই এ দেশেও বেশির ভাগ লোক হেগেল না পড়েও হেগেলের মতাবলম্বী হয়েছেন। ভিড়ে মিশে যাওয়ার নামই যে পরম পুরুষার্থ, এ জ্ঞান এখন সর্ব-সাধারণ হয়েছে। গোলে হরিবোল দেওয়াই যে দেশ-উদ্ধারের একমাত্র উপায়, এই হচ্ছে বর্তমান হট্টমত। এ জর্মান-মত সম্বন্ধে যাঁর মনে দ্বিধা আছে তাঁকে আগে একটি মহাসমস্যার মীমাংসা ক'রে পরে মুখ খুলতে হবে। সে সমস্যা এই : কোয়ানটিটি কোয়ালিটির অবনতি, না, কোয়ালিটি কোয়ানটিটির পরিণতি? এ বিচারের উপযুক্ত সময় হচ্ছে নিদাঘ, বর্ষা নয়। কারণ উক্ত সমস্যার মীমাংসার জন্য তার উপর প্রচণ্ড আলো ফেলতে হবে, যে আলো এই মেঘলা দিনে আকাশেও নেই, মনেও নেই। আজকের দিনে এই গা-ঢাকা আলোর ভিতর বাজে কথা বলাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কালিদাস বলেছেন—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ

সুতরাং আমার মনও যে অন্যথাবৃত্তি অর্থাৎ অদার্শনিক হয়ে পড়েছে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

৮

এখন পুরনো কথায় ফিরে যাওয়া যাক। 'আষাঢ়ে গল্প' কথাটার সৃষ্টি হল কি সূত্রে তারই এখন অনুসন্ধান করা যাক, কিন্তু সে সূত্র খুঁজতে হলে আমাকে আর-এক শাস্ত্রের দ্বারস্থ হতে হ'বে—যে শাস্ত্রের ভিতর প্রবেশ করবার অধিকার আমার নেই, সে শাস্ত্রের নাম শব্দতত্ত্ব। অপর পক্ষে, এই বর্ষার দিনে স্বাধিকার-প্রমত্ত হবার অধিকার সকলেরই আছে, এই বিশ্বাসের বলেই আমি অনধিকারচর্চা করতে ব্রতী হচ্ছি।

আমি পূর্বে বলেছি যে, নিরুক্তকারদের মতে যে কথার মানে আমরা জানি নে অথচ বলি, সেই কথা থেকেই কিংবদন্তী জন্মলাভ করে। আমার বিশ্বাস 'আষাঢ়ে গল্প'-রূপ কিংবদন্তীর জন্মকথাও তাই।

আমাদের বাঙাল দেশে লোকে 'আষাঢ়ে গল্প' বলে না, বলে 'আজাড়ে গল্প'। এখন এই 'আজাড়ে' শব্দটি কি 'আষাঢ়ে'র অপভ্রংশ? 'আজাড়' শব্দের সাক্ষাৎ সংস্কৃতকোষের ভিতর পাওয়া যায় না। এর থেকে অনুমান করছি যে এটি হয় ফারসি নয় আরবি শব্দ। আর ও-কথার মানে আমরা সবাই জানি, অন্য সূত্রে। আমরা যখন বলি 'মাঠ উজাড়' করে দিলে তখন আমরা বুঝি যে উজাড় মানে নির্মূল। কারণ 'জড়' মানে যে মূল তা বাংলার চাষীরাও জানে। সুতরাং 'আজাড়ে গল্পে'র অর্থ যে অমূলক গল্প এরূপ অনুমান করা অসংগত নয়। এই 'আজাড়' কথাটার শুদ্ধি ক'রে নিয়ে আমরা তাকে 'আষাঢ়' বানিয়েছি। এ কারণ আরব্য-উপন্যাসের সব গল্পই আজাড়ে গল্প, হিন্দু জবানে 'আষাঢ়ে গল্প'; যদিও আরবদেশে আষাঢ়ও নেই, শ্রাবণও নেই।

সুতরাং এ কিংবদন্তীর অলীকতা ধরতে পারলেই আমরা বুঝতে পারব যে, বৃষ্টির জল পেয়ে গল্প গজায় না, জন্মায় শুধু কবিতা। বর্ষাকাল কবির স্বদেশ, ঔপন্যাসিকের বিদেশ।

৯

বর্ষা যে গল্পের ঋতু নয় গানের ঋতু—তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্যে আষাঢ়ে গল্প নেই, কিন্তু মেঘরাগের অগণ্য গান আছে।

বাংলার আদিকবি জয়দেবের আদিশ্লোক কার মনে নেই? সকলেরই মনে আছে এই কারণ যে—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবশ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ

এ পদ যার একবার কর্ণগোচর হয়েছে তাঁর কানে তা চিরদিন লেগে থাকবার কথা। চিরদিন যে লেগে থাকে তার কারণ A thing of beauty is a joy for ever। এর সৌন্দর্য কোথায়? এ প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট জবাব দেবার জো নেই। পোয়েট্রি অথবা বিউটি যে-ভাষায় আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করে, তা অপর কোনো ভাষায় অনুবাদ করা অসম্ভব। আর আমরা যাকে ভাষা বলি, সে তো হয় কর্মের, নয় জ্ঞানের ভাষা। তবে ঐ ক'টি কথায় জয়দেব আমাদের চোখের সুমুখে যে-রূপ ধরে দিয়েছেন তা একটু নিরীক্ষণ ক'রে দেখা যাক। কবিতা মাত্রেরই ভিতর ছবি থাকে; অতএব দেখা যাক কবি এ স্থলে কি ছবি এঁকেছেন। বর্ষার যে ছবি কালিদাস এঁকেছেন এ সে-ছবি নয়। এর ভিতর বজ্র নেই বিদ্যুৎ নেই বৃষ্টি নেই—অর্থাৎ যে-সব জিনিস মানুষের ইন্দ্রিয়ের উপর হঠাৎ চড়াও হয় এবং মানুষের মনকে চমকিত করে সে-সব জিনিসের বিন্দুবিসর্গও উক্ত পদে নেই। কবি শুধু দুটি কথা বলেছেন, আকাশ মেঘে কোমল ও বনতমালে শ্যাম; তিনি তুলির দুটি টানে একসঙ্গে আকাশের ও পৃথিবীর চেহারা এঁকেছেন। এ চিত্রের ভিতরে কোনো রেখা নেই, আছে শুধু রঙ; আর সে রঙ নানাজাতীয় নয়; একই রঙ—শ্যাম, উপরে একটু ফিকে নীচে একটু গাঢ়। এ বর্ণনা হচ্ছে—চিত্রকররা যাকে বলে—ল্যান্ড-স্কেপ পেণ্টিং। তুলির দু টানে জয়দেব বর্ষার নির্জনতার, নীরবতার, তার নিবিড় শ্যামশ্রীর কি সমগ্র কি সুন্দর ছবি এঁকেছেন। এ ছবি যার চোখে একবার পড়েছে তার মনে এ ছবির দাগ চিরদিনের মতো থেকে যায়। বাইরে যা ক্ষণিকের, মনে তা চিরস্থায়ী হয়। যা অনিত্য তাকে নিত্য করাই তো কবির ধর্ম।

১০

এর থেকে মনে পড়ে গেল যে, কবিতা বস্তু কি? এ প্রশ্ন মানুষে আবহমানকাল জিজ্ঞাসা ক'রে এসেছে, আর যথাশক্তি তার উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে। এ সমস্যার মীমাংসায় ইউরোপীয় সাহিত্য ভরপুর। আরিস্টটলের যুগ থেকে এ আলোচনা শুরু হয়েছে আর আজও থামে নি, বরং সটান চলছে। এর চূড়ান্ত মীমাংসা যে

আজ পর্যন্ত হয় নি তার কারণ যুগে যুগে মানুষের মন বদলায় এবং তার ফলে পুরনো মীমাংসা সব নতুন সমস্যা হয়ে ওঠে। যখন মানুষের মনে কোনো সমস্যা থাকবে না তখনই তার চূড়ান্ত মীমাংসা হবে। যাক বিদেশের কথা। 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' যে এ দেশের লোকের মনেও উদয় হয়েছিল তার পরিচয় যিনি পেতে চান, তিনি 'কাব্যজিজ্ঞাসা' সম্বন্ধে আমার বন্ধু শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের বিস্তৃত আলোচনা পড়ে দেখুন। আমাদের দেশের দার্শনিকরা 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র যে উত্তর দিয়েছেন 'কাব্যজিজ্ঞাসা'রও সেই একই উত্তর দিয়েছেন। সে উত্তর হচ্ছে নেতি নেতি-- অর্থাৎ কাব্যের প্রাণ রীতিও নয়, নীতিও নয়, ভাষাও নয় ভাবও নয়। এক কথায় কাব্যের প্রাণ হচ্ছে একটি mystery। প্রাণ জিনিসটা mystery, এ সত্য জেনেও মানুষে দেহের ভিতর প্রাণের সন্ধান করেছে, আর তা কতকটা পেয়েওছে। সুতরাং কবিতার দেহতত্ত্বের আলোচনা করলে আমরা তার প্রাণের সন্ধান পেতে পারি। দার্শনিকের সঙ্গে কবির প্রভেদই এই যে, দার্শনিকের কাছে দেহ ও মন, ভাষা আর ভাব দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু; কিন্তু কবির কাছে ও-দুই এক। তাঁর কাছে ভাষাই ভাব, আর ভাবই ভাষা। কাব্যবস্তু যে ভাষার অতিরিক্ত তার কারণ ভাষার প্রতি পরমাণুর ভিতর ভাব আছে, এবং তা যে ভাবের অতিরিক্ত, তার কারণ প্রতি ভাবকণার ভিতর ভাষা আছে। এই কারণে বলতে সাহসী হচ্ছি যে, জয়দেবের উক্ত পদ যে আমাদের মুগ্ধ করে তার একটি কারণ তার music, আর এ musicএর মূলে আছে অনুপ্রাস। অনুপ্রাস জিনিসটে কতদূর বিরক্তিকর হতে পারে তার পরিচয় বাংলার অনেক যাত্রাওয়ালা ও কবিওয়ালার গানে পাওয়া যায়। কিন্তু কবির হাতে পড়লে অনুপ্রাস যে কবিতাতে প্রাণসঞ্চার করে তার পরিচয় অপর ভাষার অপর কবিদের মুখেও পাওয়া যায়। শেক্‌স্‌পীয়রের full fathom five thy father lies, এবং কোল্‌রিজের five miles meandering with a mazy motion—এ দুটি পদ যে মনের দুয়ারে ঘা দেয় এ কথা কোন্‌ সহৃদয় লোক অস্বীকার করবে? এ দুটি লাইনের সৌন্দর্য যে অনুপ্রাস-নিরপেক্ষ নয় সে তো প্রত্যক্ষ সত্য। জয়দেবের বর্ষার রূপবর্ণনা অনুপ্রাসের গুণে ভাবঘন হয়ে উঠেছে, আর এই একই কবির বসন্তবর্ণনা অনুপ্রাসের দোষে নিরর্থক হয়েছে—

ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলনকোমলমলয়সমীরে

শুধু শব্দঘটা মাত্র, ছবিও নয়, গানও নয়। ও-পদের ভিতর সে ধ্বনিও নেই, সে আলোকও নেই, যা আমাদের ভিতরের বাইরের রূপলোককে আলোকিত ও প্রতিধ্বনিত করে।

১১

কাব্যবস্তুর স্বরূপ বর্ণনা করতে হলে যে নেতি নেতি বলতে হয়—এ কথা আমিও জানি, আমিও মানি। কিন্তু এ নেতি নেতির অর্থ এই যে, রচনার যে গুণকে অথবা রূপকে আমরা কাব্য বলি তা শব্দালংকার অর্থালংকার প্রভৃতি সবরকম অলংকারের অতিরিক্ত। তবে কাব্য অলংকার-অতিরিক্ত ব'লে অলংকার-রিক্ত নয়।

কাব্যের সর্বপ্রকার অলংকারের মধ্যে যে অলংকার সবচেয়ে সস্তা সেই অলংকার অর্থাৎ অনুপ্রাসও যে আমাদের মনে কাব্যের সুর সঞ্চার করতে পারে, এ কথা মেনে নিলে বহু কবিতার রস উপভোগ করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে আসে, কারণ এ বিষয়ে আমাদের মন অনেক ভুল আইডিয়ার বাধামুক্ত হয়। ভালোকথা, ভাবেরও কি অনুপ্রাস নেই? সেই অনুপ্রাসই কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে না, যে অনুপ্রাসের ভিতর অনুভাষ নেই; যেমন সে সংগীত মানুষের মনের দুয়োর খুলতে পারে না, যে সংগীতের অন্তরে অনুরণন নেই।

অনুপ্রাস সম্বন্ধে এত কথা বললুম এইজন্যে যে, আজকের দিনে যে-সব বাংলা গান মনের ভিতর গুন্‌গুন্‌ করছে তারা সবই অনুপ্রাসে প্রাণবন্ত। বাংলার পুরনো কবিদের দুটি পুরনো গান রবীন্দ্রনাথ আমাদের নূতন ক'রে শুনিয়েছেন। বিদ্যাপতি কোন্‌ অতীত বর্ষার দিনে গেয়ে উঠেছিলেন—

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর

কিন্তু তার পরেই তিনি যা বলেছেন তার ভিতর কাব্যরস এক ফোঁটাও নেই—

কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া

এ হচ্ছে সংস্কৃত কবিদের বাঁধিগৎ। তাই ও কবিতা থেকে ঐ প্রথম দুটি পদ বাদ দিলে বিদ্যাপতির বাদবাকি কথা কাব্য হত না। বরং সত্য কথা বলতে গেলে 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর' এই কথা-ক'টিই সমগ্র কবিতাটিকে রূপ দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে। ভরা বাদর মাহ ভাদরের সুর যার কানে বেজেছে, সেই মুহূর্তে সে অনুভব করেছে যে 'শূন্য মন্দির মোর'। যে মুহূর্তে আমরা শূন্যতার রূপ প্রত্যক্ষ করি, সে মুহূর্তে যে ভাব আমাদের মনকে পেয়ে বসে তার নাম মুক্তির আনন্দ। কাব্যজ আনন্দকেও আলংকারিকরা মুক্তির আনন্দ বলেছেন। আলংকারিকদের এ কথা মিছে নয়।

১২

অপর কবিতাটি এই—

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া-গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥

এ কবিতা যাঁর কানে ও প্রাণে একসঙ্গে না বাজে তাঁর কাছে কবিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা ক'রে কোনো ফল নেই। আলংকারিকরা বলেন—

তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়া চ কিম্‌।
পদবিন্যাস মাত্রেন যয়া নাপহৃতং মনঃ॥

উক্ত কবিতা পদবিন্যাস মাত্র যাঁর মন হরণ করে, তিনিই যথার্থ কাব্যরসিক। আর যাঁদের করে না, ভগবান তাঁদের মঙ্গল করুন।

উপরে যে দু-চারিটি নমুনা দিলুম তার থেকেই দেখা যায় যে, বাঙালি কবির বর্ষাবর্ণনা ছবিপ্রধান নয়, গানপ্রধান। বাঙালি কবিরা বর্ষার বাহ্যরূপের তেমন খুঁটিয়ে বর্ণনা করেন না যেমন প্রকাশ করেন বর্ষাগমে নিজেদের মনের রূপান্তরের। শব্দ দিয়ে ছবি আঁকার চাইতে শব্দ দিয়ে সংগীত রচনা করবার দিকেই বাঙালি কবির ঝোঁক বেশি। তাই তাঁদের কবিতায় উপমার চাইতে অনুপ্রাস প্রবল।

সংস্কৃত কবির চোখ আর বাঙালি কবির কান এ দুইই তাদের পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। সকলেই জানেন যে, রবীন্দ্রনাথ বর্ষার বিষয়ে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। ফলে ও-ঋতুর বিচিত্র রূপের প্রতি রূপের চিত্র তাঁর কাব্যে ছন্দোবন্ধে আবদ্ধ হয়েছে। এ ঋতু সম্বন্ধে তাঁর কবিতাবলীকে একটি বিচিত্র পিক্‌চার গ্যালারি বললে অসংগত কথা বলা হয় না। অপর পক্ষে বর্ষার সুরে মনের ভিতর যে সুর বেজে ওঠে সেই অপার্থিব সুরের দিব্যরূপ পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হয়েছে রবীন্দ্রনাথের একটি বর্ষার কবিতায়, সে কবিতার প্রথম পদ হচ্ছে—

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।

যে কবিতার ভাষা ও ভাব মিলে এক হয়ে যায় সেই কবিতাই যদি perfect কবিতা হয় তা হলে আমি জোর করে বলতে পারি এর তুল্য perfect কবিতা বাংলাতেও নেই, সংস্কৃতেও নেই। ও-কবিতা শুনে—

সমাজসংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব

এ কথা যিনি ক্ষণিকের জন্যও হৃদয়ঙ্গম না করেন তাঁর এই বর্ষার দেশে জন্মগ্রহণ করাটা কর্মভোগ মাত্র।

ভাদ্র ১৩৩৪

প্রকাশনির্দেশ

প্রবন্ধসংগ্রহে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী কোন্ কোন্ গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র থেকে সংকলিত, নিম্নে তার বিবরণ মুদ্রিত হল। গ্রন্থমধ্যে রচনার নীচে উল্লিখিত তারিখ সাময়িক পত্রে প্রকাশ অনুযায়ী।

বীরবলের হালখাতা

কথার কথা	ভারতী। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯
আমরা ও তোমরা	ভারতী। শ্রাবণ ১৩০৯
খেয়ালখাতা	ভারতী। বৈশাখ ১৩১২
মলাট-সমালোচনা	সাহিত্য। অগ্রহায়ণ ১৩১৯
তরজমা	ভারতী। মাঘ ১৩১৯
বঙ্গ সাহিত্যে নবযুগ	ভারতী। আশ্বিন ১৩২০
সবুজ পত্র	সবুজ পত্র। বৈশাখ ১৩২১
'যৌবনে দাও রাজটিকা'	সবুজ পত্র। জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
বর্ষার কথা	সবুজ পত্র। আষাঢ় ১৩২১
চুট্‌কি	সবুজ পত্র। জ্যৈষ্ঠ ১৩২২
সাহিত্যে খেলা	সবুজ পত্র। শ্রাবণ ১৩২২
প্রত্নতত্ত্বের পারশ্য-উপন্যাস	সবুজ পত্র। আষাঢ় ১৩২৩
সুরের কথা	সবুজ পত্র। পৌষ ১৩২৩
রূপের কথা	সবুজ পত্র। ফাল্‌গুন ১৩২৩
ফাল্‌গুন	সবুজ পত্র। চৈত্র ১৩২৩

নানা-কথা

তেল নুন লকড়ি	ভারতী। মাঘ-ফাল্‌গুন ১৩১২
বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা	ভারতী। পৌষ ১৩১৯
সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা	ভারতী। চৈত্র ১৩১৯
সনেট কেন চতুর্দশপদী	ভারতী। ভাদ্র ১৩২০
সবুজ পত্রের মুখপত্র	সবুজ পত্র। বৈশাখ ১৩২১
সাহিত্যসম্মিলন	সবুজ পত্র। জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
ভারতবর্ষের ঐক্য	সবুজ পত্র। আষাঢ় ১৩২১
বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ	সবুজ পত্র। অগ্রহায়ণ ১৩২১
নূতন ও পুরাতন	সবুজ পত্র। পৌষ ১৩২১
বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি	সবুজ পত্র। মাঘ ১৩২১

অভিভাষণ	সবুজ পত্র। ফাল্গুন ১৩২১
বর্তমান বঙ্গ সাহিত্য	সবুজ পত্র। কার্তিক ১৩২২
ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়	সবুজ পত্র। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩
প্রাণের কথা	সবুজ পত্র। শ্রাবণ ১৩২৪
বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌ম্	সবুজ পত্র। অগ্রহায়ণ ১৩২৭

আমাদের শিক্ষা

বাংলার ভবিষ্যৎ	সবুজ পত্র। অগ্রহায়ণ ১৩২৪
বই পড়া	সবুজ পত্র। শ্রাবণ ১৩২৫

রায়তের কথা

রায়তের কথা	সবুজ পত্র। ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৬

নানা-চর্চা

ভারতবর্ষ সভ্য কি না	সবুজ পত্র। ফাল্গুন ১৩২৫
রামমোহন রায়	সবুজ পত্র। আশ্বিন ১৩২৭
ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফি	সবুজ পত্র। মাঘ ১৩৩২
বীরবল	সবুজ পত্র। চৈত্র ১৩৩৩
অনু-হিন্দুস্থান	সবুজ পত্র। বৈশাখ ১৩৩৪
পূর্ব ও পশ্চিম	বিচিত্রা। আষাঢ় ১৩৩৪
মহাভারত ও গীতা	বিচিত্রা। কার্তিক ১৩৩৪
ভারতচন্দ্র	মানসী ও মর্মবাণী। শ্রাবণ ১৩৩৫
ইউরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি	মাসিক বসুমতী। আষাঢ় ১৩৩৭
হর্ষচরিত	মাসিক বসুমতী। ভাদ্র ১৩৩৭
পাঠান-বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৩৮

সাময়িক পত্র

জয়দেব	ভারতী ও বালক। জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭
আমাদের ভাষাসংকট	সবুজ পত্র। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৯
বর্ষা	সবুজ পত্র। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৯
বর্ষার দিন	বিচিত্রা। ভাদ্র ১৩৩৪
চিত্রাঙ্গদা	বিচিত্রা। চৈত্র ১৩৩৪
কাব্যে অশ্লীলতা—আলংকারিক মত	মাসিক বসুমতী। বৈশাখ ১৩৩৬

প্রমথ চৌধুরীর গ্রন্থসূচী

জন্ম ৭ অগস্ট ১৮৬৮। মৃত্যু ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

তেল নুন লকড়ি। ১৯০৬?। পৃ ৪৮

১৩১২ মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ। পরে 'নানা-কথা' পুস্তকের অন্তর্গত।

সনেট-পঞ্চাশৎ। ১৯১৩। [২৫ মার্চ ১৯১৩]। পৃ ৫০

চার-ইয়ারি কথা। জানুয়ারি ১৯১৬। [১১ অগস্ট ১৯১৬]। পৃ ৯৭। গল্প।

The Story of Bengalee Literature (Paper read at the Summer Meeting at Darjeeling on the 14th of June 1917). 1917. [15 August 1917]. Pp 17.

বীরবলের হালখাতা। [৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৭]। পৃ ২৭৮। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী॥ হালখাতা; কথার কথা; আমরা ও তোমরা; খেয়াল খাতা; মলাট-সমালোচনা; সাহিত্যে চাবুক; তর্জ্জমা; বইয়ের ব্যবসা; বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ; নোবেল প্রাইজ; সবুজ পত্র; বীরবলের চিঠি; "যৌবনে দাও রাজটীকা"; ইতিমধ্যে; বর্ষার কথা; পত্র; কৈফিয়ৎ; নারীর পত্র; নারীর পত্রের উত্তর; চুট্‌কি; সাহিত্যে খেলা; শিক্ষার নব আদর্শ; কন্‌গ্রেসের আইডিয়াল; পত্র; প্রত্ন-তত্ত্বের পারস্য উপন্যাস; টীকা ও টিপ্পনী; শিশু-সাহিত্য; সুরের কথা; রূপের কথা; ফাল্গুন।

এই গ্রন্থের প্রথম চৌদ্দটি প্রবন্ধযোগে বীরবলের হালখাতার দ্বিতীয় সংস্করণ ("প্রথম পর্ব্ব") ১৩৩৩ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়।

নানা-কথা। [১৩ মে ১৯১৯]। পৃ ৩৬২। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী॥ তেল নুন লকড়ি; বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাঙলা ওরফে সাধুভাষা; সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা; বাঙলা ব্যাকরণ; সনেট কেন চতুর্দ্দশপদী?; ব্রাহ্মণ মহাসভা; সবুজ পত্রের মুখপত্র; সাহিত্য-সম্মিলন; ভারতবর্ষের ঐক্য; ইউরোপের কুরুক্ষেত্র; বর্ত্তমান সভ্যতা বনাম বর্ত্তমান যুদ্ধ; নূতন ও পুরাতন; বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি?; অভিভাষণ; বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্য; অলঙ্কারের সূত্রপাত; আর্য্য-ধর্ম্মের সহিত বাহ্যধর্ম্মের যোগাযোগ; আর্য্যসভ্যতার সঙ্গে বঙ্গ-সভ্যতার যোগা-যোগ; ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়; সালতামামি; প্রাণের কথা।

পদ-চারণ। ১৯১৯। [১২ জুলাই ১৯২০]। পৃ ৮৪। কাব্যগ্রন্থ।

আহুতি। ১৯১৯। পৃ ১৯৯। গল্পসংগ্রহ।

সূচী॥ আহুতি; বড়বাবুর বড়দিন; একটি সাদা গল্প; ফরমায়েসি গল্প; রাম ও শ্যাম।

আমাদের শিক্ষা। [২৫ অগস্ট ১৯২০]। পৃ ১০৪। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী॥ আমাদের শিক্ষা; বাংলার ভবিষ্যৎ; বই পড়া; আমাদের শিক্ষা ও বর্ত্তমান জীবন-সমস্যা; নব-বিদ্যালয় ১-৩।

দু-ইয়ারকি। ২৯ জুলাই ১৯২০। [১৯ মার্চ ১৯২১]। পৃ ১৭৫। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী॥ দু-ইয়ারকি; দেশের কথা ১-২; রায়তের কথা; নবযুগ।

বীরবলের টিপ্পনী। ১৩২৮। [২ অগস্ট ১৯২১]। পৃ ১২৪। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী॥ কংগ্রেসের দলাদলি; "এত্তো বড়" কিংবা "কিছু নয়"; সাহিত্য বনাম পলিটিক্স; টীকা ও টিপ্পনী; পত্র; গত কংগ্রেস। পরিশিষ্ট॥ গুলিখোরের আবেদনপত্র; গর্জ্জন-সরস্বতী সংবাদ।

রায়তের কথা। [১০ অগস্ট ১৯২৬]। পৃ ১৷৶+৮০। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী॥ ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; টীকা, প্রমথ চৌধুরী; রায়তের কথা ('দু-ইয়ারকি' থেকে); রঙ্গপুরে উত্তর-বঙ্গ রায়ত কনফারেন্সে সভাপতির অভিভাষণ; পত্র ('বীরবলের টিপ্পনী' থেকে)।

"অভিভাষণ" ও "পত্র"-বর্জিত এই পুস্তিকার একটি সংশোধিত সংস্করণ বিশ্বভারতী-প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালায় ১৩৫১ সালের বৈশাখ সংখ্যা-রূপে [১৬ মে ১৯৪৪] প্রকাশিত।

প্রমথনাথ চৌধুরীর গ্রন্থাবলী। [২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩০]। পৃ ৩১১

সূচী॥ কাব্য—সনেট পঞ্চাশৎ; পদ-চারণ। গল্প—চার-ইয়ারি-কথা, আহুতি (সম্পূর্ণ); আরও আটটি গল্প ('নীললোহিত' ও 'নীললোহিতের আদিকথা'য় সংকলিত)। প্রবন্ধ—'দু-ইয়ারকি' (সম্পূর্ণ); 'বীরবলের হালখাতা', 'নানা-কথা' ও 'বীরবলের টিপ্পনী', প্রত্যেকটি আংশিক; কথা-সাহিত্য নামে একটি প্রবন্ধ।

নানা-চর্চ্চা। ১ মার্চ ১৯৩২। [১ জুন ১৯৩২]। পৃ ২৭৬। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী॥ ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফি; অনু-হিন্দুস্থান; মহাভারত ও গীতা; বৌদ্ধধর্ম্ম; হর্ষচরিত; পাঠান-বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ; বীরবল; ভারতচন্দ্র; রামমোহন রায়; বাঙালী পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌; পূর্ব্ব ও পশ্চিম; য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি?; ভারতবর্ষ সভ্য কি না?; গোল-টেবিলের বৈঠক।

নীললোহিত। পৃ ১৩১। গল্পসংগ্রহ। ১৩৩৯ মাঘ সংখ্যা পরিচয়ে সমালোচিত।

সূচী॥ নীললোহিত; নীললোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলা; নীললোহিতের স্বয়ম্বর; অদৃষ্ট; সম্পাদক ও বন্ধু; গল্প লেখা; পূজার বলি; সহযাত্রী; ঝাঁপান খেলা; দিদিমার গল্প; ভূতের গল্প।

নীললোহিতের আদিপ্রেম। [২২ অগস্ট ১৯৩৪]। পৃ ১০৫। গল্পসংগ্রহ। ১৩৪১ কার্ত্তিক সংখ্যা পরিচয়ে সমালোচিত।

সূচী॥ নীললোহিতের আদিপ্রেম; ট্রাজেডির সূত্রপাত; অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি; অ্যাডভেঞ্চার—স্থলে; অ্যাডভেঞ্চার—জলে; ভাববার কথা।

ঘরে বাইরে। [২৪ নভেম্বর ১৯৩৬]। পৃ ১২৭। প্রবন্ধসংগ্রহ। নয়টি "প্রস্তাব" আছে।

অভিভাষণ। বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন, চন্দননগর, ৯ ফাল্গুন ১৩৪৩

সাহিত্যশাখার সভাপতি প্রমথ চৌধুরীর অভিভাষণ ব্যতীত ইতিহাস ও দর্শন-শাখার সভাপতিদের অভিভাষণও এই পুস্তিকায় মুদ্রিত।

ঘোষালের ত্রিকথা। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭। পৃ ৯৩। গল্পসংগ্রহ।

সূচী॥ ফরমায়েসি গল্প ('আহুতি' থেকে); ঘোষালের হেঁয়ালি; বীণাবাই।

সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর অভিভাষণ, একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন, কৃষ্ণনগর, ২৯ মাঘ ১৩৪৪। পৃ ১৫

অণুকথা সপ্তক। ১৩৪৬। [১ জুলাই ১৯৩৯]। পৃ ৫৯। গল্পসংগ্রহ।

সূচী॥ মন্ত্রশক্তি; যখ; ঝোট্টন ও লোট্টন; মেরি ক্রিস্‌মাস; ফার্স্টক্লাশ ভূত; স্বল্প-গল্প; প্রগতি রহস্য।

প্রাচীন হিন্দুস্থান। অগ্রহায়ণ ১৩৪৬। [৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০]। পৃ ১১৭। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী॥ ভূবৃত্তান্ত ('নানা-চর্চা' থেকে। ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফি ও অনু-হিন্দুস্থান প্রবন্ধদ্বয়ের সংশোধিত রূপ); ইতিবৃত্তান্ত।

গল্পসংগ্রহ। ২০ ভাদ্র ১৩৪৮। [৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪১]। পৃ ৫০৭

গ্রন্থাকারে বা সাময়িক পত্রে এ যাবৎকাল প্রকাশিত লেখকের সমস্ত গল্পের সংগ্রহ। প্রমথ চৌধুরী-সংবর্ধনা সমিতির পক্ষে প্রিয়রঞ্জন সেন-কর্তৃক প্রকাশিত। এই সংগ্রহ প্রকাশিত হবার পরও চৌধুরী মহাশয় কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন। এই গল্পগুলি ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

Tales of Four Friends. June 1944. Pp 119.

চার-ইয়ারি কথার ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী-কৃত ইংরেজি অনুবাদ।

বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ডিসেম্বর ১৯৪৪। [২১ ডিসেম্বর ১৯৪৪]। পৃ ১৭। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা।

হিন্দু সংগীত। বৈশাখ ১৩৫২। [১৪ জুন ১৯৪৫]। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী॥ হিন্দু সংগীত; সুরের কথা ('বীরবলের হালখাতা' থেকে) ও ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী লিখিত সংগীতপরিচয়।

আত্মকথা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩। [২৮ জুন ১৯৪৬]। পৃ ১১৪

১৮৯৩ সালে বিলাতযাত্রা পর্যন্ত স্মৃতিকথা। পরবর্তী কালের আত্মকথা অধিকাংশ বৈশাখী (১৩৫২) ও পূর্বাশা (১৩৬০) পত্রে মুদ্রিত হয়েছে।

প্রবন্ধসংগ্রহ। প্রথম খণ্ড। ৭ অগস্ট ১৯৫২। পৃ ৩৩৩

'সাহিত্য' ও 'ভাষার কথা' সম্বন্ধে ছাব্বিশটি প্রবন্ধ। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংকলিত। সাময়িক পত্র থেকেও কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত-কর্তৃক সম্পাদিত এবং তাঁর লিখিত ভূমিকা সংবলিত।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান। ফাল্গুন ১৩৬০। পৃ ৩২

প্রবন্ধসংগ্রহ। দ্বিতীয় খণ্ড। মার্চ ১৯৫৪। পৃ ২৭৭

'ভারতবর্ষ' 'সমাজ' ও 'বিচিত্র' প্রসঙ্গে চব্বিশটি প্রবন্ধ। সাময়িক পত্র থেকে এই খণ্ডেও কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত-কর্তৃক সম্পাদিত।

প্রমথ চৌধুরীর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে (৭ অগস্ট ১৯৬৮) প্রবন্ধসংগ্রহ দুই খণ্ড একত্র মুদ্রিত।

সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা। ৭ আশ্বিন ১৮৮৩ শকাব্দ। পৃ [১৬]+১৭১

এই সংকলনগ্রন্থে সনেট-পঞ্চাশৎ ও পদচারণ ব্যতীত দশটি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা নাটিকা ও গান সংযুক্ত হয়েছে। গ্রন্থপরিচয় অংশে প্রমথ চৌধুরীর কয়েকখানি পত্র ও অন্যান্য উপকরণ মুদ্রিত। পুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সম্পাদিত। পরিবর্ধিত সংস্করণের (পৌষ ১৩৭৮) গ্রন্থপরিচয়ে অন্যান্য নূতন তথ্যের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'সনেট-পঞ্চাশৎ' (ভারতী। শ্রাবণ ১৩২০), প্রিয়নাথ সেনের 'সনেট-পঞ্চাশৎ' (সাহিত্য। শ্রাবণ ১৩২০) এবং প্রমথ চৌধুরী লিখিত 'সনেট কেন চতুর্দশপদী' (ভারতী। ভাদ্র ১৩২০)—প্রবন্ধ তিনটি সংযোজিত।

পত্রাবলী। ধর্ম ও বিজ্ঞান। ১ অক্টোবর ১৯৩১

ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে বীরবল, অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও দিলীপকুমার রায় লিখিত কয়েকটি পত্রালোচনা প্রমথ চৌধুরী এই গ্রন্থে স্বীয় 'মুখ-পত্র' সহ একত্র প্রকাশ করেন। উক্ত ভূমিকা ব্যতীত চৌধুরী মহাশয়ের তিনটি রচনা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে—বীরবলের পত্র ১-২; ফ্রান্সের নব মনোভাব।

বারোয়ারি। ১৯২১। [২ মে ১৯২১]

এই উপন্যাস বারোজন সাহিত্যিকের রচনা—'ভারতী মাসিক পত্রিকার উদ্যোগে ইহার সৃষ্টি'। প্রমথ চৌধুরী ৩৩-৩৬ পরিচ্ছেদ লিখে গ্রন্থ সমাপ্ত করেন।

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা সম্পাদিত 'ছোটগল্প' প্রতি সংখ্যায় সাধারণত একটি গল্প (অন্যান্য সংবাদ ও মন্তব্যসহ) পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হত। তার নিম্নোক্ত তিনটি সংখ্যা প্রমথ চৌধুরীর পুস্তকতালিকায় স্থান পেতে পারে—

সেকালের গল্প। ১ আষাঢ় ১৩৩৯

নীললোহিতের আদি প্রেম। ৬ ফাল্গুন ১৩৩৯

ট্রাজেডির সূত্রপাত। ৩১ ভাদ্র ১৩৪০

দুই না এক। বৈশাখ ১৩৫১। শ্রীপ্রতিভা বসু সম্পাদিত ছোটগল্প গ্রন্থমালার পঞ্চম সংখ্যা, থিয়োফিল গোতিয়ের গল্পের অনুবাদ, ভারতী থেকে পুনর্মুদ্রিত; এটিও প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্প-পুস্তিকা-পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। প্রমথ চৌধুরীর 'গল্পসংগ্রহে' এটি স্থান পায় নি, এই পুস্তিকার প্রকাশক সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু অনুবাদ-গল্প 'গল্পসংগ্রহে'র পরিধিভুক্ত নয়; প্রমথ চৌধুরী আরো কয়েকটি দেশী ও বিদেশী গল্পের অনুবাদ সাময়িক পত্রে প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলিও গ্রন্থভুক্ত হয় নি।

প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ গ্রন্থেই প্রকাশ-কাল মুদ্রিত নেই। ভূমিকার তারিখ, প্রেসের নির্দেশচিহ্ন ও বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগের তারিখ ধরে সাজানো হয়েছে।—বেঙ্গল লাইব্রেরির তারিখগুলি (বন্ধনীমধ্যে মুদ্রিত) শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

পুলিনবিহারী সেন

স্বীকৃতি

প্রবন্ধসংগ্রহে উদ্‌ধৃত সংস্কৃত শ্লোকগুলির মূলানুগ মুদ্রণের উদ্‌যোগে নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী ও শ্রীসুখময় ভট্টাচার্যের সাহায্য পাওয়া গেছে।

বিদেশী শব্দের লিপ্যন্তরকরণে সহায়তা করেন ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, নলিনীকান্ত গুপ্ত, মনোমোহন ঘোষ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সোমনাথ মৈত্র।

'ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফি' এবং 'অনু-হিন্দুস্থান' প্রবন্ধ সম্পাদন করেছেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও সত্যেন্দ্রকুমার বসু।

প্রবোধচন্দ্র সেন, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, শ্রীসুকুমার সেন ও সুশীলকুমার দে কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গ্রন্থপ্রকাশে আনুকূল্য করেছেন।